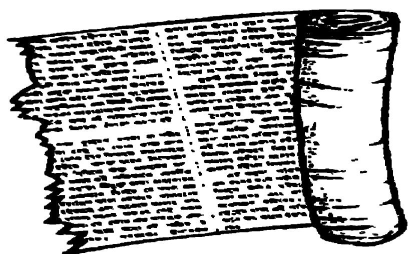
দুই শতকের
বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র



দুই শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র



মুনতাসীর মামুন

সম্পাদিত



পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯

Dui Shataker Bangla Sambad Samaikpatra

প্রথম প্রকাশ
২৩ ডিসেম্বর ২০০০

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ
গৌতম ব্যানার্জি

অক্ষর বিন্যাস
ওয়ার্ড ওয়ার্কস
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭৩

মুদ্রক
বসু মুদ্রণ
কলকাতা ৪

অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী
মান্যবরেষু

আমাদের প্রকাশিত দুটি উল্লেখযোগ্য বই

উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি / স্বপন বসু ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী *সম্পাদিত*
বুদ্ধিজীবীর নোটবই / সুধীর চক্রবর্তী *সম্পাদিত*

সম্পাদকের নিবেদন

সংবাদপত্রের সঙ্গে এদেশের মানুষের পরিচয় দুশো পঁচিশ বছর আগে। বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের আবির্ভাবের জন্য বাঙালিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে আরও বেশ কয়েকটা বছর। প্রথম পরিচয়ের জড়তা কেটে যাবার পর বাঙালিরা মুক্তকণ্ঠে এই প্রয়াসকে শুধু অভিনন্দনই জানালেন না, তৎপর হয়ে উঠলেন নতুন নতুন পত্রিকা প্রকাশেও। কিছুদিনের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী থেকে এত পত্রিকা বেরোতে শুরু করল যে সেকালের একটি নামকরা ইংরেজি কাগজ কলকাতার নতুন নাম দিল 'পত্রিকানগরী'। কিন্তু শহর কলকাতার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে পত্র-পত্রিকাগুলি আবদ্ধ থাকতে চাইল না। তার দিগন্ত হয়ে উঠল আরও প্রসারিত। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে মফস্‌সলের মানুষজনেরও বেশি সময় লাগেনি। পত্রিকার মাধ্যমে নিজেদের কথা বলার জন্য প্রস্তুত হলেন তাঁরা। মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, রংপুর, ঢাকা, রাজসাহির মতো শহরের বেড়া ডিঙিয়ে তা ঢুকে পড়ল গ্রাম বাংলায়।

সেই কবে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছে বাংলা পত্রিকার পথ চলা। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পত্র-পত্রিকার সংখ্যাও বেড়েছে অবিশ্বাস্যভাবে। উনিশ-বিশ এই দুই শতকে ঠিক কত বাংলা পত্র-পত্রিকা বেরিয়েছিল হলফ করে বলা মুশকিল—তবে সংখ্যাটা হাজার চারেকের কম নয়।

এইসব পত্রিকার অধিকাংশই দীর্ঘ জীবন পায়নি। দু-চার বছর চলার পর বেশিরভাগ পত্রিকাই বন্ধ হয়ে যেত, কয়েকটি আবার একটি/দুটি সংখ্যা প্রকাশের পরই নিত চিরবিদায়। অধিকাংশ বাংলা পত্রিকা স্বল্পস্থায়ী হলেও, দীর্ঘজীবী পত্রিকার সন্ধান যে মেলেনা এমন নয়। *সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়* টিকেছিল তিয়াত্তর বছর, *সংবাদ প্রভাকর*-এর অস্তিত্ব ১৯১৪-তেও বজায় ছিল। *সমাচার চন্দ্রিকা* চলেছিল সত্তর বছরেরও বেশি। *ঢাকা-প্রকাশ* প্রায় একশো বছর ধরে বেরিয়েছিল। ১২৬৩ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত *এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ* টিকেছিল ১৩৫৫ পর্যন্ত। *বামাবোধিনী* চলেছিল তেষট্টি বছর, আর *ভারতী* পঞ্চাশ বছর। একালের দুটি পরিচিত পত্রিকা *দেশ* আব *পরিচয়* সত্তর বছর অতিক্রম করে আজও নতুন পথের সন্ধানী। *তত্ত্বকৌমুদী* বা *সাহিত্য পরিষৎ* পত্রিকার মতো শতবর্ষ অতিক্রমকারী কাগজের কথা তো সকলেরই জানা।

বছরের পর বছর ধরে কত বিচিত্র ধরনের পত্রিকা যে বেরিয়েছে তার সীমা-সংখ্যা নেই। সংবাদপত্র ছাড়াও অসংখ্য সাময়িক পত্রিকা বাঙালিজীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। এগুলির কোনোটি প্রচার করেছে নিজধর্মের গৌরবগাথা, কোনোটি সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে চালিয়েছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। গ্রামবাংলার এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্যার কথা বলার জন্যও কম পত্রিকা বেরোয়নি। শিশু-কিশোরদের মুখ চেয়ে পত্রিকা যেমন বেরিয়েছে, তেমনি বেরিয়েছে মেয়েদের নিজের কথা বলার সুযোগ দিতে। সামাজিক বিশেষ কোন কুপ্রথার

বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার চেষ্টাও চালিয়েছেন আর-একদল। উনিশ শতকে কত সভা-সমিতি যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলা মুশকিল। এইসব সভা-সমিতির পক্ষ থেকে বেরিয়েছে একের পর এক পত্রিকা। বিশ শতকে রাজনীতি সচেতনতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে প্রকাশিত হতে শুরু হয়েছে দলীয় মুখপত্র। জাতি ও বর্ণগৌরবের মহিমা প্রচার করার জন্য দুই শতক জুড়ে কত পত্রিকা যে বেরিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

দুই শতক জুড়ে প্রকাশিত এইসব পত্র-পত্রিকার মূল্যায়ন এবং বাঙালিজীবনে সেগুলির গুরুত্ব নিয়ে তেমন কোনো কাজ আজ পর্যন্ত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্যই এই বই-এর পরিকল্পনা। আমাদের প্রয়াসকে সফল করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বেশ কয়েকজন লেখক-গবেষক।

সংকলনের কয়েকটি লেখা উনিশ শতক নির্ভর। কিছু লেখা উনিশ-বিশ দুই শতককেই ছুঁয়ে গেছে। কয়েকজন লেখকের ঘোরাফেরা বিশ শতকের মধ্যে। কারণ, নাটক বা সিনেমার কাগজ বা লিটল ম্যাগাজিন-এর জন্মই তো বিশ শতকে। সংকলিত লেখাগুলির একটি দিক সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। কয়েকজন লেখক অ্যাকাডেমিক রচনার নিয়ম মেনে প্রতিটি সংবাদসূত্রের উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ প্রবন্ধ শেষে তথ্যসূত্রের হদিশ দিয়েছেন, দু-চারজন পত্রিকা দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভর করেছেন।

এই বইতে সংবাদ-সাময়িকপত্রের বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য এবং তার নানাদিক তুলে ধরার চেষ্টা আমরা করেছি। মুনতাসীর মামুন সংবাদ-সাময়িকপত্রের স্থায়িত্ব, প্রচার ও বিপণনের মতো একটি প্রায় অনালোচিত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন, তপন বাগচীর লেখায় ফুটে উঠেছে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন-নির্ভরতা। কৃষ্ণ ধর দেখিয়েছেন সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু কেমনভাবে সংবাদপত্রের টুঁটি চেপে ধরেছে। এই-সব উপেক্ষা করে সংবাদপত্রগুলি কিভাবে দেশ ও জাতির সংকটমুহূর্তে কর্তব্যপালন করেছে তা ফুটিয়ে তুলেছেন সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। হাবিব রহমান দেখিয়েছেন সাম্প্রদায়িক হানাহানির মধ্যেও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পত্রিকাগুলি হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক মৈত্রী বজায় রাখার জন্য কীরকম চেষ্টা চালিয়েছে। সমস্ত প্রলোভন, শক্তিমানের পেশি-আস্ফালন উপেক্ষা করে উনিশ শতকের সম্পাদকরা কিভাবে তাঁদের কর্তব্যে অবিচল থেকেছেন, তার পরিচয় মিলবে আশিস খাস্তগীরের লেখাটিতে। জাতি ও বর্ণগৌরব আধুনিক মানুষকেও কতখানি আচ্ছন্ন করে রেখেছে তার হদিশ মিলবে সুমন ভট্টাচার্যের রচনায়। নিজ নিজ অঞ্চলের স্বার্থরক্ষায় উদ্‌গ্রীব মানুষজন আঞ্চলিক পত্রিকা প্রকাশে কী পরিমাণ উৎসাহ দেখিয়েছেন তার হিসাব মিলবে শেখর ভৌমিকের লেখায়। শহরের মানুষ নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত, গ্রামবাংলার দুঃস্থ নিপীড়িত খেটে খাওয়া মানুষেব কথা ভাবার সময় কোথায় তাদের! কিন্তু এমন মানুষও সেকালে ছিলেন, যাঁরা গ্রামবাংলার দুঃখ-দুর্দশার কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে জীবন-যৌবন পণ করেছিলেন। এমনই কয়েকজন মানুষ ও তাঁদের পত্রিকাব কথা শুনিয়েছেন আবুল আহসান চৌধুরী। বাংলা পত্রিকার জন্মলগ্নে হিন্দু-ব্রাহ্ম এমন কী খ্রিস্টান-রা এ ব্যাপারে যতখানি উৎসাহ বোধ করেছেন, বাঙালি মুসলমানরা ততখানি করেননি। আসলে অনেকখানি সময় তাদের লেগেছিল কোন ভাষা তাঁদের চর্চা করা উচিত সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসতে।

মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব তাঁদেরও যে কম নয় এই বোধ আসার পর থেকে বাংলা পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করতে তাঁরাও এগিয়ে এলেন। সংবাদ-সাময়িকপত্র সাধনায় বাঙালি মুসলমানের অবদানের কথা শুনিয়েছেন মুস্তফা নূরউল ইসলাম। উনিশ শতকের সাহিত্য পত্রিকার ছবি ফুটে উঠেছে অলোক রায়ের লেখায়, স্বপন বসু চেষ্টা করেছেন এইকালের ধর্ম ও তত্ত্বমূলক পত্রিকা সম্পর্কে দু-চার কথা বলার। *কবিতা* কুসুমাবলী থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা কবিতা পত্রিকার ধারাবাহিক অগ্রগতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রভাতকুমার দাস। রঙ্গব্যঙ্গের পত্রিকা সম্পর্কে চণ্ডী লাহিড়ী আমাদের কৌতূহলকে উসকে দিয়েছেন। একটা সময় পর্যন্ত মুখ বুজে সবকিছু সহ্য করতে যাঁরা ছিলেন অভ্যস্ত, লেখাপড়া শিখে সেইসব মেয়েরা নিজেদের কথা বলতে কেমনভাবে এগিয়ে এলেন, সে কাহিনি শুনিয়েছেন অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশু-কিশোর পত্রিকা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন সুবিমল মিশ্র। বাঙালিকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার ক্ষেত্রে বাংলা পত্রিকাগুলির ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন শ্যামল চক্রবর্তী। বামপন্থী চিন্তাচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যেসব পত্র-পত্রিকা বেরিয়েছিল, তাদের খবর দিয়েছেন বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য। বিশ শতকের বাণিজ্যসফল চারটি জনপ্রিয় পত্রিকার পরিচয় পেশ করেছেন সুরজিৎ বসু। *কল্লোল, কালি-কলম* পত্রিকার মতো আলোড়ন সৃষ্টিকারী কয়েকটি পত্রিকাকে একালের দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছেন সুদীপ বসু। বাংলায় প্রথম পেশাদার রঙ্গমঞ্চ গড়ে ওঠার পর যতদিন গেছে, ততই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে নাটক ও নাট্যমঞ্চ। এই জনপ্রিয়তাই নাটকের কাগজ প্রকাশের প্রেরণা জুগিয়েছে। বিস্মৃতপ্রায় সেইসব নাটকের কাগজগুলির কথা লিখেছেন রমেনকুমার সর। সিনেমার আবির্ভাবের পর নাটকের জনপ্রিয়তা কমতে আরম্ভ করে। চলচ্চিত্রের আকর্ষণ বাঙালিকে মাতাল করে দেয়। প্রকাশিত হতে থাকে একের পর এক সিনেমা পত্রিকা। হারিয়ে যাওয়া সেইসব পত্রিকার কথা জানা যাবে দেবীপ্রসাদ ঘোষের লেখা থেকে।

শুধু পশ্চিমবাংলা থেকেই নয়, বাংলাদেশ থেকেও কম পত্রপত্রিকা তো প্রকাশিত হয়নি। বাংলাদেশের সাময়িকপত্রগুলির বিভিন্ন প্রবণতা ইসরাইল খানের কলমে ধরা পড়েছে। লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে উৎসাহ শুধু এপারে নয়, ওপারেও যে সমানভাবে বর্তমান—তা জানা যাবে উৎপলকুমার বসু ও সাজজাদুর রহমান-এর লেখাদুটি থেকে। সংবাদ-সামগিকপত্র যাঁরা প্রকাশ করেছেন তাঁদের সকলের লক্ষ্য এক ছিল না—যে উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ তাঁরা করুন, তাঁদের অবদান ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য। সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত দুই বাংলায় সংবাদ-সাময়িকপত্র নিয়ে যাঁরা চর্চা করে চলেছেন, তাঁদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বারিদবরণ ঘোষ।

কী দিতে পেরেছি সেকথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কী পারিনি তাও কবুল করা দরকার। বাংলা পত্রিকার মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জার বিবর্তন নিয়ে একটা লেখা অবশ্যই থাকা উচিত ছিল, একজন সে দায়িত্বও নিয়েছিলেন কিন্তু—। বাংলা গদ্যভাষার বিবর্তনে সংবাদ-সাময়িকপত্রের ভূমিকার প্রসঙ্গটিও থেকে গেছে অনালোচিত। বিশ শতকের পত্রিকা-সম্পাদকদের নিয়ে একটি লেখা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষমুহূর্তে একজন পিছিয়ে গেছেন। বাংলা পত্রিকায় বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা

সম্পর্কে একটি লেখা দেবার কথা দিয়েছিলেন বাংলাদেশের এক বিখ্যাত লেখক-গবেষক। কিন্তু সে লেখাও আমরা পাইনি। আমাদের দুই ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক-বন্ধু সংবাদ-সাময়িকপত্রের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে লেখা তৈরি করেও পেশাগত বাধ্যবাধকতার কারণে আমাদের দিতে পারেননি। দিতে পারিনি আরও অনেককিছু। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমরা আমাদের অক্ষমতা ও অপূর্ণতা স্বীকার করে নিচ্ছি।

এমন একটা বড় মাপের বই প্রকাশের ঝুঁকি যিনি মাথা পেতে নিয়েছেন, হৃদয়বান সেই প্রকাশক অনুপকুমার মাহিন্দারের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আমাদের কাছের মানুষ আশিস খাস্তগীর-এর সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এ বই কবে প্রকাশিত হত বা আদৌ হত কি না সন্দেহ! বইটিতে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি অনুসরণ করার সাধ্যমত চেষ্টা তিনি করেছেন, তবে পশ্চিমবঙ্গবাসী সম্পাদকের অক্ষমতায় কিছু ত্রুটি থেকেই গেছে। অশোক উপাধ্যায় তিন-চারটি লেখার প্রুফ দেখে দিয়েছেন। আমার দুই আপনজন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেনকুমার সর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বই প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন। দুই সম্পাদকের একজন বইটির জন্য একাধিকবার ঢাকা থেকে ছুটে এসেছেন, ওখানকার লেখকদের তাগিদ দিয়ে দিয়ে লেখা জোগাড় করেছেন। আমাদের আর দুই বন্ধু আবুল আহসান চৌধুরী ও হাবিব রহমানও বাংলাদেশ থেকে লেখা সংগ্রহের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। গ্রন্থপ্রকাশের শেষমুহূর্তে আমাদের দুই পারিবারিক বন্ধু অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামাচরণ মণ্ডল যে ভাবে সাহায্য করেছেন তার জন্য মামুলি ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের ছোট করতে চাই না। গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রতিলিপিগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, রবীন্দ্র ভবন, শান্তিনিকেতন, জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি, উত্তরপাড়া ও ঢাকা বাংলা আকাদেমির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

এই সংকলন যদি বাংলা সংবাদপত্রের চরিত্র, জনজীবনে তার গুরুত্ব বুঝতে কণামাত্রও সাহায্য করে, তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

স্বপন বসু • মুনতাসীর মামুন

সূচি

মু ন তা সী র মা মু ন

উনিশ শতকে সংবাদ-সাময়িকপত্রের কাঠামো, স্থায়িত্ব, প্রচার ও বিপণন

উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র নিয়ে গত একশো বছরে প্রচুর প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এসব প্রবন্ধ/গ্রন্থে বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হলেও একটি বিষয় প্রায় অনালোচিত থেকে গেছে। অথচ এই বিষয়টিও জানা জরুরি। তা না হলে, সংবাদ-সাময়িকপত্র বিকাশের ধারাটি অনুধাবন করা যাবে না। বিষয়টি হল পত্র-পত্রিকার অন্তর্কাঠামো, তথা প্রচার, স্থায়িত্ব এবং বিপণন ব্যবস্থা।

উনিশ শতকে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা বা অভিন্ন বাংলা থেকে কত সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছে তার সঠিক হিসাব পাওয়া না গেলেও, স্বপন বসু-র হিসাবমতে সে সংখ্যা 'বারোশোর কম নয়'।[১] এবং স্বাভাবিকভাবেই ১৮৫৭ সালের পর প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বেশি। এসব সংবাদ-সাময়িকপত্রের অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছিল বাংলার কেন্দ্র বা ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা এবং পূর্ববঙ্গের কেন্দ্র ঢাকা থেকে। অবশ্য, সারা ভারতবর্ষের রাজধানী হিসেবে কলকাতার বিষয়টি অন্য কোনো শহরের সঙ্গে তুলনীয় নয়। তবে মফস্‌সল তো বটেই, সুদূর পল্লিগ্রাম থেকেও পত্রিকা প্রকাশের ঘটনা অভূতপূর্ব ছিল না।

আলোচনা শুরু করার আগে সংবাদ-সাময়িকপত্রের সংখ্যাটি দেওয়া আবশ্যক। প্রধানত সংবাদনির্ভর প্রকাশনাগুলি ছিল সংবাদপত্র। প্রথমদিকে অধিকাংশ সংবাদপত্র সাপ্তাহিক হলেও পরে দু'একটি দৈনিক বা সপ্তাহে দু'বার প্রকাশিত হয়েছিল। যেসব প্রকাশনা মূলত সংবাদ-নির্ভর নয়, সেগুলিকে বিবেচনা করা যেতে পারে সাময়িকপত্র হিসেবে। সাময়িকপত্রের অধিকাংশই ছিল মাসিক। কিছু ছিল সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং ত্রৈমাসিক। বর্তমান প্রবন্ধে সংবাদ-সাময়িকপত্রের রাজনৈতিক বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব না। কারণ, ওই সব বিষয় বহুল আলোচিত। আলোচনা করব সংবাদ-সাময়িকপত্রের অন্তর্কাঠামো ও বিপণন ব্যবস্থা নিয়ে—যদিও এ বিষয়ে তথ্য খুবই সামান্য।

উনিশ শতকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের মালিকানার স্বরূপটি আগে নির্ধারণ করা যাক। এ বিষয়েও সুনির্দিষ্ট প্রচুর তথ্য আছে তা নয়। তবে বিদ্যমান তথ্যের আলোকে খানিকটা ধারণা করা যেতে পারে।

ধনীরা সংবাদপত্রকে সাহায্য করেছেন ঠিকই, কিন্তু পুঁজিগত লগ্নি করেননি সংবাদপত্রের জন্য।[২] কারণ, স্বাভাবিক, ঔপনিবেশিক কাঠামোয় অধস্তন শ্রেণি হিসেবে বাঙালি ধনবানরা শিল্প বা ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করার চাইতে জমিতে খাটানো অনেক নিরাপদ মনে করতেন। উমা দাশগুপ্ত লিখেছেন, ১৮৭০-৮০ সালে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একুশটি

পত্রিকার মধ্যে সতেরটি ছিল একক উদ্যোগে প্রকাশিত, চারটি যৌথ উদ্যোগে।[৩] এ হিসাবটি অবশ্য কলকাতা- কেন্দ্রিক প্রকাশিত পত্রিকার হিসাব। অনুমান করে নিতে পারি, কলকাতার সংবাদ-সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে ধনী ও সচ্ছল মধ্যবিত্তরা একটি ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবে পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ছিল খানিকটা ভিন্ন।

পূর্ববঙ্গে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্র ধনী বা সম্পন্ন মধ্যবিত্তের সে ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি যা পেয়েছিল কলকাতাকেন্দ্রিক পত্র-পত্রিকা। এর প্রধান কারণ পূর্ববঙ্গের জমিদাররা প্রায় ক্ষেত্রেই ছিলেন অনুপস্থিত জমিদার। সচ্ছল মধ্যবিত্তের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল কলকাতা। ফলে পূর্ববঙ্গে অনেক পত্র-পত্রিকা বেরিয়েছিল যৌথ উদ্যোগে বা বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলের মুখপত্র হিসেবে (অন্তত মানসিকভাবে হলেও)।[৪] ধনী জমিদারদের অর্থানুকূল্যেও কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁরা তা করেছিলেন নিজ স্বার্থ সামনে রেখে। অবশ্য পেশাজীবী বা মধ্যশ্রেণিরও যে স্বার্থ ছিল না তা নয়। কিন্তু তার চেয়েও তীব্র ছিল বোধহয় তাঁদের জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা বা নতুন কিছু করার আগ্রহ। পূর্ববঙ্গে অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা যাঁরা প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন ছোটোখাটো উকিল, সমাজসেবী, ব্রাহ্ম প্রচারক বা শিক্ষক। এককথায়, বাংলা পত্রিকার মালিকানা ছিল প্রধানত মধ্যবিত্তের হাতে। উনিশ শতক ছিল বাঙালির জাগরণের কাল। তার সঙ্গে যুক্ত ছিল শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি আর সে কারণেই বাঙালি মধ্যশ্রেণির মধ্যে প্রবল আগ্রহ দেখা গিয়েছিল সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশে।

জাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য কৌতূহল, নিজের বা বিশ্বের প্রতি এবং তারপর সৃষ্টি হয় আদর্শের। উনিশ শতকে প্রধানত হিন্দু ধর্মের সংস্কার চেষ্টার কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ে যথেষ্ট টেনশনের সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মেরুকরণ, বিভিন্ন গোষ্ঠী বা গ্রুপের নিজেদের মতাদর্শ প্রচার করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন সভা-সমিতির। ওই সময় বাল্যবিবাহ রোধ থেকে শুরু করে বিজ্ঞান উন্নয়নের জন্যও গঠিত হয়েছিল সভা-সমিতির। এদের মুখপত্র হিসেবেও বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা বেরিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারি—

তত্ত্ববোধিনী সভা	*তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*	১৮৪৩	ব্রাহ্মসমাজ
হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা	*হিন্দু হিতৈষিণী*	১৮৬৫	রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ
শুভসাধিনী সভা	*শুভসাধিনী*	১৮৭১	সমাজ সংস্কার
বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা	*মহাপাপ বাল্যবিবাহ*	১৮৭৩	ঐ
বৌদ্ধ সমিতি	*বৌদ্ধবন্ধু*	১৮৮৪	বৌদ্ধ
টেম্পারেন্স সোসাইটি	*যুবক সুহৃদ*	১৮৮৮	সমাজ সংস্কার
ছাত্রসভা সমিতি	*ছাত্রসখা*	১৮৮৮	ঐ
সাহিত্য সমালোচনী সভা	*বিকাশ*	১৮৯৯	সাহিত্য
নুর অল ইমান	*নূর অল ইমান*	১৯০০	মধ্যপন্থী মুসলমান

দুই

প্রথমে পত্রিকা প্রকাশের একটি খরচ বের করা যাক। এ সম্পর্কে তথ্য একেবারে কম। বিভিন্ন উৎস থেকে বিভিন্ন সময়ের তথ্য নিয়ে একটি আনুমানিক হিসাব বের করা যেতে

পারে। পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে মুদ্রণযন্ত্রের দরকার। সেগুলির দাম কেমন ছিল সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাইনি। শিশিরকুমার ঘোষ *অমৃতবাজার পত্রিকা* বের করার উদ্দেশ্যে—একটি মুদ্রণযন্ত্র কেনার জন্য গিয়েছিলেন কলকাতায়। এক বিধবার কাছ থেকে মাত্র ৩২ টাকায় একটি ভাঙা প্রেস সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর সে প্রেস নিয়ে এসেছিলেন নিজ গ্রাম যশোরের পলুয়া-মাগুরায়। প্রেস গ্রামে আনার আগে কলকাতায় তিনি প্রেসের যাবতীয় কাজকর্ম শিখে নিয়েছিলেন। এই প্রেস থেকে ১৮৬২ সালের ডিসেম্বরে তাঁর ভাই বসন্তকুমার প্রকাশ করেছিলেন পাক্ষিক *অমৃতপ্রবাহিনী*। পত্রিকা চালাবার জন্য শিশিরকুমার নিজে লিখতেন, কম্পোজ করতেন। অনেক সময় প্রেসের কালি ও কাগজও তিনি তৈরি করে নিতেন।[৫] ঢাকা থেকে ১৮৫৬ সালে *ঢাকা নিউজ* প্রকাশের সময় ইংরেজ সম্পাদক ফর্বেসও একই অসুবিধায় পড়েছিলেন। "আমাদের কাছে তখন ছিল না কোন কম্পোজিটার বা প্রিন্টার। এদের সবাইকে তৈরি করতে হয়েছে আমাদের।" তিনি আরও লিখেছিলেন, প্রথম সংখ্যাটির কম্পোজ, প্রুফ, মুদ্রণ সবক্ষেত্রেই তাঁকে হাত লাগাতে হয়েছিল।[৬] তবে এগুলি ছিল মফস্‌সলের অবস্থা। কলকাতার অবস্থা ছিল ভিন্ন। সেখানে উনিশ শতকের পঞ্চাশ দশকের আগেই মুদ্রণের পরিকাঠামো তৈরি হয়ে গিয়েছিল এবং তা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছিল।

উনিশ শতকের শেষার্ধে মুদ্রণযন্ত্রের দাম সম্পর্কিত আর একটি তথ্য পাই। সংবাদ অনুসারে, *গরীব* পত্রিকার সম্পাদক কুঞ্জবাবু পত্রিকা লোকসান হওয়াতে তিনশো টাকায় তা বিক্রি করে দিয়েছিলেন *ঢাকা প্রকাশ*-এর কর্মচারী বরদাশঙ্করের কাছে। ওই সময় সাধারণত পত্রিকার সঙ্গে মুদ্রণযন্ত্রের স্বত্বও হস্তান্তরিত হত যদি পত্রিকা ও যন্ত্রের মালিক একই ব্যক্তি হতেন। আর না হলে পত্রিকা বন্ধ করে দিতেন। কুঞ্জবাবু পত্রিকা ও যন্ত্র দু'টিরই মালিক ছিলেন। ঘটনাটি ১৮৮৯/৯০-এর।[৭] এসব সামান্য তথ্য থেকে অনুমান করে নিতে পারি, একটি নতুন মুদ্রণ যন্ত্রের দাম কলকাতায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কমপক্ষে এক হাজারের মতো ছিল। পরবর্তীকালে হয়ত দাম বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবে সেকেন্ড হ্যান্ড প্রেসের দাম আরও কম ছিল। কলকাতার বাইরে সাধারণত সেকেন্ড হ্যান্ড প্রেসগুলিই আমদানি করা হত। কলকাতার বাইরে মুদ্রণযন্ত্রের পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল সত্তরের দশকে।

পত্রিকা ছাপাতে খরচ পড়ত কত? এর কোনো হিসাব পাওয়া যায়নি। তবে বই-পত্র ছাপাবার কিছু হিসাব পাওয়া গেছে। সেটি বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক হিসাব রেখে গিয়েছিলেন। সে হিসাব উনিশ শতকের শেষের দিকের, কলকাতার। তাঁর হিসাব অনুযায়ী (ষোল কেজি ডবল ক্রাউন কাগজে ছাপা) ফর্মা ছাপার খরচ চার টাকা। কাগজের রিমও চার টাকা। বাঁধাইয়ে হিসাব করে দেখেছি প্রতি বইয়ে লাগত বর্তমান ১৩ পয়সা।[৮]

১৮৬৩ সালে *ঢাকা প্রকাশ*-এ প্রকাশিত 'বাঙ্গালা যন্ত্র'-এর একটি বিজ্ঞাপনে শুধু বই ছাপার একটি হিসাব পাই। তাতে দেখা যায়, বাংলা প্রতি ফর্মা ছাপার খরচ (কম্পোজ সহ) ছয় টাকা, ইংরেজি পাঁচ টাকা।

"বিজ্ঞাপন।

আমাদিগের এই বাঙ্গালা যন্ত্রের পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কণের পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া নিম্নলিখিত

নূতন নিয়ম নির্দ্ধারিত করা হইল।

পাইকার প্রত্যেক ফর্মার মূল্য ৬ টাকা

ইংলিশের প্রত্যেক ফর্মার মূল্য ৫ টাকা

এতদপেক্ষা অল্পমূল্যে পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ করিয়া দেওয়া আমাদিগের সাধ্যাতীত।"[৯]

এর সাতবছর পরও দেখি ইংরেজি ও বাংলা ফর্মার ছাপা খরচ একই রকম। ১৮৭০ সালে 'সুলভ যন্ত্রে' ফর্মা ছাপার খরচ ছিল--

"প্রতি ফর্মা	মূল্য
স্মল পাইকা	৬৲
ইংলিশ	৫৲
গ্রেড	৫৲
ডবল গ্রেড	৪৲
ইংরাজী	৮৲।"[১০]

সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে মফস্সলে সত্তর দশকের দিকে মুদ্রণ বাজার স্থিতিশীল হয়ে এসেছিল। কলকাতায় এই স্থিতিশীলতা এসেছে কমপক্ষে দু'দশক আগে। উনিশ শতকের শেষার্ধে কলকাতা ও মফস্সলের বাজারে প্রতিযোগিতা খানিকটা ছিল, তবে তা খুবই সামান্য। বলা যেতে পারে স্বাভাবিক ভাবেই মফস্সল থেকে কলকাতায় মুদ্রাঙ্কনের দাম খানিকটা বেশি ছিল।

আপাতদৃষ্টিতে মুদ্রাঙ্কনের খরচ কম মনে হতে পারে, কিন্তু সে সময়ের বাজারমূল্য অনুযায়ী ফর্মা প্রতি ছয় টাকা খুব কম নয়। সরকারি এক কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৮৬০-এর দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্র্যাজুয়েট একশো টাকা বা তার বেশি বেতনের চাকরি পেত। আশির দশকের শেষার্ধে এম. এ. পাশও তিরিশ টাকা বেতনের চাকরি পাচ্ছে না।[১১] একজন সাধারণ কম্পোজিটরের মাইনে যা ছিল, এক ফর্মার ছাপার ব্যয় ছিল তার অর্ধেক অথবা তিনভাগের একভাগ। প্রথম দিকে হয়ত দাম আরও বেশি ছিল কিন্তু মুদ্রণের বাজার না থাকাতে ফর্মা প্রতি কম্পোজ ও ছাপার দাম কমিয়ে পাঁচ ও ছয় টাকায় আনতে হয়েছিল। এ অনুমান করছি এ কারণে যে বিজ্ঞাপনে লেখা আছে "এতদপেক্ষা অল্পমূল্যে পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ" করে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে, আশি ও নব্বই দশকে এ হার বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে অনুমান করছি। কারণ তখন মুদ্রণের একটি বাজার সৃষ্টি হয়েছিল। কাগজের দাম জানা যায়নি। কলকাতার বাজারদরটিকেই মান হিসেবে ধরে নিতে পারি।

কম্পোজিটরের বেতন সম্পর্কেও সামান্য তথ্য জানা গেছে। শুরুতে তুলনামূলকভাবে কম্পোজিটরদের বেতন বেশি ছিল কারণ তখন কাজ জানা লোকের অভাব ছিল। ১৮৬৩ সালের দিকে *ঢাকা প্রকাশ* যখন প্রকাশিত হতে থাকে তখন তার সম্পাদক কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের থেকে হেড কম্পোজিটরের বেতন বেশি ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র পেতেন মাসে পঁচিশ টাকা আর হেড কম্পোজিটর তিরিশ টাকা। কিন্তু বিশ শতকের শুরুতে দেখি একজন সাধারণ কম্পোজিটরের বেতন এসে দাঁড়িয়েছে দশ টাকায়।

"কম্পোজিটার চাই।

ঢাকা প্রকাশ কার্যালয়ে দশ টাকা বেতনে একজন কম্পোজিটার আবশ্যক। বাঙ্গালা ও

ইংরেজী কম্পোজ ও কারেকশন করিতে পারে, এবং যাহার চরিত্র ভাল, তেমন লোক চাই।
শ্রী গুরুগঙ্গা চৌধুরী।"[১২]

ষাটের দশকে একজন হেড কম্পোজিটরের বেতন যদি তিরিশ টাকা হয়, তাহলে একজন সাধারণ কম্পোজিটর কমপক্ষে পনের থেকে বিশ টাকা পেতেন নিশ্চয়। তাহলে কি ধরে নেব মুদ্রণ বাজারের বিস্তার, প্রতিযোগিতা ও স্থিতিশীলতার ফলে কম্পোজিটরদের বেতন হ্রাস পাচ্ছিল? কলকাতার বাজার ছিল তুলনামূলকভাবে বড় এবং উনিশ শতকের মাঝামাঝি সেখানে মুদ্রণ ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সেখানে কম্পোজিটরের অভাব ছিল না। অনুমান করে নিতে পারি, সেখানে বেতন মফস্‌সল থেকে বেশি ছিল না। তবে মফস্‌সল থেকে কমও ছিল না। সম্পাদকদের বেতনের ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাই সম্পাদক হতেন। তার কাছে বেতনের বিষয়টা মুখ্য ছিল না। সামগ্রিক আয়-ব্যয়-ই মুখ্য ছিল। লাভ হলে নিজেই নিতেন। সম্পাদক নিযুক্ত করা হলে হয়ত বেতনের প্রশ্নটি আসত। তবে উদ্যোক্তা-সম্পাদকের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না।

পত্রিকার আরেকটি বড় ব্যয় ছিল ডাকমাশুল। এই ডাকমাশুলের ভারে পত্রিকা ন্যুব্জ থাকত। দু'টি উদাহরণ দিই। বিক্রমপুর থেকে প্রকাশিত *পল্লী বিজ্ঞান*-এর মুদ্রণ ও কাগজ বাবদ খরচ ছিল যথাক্রমে ৩৯ টাকা এবং ২২ টাকা ৬ আনা। অন্যদিকে, ডাক মাশুলের ব্যয় ছিল ৪০ টাকা।[১৩] শিশিরকুমার ঘোষ যখন যশোহর থেকে *অমৃতবাজার পত্রিকা* প্রকাশ করতেন তখন প্রায়ই আবেদন করতেন গ্রাহক ও পত্রপ্রেরকদের, তাঁরা যেন ডাকটিকিট পাঠান।[১৪]

পত্রিকার আয়ের একটি উৎস বিজ্ঞাপন। যাঁরা সংবাদ-সাময়িকপত্রের ইতিহাস লিখেছেন তাঁদের প্রায় সবাই-এ-বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন। দু'এক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের বিষয়টি জানতে পারি। *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*-র বিজ্ঞাপনের হার ছিল প্রতি লাইনে এক আনা, এক কলাম বা তার বেশি হলে এক টাকা এবং 'এরূপ বিজ্ঞাপন ক্রমশ তিনবার প্রকাশ করিলে মূল্যের বাবদ ১/৪ বাদ' দেওয়া হত।[১৫] *বঙ্গবন্ধু*-র বিজ্ঞাপন হার ছিল প্রতি পংক্তি দুই আনা।[১৬] *রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ* জানিয়েছিল, "দিক্ প্রক'শে কেহ বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম দুইবার প্রত্যেক প্রত্যেক বারে পতি [প্রতি] পংক্তিতে ১½ আনা, তৎপর তিনবার পর্য্যন্ত প্রতি পংক্তিতে ১ আনা হিসাবে মূল্য দিতে হইবে। কেহ অধিককাল বিজ্ঞাপন দিতে বাসনা করিলে তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্তও করা যাইতে পারে।"[১৭]

অমৃতবাজার লিখেছিল, বিজ্ঞাপনের মূল্যের বিপরীতে স্ট্যাম্প পাঠালেও চলবে।[১৮] তবে বিজ্ঞাপনের হার জানানো হয়নি। অনুমান করে নিচ্ছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের হার এরকমই ছিল। সময়ভেদে তা বেড়েছে কমেছে। বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপনের ছিল নিদারুণ অভাব। সরকারের নিলাম বিজ্ঞপ্তি, বই-পত্র বা ব্যক্তিগত বিষয়ে কিছু বিজ্ঞাপন ছাপা হত বা পাওয়া যেত। এর প্রধান কারণ বৃহৎ ব্যবসার অভাব, বিজ্ঞাপনের প্রতি ব্যবসায়ীদের অসচেতনতা এবং শিল্পের অভাব। ঢাকা বা পূর্ববঙ্গের তুলনায় কলকাতাকেন্দ্রিক পত্র-পত্রিকায় স্বাভাবিকভাবে বিজ্ঞাপন খানিকটা বেশি পাওয়া যেত। বিজ্ঞাপনের ওপর ভরসা করে পত্রিকা চালানো সম্ভব ছিল না। নব্বই-এর দশক থেকে অবশ্য অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন হয়। কলকাতাকেন্দ্রিক পত্রিকাগুলি তো বটেই, ঢাকার পত্র-পত্রিকাও কিছু বিজ্ঞাপন পেতে থাকে

যার অধিকাংশ ছিল প্রসাধন, টোটকা ওষুধ প্রভৃতির বিজ্ঞাপন। অন্যদিকে ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় তুলনামূলকভাবে বিজ্ঞাপনের হার ছিল বেশি এবং বিজ্ঞাপনও তারা পেত বেশি।

আর ছিল গ্রাহক চাঁদা। এর সঙ্গে জড়িত পত্রিকার প্রচার ও বিক্রির বিষয়টি। পত্রিকা বিক্রির ব্যবস্থা উনিশ শতকে তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। পূর্ববঙ্গে তো লাইব্রেরিও ছিল না অধিকাংশ অঞ্চলে। এদিক থেকে কলকাতার ব্যবস্থা ছিল ভালো। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হকার কর্তৃক পত্রিকা বিক্রির ব্যবস্থা হয়েছিল। কারণ কলকাতা থেকে এইসময় দৈনিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল। হয়ত বিশেষ বিশেষ স্থানে পত্রিকা বিক্রির ব্যবস্থাও ছিল।

গ্রাহকের কাছে পত্রিকা পৌঁছাবার একটি প্রধান উপায় ছিল ডাকযোগে পাঠানো। অর্থাৎ যাঁরা অগ্রিম গ্রাহক মূল্য পাঠাতেন তাঁদের পত্রিকা পাঠানো হত ডাকযোগে। পত্রিকায় সব সময় দু'টি মূল্য উল্লেখ করা হত এবং অনেক সময় বলা হত মূল্যের বদলে ডাকটিকিটই পাঠাতে। মূল্যের একটি ছিল ডাকমাশুল সমেত মূল্য, অন্যটি মাশুল ছাড়া। কিন্তু গ্রাহকরা প্রায় ক্ষেত্রে গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করতেন না। পত্র-পত্রিকায় প্রায় এ নিয়ে সম্পাদকরা আক্ষেপভরা মন্তব্য করতেন। যেমন, *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*-র দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার লিখেছিলেন, ১২৭০-৭৫ সন পর্যন্ত পত্রিকা প্রকাশের জন্য তাঁকে ঋণ করতে হয়েছিল পাঁচশো টাকা। ১২৭৬-৭৮ সনে আর কোনো ঋণ করতে হয়নি। ১২৭৯ সালে ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল আরও দু'শো টাকা। তার ওপর ছিল প্রতি সপ্তাহের ডাকমাশুল সাত আট টাকা যা জোগাড় করা মুশকিল হয়ে পড়ত। আয়-ব্যয়ের দু'প্রান্ত কিছুতেই তিনি মেলাতে পারেননি। দুঃখ করে লিখেছিলেন "পরিশেষে আমরা দুঃখিতান্তকরণে বলিতেছি, নদিয়া, যশোহর, পাবনা ও ফরিদপুর প্রভৃতি কয়েক জিলার মধ্যে সামান্য মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা গ্রামবার্ত্তা চলিতেছিল, গ্রাহকদিগের অনবধানতায় তাহারও বিঘ্নোপস্থিত হইল। ইহা যেমন স্থানীয় লোকের তদ্রূপ অনাদায়ি গ্রাহকদিগের অপযশের কারণ। ধন্য আমাদিগের দেশ। ধন্য আমাদিগের 'নেব দেব না' প্রবৃত্তি।"[১৯]

তিন

পত্রিকার প্রচারসংখ্যার ওপর সেই সময় পত্রিকার টিকে থাকা অনেকটা নির্ভর করত। কারণ, বিজ্ঞাপন দিয়ে ঘাটতি মেটাবার মতো অবস্থা তখনও হয়নি, বিশেষ করে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। ধারাবাহিকভাবে পত্রিকার প্রচারসংখ্যার তথ্য আমরা পাই না। তবে বিভিন্ন সময় হঠাৎ হঠাৎ করে প্রচারসংখ্যার কিছু উল্লেখ পাই। অধ্যাপক স্বপন বসু এ ধরনের সব তথ্য জড়ো করে কিছু পত্রিকার প্রচারসংখ্যার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। আমি নিচে সে ধরনের কিছু তথ্য উদ্ধৃত করছি—

সারণি — ১

পত্রিকার নাম	সম্পাদক	প্রচারসংখ্যা কলকাতায়	মফস্‌সলে (ডাকযোগে)	মূল্য (মাসিক) টা - আ - পাই
সমাচার দর্পণ	জে. সি. মার্শম্যান	৩৫০	১৬০	১ - ০ - ০
সমাচার চন্দ্রিকা	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৬	৬	১ - ০ - ০

জ্ঞানান্বেষণ	রামচন্দ্র মিত্র	৪৫	৪	১ - ০ - ০
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়	উদয়চরণ আঢ্য	৭৭৮	৫৫	০ - ৪ - ০
সংবাদ প্রভাকর	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১২৪	৭	১ - ০ - ০
সংবাদ সৌদামিনী	কালাচাঁদ দত্ত	৭৮	২	০ - ৮ - ০
সংবাদ ভাস্কর	শ্রীনাথ রায়	৭০	১৫	১ - ০ - ০
বঙ্গদূত	রাজনারায়ণ সেন	৫০	০	০ - ৮ - ০
সংবাদ রসরাজ	কালীকান্ত গাঙ্গুলি	১৫০	০	০ - ৪ - ০
	মোট	১৭৩১	২৪৯[২০]	

এ হিসাব ১৮৩৯ সালের। ১৮৩৪ সালের হিসাব অনুযায়ী *সমাচার দর্পণ* ও *জ্ঞানান্বেষণ*-এর প্রচারসংখ্যা ছিল ২৫০ ও ১০০। অর্থাৎ পাঁচ বছরের মধ্যে পত্রিকার প্রচারসংখ্যা প্রায় অর্ধেক হ্রাস পেয়েছিল।

সারণি—২

পত্রিকার নাম	সাল ও প্রচারসংখ্যা					
	১৮৭৭	১৮৭৯	১৮৮০	১৮৮৪	১৮৮৫	১৮৮৬
সংবাদ প্রভাকর	৫৫০	৫৫০	৭০০	২৪৫	২২৫	২০০
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়	—	—	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০
সমাচার চন্দ্রিকা	৬২৫	৬২৫	৬২৫	৬২৫	৬২৫	৬২৫[২১]

এ হিসাব উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের। এখানে দেখা যাচ্ছে সত্তর-আশির দশকে *সংবাদ প্রভাকর*-এর প্রচারসংখ্যা উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে বৃদ্ধি পেলেও আশির দশকে হ্রাস পেয়ে ২০০-তে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে বাকি দু'টি পত্রিকার প্রচারসংখ্যা স্থিতিশীল। এগুলি কলকাতাকেন্দ্রিক পত্রিকা। কলকাতার বাইরে থেকে প্রকাশিত পত্রিকার প্রচারসংখ্যা কেমন ছিল—

সারণি — ৩

পত্রিকার নাম	অঞ্চল	সাল ও প্রচারসংখ্যা					
		১৮৭৭	১৮৭৯	১৮৮০	১৮৮৪	১৮৮৫	১৮৮৬
সাধারণী	চুঁচুড়া	৫১৬	৫১৬	৩৫০	৪২৫	৪২৫	৪৫০
প্রতিকার	বহরমপুর	২৩৫	২০০	৫০০	২৪৭	৫০০	৫০০
সোমপ্রকাশ	চ্যাংড়িপোতা	৭০০	৭০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০[২২]

কলকাতাকেন্দ্রিক সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির হিসাব নেওয়া যাক—

সারণি — ৪

পত্রিকার নাম	সাল ও প্রচারসংখ্যা				
	১৮৭৯	১৮৮৪	১৮৯৪	১৮৯৮	১৯০০
বঙ্গবাসী	—	১২,০০০	১২,০০০	২০,০০০	২৬,০০০
সঞ্জীবনী	—	৪০০০	৪০০০	৪০০০	৩০০০
বসুমতী	—	—	—	—	১৫০০০
হিতবাদী	—	—	৩০০০	৬০০০	৩৫,০০০

উল্লিখিত পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকেব প্রথমার্ধে পত্রিকার প্রচারসংখ্যা ছিল নগণ্য। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে [সারণি - ২]। দৈনিক পত্রিকার মানদণ্ডে বিচার করলে এগুলির প্রচারসংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। অন্যদিকে সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। [সারণি - ৪]। কলকাতার বাইরে থেকে [পশ্চিমবঙ্গ] প্রকাশিত সাপ্তাহিকগুলির প্রচার বরং তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল। এখানে একটি মন্তব্য করা যেতে পারে, কলকাতাকেন্দ্রিক সাপ্তাহিকগুলির প্রচার দেখে অনুমান করা যায় সারা বাংলায়-ই এর গ্রাহক/পাঠক ছিল। অন্যদিকে, কলকাতার বাইরে থেকে প্রকাশিত পত্রিকার গ্রাহক/পাঠকের অধিকাংশ ছিল স্থানীয়। স্বপন বসু, ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত সম্পাদিত *দৈনিক* (দৈনিক)-এর উল্লেখ করেছেন যার প্রচারসংখ্যা ছিল ১৮৮৫ সালে ৭০০০।[২৩] তবে এটি ব্যতিক্রম।

ঢাকা/পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার প্রচারসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। ১৮৬৩ সালের সরকারি হিসাব অনুযায়ী *ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা দর্পণ* এবং *হিন্দু হিতৈষিণী*-র প্রচারসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৫০, ৩৫০ ও ৩০০ কপি।[২৪] ১৮৬৭ সালের এক হিসাবে জানা যায় *ঢাকা প্রকাশ*-এর প্রচারসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ১৯ কপি এবং *হিন্দু হিতৈষিণী*-র ১০০ কপি।[২৫] ১৮৮০ সালে পূর্ববঙ্গের দশটি পরিচিত পত্রিকার সম্মিলিত প্রচারসংখ্যা ৩২৭৭ কপি, এর মধ্যে সবচেয়ে কম *রাজসাহী সমাচার*-এর, মাত্র ৩১ কপি।[২৬] ১৮৯০-এর আর এক হিসাবে জানা যায়, ছয়টি পত্রিকার সম্মিলিত প্রচারসংখ্যা ছিল ২২৪০ কপি। এর মধ্যে *ঢাকাপ্রকাশ*-এরই প্রচারসংখ্যা ১২০০ কপি।[২৭] *ঢাকা প্রকাশ*—এর প্রচারসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের উত্থান। পত্রিকাটি তখন এদের মুখপত্র। পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার প্রচার অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল।

সাময়িকপত্রের ব্যাপারেও কমবেশি একই কথা প্রযোজ্য। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সাময়িকপত্রের প্রচারও ছিল সীমিত। আশির দশকের পর থেকে সাময়িকপত্রের প্রচার বেড়েছিল, তাও কিছু কিছু মাসিকপত্রের ক্ষেত্রে। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের *বঙ্গদর্শন*, ছাপা হত ১৫০০ কপি (১২৭৯)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত *ভারতী*-র প্রচার ৮৫০। দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর *নব্যভারত* ছাপা হত ১৮০০ (১৮৯৭) কপি। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *প্রদীপ* ছাপা হত ৩০০০। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের *নবজীবন*-এর প্রচারসংখ্যা ছিল ৫০০০। *বঙ্গবাসী*-র ১০,০০০ (১৮৭৯)। এগুলি ব্যতিক্রম। অধিকাংশ মাসিকের প্রচার ছিল ৫০০/৬০০ বা এর কাছাকাছি। যেমন হরিশ্চন্দ্রের *মিত্র প্রকাশ*-এর প্রচার- সংখ্যা ২৫০

(১৮৭২), দ্বারকানাথের *অবলা বান্ধব*-এর ২৫০। এ বিষয়ে স্বপন বসু তাঁর প্রাগুক্ত প্রবন্ধে বিস্তারিত লিখেছেন।[২৮] এখানে তাই বিস্তারিত বিবরণ দিলাম না। এটুকু বলতে পারি, সময়ের তুলনায় সাময়িকপত্রের প্রচার ছিল ভালো এবং অনেকক্ষেত্রে বর্তমানের চেয়েও ভালো।

চার

পত্রিকার বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ওপর কর্তৃপক্ষের তেমন কোনো ভরসা ছিল না। অন্তত বিজ্ঞাপন পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল কম। তাই প্রচারের ওপর জোর দিতে চাইতেন তাঁরা। কিন্তু প্রচারের অনুকূল পরিস্থিতি (যেমন যোগাযোগ বা শিক্ষা) তখন না থাকায় পত্রিকা গ্রাহকদের তাঁরা নানারকম সুবিধা দিয়ে প্রচারসংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাইতেন। যেমন *গৌরব* (ঢাকা) প্রকাশিত হওয়ার আগে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিলেন, গ্রাহকরা "আপন বংশের গৌরব চিরস্থায়ী করিতে ইচ্ছা করিলে" তাঁদের 'বংশ লতিকা' পত্রিকায় মুদ্রণের জন্য পাঠাতে পারেন। শুধু তাই নয়, যাঁরা অগ্রিম গ্রাহকমূল্য দেবেন তাঁদের উপহার দেওয়া হবে এক টাকা তিন আনা মূল্যের পাঁচখানা বই। সুবিধা দেওয়া হবে বিক্রেতাদেরও।[২৯]

ঢাকা প্রকাশ-এর বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ছিল পাঁচ টাকা। কিন্তু 'অসমর্থদিগকে' তিন টাকাতেও পত্রিকা দেওয়া হত। তা সত্ত্বেও পাওয়া যেত না গ্রাহক। ১৮৭১ সালে *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* লিখেছিল, ষোল বছর ধরে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে, তুলে ধরেছে নানারকম নিপীড়নের কাহিনি, পালন করেছে কর্তব্য। কিন্তু, গ্রাহকদের অবহেলা বা বলতে গেলে পাওনা টাকা পরিশোধ না করার কারণে পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। বন্ধ হওয়ার সময় গ্রাহকসংখ্যা ছিল মাত্র ২০০।[৩০]

গ্রাহকসংখ্যা বাড়ার কোন কারণ ছিল না। কারণ, কোন রকম উপাত্ত ছাড়াই এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত জনসংখ্যাই ছিল নিরক্ষর। পার্থ চট্টোপাধ্যায় সরকারি হিসাব উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন, বাংলায় অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা মাত্র তিন ভাগ।[৩১] বাংলায় নগরায়ন হয়নি। আক্ষরিক অর্থে শহর বলতে শুধুমাত্র কলকাতা। বাকি শহরগুলি সমৃদ্ধ গ্রামের বিস্তৃতি। যোগাযোগ ব্যবস্থা অপ্রতুল। পূর্ববঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। রমেশচন্দ্র মজুমদারের কৈশোর কেটেছে ফরিদপুরে। তিনি লিখেছেন, কোনো গ্রামে হয়ত মাত্র একটি খবরের কাগজ আসত। তখন খবর জানতে হলে, লোকজন গ্রামের পোস্ট অফিসে গিয়ে হাজির হত। একজন পড়ত, বাকি সবাই শুনত।[৩২] এবং গ্রাহক হতেন কারা? অবশ্যই শিক্ষিত পেশাজীবীদের ক্ষুদ্র একটি অংশ। স্বপন বসু উনিশ শতকের প্রথমার্ধে *সমাচার দর্পণ*-এর একটি তথ্য জানিয়েছেন। ওই সময় মফস্‌সলে কলকাতার যে পত্রিকার প্রচার সবচেয়ে বেশি ছিল তা হল *সমাচার দর্পণ*। ১৬০ কপি মফস্‌সলে যেত। এর মধ্যে ৬৪টি যেত 'সাহেব'দের কাছে, ৭১টি বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় আর ২৫টি ধনী জমিদারদের কাছারিতে। ১৮৪৫-এ *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া* লিখেছিল—'Their circulation and influence are almost exclusively confined to the metropolis.'[৩৩] ধরে নেওয়া যায়, কলকাতা ঢাকা ছাড়া পত্র-পত্রিকার তেমন কোনো প্রভাব ছিল না। পরিবর্তন আসা শুরু করে ৭০/৮০-র দশকে। কলকাতার ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তনটি ঘটে ৯০-এর দশকে। আর একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। সংবাদ-সাময়িকপত্রের দাম সময়ের তুলনায় কম ছিল না।

পত্রিকার স্থায়িত্ব নিয়ে ১৮৮৭ সালে *সুরভি ও পতাকা* লিখেছিল--'বঙ্গদেশে সাময়িকপত্রের বড়ই দুর্দ্দশা। গত বৎসর সাময়িকপত্রের সংখ্যা ছিল ৪০২, এ বৎসর হ্রাস পাইয়া ২৬০ মাত্র হইয়াছে অর্থাৎ এ বৎসর ১৪২ খানি সাময়িকপত্র অন্তর্হিত হইয়াছে। সাহিত্য প্রিয় ব্যক্তির পক্ষে এ সংবাদ অত্যন্ত মর্ম্ম পীড়াদায়ক।' আর *সাধারণী* সংবাদ-সাময়িকপত্রের অকাল মৃত্যুর জন্য যেসব কারণের উল্লেখ করেছিল সেগুলি হল অর্থাভাব, কম্পোজিটরের অভাব, লেখকের অভাব, বাঙালির নিস্পৃহতা, সরকারি বিরুদ্ধাচারণ ইত্যাদি।[৩৪]

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, আলোচ্য সময়ে সংবাদ-সাময়িকপত্র বিকাশের তেমন কোনো সুযোগ ছিল না। কারণ পত্রিকার ব্যয়ের সঙ্গে আয়ের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এটিই ছিল বাস্তব। আশ্চর্যের ব্যাপার, এই বাস্তবতা পত্র-পত্রিকার উদ্যোক্তা, মালিক, সম্পাদকরা অস্বীকার করেছিলেন। এটা ঠিক, অধিকাংশ পত্রিকা বেশিদিন টেকেনি। কিন্তু তিনবছর পর্যন্ত টিকে ছিল এ ধরনের সংবাদ-সাময়িকপত্রের সংখ্যা কম নয়। অনেক পত্রিকা তো দীর্ঘদিন টিকে ছিল। যেমন, ৭০ বছরের ওপর টিকে ছিল *সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, সংবাদ প্রভাকর, সমাচার চন্দ্রিকা। এডুকেশন গেজেট* টিকে ছিল ৯০ বছরের ওপর। ৫০ বছরের বেশি টিকে ছিল *ভারতী* ও *বামাবোধিনী*।[৩৫] পূর্ববঙ্গের ঢাকা ও যশোর থেকে (পরে কলকাতা) প্রকাশিত *ঢাকা প্রকাশ* ও *অমৃতবাজার পত্রিকা* টিকে ছিল ১০০ বছরের ওপর। এগুলি ব্যতিক্রম। বাজার অর্থনীতি তখনও ছিল। প্রতিযোগিতায় যাঁরা পারতেন না, তাঁরা পত্রিকা বন্ধ করে দিতেন অথবা আর্থিক ক্ষতি বিবেচনায় না এনে টিকে থাকার চেষ্টা করতেন।

উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের এ হিসাবটাই মেলানো দুষ্কর। ধরে নিতে পারি নতুন যুগের জাগরণের উদ্যম, মতাদর্শের প্রতি বিশ্বস্ততা তাঁদের প্রণোদনা জুগিয়েছিল সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশে। লাভ-লোকসানের বিষয়টি তেমনভাবে বিবেচনায় আসেনি। সে সময় সংবাদপত্র / সাময়িকপত্রের সম্পাদকরা অসম্ভব মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ সহ্য করেছেন কিন্তু ভেঙে পড়েননি। যেমন কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার যখন *বিজ্ঞাপনী*-র সম্পাদক ছিলেন তখন ব্রাহ্ম আন্দোলনের পক্ষে কিছু ছেপেছিলেন যা মালিক পছন্দ করেননি। কৃষ্ণচন্দ্র ভবিষ্যতের কথা না ভেবে তখনই চাকুরিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন।[৩৬] হরিনাথ মজুমদার *গ্রামবার্ত্তা* প্রকাশ করতে গিয়ে নিদারুণ অর্থকষ্টে ভুগেছেন। কিন্তু প্রকাশ বন্ধ রাখেননি। লিখেছিলেন তিনি, 'আমি লেখক, আমিই সম্পাদক, আমিই পত্রিকা লেফাপা ও বিলিকারক এবং আমিই মূল্য আদায়কারী অর্থ সংগ্রাহক। আবার আমিই আমার স্ত্রী পুত্রাদি সংসারে সংসারী। দীনজনের দীনতার দিন এইভাবে দিন দিন গত হইতেছে।' শুধু তাই নয়, পত্রিকার খবরের জন্য জমিদার (এর মধ্যে কলকাতার ঠাকুর পরিবারও অন্তর্গত) ও বিত্তবানদের নিগ্রহ সইতে হয়েছে। কিন্তু কেউ পাশে এসে দাঁড়ায়নি। লিখেছিলেন তিনি, 'যাহাদের নিমিত্ত কাঁদিলাম, বিবাদ মাথায় করিয়া বহন করিলাম, তাঁহাদিগের এই ব্যবহার।'[৩৭] অধিকাংশ পত্রিকায় একজন খুব বেশি হলে আরও দু'তিনজন নিয়ে কাজ করতেন, যে কাজের বিবরণ দিয়েছেন হরিনাথ। বিপদে পড়লে তাদের সাহায্য করার কেউ ছিল না। কিন্তু করার জন্য অনেকে ছিলেন। ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা বঙ্গচন্দ্র রায়ের উদ্দেশে একবার একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল—'আপনাদিগের নিকট শুভসাধিনী পত্রিকা মুদ্রাঙ্কন দরুণ যাহা

প্রাপ্য আছে তাহা অদ্য তারিখ হইতে ১৫ দিবসের মধ্যে পরিশোধ করিয়া দিবেন। যদি তাহা না দেন তবে ১৫ দিবস পরে আপনাদিগের নামে নালিশ উপস্থিত করিব।'[৩৮] কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র 'হা অন্ন হা অন্ন' করে মারা যান বটে কিন্তু শেষপর্যন্ত পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ রাখেননি। লিখেছিলেন--

'হরিশের এই পণ যায় যদি এ জীবন
তবু কভু তোষামুদী করিবে না কায়রে
প্রাণ চিরস্থায়ী নহে যায় যায় গ্রহ রহে
মান গেলে ছার প্রাণ রাখিতে কে চায়রে।'[৩৯]

এত যে মরণপণ সংগ্রাম করে পত্র-পত্রিকা বের করা, তাতে কিন্তু (প্রায় ক্ষেত্রে) সাধারণের স্থান প্রায় ছিল না। ছিলেন না তাঁরা খবরের বিষয়ও। এবং তাঁরাও সংবাদপত্র নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কারণ শিক্ষিতের হার, কারণ দারিদ্র। পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, বাংলা পত্রিকা প্রকাশের শুরু থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বাংলা সংবাদপত্রের পাঠকরা অধিকাংশই ছিলেন ধনী বা মধ্যশ্রেণির এবং প্রচারও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল নগর এলাকার মধ্যে।[৪০] এ মন্তব্য প্রায় সঠিক। প্রায় বলছি এ কারণে যে পরিপূর্ণ নগর ছিল কলকাতা, তারপর ঢাকা। পাবনা, বহরমপুর, বর্ধমান বা কুষ্টিয়া সে অর্থে নগর ছিল না। সম্পন্ন গ্রামের বিস্তৃতি ছিল মাত্র, যা আগেই উল্লেখ করেছি। এবং স্থানীয় পত্রিকার গ্রাহক প্রধানত ছিলেন স্থানীয়রা। কিছু যেত নগরে।

এখনও যে অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। উনিশ শতকে বাংলায় প্রচুর পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু আগেই দেখিয়েছি এর প্রচার ছিল সামান্য। সাধারণ মানুষের খবর যে পত্রিকায় একেবারে ছিল না তা নয় তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন করুণার পাত্র। সরকারি ভাষা অনুযায়ী, সংবাদপত্র খুব সীমিত একটি শ্রেণির মনোভাব প্রকাশ করে মাত্র, যারা সরকার দ্বারা শিক্ষিত।[৪১] এর ইঙ্গিতটা স্পষ্ট, অর্থাৎ তারা শাসক শ্রেণীর স্বার্থের বাইরে যাবে না, এবং তারা যায়ওনি।

আমার আলোচ্য সময়ে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলির অন্তিম ঝোঁক ছিল কোনদিকে? উপনিবেশিক সমাজকাঠামোয় বুদ্ধিজীবীদের চরিত্র যা হয় এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।[৪২] তাঁদের মতামতে চিন্তার বৈপরীত্য, ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি আনুগত্য, সমাজকাঠামো অপরিবর্তিত রাখার ইচ্ছা প্রভৃতি স্পষ্ট। তাঁদের চিন্তা রক্ষণশীল ছিল, না প্রগতিশীল--এ সরলীকরণ না করে বরং আমরা বলতে পারি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন তাঁরা ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবী।

এর বিপরীত দিকটিও আমাদের বিবেচনা করা দরকার। আমরা দেখেছি, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। নির্জন গ্রামের বাঁশঝাড়ের পাশে খড়ো কুটিরে কাঠের আদিম প্রেসে বা উত্তর বা পশ্চিমবঙ্গের ধূলিওড়া মলিন 'শহর' থেকে বা কলকাতা বা ঢাকার বদ্ধ অন্ধকার নোংরা গলিতে বসে, অক্লান্ত সব কর্মীরা নতুন যুগের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে একটির পর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন যার অনেকগুলির খবর আমরা জানি না। অর্থাভাবে, মানহানির মামলা ও বিরুদ্ধবাদীদের হামলায় বা সরকারি বিধিনিষেধের কারণে অনেক সময় পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, লোকলাঞ্ছনা, দারিদ্র উপেক্ষা করে তাঁরা

কাজ করে গিয়েছিলেন। সমাজে অন্তত একটি শ্রেণীর মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন সচেতনতার, সচলতার। সচেতন করে তুলেছিলেন অনেক ক্ষেত্রে দেশ এবং নিজেদের সম্পর্কে। ভবিষ্যতের ঔপনিবেশিক সরকার বিরোধী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনেও তাঁরা সহায়তা করেছিলেন--এমন মন্তব্য করাও বোধহয় ভুল হবে না।

তথ্যসূত্র

১. স্বপন বসু, 'উনিশ শতকের বাংলা পত্রিকা — সামাজিক দায়বদ্ধতা' *শ্রদ্ধালেখমালা*, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২১১

২. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ*, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৯৮।

৩. Uma Dasgupta, 'The Indian Press 1878-1880', *Modern Asian Studies*, vol II, pt 2, April 1977, pp. 216-17.

৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববাংলার সংবাদ-সাময়িকপত্র*, কলকাতা, ১৯৯৭।

৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, অনাথনাথ বসু, *মহাত্মা শিশিরকুমার*, কলকাতা, ১৯৭৬।

৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, *ঢাকা নিউজ*, ঢাকা, ১৮৫৬-৫৮।

৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮৮৮।

৮. গোপালচন্দ্র রায়, 'বাংলা বইয়ের ব্যবসা', চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনা*, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৩৫৬।

৯. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮৬৩।

১০. অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *উপদেশ শতক*, ঢাকা, ১৮৭০ ; শেষ প্রচ্ছদের বিজ্ঞাপন।

১১. *Report of the Government of Bengal to revise the salaries of Ministerial offices, and to Reorganise the system of Business in Executive offices 1885-1886, Calcutta, 1886*

১২. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮৯৯।

১৩. কেদারনাথ মজুমদার, *বাংলা সাময়িক সাহিত্য*, ময়মনসিংহ, পৃ. ৪১০।

১৪. ১৮৬৮-৬৯ সালের *অমৃতবাজার পত্রিকা*-র ফাইল।

১৫. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*, সপ্তম বর্ষ।

১৬. *বঙ্গবন্ধু*, ১৮৭৫।

১৭. *রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

১৮. *অমৃতবাজার পত্রিকা*, ১৮৬৮।

১৯. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*, ১৮৭৩।

২০. স্বপন বসু, *প্রাগুক্ত প্রবন্ধ*, পৃ. ২২৪।

২১. *ঐ*, পৃ. ২২৫।

২২. *ঐ*, পৃ. ২২৫-২২৬।

২৩. *ঐ*, পৃ. ২২৫।

২৪. *Proceedings of the Government of Bengal in the General Department*, January 1865, pp. 4-5.

২৫. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১।

২৬. *Report on Native Papers.* নং ১, ১৮৮০ পত্রিকাগুলি ছিল—

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা (মাসিক)	১৭৫ কপি
সংশোধনী	৬০০ কপি
রাজসাহী সমাচার	৩১ কপি
ভারত মিহির	৬৭১ কপি
ঢাকা প্রকাশ	৩৫০ "
হিন্দু হিতৈষিণী	৩০০ "
হিন্দুরঞ্জিকা	২০০ "
রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ	২৫০ "
সঞ্জীবনী	২৬০ "
শ্রীহট্টপ্রকাশ	৪৪০ "

২৭.

আহমদী	৪৫০ "
হিতকরী	৩০ "
চারুবার্তা	৫০০ "
ঢাকা প্রকাশ	১২০০ "
হিন্দুরঞ্জিকা	৩০ "
সারস্বত পত্র	৩০ "

প্রাগুক্ত, ১৮৯০

২৮. স্বপন বসু, *প্রাগুক্ত*।

২৯. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮৮৮।

৩০. *Report on Native Papers*, 1879.

৩১. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১

৩২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *জীবনের স্মৃতিদীপে*, কলকাতা, পৃ. ১০।

৩৩. স্বপন বসু, *প্রাগুক্ত*।

৩৪. ঐ।

৩৫. ঐ।

৩৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার*, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ১৯।

৩৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৫।

৩৮. ঐ।

৩৯. ঐ।

৪০. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০।

৪১. *Report on the Administration of Bengal*, 1872-73.

৪২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, ঢাকা, ১৯৮৫।

অ লো ক   রা য়

উনিশ শতকের সাহিত্য পত্রিকা

সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্র--অনেকদিন পর্যন্ত এ দুয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে বিলেতে সংবাদপত্র বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দেশের ও বিদেশের খবর নিয়ে পত্রিকা বেরিয়েছে। বোঝা যায় বাণিজ্যিক উদ্যোগ হিসেবে খবরের কাগজ প্রকাশের কথা অনেকে ভাবছেন। এমনকি যাঁরা সাহিত্যিক, তাঁরাও সংবাদপত্র বার করছেন, বা নিজে সম্পাদক-প্রকাশক না হয়েও সংবাদপত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হচ্ছেন। এর সঙ্গে সেই সময়ে রাজনৈতিক দলাদলির কথাও মনে রাখতে হবে। হুইগ এবং টোরি দু-দলই নিজেদের প্রচারের জন্য পত্রিকার প্রয়োজন অনুভব করেছে। ড্যানিয়েল ডিফোর *The Review* (১৭০২) পত্রিকায় রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এমনই উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল যে তাঁকে কারাবাস করতে হয়। ডিফোর পত্রিকাকে যদি হুইগদের মুখপত্র বলি, তাহলে বিরোধীপক্ষ টোরিদের পত্রিকা ছিল *The Examiner,* যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন জোনাথান সুইফট ও ম্যাথু প্রায়র। ফলে এগুলিকে যথার্থ সংবাদপত্র বলা যাবে কি না সন্দেহ, অন্তত যে-অর্থে আঠারো শতকে সংবাদপত্র ছিল *The Morning Chronicle, The Morning Post, The Times*। সংবাদপত্র কেমন করে সাহিত্যপত্রে রূপান্তরিত হয় তার, ভালো দৃষ্টান্ত রিচার্ড স্টিল-এর *The Tatler* (১৭০৯)। সংবাদপত্র সম্পাদনায় স্টিল-এর প্রতিভা ও উদ্যম দেখা গেছে *The Guardian* (১৭১৩), *The Englishman* (১৭১৩), *The Reader* (১৭১৪), *The Plebian* (১৭১৯) প্রচারে। স্টিল্-এর রাজনৈতিক মত-পরিবর্তন কখনও আপত্তিকর মনে হলেও তাঁর লেখা প্রবন্ধ ইংরেজি সাহিত্যের সম্পদ। অবশ্য সমসাময়িক এবং একদা সহযোগী জোসেফ অ্যাডিসন সম্ভবত স্টিল-এর থেকে অনেক বড়ো লেখক। *The Tatler* এবং *The Spectator* (১৭১১) দুই বন্ধুর আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন ছিল। হয়তো অ্যাডিসনের একান্ত ইচ্ছার ফলেই সংবাদপত্র দুটি সাহিত্যপত্রের রূপ নেয় (অ্যাডিসন এই দুটি পত্রিকার জন্য অন্তত চারশো সাহিত্য-প্রবন্ধ লেখেন)। বোঝা গেল *The Literary journal has come to stay.* আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্যামুয়েল জনসনের *The Rambler* স্বল্পজীবী হলেও ইংরেজি সাহিত্যে তার প্রভাব নিতান্ত কম নয়। জনসন আরও দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন--*The Idler* এবং *Universal Chronicle*। তারপর উনিশ শতকে সাহিত্যপত্রিকা কখনও সংবাদপত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। রোমান্টিক কবি-সাহিত্যিকেরা শুধু এসব পত্রিকায় লিখেছেন তাই নয় (লে হাণ্টের *The Examiner* পত্রিকায় কিটসের কবিতা ছাপা হয়েছে), অনেকে পত্রিকা সম্পাদনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন (যেমন কোলরিজ-এর পত্রিকা *The Watchman* ও *The Friend*। কোলরিজ *The Morning Post* পত্রিকাতেও নানা বিষয়ে গদ্য-প্রবন্ধ লিখেছেন)। লে হান্ট, হ্যাজলিট, ল্যাম,

ডি কুইন্সি, সাদে—সকলেই এই সময়ে প্রকাশিত চারটি বিখ্যাত পত্রিকার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত ছিলেন—*The Edinburgh Review* (১৮০২), *The Quarterly Review* (১৮০৯), *Blackwood's Magazine* এবং *The London Magazine* (১৮২০)। পরবর্তীকালে জর্জ এলিয়ট *The Westminster Review* (১৮৫১) ও জর্জ মেরেডিথ *The Fortnightly Review* (১৮৬৭) অল্পদিন সম্পাদনা করেন। উনিশ শতক থেকে সাময়িকপত্র সাহিত্যজীবীর আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন হয়ে ওঠে। জীবিকা হিসেবেও অনেক সময়ে সাহিত্যিককে সাংবাদিকতাবৃত্তি গ্রহণ করতে দেখি, যেমন ডিকেন্স-এর পত্রিকা হল *True Sun* (১৮৩২), *The Morning Chronicle* (১৮৩৪), *The Monthly Magazine* (১৮৩৩), থ্যাকারের পত্রিকা *Punch* (১৮৪৩), *Fraser's Magazine* (১৮৪৮), *The Cornhill Magazine* (১৮৬০)। সংবাদপত্রের মধ্যে সাহিত্যপত্রের সম্ভাবনা প্রথম থেকেই লুকিয়ে ছিল, ক্রমশ সাহিত্যপত্র তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এদিক থেকে যে-কোনো দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে সাময়িকপত্রের দান অনস্বীকার্য।

উনিশ শতকে বাংলা সাময়িকপত্রের আদিযুগে যে-সব পত্রিকা বেরিয়েছিল তার ঝোঁক ছিল সংবাদ পরিবেশনের দিকে। *সমাচার দর্পণ* (২৩ মে ১৮১৮) সাপ্তাহিকের নামকরণ থেকে শুরু করে প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়—পত্রিকাটিতে নানাধরনের *সমাচার* ছাপা হত। সমাচারের মধ্যে সাহিত্য-সমাচারও স্থান পেত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (১৯৩২-১৯৩৬) গ্রন্থে 'সাহিত্য' শিরোনামায় নূতন 'পুস্তক এবং পত্রিকা' প্রকাশের প্রচুর বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়েছে। শুধু বইয়ের খবর নয়, বইয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও এখানে পাই, যেমন—*ভূপালকদম্ব* (১৯.১২.১৮২৯) কিংবা *তাড়িত* [*The Persecuted*] (৩.১২.১৮৩১), সেইসঙ্গে 'দেশীয় প্রাচীন অক্ষরের পরিবর্তে ইঙ্গরেজী অক্ষর ব্যবহারকরণ' (৪.৮.১৮৩৪) নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা। তবে *সমাচার দর্পণ* বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিচ্ছিন্ন সাহিত্য-সংবাদের জন্য স্মরণীয় হয়ে নেই, হয়তো সম্পাদকমণ্ডলীর অজ্ঞাতসারে 'সমাজ' শিরোনামায় সেখানে স্থান পেয়েছে বাংলা কথাসাহিত্যের কিছু আদি নিদর্শন। ১৮২১ সালের ২৪ ফেব্রুয়াবি ও ৯ জুন দুটি পরিচ্ছেদে 'প্রচ্ছন্নরূপে কোন অজ্ঞাত লোক' প্রেরিত 'বাবুর উপাখ্যান' ছাপা হয়, যাকে আমরা *নববাবু বিলাস*-এর (১৮২৫) মতো নকশা-জাতীয় রচনার উৎস বলতে পারি। প্রথম পরিচ্ছেদের নায়ক তিলকচন্দ্র চক্রবর্তী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নায়ক দাতারাম ঘোষ। এরা সকলেই আলালের ঘরের দুলাল, তিলকচন্দ্র 'বাবু ঘুড়ী বুলবুলি প্রভৃতি খেলাতে সদা মগ্ন থাকেন লেখাপড়ার দোকান আছে কিন্তু করেন না। অর্থী ও স্বার্থপর খোশামুদে মিষ্ট মুখো কতকগুলিন দেওয়ানজীর পারিষদ লোক বাবুর নানাবিধ গুণ ও বিদ্যাসূচক প্রশংসা করে।' দাতারাম 'বাবু আপন চাকরকে হুকুম দিয়া রাখেন তোপের পূর্বে নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিও প্রাতঃকালে ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া বেড়াইতে যাইব। বাবু প্রায় সমস্ত রাত্রি বেশ্যালয়ে ছিলেন চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে বাটীতে আসিয়া শয়ন করিয়াছেন তাহাব পরে চাকর নিদ্রা ভাঙ্গাইলেক সুতরাং উঠিতেই হইল সেই ঘুম চক্ষে ঘোড়ার উপরে সওয়ার হইয়া যাইতেছিলেন দেখেন রৌদ্র হইয়াছে এই ক্ষণে যে পথে সাহেব লোক গিয়াছে সে পথে গেলে লজ্জা পাইব।' এইভাবে উনিশ শতকের বাবু-বৃত্তান্ত সংবাদ থেকে সাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ

করতে থাকে (তু. 'শৌকীন বাবু', ২৩ জুন ১৮২১। হিন্দু কলেজের ছাত্রের পিতার মনঃক্ষোভ, ৬ নভেম্বর ১৮৩০, ইংরেজি বিদ্যাভ্যাসের ফল, ১৪ মে ১৮৩১)। এর মধ্যে কয়েকটি অংশ *সমাচার চন্দ্রিকা, সম্বাদ কৌমুদী, সংবাদ প্রভাকর* থেকে উদ্ধৃত/পুনর্মুদ্রিত। সাহিত্যপত্র না হলেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

এখানে মনে রাখতে হবে, বাংলা গদ্যের বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য আমাদের কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। *সমাচার দর্পণ*-এর সম্পাদক হিসেবে জে. সি. মার্শম্যানের নাম ছাপা হত, যদিও তাতে লিখতেন বঙ্গভাষী পণ্ডিতেরা, যথা জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, তারিণীচরণ শিরোমণি। *সম্বাদ কৌমুদী* (৪ ডিসেম্বর ১৮২১) পত্রিকা আমরা দেখবার সুযোগ পাইনি। রামমোহন রায়ের লেখা পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দিকে *সম্বাদ কৌমুদীর* সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পরে 'অংশিগণের সহিত ধর্ম বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়ায়' তিনি এর সংস্রব ত্যাগ করে *সমাচার চন্দ্রিকা* (৫ মার্চ ১৮২২) পত্রিকা প্রকাশ করেন। ভবানীচরণ নক্‌শা-জাতীয় রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তবে *সমাচার চন্দ্রিকা* বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় রচনা-বৈশিষ্ট্য সেভাবে নির্দেশ করা সম্ভব নয়। (*সংবাদপত্রে সেকালের কথায়* বিচ্ছিন্নভাবে *সমাচার চন্দ্রিকার* অল্প কয়েকটি রচনা সংকলিত হয়েছে)।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সমসাময়িক সংবাদপত্রের ধারানুসবণে *সংবাদ প্রভাকর* সাপ্তাহিক (২৮ জানুয়ারি ১৮৩১) প্রকাশ করেন। দেশবিদেশের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ এর উদ্দেশ্য ছিল। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের প্রতিদিনের খবর, দলাদলি, মতবিরোধ, এবং বিশেষভাবে পাঠকদের 'প্রেরিত পত্র'—আজ 'ইতিহাস' বলে পরিগণিত হয়। বিনয় ঘোষ *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র* গ্রন্থে (চারখণ্ড, ১৯৬২-১৯৬৬) *সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বেঙ্গল স্পেক্টেটর, সম্বাদ ভাস্কর, বিদ্যাদর্শন, সর্বশুভকরী, সোমপ্রকাশ* পত্রিকা থেকে প্রধানত সংবাদ সংকলন করেছেন, তবে কখনও সম্পাদকীয় মন্তব্যে, কখনও পুস্তক-পরিচয়ে, কখনও প্রেরিত পত্রে সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস দেখা গেছে। সংবাদপত্রে সংবাদ পরিবেশনের মধ্যেও সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া যেতে পারে, যেমন—

'গুণ হোয়ে দোষ হলো বিদ্যার বিদ্যায়'।

> ডাক্তার গুডিভ সাহেব গোপালচন্দ্র শীল এবং ভোলানাথ বসু নামক দুইজন মিডিকেল ছাত্রকে সমভিব্যহাবে লইয়া বিলাত হইতে আগমন করিতেছেন, সূর্যকুমার নাম বিপ্র কুলোদ্ভব ছাত্র বিলাতে রহিলেন, হঠাৎ এখানে আসিবেন না, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, একটি বিলাতি বিবি বিবাহ করিবেন তবে আসিবেন, নচেৎ যে রহিলেন সেই রহিলেন, বিবির সহিত বিবাহের লোভে তিনি পাদ্রিদিগের শ্বেত পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্বক ঈশু মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, অজপূর্ব ব্রহ্মপুত্র নদের পারে পাণ্ডববর্জিত দেশে ঐ সূর্যকুমার জন্মগ্রহণ করেন, ঢাকাব কলেজে কিছুদিন ইংরাজী পড়িয়া কলিকাতায় আগমন করত চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত মিডিকেল কালেজে নিযুক্ত হয়েন, এখানে যতদিন ছিলেন, কিছুই মানিতেন না, সংপূর্ণ নাস্তিক ছিলেন, গলদেশ হইতে যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, কোন ধর্মের প্রতিই বিশ্বাস করিতেন না, পরে মিডিকেল কালেজের গুডিভ সাহেবের সহিত বিলাত গমন করেন, যেখানে উত্তমরূপে বিদ্যা শিখিয়া দুর্বুদ্ধিবশতঃ অবশেষে এই অগাধ বিদ্যা প্রকাশ করিলেন, যাহা হোক ধন্যবিবি লোভ, হে খ্রীষ্টধর্ম, চমৎকার তোমার গুণ, তুমি বিবি পর্যন্ত দিয়া লোককে স্বমতে আকর্ষণ করহ। (*সংবাদ প্রভাকর*, ১৫.২.১৮৪৮)

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ শুধু সাংবাদিক ছিলেন না, তাঁদের সম্পাদিত সংবাদপত্রও সাহিত্যস্বাদ বঞ্চিত ছিল না। অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদপত্র সম্পাদনা করলেও মুখ্যত সাহিত্যিক ছিলেন। সেকালে লেখকের সংখ্যা কম ছিল, সম্পাদককেই সব ধরনের লেখা লিখতে হত। তবে *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকার দ্বিতীয় পর্যায় (১৮৩৬) প্রকাশকালে ঈশ্বর গুপ্ত 'কেবল মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন এবং বিশেষ রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন ঘটনা হইলে তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় উক্তি লিখিতেন।' *সংবাদ প্রভাকর* প্রথমে ছিল সাপ্তাহিক, পরে বারত্রয়িক, অবশেষে দৈনিক (১৪ জুন ১৮৩৯)। ১৮৫৩ সাল থেকে মাস পয়লার *সংবাদ প্রভাকর* 'এক একখানি স্থূলকায় প্রভাকর' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, যেখানে 'সর্বাগ্রে জগদীশ্বরের মহিমা বর্ণনা, নীতিকাব্য ও বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি গদ্য পদ্য পরিপূরিত উত্তম উত্তম প্রবন্ধ এবং সর্বশেষে— মাসের সমুদয় ঘটনা অর্থাৎ মাসিক সংবাদের সারমর্ম প্রকটিত' হত। এদিক থেকে মাস-পয়লার *সংবাদ প্রভাকরকে* বাংলা আদি সাহিত্যপত্রের নিদর্শন বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যপত্র হিসেবেই *সংবাদ প্রভাকরকে* দেখেছেন—'বাঙ্গালা সাহিত্য এই প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। মহাজন মরিয়া গেলে খাতক আর বড় তার নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মুখে আনি না। কিন্তু একদিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্তা কর্তা বিধাতা ছিল। প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্তন করিয়া যান। ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাঁহার অনেক ছিল বটে—অনেক স্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুগামী মাত্র, কিন্তু আর একটা ধরণ ছিল, যা কখনও বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে। নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্বণ, আজ মিশনারি, কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন। আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা কীর্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিল। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর একজন। শুনিয়াছি, বাবু মনোমোহন বসু আর একজন। ইহার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য, প্রভাকরের নিকট ঋণী। আমি প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।'

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার (১৮৪৩) সঙ্গেও সেকালের সাহিত্যিকদের, বিশেষত গদ্যলেখকদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* ছিল তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র, পত্রিকা প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 'ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন এবং উন্নতি কি প্রকারে হইবেক' তা জানানো। তবে সেই সঙ্গে 'বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের কৌশল প্রকাশিত হইবেক।' তাই ধর্ম, দর্শন, পুরাতত্ত্ব, সাহিত্য, বিজ্ঞান, জীবনী, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে আলোচনা এতে ছাপা হত। প্রথম দিকে অক্ষয়কুমার দত্ত পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। বিলিতি পত্রিকার মতো *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকারও* 'পেপার কমিটি' নামে প্রবন্ধনির্বাচনী সভা ছিল, বিভিন্ন সময়ে যার সদস্য (গ্রন্থাধ্যক্ষ) ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু, শ্রীধর ন্যায়রত্ন, আনন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ,

প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, রাধাপ্রসাদ রায় প্রমুখ সেকালের বিদ্বজ্জন। আমাদের মনে পড়বে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ' ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* ঠিক সাহিত্যপত্র না হলেও তাকে সংবাদপত্রও বলা যাবে না। বিনয় ঘোষের মনে হয়েছে 'বঙ্গদর্শনের শুভাবির্ভাবকে সম্ভাব্য করে তুলেছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।'

এদিক থেকে দেখলে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ প্রচারিত *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ* (১৮৫১) *তত্ত্ববোধিনী* ও *বঙ্গদর্শনের* মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে। শুধু সংবাদ পরিবেশন নয়, সমাজ বা ধর্মসংস্কারের জন্য বাদপ্রতিবাদ নয়,—সহজ সরল ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের যাবতীয় বিষয় সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহের* উদ্দেশ্য ছিল—"যাহাতে বঙ্গদেশস্থ জনগণের জ্ঞানবৃদ্ধি হয় এমৎ সৎ ও আনন্দ-জনক প্রস্তাব সকল প্রচার করা উক্ত সমাজের মুখ্য কল্প, এবং ইংরাজী ভাষায় 'পেনি ম্যাগাজিন' নামক পত্রের অনুবর্তিত এতৎপত্রে তদভিপ্রায় সিদ্ধ্যর্থে অবিরত সম্যক চেষ্টা করা যাইবেক।" এই উদ্দেশ্য যে পত্রিকাটি অনেকটা সিদ্ধ করতে সক্ষম হয়, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের শৈশবস্মৃতি—'বার বার করে সেই বইখানা পড়বার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড় চৌকো বইটাকে বুকে নিয়ে আমাদের শোবার ঘরে তক্তাপোষের উপর চিত হয়ে পড়ে নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজি বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়তে পড়তে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কেটেছে।" সব্যসাচী-রাজেন্দ্রলাল মিত্র বহুবিচিত্র বিষয়ে লিখতে সক্ষম ছিলেন। তবে সেই সঙ্গে তিনি প্রস্তাব-রচয়িতা হিসেবে পেয়েছিলেন সেকালের কয়েকজন শক্তিমান লেখককে, যেমন—রামচন্দ্র মিত্র, যাদবকৃষ্ণ সিংহ, রাধানাথ বিদ্যারত্ন, নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা), ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, আনন্দনন্দন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ* অন্য একটি কারণেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে—এখানেই বাংলা সাহিত্য সমালোচনার উন্মেষ। এই সময়ে বাংলা গদ্য ও পদ্য যে সব উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, রাজেন্দ্রলাল নিজে বা তাঁর সহযোগী কেউ, সেগুলি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, টেকচাঁদ ঠাকুর, দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্যকৃতি বিশ্লেষণে সমালোচকের সাহিত্যরুচির পরিচয় মিলেছে। মধুসূদনের *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের* প্রথম দুই সর্গ *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে* প্রকাশিত হয়। পরে কাব্যটি নিয়ে রাজেন্দ্রলাল পত্রিকায় সবিস্তারে আলোচনা করেন, যা পড়ে রাজনারায়ণ বসুকে কবি লেখেন—'Have you seen Rajendra's critique on Tilottama in the Vividartha? I suppose you have. It is kind.' রাজেন্দ্রলাল মিত্র পত্রিকার ছয়টি পর্ব সম্পাদনার পর অবসর গ্রহণ করলে কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তবে সপ্তম পর্ব অনিয়মিতভাবে কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকার বিলুপ্তি ঘটে। বেশ কয়েক বছর পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে *রহস্য-সন্দর্ভ* (১৮৬৩) নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন—'এতাদৃশ কেবলমাত্র-বিদ্যানুরাগী সাময়িক পত্র যে জনসমাজের হিতকর ও আদরাস্পদ বটে তাহা বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহের সিদ্ধসঙ্কল্পতায় নিশ্চয় বোধ হইতেছে। পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ

মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্য-ব্যাপার ও জীবসংস্থার বিবরণ, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্য-দ্রব্যের উৎপাদন, নীতি-গর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচন, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায় উক্ত পত্র অতি অল্পকালে সংখ্যাতিরিক্ত ব্যক্তির প্রেমাস্পদ হইয়াছিল ; এই মাসিক পত্র তদনুকরণদ্বারা তাহার পুরস্কার প্রার্থনা করে।' *রহস্যসন্দর্ভে* জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের সঙ্গে নিয়মিত নানানধরনের আখ্যান সংকলিত হয়েছে (যেমন, অরণ্য-কাহিনী, অপূর্বভূতের গল্প, ঠাকুরদাদার বাল্যদশা ইত্যাদি)। কবিতার সংখ্যাও *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহের* তুলনায় বেড়েছে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় *রহস্য-সন্দর্ভের* অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন। মাইকেল মধুসূদনের অন্তত দুটি চতুর্দশপদী কবিতা ('কবতক্ষ নদ', 'সায়ঙ্কাল') সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ পত্রিকায় ছাপা হয়েছে—'নিম্নস্থ চতুর্দশপদী কবিতাদ্বয় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্তৃক প্রণীত। উক্ত মহোদয়ের শর্ম্মিষ্ঠা তিলোত্তমা মেঘনাদাদি কাব্য বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মেঘনাদ বাঙ্গালী মহাকাব্য বলিবার উপযুক্ত। অপর কবিবর কেবল উত্তম কাব্য লিখিয়াছেন এমত নহে। তাঁহাকর্তৃক বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াও তিনি এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার এই অভিনব কবিতা তাঁহার কবিত্ব-মার্তণ্ডের অনুপযুক্ত অংশু নহে।' *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে তার সমালোচনা যেমন *রহস্য-সন্দর্ভে* স্থান পেয়েছে, তেমনি সে সময়ে মুদ্রিত অধিকাংশ নতুন ধরনের লেখা পত্রিকায় 'নূতন গ্রন্থের সমালোচন' অংশে স্থান পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের *দুর্গেশনন্দিনীর* সপ্রশংস আলোচনা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য —'আমরা বঙ্গীয় সাময়িক পত্রের সম্পাদক হইয়াও বাঙ্গালী গদ্যকাব্য-পাঠে অত্যন্ত অনুরাগবিহীন। পরন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করায় সে বিরাগের দূরীকরণ হইয়াছে। আমরা তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। ইহার কল্পনা, গ্রন্থন, রচনা, সকলই নূতন প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং তাহাতে কাহাকেই চর্বিতচর্বণের ক্লেশ পাইতে হয় না। ...যাঁহারা নূতন সরস মনোমুগ্ধকর গল্পের অনুযায়ী ; যাঁহারা বীর্যবৎ বাক্যের আদায়কারী ; যাঁহারা, বিনানুপ্রাসে রচনার চাতুর্য হইতে পারে এমত জ্ঞান করেন ; যাঁহারা মহদ্‌গুণে পরিতৃপ্ত হন, তাঁহারা দুর্গেশনন্দিনীতে আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন ; কারণ ইহা তাঁহাদের সকল অভীষ্টের সম্যক্ প্রকারে পোষক, সন্দেহ নাই।' (২ পর্ব, ২১ খণ্ড)

বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ ও *রহস্যসন্দর্ভ* যেমন সরকারি অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়, তেমনই *এডুকেশন গেজেট* ও *সাপ্তাহিক বার্তাবহ* (৪ জুলাই ১৮৫৬) 'was established under the Editorial charge of the Reverend O' Brien Smith, under the auspices and patronage of this Department, assisted by a Government grant of Rupees 200 a month.' ইংরেজি ও বাংলা মিশিয়ে এই অদ্ভুত নামকরণ বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। সাপ্তাহিক পত্রটি মুখ্যত 'বার্তাবহ' হওয়া সত্ত্বেও প্রথম থেকে তাতে নানা ধরনের রচনা ছাপা হত। আবার সম্পাদক হিসেবে স্মিথের নাম ছাপা হলেও, সহকারী রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তত ১৮৬২ সাল পর্যন্ত আসল সম্পাদনার কাজ করেছেন। *সংবাদ প্রভাকর* (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬০) পত্রিকা থেকে জানি 'শরীর-সাধনী বিদ্যার গুণকীর্তন' নামে বক্তৃতা দিয়েছেন 'এডুকেশন গেজেট সম্পাদক শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।' স্মিথ

অবসর গ্রহণ করলে অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন (মার্চ ১৮৬৬-আগস্ট ১৮৬৮)। এই সময়ে নবীনচন্দ্র সেন *এডুকেশন গেজেটে* কবিতা লিখতেন (প্রথম কবিতা প্রকাশ 'কোনো এক বিধবা কামিনীর প্রতি')। *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহের* শেষ পর্যায়ে কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদনাকালে *নীলদর্পণ* নাটকের আলোচনায় 'সম্পাদক বাবু বিবিধার্থে নীলকরদিগের গ্লানি প্রকাশ করায় গবর্নমেন্ট যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন, এবং সেই সূত্রেই বিবিধার্থের বিনাশ হয়।' প্যারীচরণ সরকারের সম্পাদনাকালে *এডুকেশন গেজেটে* 'ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের দুর্ঘটনা'-বৃত্তান্ত ছাপার জন্য সম্পাদক কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন, ফলে প্যারীচরণকে পদত্যাগ করতে হয়। এর পর ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং সেই সঙ্গে পত্রিকার উপর সরকারি কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। ভূদেবের আমলে পত্রিকাটি প্রায় সাহিত্যপত্রের রূপ নেয়। এই সময়ে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক কবিতা এবং সমসাময়িক প্রধান লেখকদের রচনা *এডুকেশন গেজেটে* ছাপা হতে দেখা যায়। ভূদেবের *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস,* উত্তরচরিত-রত্নাবলী-মৃচ্ছকটিকের সমালোচন, এবং *বিবিধ প্রবন্ধের* (দ্বিতীয় ভাগ) অনেক রচনার প্রথম প্রকাশ এই পত্রিকায়।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত সাপ্তাহিক *সোমপ্রকাশকে* (১৫ নভেম্বর ১৮৫৮) সাহিত্যপত্র বলা যায় না। তবে *সোমপ্রকাশ* পত্রিকার সাহিত্যাদর্শ যাবতীয় রচনায় কমবেশি পরিমাণে প্রকাশিত হয়েছে। সমসাময়িক পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছে, 'The *Shome Prokash* was first projected by Pundit Eswar Chunder Vidyasaghur, and we believe the first number was written by him. But he fell sick and made over the paper to Pundit Dwarkanath, under whose able management the paper attained the foremost place among the Bengalee newspapers'. (*The Hindoo Patriot,* January 9, 1865). বিদ্যাসাগর *সোমপ্রকাশ* পত্রিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কতটা জড়িত ছিলেন, জানা না গেলেও 'ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য' এবং 'নীতির উৎকর্ষতা'র পিছনে তাঁর প্রভাব কাজ করেছে। *দুর্গেশনন্দিনী* উপন্যাসের সমালোচনায় 'অতিবর্ণন দোষ', 'পতৎপ্রকর্ষতা দোষ', 'অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতাদোষে'র উল্লেখ থাকলেও 'উপন্যাসের সবিশেষ মনোহরতা' স্বীকার করা হয়েছিল। কিন্তু *বঙ্গদর্শন* প্রকাশের পরে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, প্রবন্ধ, রচনারীতি, ভাষা সব কিছুই আপত্তিকর মনে হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের *দ্বাদশ কবিতা* সম্বন্ধে মন্তব্য, 'এই গ্রন্থকার অনেক গ্রন্থ লিখিলেন ; কিন্তু আমরা বলিতেছি ইহার একখানিও চিরস্থায়ী হইবে না। ইউরোপের ন্যায় এখানে সাহিত্যপ্রিয় দলের ক্ষমতা থাকিলে দীনবন্ধু মিত্রের ন্যায় মুগুরে কবি সধবার একাদশীর ন্যায় ঘৃণাকর গ্রন্থ লিখিবার পর আর লেখনী ধারণ করিতে সাহসী হইতেন না।' বঙ্কিম-বিরোধিতায় অবশ্য সেকালে অনেক পত্রিকাই সোচ্চার হয়েছে, যেমন *হালিশহর পত্রিকা* (১৮৭১), *মধ্যস্থ* (১৮৭২), *বসন্তক* (১৮৭৪)। এর মধ্যে *মধ্যস্থ*-সম্পাদক মনোমোহন বসু সেকালে জনপ্রিয় লেখক বলে পরিচিত ছিলেন। *জ্ঞানাঙ্কুর* (১৮৭২) মাসিকপত্রটি বিশেষভাবে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের *স্বর্ণলতা* উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

অবশ্য সাময়িক পত্রে উপন্যাস ছাপার কথা উঠলে আমাদের কয়েকবছর পিছিয়ে যেতে হবে, কারণ বাংলা 'প্রথম' উপন্যাস *আলালের ঘরের দুলাল* প্রকাশিত হয় প্যারীচাঁদ মিত্র ও

রাধানাথ সিকদার সম্পাদিত *মাসিক পত্রিকা*-য় (১৮৫৪)। পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যায় জানানো হত 'এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।' প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনাটি হল 'শ্রাদ্ধে কিছু মাত্র ফল নাই'।--'লোকে কি শ্রাদ্ধের জোরে স্বর্গে যায়? তাহা হইলে কেবল বড়মানুষেরা স্বর্গে যাইত, কারণ তাহাদিগেরই শ্রাদ্ধ বড় ঘটায় হইয়া থাকে। গরীবদিগের শ্রাদ্ধ কখন হয়, কখন বা না হয়, যখন হয় তখন অতি কষ্টেই হয়, শ্রাদ্ধের দ্বারা লোকে স্বর্গে গেলে, গরীব লোকের স্বর্গে যাইবার সম্ভাবনা নাই।' তবে সে সময়ে *মাসিক পত্রিকা*-র বিরোধিতা করবার মতো লোকেরও অভাব ছিল না। *সংবাদ প্রভাকর*-এর মন্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি, '*প্রকৃত মুদ্গার* ইত্যাভিধেয় এক ক্ষুদ্রাকার মাসিক পুস্তক আমরা গত দিবস প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার ভাষা লেখা উত্তম হইয়াছে বটে, কিন্তু অভিনব *মাসিক পত্রিকার* বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করাই সম্পাদকের অভিপ্রায়, ফলতঃ এইরূপ বাদানুবাদে দেশের কি উপকার তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে পারিলাম না।' (৬ নভেম্বর ১৮৫৪)।

কবি-সম্পাদিত পত্রিকা হলেও *সংবাদ প্রভাকর*-এ গদ্যরচনা প্রাধান্য পেয়েছে। সম্ভবত বাংলা প্রথম কবিতা-পত্রিকা *কবিতাকুসুমাবলী* (মে ১৮৬০) ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। প্রথম বছরে সম্পাদক সদ্ভাবশতক-রচয়িতা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। তাঁর সহযোগী ছিলেন কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র ও প্রফুল্লকুমার সেন। হরিশ্চন্দ্র মিত্র সম্পাদিত *কাব্যপ্রকাশ* (১৮৬৪) পত্রিকাতেও কবিতা সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। প্রসঙ্গত বিহারীলাল চক্রবর্তীর উদ্যোগে প্রচারিত তিনটি পত্রিকার উল্লেখ করা যায়--*পূর্ণিমা* (১৮৫৯), *অবোধবন্ধু* (১৮৬৩) এবং *সাহিত্য সংক্রান্তি* (১৮৬৩)। *পূর্ণিমা* পত্রিকায় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের দুটি কবিতা ছাপা হয়--'জুঁইফুলের গাছ' ও 'তাঁতিয়া টোপি'। *সাহিত্য সংক্রান্তিতে* বেরিয়েছে বিহারীলালের 'নভোমণ্ডল', 'বীর্যবতী হিন্দুনারী', 'প্রেম-প্রবাহিনী কাব্য—পল্লীগ্রাম ভ্রমণ' প্রভৃতি অনেক কবিতা। *অবোধবন্ধু* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ কিছু রচনা 'নিসর্গসন্দর্শন', 'বঙ্গসুন্দরী', 'সুরবালা কাব্য'। বিহারীলালের সম্পাদনাকালে *অবোধবন্ধুতে* হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'ইন্দ্রের সুধাপান', কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য লিখেছেন 'পৌলভর্জিনী', 'নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবনবৃত্তান্ত'। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, 'বাঙ্গলা ভাষায় বোধ করি সেই *প্রথম* মাসিক পত্র বাহির হইয়াছিল যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদবৈচিত্র্য পাওয়া যাইত। বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রাণসঞ্চারের ইতিহাস যাঁহারা পর্যালোচন করিবেন তাহারা অবোধবন্ধুকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যূষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।' (*সাধনা*, আষাঢ় ১৩০১)। বিহারীলালের *সারদামঙ্গল* অবশ্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় অনেকদিন পড়ে থাকার পর সেই অবস্থায় *আর্যদর্শন* (১২৮১) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আর *সাধের আসন* কবির মৃত্যুর পর ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *মালঞ্চ* (১২৯৫-১২৯৬) পত্রিকায় ছাপা হয়। কবিতার জন্য না হলেও, সাহিত্য-সমালোচনার জন্য, ঠাকুরদাসের *মালঞ্চ* (১৮৮৮) ও *পাক্ষিক সমালোচক* (১৮৮৪) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

বঙ্গদর্শন-এর (১৮৭২) আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ'। এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল।...বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।" *বঙ্গদর্শন* শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মপ্রকাশের বাহন হয়নি, *বঙ্গদর্শনকে* কেন্দ্র করে একটি লেখকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাস ও বড়ো গল্প *বঙ্গদর্শনে* প্রথম ছাপা হয়—*বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রজনী, রাধারাণী, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, আনন্দমঠ* ও *মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত।* এই সঙ্গে তাঁকে লিখতে হয়েছে *লোকরহস্য, কমলাকান্ত, বিজ্ঞানরহস্য, সাম্য, বিবিধ সমালোচন* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নানা ধরনের রচনা। চার বছর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সম্পাদনায় *বঙ্গদর্শন* প্রকাশের পর ১৮৭৬ সালে মার্চ মাসে পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়। কারণ—'আমি একে ত দাসত্বভারে পীড়িত, তাহার উপর স্বাস্থ্যের এবং পরিশ্রমশক্তিরও সীমা আছে। ইদানীং বঙ্গদর্শনের প্রায় লিখার ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। কাজেই আমি আর পারিলাম না।' শুধু নিজে লেখা নয়, লেখক তৈরি করতে হয়েছে সম্পাদককে ('আমি এক রাজকৃষ্ণ ছাড়া কারও লেখা ভাল করে না দেখে প্রেসে দিইনি...একবার চন্দ্র বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরেজি লিখেছিলেন, খুব খাটতে হয়েছিল')। *বঙ্গদর্শনের* লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন—চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বসু, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, লালমোহন বিদ্যানিধি, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রাণনাথ পণ্ডিত, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জগদীশনাথ রায় ও রামদাস সেন। এর মধ্যে কেউ বেশি লিখেছেন, কেউ কম লিখেছেন। দ্বিতীয় পর্যায় *বঙ্গদর্শন* (১৮৭৭-১৮৮২) প্রকাশিত হয় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। তিনি এর আগে *ভ্রমর* (১৮৭৪) পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন—'প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন।' *বঙ্গদর্শনে* প্রকাশিত তাঁর 'পালামৌ' ও 'জাল প্রতাপচাঁদ' বাংলা সাহিত্যে তাঁকে অমরতা দিয়েছে। সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনাকালেও পত্রিকা পরিচালনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কর্তৃত্ব হ্রাস পায়নি। এই সময়ে *কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী* (অসম্পূর্ণ) যেমন ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছে, তেমনি 'বুড়ো বয়সের কথা', 'কমলাকান্তের পত্র', 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি'র মতো বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত কিছু রচনা *বঙ্গদর্শনে* স্থান পেয়েছে। *বঙ্গদর্শন* তৃতীয় পর্যায় (১৮৮৩) অল্প কয়েকমাসের জন্য সম্পাদনা করেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

কোনো সন্দেহ নেই একদিকে যেমন 'বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল', তেমনি বঙ্গদর্শন-বিরোধিতাও সে সময়ে প্রবল হয়। *সোমপ্রকাশ, হালিশহর পত্রিকা, মধ্যস্থ* পত্রিকার কথা আগে বলেছি। সম্ভবত *বঙ্গদর্শন*-এ 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন' প্রকাশের ফলে 'শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে [বঙ্কিমকে] ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।' এর মধ্যে সবটুকুই ব্যক্তিগত আক্রোশ নয়, সাহিত্যাদর্শগত বিরোধও ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'ভারতমহিলা' প্রবন্ধটি *আর্যদর্শন* (১৮৭৪) পত্রিকায় পাঠালে সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বলেন, 'তুমি বাপু

যে সকল ভিউ দিয়াছ, আমার সঙ্গে তা মেলে না। আমূল পরিবর্তন না করিলে আমার কাগজে উহা স্থান দিতে পারি না।' *বঙ্গদর্শনে* প্রবন্ধটি সাদরে গৃহীত ও মুদ্রিত হয়েছিল। তার মানে যে *বঙ্গদর্শনের* সঙ্গে মতের মিল ছিল তা নয়। *বঙ্গদর্শনে* 'পাঠযোগ্য যে কোন রচনাই' ছাপা হত, কারণ তার ঘোষিত নীতি ছিল—

আর্য্যদর্শন।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, বার্ত্তাশাস্ত্র, জীবনবৃত্ত, শব্দশাস্ত্র ও সঙ্গীতাদি-বিষয়ক

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্‌ এ

সম্পাদিত।

প্রথম খণ্ড।

১২৮১ সাল।

কলিকাতা।

৪৩ নং মলঙ্গা লেন বহুবাজার, নূতন ভারতযন্ত্রে

শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ৩৷৷০ টাকা।

ডাকমাশুল সমেত ৫৲ টাকা।

আর্য্যদর্শন—প্রথম সংখ্যা

'সম্পাদকের মতের বিপরীত মতও বঙ্গদর্শনে প্রকাশের আপত্তি নাই, এই কথা পাঠকদিগের যেন স্মরণ থাকে।' (পৌষ, ১২৮০)

'লেখকের মতের সঙ্গে আমাদের নিজ মতের সর্বত্র ঐক্য নাই, কিন্তু নব্যসম্প্রদায় আত্মপক্ষ সমর্থনে যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তাঁহারা বলিতে অধিকারী, আমরা প্রবন্ধান্তরে অন্য প্রকার গ্রন্থ সমালোচনা করিয়াছি বলিয়া এই লেখকের মতগুলি অপ্রকাশিত রাখিতে অধিকারী নহি। ইচ্ছা করিলে সকল সম্প্রদায়ের লোক আপন আপন মত বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করিতে পারেন, ইহা বঙ্গদর্শনের উদ্দেশ্য।' (পৌষ ১২৮১)

বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে *প্রচার* (১৮৮৪) নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করেন। *প্রচার* পত্রিকা প্রকাশের ছ'মাস আগে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় *নবজীবন* (১৮৮৪) বার হয়। গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের ঢঙে প্রায় দু' বছর ধরে *নবজীবনে* বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম নিয়ে যে প্রবন্ধগুলি লেখেন, সেগুলি পরে *ধর্মতত্ত্ব* গ্রন্থে স্থান পায়। *প্রচার*-এর 'সূচনা'য় বঙ্কিমচন্দ্র জানান, "আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই সময়ে 'নবজীবন' নামে অত্যুৎকৃষ্ট উচ্চদরের সাময়িক পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা সেই মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া এই ব্রত পালন করিতে যত্ন করিব। *'সত্য, ধর্ম'* এবং *'আনন্দের'* প্রচারের জন্যই আমরা এই সুলভ পত্র প্রচার করিলাম এবং সেই জন্য ইহার নাম দিলাম 'প্রচার'।" *প্রচারের* প্রথম সংখ্যায় 'সূচনা' ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা দুটি প্রবন্ধ 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' ও *'হিন্দুধর্ম'* এবং *সীতারাম* উপন্যাসের প্রথম দুটি পরিচ্ছেদ মুদ্রিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মব্যাখ্যা অনেকের পছন্দ হয়নি। *আর্যদর্শন* পত্রিকায় পূর্ণচন্দ্র বসু, *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু, *নব্যভারতে* কৈলাসচন্দ্র সিংহ, *সঞ্জীবনী* পত্রিকায় ও পরে *ভারতী* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব তাঁদের আপত্তির কথা জানান। বঙ্কিমচন্দ্র *প্রচার* পত্রিকায় 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়' (অগ্রহায়ণ ১২৯১) নামে প্রবন্ধে এর প্রতিক্রিয়ায় লেখেন, 'নবজীবনের পনর দিন পরে, প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আমি হিন্দু ধর্ম--যে হিন্দু ধর্ম আমি গ্রহণ করি--তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম। প্রচারেও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম। সেই ধর্ম আদি ব্রাহ্ম সমাজের অভিমত নহে। যে কারণেই হউক, প্রচার প্রকাশিত হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্ম সমাজ-ভুক্ত লেখকদিগের দ্বারা চারিবার আক্রান্ত হইয়াছি।' উনিশ শতকে শেষপাদে ধর্ম নিয়ে বাদানুবাদ প্রবল হয়ে ওঠে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মব্যাখ্যায় আগ্রহী হলেও সাহিত্যচর্চা পরিত্যাগ করেননি। ১২৯১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'আগামী বৎসরে প্রচার যেরূপ হইবে' তা জানিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র--'জ্ঞানের মধ্যে ধর্মজ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু অন্যান্য জ্ঞান ভিন্ন ধর্মজ্ঞানের সম্যক্ স্ফূর্তি হয় না। বিশেষ মনুষ্যজীবন বিচিত্র ও বহুবিষয়ক ; এজন্য জ্ঞানেরও বৈচিত্র্য ও বহুবিষয়কতা চাই। যাহা বিচিত্র ও বহুবিষয়ক নহে, তাহা সাধারণের নিকট আদরণীয় হইতে পারে না। সাধারণের নিকট আদরণীয় না হইলে ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধেও সফলতা ঘটে না। অতএব আগামী বৎসরে যাহাতে প্রচার বিচিত্র ও বহুবিষয়ক হয়, আমরা তাহা করিবার উদ্যোগী হইয়াছি।'

সাহিত্যপত্রে 'বহুবিষয়কতা' একান্ত কাম্য। এদিক থেকে *ভারতী* (১৮৭৭) পত্রিকা উনিশ শতকের সাহিত্যপত্রের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। *ভাবতী* পত্রিকা অনেকদিন পর্যন্ত

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি-পরিচালিত হওয়ায় তার নিজস্ব একটা চরিত্র গড়ে ওঠে। উনিশ শতকে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী। 'ভারতী' শব্দের ব্যাখ্যায় ভূমিকায় জানানো হয়েছে—বাণী, বিদ্যা ও ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই তিনের সেবা পত্রিকার উদ্দেশ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদক হলেও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, লেখক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের মত একখানা কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা। আমাকেই সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না। আমি কিন্তু ঐ নামটুকু দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্তভার জ্যোতির উপর পড়িল।'—বলেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। প্রথম সংখ্যা থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ পত্রিকার প্রধান লেখক, দশটি লেখার মধ্যে তিনটি রবীন্দ্রনাথের—'ভারতী' (কবিতা), 'মেঘনাদবধ কাব্য' (প্রবন্ধ) ও 'ভিখারিণী' (গল্প)। (*বঙ্গদর্শনে* রবীন্দ্রনাথের একটি লেখাও বার হয়নি)। মনে হয় *ভারতী* ছিল রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন। রবীন্দ্রনাথ এক বছর *ভারতী* সম্পাদনাও করেছেন। উনিশ শতকের শেষ পাদে *ভারতীতে* লেখেননি, এমন কোনো বিখ্যাত লেখকের কথা ভাবা যায় না (এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রও 'দ্রৌপদী' প্রবন্ধের শেষাংশ *ভারতী* পত্রিকায় ছাপাবার জন্য দিয়েছেন)। তবে *ভারতী* দীর্ঘজীবন লাভ করায় এবং একাধিক জনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হওয়ায়, লেখার মান সবসময়ে একরকম রাখা যায়নি। মাঝখানে কয়েকবছর জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত *বালক* (১৮৮৫) পত্রিকাটি *ভারতীর* সঙ্গে সম্মিলিতভাবে *ভারতী ও বালক* (১৮৮৬) নামে প্রকাশিত হয়। পরে আবার *ভারতী* নামেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকে (১৮৯৩)।

রবীন্দ্রনাথ অতি তরুণ বয়স থেকে লেখালিখি শুরু করেন। *জ্ঞানাঙ্কুর* ও *প্রতিবিম্ব* (১৮৮২) পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল' ও 'প্রলাপ' (কবিতা) এবং গদ্য রচনা 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' প্রকাশিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত *নবজীবন* পত্রিকায় তিনি লেখেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' ও 'রাজপথের কথা', বঙ্কিমচন্দ্রের *প্রচার* পত্রিকায় 'কাঙালিনী' ও 'মথুরায়'। *বালক* পত্রিকার কথা *ভারতী*-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ' বার করেন যার কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বালকদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের লেখা মনে হয় বেশি ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। প্রথম সংখ্যায় তেরোটি রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখা পাঁচটি। কবিতা-গান-নাটক-উপন্যাস-প্রবন্ধ লিখেছেন *বালক* পত্রিকার জন্য, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'মুকুট' ও 'রাজর্ষি'।

হিতবাদী (১৮৯২) সাপ্তাহিক পত্রে মনে হয় সব ধরনের লেখাই ছাপা হত (বিজ্ঞাপনে জানানো হয়, বঙ্কিমচন্দ্র শুধু ধর্মীয় বিষয় নিয়ে লিখবেন)। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য পত্রিকার সম্পাদক, রাজনীতিবিভাগের সম্পাদক মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *হিতবাদী* পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে বাংলা ছোটগল্পের জন্মভূমি হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ 'দেনাপাওনা', 'পোস্টমাস্টার' প্রভৃতি ছটি বা সাতটি গল্প *হিতবাদীর* জন্য লেখেন। গল্প ছাড়া তিনি 'সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ'ও

লিখতেন। তবে *হিতবাদী* পত্রিকার ফাইল রক্ষিত না হওয়ায় গল্প ছাড়া অন্য রবীন্দ্র-রচনার হদিশ মেলে না। জ্যৈষ্ঠ থেকে আশ্বিন ১২৯৮ সম্ভবত এই কয়মাস রবীন্দ্রনাথ হিতবাদীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আশ্বিন মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নতুন পত্রিকার বিজ্ঞাপন বার হল--*সাধনা* মাসিকপত্র। সম্পাদক হিসেবে প্রথম তিন বছর ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম থাকলেও রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকে পত্রিকার যাবতীয় দায়ভার গ্রহণ করেছেন। 'চতুর্থ বৎসরে ইহার সম্পূর্ণ ভার আমাকে লইতে হইয়াছিল। *সাধনা* পত্রিকার অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরি পরিমাণে ছিল।'--রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনে *সাধনার* ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম সংখ্যায় বেরিয়েছে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', পরে 'সম্পত্তি সমর্পণ', 'দালিয়া'. 'কঙ্কাল', 'মুক্তির উপায়', 'ত্যাগ', 'একরাত্রি', 'একটা আষাঢ়ে গল্প', 'জীবিত ও মৃত', 'স্বর্ণমৃগ', 'রীতিমতো নভেল', 'জয়পরাজয়', 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি', 'সুভা', 'মহামায়া', 'দানপ্রতিদান', 'সম্পাদক', 'মধ্যবর্তিনী', 'অসম্ভব কথা', 'শাস্তি', 'একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প', 'সমাপ্তি', 'সমস্যাপূরণ', 'খাতা', 'অনধিকার প্রবেশ', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'বিচারক', 'নিশীথে', 'আপদ', 'দিদি', 'মানভঞ্জন', 'ঠাকুরদা', 'প্রতিহিংসা', 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'অতিথি'। প্রকৃতপক্ষে এত গল্প রবীন্দ্রনাথ আর কখনও কোনো একটি পত্রিকায় লেখেননি। গল্পের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্য ধরনের লেখাও (কবিতা, প্রবন্ধ, সাময়িক সারসংগ্রহ, বৈজ্ঞানিক সংবাদ) *সাধনায়* বেরিয়েছে। ঠাকুরবাড়ির প্রায় সকলেই পত্রিকাটিতে লিখতেন, প্রথম সংখ্যাতেই দেখা যাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, ঋতেন্দ্রনাথ লিখেছেন।

সাহিত্য-কল্পদ্রুম (১৮৮৯) মাসিকপত্রটি সাহিত্যের ইতিহাসে স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত না হলেও, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সঙ্গে পত্রিকাটির যোগ (সপ্তম সংখ্যা থেকে তিনি সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন) এবং পরবর্তীকালে "১২৯৭ সালের বৈশাখ হইতে 'কল্পদ্রুম'-কাটা 'সাহিত্য' প্রকাশিত হয়" বলে তার গুরুত্ব আছে। উনিশ শতকের শেষ দশকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রগুলির মধ্যে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত *সাহিত্য* (১৮৯০) আগাগোড়া তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে। রবীন্দ্র-বিরোধিতার জন্য *সাহিত্য* বিখ্যাত হলেও তার লেখকসূচিতে রবীন্দ্রনাথের নাম পাওয়া যায় ('লেখার নমুনা', 'মেঘদূত', 'সোনার বাঁধন', 'প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব', 'গান', 'একটি পত্র', 'রবীন্দ্রবাবুর পত্র')। *সাহিত্য* প্রকাশকালে সুরেশচন্দ্রের ঘোষিত নীতি ছিল 'বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবার জন্য সাহিত্যের জন্ম হইল। জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর, সাহিত্যে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।' 'জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি' বলতে তিনি বুঝতেন 'জাতীয় জীবনের উন্নতি' এবং 'জাতীয় জীবন গঠনের প্রাণপাত'। সুরেশচন্দ্র গল্প লিখতেন, কিন্তু গল্পকার হিসেবে সমসাময়িককালেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেননি। তাঁর খ্যাতি-অখ্যাতির প্রধান কারণ *সাহিত্য* পত্রিকায় প্রকাশিত 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'। রবীন্দ্রনাথের লেখার কখনও প্রশংসা করলেও, সাধারণভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারী লেখকদের নিন্দা করেছেন। আর সব সময়ে সেই নিন্দার পিছনে কোনো সাহিত্যাদর্শ কাজ করেনি। এইখানে *বঙ্গদর্শন*-এর সঙ্গে *সাহিত্য*-এর প্রভেদ। আসলে সুরেশচন্দ্র ছিলেন সাংবাদিক, তিনি বিভিন্ন সময়ে *বসুমতী, সন্ধ্যা, নায়ক, বাঙ্গালী* প্রভৃতি সংবাদপত্র সম্পাদনা করেছেন।

কোনো সিদ্ধান্ত-বাক্যে উপনীত হওয়া যায় কিনা জানি না. তবে উনিশ শতকের সাহিত্যপত্রের ইতিহাস আলোচনা করলে মনে হয়, সাহিত্যিকের পক্ষে সাহিত্যপত্র সম্পাদনা করা সম্ভব এবং সার্থক। ব্যতিক্রম থাকতে পারে, বিশেষত যেখানে সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্রের সম্মিলন ঘটে। বিশ শতকে 'সংবাদ-সাহিত্যে'র যে ব্যাপক প্রসার দেখা যায়, তারও উন্মেষ উনিশ শতকে। তবে সংবাদপত্র যত সুসম্পাদিত হোক না কেন, কখনও সাহিত্যপত্রের বিকল্প নয়।

আবুল আহসান চৌধুরী

উনিশ শতকের গ্রামনির্ভর সংবাদ-সাময়িকপত্র

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাঙালির জাগরণের মূলে সংবাদ-সাময়িকপত্রের একটি বড় ভূমিকা ছিল। সেকালের বাংলার ক্ষমতাকেন্দ্র কলকাতা মহানগরী কিংবা পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর ঢাকার বাইরে থেকেও উনিশ শতকে অনেক সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছে। এ-সব সাময়িকপত্র যেমন দূরবর্তী মফস্‌সল শহর থেকে--আবার তেমনি কখনো কখনো প্রত্যন্ত পল্লীগ্রাম থেকেও বেরিয়েছে।

উনিশ শতকের বৃহত্তর বঙ্গদেশে মফস্‌সল থেকে যে-সব গ্রামনির্ভর ও গ্রামীণ পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* (১৮৪৭, রংপুর), *উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা* (১৮৫৬, উত্তরপাড়া), *রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ* (১৮৬০, রংপুর), *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* (১৮৬৩, কুমারখালি, কুষ্টিয়া), *পল্লীবিজ্ঞান* (১৮৬৭, বিক্রমপুর, ঢাকা), *অমৃতবাজার পত্রিকা* (১৮৬৮, যশোর), *পল্লীগ্রাম বার্ত্তাবহ* (১৮৬৮, বৈদ্যবাটি, হুগলি), *বরিশাল বার্ত্তাবহ* (১৮৭০, বরিশাল), *সমাজদর্পণ* (১৮৭১, খুলনা), *পল্লীদর্শন* (১৮৭৩, পাবনা), *গ্রামবাসী* (১৮৭৩, রানাঘাট, নদীয়া), *ভারতমিহির* (১৮৭৫, ময়মনসিংহ), *শ্রীহট্ট প্রকাশ* (১৮৭৬, সিলেট), *সুহৃদ* (১৮৭৮, দিনাজপুর), *পূর্ব-প্রতিধ্বনি* (১৮৭৯, চট্টগ্রাম), *ত্রিপুরা বার্ত্তাবহ* (১৮৮০, কুমিল্লা), *পূর্ব্ববঙ্গবাসী* (১৮৮৫, নোয়াখালি), *গ্রামবাসী* (১৮৮৬, উলুবেড়িয়া, হাওড়া), *আহমদী* (১৮৮৬, টাঙ্গাইল), *পল্লীগ্রাম* (১৮৮৭, রানাঘাট, নদীয়া), *ফরিদপুর হিতৈষিণী* (১৮৮৯, ফরিদপুর), *হিতকরী* (১৮৯০, কুষ্টিয়া), *বগুড়া দর্পণ* (১৮৯৫, বগুড়া) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। অবশ্য এর বাইরেও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আরও অনেক পত্রিকা বের হয়েছিল। উল্লিখিত পত্রিকাগুলি বেশ ক'টি সরাসরি গ্রামাঞ্চল থেকেই প্রকাশিত হত। এইসব গ্রামনির্ভর পত্র-পত্রিকার মধ্যে নানা বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্যে প্রতিনিধিত্বশীল তিনটি পত্রিকা হল *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, অমৃতবাজার পত্রিকা* ও *হিতকরী*।

দুই

লোকহিত-ব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬) ১২৭০ সালের ১ বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৬৩) *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব কাঙাল হরিনাথ একাধারে ছিলেন সাহিত্যশিল্পী, সংবাদ-সাময়িকপত্র পরিচালক, শিক্ষাব্রতী, সমাজ-সংস্কারক, নারীকল্যাণকামী, দেশহিতৈষী, রায়ত-কৃষক-প্রজাপ্রেমী, সাধক ও ধর্মবেত্তা এবং নব্য-সাহিত্যসেবীদের উদার পৃষ্ঠপোষক। তাঁর সারস্বত-সাধনায় বাউলগানের রচয়িতা কিংবা 'বিজয়বসন্ত' (১৮৫৯) উপাখ্যানের লেখকের পরিচয় ছাপিয়ে সাময়িকপত্র-সম্পাদক হিসেবেই একসময়ে তাঁর পরিচয় সর্বজনীন হয়ে ওঠে।

সাময়িকপত্র সম্পাদনা কাঙাল হরিনাথের সামাজিক কর্মকাণ্ডের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়। আশৈশব জমিদার, মহাজন, কুঠিয়াল ও গোরা পল্টনের শোষণ-অত্যাচার ও উৎপীড়ন প্রত্যক্ষ করে হরিনাথের মনে যে প্রতিকারচিন্তা জেগেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রেরণা লাভ করেন। কবি ঈশ্বর গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) *সংবাদ প্রভাকর*-এর সংবাদদাতা হিসেবে এ-বিষয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্ম-প্রস্তুতির পটভূমি রচিত হয় :

> ...তাঁহার স্বগ্রামের প্রজাগণের দুঃখ ও অভাবকাহিনী সাধারণের গোচর করিবার জন্য তিনি "সংবাদ প্রভাকরে" প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ...এই সকল অভাব ও অভিযোগের বিবরণ ঈশ্বরচন্দ্রের হস্তগত হইলে, তিনি তাহা সযত্নে "প্রভাকরে" প্রকাশ করিতেন। কোন ভ্রম থাকিলে সংশোধন করিয়া দিতেন এবং প্রবন্ধ রচনা সম্বন্ধে তাঁহাকে উপদেশ দান করিতেন। এই প্রকারে হরিনাথ সংবাদপত্র সম্পাদনে অভ্যস্ত হইয়া উঠেন।[১]

সেই যুগে অখ্যাত 'মফস্বল-পল্লী' কুমারখালি থেকে নানা প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে এই পত্রিকার প্রকাশ একটি দুরূহ উচ্চাভিলাষী প্রয়াস হিসেবে বিবেচিত। *গ্রামবার্ত্তা* প্রকাশের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে হরিনাথ তাঁর 'স্বলিখিত দিনলিপি'তে উল্লেখ করেছেন :

> আমি ইতিপূর্ব্বে নীলকুঠিতে ও মহাজনদিগের গদিতে ছিলাম, জমিদারের সেরেস্তা দেখিয়াছিলাম, এবং দেশের অন্যান্য বিষয় অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছিলাম ; যেখানে যত প্রকার অত্যাচার হয়, তাহা আমার হৃদয়ে গাঁথা ছিল। দেশীয় সংবাদপত্রের অনুবাদক রবিন্সন সাহেব যখন অনুবাদ-কার্য্যালয় খুলিলেন, আমিও সেই সময় গ্রামবার্ত্তা প্রকাশ করিলাম।[২]

তাঁর অপ্রকাশিত 'দিনলিপি' থেকে আরও জানা যায় :

> গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা সংবাদপত্রিকার দ্বারা গ্রামের অত্যাচার নিবারিত ও নানা প্রকারে গ্রামবাসীদের উপকার সাধিত হইবে এবং তৎসঙ্গে মাতা বঙ্গভাষাও সেবিতা হইবেন, ইত্যাদি নানা প্রকার আশা করিয়া...'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র কার্য্য আরম্ভ করিলাম।[৩]

গ্রাম-হিতৈষণার আদর্শ নিয়েই *গ্রামবার্ত্তা*-র আত্মপ্রকাশ। নামকরণেই যে সেই আভাস সূচিত তার উল্লেখও মেলে পত্রিকার এই ঘোষণায়--"গ্রাম ও গ্রামবাসী প্রজার অবস্থা প্রকাশ করিবে বলিয়া পত্রিকার নাম 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'" রাখা হয়।[৪] এ-থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, বাংলা সাময়িকপত্রে নগরকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে উপেক্ষিত গ্রামীণ-স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে এই পত্রিকার একটি বিশেষ অঙ্গীকার ছিল। *গ্রামবার্ত্তা* পত্রিকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সম্পাদক তাই সরাসরিই উল্লেখ করেছেন :

> .. এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সংবাদপত্রিকা যতই প্রচারিত হইতেছে তাহা কেবল প্রধান প্রধান নগর ও বিদেশীয় সম্বাদাদিতেই পরিপূর্ণ। গ্রামীয় অর্থাৎ মফঃস্বলের অবস্থাদি কিছুই প্রকাশিত হয় না। তজ্জন্য গ্রামবাসীদিগের কোন প্রকার উপকার দর্শিতেছে না। যেমন চিকিৎসক, রোগীর অবস্থা সুবিদিত না হইলে তাহার প্রতিকারে সমর্থ হন না, তদ্রূপ দেশহিতৈষী মহোদয়গণ গ্রামের অবস্থা অবিদিত থাকিলে কিরূপে তাহার প্রতিকার করিতে যত্নবান হইবেন? যাহাতে গ্রামবাসীদের অবস্থা, ব্যবসায় রীতি, নীতি, সভ্যতা, গ্রামীয় ইতিহাস, মফঃস্বল-রাজকর্ম্মচারীগণের বিচার, এবং আশ্চর্য্য ঘটনাদি প্রকাশিত হয় তাহাই এই পত্রিকার প্রধানোদ্দেশ্য, এবং লোকরঞ্জনার্থ ভিন্নদেশীয় সম্বাদ ও গদ্য পদ্য চিত্তরঞ্জন বিষয়ও লিখিত হইবেক।...[৫]

নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক হিসেবে কয়েক পর্যায়ে মোট ২২ বছর চলেছিল।[৬] *গ্রামবার্ত্তা* প্রথমে কলকাতার গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের যন্ত্রে মুদ্রিত হত। পরে হরিনাথ ১২৮০ সালের প্রথম দিকে কুমারখালিতে 'মথুরানাথ যন্ত্র'

স্থাপন করেন এবং তখন থেকে *গ্রামবার্ত্তা* এই প্রেসেই ছাপা হতে থাকে। পত্রিকা প্রকাশনায় হরিনাথ তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর অর্থাৎ জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯), শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (১৮৬০-১৯১৩), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০), প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সহায়তা লাভ করেন। মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১১) সঙ্গেও এই পত্রিকার যোগ ছিল।

কৃষক-তাঁতি, রায়ত-প্রজাসহ শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা ও অধিকার সম্পর্কে *গ্রামবার্ত্তা* সচেতন ও সক্রিয় ছিল। এদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে *গ্রামবার্ত্তা* কোনো দ্বিধা বা শঙ্কা বোধ করেনি। পাক্ষিক *গ্রামবার্ত্তা*-র প্রায় প্রতিটি সংখ্যাতেই এদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। এ-সব বর্ণনায় রায়ত-প্রজার প্রতি সহানুভূতি, জমিদারের শোষণ-নিগ্রহের স্বরূপ উন্মোচন এবং সরকারি ভূমিকার সমালোচনার ইঙ্গিতও মেলে। অনেকক্ষেত্রেই সরকারের দায়িত্ববোধের অভাব বা ঔদাসীন্য সম্পর্কে বেদনা এবং অভিযোগ জানিয়ে কর্তব্যচেতনা জাগানোর চেষ্টা রয়েছে। দেশীয় শোষক-জমিদার কিংবা বাক্-সর্বস্ব তথাকথিত দেশদরদির আচরণ ও ভূমিকাও পত্রিকায় সমালোচিত ও নিন্দিত হয়েছে।

সেকালে নিরীহ-অভাবী-অসহায় গ্রামবাসী যে কতভাবে নিগৃহীত ও ক্ষতিগ্রস্ত হত তার বিবরণ মেলে *গ্রামবার্ত্তা*-র 'দেশ নষ্ট কপটে, প্রজা মরে চপটে, কি করিবে রিপোর্টে' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে। এখানে নিরুপায় কৃষক-প্রজার দুঃখ-দুরবস্থার প্রধান কারণ হিসেবে পুলিশ, গো-খোঁয়াড়, আদালত, জমিদার ও মহাজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে,--সর্বক্ষণই যাদের '...প্রজার শোণিত পান করিতে...লালা ক্ষরিতেছে'। পুলিশ সম্পর্কে পত্রিকার মন্তব্য, 'বিকারগ্রস্ত রোগীর হিক্কা উপসর্গের ন্যায়, পুলিশ প্রজার উপসর্গ হইয়াছে'। গো-খোঁয়াড় কৃষকের জন্যে 'কার্য্য দোষে অপকারের হেতু হইয়াছে', কেন না 'অনেক স্থানের খোওয়াড় নীলকর প্রভৃতির বৈরনির্যাতনের ফল হইয়াছে'। আদালতের 'আমলাদিগের হাত পাতা রোগ'-এর কারণে মূলত দরিদ্র প্রজারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এরপর আছে জমিদারের শোষণ-কৌশল—অবাধ প্রজাপীড়নের প্রয়োজনে রাজকর্মচারি, পুলিশ ও আদালতকে উৎকোচ দিয়ে বশে রাখা। সরকার-প্রণীত বিধি-আইনও প্রজার রক্ষাকবজ না হয়ে বরং তার অস্তিত্ব-সংকটের সহায়ক হয়েছে। এইসব বিষয় আলোচনা করে *গ্রামবার্ত্তা* পরামর্শ দিয়েছে :

> ...যদি প্রজা রক্ষা ও প্রজার প্রতি অত্যাচার নিবারণ করিতে গবর্ণমেন্ট আন্তরিক সংকল্প করিয়া থাকেন, তবে প্রজাগণ কি কারণে অত্যাচারিত হইতেছে অগ্রে তাহার গোপনানুসন্ধান করুন. পরে যে নিয়ম করিবেন তাহাতেই কার্য্য হইবে। অন্যথা কেবল আড়ম্বর।[৭]

দেশীয় শিল্পের উন্নতি ও বিকাশ সবসময়ই কামনা করেছে *গ্রামবার্ত্তা*। তাই দেশীয় প্রযুক্তিতে প্রস্তুত তাঁতে 'মধ্যবিত্ত ও দুঃখী লোকের উত্তম শীতবস্ত্র' বয়নে যখন তাঁতিরা সফল হয় তখন *গ্রামবার্ত্তা* সন্তোষ প্রকাশে বিস্মৃত হয় না।[৮] আবার এ-দেশের সেই তন্তুবায় সম্প্রদায়ের দুরবস্থা এবং সরকারের ঔদাসীন্য সম্পর্কেও *গ্রামবার্ত্তা* নীরব থাকতে পারেনি। এ-বিষয়ে গ্রামীণ শিল্পজীবীদের অস্তিত্ব-সংকটে সরকারের নির্লিপ্ততায় পত্রিকার তীব্র মন্তব্য স্বাদেশিকতার বিশেষ পরিচয় বহন করে :

> দেশীয় জোলা, তাঁতি, যুগী প্রভৃতি শিল্পকারের দুরবস্থা আমরা কতবার গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশ করিয়াছি, কি গবর্ণমেন্ট কি দেশীয় ব্যক্তিগণ, তৎপ্রতি কেহই সদয় দৃষ্টিপাত করেন নাই।...কেবল উক্ত শ্রেণীর লোকদিগের দুরবস্থা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হইতেছে তাহা নহে, তৎসঙ্গে দেশীয় শিল্পকার্য্যের মূলে গুরুতর আঘাত লাগিতেছে। লাঙ্কেষ্টরের তাঁতিরা যতদিন গবর্ণমেন্ট হৃদয়ে বাস করিবে, ততদিন এদেশীয়

তাঁতি জোলার দুরবস্থা সেই হৃদয়ে স্থান পাইবে, এরূপ ভরসা করা যায় না।[৯]

প্রজার স্বার্থ-সংরক্ষণে জমিদারের সঙ্গে তার সম্পর্ক রচনা এবং কৃষির উন্নতি ও মধ্যশ্রেণীর আয়-উপার্জনের বিষয়টি পরস্পর-সাপেক্ষ বিবেচনা করে *গ্রামবার্ত্তা* অভিমত প্রকাশ করেছে :

> এক্ষণে গ্রাম ও পল্লীবাসী মধ্যবৃত্তি লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়াছে।...জমিদারিদিগের সহিত প্রজাদিগের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না হইলে, গ্রাম ও পল্লীবাসী মধ্যমাস্থ লোকদিগের অবস্থোন্নতির অন্য কোন উপায় নাই। বস্তুত মধ্যবৃত্তি লোকের কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত না হইলে চাষের উন্নতি হইবে না। খাল খনন করিয়া নদীর জল আনিলে কোন ভূমির উপকার ও কোন ভূমির অপকার হয় ; কি প্রণালীতে চাষ করিলে অধিক লাভ হইতে পারে ইত্যাদি কৃষিকার্য্যে বিষয়ী জ্ঞান যাহা কিছু মধ্যবৃত্তি ও চাষালোকেরই আছে ; বিলাসী বড়মানুষদিগের তাহা কিছুমাত্র নাই।[১০]

পাবনার প্রজা-বিদ্রোহেও *গ্রামবার্ত্তা*-র বিশেষ সহানুভূতি ছিল। রায়ত-প্রজার উপর জমিদারের অন্যায় পীড়নই এই অসন্তোষের কারণ বলে *গ্রামবার্ত্তা* মনে করেছে। পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে (জুন ১৮৭৩) জানা যায়, প্রজাপীড়ন ও অযৌক্তিক খাজনা বৃদ্ধিই এই বিক্ষোভের মূল কারণ।

বাংলাদেশের জমিদার-সম্প্রদায়ের প্রজাহিতকর কর্মোদ্যোগের অন্তরালে ছিল তাঁদের শোষণ সম্পর্কে অন্যের দৃষ্টি-বিভ্রান্তির চেষ্টা এবং রাজ-সম্মানলাভের আকাঙ্ক্ষা। জমিদারের এই স্বরূপ উন্মোচন করে *গ্রামবার্ত্তা* স্পষ্ট বক্তব্য পেশ করেছে :

> জমিদারদিগের দ্বারা যত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, রাজদ্বারে সম্মান লাভেচ্ছাই তাহার অধিকাংশের কারণ।...মফস্বলের এক একজন জমিদার দাতব্য ডিস্‌পেনসারি ও বিদ্যালয়াবরণ দিয়া, আমেরিকা দেশের ভাম্পাইয়ার বাদুড়ের ন্যায় প্রজার রক্তপান করেন। হাকিমেরা মফস্বলে আসিয়া স্কুল ও ডিস্‌পেনসারি দেখিয়া ভুলিয়া যান, প্রজার ক্রন্দন কিছুই শুনেন না। ...যোড়াসাঁকোনিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এদেশের অদ্বিতীয় ধার্ম্মিক। ...সম্প্রতি একটা কথা শুনিয়া দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি। তিনি শিলাইদহের স্কুল হইতে ইংরেজী শিক্ষা উঠাইয়া দিয়াছেন।[১১]

কৃষক-প্রজার সন্তান ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে যাতে অধিকার-সচেতন হয়ে উঠতে না পারে ও অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিকারের সাহস ও সুযোগ না পায়, সে-জন্যই জমিদার তাঁর স্বার্থবুদ্ধির কারণেই যে এই জনকল্যাণবিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন—এই ইঙ্গিত এখানে অস্পষ্ট নয়।

হরিনাথের *গ্রামবার্ত্তা* রাজশক্তির সমালোচনাতেও প্রয়োজনে দ্বিধা করেনি। পল্লীবাসীর নিদারুণ জলকষ্টে সরকারের উদ্যোগহীনতাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে পত্রিকায় লেখা হয় :

> এতৎ প্রবন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ-সমীপে এই মাত্র বক্তব্য, গবর্ণর জেনারেল প্রভৃতির সিমলার বিহারের নিমিত্ত প্রতি বর্ষে রাজকোষ হইতে সাড়ে চারি লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, গ্রাম ও পল্লীবাসীর দরিদ্র প্রজাদিগের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ ব্যয় কি রাজধর্ম বিরুদ্ধ![১২]

প্রশাসন-যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের ত্রুটি-বিচ্যুতি-স্খলনকেও *গ্রামবার্ত্তা* কঠোরভাবে সমালোচনা করেছে। পাবনার ইংরেজ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট একবার এক দরিদ্র বিধবার একটি দুগ্ধবতী গাভী জবরদস্তি করে সংগ্রহ করেন। হরিনাথ ম্যাজিস্ট্রেটের এই অসংগত ও অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করে *গ্রামবার্ত্তা*-য় 'গরুচোর ম্যাজিস্ট্রেট' নামে সংবাদ প্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে 'রাজকর্ম্মচারীদিগের অসচ্চরিত্রতাই প্রজার মনোভঙ্গের কারণ' বলে *গ্রামবার্ত্তা* মনে করেছে।[১৩]

অনেকাংশে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও হরিনাথ নির্ভীক ও সৎ-সাংবাদিকতার একটি আদর্শ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শাসক-সরকার, আমলা-ফয়লা, পুলিশ-গোরাপল্টন, নীলকর, জমিদার, মহাজন প্রমুখ কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করার কারণে তাঁকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। এতে যে তাঁকে কেবল পীড়িত-অপদস্থ-বিপন্ন হতে হয়েছে তাই নয়, কোনো কোনো সময়ে তাঁর জীবন-সংশয়ও দেখা দিয়েছে। নির্ভীক ভূমিকার জন্যে তাঁকে 'জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এবং পরগণার জমিদার' উভয়েরই বিরাগভাজন হতে হয়। কিন্তু কাঙাল সাহস ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে এইসব প্রতিকূলতার মোকাবিলা করেছেন, তাঁর কর্তব্য-কর্ম থেকে কখনো বিচ্যুত হননি। এ-সম্পর্কে হরিনাথ *গ্রামবার্ত্তা*-য় লেখেন :

> মাতৃ ও পিতৃভক্ত কোন ব্যক্তিকে কেহ যদি বলে, তুমি তোমার পিতামাতার সেবা পরিত্যাগ কর, যদি না কর তবে দণ্ডিত হইবে। এই দণ্ডভয়ে কি পিতামাতার সেবা পরিত্যাগ করিতে পারেন? সত্যপালনই জগৎপিতার সেবা করিবার উপায় ; এই সত্য পালন করিয়া জগৎপিতার সেবা করিতে যদি কেহ দণ্ড করেন, তাহা হইলে কি আমরা তাঁহার সেবা পরিত্যাগ করিব? অতএব যাঁহারা নতুন আইনের কথা শুনিয়া গ্রাম ও পল্লীবাসীদের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আমরা তাহাদিগকে বলিতেছি, ভ্রাতৃভাবে বিনয় করিয়া বলিতেছি, অত্যাচার পরিত্যাগ করুন। ...অত্যাচার করিয়া একদিন না হয় দুদিন পার পাইবে, তিনদিনের দিন অবশ্যই তাহা রাজার কর্ণগোচর হইবে। আমরা এতদিন সহ্য করিয়াছি, আর করিতে পারি না। সকল কথা প্রকাশ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে ত্রুটি করিব না। ইহাতে মারিতে হয় মার কাটিতে হয় কাট, যাহা করিতে হয় কর, প্রস্তুত আছি।[১৪]

হরিনাথ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যে সততা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, সেকালের নিরিখে তার তুলনা মেলা ভার। বিশেষ করে স্থানীয় প্রতাপশালী জমিদারের প্রজাপীড়নের সংবাদ-প্রকাশ তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও নির্ভীকতার পরিচয় বহন করে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের জমিদারি ছিল কুষ্টিয়ার নিকটে বিরাহিমপুর পরগণায়। শিলাইদহে ছিল তার সদর দফ্তর। ঠাকুর-জমিদারদের এলাকায় 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ঠাকুরের (১৭৯৪-১৮৪৬) আমল থেকেই প্রজা-পীড়নের অভিযোগ ছিল। 'মহর্ষি' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) সময় এই পীড়ন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। খাজনা বৃদ্ধি, নানা আবওয়াব কর-আরোপ, জুলুম করে প্রজার ভিটেমাটি উচ্ছেদ, অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টিতে বিপন্ন রায়ত-প্রজার নিকট থেকে বলপূর্বক খাজনা আদায় ইত্যাদি ঘটনা হরিনাথ *গ্রামবার্ত্তা*-য় দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করতেন। এর পাশাপাশি প্রজাকল্যাণে জমিদারের অনীহা বা ঔদাসীন্য সম্পর্কেও সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। *গ্রামবার্ত্তা*-র এই জমিদার-স্বার্থবিরোধী ও তাঁদের চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচনকারী ভূমিকা অনুমোদন করা ঠাকুর-জমিদারদের পক্ষে সংগত কারণেই সম্ভব হয়নি। তাই তাঁদের প্রতিক্রিয়ায় কাঙাল নানাভাবে নিগৃহীত হন। এই অত্যাচারী জমিদার সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়ে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় আবেগপূর্ণ ভাষায় বলেছেন :

> হরিনাথ যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সুতীব্র সমালোচনায় রাজদ্বারে পল্লীচিত্র বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি এদেশের সাহিত্য-সংসারে এবং ধর্ম্মজগতে চির পরিচিত ;—তাঁহার নামোল্লেখ করিতে হৃদয় ব্যথিত হয়, লেখনী অবসন্ন হইয়া পড়ে।[১৫]

ঠাকুর-জমিদারদের পক্ষ থেকে প্রথম পর্যায়ে অর্থের প্রলোভনে হরিনাথকে বশ করার চেষ্টা হয়। এই চেষ্টা ব্যর্থ হলে লাঠিয়াল বাহিনী নিযুক্ত হয়। 'কিন্তু লাঠিয়ালেরা তেজস্বী হরিনাথের দেহ স্পর্শ করিতে সাহসী হইল না। তীতু মিঞা, আব্বাস মিঞা, ঋতু মিঞা

প্রভৃতির দল হাল ছাড়িয়া দিলে একজন পাঞ্জাবী গুণ্ডা হরিনাথের বাড়ি সশস্ত্র উপস্থিত।'[১৬] সৌভাগ্যক্রমে পাঞ্জাবি গুণ্ডার উদ্যোগও ব্যর্থ হয়। কাঙালের অপ্রকাশিত 'দিনপঞ্জি' থেকে জানা যায়, জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর হাত থেকে বিপন্ন বন্ধু হরিনাথকে রক্ষার জন্যে এগিয়ে আসেন বাউলসাধক লালন ফকির (১৭৭৪-১৮৯০)। তিনি 'তাঁর দলবল নিয়ে নিজে লাঠি হাতে সেই লাঠিয়ালের দলকে আচ্ছা কবে ঢিট্ করে সুহৃদ কৃষক-বন্ধু হরিনাথকে রক্ষা করেন।'[১৭] দরিদ্র কৃষক ও প্রজাসাধারণের পাশাপাশি 'প্রসিদ্ধ বাউল লালন ফকিরের অগণিত শিষ্য-সামন্তও কাঙ্গালের অমূল্য জীবনরক্ষার অন্যতম প্রহরী ছিলেন।'[১৮]

হরিনাথের সাহিত্য-শিষ্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখেছেন, "যতদিন 'গ্রামবার্ত্তা' জীবিত ছিল, প্রায় ততদিনই কোন-না কোনরূপে হরিনাথকে জমিদারের উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত।"[১৯] অক্ষয়কুমারকে লিখিত এক পত্রে (২১ চৈত্র ১২৮৫) কাঙাল নিজেই বলেছেন, "জমিদারেরা প্রজা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি যতদূর সাধ্য অত্যাচার করেন।" কিন্তু উপকৃত পল্লীবাসী হরিনাথের বিপদ ও সংকটে নিস্পৃহ ও উদাসীন থাকায় মর্মাহত হরিনাথ ঐ পত্রে আক্ষেপ করে লেখেন :

> জমিদারেরা যখন আমার প্রতি অত্যাচার করে, এবং আমার নামে মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে যত্ন করে, আমি তখন গ্রামবাসী সকলকে ডাকিয়া আনি এবং আত্মাবস্থা জানাই। গ্রামের একটি কুকুর কোন প্রকারে অত্যাচারিত হইলেও গ্রামের লোকে তাহার জন্য কিছু করে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ও আমার এতদুরই দুর্ভাগ্য যে, আমার জন্য কেহ কিছু করিবেন, এরূপ একটি কথাও বলিলেন না। যাঁহাদের নিমিত্ত কাঁদিলাম, বিবাদ মাথায় করিয়া বহন করিলাম, তাঁহাদিগের এই ব্যবহার।[২০]

সাময়িকপত্র-পরিচালনা ছিল হরিনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ 'মিশন'। বিপন্ন ও পীড়িত গ্রামবাসীর স্বার্থরক্ষার যে উদ্দেশ্য ও অঙ্গীকার নিয়ে *গ্রামবার্ত্তা*-র যাত্রা শুরু হয়েছিল, সম্পাদক হিসেবে হরিনাথ সততার সঙ্গে তা পালন করেছিলেন। *গ্রামবার্ত্তা*-র সাফল্য সম্পর্কে হরিনাথ তাঁর অপ্রকাশিত 'দিনলিপি'তে উল্লেখ করেছেন : '...পূর্ব্বের অনেক ধনবানাদি সবল লোকেরা দুর্ব্বলের প্রতি প্রকাশ্যরূপে সহসা যে প্রকার অত্যাচার করিতেন, এক্ষণে যে তদ্রূপ করিতে সাহসী হইতেছেন না ...গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকাই তাহার কারণ।'[২১] সমাজে যে এই পত্রিকার একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল এই বক্তব্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্পাদক হিসেবে হরিনাথের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁর আর-এক সাহিত্য-শিষ্য দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪০) যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :

> ...হরিনাথ উদরান্নের সংস্থানের আশায় সম্পাদকের বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই, স্বত্বাধিকারীর মনোরঞ্জনের জন্য ভাড়াটে সম্পাদকের মত তাঁহাকে আত্মসম্মান বিক্রয় করিতে হয় নাই...। ...হরিনাথ বহু অত্যাচারে জর্জ্জরিত, নানা অভাবে পীড়িত পল্লী-অঞ্চলের অভাব অভিযোগ বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে লেখনীধারণ করিয়াছিলেন ; কাহারও ধমকে তিনি এই কঠোর কর্ত্তব্যব্রত পরিত্যাগ করেন নাই, কাহারও লাঠীর ভয়ে তিনি তাঁহার স্বাধীন মন্তব্য প্রত্যাহার করেন নাই। আর্তের পরিত্রাণের জন্য, উৎপীড়কের দমনের নিমিত্তে তিনি লেখনীর ব্যবহার করিয়াছিলেন। ...হরিনাথ সংবাদপত্র-সম্পাদকগণের আদর্শ ছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের এই অতি-প্রসারের দিনে, এখনও মফস্বল হইতে কত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু হরিনাথের গ্রামবার্ত্তার মত বার্ত্তাবহ একালে সর্বদা দেখিতে পাই না।[২২]

গ্রামবার্ত্তা যে সৎ-সাংবাদিকতার আদর্শ ও জনকল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল তা পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছিল। সেই কারণে দূর-মফসসল থেকে প্রকাশিত হলেও সমকালে *গ্রামবার্ত্তা* জনপ্রিয়তা অর্জনের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র হিসেবেও স্বীকৃতিলাভ করেছিল। *গ্রামবার্ত্তা* একদিকে যেমন জনগণের অভাব-অভিযোগ-সমস্যামূলক সংবাদ প্রকাশ করে প্রতিকারের জন্যে জনমত সৃষ্টি ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করত, অপরদিকে সুপারিশ ও পরামর্শমূলক প্রস্তাব পেশ করে সরকারের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার চেষ্টাও তার ছিল। এই প্রয়াসে *গ্রামবার্ত্তা*-র সাফল্য ছিল উল্লেখ করার মতো। এ সম্পর্কে জলধর সেন বলেছেন :

> গ্রামবার্ত্তা দ্বারা, প্রদেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছিল। ইহা যে কেবল জমিদারের মহাজনের এবং নীলকুঠির অত্যাচার নিবারণের মুষ্টিযোগস্বরূপ হইয়াছে তাহা নহে, প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ থাকিত তদনুসারে কার্য্য করিতে গবর্ণমেণ্টেরও যথেষ্ট অনুরাগ লক্ষিত হইত। বাংলা গবর্ণমেণ্টের বাংলা সংবাদপত্রের অনুবাদক মিঃ রবিন্সন সাহেব বাহাদুর স্বয়ং বিদ্যারত্ন যন্ত্রে উপনীত হইয়া "গ্রামবার্ত্তা" গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গবর্ণমেণ্টের গোচরার্থে গ্রামবার্ত্তা হইতে যে সকল অনুবাদ করিতেন, তাহাতে গ্রাম ও পল্লীবাসী নিরীহ দুঃখীপ্রজার বিস্তর উপকার সাধিত হইয়াছিল। নদীখাল প্রভৃতি পয়ঃপ্রণালী সংস্কারপূর্ব্বক জলকষ্ট নিবারণ, পুলিশ-বিভাগের সংস্কার, গো-ধন রক্ষা, রেলপথ দ্বারা জল নিঃসরণের পথ বন্ধ হওয়ায় এদেশ যে অস্বাস্থ্যকর ও ম্যালেরিয়ার আকরভূমি হইতেছে, পোষ্টাফিসের মনিঅর্ডার প্রথা প্রচলন প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে হরিনাথ লেখনী পরিচালনা করিয়া রাজা ও প্রজা উভয়েরই হিতাকাঙক্ষী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।[২৩]

হরিনাথের *গ্রামবার্ত্তা* যথার্থই পল্লীর নিপীড়িত দরিদ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। এই পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলে পল্লীবাসী এর প্রয়োজনীয়তা আরও তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছেন। পরবর্তীকালে যে-সব পত্রপত্রিকা এই অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হয়, তা *গ্রামবার্ত্তার* মতো পরিপূর্ণভাবে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হয়নি। মীর মশাররফ হোসেন-এর *হিতকরী* পত্রিকায় 'পল্লীবাসী প্রজার' পরিচয়ে প্রকাশিত একটি চিঠিতে একজন পত্রিকা-পাঠক প্রজা-কল্যাণের পক্ষে *গ্রামবার্ত্তা*-র মতো নিঃস্বার্থ সাহসী ভূমিকা পালনের প্রত্যাশা করেন *হিতকরী*-র কাছে :

> আজ কয়েক বৎসর হইতে গ্রামবার্ত্তার কণ্ঠ নীরব হইয়াছে। গ্রামবার্ত্তার সতেজ লেখনি প্রভাবে এ অঞ্চলের পুলিশ, বিচারক, হাকিম, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, জমিদার প্রভৃতির অত্যাচার শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল। গ্রামবার্ত্তার জীবন এই সমস্ত অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ করিয়া অনেক সময় নানা বিপদে পড়িতে হইয়াছিল যে তাহার আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই ; এ প্রদেশের সকলেরই অন্তরে তাহা জাগরিত রহিয়াছে।...তাই আমাদের নিবেদন গ্রামবার্ত্তার কণ্ঠ নীরবের পর যখন হিতকরীর অভ্যুদয় হইয়াছে, তখন আমরা পল্লীবাসী আমাদের দুঃখের কথা গ্রামবার্ত্তায় যেমন তীব্রভাবে আলোচিত হইয়া রাজার গোচর করিত, সেইরূপ আলোচিত হইয়া আমাদের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করুন।...পূর্ব্বে যখনই দুঃখ পাইতাম তখনই গরীবের দুঃখের দুঃখী, কান্নাই [কান্নায়] সমভাগী গ্রামবার্ত্তার দ্বারে গিয়া কতবার কাঁদিতাম। সকরুণ স্বরে আমাদের জন্যে কত কান্নাই সম্পাদক রাজার নিকট. জমিদারের নিকট না কাঁদিয়াছেন ; কিন্তু এখন কাহার কাছে যাইব ? ...গ্রামবার্ত্তার স্থানে আবার হিতকরীকে আমরা দেখিতে পাইয়া গ্রামবার্ত্তার অভাবকষ্ট ভুলিয়া যাইব।[২৪]

গ্রামবার্ত্তা পল্লীবাসী প্রজা-সাধারণের মনে যে কী গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল, *গ্রামবার্ত্তা* বিলুপ্ত হওয়ার পরও তার অভাব যে কী তীব্রভাবে সমস্যা-জর্জরিত ও

পীড়িত পল্লীবাসী অনুভব করেছেন, তার স্পষ্ট প্রমাণ *হিতকরী*-তে প্রকাশিত এই পত্র। এই পটভূমিকা মনে রাখলে এ-কথা বলতেই হয়, কাঙাল হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* বাংলা সাময়িকপত্র এবং গ্রামীণ সাংবাদিকতার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পত্রিকা, যা কৃষক-প্রজা-রায়ত-শ্রমজীবী মানুষ ও মধ্যশ্রেণীর স্বার্থের অনুকূলে একটি যুগোপযোগী ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল।

তিন

শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১) প্রকাশিত-সম্পাদিত *অমৃতবাজার পত্রিকা* আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রামনির্ভর পত্রিকা। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ১৮৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি যশোরের পলুয়া-মাগুরা গ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। অবশ্য এর বছর কয়েক পূর্বে ১৮৬২ সালে স্বগ্রাম থেকে অগ্রজ বসন্তকুমার ঘোষ-সহযোগে তিনি *অমৃত প্রবাহিণী* নামে একটি স্বল্পজীবী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

গ্রাম থেকে পত্রিকা প্রকাশের বিষয়ে শিশিরকুমার অত্যন্ত আন্তরিক ও উদ্যোগী ছিলেন। এই প্রয়োজনে তিনি গ্রামে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু তাই নয়, পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি কম্পোজ ও ছাপার কাজও তিনি করতেন, আবার ছাপার কাগজ প্রস্তুতের ব্যবস্থাও করেছিলেন নিজের গ্রামেই।[২৫] ১৮৭১ সালের ৪ অক্টোবর পর্যন্ত যশোর থেকে *অমৃতবাজার পত্রিকা* প্রকাশিত হয়। এরপর পত্রিকাটি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয় এবং পরে একসময়ে (১৮৯১) দৈনিকে রূপলাভ করে।

শিশিরকুমার ছিলেন গ্রামমনস্ক, গ্রামের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন এবং প্রতিকার-প্রয়াসী। শিশিরকুমার এবং তাঁর পরিবারের সদস্যারা গ্রামে স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, ডাকঘর, হাটবাজার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। নীলকরের অত্যাচারে বিপন্ন রায়ত-প্রজার দুরবস্থার বিষয় সরকারের গোচরে আনার জন্যে তিনি *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকায় নিয়মিত সংবাদ পাঠাতেন। পরে নিজে যখন তিনি পত্রিকা প্রকাশ করলেন তখন সেই পত্রিকায় পল্লীমঙ্গলের এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতপক্ষে 'মফস্বলের প্রজাবর্গের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরা অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল'।[২৬]

পল্লীগ্রামের নানা সমস্যার কথা আলোচিত হয়েছে *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য় প্রকাশিত সংবাদ, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সম্পাদকীয় ও চিঠিপত্রে। অনেক ক্ষেত্রেই সংবাদের সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে পত্রিকার নিজস্ব মন্তব্যও সংযোজিত হয়েছে। গ্রামের রাস্তাঘাটের দুরবস্থা, রোগ-ব্যাধি, সামাজিক অনাচার, সরকারি প্রতিনিধির অসততা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি সম্পর্কে প্রতিকার কামনা করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

সেকালে গ্রামের যোগাযোগ-ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। প্রায় সম্পূর্ণই ছিল কাঁচা রাস্তা। এই অবস্থায় বর্ষাকালে পল্লীবাসীকে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হত। শহর-জনপদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত গ্রাম। *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য় এ-বিষয়ে এক সংবাদে উল্লেখ করা হয় :

> গত বর্ষায় চাকদহা হইতে বনগ্রাম পর্য্যন্ত রাস্তা এমন কদর্য্য হইয়া পড়িয়াছে যে, ঘোড়াগাড়ী কি গোরুর গাড়ী সহজে যাতায়াত করিতে পারে না। কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে যশোহর আসিবার

এইটি প্রধান রাস্তা, অতএব আমরা কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে অনুরোধ করি যে তাহারা রাস্তাটী মেরামতের প্রতি সত্বর মনোযোগী হন।[২৭]

গ্রামবাংলায় একদিকে স্বাস্থ্য-সচেতনতার অভাব ও অপরদিকে চিকিৎসা-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় রোগ-ব্যাধি মহামারীর আকারে প্রায় সারা বছরই লেগে থাকত। রোগ-শোক নিয়েই দিনযাপন ছিল পল্লীবাসীর। *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য় এই বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। খবর পাওয়া যায় :

অমৃতবাজারের নিকট আটিলা প্রভৃতি গ্রামে অত্যন্ত ওলাওঠা হইতে আরম্ভ হইতেছে। গত বর্ষাও ঐ সকল স্থানে প্রথমে ওলাওঠার সৃষ্টি হইয়া শেষে দেশ উচ্ছিন্ন দেয়। এবার কি আবার সেই প্রকার হইবে?...[২৮]

আর-এক সংবাদে প্রকাশ :

কাটিপাড়ার নিকটবর্ত্তী রামনগর গ্রাম হইতে আমাদিগকে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, তথায় ভয়ানক ওলাওঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। প্রত্যহ ৫/৬টি করিয়া পঞ্চত্ব পাইতেছে। গ্রামবাসীগণ প্রায়ই নির্ধন, ডাক্তারকে বিজিট দিয়া চিকিৎসা করে এমন সংগতি নাই। কাটিপাড়ায় একটি গবর্ণমেন্ট দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। যদি সেখানকার ডাক্তার বিনা বিজিটে গ্রামবাসীদিগকে চিকিৎসা করেন, তাহা হইলে গ্রামবাসীগণ ভারি উপকৃত হন।[২৯]

দুই সপ্তাহ পরে প্রকাশিত সংবাদে অভিযোগ করা হয়, অমৃতবাজারের পার্শ্ববর্ত্তী দোসতিনা গ্রামে 'ভয়ানক ওলাওঠা'য় ডাক্তারখানা থেকে যে 'ঔষধ বিলি হইতেছে', তাতে কোন 'ফলই দর্শিতেছে না'।[৩০] মহামারীতে যশোরের গদখালি থানার অর্ন্তগত ঘরভাঙা গ্রামটি সম্পূর্ণই উচ্ছন্ন হয়ে যায়। মর্মান্তিক খবর এই যে :

...১৯ ঘর লোকের মধ্যে একজন মাত্রও জীবিত নাই। গ্রামস্থ লোকদিগের সমুদয় সম্পত্তি পোলিস কর্ত্তৃক গবর্ণমেন্টে আনিত হইয়াছে।

এরপর মন্তব্য করা হয়েছে, 'গ্রামবাসীরা গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ঔষধ কি অন্য কোন রূপ সাহায্য পাইয়াছিল কিনা তাহা আমরা শুনি নাই।'[৩১] এই মন্তব্য সরকারের গাফিলতি, দায়িত্বহীনতা ও ঔদাসীন্যের প্রতিই ইঙ্গিত করে।

সামাজিক অনাচার ও অনৈক্য পল্লীবাসীর দুর্ভোগ ও দুর্দশার অন্যতম কারণ, সেই কথাটি অনেক সংবাদ ও তার অনুষঙ্গী মন্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। উনিশ শতকে বারবণিতা-সঙ্গ ও আসক্তি নাগরিক সমাজে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। সেই ঢেউ কমবেশি পল্লীবাংলাতেও এসে লেগেছিল। এর প্রভাব ও ফলাফল বিচলিত করেছিল *অমৃতবাজার পত্রিকা*-কে। এই রকম একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় পত্রিকায় :

যশোহর হইতে প্রায় ১।। ক্রোশ ব্যবধান পুড়াপাড়া গ্রামে দিনমণী নাম্নী একটী বেশ্যা আসিয়া ভারি উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। গ্রামস্থ গরিব বেচারারা দুই এক পয়সা যা রোজকার করে সবই তারি কল্যাণে—। মহাশয়! এ উৎপাত এতদিন সহরে দেখিতে পাইতাম। গ্রামে এ কি সর্ব্বনাশ![৩২]

ব্যভিচারও গ্রামীণ সমাজকে আক্রান্ত ও কলুষিত করেছিল। এই চরিত্রহানির ব্যাধিও পত্রিকার চিন্তার কারণ হয়েছিল। যশোরের লোহাগড়া থানার অন্তর্গত কুমারডাঙ্গা গ্রামে 'একটি আশ্চর্য্য শোচনীয় হত্যাকাণ্ড' ঘটেছিল। এর মূলে ছিল অবৈধ যৌন-সম্পর্ক। এই ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করে পত্রিকায় লেখা হয়—'এই হত্যাকাণ্ডটীর কারণ ব্যভিচার যাহাতে দেশ উৎসন্ন করিতেছে'।[৩৩]

পল্লীগ্রামের দুর্দশা-দুরবস্থার অন্যতম কারণ যে '*লোকদিগের পরম্পরাগত দলাদলি, ঈর্ষাভাব, অনুৎসাহ, ভগ্নোদ্যম*', তা খুলনার এক বর্ধিষ্ণু পল্লী সেনহাটির প্রসঙ্গে পত্রিকা মন্তব্য করেছে। পূর্বাপর এই গ্রামটির অবস্থা 'তুলনা করিলে একেবারে স্বর্গ ও নরক বলিয়া প্রতীয়মান হয়'।[৩৪]

সরকারি কর্মে নিয়োজিত বিশেষ করে পুলিশ-চৌকিদারের অসাধুতা ও ঘুষ-দুর্নীতি গ্রামবাংলার মানুষকে অতিষ্ঠ ও অসহায় করে তুলেছিল। পুলিশ-চৌকিদারের স্বভাব ও আচরণের এই বৈশিষ্ট্য বোধ করি আবহমানকালের। '*দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন*'—এই ব্রত যাদের পেশাগত মূলমন্ত্র, তারা চিরকালই এর বিপরীত কাজই করে এসেছে। এক পত্রলেখকের সূত্রে জানা যায় :

> ইস্টেসন মুনিরামপুরের অধীন ঢাকুরিয়া প্রতাপকাটি ও অন্যান্য গ্রামসমূহে পাতি চোরের উৎপাতে গ্রামবাসীরা নিতান্ত পীড়িত হইতেছে।...পুলিষে এজাহার করিলে একজন মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাকে অন্ততঃ গণ্ডা গণ্ডা টাকা না দিলে খেলাপ এজাহার হইতে মুক্তি পাওয়া সুকঠিন। সুতরাং অনেকেই পুলিষ হুজুরের মন রাখিতে পারিবেন না বিবেচনায় এজাহারে বিরত থাকেন এবং চুপি চুপি সিঁদ বুজাইয়া ফেলেন। চৌকিদারকে দিবসে বেতন আদায় করিবার সময় দেখা যায়। রাত্রে তাহার গন্ধ পাওয়া ভার।...[৩৫]

উপরের তথ্য-বিবরণ থেকে শান্তি-শৃঙ্খলা-নিরাপত্তার বিষয়ে গ্রামের মানুষের অসহায়ত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'পল্লিগ্রামের অস্বাস্থ্যকারিতা ও তাহার নিবারণের উপায়' (১ জুলাই ১৮৬৯), 'এ দেশীয় দরিদ্র লোকের অবস্থা' (২৯ জুলাই ১৮৬৯), 'মহাজনের অত্যাচার' (১১ নভেম্বর ১৮৬৯), 'গ্রাম্যসমাজ' (১৩ জানুয়ারি ১৮৭০)—*অমৃতবাজার পত্রিকায়* প্রকাশিত এইসব নিবন্ধ বা সম্পাদকীয়তে গ্রামীণ সমাজের দুর্দশা-দুঃখের চালচিত্র এবং তা নিবারণ ও উত্তরণের উপায় নির্দেশিত হয়েছে।

কলকাতায় স্থানান্তরের পর *অমৃতবাজার পত্রিকা*-র গ্রামীণ সংবাদপত্রের চরিত্র অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়। এই পর্যায়ে পত্রিকাটি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজাস্বার্থকে উপেক্ষা করে জমিদারের পক্ষাবলম্বন করে। বিশেষ করে পাবনার প্রজাবিদ্রোহে কৃষক-প্রজার বিপরীতে জমিদারপক্ষকে সমর্থন দেয়। রায়ত-প্রজার প্রতি কর্তব্যবোধের মনোভাব পরিবর্তনের কারণে এই পত্রিকার গুণগ্রাহী এক সহযোগী পত্রিকা ব্যথিত ও বিস্মিত হয়ে বলতে বাধ্য হয় :

> অমৃতবাজার যখন অমৃতবাজারে ছিলেন, তখন আমাদের ন্যায় মফস্বলবাসিদিগের সর্ব্বপ্রকার অনুকূলপক্ষ অবলম্বন করিতেন। ...আমাদের প্রিয় অমৃতবাজার, পল্লিগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নগর, বিশেষতঃ রাজধানীবাসী হইয়াছেন, দুঃখি প্রজাদিগের দশা কেমন করিয়া অনুভব করিবেন?[৩৬]

তবুও এই পত্রিকার পূর্ব-পর্বের গ্রামমনস্কতা, গ্রামীণ জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে সংলগ্নতা ও স্বদেশ-চেতনার কারণে এর ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে আছে।

চার

'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫)-খ্যাত মীর মশাররফ হোসেন-পরিচালিত পাক্ষিক *হিতকরী* ১৫ বৈশাখ ১২৯৭ প্রকাশিত হয় তাঁর স্বগ্রাম কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া থেকে। সাহিত্যিক হিসেবে যেমন সাংবাদিক হিসেবেও তেমনি মশাররফ প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি লাভ করেছিলেন। *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*-সম্পাদক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার ও ঈশ্বর গুপ্ত-প্রতিষ্ঠিত *সংবাদ প্রভাকর*

পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রেরণা ও তত্ত্বাবধানেই মশাররফের সাংবাদিকতার হাতেখড়ি।[৩৭] তাঁর সম্পাদনায় দু'টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। *হিতকরী*-র পূর্বে তিনি *আজীজন নেহার* (১২৮১) নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

প্রজাহিতসাধনের লক্ষ্যে সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার আদর্শ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে *হিতকরী*-র আত্মপ্রকাশ। *হিতকরী*-র উদ্বোধনী সংখ্যায় এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ও নীতি সম্পর্কে জানানো হয় :

> সকলের হিতকথা, যাহাতে সর্ব্বসাধারণের হিতের আশা থাকে, সেই সকল কথাই হিতকরীতে প্রকাশ হয়। জাতিগত কি ধর্ম্মগত কোন পক্ষকে লক্ষ্য করিয়া কিছু প্রকাশ হয় না।[৩৮]

পত্রিকা প্রকাশের দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য সম্পর্কে আরো স্পষ্ট উল্লেখ মেলে বিগত এক বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে :

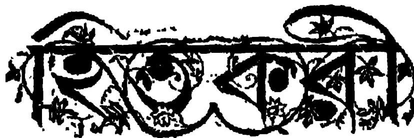
> দুই দশ টাকা লাভের জন্য হিতকরী প্রকাশ হয় নাই। জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় না পাইয়া এই কুটিল ও জটিলপথ আশ্রয় করা হয় নাই। ন্যায্য বলিব, সত্য প্রকাশ করিব। সত্যাশ্রয়ে থাকিব, সাধারণের হিতকরকার্য্যে অবশ্যই যোগ দিব।...যেখানে অন্যায়, সেইখানেই আমরা, যেখানে অত্যাচার, যেখানে অবিচার সেখানেই আমাদের কথা। আমরা প্রশংসার প্রত্যাশী নহি। আর্থিক সাহায্যের আশাও রাখি না। সুতরাং আমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। প্রথম সূচনায় বলিয়াছি, আমাদের প্রথম পূজনীয় ঈশ্বর, তৎপরেই রাজা : গ্রাহকমাত্র না থাকুক, সাধারণে হিতকরী পাঠ না করুন, ক্ষতি নাই। যাঁহার নিকট জানাইলে দেশের উপকার হইবে, অত্যাচার অবিচার কমিবে, অন্যায়ের সুবিচার হইবে, কেবল তাঁহাকেই জানাইব।...আর ভয় কি, কিসের আশঙ্কা?[৩৯]

এখানে লক্ষণীয় যে, রাজভক্তি ও রাজানুকূল্যের প্রশ্নে *হিতকরী* তার যুগকে অস্বীকার বা অতিক্রম করতে পারেনি। তাই পূর্বসূরী *গ্রামবার্ত্তা* কিংবা *অমৃতবাজার*-এর মতোই রাজদ্বারে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে সমস্যামোচনের প্রয়াসই অবলম্বন করেছিল *হিতকরী*।

হিতকরী পাক্ষিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও, দ্বিতীয় বর্ষে 'দাশাহিক' বা 'দাশহিক' হিসেবে (অর্থাৎ দশদিন পরপর) প্রকাশিত হতে থাকে। তৃতীয় বর্ষে *হিতকরী* মশাররফের কর্মস্থল টাঙ্গাইলে স্থানান্তরিত হয়। এই পর্যায়ে অন্তত এক বছর (১২৯৯) পত্রিকাটি চলেছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ মেলে। অনুমান করা চলে, মীরের টাঙ্গাইল-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই এই পর্বের সমাপ্তি ঘটে। এর সাত বছর পর মশাররফ পুনরায় *কোহিনুর*-সম্পাদক এস. কে. এম. মহম্মদ রওসন আলীর [রওশন আলী চৌধুরী] (১৮৭৪-১৯৩৩) সহযোগে *হিতকরী* প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং সে-সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এই যৌথ-উদ্যোগে পত্রিকা প্রকাশিত না হয়ে ১৩০৬ সালে চতুর্থ বর্ষের *হিতকরী* পাক্ষিক হিসেবে জ্যোতিপ্রসাদ সান্যালের সম্পাদনায় কুমারখালি থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার পঞ্চম বর্ষে *হিতকরী* ১৩০৭ সালের শেষভাগ পর্যন্ত যে প্রকাশিত হয় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এরপর *হিতকরী* প্রকাশের আর কোনো খবর মেলে না।

মশাররফ-পরিচালিত *হিতকরী*-র আদর্শ ছিল কাঙাল হরিনাথের *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*। *গ্রামবার্ত্তা*-র অনুসরণে *হিতকরী*-তে স্থানীয় সংবাদ, জাতীয় সংবাদ, বিবিধ সংবাদ, অভাব-অভিযোগ-সমস্যা-সম্বলিত চিঠিপত্র, সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও মন্তব্য, উপসম্পাদকীয়, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও কোনো কোনো সময়ে অস্বাক্ষরিত সাহিত্যধর্মী রচনাও প্রকাশিত হত। *হিতকরী*-তে প্রকাশিত এইসব নিবন্ধ বা সংবাদে সমস্যা-জর্জরিত গ্রামীণ সমাজের বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

টাঙ্গাইল সাহিত্যকুল হইতে প্রকাশিত।



বার্ষিক মূল্য বাক্সমেত
মাশুল ২৲ টাকা
নগদ মূল্য ৵১০ দুইপাই

পাক্ষিক পত্রিকা

[illegible] ভাগ। { সন ১২৯৮ সাল। ৩০শে আশ্বিন, [illegible] বার। ইং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ। ১৫ই অক্টোবর। } ১৮শ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপন।

[illegible]

মীরমশাররফ হোসেন
সাহিত্যকুল—টাঙ্গাইল

[illegible]

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

[illegible]

বিজ্ঞাপনক
সম্পাদক

[illegible]

মীর মশাররফ হোসেন-এর *হিতকরী*

হিতকরী-তে রায়ত-প্রজার সমস্যা-কষ্ট ও দুঃখ-দুর্দশার কথা গভীর সহানুভূতি ও আন্তরিকতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। 'বড়ই দুঃখের কথা' শিরোনামে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে প্রকৃতি-শাসিত শোষিত-দরিদ্র রায়ত-প্রজার অসহায় অবস্থার কথা জানা যায়। এই নিবন্ধে একদিকে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা এবং অপরদিকে জমিদার-মহাজনের নির্মম নিগ্রহের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে :

> দুইএকখানি গ্রাম নহে, জেলা নদীয়ার অনেক স্থানে বিশেষতঃ মহকুমা কুষ্টিয়ার অধীন কুমারখালী ভালুকার অন্তর্গত গ্রামসকল উৎসন্ন হইবার উপক্রম। আর কতকাল সহ্য হয়? বৎসরের পর বৎসর অতীত হয়, কৃষকেরা পর বৎসরের দিকে তাকাইয়া আশায় আশায় জীবনধারণ করে। গত পাঁচ বৎসর হইতে বর্ষার জলপ্লাবনে ধান্য ও ইক্ষু নষ্ট হইয়া যাওয়ায় কৃষকেরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। চাষার আর কি সম্বল আছে? কয়েকটী গোরু, সামান্য যোতজমা, স্ত্রীপুত্র ও তাহার শরীর একমাত্র সম্বল। এই শরীরের দিকে জমিদার, মহাজন, স্ত্রীপুত্র সকলেই স্বার্থযুক্ত নেত্রে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে; কিন্তু ইহার রক্ষার জন্য কয়জন? দরিদ্র কৃষক পাষাণহৃদয় মহাজনের পা ধরিয়া কাঁদাকাটি করিয়া খত দিয়া কয়েকটী টাকা কর্জ্জ লইল; তাহার কতক গরু কিনিতে, কতক খাজনা দিতে, কতক অত্যাচারীর সেবায় ব্যয় হইয়া গেল, দিন গুজরাইতে অতি অল্পই রহিল।...৪০

কৃষিজীবী গ্রামীণ মানুষের এই অনিশ্চিত জীবনযাত্রা আরো দুর্বিষহ হয়ে ওঠে 'জমিদার ও পুলিষের আবদার পিঠে সহ্য করিয়া'। এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরে *হিতকরী* উল্লেখ করেছে :

> যাঁহারা কুমারখালী অঞ্চলের জলপ্লাবন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারা একটু অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন, পদ্মার দক্ষিণ তীরে চিনিরগোলা মহেন্দ্রপুর প্রভৃতি নিম্নস্থান দিয়া জলপ্রবাহ প্রবলবেগে আষাঢ় মাসেই ক্ষেতে পতিত হইয়া শস্যাদি নষ্ট করিয়া ফেলে। ঐ সকল স্থানে বাঁধ দিলে আশু জলপ্লাবন নিবারণ হইতে পারে।...এই বাঁধের জন্য কতবার চীৎকার করা হইয়াছে, কেহই তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারি। তিনি এ দেশের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকারের হিতকামনায় বহুল অর্থ ব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু এই ভয়ানক শোচনীয় ব্যাপারটী কি তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই?৪১

প্রজার হিতসাধনে নির্লিপ্ত এই স্বনামধন্য জমিদারের প্রতি পত্রিকা অনুরোধ জানিয়েছে এই বলে যে, 'তিনি দরিদ্র প্রজাদের এই কষ্ট নিবারণ করিয়া অর্থের সার্থকতা ও নামের গৌরব রক্ষা করিবেন'। পাশাপাশি সরকারের দায়িত্বও স্মরণ করিয়ে দিয়ে পত্রিকা লিখেছে :

> ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড এই বাঁধ প্রস্তুত সম্বন্ধে মনোযোগী হইবেন, আমরা ইহা আশা করি... ।...আমরা সকলেই জলপ্লাবনের মধ্যে নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শন করিতেছি, পুস্তক রচনা ও খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিতেছি, অথচ কোন খবরই লইতেছি না, সুখে নিদ্রা যাইতেছি। কৃষকেরা কিন্তু অনশনে মরিতেছে। ...সেখানে একটু যত্ন করিলেই সহস্র লোকের জীবনোপায় হয় তাহাও আমরা অন্ততঃ মনুষ্যত্বের খাতিরে করিতে প্রস্তুত হইব না?৪২

ঝরা এবং খরা নিয়েই এ-দেশের কৃষকের জীবন এবং প্রায় ক্ষেত্রেই তা তাদের জন্যে বহন করে আনে অভিশাপ। বন্যায় ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে চাষির জীবনে নেমে আসে চরম দুঃখ-কষ্ট-হতাশা। উপরিউক্ত প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে কী জমিদার কী সরকার কারোরই কোনো চেতনা হয়নি। তাই পরের বছরও একই প্রসঙ্গে ক্ষোভ ও হতাশা নিয়ে *হিতকরী*-কে সম্পাদকীয় লিখতে হয় :

> ...সামান্য বর্ষাতেও কুমারখালীর অধীন চড়াইকোল, শিবরামপুর, বুজরুকবাকই, ভবানীপুর, পুঁঠিয়া প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রামের ধান্য বলিতে নাই, জলে ডুবিয়া গিয়াছে। এইসকল গ্রামের প্রধান ফসল

ধান ও কোষ্টা ; তাহা সমূলে নষ্ট। আর গরিব চাষাদের কি উপায় আছে?...প্রায় ১৫/১৬ খানি গ্রামের লোকের ভয়ানক অন্নকষ্ট। কেবল গোরুর দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া অর্দ্ধাশনে ও কখন অনশনে ইহারা জীবনযাপন করিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষগণ শুষ্ক ভূমিতে থাকিয়া কি ইহাদের তত্ত্ব লইবেন না? ...কোন সদাশয় ব্যক্তি ইহাদের হিতৈষী বন্ধু ও নেতা হইয়া প্রায় ১০০০৲ টাকা ব্যয়ে একটী খাল কাটিয়া দিলেই ইহাদের সকল অভাব দূর হইয়া এই সকল বিস্তীর্ণ প্রান্তরেব শস্য রক্ষা হইতে পারে। ...মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নড়াইলের জমিদার এইসকল গ্রামের মালিক। ইঁহারা ১০০০৲ টাকা দিতে পারেন না? প্রজাগণ ক্রমে দেশছাড়া হইতে চলিল, খাজানা আদায়ের কোনই সংস্থান নাই। ইহারা ভিক্ষা করিয়া খাজানা দিবে, এই কি জমিদারের ইচ্ছা? প্রজাগণ ছোটলাট বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়াছে। তাহাদের ক্রন্দন তাঁহার কর্ণে গিয়াছে কিনা জানি না।[৪৩]

হিতকরী জন্মলগ্ন থেকেই কৃষক-প্রজার স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এসেছে। আষাঢ় মাস এ-দেশের প্রকৃতি-নির্ভর কৃষকের বড় দুঃখ-কষ্টের কাল। আষাঢ় মাসে অতিবৃষ্টি-বর্ষা-বন্যায় কৃষিজীবী মানুষের জীবনযাপন দুরূহ হয়ে পড়ে। একদিকে ফসলহানি ও আবাদ-বুনানির সমস্যা, অপরদিকে মহাজনের ঋণ-প্রাপ্তির অনিশ্চয়তার ভেতর দিয়ে কৃষকের জীবন কাটে। তাই এই মাসে কৃষক-সম্প্রদায়ের পক্ষে খাজনা প্রদান অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে *হিতকরী* প্রস্তাব দিয়েছে :

লাটের খাজনা—চারি কিস্তিতে আদায় না হইয়া দুই কিস্তিতে আদায় হওয়ার একটা কথা উঠিয়াছে। যাহাই হউক, কিন্তু আষাঢ়ের কিস্তিটা বড়ই কষ্টকর। চারি ভাঙ্গিয়া দুই কি তিন হউক ক্ষতি নাই, আষাঢ় মাসের কিস্তিটা না থাকাই ভাল।[৪৪]

কখনো প্রচলিত নিয়ম বা আইনের ত্রুটি ও কুফল, আবার কখনো বা নতুন কোনো প্রস্তাব পত্রিকার মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে। যেমন 'শষ্যকর বা রাজস্ব' আরোপের সুপারিশ করা হয়েছে, কেন না 'শষ্যকরের ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলে রাজা ভূমির উৎকর্ষ সাধন ও শস্যোৎপাদনের উন্নতির দিকে লক্ষ্য না করিয়াই পারেন না ; না করিলে শস্যাভাবে তাঁহারই ক্ষতি—রাজ্যশাসন ও নিজ সুখসমৃদ্ধির ব্যয়ভার সংকুলানের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়'।[৪৫]

উনিশ শতকে নীলচাষের নামে রায়ত-প্রজার উপরে নীলকর সাহেবদের যে জুলুম-জবরদস্তি হত তার খণ্ডচিত্রও এখানে মেলে। নির্যাতিত কৃষক-প্রজা যে কখনো কখনো প্রতিবাদী হয়ে আইনের আশ্রয়ও গ্রহণ করেছে সে-খবরও দিয়েছে *হিতকরী* :

মিঃ সেরিফ সাহেবের কুঠী হইতে প্রজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোরপূর্ব্বক নীল সাট্ট গছান হয় বলিয়া কয়েকটী প্রজা কুষ্টিয়া ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ করে। আদালত মনি অর্ডার যোগে ঐ টাকা কুঠিয়ালগণকে ফেরত দিতে আদেশ করিয়াছেন।[৪৬]

হিতকরী জীবিকার প্রয়োজনে চাকুরির পরিবর্তে স্বাধীন বৃত্তিকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছে। বিশেষত কৃষিকর্মের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে এই পত্রিকায় বলা হয় :

এখন কি উপায়ে আমাদের স্বদেশবাসী সুখী হয়, কি উপায়ে তাহাদের জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, ইহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই চিন্তার বিষয়। আমাদের দারিদ্র্যের কারণ সাধারণের অনাস্থা। সাধারণ গৃহস্থের ছেলে যাই একটু লেখাপড়া শিখিতেছে, অমনি চাকুরী ২ করিয়া ঘুরিতেছে। কৃষিকার্য্যের উপর সামান্য লোকেরই মনোযোগ দেখা যায়। অশিক্ষিত কৃষক পুরাতন প্রণালী অনুসারে যাহা কিছু উৎপন্ন করিতেছে, তাহাতে দেশের অভাব দূর হইতেছে না। আমাদের দেশে যে জমি আছে, তাহাই যদি নূতন যন্ত্রাদি দ্বারা উৎকৃষ্ট প্রণালীতে চাস [চাষ] করা যায়, তাহা হইতেই প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। শিক্ষিত যুবকেরা এদিকে একটু মনোযোগ করিলেই দেশের এই প্রধান অভাবটী

> সহজেই দূর হইতে পারে। সকল বিষয়েই গবর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে সে জাতির কখনই উন্নতি হইবে না।...[৪৭]

কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি, গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণ, স্বাধীন পেশার মাধ্যমে আত্মমর্যাদার সঙ্গে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ উন্নত-আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের মধ্যেই নিহিত আছে বলে পত্রিকা মত প্রকাশ করেছে। এতে কৃষিকর্মের গুরুত্বের পাশাপাশি গ্রামমুখীন চিন্তা-চেতনারও পরিচয় মেলে।

সত্য-প্রকাশের ব্রতে নিষ্ঠ নির্ভীক সাংবাদিকতার আদর্শে বিশ্বাসী *হিতকরী*-র চলার পথ সুগম ছিল না। অনেক বিরুদ্ধতা ও বিরূপ সমালোচনা সহ্য করে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়েছে। অবশ্য রায়ত-প্রজার অভাব-অভিযোগ এবং প্রশাসনিক ত্রুটি-বিচ্যুতি-অব্যবস্থার কথা নির্ভীকভাবে প্রকাশ করে *হিতকরী* যথার্থ সামাজিক কর্তব্য পালন করেছে এমন প্রশংসা ও স্বীকৃতিও মিলেছে। 'জনৈক গ্রাহক'-এর পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে :

> ...হিতকরী ন্যায়ের পথ অবলম্বন করিয়া লোকসেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। অত্যাচারীর অত্যাচার কাহিনী, অন্যায়ের প্রতিবাদ, ন্যায়েব সমর্থন, স্বদেশবাসীর মঙ্গলচিন্তা, এই সকল বিষয়ই তো হিতকরীতে দেখিতে পাই।...কুষ্টিয়ার বড়ই সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, হিতকরীর মত একখানি উচ্চ ও উদার মনের পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া দেশের দুঃখকষ্টের কথা সাধারণ ও কর্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট জানাইতেছেন।[৪৮]

পাঠকের প্রতিক্রিয়ায় *হিতকরী*-র এই যে মূল্যায়ন, তা যথার্থ বলে বিবেচনা করা যায়।

পাঁচ

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, *অমৃতবাজার পত্রিকা* ও *হিতকরী* পত্রিকার তিন সম্পাদকেরই জন্ম গ্রামে। গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে তাঁদের যোগ ছিল নিবিড়। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার আজীবন গ্রামেই বাস করেছেন। কলকাতায় স্থায়িবাসের পূর্ব পর্যন্ত শিশিরকুমার ঘোষ জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় কাটিয়েছেন গ্রামে। মীর মশাররফ হোসেন সামান্য সময় ছাড়া গ্রাম আর ছোট মফস্‌সল শহরেই মূলত জীবনযাপন করেছেন। তাই গ্রামমনস্কতা ছিল এঁদের সহজাত--বলা চলে, অনেকটা তাঁদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। তাই অভিজ্ঞতার আলোকে সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে গ্রামীণ জীবনের অভাব-অভিযোগ-সমস্যার কথা পরম আন্তরিকতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। উনিশ শতকে প্রভাবসঞ্চারী গুরুত্বপূর্ণ গ্রামনির্ভর সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশে এঁরাই ছিলেন প্রধান পুরুষ, এঁদের হাত ধরেই গ্রামীণ সাংবাদিকতার যথার্থ যাত্রা শুরু, আর সাময়িকপত্রের মাধ্যমে গ্রাম-আবিষ্কারের মহৎ আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণও অনেকাংশে ঘটে এঁদের মাধ্যমেই।

ছয়

উনিশ শতকে মফস্‌সল ও গ্রামাঞ্চল থেকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের কিছু ঘোষিত নীতি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল--গ্রামমনস্কতা তারই অংশ। গ্রামীণ জীবন ও সমাজের কথা সেই উদ্দেশ্য-সংলগ্ন হয়েই প্রকাশিত হয়েছে। মফস্‌সল ও গ্রামীণ সংবাদপত্র তো এই অঙ্গীকার পালন করেইছে, এমন কী শহর-নগর থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার একটি বড় অংশের কাছেও গুরুত্ব ও মনোযোগ পেয়েছে বিষয়টি। দৃষ্টান্ত হিসেবে কলকাতার দুটি নামি কাগজ--

ঈশ্বর গুপ্তের *সংবাদ প্রভাকর* ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৪-১৮৬১) *হিন্দু পেট্রিয়ট*-এর কথা উল্লেখ করা যায়। উনিশ শতকে জাতীয়তাবোধ, স্বদেশানুরাগ ও লোককল্যাণ-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী গ্রামীণ সমাজের দুঃখ-দুর্দশা-সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল, কর্তব্যবোধের প্রেরণা আর অভিজ্ঞতার আলোকে। ফলে নীলকর-জমিদার-মহাজন-পুলিশ-রাজকর্মচারীর শোষণ-অত্যাচার, রায়ত-প্রজার অভাব-অভিযোগ, গ্রামোন্নয়নের সমস্যা-অন্তরায় ও তা উত্তরণের উপায়—এইসব বিষয় পত্রিকায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রয়াস নিষ্ফল হয়নি, কিছু প্রতিকার তো হয়েইছিল। রায়ত-প্রজার অভাব-অভিযোগের কথা সরকারের গোচরে এলে, প্রশাসনিক ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রজা-স্বার্থে কিছু কিছু আইনও প্রণীত হয়েছিল। ফলে নীলকরের নিগ্রহ কমেছিল, জমিদার-মহাজন সংযত হয়েছিল, গ্রামের মানুষের কিছু সমস্যা-দুর্দশা দূর হয়েছিল, গ্রামের উন্নতির জন্যে সীমিত ক্ষেত্রে হলেও কর্তৃপক্ষ সচেতন হয়ে উঠেছিল। এ-সব বিষয় বিবেচনায় এনে তাই বলা যায়, উনিশ শতকে গ্রামীণ সমাজের বিবর্তনে গ্রামনির্ভর সংবাদ-সাময়িকপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

তথ্যসূত্র

১. *হরিনাথ গ্রন্থাবলী*, ১ম ভাগ। কলিকাতা, ১৩০৮ ; পৃ. ৫।
২. জলধর সেন : 'হরিনাথ মজুমদার'। *দাসী*, জুন ১৮৯৬ ; পৃ. ৩১০।
৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : *হরিনাথ মজুমদার*। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', ৩য় খণ্ড। কলিকাতা, চ-স: বৈশাখ ১৩৬৮ : পৃ. ১৪।
৪. ঐ ; পৃ. ১৩।
৫. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* : বৈশাখ ১২৭০।
৬. আবুল আহসান চৌধুরী : *কাঙাল হরিনাথ মজুমদার*। ঢাকা, দ্বি-স : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ ; পৃ. ৩৬।
৭. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* : জানুয়ারি ২য় সপ্তাহ ১৮৭৩।
৮. ঐ ডিসেম্বর ২য় সপ্তাহ ১৮৭২
৯ ঐ ১ নভেম্বর ১৮৭৩।
১০. ঐ জানুয়ারি ১৮৭০।
১১. ঐ অগস্ট ৩য় সপ্তাহ ১৮৭২।
১২. ঐ জুন, ১ম সপ্তাহ ১৮৭২।
১৩. ঐ সেপ্টেম্বর ২য় পক্ষ ১৮৬৯।
১৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত ; পৃ. ২০।
১৫. *সাহিত্য* : বৈশাখ ১৩০৩ ; পৃ. ২৫
১৬. জলধর সেন : 'কাঙাল হরিনাথ'। *ভারতবর্ষ*, বৈশাখ ১৩৩৮ ; পৃ. ৭৮৩।
১৭. হেমাঙ্গ বিশ্বাস : *লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম*। কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ : পৃ. ৬৭-৬৮।
১৮. বিশ্বনাথ মজুমদার : 'কাঙাল হরিনাথ'। *কাঙাল হরিনাথের ৭৪তম বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব স্মারক-পত্র* : কলিকাতা, ৬ বৈশাখ ১৩৭৬ ; পৃ. ১।
১৯. *সাহিত্য* : পূর্বোক্ত ; পৃ. ২৫।

২০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত ; পৃ. ২১।
২১. ঐ : পৃ. ১৬।
২২. *সাহিত্য* : আষাঢ় ১৩২০ ; পৃ. ১৯৮।
২৩. জলধর সেন : *কাঙ্গাল হরিনাথ,* ১ম খণ্ড। কলিকাতা, আশ্বিন ১৩২০ ; পৃ. ১২।
২৪. *হিতকরী* : ২৬ আগস্ট ১৮৯১ ; পৃ. ১০৮।
২৫. মুনতাসীর মামুন : *উনিশ শতকে পূর্ববাংলার সংবাদ-সাময়িকপত্র*। কলিকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৭ ; পৃ. ৫০।
২৬. অমর দত্ত : *অমৃতবাজার পত্রিকা ও অন্যান্য*। কলিকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ; পৃ. ২।
২৭. *অমৃতবাজার পত্রিকা* : ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮।
২৮. ঐ : ৩১ ডিসেম্বর ১৮৬৮।
২৯. ঐ : ১৪ এপ্রিল ১৮৭০।
৩০. ঐ : ২৮ এপ্রিল ১৮৭০।
৩১. ঐ : ৭ এপ্রিল ১৮৭০।
৩২. ঐ : ২৩ জুলাই ১৮৬৮।
৩৩. ঐ : ৮ জুলাই ১৮৬৯।
৩৪. ঐ : ৩ ডিসেম্বর ১৮৬৮।
৩৫. ঐ : ২৮ মে ১৮৬৮।
৩৬. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* : জুলাই ৩য় সপ্তাহ ১৮৭৩।
৩৭. মীর মশাররফ হোসেন : *আমার জীবনী*। দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৩৮৪ ; পৃ. ২৩৬-৩৭।
৩৮. *হিতকরী* : ১৫ বৈশাখ ১২৯৭।
৩৯. ঐ : ১০ বৈশাখ ১২৯৮।
৪০. ঐ : ৩০ আষাঢ় ১২৯৭।
৪১. ঐ : ঐ।
৪২. ঐ : ঐ।
৪৩. ঐ : ২০ ভাদ্র ১২৯৮।
৪৪. ঐ : ১০ পৌষ ১২৯৮।
৪৫. ঐ : ৩০ আষাঢ় ১২৯৮।
৪৬. ঐ : ১০ আষাঢ় ১২৯৮।
৪৭. ঐ : ২০ বৈশাখ ১২৯৮।
৪৮. ঐ : ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮।

মু স্ত ফা নূ র উ ল ই স লা ম

সাময়িকপত্র সাধনায় বাঙালি মুসলমান : প্রথম পর্ব

প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয়—বাংলা ভাষায় সাময়িকপত্র সাধনার কর্মকাণ্ডে বাঙালি মুসলমানের উদ্যোগ-সম্পৃক্ততা : প্রথম পর্ব। এই কালপর্ব সূচনাবধি প্রধানত উনিশ শতক জুড়েই সম্প্রসারিত, এবং ক্ষেত্রবিশেষে কিছুটা কুড়ির শতকেও পড়েছে। এখন ভূমিকাতে নিবেদন, বর্তমান আলোচনা-পরিধিতে উক্ত কর্মকাণ্ডের যথাসম্ভব পরিচিতি প্রদানের এবং তৎসহ চরিত্ররূপ চিহ্নিতকরণের প্রয়াস পাওয়া যাবে। তবে পূর্বাহ্নেই জানিয়ে রাখবার যে, এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে সমধিক। যথা—মুখ্যত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীর অভাব। সেই অতীতে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার ফাইল প্রায়শ রক্ষিত হয়নি। মনে হয়, সচেতনতাও সম্ভবত অনেকের তেমন ছিল না। এর দরুন পরবর্তী সময়ে সন্ধানের স্বার্থে বিকল্প উৎসের সহায়তা ব্যতীত উপায়ান্তর পাওয়া যায় না। অতএব অন্যত্র উল্লেখিত ও উদ্ধৃত প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ থেকে যথা প্রয়োজন উপকরণাদি সংগ্রহ করতে হয়েছে। এবং সেই পন্থায় পূর্বোক্ত মোতাবেক সাময়িকপত্রের ইতিকথা উদ্ধার-সংকলনের যতটা আয়াস।

স্বতঃ হেতুতেই এইখানে তাৎক্ষণিক কতিপয় জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হয় : *ক.* সাময়িকপত্র-প্রকাশনার কর্মকাণ্ড কেন অমন চিহ্নিত করে 'মুসলমান' অভিধায় আখ্যাত করা? তাহলে কি পাশাপাশি অমন আরো তো সব রয়েছে 'হিন্দু', 'খ্রিস্টান', 'ব্রাহ্ম' বিশেষিত আলাদা আলাদা চরিত্র? *খ.* এমত উদ্যোগ কি আয়োজকদের কারও কারও তরফে কি নিছকই সখজাত 'পত্রিকা-প্রকাশনা'র শৌখিনতা? কিংবা আসলে *গ.* কনভিকশন-চেতন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাদর্শের প্রেরণায় এই প্রকারের কর্ম? কিংবা *ঘ.* সমাজে-রাজনীতিতে-ধর্মপরিমণ্ডলে নেতৃত্ব অর্জনের অভিলাষীদের প্রভাব-বলয় বিস্তারের তাগিদ? অপরপক্ষে *ঙ.* কার্যকারণ হেতুর গোড়াতে কাজ করে গেছে সমাজ-বাস্তবতার আর সামাজিক নানাবিধ টানাপোড়েনের দ্বন্দ্ব সংঘাত? আগ্রহী অনুসন্ধিৎসুজনের জন্যে এই মতো অবতরণিকা আভাসিত করা গেল। আপাতত ঔৎসুক্য গুরুত্বের দিক থেকে *'ক'* শীর্ষক প্রশ্নটি প্রাথমিক বিবেচনায় আনা যাক।

বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাস পাঠ থেকে জানা যায় যে, যাত্রা শুরুতে তো বটেই, এবং পরবর্তী দীর্ঘ কালাবধি ধর্ম প্রচারোদ্দেশ্যে / ধর্ম কলহ-বিতর্কে আমাদের পত্রপত্রিকার প্রকাশনা, বিকাশ। উদ্যোক্তা প্রমুখ জন অবশ্য সচেতন ছিলেন, লক্ষ্য-অর্জনে জনমত সংগঠনের কার্যকর ভূমিকা কেমন শক্তিশালী। অতএব এক্ষেত্রে স্বভাবতই বাহন সাময়িক পত্রের মুদ্রণ-প্রকাশনা।

ইতোমধ্যে হুগলি শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস স্থাপিত হয়ে গেছে। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে, ১৮১৮ নাগাদ খ্রিস্টান মিশনারিদের আয়োজনে মাসিকপত্র *দিগ্‌দর্শন,* সাপ্তাহিক পত্রিকা

সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হচ্ছে। অপর দিকে সনাতনী হিন্দুত্ব গোঁড়ামির প্রতিরোধে সংস্কারপন্থী রাজা রামমোহন রায় ১৮২১-এ বার করেন *ব্রাহ্মণ সেবধি*, এবং একই বছরে তাঁর *সম্বাদ কৌমুদী*। অবশ্য পিছিয়ে থাকেননি হিন্দু রক্ষণশীল পাণ্ডা গোষ্ঠীও। রামমোহনের 'সতীদাহ-নিবারণ'-এর সর্বাত্মক বিরোধিতায় এককাট্টা জোট বেঁধেছিলেন তাঁরা। পরপরই তাঁদের মুখপত্র *সমাচার চন্দ্রিকা* (১৮২২), সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। লক্ষ করবার যে, ছড়িয়ে পড়ছে খ্রিস্টান-হিন্দু-ব্রাহ্ম এই ত্রিমুখী ধর্ম দ্বন্দ্ব-দ্বেষিতা। ক্রমে উত্তরণ ঘটে ব্রাহ্মবাদীদের *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় (১৮৪৩) ; পৃষ্ঠপোষক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত। এইটে বাইরের এক বিশেষ চেহারা। ধর্মীয় বিশ্বাসকেন্দ্রিক জনমত সংগঠিত হচ্ছে। আর সেই জনমতের ধারক-বাহক সাময়িকপত্র।

সমান্তরালে অপরদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য কর্মকেন্দ্র নগর কলকাতা অবয়ব নিচ্ছে, ইংরেজি-মাধ্যম শিক্ষার প্রসার ঘটছে, নাগরিক নতুন এক মধ্যবিত্ত সমাজ ক্রম-বিকশিত হচ্ছে, এবং পাশ্চাত্য প্রভাবে রেনেসাঁস আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগছে বিদ্রোহী 'ইয়ং বেঙ্গল' তারুণ্যের মানসে, আচরণে। ডিরোজিও থেকে মাইকেল মধুসূদনের মানসে-কর্মে আলোড়নের প্রতিফলন।

অনুসন্ধানের যে, ভাঙাগড়ার এমন ক্রান্তিকালে কোথায় তখন প্রতিবেশী বাঙালি মুসলমানের অবস্থান? সমগ্র দেশ জুড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ কয়েক কোটির ঘরে তারা ; সর্বার্থেই গ্রামীণ এবং পেশায় প্রধানত কৃষিনির্ভর। কাল সচেতনতা, নতুন শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদি তাবৎ ক্ষেত্রেই তারা পশ্চাদ্‌পদ, নতুন আলোকের সন্ধান মাত্র পায়নি। বলা যেতে পারে, জড়-স্থবির বিশাল এই জনগোষ্ঠী। উপরিবর্ণিত অবকাঠামোতে যখন বাংলার মুসলমান সমাজের ঠাঁই ঠিকানা, অনুসন্ধিৎসা স্বাভাবিক যে এমনতর পটভূমিতে সাময়িকপত্র পত্রিকা প্রকাশনার উদ্যোগ সম্ভব কী প্রকারে? তথাপি, বিস্ময়কর হলেও 'সংবাদ'—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সাড়া-জাগানো সাপ্তাহিকী *সংবাদ প্রভাকর* প্রকাশের (২৮ জানুয়ারি, ১৮৩১) মাত্র মাস দুয়েকের ব্যবধানে বেরিয়েছে কলকাতা, কলিঙ্গা থেকে শেখ আলিমুল্লাহর সাপ্তাহিক *সমাচার সভারাজেন্দ্র* (৭ মার্চ, ১৮৩১)। বাঙালি মুসলমানের উদ্যোগে প্রথম প্রকাশিত সংবাদ সাময়িকী। তবে মনে হয় যে, তা এই পর্যন্তই ; নিতান্তই সমাচার মুদ্রণ ব্যতীত পত্রিকাটির তেমন কোনো মৌলিক উদ্দেশ্য কিংবা তাগিদ পরিলক্ষিত হয় না। বিশেষ করে মুসলমান সমাজকথা একেবারে অনুপস্থিত। সমকালীন *সমাচার চন্দ্রিকায়* মন্তব্য করা হচ্ছে, 'প্রথম সংখ্যা দৃষ্টি করিয়াছি তাহাতে তৎপ্রকাশকের প্রতিজ্ঞা বা অভিপ্রায় কিছুই ব্যক্ত হয় নাই কেবল কয়েকটি সম্বাদ...।' সরকার প্রদত্ত লাইসেন্সেও উল্লেখ রয়েছে 'News Paper'। তথাপি পত্রিকাটির যদি বা কোনো দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, বরঞ্চ তা তখনকার হিন্দু গোঁড়া রক্ষণশীলতার সমর্থনকসূচক ছিল। এই ধারার প্রতিনিধি স্থানীয় পূর্বোক্ত ওই *সমাচার চন্দ্রিকা* এবং *তিমিরনাশক* ইত্যাদিতে শেখ আলিমুল্লাহর *সমাচার সভারাজেন্দ্র* প্রসঙ্গে প্রশংসা করা হয়েছে। একই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানাচ্ছেন যে, 'সমাচার সভারাজেন্দ্র সম্পাদক প্রাচীনপন্থী ছিলেন।' এমত হেতু পত্রিকাটি বরং রক্ষণশীল হিন্দু পাঠক মহলে কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। (—*সমাচার দর্পণ*, ২১ জানুয়ারি, ১৮৩২)। ধারণা স্বাভাবিক যে, বিক্রয় সংখ্যা বৃদ্ধিই ছিল এই পত্রিকা প্রকাশনার আসল উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে বিশেষ

আরেক উল্লেখের যে, এটির প্রকাশনা ছিল বাংলা-ফার্সি দ্বিভাষিক। জানা রয়েছে, তৎকালে নগরবাসী শিক্ষিত সমাজ ফার্সি পাঠে, অনুধাবনে অভ্যস্থ ছিলেন। অতএব বাজার-কাট্‌তির স্বার্থেই ওই মতো দ্বিভাষিক *সমাচার সভারাজেন্দ্র*। অতঃপর কালানুক্রমিক ইতিহাসে সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে মৌলভী ফরিদুদ্দীন খাঁ সম্পাদিত সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী জগদুদ্দীপক ভাস্কর'। অনুষ্ঠান পত্রের ঘোষণা অনুযায়ী পত্রিকাটি বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, ফার্সি এবং উর্দু বা হিন্দুস্থানী এই পাঁচটি ভাষায় প্রকাশিত। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১১ জুন, ১৮৪৬। ঠিকানা পূর্বতন *সমাচার সভারাজেন্দ্র*-র মতোই কলকাতার অপর এক মুসলমান-অধ্যুষিত এলাকা বৈঠকখানা রোড। পঞ্চভাষিক পত্রিকা প্রকাশনা, অনন্য ব্যতিক্রমী অতীব সাহসিক এক কাণ্ড বটে এবং অবশ্য যেন অবধারিত পরিণতি—এটি নেহাতই স্বল্পায়ু ; যতটা জানা যায় দ্বিতীয় সংখ্যার পর আর প্রকাশিত হয়নি। সে যাই হোক, পত্রিকাটি তৎকালীন অন্যান্য পত্রপত্রিকার মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিল। সে কালের *সম্বাদ ভাস্কর, Calcutta Review, Friend of India* ইত্যাদিতে *জগদুদ্দীপক ভাস্কর* বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। ধারণা করি, ইতোপূর্বে যে বলা গেছে অনন্য এক সাহসিক কর্ম সাধন, *Calcutta Review*-তে স্পষ্টতই এমন ভাষায় জানিয়ে দেওয়া '...In this respect the project is as it appears to indicate the existence of a daring adventerous and enterprising spirit, the projector is entitled to all the credit which belongs to a new claimant for renown...' (1846, No. X–Vol. V).

প্রসঙ্গত জেনে রাখবার যে, যদিচ শতাব্দীর প্রথম দিককার কালপর্বেই বাঙালি মুসলমানকে সাময়িকপত্র প্রকাশনা-উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত দেখা যায়, এই কর্মে কিন্তু ক্রম-অনুসৃতি তেমন রক্ষিত হয়নি। কেন এমন, সে সম্পর্কে ইতোপূর্বে কিছুটা আলোকপাত করা গেছে। এবং সংখ্যা গণনায় সামান্যতমমাত্র সন্ধান যা পাওয়া যায়, তা বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের অধিক নয়। আবার কী অবাক-করা কাণ্ড, ওই আমলে মহানগরী কলকাতার বাইরে দূর মফস্‌সল ফরিদপুর থেকে মুসলমান সম্পাদিত সাপ্তাহিকী বেরোচ্ছে—এমন মর্মে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। সন ১৮৬১, নাম *ফরিদপুর দর্পণ*, সম্পাদক শ্রী আলাহেদাদ খাঁ। অমন আর একটি মানিকগঞ্জের অন্তঃপাতী কোনো এক মহকুমা গ্রাম পারিল থেকে—মৌলভী আনিছুউদ্দীন আহমদের সম্পাদনায় পাক্ষিক সাময়িকী *পারিল বার্ত্তাবহ*। প্রকাশকাল ১৮৭৪ (পৌষ, ১২৮১)। পত্রিকাটি খুব বেশিদিন টেকেনি।

এ পর্যন্ত যতটা যা সংগ্রহ করা গেছে কমবেশি সেই সমুদয় তথ্য অবলম্বনে একটি বিবরণী-কাঠামো মতো দাঁড় করানো গেল। তা থেকে জানা যাচ্ছে যে, বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশনায়-সম্পাদনায় যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন নাম পরিচিতিতে তাঁরা মুসলমান বটে, তবে তাঁদের পত্রিকার মৌল চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। প্রশ্নটা হচ্ছে—যদর্থে খ্রিস্টান মিশনারিদের *দিগ্‌দর্শন, সমাচার দর্পণ*, আর রামমোহনের *ব্রাহ্মনিকাল ম্যাগাজিন* ও *ব্রাহ্মণ সেবধি*, আবার রক্ষণশীল হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী ভবানীচরণের *সমাচার চন্দ্রিকা*, এবং আরও পরে অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা, সমকালে মুসলমানদের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ কি?

শতকের সপ্তম দশকের প্রারম্ভ পর্যন্ত অনুরূপ কর্মকাণ্ডের সাক্ষী তেমন পাই না। এদিকে

ইতিহাস পাঠে জানছি, এই উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই ওহাবী-ফারায়েজী বিক্ষোভ আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে গ্রাম্‌ বাংলার মুসলমান প্রধান অঞ্চল সমূহে--মধ্যবঙ্গে, উত্তরবঙ্গে। উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে আগত মওলানা-মাশায়েখ এঁরা ওয়াজ করতেন : ইংরাজ রাজশক্তি খ্রিস্টান বিধায় 'নাছারা'। অতএব এই শক্তির অধীনে শাসিত এদেশ কদাপি দারুল ইসলাম নয়, আদপেই 'দারুল হর্‌ব'। তবে বলা বাহুল্য যে, ঐ সব ওয়াজ-প্রচারণার আগাগোড়া সবটাই ছিল পেছুটান, মধ্যযুগীয় গোঁড়ামি-অন্ধত্বে আচ্ছন্ন। এতদ্দরুন এবং ইতোপূর্বে যেমনটা নির্দেশিত করা গেছে নানাবিধ সীমাবদ্ধতা হেতু নাগরিক বাঙালি মুসলিম সমাজ 'হয়ে-ওঠা'র সহায়ক অবকাশ তেমন পায়নি। অতএব পুনরায় বিবেচনাতে আনতে চাইছি,—কেন না ধর্মীয় আবরণে হলেও সেকালে ঐ পটভূমিতে মুসলমান তরফে সাময়িক পত্রপত্রিকা প্রকাশনা কর্মকাণ্ডে সচেতন ব্যাপক উদ্যোগ।

তবে এইখানে এই ব্যাপারটা অবশ্য করেই লক্ষ করবার যে, প্রথম ওই পালায় মুসলমান উদ্যোগে প্রকাশিত সাময়িকপত্র তিনটির নামকরণ কিন্তু সংস্কৃত-ঘেঁষা এবং সম্পূর্ণতই তৎসম শব্দ জাত। মোটে নয় তথাকথিত 'মুসলমানত্বে'রই পরিচায়ক।

দুই

এখন মূল ধারার প্রসঙ্গ। অর্থাৎ সচেতন প্রয়াসে বাংলা সাময়িক পত্রপত্রিকা প্রকাশনার ধারাবাহিক কর্মকাণ্ড। ইতোমধ্যে প্রধানতই আর্থ-সামাজিক হেতুতে, পেশার টানে মফস্‌সল অঞ্চল থেকে গ্রাম-কৃষি নির্ভর মুসলমানদের কারও কারও রাজধানী নগরী কলকাতায় আগমন, এইখানে ক্রমে বাসা বাঁধা। এতদ্‌সহ নতুনের প্রতি আকর্ষণ ঔৎসুক্য-অনুসন্ধিৎসা বাড়ছে, চক্ষু কর্ণ উন্মোচিত হচ্ছে।

তবে লক্ষ করবার যে, ইতিহাসের পালাবদলের এই বর্তমানে এখনো নয় কিন্তু দেশজ পটভূমিতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। বলবার যে, যেন কাকতালীয় খোঁজই বটে। শতাব্দীর শেষ পাদে ১৮৭৭-এ কোথায় কোন্ সুদূরে মুসলিম বিশ্বের ঘটনা--তুরস্কের বিরুদ্ধে রুশ অভিযান। এবং এদিকে এর মাত্র মাস দুয়েকের মধ্যেই প্রকৃতার্থে যাত্রা শুরু হয়ে যাচ্ছে ; কলকাতা থেকে বেরোচ্ছে বাংলা-উর্দু দ্বিভাষিক অর্ধ সাপ্তাহিকী (পরে সাপ্তাহিক) *মহাম্মদি আখবার* (৪ঠা জুন, ১৮৭৭)। কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা বিশেষ পাঠক শ্রেণীর জন্যে পত্রিকার বাংলা অংশটি প্রভূত সংখ্যায় আরবি, ফার্সি, উর্দু শব্দাবলী সংমিশ্রিত। জিজ্ঞাস্য, মৌলভী আবদুল খালেকের সম্পাদনায় এই পত্রিকার প্রকাশনার তাগিদটা কোথায়? অনুধাবন করে নেব, গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে--সম্পাদক এমন এক মিশ্রিত ভাষায় আকুল আবেদন জানাচ্ছেন : "ভাইগণ: রাশিয়া লালচ ও আদাওতের সববে রুমের পরে চড়াই করিয়াছে। কারণ এই যে, বায়তুল মকদ্দছ, মদিনা ও কারবালা হাত করিয়া মোসলমানদের ইমানের হানি করে। তুর্কি মোসলমানেরা ইমানকে জান্ অপেক্ষা অধিক জানে : এই বিপদ টালিবার জন্য জোরু, লাড়্‌কা, জান্ মাল শুদ্দা খোদার রাহে দিতে আছে। দেখো হাজারও আওরাতকে বেওয়া ও ছোট ছোট বালকদের এতিম ছাড়িয়া শহিদ হইতেছে।" এমত দুঃসময়ে অতএব '...ঐ বেওয়াদের জন্য ও এতিমদের অবস্থার খেয়াল কর, আর আপন আপন মকদুর মত তাহাদের খবর লহ। তাহাদের খবর নিতে টাকা পাঠাও। দেখো সওয়ার সস্তায় বিকাইতেছে। কিনে

লহ।' এর পরপরই আশির দশকের গোড়াতে প্যান ইসলামবাদের বিশ্ববিশ্রুত প্রবক্তা জামালউদ্দীন আফগানীর কলকাতা সফর। তাঁর এ সফর নব্যশিক্ষিত মুসলমান নাগরিকদেরকে ব্যাপক উদ্বোধিত এবং গভীরে প্রাণিত করেছিল। তাঁদের ঔৎসুক্য, আগ্রহ মনোযোগ আকর্ষণ করছে মুসলিম মধ্য প্রাচ্য। পরবর্তী আরেকটি ঘটনা ১৮৯৭-তে গ্রিক-তুর্কি যুদ্ধ। উন্মেষ-উন্মুখ বাঙালি মুসলিম মানসে ক্রমে নতুনতর মাত্রিকতার যোজনা ঘটাচ্ছে। এইভাবে কুড়ি দশকের কাল ব্যবধানে বহির্বিশ্বে মুসলমান প্রধান দেশাঞ্চল এদেশে মুসলমানত্বের চেতনার বিকাশে বেশ খানিকটা সক্রিয় ভূমিকায় কাজ করে গেছে। এবং তদ্দরুন স্বভাবতই সমাজে জনমত সংগঠনে দানা বাঁধছে, আর তার প্রভাব এসে পড়ছে সাময়িক পত্রপত্রাদি প্রকাশনার উদ্যোগে। এমন অভিধায় চিহ্নিত করে নেওয়া যেতে পারে, এইটে স্বধর্ম-বোধচেতনার এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ। তবু দূর বহির্বিশ্বের ব্যাপার কাণ্ড স্বদেশের সাধারণ্যে কতটা আর স্পর্শ করে? এই হেতুতেই গভীরে আসলের সন্ধান। জবাবে দেখছি ;—ওই একই ইতিহাসের আবর্তন ; যা কিনা একদা হিন্দু-ব্রাহ্ম-খ্রিস্টান ধর্ম কলহে-পারস্পরিক দ্বন্দ্বে এই দেশে সাময়িক পত্রপত্রিকার প্রকাশনার উদ্‌গম এবং বিস্তার ঘটিয়েছিল। প্রসঙ্গত স্মরণ করব, উনিশ শতকের শেষ পাদে অনুরূপ প্রায় একই প্রকারের তাড়নাতে বাঙালি মুসলমানের ক্ষেত্রেও সাময়িকপত্র সাধনায় যতসব উদ্যোগ-আয়োজনের বহমানতা।

সেই কালের দেশজ পটভূমি। ইতোমধ্যে খ্রিস্টান মিশনারিদের পরিকল্পিত প্রয়াসে পশ্চিম এবং মধ্য বাংলার মুসলমান সাধারণ্যের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্মমতের প্রসার ঘটানো হচ্ছে। অপরদিকে পূর্বাবধি দেশের কোথাও কোথাও হিন্দু সামাজিক ও ধর্মীয় আচার সংস্কারেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এমত পরিস্থিতি রুখতে প্রতিক্রিয়ায় ইসলামের 'মুসলমানত্বে'র বিশুদ্ধতা রক্ষার আন্দোলন তদবধি জোরদার হয়ে ওঠে। এঁদের দিক থেকে ফরজতুল্য তাগিদ—ইসলামের মহিমা কীর্তন, ইসলামের অতীত গৌরবকথার প্রচার। স্বভাবতই দায়িত্ব এসে বর্তায় সমাজ-প্রধান, ধর্মীয় নেতা প্রমুখ জনের ওপরে। অতএব স্থানে স্থানে মহফিলের আয়োজন, আঞ্জুমান সমিতি ইত্যাদি সংগঠিত করা। এবং তৎসহ আসছে সাময়িক পত্রপত্রিকার প্রকাশনা-উদ্যোগ। এই সমস্ত গোড়াতে তাহলে ওই একই ধরনের প্রেরণা—নবলব্ধ স্বধর্মচেতনার উদ্বোধন।

প্রথমত এই যাত্রারম্ভের ১৮৭৭ থেকে পরবর্তী বেশ কিছু কাল পর্যন্ত প্রকাশিত সাময়িক পত্রসমূহের কেবল নামকরণই যদি বিবেচনায় আনা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষণীয় যে, সেগুলি 'ইসলাম' 'মুসলিম' বিশেষ এই দু'টি পরিচায়ক বিশেষণে ব্যঞ্জিত। এতদ্‌প্রসঙ্গে এ পর্বে প্রথমটাই তো *মহাম্মদি আখবার*। পরে পরে যেন ঝাঁক বেঁধে আসছে *আখবারে এসলামীয়া, ইসলাম. মুসলমান-বন্ধু, আহমদী, ইসলাম-প্রচারক* ইত্যাদি। ধারাবাহিকতায় আরও, যথা— *শরিয়ত. হাদিস, মসজেদ, তবলীগ, মোয়াজ্জিম, ইমান, হেদায়েত* ইত্যাদি ধরনের ধর্মীয় দ্যোতনা-বাহিত নাম-পরিচিতি।

উদ্যোক্তা, পৃষ্ঠপোষক, সম্পাদক, প্রকাশক, সংশ্লিষ্ট লেখকগোষ্ঠী অবশ্য তাঁরা সচেতন—কেন তাঁদের সাময়িকপত্র সাধনার কর্মকাণ্ড। উল্লেখ বাহুল্য, এই কর্মে নিশ্চিত লক্ষ্যাদর্শ হচ্ছে '*সম্মোহিত,* পশ্চাদ্‌পদ মুসলমান সমাজের জাগরণ। সময়ের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি অগ্রসর হয়ে যাওয়া।' যেমন *ইসলাম-প্রচারক* (১৮৯১) স্পষ্টত জানিয়ে দিচ্ছে এটি "মুসলমানদিগের

ধৰ্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ক মাসিক পত্রিকা"। 'সম্পাদকীয়তে বলা হচ্ছে', 'ইসলাম প্রচারক যাহাতে প্রকৃত ইসলাম-প্রচারকের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে তৎসম্বন্ধে যত্ন চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।' আর সমকালীন *হাফেজ* (১৮৯৭)-এর উদ্দেশ্য—'হাফেজ সেই ভোগবিলাস-সুখাভিলাষী নিদ্রিত বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে তাঁহাদের পূর্বপুরুষদিগের অতীত গৌরব ও ধৰ্ম্মতত্ত্বকাহিনী এবং পবিত্র ধর্ম্মের পবিত্র রীতিনীতি শুনাইয়া জাগরিত করিবার জন্য' তাঁদের প্রকাশনা। অমন আরেকটি *নূর-অল-ইমান* (১৯০০), জানানো হচ্ছে 'এসলামী পত্রিকা'। পত্রিকাটি শুধুই যে কেবল 'ধৰ্ম্মবিষয়ক', তা অবশ্য নয়। সেই সাথে বলা হয়েছে 'মুসলিম সাহিত্য' সৃষ্টি। এদিকে *নবনূর* পত্রিকার (১৯০৩) সম্পাদকীয় নিবেদনে রয়েছে, 'আমরা দেখিতেছি, মুসলমানগণ সকল বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের জাতীয় জীবনে অবসাদই যেন একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ...পতিত মুসলমানকে উন্নত করিবার, উদ্ধার করিবার, একমাত্র অবলম্বন সাহিত্য।' এবং *বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*'র (১৯১৮) মতে এই সাহিত্য 'জাতীয় সাহিত্য' তথা 'মুসলিম' সাহিত্য। দেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠী, মুখ্যত গ্রামীণ, কৃষি-উৎপাদন নির্ভর, এবং তৃণমূল পর্যায়ের—ধর্মীয় আচারে-বিশ্বাসে মুসলমান, বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এই সমাজ এতাবৎ কাল অনুপস্থিত। এদের জীবনকথা নিয়ে সাহিত্য রচনা ; গুরুত্বটা আরোপ করা হয়েছে এইখানে।

এখন বিশেষ করেই জানান দেওয়ার যে, এই কালপর্বে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বর্ণনায় ক্বচিৎ সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের সাক্ষাৎ মেলে। কলকাতায় মুসলমান শিক্ষিত মহলে জামালউদ্দীন আফগানীর আকর্ষণ যখন তুঙ্গে, তা কিন্তু প্রতিবেশী এই দুই সমাজের পারস্পরিক সৌহার্দ্যে কোনই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি। বরং প্রসঙ্গত লক্ষ করছি, সেই সময়ে মুন্সি গোলাম কাদের, সম্পাদিত সাময়িকপত্র বেরিয়েছে, নামকরণটি কিন্তু অমন সুস্পষ্ট করেই *হিন্দু-মোসলমান সম্মিলনী* (১৮৮৭)। আবার অপরপক্ষে *ইসলাম-প্রচারক, আল্-এস্লাম, শরিয়তে এসলাম* ইত্যাদির মতো সর্বতোভাবেই যে 'ধর্ম বিষয়ক' পত্রিকা, এই গুলিও উচ্চকণ্ঠে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণী প্রচার করে গেছে। মিলিয়ে নেব, ১৯০৪-এ (মাঘ, ১৩১১) *ইসলাম-প্রচারক* কী লিখছে--'বিধাতার ইচ্ছাক্রমে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান বৰ্ত্তমান সময়েই একই স্বভূমে আবদ্ধ, একই সূত্রে গ্রথিত এবং একই নিয়মে শাসিত ও পরিচালিত। ফলতঃ হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে এক্ষণে ভারতমাতার দুই সন্তানের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। একই মাতার দুই সন্তানের মধ্যে বন্ধুত্বই বাঞ্ছনীয়, দুই ভ্রাতার মধ্যে সৌহার্দ্য সংস্থাপিত থাকাই সকলের অভিপ্রেত। ইহাতে পরস্পরের মহা উপকার,—তথা ভারতমাতারও বহু মঙ্গল সাধিত হয়।' বিবেচনাতে রাখছি, রাজনৈতিক পটভূমিতে এর পরের বছরেই লর্ড কার্জনের 'বঙ্গভঙ্গ'। এবং প্রায় দশক কাল ব্যবধানে ধর্মগত ফারাক ছাড়িয়ে গিয়ে *আল্-এস্লাম* ডাক দিচ্ছে--'তুমি হিন্দু, আমি মুসলমান, তোমার এক ধৰ্ম্ম, আমার এক ধৰ্ম্ম, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? তোমায় আমায় কি বন্ধুত্ব হইতে পারে না? তুমি আমি কি ভাই ভাই হইয়া কৰ্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারি না?...আমরাও বলি, আমরা একই মায়ের সন্তান।' (অগ্রহায়ণ, ১৩২৩, ১৯১৬)। ইতিহাস সাক্ষ্য, যদবধি সাম্প্রদায়িক ভুল বোঝাবুঝি, দ্বন্দ্ব, এবং পরিণামে সংকট বিপর্যয় যত যা কিছু, আসলে সেই সব পাকিয়ে তুলছিল রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী জোট এবং ধর্মান্ধ নেতৃবর্গ, ফিকির-সন্ধানী সমাজ-মাতব্বর গোষ্ঠী।

তিন

নির্দেশিত করা গেছে--বাঙালি মুসলমানের 'স্বধর্মচেতনা'র উন্মেষ। জানা রয়েছে, এই কর্ম সাধনে এক পক্ষে ওহাবী মওলানাদের ব্যাপক নসিহতের কথা। ধর্মবিশ্বাসী সরল প্রাণ বহু সংখ্যক গ্রামীণ মুসলমানের মধ্যে এমন বিষয় তাগিদের প্রসার ঘটানো হয়েছিল--এদেশ যেহেতু 'দারুল হর্‌ব্‌' অতএব চিরতরে দেশত্যাগ করে হিজরত্‌ কর পশ্চিম মুখে মুসলিম দেশ আফগানিস্থান-ইরান-তুরান-আরব-তাতার-রুমে। তাতে আখেরে অশেষ সওয়াব। ওহাবী প্রচারণার আছরে তৎকালে কার্যত অনেকটাই তেমন হয়েছিল। বাঙালি মুসলমানের 'ওয়াতান' মাতৃভূমির ঠিকানা আদপে কোথায়--মস্ত হয়ে এসেছিল এইমতো জিজ্ঞাসার চ্যালেঞ্জ। ওদিকে কলকাতায় শিক্ষিত নাগরিক মুসলিম মানসে জামালউদ্দীন আফগানীর প্রভাব--স্বদেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব মুসলিম বন্ধনে মিশে যাওয়া। বর্ণিত এমত প্রেক্ষিতে বিবেচনাতে আনতে চাইছি আমাদের সাময়িকপত্রের ভূমিকা। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে সামনের সারির পত্রপত্রিকা সমূহ স্বাদেশিকতার পক্ষে ইতিবাচক জনমত সংগঠিত করণের দায়িত্ব পালন করে গেছে। এমনকি উত্তরবঙ্গ রংপুর থেকে প্রকাশিত *বাসনা* (১৯০৮) পত্রিকায় অতীব জোরালো ভাষায় এমন দাবি : 'আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আরব, পারস্য, আফগানিস্থান অথবা তাতারের অধিবাসীই হউন, আর এতদ্দেশবাসী হিন্দুই হউন, আমরা এক্ষণে বাঙালী, আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা।...আমাদের অনেকের মোহ ছুটে নাই। তাঁহারা বাঙ্গালার বাঁশবন ও আম্রকাননের মধ্যস্থিত পর্ণকুটিরে নিদ্রা যাইয়া এখনও বোগদাদ্‌, বোখারা, কাবুল, কান্দাহারের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে উর্দ্দুকে মাতৃভাষা করিবার মোহে বিভোর।'

একই সাথে এসে পড়ছে আরেক মারাত্মক বিভ্রান্তির সংকট। কীরকম মতলবী কিংবা আহাম্মুখী বিমূঢ়তার সৃষ্টি করা হয়েছিল--'বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা কী?' এর ফয়সালা নিয়ে আমাদের পূর্ব প্রজন্মের তাঁদেরকে লড়তে হয়েছে। সমকালের সাময়িক পত্রপত্রিকা তুলে ধরেছে বাঙালি মুসলমানের আপন মাতৃভাষার অধিকার দাবি। অনুধাবনের সুবিধার্থে এইখানে কালানুক্রমিক সাজানো যাচ্ছে সেই সব প্রতিক্রিয়া-প্রতিবাদ এবং স্বতঃস্ফূর্ত সমাধান-সিদ্ধান্তের কতিপয় নিদর্শন :

নবনূর, পৌষ ১৩১০ (১৯০৪)–

> বঙ্গভাষা ব্যতীত বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষা আর কী হইতে পারে? যাঁহারা জোর করিয়া উর্দ্দুকে বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষার আসন প্রদান করিয়া সমগ্র ভারতে মুসলমানের একই মাতৃভাষা করিতে চান, তাঁহারা কেবল অসাধ্য সাধনের জন্য প্রয়াস করেন মাত্র। ...গঙ্গাকে ফিরাইয়া যেমন তাহার উৎপত্তি স্থান হিমালয় স্থিত নির্ঝরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় না, সেইরূপ বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে বঙ্গভাষার প্রচলন রোধ করাও একান্ত অসম্ভব।--(সম্পাদক)

কোহিনুর, মাঘ ১৩২২ (১৯১৬)–

> বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, ইহা দিনের আলোর মত সত্য।--(মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী)।

আল্‌-এস্‌লাম, আশ্বিন ১৩২৩ (১৯১৬)–

> মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃদুগ্ধ পানের সঙ্গে যে ভাষা আমাদের কর্ণপটহে প্রতিধ্বনিত

হইয়াছে, যে ভাষা আপামর জনসাধারণ আজীবন ব্যবহার করে ; যে ভাষায় আমরা ঘরে বাহিরে হাটে মাঠে, ব্যবসায়ে বাণিজ্যে ও বৈষয়িক কার্য্যে সচরাচর কথোপকথন করি, যে ভাষায় আমরা চিন্তা করি, এমন কি যে ভাষায় নিদ্রাকালে স্বপ্ন দেখি তাহাই আমাদের মাতৃভাষা,—এবং তাহাই বাঙ্গালা।—(আবদুল খালেক চৌধুরী)।

আল্-এস্লাম, শ্রাবণ ১৩২৪ (১৯১৭)—

কোন গুণে উর্দ্দু আমাদের বরেণ্য? ভারতের অর্দ্ধেকের বেশী মোসলমান কথা বলেন বাঙ্গালায়, আর অবশিষ্ট বলেন বিভিন্ন ভাষায়। তথাপি বাঙ্গালী মোসলমানকে উর্দ্দু ধরিতে হইবে, আচ্ছা জবরদস্তি বটে। বাজারের, শিবিরের ভাষা উর্দ্দু বাজারে শিবিরে চলুক। একটা জাতিকে জোর করিয়া উর্দ্দু শিখাইবার কি প্রয়োজন?...ফলকথা বাঙ্গালাদেশে আমরা কখনও উর্দ্দুকে প্রশ্রয় দিতে পারি না।—(মোজাফ্ফর আহমদ)।

নূর, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৬ (১৯২০)-

বাঙ্গালার মাটি হইতে উর্দ্দুকে নির্ব্বাসিত করিতে না পারিলে বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। মাতৃভাষার বিপুল ও তুমুল চর্চ্চা ব্যতীত কোনও জাতির মুক্তি ও কল্যাণ লাভ সম্ভবপর নয়।—(সম্পাদক)।

বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা বৈশাখ, ১৩২৮ (১৯২১)—

আমি ভিখারী হইতে পারি, দুঃখে অশ্রুর কঠিনভারে চূর্ণ হইতে আপত্তি নাই। আমি মাতৃহারা অনাথ বালক হইতে পারি,—কিন্তু আমার শেষ সম্বল ভাষাকে ত্যাগ করিতে পারি না। আমার ভাষা চুরি করিয়া আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিও না।...বিদেশী ভাষায় কাঁদিবার জন্য—কে আমাকে উপদেশ দেয়?—(মোহাম্মদ লুৎফর রহমন)।

ধারণা করি যে, উপরি উদ্ধৃত এই কয়েকটি মাত্র নমুনাংশ থেকেই মোটামুটি সার্বিক পটভূমি এবং অবয়ব আঁচ করে নেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে লক্ষণীয়—স্বাদেশিকতার এবং মাতৃভাষার প্রশ্নে অন্তরাবেগ কেমন উচ্ছ্রিত হয়ে উঠেছে, এতদ্‌সহ সর্বোপরি রয়েছে কমিটমেন্টের উচ্চারণ। মুসলমানত্ব এবং স্বাদেশিকতা-মাতৃভাষা চেতনায় শ্লাঘা গভীরে একই উৎসমূলে নিহিত।

অতঃপর চিহ্নিত করে নেব—বৈরী শিবির থেকে উদ্যত প্রতিকূলতার প্রতিরোধে সমকালীন পত্রপত্রিকা বাঙালি মুসলমানকে আপন আইডেনটিটিতে উজ্জীবিত করতে সর্বাত্মক দায়িত্ব পালন করে গেছে। আমাদের এই বক্তব্যের সমর্থনে চট্টগ্রামে মুসলমান ছাত্র সম্মেলনে সভাপতি (ড.) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ভাষণের উল্লেখ করা যাচ্ছে। *আল্-এস্লাম* পত্রিকায় (আষাঢ়, ১৩২৬, ১৯১৯) প্রকাশ করছে—'তোমরা কেবল ছাত্র নও, তোমরা বাঙালী। তোমরা বাঙালী মুসলমান। বাঙ্গালার আবহাওয়ায়, বাঙ্গালার মাটিতে, বাঙ্গালার শস্যে, বাঙ্গালার ফলে তোমাদের দেহ গঠিত, পুষ্ট, বর্দ্ধিত। ...জানিও, দেশের সুখ দুঃখ, শুভাশুভের সহিত তোমাদের সুখ দুঃখ, শুভাশুভ এক নাড়িতে বাঁধা। তোমাদের জন্মভূমিও তোমাদের নিয়ে কিছু আশা রাখে। তোমাদিগকে বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান হইতে হইবে। শুন নাই কি —হুব্বুল ও ত্বনি মিনল্ ঈমান—দেশপ্রীতি ঈমানের অন্তর্গত?' এইখানে প্রসঙ্গত যোগ করবার যে, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্বয়ং তিনি ছিলেন *বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*-র অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক।

চার

পরিশেষে এখন সন্ধান-বিষয় সম্পর্কে এই যে আমাদের আলোচিত কালপর্ব, তেমন নির্ধারিত করে কি সীমানারেখা দেগে দেওয়া সম্ভব? কিংবা তা কতটা বাস্তবসম্মত? জবাবে বলব, একেবারে শুরুটা অবশ্য এক রকম করে জানানো গেছে। কিন্তু প্রস্তাবিত প্রথম পর্বের ইতি টানা কোথায়, তথাপি আপন বিবেচনায় যতটা আনা যায় লক্ষ করব যে, বিগত শতকে কুড়ির দশকে যখনাবধি কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় সাময়িকী *ধূমকেতু, লাঙল,* তারপর ঢাকায় *বুদ্ধির মুক্তি,* আন্দোলনের মুখপত্র *শিখা* এবং কলকাতায় উদার-সুস্থ মননের লেখক গোষ্ঠীর সাহিত্যপত্র মাসিক *সওগাত*—ইতোমধ্যে নবীনতর এক পরিমণ্ডলের সৃজন হয়ে গেছে। সে পরবর্তী আরেক ইতিবৃত্তান্ত।

বর্তমান প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে অপর কতিপয় মৌল প্রশ্ন : সেই সময়ে পত্রপত্রিকা বেরোত কাদের উদ্যোগে, পৃষ্ঠপোষকতায়? প্রকাশক, সম্পাদক, লেখক ছিলেন কারা? অবশ্য সময়ের সাথে ক্রমে অর্জন যে, অতীতের একদার ঔৎসুক্য রহিত মূক স্থবির মুসলমান সমাজে পাঠক শ্রেণির সৃষ্টি হচ্ছে। সম্পাদক, লেখকদের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি খ্যাতি-প্রতিষ্ঠাব এমন মাপের বেশ কয়েকজনকে—মীর মশাররফ হোসেন, পণ্ডিত রেয়াদুজ্জীন মাশহাদী, মুন্সি মেয়েজউদ্দীন, মহম্মদ রওশন আলী, মির্জ্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী থেকে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, সৈয়দ এমদাদ আলী, মওলানা মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী, মোজাম্মেল হক, এয়াকুব আলী চৌধুরী, ডা. লুৎফর রহমান, মোজাফ্‌ফর আহমদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পর্যন্ত প্রমুখ এঁরা। লেখক-কর্মী-সংগঠক এঁদের দৃঢ় ভূমিকা মুখ্যতই সমাজ-সংস্কারের, ধর্ম আন্দোলনের ক্ষেত্রে অন্ধ গোঁড়ামির মুকাবিলায় প্রতিবাদের; এবং ক্রমেই গুরুত্ববাহী হয়ে আসছিল স্বাদেশিকতার আহ্বান, আর মুসলমানত্বে-বাঙালিত্বে স্বচ্ছ সমন্বয়। অপরপক্ষে অবশ্য প্রচণ্ড রক্ষণশীল, ফতোয়াবাজ মোল্লাকীর ধ্বজাধারী ওঁরাও ছিলেন আগের থেকেই দলে বেশ ভারি। ওঁদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 'পীর' শ্রেণির প্রধানেরা, প্রয়োজনে জমিদার জোতদার এঁরাও আর্থ সহায়তার জোগান দিতেন। বরঞ্চ হামেশাই আর্থ-সংকটের আবর্তে পড়তেন প্রথমোক্ত গোষ্ঠীর তাঁরা। পত্রিকা-প্রকাশনা অব্যাহত রাখতে যে ধরনের জরুরি সাহায্য-সহযোগিতা কিংবা দান-অনুদানের প্রয়োজন, তেমন খুব পাওয়া যেত না। আর, সম্পাদক-লেখক আদর্শের টানে যাঁরা কাতারে সামিল হয়েছেন, উল্লেখ করবার যে, এই জামানায় সবাই এঁরা প্রথম প্রজন্মের। সরাসরি গ্রামদেশের শেকড়-মূল থেকে সদ্য উঠে আসা ; নগর কলকাতায় সবে পা রাখছেন। আবাস কোনোপ্রকারে জুটিয়ে নেওয়া মেস বাড়িতে, আর্থ-অবস্থান টানাটানিতে মধ্যবিত্ত, ক্বচিৎ দু'চার জন সরকারি আধা-সরকারি পেশাজীবী, কেউ কেউ রয়েছেন শিক্ষকতায়। সম্বল এঁদের বিশেষ আদর্শবাদের প্রেরণা ; আর সেই সাথে ললাটলিপি যাই থাকুক না কেন ভরসা অসীম সাহস।

এমন করে আখ্যায়িত করব—সাময়িকপত্র প্রকাশনার কর্মকাণ্ডে অভিযান যথাসাধ্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস তাঁরা পেয়েছেন। হটে যাননি, সরে যাননি। প্রত্যক্ষত এ কার্যে হয়তো বা 'এ্যাডভেঞ্চার' বটে, তবে সেই সময়ে বাঙালি মুসলমানের সাময়িকপত্র সাধনা এবং বাঙালি মুসলিম জাগরণ একে অপরের সম্পূরক হয়ে সম্মিলিত স্রোত-সংগমে উত্তবিত হয়ে যায়।

স্ব প ন ব সু

উনিশ শতকের ধর্ম ও তত্ত্বমূলক পত্রিকা

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালিসমাজের বড়ো একটা অংশ ধর্মীয় বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। একসময়ে ব্যাপারটা এমন একটা পর্যায়ে চলে যায় যে, তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য এই সময়ের বহু সভা-সমিতিতে (যেমন 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা', 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা', 'বেথুন সোসাইটি', 'জ্ঞানসন্দীপন সভা' ইত্যাদি) ধর্মীয় আলোচনা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

গোটা উনিশ শতক ধরে ধর্মের নানা তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়েছে বাঙালিজীবনে। এই শতকের প্রথমদিক থেকেই খ্রিস্টান মিশনারিরা ধর্মীয় মাহাত্ম্য এবং সেই সঙ্গে পরধর্মের কুৎসাপ্রচারে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ব্রাহ্মরা তার যথোচিত জবাব দিতে এগিয়ে এলেন। শুধু তাই নয়, প্রচলিত হিন্দুধর্মের সীমাবদ্ধতা ও একেশ্বরবাদের মহিমাপ্রচারের ব্যাপারটাও উপেক্ষা করলেন না তাঁরা। খ্রিস্টান এবং ব্রাহ্মদের আক্রমণের মুখে পড়ে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ প্রথমটা হতচকিত হয়ে গেলেও, কিছুদিনের মধ্যেই আত্মস্থ হয়ে উঠে প্রতি-আক্রমণে এবং হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্যপ্রচারে তৎপর হয়ে ওঠেন। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষ করে ব্রাহ্মদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের সময় হিন্দুত্ববাদ নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে—ইতিহাসে যা হিন্দু-পুনরুজ্জীবন আন্দোলন নামে বিখ্যাত। যে কারণে এইকালে হিন্দুরা নানাভাবে ধর্মীয় মহিমা প্রচারে হয়ে ওঠেন ভীষণরকম সক্রিয়। উনিশ শতকের প্রথমদিকে বাঙালি মুসলমানসমাজ নানাকারণে গুটিয়ে থাকলেও, আশির বছরগুলি থেকে তাঁরাও পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়ে শুরু করলেন ইসলামের গৌরব কীর্তন।

বাংলায় ধর্মবিষয়ক পত্রিকা প্রথম প্রকাশের কৃতিত্ব খ্রিস্টান মিশনারিদের। ১৮১৯-এর ডিসেম্বরে তাঁদের উদ্যোগে খ্রিস্টতত্ত্ব-বিষয়ক পত্রিকা *গসপেল ম্যাগাজিন* প্রকাশিত হয়। দ্বিভাষিক এই মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'সপ্তাহের মূল', 'তারক যিশু', 'অন্তঃকরণের মালিন্যবিনাশ', 'বালককালে শিক্ষার গুণ', 'খ্রীষ্টোপাখ্যান', 'মৃজাপুরের গিরজাঘরের বিবরণ'-এই কটি লেখা ছাড়াও ধর্মসংক্রান্ত কিছু খবরও ছিল। এর অল্পদিন পরেই 'পাপিরদিগের পরিত্রাণার্থে ও মঙ্গলসমাচার ঘোষণা' করার উদ্দেশ্য নিয়ে আসরে নামে *খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি* (১৮২২)। খ্রিস্টমহিমা ও অন্যধর্মের নিন্দা করার জন্য মিশনারিদের উদ্যোগে কম পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি—*মঙ্গলোপাখ্যান পত্র* (১৮৪৩), *উপদেশক* (১৮৪৭), *সত্যার্ণব* (১৮৫০), *তত্ত্ববিকাশিনী* (১৮৬৭), *বঙ্গমিহির* (১৮৭৩), *বিরিয়াপত্র* (১৮৭৫), *খ্রীষ্টীয় বান্ধব* (১৮৭৯),

ত্রাণোদয় (১৮৯০), *খ্রীষ্টীয় শক্তি* (১৮৯৭), *প্রচার* (১৮৯৯), *শ্রীহট্টবন্ধু* (১৯০০) এবং আরও অনেক। এই ধরনের কোনো কোনো পত্রিকা অন্যধর্মের কুৎসাপ্রচারে কী পরিমাণ সক্রিয় ছিল তার সামান্য একটু নমুনা দেওয়া যাক—

> হিন্দুরা প্রায় সকলপ্রকার পাপ করে বিশেষতঃ তাহারা দেবপূজারূপ মহাপাপে দোষী আছে ঘৃণ্য দেবপূজাকারী হিন্দুরা কি ধার্ম্মিক। তাহা নহে।...হিন্দুরা ও মুসলমানেরা মরণ সময়ে কি করিবে তাহারা নরকে গমন করিবে।...হিন্দুরদের তাবৎ পূজা মিথ্যা পাপ শেষে তাহারা দেখিবে যে এবং ঐ পাপের নিমিত্ত পরকালে দুঃখভোগ করিতে হইবেক মহম্মদীয়েরা ভরসা করে যে মরণের পর তাহারা ফারদিশে গমন করিবে কিন্তু মুসলমানেরা ফারদিশে গমন করিতে পারিবে না মহম্মদ প্রবঞ্চক ছিল ও কোরান মিথ্যা... (*মঙ্গলোপাখ্যান পত্র*, এপ্রিল, ১৮৪৩)

সব পত্রিকাই যে এই ধরনের কুৎসিত আক্রমণে লিপ্ত থাকত এমন নয়। ওয়েঙ্গার সম্পাদিত *উপদেশক পত্রিকা* (১৮৪৭) খ্রিস্টধর্মের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হলেও পরধর্মের কুৎসাপ্রচারে তেমন উৎসাহবোধ করেনি।

'সত্যধর্ম' প্রচারের বাসনা নিয়ে এইকালে কয়েকটি সংবাদপত্রও প্রকাশিত হয়েছিল। লালবিহারী দে-র *অরুণোদয়*-এর কথাই ধরা যাক। এর প্রথম সংখ্যাটির পরিচয় দিতে গিয়ে একটি দৈনিক পত্রিকা বলে—

> এতৎ নূতন পত্রিকা কেবল সাংসারিক ও বৈষয়িক সংবাদ এবং বিজ্ঞান বার্ত্তাদিতে পূরিত না হইয়া সত্যধর্ম্ম অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ানধর্ম্মসূচক উপদেশে ও নানাবিধ পরমার্থ প্রবন্ধে অলঙ্কৃত হইবে।
>
> (*সংবাদ প্রভাকর*, ৫.৮.১৮৫৬)

খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে কেউ কোনো প্রশ্ন তুললে লালবিহারী চটে আগুন হয়ে যেতেন। *বিজ্ঞান মিহিরোদয়* নামে একটি পত্রিকা এই ধরনের কিছু 'কুতর্ক' তোলায় ক্ষুব্ধ লালবিহারী লেখেন—

> তিনি যদি জ্ঞানবান ব্যক্তির ন্যায় তর্ক করেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার সহিত বিচার করিতে পারি, কিন্তু ব্যলীকের ন্যায় যাহা মুখে আইসে তাহাই বলিলে কোন ভদ্রসন্তান তাঁহার সহিত বিতণ্ডা করিবে? আর তাহার ফলই বা কি? হস্তে দুর্গন্ধমাত্র। (*অরুণোদয়*, ১.১২.১৮৫৭)

'এতদ্দেশের সকল লোকেই বিলক্ষণ জানেন যে মিশনারিদের ন্যায় ভারতভূমির পরম বন্ধু আর নাই'—এমন কথা *অরুণোদয়*-এ লিখতেও লালবিহারী ইতস্তত করেননি!

মিশনারিদের কোনো কোনো পত্রিকা সংবাদপত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেও, কিছুদিনের মধ্যে ধর্মের কোটরে ঢুকে পড়ে। পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *সাপ্তাহিক সম্বাদ*-এর কথাই বলি। বছর দুয়েক সংবাদপত্র হিসাবে প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটির যে পরিবর্তন ঘটে, তার উল্লেখ করে ক্ষোভের সঙ্গে সমকালীন একটি পত্রিকা লেখে--

> সাপ্তাহিক সম্বাদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। এক্ষণ অবধি উহা মাসের ১লা ও ১৫ই বাহির হইবে। উহাতে আর রাজনৈতিক কোন বিষয় থাকিবে না। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমুদয় উপদেশ, বক্তৃতা প্রভৃতি থাকিবে। সুতরাং রাজনৈতিক পৃথিবী হইতে সাপ্তাহিক অন্তর্হিত হইলেন। আমাদের সাপ্তাহিককে করিয়া কিছু শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। তাহার বিরহে আমরা কিছু কষ্ট পাইব।
>
> (*অমৃতবাজার পত্রিকা*, ১৯. ৫. ১৮৭০)

সংবাদ সুধাংশু-র সম্পাদক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু খোলাখুলিভাবে নিজের উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করতে ইতস্তত করেননি--

> আমরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শাসন প্রায় কাহার অগোচর নাই, অনেকেই তদ্ধর্ম্মের উপদেশ এবং রাজনীতির প্রশংসা করিয়া থাকেন, অতএব অধিক কি লিখিব সেই নীত্যনুযায়ি সরলতাচরণ করাই আমাদের প্রতিজ্ঞা--
>
> (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর *বাংলা সাময়িকপত্র* (১৮১৮-৬৮) থেকে উদ্ধৃত)

শুধু 'সরলতাচরণ' করেই পত্রিকাটি অবশ্য থামেনি। সুযোগ পেলেই হিন্দুধর্মের কুৎসাপ্রচারের কোনও সুযোগই এটি ছাড়ত না।

এদেশবাসীর ধর্ম সম্পর্কে খ্রিস্টান মিশনারিদের কুৎসাপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রথম যে মানুষটি রুখে দাঁড়ান, তিনি রামমোহন রায়। হিন্দুদের প্রতি অন্যায় আক্রমণের উত্তর দেওয়ার জন্য ১৮২১-এ তিনি প্রকাশ করেন *ব্রাহ্মণসেবধি*। পরবর্তীকালে রামমোহনের অনুগামীরা একেশ্বরবাদের মহিমাপ্রচার ও খ্রিস্টধর্মস্রোত রোধ করার জন্য একের পর এক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। রামমোহন-অনুরাগী দেবেন্দ্রনাথের জীবনের প্রধান সংকল্প ছিল 'বেদবেদান্ত ও পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার'। এই সংকল্প 'সুসিদ্ধ' করার জন্য ১৮৪৩-এ তিনি প্রকাশ করলেন *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*। পত্রিকায় কী কী থাকবে তা জানাতে গিয়ে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত লিখলেন--

> সর্ব্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহা জানাইবার নিমিত্তে আমারদিগের শাস্ত্রের সারমর্ম্ম সংগৃহীত হইবেক। বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক। কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

শুধু 'পরব্রহ্মের' উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব ও 'মন পরিশুদ্ধ' রাখার চেষ্টায় মগ্ন না থেকে পত্রিকাটি খ্রিস্টধর্মপ্রচারকদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। ১ চৈত্র ১৭৭৬ শকে পত্রিকাটি লেখে, আর তো সহ্য হয় না। মিশনারিদের দৌরাত্ম্য এখন 'সহিষ্ণুতার সীমার বহির্ভূত!' সংখ্যার পর সংখ্যায় দেশবাসীকে 'নির্লজ্জ মিশনারিদের' কুহকজাল ছিন্ন করার আহ্বান জানায় পত্রিকাটি। ১ আশ্বিন, ১৭৭৬ শকে প্রকাশিত একটি লেখায় খ্রিস্টধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে *তত্ত্ববোধিনী* দেখায়, 'খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ ভ্রান্তিমূলক ধর্ম্ম।'

কেবল *তত্ত্ববোধিনী-ই* নয়, ব্রাহ্মধর্মের মহিমাকীর্তনে এবং এর ওপর যে কোনো আক্রমণ প্রতিহত করার ইচ্ছা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল *সত্যসঞ্চারিণী* (১৮৪৬), *সত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী* (১৮৫৬), *ধর্ম্মপ্রচারিণী* (১৮৬৪), *সত্যান্বেষণ* (১৮৬৫) *সত্যজ্ঞানপ্রদায়িনী*-র (১৮৬৫) মতো পত্রিকা।

একদিকে যখন একের পর এক ব্রাহ্মধর্ম-পরিপোষক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, তখনই শুরু হয়ে গেছে ব্রাহ্মদের অন্তর্কলহ। যার পরিণামে ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়।

দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব অস্বীকার করে অনুগামীদের নিয়ে ১৮৬৬-তে কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠা করলেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* হয়ে উঠল দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র। আর *ধর্ম্মতত্ত্ব* নামে যে পত্রিকাটি ১৮৬৪-র অক্টোবর থেকে ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি করার লক্ষ নিয়ে প্রকাশিত হয়ে আসছিল--সেটি পরিণত হল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্রে। একটি পত্রিকায় সন্তুষ্ট না থেকে ১৮৭২-এর মে মাসে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আনুকূল্যে প্রকাশিত হল *ধর্ম্মসাধন* নামে একটি সাপ্তাহিক। অনিয়মিতভাবে হলেও, পত্রিকাটি দীর্ঘদিন কেশবচন্দ্রের বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

ধর্ম্মতত্ত্ব

কেশবপন্থী ব্রাহ্মদের মুখপত্র *ধর্ম্মতত্ত্ব*

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না। কিছুদিনের মধ্যেই কেশবচন্দ্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর অনুগামীদের মধ্যেই প্রশ্ন জাগল। সরাসরি বিদ্রোহের পথ না ধরে একদল মধ্যপন্থা অবলম্বন

করাই শ্রেয় বিবেচনা করলেন। ১৮৭৪-এর নভেম্বরে শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হল *সমদর্শী OR THE LIBERAL*। সম্পাদকের প্রতিবেদনে শিবনাথ বললেন—

> The journal will be conducted in English and Bengali, that it may be acceptable to the theists of other Presidencies. In short the projectors aspire to make it, what it should be, an impartial Exponent of Theistic Opinion.

সম্পাদক যা-ই বলুন না কেন, কেশবচন্দ্রকে কটাক্ষ করা যে পত্রিকা প্রকাশের অন্যতম কারণ, তা বুঝতে বেশি সময় লাগেনি। যে কারণে *সমদর্শী*-তে প্রকাশিত মতের প্রতিবাদে *ধর্ম্মতত্ত্ব*-কে মাঝেমাঝেই সরব ও সক্রিয় হতে হয়েছে। (দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব* ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৭ শক)

কেশবচন্দ্র সম্পর্কে অনুগামীদের ক্ষোভ কিন্তু দিনদিন বেড়েই চলে, শেষপর্যন্ত ১৮৭৮-এ কেশবচন্দ্রের অনুগামীদের একাংশ গঠন করলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হিসাবে ইংরেজিতে বেরোল *ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন* আর বাংলায় *তত্ত্বকৌমুদী*। *তত্ত্ববোধিনী, ধর্ম্মতত্ত্ব* এবং *তত্ত্বকৌমুদী*—তিনটি পত্রিকাই ব্রাহ্মধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের পাশাপাশি পরস্পরকে আক্রমণ করতেও দ্বিধা করত না।

এইরকম সংকটকালেও কেশবচন্দ্র কিন্তু ভেঙে পড়েননি। কিছুদিন পরেই তিনি ঘোষণা করলেন 'নববিধান'—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পরিণত হল নববিধান ব্রাহ্মসমাজে। কেশবচন্দ্রের মতো সংবাদপত্রের গুরুত্ব আর কজন বুঝতেন জানি না। গণমাধ্যমের শক্তি সম্পর্কে সচেতন এই মানুষটি পত্রিকার মধ্য দিয়ে নববিধানের বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশ মেনেই ১৮৮১-তে তাঁর এক অনুগামী প্রকাশ করলেন *বিশ্বাসী*। বিজ্ঞাপনে পত্রিকাটি জানাল—

> যাঁহারা নববিধানের গভীর তত্ত্ব ও উচ্চভাব সহজে বুঝিতে চান এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশ ও গল্পপাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চান, তাঁহাদিগের জন্য 'বিশ্বাসী' নামে একখানি মাসিকপত্র ছাপা হইতেছে।
>
> (*ধর্ম্মতত্ত্ব* ১৬ শ্রাবণ, ১৮০৩ শক)

বিজ্ঞাপন বেরোনোর মাসখানেকের মধ্যেই *বিশ্বাসী*-র আত্মপ্রকাশ। ১৮৮২-র প্রথমদিকে ময়মনসিংহ থেকে *হরিভক্তি তরঙ্গিণী* নামে যে মাসিক পত্রিকাটি বেরোয়, সেটির পরিচয় দিতে গিয়ে *ধর্ম্মতত্ত্ব* বলে 'পত্রিকাখানি দ্বারা নববিধান প্রচার করাই লিখকের উদ্দেশ্য।' কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও অনুগামীরা গুরুর নির্দেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন। যে কারণে ১৮৮৮-তে ময়মনসিংহ নববিধান সমাজ থেকে প্রকাশিত হয় *ধর্ম্মপ্রকাশ*। সমকালেই টাঙ্গাইল নববিধান সমাজ থেকে বেরোতে আরম্ভ করে *মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর জিহ্বা* নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। পত্রিকাটি বেশিদিন চলেনি। যে কারণে ১৮৯০-এ টাঙ্গাইল থেকেই প্রকাশিত হয় *নববিধান মৃতসঞ্জীবনী* নামে আর একটি পত্রিকা। কেশব-জীবনীকার চিরঞ্জীব শর্মার সম্পাদনায় ১৮৯৩-এ 'নববিধান সমাজের বার্ত্তাবহ' হিসাবে আবির্ভূত হয় *নববিধান*। পত্রিকার প্রচ্ছদে থাকত একটি পতাকার ছবি, যার মধ্যে লেখা 'নববিধান'। নববিধানের বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পত্রিকাটি বিনামূল্যে বিতরিত হত। কিছুদিন প্রকাশের পর *নববিধান*-সম্পাদক পাঠকদের অনুনয় করে বলেন—

যাঁহারা "নববিধান" ফাইল করিয়া না রাখিবেন, তাঁহারা পাঠান্তে ইহা অন্য কাহাকেও যেন দেন, তিনি আবার পড়িয়া অন্যকে দিবেন, এইরূপে ধর্ম্মজ্ঞান জনসমাজে বিস্তার হইতে থাকুক।

সমাচারচন্দ্রিকা

সদাসমাচারসুধাংশুপ্রকাশিকা পদার্থচেষ্টাপরমার্থদায়িকা।
বিজ্ঞমতেসর্বমনোনুরঞ্জিকা প্রিয়াভবানীচরণস্যচন্দ্রিকা।

হিন্দুধর্মের পবিত্রতা রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ *সমাচার চন্দ্রিকা*

যে সামান্য কয়েকটি পত্রিকার কথা আমরা বললাম, তার বাইরেও কম ব্রাহ্মপত্রিকা বেরোয়নি। এগুলির মধ্যে দ্বিভাষিক *পিলগ্রিমস্ জার্নাল* (১৮৮০), *ধর্ম্মবন্ধু* (১৮৮১),

বঙ্গবন্ধু (১৮৮২), *ব্রাহ্মজীবন* (১৮৮৪), *রত্নাকর* (১৮৮৪), *বিবেক* (১৮৮৮), *সেবক* (১৮৯১), *আশা* (১৮৯২) ইত্যাদির নাম নানাকারণে স্মরণীয়। তবে এই ধরনের একটি পত্রিকা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ১৮৮৪-র সেপ্টেম্বর-এ *আলোচনা* নামে ধর্ম, সমাজ ও নীতিবিষয়ক একটি পত্রিকা বেরোয়। হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের ঘোরবিরোধী এই পত্রিকাটি ব্রাহ্মসমাজের কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব না করে তিন ব্রাহ্মসমাজের মিলনের জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা চালায়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত 'তিন ব্রাহ্মসমাজের মিলন সম্ভব কিনা?' বা 'ব্রাহ্ম সমাজত্রয়ের মিলন'-এই ধরনের লেখা আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে তুলে ধরা যায়।

আগেই বলেছি, উনিশ শতকের প্রথমদিক থেকে প্রচলিত হিন্দুধর্মকে নানা আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয়। ব্যাপারটা সামলে নেওয়ার পর সনাতনপন্থীরাও শুরু করলেন পালটা আক্রমণ। রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল *সমাচার চন্দ্রিকা* (১৮২২)। আইন করে সতীদাহ নিবারিত হলে এর বিরুদ্ধে বিলেতে আপিল করা এবং হিন্দুধর্মের সবরকম আচার-আচরণ বজায় রাখার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় 'ধর্মসভা' (১৮৩০)। *সমাচার চন্দ্রিকা* পরিণত হয় এই 'ধর্মসভা'র মুখপত্রে। পৌত্তলিকতার সমর্থক হিসাবে আসরে নামল *সংবাদ তিমিরনাশক* (১৮২৩)। ১৮৩২-এ আন্দুলের জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের সনাতনপন্থী *সংবাদরত্নাবলী* প্রকাশিত হয়। ১৮৪৬-এ 'নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা' উচ্ছেদ করে কৃষ্ণপূজাপ্রচারের জন্য নন্দকুমার কবিরত্নের সম্পাদনায় *নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা* প্রকাশিত হলে *তত্ত্ববোধিনী* তাঁর প্রচেষ্টাকে 'সাগরস্রোতরোধে বালির বাঁধের' মতো উপহাসের কারণ বলে অভিহিত করে। *নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা*-র সম্পাদক বিশ্বাস করতেন 'হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মই সত্য নহে'—এবং সেইকারণেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও সেইসঙ্গে ব্রাহ্ম ও মিশনারিদের সমালোচনায় তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন। পত্রিকাটি মনে করত—

> নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা...যথার্থ হিন্দুদিগের মাতার ন্যায় উপকারিণী, ধর্ম্মপোষিকা, চিত্ততোষিকা, পরমার্থধন পোষিকা, অজ্ঞানান্ধ বিনাশিনী, *বিধর্ম্মদলবলনাশিনী*।
>
> (*নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা*, আষাঢ়, ১২৬১)

১৮৪৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে *দুর্জনদমন মহানবমী*-র আত্মপ্রকাশ। পত্রিকাটির রুচিহীনতা পীড়াদায়ক। ব্রাহ্ম ও খ্রিস্টান দু-দলের প্রতিই পত্রিকাটি অপ্রসন্ন। যে কালে ব্রাহ্মদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের বিরোধ চরমে, সেইকালেও 'যে ব্রাহ্ম সেই খ্রীষ্টিয়ান' বলতে পত্রিকাটির বাধেনি। পত্রিকাটি মনে করত—

> ব্রাহ্ম খ্রীষ্টিয়ান তুল্য তুল্য অনুরূপ।
> হিন্দুধর্ম্ম মজাইতে দুই কামকূপ।

১৮৪৭-এ ব্রাহ্মধর্মের বিরোধিতা করার লক্ষ নিয়ে প্রকাশিত হয় *হিন্দু ধর্ম্মচন্দ্রোদয়*। *হিন্দুবন্ধু* (১৮৪৭) ও *ধর্ম্মরাজ* (১৮৫৩)-এই দুটি পত্রিকারই উদ্দেশ্য ছিল 'স্বধর্ম্মপোষণ করত খ্রীষ্টধর্ম্ম দোষণ'। ব্রাহ্ম ও খ্রিস্টানদের কবল থেকে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করার জন্য ১৮৬৬-তে *হিন্দুরঞ্জিকা*-র আবির্ভাব। ধর্মবিশেষের প্রতি বিদ্বেষ উনিশ শতকের শেষভাগেও কতখানি প্রবল ছিল *আর্যধর্মপ্রচারক ব্রাহ্মণপণ্ডিত* নামক পত্রিকাটি দেখলেই তা বোঝা

যাবে। পত্রিকাটি মনে করত 'হিন্দু খ্রীষ্টীয়ান, মুসলমান, বৌদ্ধ আদি মতসমূহের ঔরসে ও সহজবুদ্ধির গর্ভে বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্ম।'

সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী

মাসিক পত্রিকা

[illegible]

সংবৎ ১৯৩৮ । [illegible] । আষাঢ় । ইং ১৮৮১ । জুন ।

সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা।

এই সভার আষাঢ় মাসীয় কার্য্য বিবরণ জানিবার নিমিত্ত দেশহিতৈষী বিজ্ঞ জন মাত্রেই যেরূপ উৎসুক ও [illegible] হইয়াছেন, তাহাতে বর্ত্তমান [illegible] পত্রিকার অপরাপর বিষয়ের সমালোচনা করিলে, [illegible] সভার [illegible] প্রয়োজনীয় কার্য্য বিবরণ সম্যক রূপে প্রকটিত হয় না, সেই নিমিত্ত [illegible] পরিত্যাগে [illegible] প্রকটিত করা গেল, পাঠে বোধ হয় সকলেই সন্তোষলাভ করিবেন।

গৌর আষাঢ়স্য ৫ম দিবসীয় রবিবার অপরাহ্ন তিন ঘটিকার পর, উক্ত সভার নিয়মিত মাসিকাধিবেশন হয়, তাহাতে নবদ্বীপ প্রভৃতি বিবিধ [illegible] স্থানের বহুতর অগ্রগণ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ও বিষয়ী সম্ভ্রান্ত সুবিজ্ঞ ধর্ম্মনিষ্ঠ [illegible], ও দর্শক সমবেত হয়েন।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা কালী-[illegible] বাহাদুর নির্দ্দিষ্ট আসন পরিগ্রহ করিলে সভাকার্য্য আরম্ভ হইল।

প্রথম। বিগত মাসিকাধিবেশনের কার্য্য বিবরণ অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত হইলে, সভাগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইল।

২য়। পরে সভাচার্য্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র শিরোমণি মনুসংহিতা, তৎপরে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জগদানন্দ গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ও ব্যাখ্যা করিয়া সভাস্থ জনসমূহের অসীম চিত্তরঞ্জন করিলেন।

৩য়। সভার নিয়মানুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভাপদে অভিষিক্ত হইলেন।

তাহাদের নিবাস

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারী মোহন সরকার [illegible]।

" রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়।

" [illegible] বসু।

শ্রীযুক্ত [illegible]

সাং [illegible], বারুদিগের [illegible]।

শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ বিদ্যাবাচস্পতি।

সাং নবদ্বীপ

শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ শীল

সাং বড়বাজার।

সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী সভার মুখপত্র

উনিশ শতকের সত্তর-আশি ও নব্বই-এর বছরগুলিতে হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্যপ্রচারের জন্য প্রচুর পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এইকালে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তারই ফল এটি। এইসব পত্রিকার মধ্যে 'সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী সভা'র মুখপত্র *সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী* (১৮৭১), কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের *ধর্ম্মপ্রচারক* (১৮৭৭)। রাখালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের *প্রচার* (১৮৮৪)। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের *নবজীবন* (১৮৮৪), রামকৃষ্ণ-ভক্তদের

দ্বারা পরিচালিত *তত্ত্বমঞ্জরী* (১৮৮৫), ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের *বেদব্যাস* (১৮৮৭), যদুনাথ মজুমদারের *হিন্দুপত্রিকা* (১৮৯৪) ও স্বামী বিবেকানন্দ পরিকল্পিত *উদ্বোধন*-এর (১৯০০) কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। 'সত্যধর্ম্ম'র কথা জনসমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র *প্রচার*-এর পরিকল্পনা করেন। যদিও তিনি থেকে যান নেপথ্যেই। 'হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মহিমা কীর্ত্তন' করাই ছিল *বেদব্যাস*-এর উদ্দেশ্য। ভূধর চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নামেই সম্পাদক—সবাই এটিকে শশধর তর্কচূড়ামণির কাগজ বলেই জানত। মতামতের দিক দিয়ে *ধর্ম্মপ্রচারক* ও *বেদব্যাস* দুটিই ছিল অত্যন্ত গোঁড়া। *প্রচার* আর *নবজীবন*—এই পত্রিকাদুটি হিন্দুধর্মকে কালোপযোগী করার জন্য কিছু কিছু সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল। ব্যাপারটায় ঘোর আপত্তি ছিল *বেদব্যাস*-এর। বিষয়টি নিয়ে পত্রিকাগুলির মধ্যে রীতিমতো বাদানুবাদও চলত। *হিন্দুপত্রিকা*-র সূচনায় সম্পাদক পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করলেন—

> আর্য্য ঋষিগণের পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া হিন্দুপত্রিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। হিন্দুপত্রিকায় হিন্দু ধর্ম্মসমাজের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী প্রবন্ধ থাকিবে। বেদ উপনিষৎ ও দর্শনাদি প্রাচীন শাস্ত্রের মর্ম্ম সাধারণকে অবগত করাইবার জন্য হিন্দুপত্রিকা প্রকাশিত হইল।

প্রথম সংখ্যাতেই জনৈক লেখক আশঙ্কাপ্রকাশ করে বলেন—

> হিন্দুবর্গ যেরূপ বিদেশীয় ধর্ম্ম, বিদেশীয় আচারব্যবহার অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে আর অল্পদিনের মধ্যে হিন্দুসমাজ যে ম্লেচ্ছসমাজে পরিণত হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?
>
> (*হিন্দুপত্রিকা*, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১)

এই আশঙ্কা থেকে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে আসরে নামে *হিন্দুপত্রিকা*।

হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষণাকারী পত্রিকাগুলির মধ্যে কয়েকটি আবার বিশেষভাবে বৈষ্ণবধর্মের মাহাত্ম্যপ্রচারেই ছিল উৎসাহী। এইকালে নব্য বৈষ্ণববাদের যে জোয়ার বাঙালিসমাজে মাথাচাড়া দেয়, তারই ফল এটি। এই ধরনের পত্রিকার মধ্যে *সজ্জনতোষিণী* (১৮৮১), *প্রেমপ্রচারিণী* (১৮৮২), *সুনীতি* (১৮৮৩), *ভারতে হরিধ্বনি* (১৮৮৫), *বৈষ্ণব* (১৮৮৬), *হরিভক্তিতত্ত্ব* (১৮৮৮), *বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা* (১৮৯০, দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে নাম হয় *শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা*), *হিন্দুসুহৃদ* (১৮৯৩), *সঙ্গিনী* (১৮৯৪), *সনাতন ধর্ম্মকণা* (১৮৯৭), *হরিভক্তিতরঙ্গিণী* (১৮৯৮), *হরিভক্তি* (১৮৯৯), *শ্রীচৈতন্যপত্রিকা* (১৮৯৯), বৈষ্ণবপ্রতিভা (১৯০০) প্রভৃতির নাম করা যায়।

উনিশ শতকের আশির বছরগুলি থেকে অলকট, ব্লাভাটস্কি প্রমুখের চেষ্টায় এদেশে থিওজফি আন্দোলন রীতিমতো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। থিওজফির মতবাদ দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কলকাতায় 'বঙ্গীয় তত্ত্বসভা' নামে একটি সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার সদস্যরা বাংলায় তত্ত্বজ্ঞানপ্রকাশক একটি পত্রিকা প্রকাশের কথা কিছুদিন ধরেই চিন্তা করছিলেন। ১৮৯৩-এ তাঁদের সেই চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রকাশিত হয় *কল্প* নামে একটি মাসিক পত্রিকা। কেন *কল্প* প্রকাশ করতে হল, তার কারণ বিশ্লেষণ করে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক জানালেন—

সমগ্র ভূমণ্ডলের শিক্ষাগুরু প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যঋষিগণ যে সকল শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া যাহাতে সাম্প্রদায়িকতার অশান্তি ও মতভেদের তীব্রতা সমূলে বিনষ্ট হয় এবং পবিত্র একতাসূত্রে আবদ্ধ হওতঃ আমরা জীবনকে মধুময় করিতে পারি তাহারই জন্য আমাদের "কল্প" বঙ্গবাসীর দ্বারস্থ হইল। (*কল্প*, বৈশাখ, ১৩০০)

খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম, হিন্দু সবাই নিজের নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বপ্রমাণে যখন বদ্ধপরিকর, ঠিক সেইসময়েই প্রায় নীরবে, নিঃশব্দে বৌদ্ধদের কথা জনসমাজে তুলে ধরার ইচ্ছা নিয়ে আবির্ভাব *বৌদ্ধবন্ধু*-র (১৮৮৫)। পত্রিকাটির পরিচয় দিতে গিয়ে সমকালীন একটি পত্রিকা লেখে—

আমরা কৃতজ্ঞতা ও আনন্দসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে বৌদ্ধবন্ধু নামক মাসিকপত্রের [ ] আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বৌদ্ধধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব ও ভাব এবং ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ও মহামুনি বুদ্ধদেবের চরিত্র প্রচার করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। ইহার সম্পাদক চট্টগ্রাম প্রদেশবাসী একজন উপযুক্ত বৌদ্ধ। বৌদ্ধদিগের দ্বারা বঙ্গভাষায় সম্পাদিত এই প্রথম পত্রিকা।...প্রথম খণ্ডে বুদ্ধ আহ্বান, উপযুক্ত বৌদ্ধ, শাক্য এবং কেশব, চট্টগ্রামের বড়ুয়াজাতির দুরবস্থা, ধর্ম্মপদ, শাক্যকুসুম, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ও প্রাপ্তিস্বীকার এই কয়েকটি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বুদ্ধ আহ্বান বিষয়টি আমরা স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। (*ধর্ম্মতত্ত্ব*, ১৬ আষাঢ়, ১৮০৭ শক)

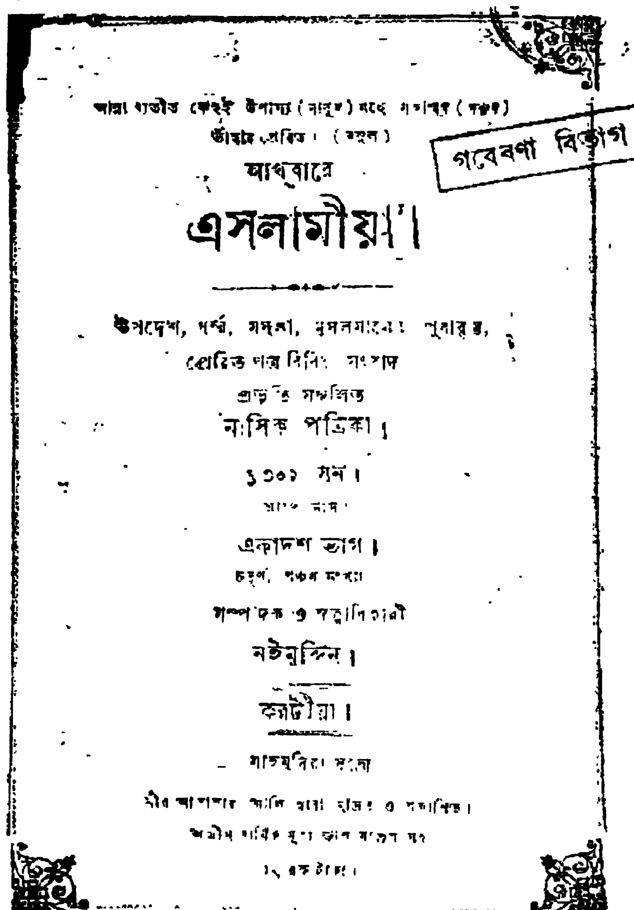
সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রচারে খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম ও হিন্দুরা যতখানি তৎপর ছিলেন, মুসলমানরা ততখানি নন। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে উনিশ শতকের সত্তরের বছরগুলি থেকে তাঁরাও এ-ব্যাপারে রীতিমতো সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তবে ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার বাসনা নিয়ে *আখ্‌বারে এসলামীয়া*-র (১৮৮৪) আগে কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই। নইমুদ্দিন সম্পাদিত 'মুসলিম ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক' এই পত্রিকাটির প্রকাশ ছিল অনিয়মিত। কয়েকবছরের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেনের সঙ্গে গো-হত্যা সংক্রান্ত বিতর্কে পত্রিকাটি জড়িয়ে পড়ে। ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। ১২৯৭-এর ভাদ্র সংখ্যার পর পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে হয়।

কেন এই সিদ্ধান্ত নিতে হল তা বলতে গিয়ে সম্পাদক জানান—

খোদার ফজলে আখবারে এসলামীয়া প্রায় সাতবৎসর যাবত এসলাম সমাজের খেদমতে হাজীর ছিল ইহার দ্বারা এসলাম সমাজের যথোচিত উপকার না হইলেও ভরসা করি অপকার হয় নাই। খবরের কাগজ প্রচলন করা এবং তাহার বিধান বহন করা যে কত বড় বৃহৎ কার্য্য তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। গ্রাহকগণ যত মূল্য দেন তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। এসলামীয়ার যে পরিমাণ বার্ষিক ব্যয় হয় তাহার এক পঞ্চমাংশও আদায় হইতেছে না কাজেই সম্পাদক বহু টাকা ঋণগ্রস্থ হইয়াছেন, এইক্ষণ তাঁহার ব্যয় বহন করা সুকঠিন এজন্য নানা কথা চিন্তা করিয়া সম্প্রতি আখবারে এস্‌লামীয়া এসলাম সমাজ হইতে বিদায় হইলেন। খোদাতালা সম্পাদকের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিলে এসলামীয়া পুনঃ এসলাম খেদমতে হাজির হইবে এরূপ আসা আছে—

সম্পাদকের আশা পূর্ণ হয়েছিল, ১৩০২-এর বৈশাখে পত্রিকাটি আবার 'এসলাম খেদমতে হাজির' হবার সুযোগ পেয়েছিল।

শুধু *আখবারে এসলামীয়া*-ই নয়, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বপ্রমাণের জন্য সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল *ইসলাম* (১৮৮৫), *ইসলাম প্রচারক* (১৮৯১), ইসলাম (১৯০০), *নূর অল ইমান* (১৯০০), ইসলাম রবি-র (১৯০০) মতো কাগজ। এগুলির মধ্যে রেয়াজউদ্দীন আহমদ-এর *ইসলাম প্রচারক*-এর কথা একটু না বললেই নয়। প্রথম প্রকাশকালে (ভাদ্র, ১২৯৮) পত্রিকাটি 'ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধীয়' মাসিক বলে পরিচয় দেয়। প্রথম সংখ্যার 'সূচনা'য় সম্পাদক বলেন—



আখবারে

এসলামীয়া।

মাসিক পত্রিকা।

১৩০১ সাল।

একাদশ ভাগ।

নইমুদ্দিন।

করটীয়া।

ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারে মুসলমানরাও পিছিয়ে ছিলেন না

পরম দয়াময় খোদাওয়ালা করিমের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া আমরা "ইসলাম প্রচারক" প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। ইসলাম প্রচারক যাহাতে প্রকৃত ইসলাম প্রচারকের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে

যত্নচেষ্টার ত্রুটি হইবে না।...যতখানি বিধর্ম্মীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি, তাহাদের নাম ধামাদি ইসলাম প্রচারকে প্রকাশিত হইবে।

তৃতীয় সংখ্যা থেকে এটি 'মুসলমানদের ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ক মাসিক পত্রিকা' হিসাবে পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। অনিয়মিতভাবে হলেও, দীর্ঘদিন মুসলমান সমাজ ও ধর্মের সেবা নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছে পত্রিকাটি। প্রথম থেকেই পত্রিকাটি খ্রিস্টানদের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। ১৮৯৯-এর জানুয়ারি মাসে গোপালচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় *প্রচার* নামে একটি 'খ্রীষ্টীয়ান মাসিকপত্র' প্রকাশিত হওয়ার পর ব্যাপারটা চরমে পৌঁছয়। *ইসলাম প্রচারক*-এর সঙ্গে পত্রিকাটির রীতিমতো ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়। *ইসলাম প্রচারক*-এ বাইবেল ও খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে কলম ধরেন শেখ জামিরুদ্দিন ও এবনে মাআঁজ-এর মতো প্রভাবশালী লেখক। *প্রচার*-সম্পাদক শুধু ইসলামের নিন্দা করেই ক্ষান্ত হয়নি, হিন্দুধর্মের কুৎসাপ্রচারেও তিনি ছিলেন সমান উৎসাহী। তাঁর এই মনোভাবের সমালোচনা করে *শ্রীহট্টদর্পণ* লেখে—

খ্রীষ্টীয়ান সম্পাদক হিন্দুধর্ম্মের কথা, দেবদেবীর কথা, অবতারের কথা এবং শ্রীগৌরাঙ্গচরিত বুঝিবার সম্পূর্ণ অনধিকারী।..অনধিকারচর্চ্চা করা কেবল অন্যায় নহে, সময় সময় তাহা মহাপাপ হয়, প্রচার সম্পাদক পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন বলিয়াই কি বৈর নির্য্যাতন করিবার অভিপ্রায়ে বদ্ধপরিকর হইয়া মাসে মাসে পরনিন্দারূপ বহ্নি উৎগীরণ করিয়া থাকেন? (*শ্রীহট্টদর্পণ*, পৌষ-মাঘ, ১৩০৭)

একদিকে ধর্মীয় মাহাত্ম্য ও তত্ত্বকথা প্রচার, অন্যদিকে পারস্পরিক আক্রমণের যে ট্রাডিশন বাংলা ধর্ম ও তত্ত্বমূলক পত্রিকার প্রায় জন্মলগ্ন থেকে শুরু হয়েছিল, শতাব্দী শেষেও বাঙালিসমাজ তা থেকে মুক্ত হতে পারলেন না। একথার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে রাখা দরকার। পারস্পরিক বিভেদ ও বিদ্বেষের এই অস্বস্তিকর পরিবেশেও কিছু সম্পাদক প্রচার করে গেছেন সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর বাণী। মনে আসছে মাগুরার গোলাম কাদের-এর *হিন্দুমুসলমান সম্মিলনী*-র কথা। মনে পড়ছে উনিশ শতকের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত মীর মশাররফ হোসেন-এর লেখার অংশবিশেষ—

ভাই হিন্দু-মুসলমান। আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া যে জন্মভূমিতে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছি, যে জন্মভূমির প্রদত্ত ধন-ধান্যে জীবনরক্ষা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতেছি, যে মাতৃভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিয়া সকল কার্য্য সমাধা করিতেছি। সেই মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার উন্নতির জন্য প্রাণপণে সকলেরই কি যত্ন ও চেষ্টা করা উচিত নহে।

আ শি স খা স্ত গী র

উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকার সম্পাদক

উনিশ শতকের সূচনায় বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সমাজসচেতন মানুষের মনে যে নবজিজ্ঞাসার উদয় হয়েছিল তার সলতে পাকানোর পর্ব চলেছে আঠারো শতক জুড়ে। ১৭৬৫-তে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় এদেশ পরিণত হল কাঁচামালের আড়তে। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (ইং ১৭৭০) ভয়াবহ মন্বন্তরে ভেঙে পড়ল বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন। তিন বছর পর ১৭৭৩-এ কলকাতা ভারতের রাজধানীতে পরিণত হল।

কলকাতার দ্রুত সমৃদ্ধির নেপথ্য-ভূমিকা ছিল ইংরেজদের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ঘন ঘন পরিবর্তন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার। নানা পরিবর্তনের পর ১৭৯৩-এ পুরোনো ভূমি-ব্যবস্থার পুরো ছবিটাই পালটে গেল। বাঙালি বুঝল সত্যিই বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস। বিত্তকৌলীন্য বংশকৌলীন্যকে পিছনে ফেলে দিল। 'হঠাৎ নবাব'-এর দল চাইল ক্ষণিকের আমোদ-প্রমোদ, চড়া ধাতের রঙ্গ-রসিকতা। বারাঙ্গনা-বিলাস এবং পাশাপাশি মদ্য-প্রীতি ও গঞ্জিকাসেবন-প্রবণতা ছিল সেই সময়কার সমাজে এক দগদগে ঘা। বাঙালিসমাজে তখন সংস্কারের, আচার-বিচারের অন্ধকার। সামাজিক ও ধর্মীয় কুপ্রথা, কুসংস্কার সমাজকে ভিতরে ভিতরে কাঁপা করে দিলেও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মঞ্চ তৈরি হয়নি।

কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে ঘটে গেল আমূল তোলপাড়। ১৮১৩-তে কোম্পানির সনদে এদেশীয়দের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অনুমতি দেওয়া হল। ১৮৩৩-১৮৪২-এ ১০৪৫ জনকে ধর্মান্তরিত করার কাজ সেরে ফেললেন মিশনারিরা। ধর্মান্তরকরণের বিরোধিতায় এক মঞ্চে দাঁড়ালেন রাধাকান্ত দেব, সত্যচরণ ঘোষাল, রামগোপাল ঘোষের মত মানুষ।

উনিশ শতকের প্রথম থেকেই নারীকেন্দ্রিক এক একটি সমস্যা সমাজের মধ্যে আলোড়ন তুলতে শুরু করে। প্রথমটি সতীদাহপ্রথা। ১৮২৯-এর ডিসেম্বর নিষিদ্ধ ঘোষিত হল সতীদাহপ্রথা। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মহানির আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত রক্ষণশীল গোষ্ঠী গঠন করলেন 'ধর্মসভা'। হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। তাদের সে প্রচেষ্টা পরিণতি লাভ করে নানা সভা-সমিতি, সাময়িকপত্র ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মধ্য দিয়ে।

১৮৫৬-তে রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে আর এক ধাক্কা। বিধিবদ্ধ হল বিধবা বিবাহ। ওদিকে কৌলীন্যপ্রথারও বিরুদ্ধতা করল ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী এবং মিশনারিরা। বাংলার সমাজে আরও একবার ঢেউ উঠল নারীশিক্ষা নিয়ে। নারীকে শিক্ষিত করার চেষ্টা শুরু হয় ১৮১৭-র পর থেকে। অনেক তর্ক-বিতর্ক, ঝড়-ঝাপটা পার হয়ে বেথুনের 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল'-এর যাত্রা শুরু ১৮৪৯-এ। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা করেও সফল হননি রক্ষণশীল নেতারা।

গণতন্ত্রীকরণ দেখা গেল শিক্ষার ক্ষেত্রেও। উনিশ শতকে শিক্ষার প্রসার সমাজের

শ্রেণিনির্বিশেষে সকল মানুষের সামনে 'বুদ্ধিজীবী' অভিধাযুক্ত হবার সুযোগ করে দিল। একদিকে জমিদার-ধনিক শ্রেণি, অন্যদিকে দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়। এরই মধ্যে ইংরেজ শাসনে উঠে এল মুদ্রা ও শিক্ষানির্ভর নতুন শ্রেণি—মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী।

উচ্চতর শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ল উকিল, শিক্ষক, ডাক্তার, প্রশাসনিক দপ্তরে কেরানিকুলের সংখ্যা। যদিও কেরানিদের সংখ্যাবৃদ্ধির হার বিদ্যাবুদ্ধিজীবীদের তুলনায় ছিল অনেক বেশি। পাশাপাশি বেড়েছে ছোটো ব্যবসায়ী আর উকিল-মোক্তারের সংখ্যা।

তবে শিক্ষানির্ভর শ্রেণি মানেই যে স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত, একথা ভাবা ভুল। ধনশালী সম্প্রদায় এবং তাঁদের অনুগত গোষ্ঠীও ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হল সম্পূর্ণ বৈষয়িক কারণে। তাঁদের অবলম্বন হল প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা। এককথায় এঁরা হলেন হিন্দু রক্ষণশীল গোষ্ঠীভুক্ত। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ঝুঁকে পড়লেন পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের দিকে। দু'দলই ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে সচেতন থাকলেও, প্রথম দল রইলেন ইংরেজদের অনুগত আর দ্বিতীয় দল হয়ে উঠলেন ইংরেজদের কড়া সমালোচক।

১৭৯৩-এর আগে পর্যন্ত ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত মিশ্র প্রশাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু কর্নওয়ালিস-প্রবর্তিত ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সরকারি উচ্চপদ থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত করা। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ পুনর্নবীকরণে ভারতীয় বাণিজ্য ইউরোপীয়দের কাছে উন্মুক্ত করা হয়। ফল হল মারাত্মক। ভারতে ব্রিটেনের বাজার জাঁকিয়ে বসল এবং ভারতের শিল্পগুলি ধ্বংসের মুখোমুখি হল। এই শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যমূলক আচরণের মধ্যেই উনিশ শতকের সূচনা।

দুই

শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে যে-দুটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা গেল, তার প্রতিফলন ঘটল সংবাদ-সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায়। মধ্যবিত্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবী তার মতামত প্রকাশের, তর্ক-বিতর্কের এবং প্রতিবাদের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বেছে নিলেন সংবাদ-সাময়িকপত্রকে। তাতে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন বেশ কয়েকজন মানুষ। এঁরা পত্র-পত্রিকার সম্পাদক। একশো বছরে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের সম্পাদনা বা পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত মানুষের সংখ্যা কম নয়। নানা কারণে তাঁদের সকলের কথা বলার সুযোগ এই আলোচনায় নেই।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন—*তখনকার দিন ছিল লেখক-বিরল; সম্পাদকের পত্রিকার প্রায় অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা পূরণের ভার নিতে হত বা নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হত।* অর্থাৎ তখন পত্র-পত্রিকা হয়ে উঠেছিল ব্যক্তিচিহ্নিত। অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক —সব দিক দিয়েই সম্পাদকের মতামতের দ্বারাই পত্র-পত্রিকার স্বাতন্ত্র্য সূচিত হতে শুরু করল। গঙ্গাকিশোরের *বাঙ্গাল গেজেটি* বছরখানেক জীবিত ছিল ঠিকই, কিন্তু কোনো সংখ্যা না পাওয়ায় পত্রিকাটিতে সম্পাদক গঙ্গাকিশোরের পরিচয় কতটা ফুটেছে তা বলা সম্ভব নয়। ১৮২১-এ *সম্বাদ কৌমুদী*-র প্রকাশনায় যুগ্মভাবে এগিয়ে এসেছিলেন দেওয়ান তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীচরণ এক বছরের বেশি

পত্রিকাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেননি। এরপর *কৌমুদী*-র সম্পাদনার দায়িত্ব বেশ কয়েকবার হস্তান্তরিত হয়েছে। হরিহর দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র কোঙার, আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হলধর বসু, রাধাপ্রসাদ রায় প্রমুখের ওপর ক্রমান্বয়ে দায়িত্ব বর্তেছে। ফলে *কৌমুদী*-তেও সম্পাদকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মুদ্রিত হয়নি। সে-স্বাতন্ত্র্যের সূচনা ভবানীচরণের *সমাচার চন্দ্রিকা* থেকে। এরপর ঈশ্বর গুপ্তের *প্রভাকর*, অক্ষয় দত্তের *তত্ত্ববোধিনী*, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ*, দ্বারকানাথ রায়ের *সুলভ পত্রিকা*, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের *এডুকেশন গেজেট* (১৮৬৮-র ডিসেম্বর থেকে), দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের *সোমপ্রকাশ*, কাঙাল হরিনাথের *গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা*, উমেশচন্দ্র দত্তের *বামাবোধিনী পত্রিকা*, শিশিরকুমার ঘোষের *অমৃতবাজার পত্রিকা*, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের *অবলাবান্ধব*, কেশবচন্দ্র সেনের *সুলভ সমাচার*, বঙ্কিমচন্দ্রের *বঙ্গদর্শন*, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের *আর্য্যদর্শন*, কালীপ্রসন্ন ঘোষের *বান্ধব*, প্রমদাচরণ সেনের *সখা*, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের *হিতবাদী*, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের *দাসী* ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা সম্পাদকের নামেই চিহ্নিত হয়ে গেল। সম্পাদক এবং পত্রিকা তখন একই মর্যাদায় আসীন।

সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশনা প্রথমে ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফসল। পরে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা এতে যুক্ত হয়। বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে সমবেত প্রচেষ্টা প্রথম দেখা গেল *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকায়। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, তারকচন্দ্র বসু প্রমুখ 'সাহিত্য সমালোচনী সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। সে-সভায় পঠিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকায়। এরপর মাঝেমধ্যে 'কতিপয় শিক্ষিত যুবক' মিলেমিশে পত্রিকা বার করছেন। যেমন, *সর্ব্বরসরঞ্জিনী*, *জগদ্বন্ধু* ইত্যাদি। ওপার বাংলা থেকে যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র *ঢাকাপ্রকাশ*। পত্রিকাটির একটি পরিচালক গোষ্ঠী ছিল। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বসু, চন্দ্রকান্ত বসু, দীনবন্ধু মৌলিক, ব্রজসুন্দর মিত্র প্রমুখ।

উনিশ শতকে ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্যে স্থাপিত সভা-সমিতির মুখপত্র হিসেবেও বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। সে-সব পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে সাধারণত কোনো পেশাদার ব্যক্তিকেই নিয়োগ করা হত। প্রথমেই বলতে হয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মুখপত্র *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র কথা। মাসিক ৩০ টাকা বেতনে অক্ষয়কুমার দত্ত পত্রিকাটির সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর 'সত্যসঞ্চারিণী সভা'র মুখপত্র *সত্যসঞ্চারিণী* (সম্পা. শ্যামাচরণ বসু), 'সর্ব্বশুভকরী সভা'র *সর্ব্বশুভকরী* (রাজনারায়ণ বসু লিখছেন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং বিদ্যাসাগর এই পত্রিকাটির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা, নামেমাত্র সম্পাদক ছিলেন মতিলাল চট্টোপাধ্যায়।), 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ'-এর *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ*—এমনই আরও অনেক পত্রিকার নাম করা যায়। ঢাকায় ১৮৬৫-তে গোঁড়া হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান 'হিন্দু ধর্ম্মরক্ষিণী সভা' স্থাপিত হয়। এই সভার মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় *হিন্দু হিতৈষিণী*। হরিশচন্দ্র মিত্র ছিলেন এর প্রথম সম্পাদক। রাজশাহির 'বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা'র মুখপত্র ছিল *হিন্দুরঞ্জিকা*। সম্পাদক শ্রীনাথ সিংহরায়। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের 'সঙ্গত সভা'র মুখপত্র *বঙ্গবন্ধু* প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গচন্দ্র রায়ের সম্পাদনায়। একইভাবে নাম করতে পারি ঢাকার 'শুভসাধিনী সভা'র *শুভসাধিনী* (সম্পা. কালীপ্রসন্ন ঘোষ), 'মনোরঞ্জিকা সভা'র *মনোরঞ্জিকা* (সম্পা. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার) ; পাবনার 'জ্ঞানদায়িনী সভা'র *জ্ঞানবিকাশিনী*, 'উদ্যোগবিধায়িনী সভা'র *উদ্যোগবিধায়িনী* ;

বিক্রমপুরের 'জ্ঞানমিহির বিকাশিনী সভা'র *সংস্কার সংশোধনী* ; ময়মনসিংহের 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী সভা'র *বিদ্যোন্নতিসাধিনী* এমন আরও অসংখ্য পত্র-পত্রিকার।

কখনও কোনো বিশেষ ব্যক্তির নামের আড়ালে কাজ করেছেন সম্পাদনায় অভিজ্ঞ অপর কেউ। বিশেষ ব্যক্তিটি থাকতেন নামেমাত্র সম্পাদক। যেমন, *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকায় সম্পাদকরূপে নাম থাকত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের। কিন্তু সম্পাদনার দায়িত্ব সামলাতেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। *সম্বাদ তিমিরনাশক* এই দুজনের গাঁটছড়াকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে ছাড়েনি।

> দক্ষিণারঞ্জন........বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গলা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলে নয়..........একজন নাটুরে ভাট মদ্যপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দুদ্বেষী কাগজ আরম্ভাবধি কেবল ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশয়কে কটু কহে..........এজন্য ভদ্রলোকমাত্র কেহ ঐ কাগজ পাঠ করেন না ....।

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের কথা আর একটু বলি। একই সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ ও ইংরেজ রাজত্বের সমর্থক এবং বিপরীতদিকে সতীদাহপ্রথা কৌলীন্যপ্রথা ও সাঁওতাল বিদ্রোহের বিরোধী খর্বাকৃতি চেহারার গৌরীশঙ্কর (গুড়গুড়ে) ভট্টাচার্য জন্মেছিলেন অষ্টাদশ শতকের শেষ বছরে (১৭৯৯), মৃত্যু ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে। গৌরীশঙ্কর বেথুনের 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলে' বাড়ির মেয়েদের পাঠিয়েছেন, বিধবা বিবাহের সমর্থনে শুধু লেখনী ধারণই নয়—ইয়ংবেঙ্গল দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বর্ধমানের বিধবা রানি বসন্তকুমারীর বিয়েতে একমাত্র সাক্ষী ছিলেন। এই বিবাহটি একাধারে বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ এবং আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ। সাহস করে গৌরীশঙ্কর প্রচার করেছিলেন, তিনি রামমোহনের সকল সংস্কারের সমর্থক। আবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ রাজত্বকে রামরাজত্বের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং সাঁওতাল বিদ্রোহকেও সমর্থন জানাননি। উনিশ শতকীয় দোলাচলবৃত্তি গৌরীশঙ্করের মধ্যেও প্রকট হয়েছিল। এ কারণে অশ্লীল রচনা ও ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক নিবন্ধাদি প্রকাশ করার জন্য গীতা, চণ্ডী, মহাভারত গ্রন্থের অনুবাদক গৌরীশঙ্করের অর্থদণ্ড এবং একাধিকবার কারাবাসও ঘটেছে। পরবর্তীকালে রামমোহনের আনুগত্য ভুলে গৌরীশঙ্কর 'ব্রাহ্মসভা' ত্যাগ করেছেন এবং রাধাকান্ত দেবের 'ধর্মসভা'য় যোগ দিয়েছেন।

তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূচনা *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকার সম্পাদকীয় কাজকর্ম নির্বাহের মাধ্যমে। এরপর আড়াল থেকে পরিচালনা করেছেন *সম্বাদ ভাস্কর* (১৮৩৯, প্রথমে সম্পাদক হিসেবে নাম থাকত শ্রীনাথ রায়ের), *সম্বাদ রসরাজ* (১৮৩৯, এখানে সম্পাদকের নাম ছিল যথাক্রমে কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য ও ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়ের) *হিন্দুরত্নকমলাকর* (১৮৫৭, পত্রিকাটি ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশিত হত)। গৌরীশঙ্করের সুদক্ষ সম্পাদনায় *সম্বাদ ভাস্কর* সেযুগের উল্লেখযোগ্য একটি সংবাদপত্রে পরিণত হলেও তিনি স্বয়ং অশ্লীলতা, ব্যক্তিগত আক্রমণ ও কুৎসাপ্রচারের পথ থেকে বিরত হননি। সেকালে জনরুচির চাহিদাও সম্ভবত এ-ই ছিল। নচেৎ *রসরাজ*-এর গ্রাহকসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে কেন? 'সে-যুগের কোন ভাল সংবাদপত্রেরও এত গ্রাহক ছিল না।' যদিও তাঁর পরিণতি মোটেই ভালো হয়নি। একাধিকবার অর্থদণ্ড ও কারাবাস ঘটার পরও তিনি কলকাতার মান্যজনদের বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা লিখতে কুণ্ঠিত হলেন না। শেষে কমলকৃষ্ণ

দেবের উদ্যত রোষের মুখে পড়ে গৌরশঙ্কর *রসরাজ*-কে বিদায় দিতে বাধ্য হলেন।

আড়াল থেকে অপরের নামে সম্পাদনার কাজটি সম্পন্ন করেছেন আরও কিছু মানুষ। এঁদের মধ্যে একজন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। *সংবাদ রত্নাবলী*-র (১৮৩২) সম্পাদক হিসেবে মহেশচন্দ্র পালের নাম থাকলেও প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। গুপ্তকবি নিজেই লিখেছেন—'মহেশচন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কিছু মাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য্য আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম।' ঈশ্বরচন্দ্র নবকৃষ্ণ রায়ের বকলমে সম্পাদনা করেছেন *সংবাদ সাধুরঞ্জন* (১৮৪৭) পত্রিকাটি।

কয়েকজন সম্পাদক একই সঙ্গে একাধিক পত্রিকা বা একটি পত্রিকার মৃত্যুর পর আর একটি সম্পাদনা করেছেন। যেমন, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ মুস্তফী, রাজেন্দ্রলাল দাসঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রমুখ। পত্রিকা প্রকাশ বা সম্পাদনা করা যেন তাঁদের কাছে নেশার মত হয়ে উঠেছিল। তবে 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'র মত সম্পাদক সেকালে কমই ছিলেন। কারণ গাঁটের কড়ি খরচ করার সামর্থ্য ছিল না মধ্যবিত্ত সম্পাদকদের অনেকেরই। তাঁদের হাত পাততে হত উচ্চবিত্ত জমিদার-ভূস্বামী বা ব্যবসায়ীদের কাছে। প্রকৃতপক্ষে তখনই সম্পাদকরা পৃষ্ঠপোষকের আজ্ঞানুবর্তী হয়ে পড়তেন। এর ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়।

অনেকে যেমন প্রাণের টানে পত্রিকা সম্পাদনার ভার বহন করেছেন, তেমনই অনেকে পত্রিকা সম্পাদনাকে বেছে নিয়েছেন পেশা হিসেবে। পত্র-পত্রিকার সম্পাদনায় পেশাদারিত্ব তখনই দেখা গেছে, যখন কোনো ধনী ব্যক্তি বা কোনো সভা-সমিতি পত্রিকাটির ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব বহন করতেন। হাল আমলের পরিভাষায়. যাকে বলে স্পনসরশিপ। সম্পাদনায় পেশাদারিত্ব চলে আসায় নতুন একটি পেশার উদ্ভব যেমন হল, তেমনই আরও কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়তে লাগল। যোগ্য ব্যক্তির কদর বাড়ল। যোগ্যতাসম্পন্ন, জনচিত্তজয়ে সক্ষম সম্পাদকদের মাইনে ধাপে ধাপে বাড়ানো হত। পাছে অধিকতর মাইনে পেয়ে তিনি না আবার অন্য কোনো পত্রিকায় যোগ দেন। উনিশ শতকের অন্যতম প্রভাবশালী সাংবাদিক এবং কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কথাই ধরা যাক। চাকরি করছিলেন স্কুলে ১৫ টাকা বেতনে। সেই চাকরি ছেড়ে ২৫ টাকা মাইনের *ঢাকাপ্রকাশের* সম্পাদক হিসেবে কাজে যোগ দেন। পরে আর একটি স্কুলে তিনি ৩০ টাকা মাইনের আমন্ত্রণ পেলে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তাঁর মাইনে আরও দশ টাকা বাড়িয়ে ৩৫ টাকা করে দেন। কিছুদিন পর কৃষ্ণচন্দ্র *ঢাকাপ্রকাশ*-এর কাজ ছেড়ে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে *বিজ্ঞাপনী* পত্রিকায় সম্পাদকের কাজে যোগ দেন। কবি দীনেশচরণ বসু অবশ্য মাসিক ৫০ টাকা বেতনে *ঢাকাপ্রকাশ*-এর সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। যদিও মাত্র দু'মাসের জন্য তিনি ওই পদে ছিলেন।

এর বিপরীত ছবিটি অবশ্যই করুণ। স্পনসরের পছন্দ না হলে, সেই হতভাগ্য সম্পাদককে সরে যেতে হত। আসতেন নতুন মানুষ। পেশাদারিত্বের কারণেই ঘন ঘন সম্পাদক বদল হত পত্র-পত্রিকার। পত্র-পত্রিকার সম্পাদক বদলের ব্যাপারটি ভালো লাগেনি *সংবাদ প্রভাকর*-এর। ১৮৬৫-র ৩ নভেম্বর পত্রিকাটি মন্তব্য করে—'আজিকাল সম্পাদকদিগের নাম পরিবর্ত্তন করা একটি অভ্যাস হইয়া উঠিল। এখন আর সাধ্যপক্ষে কেহ আপনার উপর

ঝোঁক রাখিতে চাহেন না। এ উপায় মন্দ নয়।' এর ফলে একজন ব্যক্তি বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন এমনটি হামেশাই চোখে পড়ত।

সম্পাদক বদলের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার চরিত্রগত ধর্মও পরিবর্তিত হত। ব্রাহ্মদের মুখপত্র হিসেবে ১৮৪৩-এ প্রকাশিত *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* সম্পাদনার দায়িত্ব অক্ষয়কুমার দত্ত দীর্ঘদিন পালন করার পর উনিশ শতকে সে-দায়িত্ব নির্বাহ করেন যথাক্রমে নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁরা সকলেই ব্রাহ্ম মতাবলম্বী হলেও বিস্ময়ের ব্যাপার এই, অক্ষয়কুমারের পর *তত্ত্ববোধিনীর* চরিত্রগত বিপুল পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। তখন এটি হয়ে উঠেছে আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র। তিন আইনে বিবাহ, মেয়েদের উচ্চশিক্ষা, নারী স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে বিরোধিতা বিস্ময়কর। ব্রাহ্ম মতেরই পথিক হিসেবে ১৮৬১-তে *ঢাকাপ্রকাশ*-এর আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রথম সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। কয়েকবছর পর সম্পাদক হয়ে আসেন ব্রাহ্ম দীননাথ সেন। *ঢাকাপ্রকাশ*-এর পরবর্তী সম্পাদকরা হলেন জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী, গোবিন্দপ্রসাদ রায়, অনাথবন্ধু মৌলিক, যাদবচন্দ্র সেন, গুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র বসু। ইতিমধ্যে মালিকানা পালটেছে একাধিকবার। বারবার মালিকানার পরিবর্তন এবং সম্পাদক বদলের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার মনোভাবেরও বদল ঘটে। প্রথম পর্যায়ে পত্রিকায় ব্রাহ্ম-মানসিকতার প্রতিফলন ঘটলেও, পরবর্তীকালে দেখা গেল গোঁড়া হিন্দুত্বের বহিঃপ্রকাশ। এর উলটো ছবি দেখি ১৮৮৬ সালে। সে-বছর ঢাকা থেকে জনৈক কুঞ্জবাবু প্রকাশ করেছিলেন *গরীব* পত্রিকা। বেশিদিন চালাতে পারলেন না। মাত্র তিনশো টাকায় বিক্রি করে দিলেন *ঢাকাপ্রকাশ*-এর কর্মচারী বরদাশঙ্করের কাছে। কুঞ্জবাবু ছিলেন গোঁড়া হিন্দু আর বরদাশঙ্কর খাঁটি ব্রাহ্ম। *সাহিত্য কল্পদ্রুম* পত্রিকার প্রথম সম্পাদক শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। কয়েক মাস পরে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, এরপর ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদক হন। প্রথম দিকে সংস্কারপন্থী হলেও পরবর্তীকালে পত্রিকাটি রক্ষণশীল মতবাদের ধারক হয়ে ওঠে।

১৮৬৪-তে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র রূপে *ধৰ্ম্মতত্ত্ব* পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ। তখন সম্পাদক হিসেবে কারও নাম মুদ্রিত থাকত না। ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পর *ধৰ্ম্মতত্ত্ব* ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্রে পরিণত হয়। তৃতীয় বর্ষে সম্পাদক হন উমানাথ গুপ্ত। পরবর্তীকালে এটি হয় নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র। তখন সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন গৌরগোবিন্দ রায়। ফলে পরিচালকমণ্ডলীর মতামতই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। সম্পাদক সেখানে নিমিত্তমাত্র। একই ঘটনা ঘটেছে *বামাবোধিনী পত্রিকা*-র ক্ষেত্রে। উমেশচন্দ্র দত্ত কেশবচন্দ্রের গুণমুগ্ধ ছিলেন বলে *বামাবোধিনী*-র প্রথম পর্বে স্ত্রীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা বিষয়ে কেশবচন্দ্রের মতামতের প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু ১৮৭৮-এ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পর উমেশচন্দ্র দত্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। তখনকার *বামাবোধিনী*-র পৃষ্ঠপোষক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাই পত্রিকাটি পরিচালিত হত।

·

এমনও দেখা গেছে, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে স্বয়ং সম্পাদকেরই মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সাপ্তাহিকরূপে ১৮৩১-এ যাত্রা শুরু করে ১৮৩৬-এ বারত্রয়িক এবং তিন বছর পর ১৮৩৯ সালে বাংলা ভাষায় প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র

হিসেবে *সংবাদ প্রভাকর* আত্মপ্রকাশ করে। দীর্ঘদিন সম্পাদক থাকার সুবাদে ঈশ্বরচন্দ্র সামাজিক ও রাজনৈতিক ওঠাপড়ার সাক্ষী ছিলেন। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের মতামতেরও পরিবর্তন ঘটেছে। *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকা প্রথমদিকে রক্ষণশীল থাকলেও, পরবর্তীকালে পত্রিকায় দেখা যায় উদারমতের প্রতিফলন। এ কারণে বিরোধিতা ছেড়ে স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহের সমর্থনে এবং সমর্থনের পরিবর্তে কৌলীন্যপ্রথার বিরোধিতায় এগিয়ে এসেছিল প্রভাকর। যে মানুষটি রক্ষণশীলদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চড়া সুরে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা করেছেন, এমনকি 'রাত্রিকালে বৈকালে অবাধে প্রতিদিন বারেক দুইবার যাইয়া গুণবতীদিগের গুণের পরীক্ষা' নেবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন, যিনি ছড়া কেটে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন—'যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে, / এ বি লিখে, বিবী সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে' ; সেই তিনিই নিজেকে আমূল পালটে ফেললেন। বেথুনের প্রয়াসকে স্বাগত তো জানালেনই, উপরন্তু বিরোধীদেরও সমালোচনা শুরু করলেন। *সংবাদ প্রভাকর*-এর সম্পাদকীয়তে দেখা দিলেন এক নতুন ঈশ্বর গুপ্ত।

> ...আমরা স্থির নেত্রে পুরুষ জাতির বিদ্যাশিক্ষার বিবিধ উপায় অবলম্বন করত যেরূপ সুখানুভব করিতাম, স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার উপায়াভাব জন্য সেইরূপ দুঃখিত ছিলাম, কিন্তু মান্যবর মেং জে ই ডি বেথুন সাহেব আমারদিগের সেই দুঃখ নিবারণের জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন,...তাহার প্রারম্ভ সময়ে এতদ্দেশীয় দলাদলি প্রিয় মহানুভব মহাশয়েরা তাহার উন্নতির প্রতি প্রতিবন্ধকতা করণে ত্রুটি করেন নাই,...কিন্তু সকলের সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছিন্ন করিয়া এইক্ষণে বেথুন সাহেবের স্ত্রী বিদ্যালয় যত উন্নত হইতেছে ততই আমরা হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছি,...।

ঈশ্বরচন্দ্রের *সংবাদ সাধুরঞ্জন*-ও স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করেছে।

এর বিপরীত উদাহরণ *বান্ধব*-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষের। কালীপ্রসন্ন ঘোষ ব্রাহ্ম থাকাকালীন সময়ে নারীমুক্তির সমর্থনে ও কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে বই লেখেন। কিন্তু হিন্দু ধর্মে প্রত্যাবর্তনের পর যেসব বই লিখেছেন তাতে দেখা গেছে ভক্তিবাদের প্রচার, আবেগ ও রক্ষণশীলতা। স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে কালীপ্রসন্ন লিখছেন,

> নারী জাতিকে অন্নজলে বঞ্চিত করিয়া মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করা যদি পাপ হয়, শিক্ষালাভে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে দুঃখ দুর্গতি এবং পাপমুখে নিক্ষেপ করা তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক পাপ।

সঙ্গে সঙ্গে এ-ও লিখেছেন--

> যা বিবেককে অধিক সামর্থ্যসম্পন্ন, তাহাদিগের বিশ্বাসকে অধিক দৃঢ় এবং নির্ম্মল করিতে পারে, তাহাই নারীজাতির বিশেষ আলোচনীয়। ধর্মতত্ত্বের জটিল তর্কজালেই জীবন অবসিত হইল, হৃদয় ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিল না, এমত শিক্ষার প্রয়োজন নাই। (*নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব*)

মত বদলানোর আর একটি উদাহরণ হরিশ্চন্দ্র মিত্র। হরিশ্চন্দ্র বরাবর ব্রাহ্মবিরোধী। দেশীয় কুপ্রথার উচ্ছেদসাধনে লেখনী ধরলেও পরে বিধবাবিবাহের বিরোধী হয়ে পড়েন। তখন *সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়* লেখে, 'হরিশবাবু এতকাল চিরদুঃখিনী বঙ্গ বিধবাদিগের সপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করিয়া এক্ষণ তাহাদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন শিক্ষিত অন্তঃকরণের এতাদৃশ পরিবর্তন অসম্ভবনীয়।'

তিন

বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের সম্পাদক বা পরিচালকের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে সকলেই উঠে এসেছেন সাধারণ ঘর থেকে, দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে। পরবর্তীকালে নিজ চেষ্টায় অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করেছেন। আবার এর উলটো ছবিও আছে। সম্পন্ন ভূস্বামী বা উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান হয়েও ঘটনাচক্রে অর্থকষ্টে পড়েছেন। অল্প বয়সে বা অকালে মাতৃহীন অথবা পিতৃহীন হয়েছেন অনেকে। ফলে অর্থের প্রয়োজনে পড়াশুনা ছেড়ে চাকরি (তা সে যেমন চাকরিই হোক না কেন) করতে হয়েছে তাঁদের। চাকরি তখন তুলনামূলকভাবে সহজলভ্য ছিল তো বটেই!

অক্ষয়কুমার দত্ত মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। সাংসারিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও আয়ত্ত করেছেন দেশি বিদেশি নানা ভাষা। *ভারতমিহির* পত্রিকার সম্পাদক অনাথবন্ধু গুহ ছিলেন দরিদ্র-সন্তান। ক্রমে বিত্ত ও খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন আইনের ব্যবসা করে। *হেলেনাকাব্য* রচয়িতা আনন্দচন্দ্র মিত্র ছিলেন মেধাবী ছাত্র। কিন্তু আর্থিক কারণে পড়াশুনা বেশিদূর এগোয়নি।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মেছেন মধ্যবিত্ত পরিবারে। পিতা ওকালতি করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দরিদ্র-সন্তান। পিতা কবিরাজি করতেন। দশ বছরে মাতৃবিয়োগ ঘটে। লেখাপড়া তেমন শিখতে পারেননি। নিজ প্রতিভাবলে উন্নতি করেছেন। সাংবাদিক এবং কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারকে অবশ্য দরিদ্র-সন্তান বলা যায় না। তাঁর দাদু ছিলেন বরিশালের কীর্তিপাশার জমিদার। জমিদারি থেকে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্য তিনি একটি বৃত্তিও ঠিক করে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের মাত্র ছ'মাস বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটে। এক বছরের মধ্যে তাঁর বড়দারও প্রয়াণ হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। এরপর কৃষ্ণচন্দ্রকে পরানুগ্রহে ও পরাশ্রয়ে পড়াশুনা করতে হয়েছে। মামার বাড়ি আশ্রয় হল তাঁর। তবে বেশিদিন মন টেঁকেনি সেখানে। পালিয়ে এলেন কলকাতায়। তা-ও কিছুদিনের জন্য। ফিরে গেলেন ঢাকায়। বিয়েও করলেন। তখন উপার্জন না থাকায় বেশ কিছুদিন বেকারত্ব ও দারিদ্রের জ্বালা সহ্য করেছেন। অবশেষে চাকরি পেলেন স্কুলে। ব্যক্তিগত জীবনে খ্যাতি ও স্বাচ্ছন্দ্য তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল সুরাপানের দিকে। আত্মসংযম না থাকায় বিপর্যয় নেমে এল জীবনে। কর্মচ্যুত হন তিনি। ১৮৭০-এ একটি স্কুলের চাকরি যোগাড় হলেও অর্থাভাব তাঁর ছিল। ১৮৭৪-এ যশোর জেলা স্কুলের প্রধান পণ্ডিতপদে যোগ দেবার পর অর্থাভাব কিছুটা মেটে। [১]

বিখ্যাত ইয়ংবেঙ্গল কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শৈশব ও কৈশোর কাটিয়েছেন নিদারুণ দারিদ্রে। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য মাত্র ১৫ বছর বয়সে নিঃসম্বল অবস্থায় শ্রীহট্ট থেকে নৈহাটিতে এসেছিলেন। এরপর পাণ্ডিত্য অর্জন করে কলকাতায় উপস্থিত হন। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় অন্নকষ্ট ভোগ করেছেন। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁর জন্য ৫০ টাকা মাসোহারার বন্দোবস্ত করেছিলেন। তিনিই *উপাসনা* পত্রিকাটি প্রচারের সুবন্দোবস্ত করে দেন। *পরিদর্শক, বিজ্ঞান কৌমুদী, সত্যান্বেষণ* পত্রিকার সম্পাদক জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ছিলেন দরিদ্র-সন্তান। পড়াশুনা করেছেন সংস্কৃত কলেজে এবং সেই কলেজেই পরে গ্রন্থাগারিক হন।

সাহিত্যিক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় সর্বদা অন্নচিন্তায় বিব্রত থেকেছেন। 'চক্রবর্তী ফ্যাকশনে'র তারাচাঁদ চক্রবর্তী ডেভিড হেয়ারের স্কুল থেকে ফ্রি স্কলার হয়ে হিন্দু কলেজে ছাত্র হিসেবে আসেন। কিন্তু অর্থাভাবে পড়াশুনা শেষ করতে পারেননি। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাল্যকাল কেটেছে অসচ্ছলতায়। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওরফে ভুবনমোহিনী দেবীর সাত বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটে। অসহায় নবীনচন্দ্রকে নবদ্বীপের বিখ্যাত ধনী গুরুদাস দাস তাঁর গদিতে খাতাপত্র লেখার কাজে নিয়োগ করেছিলেন।

প্যারীচরণ সরকারের পিতা ভৈরবচন্দ্রের রোজগার ছিল বেশ ভালো। ভৈরবচন্দ্রের মৃত্যুর পর (১৮৩৮) বিরাট পরিবারের দায়িত্ব এসে পড়ে প্যারীচরণের বড়দা পার্বতীচরণের ওপর। ইতিমধ্যে প্যারীচরণ হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়েছেন। তবে পারিবারিক কারণেই তাঁকে মাঝপথে (১৮৪৩) কলেজ পরিত্যাগ করতে হয়। সে-বছরই অকালে চলে গেলেন পার্বতীচরণ। ফলে প্যারীচরণকেই পথে নামতে হল উপার্জনের জন্য। ৮০ টাকা বেতনে হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের চাকরি পেলেন প্যারীচরণ।

বিহারীলাল চক্রবর্তীর বাবা যজমানি করতেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা টাঁকশালে চাকরি করতেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় সাংসারিক অর্থকষ্টে চাকরিতে ঢুকেছিলেন। মনোমোহন বসুর বাবা ছিলেন কলকাতা থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত ডাকের ঠিকাদার। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির দারিদ্রের জন্য বিদ্যাশিক্ষা হয়নি। শুরুতে ছাপাখানার প্রুফ দেখা, গৃহশিক্ষকতা ইত্যাদি করেছেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, রাজকৃষ্ণ রায় মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। রাজকৃষ্ণ শৈশবেই মাতৃহীন হন। পড়াশুনা বেশিদূর করতে পারেননি। রোজগারের আশায় প্রথমে চাকরি নেন নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে (নিউ বেঙ্গল প্রেস)। সেখানেই সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। শিশিরকুমার ঘোষ ছিলেন সম্পন্ন পরিবারের সন্তান। কিন্তু ১৮৬৩-তে পিতৃবিয়োগের ফলে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেল। প্রেস বন্ধ করে শিক্ষকতার চাকরি নিলেন।

হরিনাথ মজুমদারের ছোটোবেলা কেটেছে নিদারুণ দুঃখ-দারিদ্রে। হরিশ্চন্দ্র মিত্র সারাজীবন দারিদ্রে কাটিয়েছেন। শিক্ষা বেশিদূর হয়নি। ঢাকার বাংলা স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন, বাঙ্গালা যন্ত্রে কম্পোজিটরের চাকরিও করেছেন। মাত্র ৩৪ বছরের জীবৎকালের মধ্যে কয়েকটি সংবাদ-সাময়িকপত্র সম্পাদনা ছাড়াও লিখেছেন ৫৩টি নানাধরনের বই। অর্থের তাগিদে লিখেছেন পাঠ্যপুস্তকও।

চার

সম্পাদকদের মধ্যে নানা পেশার সমাবেশ। বড়ো অংশ পেশায় উকিল বা আইনজ্ঞ। উনিশ শতকের সূচনায় আরবি-ফারসি ও সামান্য ইংরেজি জানা মানুষের আইন-আদালতে চাকরির সুযোগ ছিল। পেশাগত বৈচিত্র্য তেমন ছিল না বলেই এই পেশায় শিক্ষিত মানুষের ভিড় বাড়ল সবচেয়ে বেশি। *ঢাকাপ্রকাশ*-এ ১ মে ১৮৭০ সালে এই পেশার একটি ছবি তুলে ধরা হয়।

ব্যবসায়ীর সংখ্যা যত অধিক হয়, ব্যবসায়ের গৌরবও তত খর্ব্ব হয় ; এবং তাহাতে ক্রমে নানা প্রকার বিকৃত ভাব প্রকাশ করে। এক্ষণকার ওকালতির সেই দশা। সম্প্রতি ইহাতে বৎসর চ বহুতর লোক প্রবেশ করিতেছেন। সুতরাং ওকালতির গৌরবও ক্রমে খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। ওকালতি স্বাধীন ব্যবসায়, কিন্তু এখন আর ইহাতে তত স্বাধীনতা দৃষ্ট হয় না। অনেক উকিল, বেতনভোগী চাকরের ন্যায় হাকিমের আনুগত্য স্বীকার করেন।...ইহা ব্যতীত আর একটী গুরুতর দোষ আছে। উকিলদিগের মধ্যে পরস্পরের ঐক্য নাই। বরং নানা প্রকার জিগীষা, দ্বেষ ও ঈর্ষ্যার প্রাদুর্ভাব। ইহাতে যে কতদূর অনিষ্ট হইতেছে, বলা বাহুল্য।

ওকালতি করেছেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (*ঐতিহাসিক চিত্র*), অক্ষয়চন্দ্র সরকার, (*সাধারণী, নবজীবন*), অনাথবন্ধু গুহ (*ভারতমিহির*), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (*পঞ্চানন্দ*), কালীপ্রসন্ন ঘোষ (*শুভসাধিনী, বান্ধব*), চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (*উপাসনা, মাসিক সমালোচক*), জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস (*সময়*), জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় (*পতাকা, বঙ্গবাসী*) প্রমুখ। কালীপ্রসন্নর পিতা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। তিনি ছেলেকে ধর্মনাশের ভয়ে ইংরেজি শেখাননি। কিন্তু কালীপ্রসন্ন নিজের চেষ্টায় ইংরেজি শিখেছিলেন। তাঁর প্রথম চাকরি ঢাকা ছোটো আদালতের পেশকার হিসেবে। পরে ভাওয়াল রাজ্যের প্রধান কর্মচারী। কিছুদিন ছিলেন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট। *বিভাকর* ও *প্রভাত* পত্রিকার সম্পাদক নবীনচন্দ্র দাস ছিলেন আইনের অধ্যাপক, রঙপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টার।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা সর্বজনবিদিত। ব্যোমকেশ মুস্তফী (*তপস্বিনী, ভারত, সাহিত্য কল্পদ্রুম, বঙ্গনিবাসী, ভারত সংবাদ, সাপ্তাহিক বসুমতী, মালা*) অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখরের পুত্র। নানা কারণে প্রথাগত উচ্চশিক্ষালাভ তাঁর ঘটেনি। কর্মসূত্রে তিনি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে এক সাধারণ কর্মচারী। যদুনাথ মজুমদার কাশ্মীর রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারির পদ ত্যাগ করে যশোহরে ওকালতি করতে এসেছিলেন। তিনি সম্পাদনা করতেন *সম্মিলনী* এবং *হিন্দু* পত্রিকা। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মজীবনে ইনকাম ট্যাক্স অ্যাসেসর, ডেপুটি কালেক্টর, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি চাকরি করেছেন। *নব্য ব্যবহার সংহিতা*-র প্রকাশক ও *ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা*-র সম্পাদক রামচন্দ্র ভৌমিক ঢাকার সদর আমিন আদালতে ওকালতি করতেন। লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার (*শাস্ত্রপ্রকাশ*) কলকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রথম লাইব্রেরিয়ান। এরপর তিনি পূর্ণিয়া জেলা-আদালতের জজ-পণ্ডিত হন। জাস্টিস সারদাচরণ মিত্র সম্পাদনা করেছেন *প্রকৃতিরঞ্জন*।

এরপর শিক্ষক অথবা শিক্ষাজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষ। উনিশ শতকের প্রথম দিকে শিক্ষকের অভাব খুব বেশি করেই দেখা দিয়েছিল। হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একঝাঁক তরুণ আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁরা ইয়ংবেঙ্গল। তাঁদের অনেকেই শিক্ষকতার বৃত্তিকে বেছে নিলেন। প্রায় একই সঙ্গে উঠে এলেন সংস্কৃত কলেজের আরও একদল উজ্জ্বল ছাত্র। বিদ্যাসাগর যাঁদের মধ্যমণি। শতকের মাঝপর্ব থেকে শিক্ষকতার বৃত্তিকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করলেন অসংখ্য তরুণ তরুণী। ততদিনে একের পর এক উচ্চশিক্ষার দরজা খুলে গেছে বাঙালির সামনে। শতাব্দী-শেষে শিক্ষকের অভাব থাকল না।

এই শ্রেণির মানুষ শিক্ষকতার পাশাপাশি পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি, সংবাদ-সাময়িকপত্রের সম্পাদনা সমানভাবে করেছেন। শুধু তা-ই নয়। স্কুল-কলেজ স্থাপনেও এগিয়ে এসেছিলেন। কখনও ব্যক্তিগত উদ্যোগ, কখনও সমষ্টিগত উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে। কয়েকটি উদাহরণ দিই। অক্ষয়চন্দ্র সরকার চতুষ্পাঠী ও 'সাধারণী স্কুল' নামে একটি ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অনাথবন্ধু গুহ ময়মনসিংহে পিতার নামে স্থাপন করেছিলেন 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়' ও স্ত্রীর নামে 'রাধাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়'। বারাণসীতে মায়ের নামে স্থাপন করেন 'জগদম্বা জাতীয় আয়ুর্বেদ মহিলা বিদ্যালয়'। গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় 'নিউ ইন্ডিয়ান স্কুল' প্রতিষ্ঠা করে তার পরিচালনাও করেন। গিরিশচন্দ্র বসু ছিলেন বঙ্গবাসী স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ ও রেক্টর। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ স্বগ্রামে জীর্ণ বিদ্যালয় সংস্কার, বিদ্যালয় স্থাপনে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা ইডেন স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। রসিককৃষ্ণ মল্লিক ১৮৩১ সালে হিন্দু ফ্রি স্কুল স্থাপন করেছেন। যশোহরে শিশিরকুমার ঘোষের পরিবারের পক্ষ থেকে নানা জনহিতকর কাজ করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে কয়েকটি স্কুল স্থাপন। হরিনাথ মজুমদার নিজ গ্রামে পড়াশুনার অভাব দূর করার জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেন। বিনা বেতনে স্কুলটিতে তিনি পড়াতেন।

সম্পাদকদের মধ্যে শিক্ষকতার বৃত্তিতে এসেছেন অক্ষয়কুমার দত্তের মত আরও অনেকেই। যেমন, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী (স্কুল-শিক্ষক, ঠাকুর পরিবারের মহিলাদের শিক্ষক), আনন্দকিশোর সেন, আনন্দচন্দ্র মিত্র (ময়মনসিংহের জেলা স্কুলের শিক্ষক), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কর্মজীবনের শুরু স্কুলের হেডমাস্টারি দিয়ে), উমেশচন্দ্র দত্ত (দীর্ঘদিনের শিক্ষক। শিক্ষকতা করেছেন জয়নগর স্কুল, কলিকাতা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি, হিন্দু স্কুল, দত্তপুকুর নিবাধুই মধ্য-ইংরেজি বাংলা স্কুল, রাজপুর স্কুল, হরিনাভি ইংরেজি-সংস্কৃত উচ্চ বিদ্যালয়, কোন্নগর ইংরেজি স্কুল, স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়, কলিকাতা স্কুল, বেথুন স্কুল ও সিটি স্কুলে। সিটি স্কুল কলেজে পরিণত হওয়ার পর তিনি তার অধ্যক্ষ হন। আমৃত্যু উমেশচন্দ্র ওই পদে সমাসীন ছিলেন।), কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (*বিচারক, হিতবাদী* পত্রিকার সম্পাদক। হেডমাস্টার ছিলেন একাধিক স্কুলে। এরপর মাসিক ১০০ টাকা বেতনে কিছুদিনের জন্য কলকাতার ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুলস হন। প্রেসিডেন্সিতে অধ্যাপক। এরপর আইন পাশ করে শিক্ষকতা ত্যাগ করে ওকালতি শুরু করেন। শেষে রিপন কলেজে আইন বিভাগের অধ্যক্ষ।), কৃষ্ণকুমার মিত্র, ক্ষেত্রমোহন দত্ত (হিন্দু কলেজ পাঠশালার প্রধান শিক্ষক, 'আত্মীয় সভা'র সভ্য), নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

নববিভাকর পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার লন্ডন মিশন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। গিরিশচন্দ্র বসু *গুণাকর, কৃষি গেজেট* পত্রিকার সম্পাদক। কটন কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় শিক্ষকতা করেছেন বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল এবং রাজসাহীর অন্তর্গত পুঁটিয়া ইংরেজি স্কুলে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় কর্মজীবনে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতা করেছেন।

দীনেশচরণ বসু স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কিছুদিন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। এরপর সংস্কৃত কলেজে প্রথমে লাইব্রেরিয়ান, তারপর শিক্ষকতা করেছেন ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত।

দ্বারকানাথ রায় হিন্দু স্কুলের শিক্ষক। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষকতা করেছেন ভাগলপুরে টি. এন. জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে। ওই স্কুলে তাঁর ছাত্র ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্যারীচরণ সরকারের প্রথম চাকরি হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে। দু'বছর পর ১৮৪৫-এ ১৫০ টাকা মাইনেয় বারাসাত গভর্নমেন্ট স্কুলে, ১৮৫৪-তে ২০০ টাকা মাইনেয় কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে বদলি এবং ১৮৬১ সাল থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা। আমৃত্যু তিনি সেখানেই ছিলেন। *সখা*-সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় বাড়ি থেকে বিতাড়িত হন। তখন তিনি কিছুদিন নকিপুর স্কুলে এবং তারপর কলকাতার সিটি স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় বিপিনচন্দ্র পালও ত্যাজ্যপুত্র হন। *পরিদর্শক* পত্রিকা সম্পাদনাকালে তিনি ছিলেন সিলেট জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। কিছুদিনের জন্য *সমাচার চন্দ্রিকা* সম্পাদনা করেছেন। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি বিভিন্ন স্কুলে হেড পণ্ডিতের কাজ করেছেন। *সুরভি* পত্রিকার সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ বসু কলকাতা রিপন কলেজে সংস্কৃত পড়ানো শুরু করেন। এরপর দেওঘরে একটি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন। শিক্ষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি বহুদূর ছড়িয়েছিল।

মডেল ভগিনী রচয়িতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু আইন পরীক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু ওকালতি করেননি। কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন জনাই স্কুলে। *আর্যাদর্শন*-সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররূপে কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ পাশ করেছেন। শিক্ষকতা করেছেন ওই কলেজ এবং ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজে। *সংবাদ রসসাগর, সংবাদ সাগর* সম্পাদক এবং *এডুকেশন গেজেটের* নির্বাহী সম্পাদক কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মজীবনের শুরুতে ছ'মাসের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন।

হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র অন্যতম ডিরোজিয়ান রসিককৃষ্ণ মল্লিক পটলডাঙায় ডেভিড হেয়ারের স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করলেও, হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরোধিতা করে চাকরিটি হারান। প্রখ্যাত ডিরোজিয়ান রাধানাথ শিকদার শিক্ষকতা করেছেন প্যারীচাঁদ মিত্রের অবৈতনিক স্কুলে এবং জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইন্সটিটিউশনে। রামচন্দ্র মিত্র হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র ও অধ্যাপক। বিটন সোসাইটির সম্পাদক। জাস্টিস অব দি পিস এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। এঁদের সঙ্গে রামদয়াল মজুমদার (*অধ্যয়ন*), রামসদয় ভট্টাচার্য, (শুভকরী-র সম্পাদক। উত্তরপাড়া গভর্নমেন্ট বাংলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক), রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ (পটলডাঙা ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনের পণ্ডিত, রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত শিক্ষক), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (২৩ বছর বয়সে সিটি কলেজে শিক্ষকতা শুরু করে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত সেখানে শিক্ষকতা করেছেন) প্রমুখের নামও করতে হয়।

শিশিরকুমার ঘোষকে শিক্ষকতার চাকরি নিতে হয়েছিল, একথা আগেই বলেছি। এরপর ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অনুগ্রহে ডেপুটি ইন্সপেক্টর। কিন্তু তাতে ইস্তফা না দিয়ে ইনকাম ট্যাক্স এসেসরের কাজে যোগ দেন। ভূদেবের অভিযোগে তাঁর দুটি চাকরিই চলে যায়। *সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়*-এর প্রথম সম্পাদক হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকা স্কুলের হেড পণ্ডিতের চাকরি পেয়ে সম্পাদনা পরিত্যাগ করেন। 'কাঙাল হরিনাথ' রূপে পরিচিত *গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা*-র সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার ছিলেন কুমারখালি বাংলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক।

জলধর সেন এল এ ফেল করে ২৫ টাকা বেতনে গোয়ালন্দের স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। এরপর শিক্ষকতা করেছেন মহিষাদলের রাজস্কুলে। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে বিক্রমপুর এবং ফরিদপুরের স্কুলে শিক্ষকতা করেন। *ঢাকাপ্রকাশ, হিতৈষিণী*-সম্পাদক দীননাথ সেন ঢাকা কলেজ থেকে বি এ পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে পারেননি। এরপর শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। কিছুদিন পর ঢাকা নর্মাল স্কুলের প্রধানশিক্ষক। পরে পূর্ব বাংলার স্কুল ইন্সপেক্টর। নোটবই লিখেছেন বিস্তর। স্কুল ইন্সপেক্টর হওয়ার সুযোগটি তিনি পুরোমাত্রায় ব্যবহার করতেন। তিনি নিজেই তাঁর বই স্কুলগুলিতে পাঠ্য করতে সচেষ্ট থাকতেন। অন্যদিকে বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষও দীননাথকে খুশি করার চেষ্টা করতেন। এমনকি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত মানুষও তাঁর *ভারতবর্ষের ইতিহাস* বইটি পাঠ্য করার জন্য দীননাথকে অনুরোধ করেছিলেন।

প্রকৃতি-সম্পাদক প্রভাতচন্দ্র সেন চাকরি করতেন ফরিদপুর জেলার ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ হিসেবে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষকতার বৃত্তি থেকে ক্রমশ উন্নতি হতে হতে শেষে স্কুল ইন্সপেক্টরের পদপ্রাপ্তি। *একাকিনী, সমাজদর্পণ* পত্রিকার সম্পাদক যশোদানন্দন সরকারও ছিলেন খুলনার ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অন্যতম অনুবাদক হেমচন্দ্র বিদ্যাবত্ন ভট্টাচার্য কিছুদিন সম্পাদনা করেছেন *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাটি*। তিনি শিক্ষাবিভাগের সাব ইন্সপেক্টর পদে কাজ করেছেন।

আছেন নানা স্তরের সরকারি-বেসরকারি চাকুরে। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি করেছেন প্রথমে বোর্ড অব রেভিনিউয়ে সামান্য বেতনে অস্থায়ী পদে, এরপর হুগলি জজ কোর্টে সেরেস্তাদারের পদে, শেষে কলকাতা হাইকোর্টে। কবি সুনির্মল বসুর ঠাকুর্দা গিরিশচন্দ্র বসু তমলুকে সল্ট এজেন্সিতে হেড রাইটারের চাকরি করেছেন। এরপর যথাক্রমে সেক্রেটারিয়েটে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার, মুর্শিদাবাদে নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারি, কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের ম্যানেজারের কাজ করেন। গোবিন্দচন্দ্র কোঙার ছিলেন মিলিটারি বোর্ড অফিসের কেরানি। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুকাল সরকারি চাকরি করেছেন। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় কর্মজীবনে ১৮৭০ সাল থেকে সরকারি কর্মী। বেঙ্গল গেজেটিয়ার সঙ্কলনে কাজ করেছেন। উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে শেষে কলকাতা মিউজিয়মে সহকারি কিউরেটর।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মজীবন বিচিত্র এবং দীর্ঘ। প্রথমে নিয়েছিলেন ডকেট কোম্পানির সরকারি চাকরি। এরপর 'সদর মেটের কর্মে নিযুক্ত হন।' একবছর পর সেখানে মুৎসুদ্দি। ২৭ থেকে ৩২ বছর বয়স পর্যন্ত তীর্থভ্রমণ। ফিরে এসে ফোর্ট উইলিয়মের মেজর জেনারেল উইলিয়ম কারের মুৎসুদ্দি, এরপর 'কেম্পটন সাহেবের বাটীতে কার্যাভিষিক্ত'। তারপর ক্রমান্বয়ে করেছেন ডাইলি সাহেবের অধীনে 'কলিকাতা পরমিটের দারোগাগিরি', পদোন্নতি ঘটে 'প্রধান কলকিউলেটরের কর্মে', আবার কার সাহেবের চাকরি, বিশপ মিডলটন সাহেবের চাকরি, হেনরি ব্লাপেট সাহেবের মুৎসুদ্দি, বিশপ হিবর সাহেবের চাকরি, ক্রিস্টোফার পুলারের অধীনে চাকরি, বিশপ মিডলটন প্রতিষ্ঠিত বিশপস কলেজে অধ্যক্ষতা, 'শোলা দানার নিমক এজেন্ট মেং জিনিং সাহেবের অধীনে শোলা দানার মধ্য ডিবিজনের সিরিস্তাদারী' (১৮২৬), হুগলি কালেকটারির খাজাঞ্চিগিরি, 'ইংলিসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক

'ইষ্টাকুইলর' সাহেবের অফিসে 'অধ্যক্ষৈকত্ব', ট্যাক্স অফিসের দেওয়ানি, হিকি বেলি কোম্পানির বাণিজ্যালয়ে প্রধানগিরি। ভোলানাথ সেন *বঙ্গদূত, অনুবাদিকা* সম্পাদনা করেছেন। তিনি দেওয়ান দ্বারিকানাথ ঠাকুরের অধীনে চাকরি করতেন। নীলরত্ন হালদারের পর তিনি *বঙ্গদূত*-এর সম্পাদক হন।

সম্পাদকদের মধ্যে কয়েকজন পুলিশকর্মীও ছিলেন। যেমন *ভোজবাজী, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান* পত্রিকার সম্পাদক অমৃতলাল বসু নদিয়া নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর, *ধর্ম্মতত্ত্ব* পত্রিকার সম্পাদক গৌরগোবিন্দ রায় পুলিসের সাব ইন্সপেক্টর। তিনি নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সদস্য, *ধর্ম্মতত্ত্বের* তৃতীয় সম্পাদক। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় কর্মজীবনে কিছুদিনের জন্য ছিলেন কটকে পুলিসের সাব-ইন্সপেক্টর।

চিকিৎসক-সম্পাদকরা চিকিৎসা সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকাই সম্পাদনা করেছেন। ব্যতিক্রম দু'একজন আছেন যাঁরা অন্য ধরনের পত্র-পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। যেমন *বিনোদিনী* পত্রিকার সম্পাদক নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওরফে ভুবনমোহিনী দেবী, *পারিজাত, বিকাশ*-সম্পাদক রসিকমোহন চক্রবর্তী, *তত্ত্বমঞ্জরী*-সম্পাদক রামচন্দ্র দত্ত (ইনি ডাক্তার-অধ্যাপক), *সাহিত্য সংক্রান্তি*-সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ (হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক) এবং *বঙ্গমহিলা*-সম্পাদক ভুবনমোহন সরকার। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে আমরা ডাক্তার হিসেবে গণ্য করতে পারি। তাঁর ডাক্তারি জীবনের সূত্রপাত অভিনব। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের পর যখন নবীনচন্দ্র অর্থোপার্জনের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন, তখন এক ডাক্তারের পরামর্শে অ্যালোপ্যাথির বই পড়তে শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যে বীরভূমের কীর্ণাহারে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দিল। এক বন্ধুর উপদেশে দু চারটি ওষুধ সম্বল করে সেখানে যাত্রা করলেন অর্থোপার্জনের আশায়। সে-আশা ফলবতী হয়েছিল। নিজেই বলেছেন 'আমার নিকট রাশি রাশি অর্থ বৃষ্টি হইতে লাগিল।' অর্থ পেয়ে সেখানেই থিতু হলেন। এরপর তিনি এমন একটি ওষুধ তৈরি করলেন, যাতে জ্বর নিরাময় এবং জ্বরঘটিত যাবদীয় পীড়ার উপশম হয়। নাম দিলেন 'নবীনবাবুর লৌহসার'। ওষুধের সুনাম ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র বাংলায়। নবীনচন্দ্র স্বীকার করেছেন 'ওষুধটি বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচারিত ও সমাদৃত হইয়া আমার আর্থিক অভাবের সম্যক্ নিরাকরণ করিয়াছে।' আর একজনের নাম অবশ্যই করতে হয়। তিনি *কল্পলতা*-র সম্পাদক ও 'স্বর্ণলতা'র লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন হিসেবে বাইশ বছর চাকরি করেছেন। ভ্যাকসিনেশন সুপারিন্টেডেন্ট হয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরেছেন।

অঘোরনাথ ঘোষ ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। সেকালের বিখ্যাত চিকিৎসক ব্রাহ্ম অন্নদাচরণ খাস্তগীর ছিলেন নারীমুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সহযোগী। *ভীষক দর্পণ*-সম্পাদক জহিরুদ্দিন আহমদ শল্যচিকিৎসক হিসেবে কলকাতায় সুনাম অর্জন করেছিলেন। মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের শিক্ষক-ডাক্তার হন। শুধু ডাক্তার হিসেবে নয়, সমাজ-সংস্কৃতির সেবক হিসেবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। ১৮৯৫-এ কলকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নিযুক্ত হন। চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক একটি বড় বই (*অস্ত্র-চিকিৎসা,* ১৮৮৩) লিখেছেন। *বঙ্গবন্ধু* ও *ভিষক*-সম্পাদক দুর্গাদাস রায় ছিলেন খ্যাতনামা চিকিৎসক। *ধাত্রীশিক্ষা, শরীরপালন* প্রভৃতি গ্রন্থ

প্রণেতা বিখ্যাত ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেছেন *চিকিৎসাদর্পণ, পল্লীগ্রাম* নামে সাময়িকপত্র।

সে-সময় ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাওয়া রীতিমত সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল। কিন্তু সে-সৌভাগ্যকে অবহেলা করে সাংবাদিকতায় এসেছিলেন কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (*পরিণাম*)। দীনেশচরণ বসু (*চারুবার্ত্তা*) মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলেও শারীরিক কারণে পড়াশুনা চালাতে পারেননি। নবকৃষ্ণ রায় (*সাধুরঞ্জন*), কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (*দৈনিক চন্দ্রিকা*) মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রথমে মেডিক্যাল কলেজে ও পরে আইন পড়েন।

বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র ও ছাপাখানার মধ্যে নিকট-সম্পর্ক রয়েছে. সম্পর্কটি নিকটতর হয়েছে দু'ভাবে। মূলত এক বা একাধিক প্রেসের মালিক ব্যবসায়ে সফল হওয়ার পর পত্রিকা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। সেক্ষেত্রে সম্পাদনার ব্যাপারটি গৌণ। অন্যদিকে আর একদল মানুষ হাতে টাকা থাকায় পত্রিকা ও প্রেস একই সঙ্গে কিনে নিয়ে তার মালিক হয়ে বসেছেন। শুধুমাত্র পত্র-পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রেস স্থাপন করে পরবর্তীকালে সেই প্রেস থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বই ছাপা হচ্ছে, এমন উদাহরণ প্রচুর। সেকালে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করতেন বা পত্র-পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে চলতেন। তাঁদের কারও কাবও নিজস্ব প্রেসও ছিল। কিন্তু সে-প্রেস থেকে কখনই কোনো পত্র-পত্রিকা ছাপাননি। উদাহরণ বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত যন্ত্র। এই প্রেস থেকে কোনো পত্র-পত্রিকা ছাপা হয়নি।

সাময়িকপত্র ও ছাপাখানার মধ্যে নিকট-সম্পর্কটি গড়ে দিয়েছেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। তিনি ছাপাখানা স্থাপন করেন ১৮১৮ সালে। প্রেসের নাম বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস বা আপিস। অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য ১৮৩৮-এ স্থাপন করেছিলেন 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র'। কাজের চাপ বাড়ায় ৮৩নং রাধাবাজারে 'শাখা-পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করেন। *মিত্রপ্রকাশ, সুবোধিনী*-সম্পাদক কালিদাস মিত্রের হাতে ঢাকার গিরিশ যন্ত্রের তত্ত্বাবধান ভার অথবা পরিচালনভার ন্যস্ত ছিল একসময়। ১৮৭০ সালে *মিত্রপ্রকাশ* পত্রিকাটি গিরিশ যন্ত্র থেকে ছাপা হত। *বঙ্গবন্ধু*-র সম্পাদক ব্রাহ্ম কৈলাসচন্দ্র নন্দী নিউ প্রেস (১৮৭৮) ও ইস্টবেঙ্গল প্রেসের (১৮৭৭) মালিক। *বঙ্গবন্ধু, মহিলা* পত্রিকার সম্পাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারিতে নকলনবিশ ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী। তিনি ঢাকা গেন্ডারিয়া যন্ত্রের মালিক। মানিকগঞ্জের তালুকদার গোঁড়া হিন্দু গুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরী ১২৯১ বঙ্গাব্দে ৩৪৫০ টাকায় ঢাকাপ্রকাশ এবং বাঙ্গালা যন্ত্রের মালিকানা কিনে নেন। *ঢাকাপ্রকাশ* পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন কয়েকবছর (১২৯১-১৩০৮)। সরকারি চাকুরে গুরুচরণ রায় প্রথম চার বছর *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* পত্রিকাটি চালিয়েছিলেন। মধ্যবিত্ত গুরুচরণের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী ভাগীরথী দেবী *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* প্রেসের তাবৎ বস্তু এবং দেনা-পাওনা নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের কাছে বিক্রি করে দেন।

গোবিন্দপ্রসাদ রায় (*ঢাকাপ্রকাশ*) প্রথমে ছিলেন *ঢাকাপ্রকাশ*-এর বেতনভোগী কর্মচারী। ব্রাহ্মকর্মী গোবিন্দপ্রসাদ পত্রিকা প্রকাশের পঞ্চম বছরে *ঢাকাপ্রকাশ* এবং বাঙ্গালা যন্ত্রের স্বত্ব

কেনেন। রানি ভিক্টোরিয়ার ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণের সময় দিল্লিতে পূর্ববঙ্গের একমাত্র সম্পাদকরূপে ডাক পান। যদিও তিনি সেখানে যাননি। জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ভাবপ্রকাশ ও পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রালয়ের স্থাপক। *আদরিণী* পত্রিকার সম্পাদক তারকনাথ বিশ্বাস সে সময়কার জনপ্রিয় গ্রন্থকার। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আদরিণী প্রেস। *প্রজাবন্ধু*-সম্পাদক তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় গোন্দলপাড়ার ব্যাস যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে পিতা হরচন্দ্র ন্যায়রত্নের সঙ্গে যৌথভাবে 'বাঙ্গালা যন্ত্র' স্থাপন করেন। ঠিকানা ১নং সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেন, চাঁপাতলা। পিতার মৃত্যুর পর প্রেসের মালিক হন দ্বারকানাথ। ওই প্রেস থেকে ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয় *সোমপ্রকাশ* পত্রিকা।

এডুকেশন গেজেট ও *হিতসাধক* পত্রিকার সম্পাদক 'ফার্স্ট বুক' রচয়িতা প্যারীচরণ সরকার স্কুল বুক প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত নিজের লেখা বইয়ের সমাদর দেখেই প্রেস স্থাপনের চিন্তা তাঁর মাথায় আসে। তবে শুধু নিজের বই নয়, অন্যের লেখা বই এবং একাধিক সাময়িকপত্রও স্কুল বুক প্রেস থেকে ছাপা হয়েছে। প্রেসের ব্যবসায় তাঁর যত লাভ হয়েছে, প্রেসও তত বড় হয়েছে। লভ্যাংশ থেকেই একাধিক বাড়ি তৈরি করা, ছেলেকে বিলেত পাঠানো এবং দুঃস্থ মানুষকে দানধ্যান সবই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

বসন্তক, রচনা রত্নাবলী, রহস্য সন্দর্ভ-সম্পাদক প্রাণনাথ দত্ত সুচারু যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। *শুভসাধিনী* এবং *বঙ্গবন্ধু* পত্রিকার সম্পাদক কেশবচন্দ্রের অনুগত ব্রাহ্ম বঙ্গচন্দ্র রায় ঢাকার ইস্টবেঙ্গল প্রেসের অন্যতম মালিক। ইস্টবেঙ্গল প্রেসের আর একজন মালিকের নাম শশিভূষণ রায়। তিনি *ঈষ্ট* পত্রিকার সম্পাদক। *ঢাকাপ্রকাশ*-এর আর এক কর্মচারীর নাম বরদাশঙ্কর দাস। তিনি পরে ঢাকার গরীব যন্ত্রের মালিক হন। ওই প্রেস থেকে তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *গরীব* পত্রিকা।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংবাদিকতার হাতেখড়ি হয় রামমোহনের *সম্বাদ কৌমুদী* পত্রিকায়। প্রথম ১৩টি সংখ্যা বেরোনর পর অন্যান্যদের সঙ্গে বনিবনা হল না। কালবিলম্ব না করে তিনি নিজেই একটি প্রেস স্থাপন করলেন। নাম দিলেন সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্র। সেখান থেকে বেরোতে লাগল ভবানীচরণ সম্পাদিত *সমাচার চন্দ্রিকা*। *দূত, হেমলতা*-সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ ঘোষ বেন্টিঙ্ক প্রেসের স্বত্বাধিকারী। *সাপ্তাহিক সমাচার* সাময়িকপত্রের সম্পাদক যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ষাটের দশকে বউবাজার স্ট্রিটে জে. জি. চ্যাটার্জি'স প্রেস নামে একটি ছাপাখানা বসান। তিনি নিজে একাধিক প্রাইমার ও স্কুলপাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থ প্রণেতা। সেকালে বেশ জনপ্রিয় ওই প্রেস থেকে ছাপা হয়েছে অভিধান, নীতিশিক্ষা, নাটক, কাব্য, ধর্ম, জমিদারি, সঙ্গীত, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রবিষয়ক অসংখ্য বই। নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় টাকা ধার করে ঠনঠনিয়ায় তাঁর *বীণা* পত্রিকার জন্য স্থাপন করেছিলেন বীণা যন্ত্র। রাজেন্দ্রলাল দাসঘোষ টালার ইডেন প্রেসের মালিক। বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র নিজের বাড়িতে স্থাপন করেছিলেন বঙ্গদর্শন প্রেস। *বঙ্গদর্শন* সেই প্রেস থেকে ছাপা হত। সেসময় *গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা*-র বড়ই দুঃসময়। পত্রিকা বন্ধ। কিভাবে পত্রিকা চলবে, কিভাবে কয়েকটি সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন চলবে, তা ভেবে হরিনাথ মজুমদার বিভ্রান্ত। এরপর হরিনাথ বলছেন—

> রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় আমার ছাত্র রাজকৃষ্ণ মৈত্রের মুখে শুনিয়াছিলেন, একটি প্রেস অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্র হইলে কুমারখালী সংবাদপত্রিকা গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা ইহা অপেক্ষা ভালভাবে

চলিতে পারে এবং উক্ত প্রেস ধরিয়া আমাদিগের ন্যায় অন্যূন সাত আটটি পরিবার অনায়াসে অন্ন সংগ্রহ করিতে পারে।

এরপর হরিনাথ প্রেস স্থাপন করে তাকে বাঁচানোর জন্য প্রচুর সংগ্রাম করেও শেষরক্ষা করতে পারেননি। নিজেই বলেছেন--'আমার অর্থকৃচ্ছ্রতা পূর্ব্বে যেমন ছিল, তাহা অপেক্ষা বরং ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।' আর ঋণবৃদ্ধি অনুচিত মনে করে তিনি পত্রিকার কাজ বন্ধ করে দিলেন। *কবিতাকুসুমাবলী, অবকাশরঞ্জিকা, ঢাকাদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, হিন্দু হিতৈষিণী, মিত্রপ্রকাশ, হিন্দুরঞ্জিকা*-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মিত্র ১৮৬৪-তে সুলভ প্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৫ থেকে চার বছর সম্পাদনা করেছেন রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন পত্রিকা *হিন্দুহিতৈষিণী*। ১৮৬৯-এ পত্রিকার সম্পাদনা ত্যাগ করে ঢাকায় গিরীশ যন্ত্র স্থাপন করেন।

পত্র-পত্রিকার সম্পাদকদের মধ্যে অনেকেই লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বেশ কিছু মানুষ লেখকরূপে বিখ্যাত হবার পর পত্রিকা বার করেছেন অথবা পত্রিকার সম্পাদক হয়ে বিখ্যাত হয়েছেন। নানা ধরনের বইয়ের পাশাপাশি কয়েকজন ছিলেন বটতলার বইয়ের লেখক। যেমন *হিতবোধ*-সম্পাদক স্কুলের হেডমাস্টার অম্বিকাচরণ গুপ্ত বিবিধ বিষয়ের, বিশেষত গোয়েন্দা কাহিনি ও ছেলেভুলানো গল্পের জনপ্রিয় লেখক ও গবেষক। বটতলা থেকে তাঁর বই প্রকাশিত হত। *এডুকেশন গেজেট-এ* তাঁর *কপট সন্ন্যাসী* বইয়ের বিজ্ঞাপন-- এলোকেশী হত্যার বিবরণ। মূল্য পোস্টেজ সহ ।।/০ আনা ; প্রকৃত ঘটনা অবগত হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা আছে, একবার দেখুন।...শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত, হেডমাস্টার।

নাট্যকার ও অভিনেতা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতা বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করতেন *কৃষিতত্ত্ব, দ্রব্যগুণতত্ত্ব, পাকপ্রণালী, গৃহস্থালী* নামে সাময়িকপত্রাদি। রান্নাবান্না এবং চাষবাসের কয়েকটি বইও লিখেছেন। বটতলার নামকরা লেখক হলেন বৈষ্ণবচরণ বসাক। ১৮৮৭ সালে এঁর সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রকাশ করেছিলেন *সঙ্গীত কল্পতরু* বইটি। তিনি বসাক প্রেস নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেছিলেন মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে। বৈষ্ণবচরণের লেখা কিছু বইয়ের নাম--*হরবোলা ভাঁড়, খেমটা ও সৌখীন সঙ্গীত, নূতন প্রেম সঙ্গীত, রঙদার চাটনি, বালক সঙ্গীত* ও *সোহাগ সঙ্গীত* ইত্যাদি। ইনি *আর্য্যপ্রতিভা* নামে সাময়িকপত্রের প্রকাশক। বটতলার আর একজন সুপরিচিত গ্রন্থকার রাজেন্দ্রলাল দাসঘোষ। তাঁর লেখা বইগুলি সেকালে সাধারণ পাঠকের কাছে বেশ জনপ্রিয় ছিল। তিনি একাদিক্রমে বেশ কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। *উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা, উদাসিনী রাজকন্যার পুঁথি, রত্নসিংহ, রহস্যসংগ্রহ, জগৎবাসী*।

সম্পাদকদের কেউ কেউ ছিলেন ছোটো বড়ো মাঝারি মাপের ব্যবসায়ী। ছোটো বা মাঝারি মাপের ব্যবসার মধ্যে কাপড়ের দোকান, অলঙ্কারের দোকান ইত্যাদির সঙ্গে ছিল বইয়ের দোকান। পত্রিকা সম্পাদনা ও বইয়ের ব্যবসায় রয়েছে আত্মীয়তার টান। এ-কারণে কয়েকজন বইয়ের ব্যবসায় নেমেছিলেন। যার পথিকৃৎ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। মধ্যবিত্ত-সন্তান গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্মজীবন শুরু করেছিলেন শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় কম্পোজিটর

হিসেবে। কাজ শিখে কলকাতায় এলেন। কলকাতায় গ্রন্থপ্রকাশ ও বিক্রির ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন। ব্যবসার প্রসারের দিকে তাঁর বিশেষ মনোযোগ ছিল। শহরে ও গ্রামে বিক্রয়-প্রতিনিধি রেখে তাদের মাধ্যমে বই বিক্রির বন্দোবস্ত করেছিলেন। ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় কলকাতায় বইয়ের দোকান খুললেন।

বড়ো মাপের ব্যবসায়ী অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্যের কথা পরে বলছি। অদ্বৈতচন্দ্র অবশ্য বই বিক্রির ব্যবসাতেও নেমেছিলেন। দোকান খুলেছিলেন প্রথমে পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রালয়ে, তারপর তার শাখা রাধাবাজারে। ঢাকা ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও *ঢাকাপ্রকাশ*-এর অন্যতম সম্পাদক অনাথবন্ধু মৌলিক বই লিখেছেন 'উপদেশমঞ্জরী', 'উপাসনাপদ্ধতি'। ঢাকায় তাঁর বইয়ের দোকান ছিল। নাম অনাথবন্ধু মৌলিকের পুস্তকালয়। উমেশচন্দ্র দত্ত হরিনাভিতে একটি ছাপাখানা এবং জয়েন্ট স্টক কোম্পানি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতেন। কিন্তু তাতে লাভের মুখ দেখতে পাননি। ব্যবসায়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর স্ত্রী কৈলাসকামিনী দেবী 'নিজের বুদ্ধি কৌশলে পরিশ্রমে' সে ঋণ শোধ করেন। *আর্য্যপ্রতিভা*-র সম্পাদক কৈলাশচন্দ্র ঘোষ নিজে বই লিখেছেন। ঢাকায় তাঁর বইয়ের দোকান ছিল। সংক্ষেপে বলা হত কে সি ঘোষের বইয়ের দোকান।

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় নোটবইও লিখেছেন। ঢাকার বাবুরবাজার এলাকায় তাঁর বইয়ের দোকান ছিল। নাম এন. কে. চট্টোপাধ্যায় এন্ড কোম্পানির পুস্তকালয়। বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছেন 'স্থানীয় রীত্যনুসারে কমিশন দেওয়া হয়।' প্যারীচাঁদ মিত্রের বাবা ছিলেন কোম্পানির কাগজ ও হুন্ডির ব্যবসায়ী। প্যারীচাঁদ ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির প্রথমে সাব-লাইব্রেরিয়ান ও পরে লাইব্রেরিয়ান এবং সেক্রেটারি পদে উন্নীত হন। সে সময় তিনি ব্যবসায় মন দেন। ১৮৩৯ সালে কালাচাঁদ শেঠ এবং তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সঙ্গে মিলে আমদানি রপ্তানির ব্যবসা শুরু করেন। এরপর ১৮৫৫-তে তিনি তাঁর দুই পুত্রকে নিয়ে 'প্যারীচাঁদ মিত্র অ্যান্ড সন্স' নামে ব্যবসা চালাতে থাকেন। সততায় সে-ব্যবসা করে প্রচুর আয়ও করেন। বহু বিলেতি কোম্পানির ডিরেক্টর ছিলেন। ভালো বুঝতেন চায়ের ব্যবসা। তাই কয়েকটি চায়ের কোম্পানি তাঁকে ডিরেক্টর করেছিলেন। কৃষি বিষয়ক জ্ঞানও ছিল গভীর।

সচিত্র বিজ্ঞান দর্পণ, সহচরী, জাহ্নবী পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র বীরেশ্বর পাঁড়ে বেশ কিছু পাঠ্যবই ও নোটবই লিখেছিলেন। সম্ভবত তাঁর দেশি কাপড়ের দোকান ছিল। '*আর্য্যপাঠ, শিশুবিজ্ঞান, নীতিকথামালা* লেখার পর তৎকালীন স্কুল ইন্সপেক্টর দীননাথ সেনকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন

> এবার আপনার বিভাগে আর্য্যপাঠ উচ্চ প্রাথমিকের পাঠ্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। ...যদি দয়া করিয়া শিশুবিজ্ঞানখানি এবারকার উচ্চ প্রাথমিক পাঠ্যে নির্দিষ্ট করিয়া দেন এবং সার্কেল স্কুল প্রভৃতির জন্য যে পাঠ্য লিস্টি বাহির করেন তাহার নির্দিষ্ট শ্রেণীতে যদি আমার নীতিকথামালা নির্দিষ্ট করিয়া দেন, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হই। আমি তাহা হইলে দেশী কাপড়ের দোকানেই কিছু পুঁজি করিতে পারি ও তাহা দ্বারা পরিবার প্রতিপালনে সহায়তা ও দেশের যে কিছু কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, তাহারও সফলতা বিষয়ে যত্ন করিতে পারি।

বিভাকর, মধ্যস্থ পত্রিকার সম্পাদক সাংবাদিক কবি নাট্যকার মনোমোহন বসু ১৮৮০ সাল নাগাদ বইয়ের ব্যবসায় নেমেছিলেন।। কলকাতায় 'মনোমোহন লাইব্রেরি' নামে একটি দোকান

খোলেন। সেখানে বিক্রি হত 'অতি সুলভ মূল্যে স্কুল, কলেজপাঠ্য পুস্তক, ম্যাপ, নাটক, নভেল, শাস্ত্র, বটতলার গ্রন্থ প্রভৃতি।' উচ্চমানের সাহিত্যপত্রিকা এবং রবীন্দ্ররচনার উন্মেষকেন্দ্র *জ্ঞানাঙ্কুর* পত্রিকার সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ দাস পরবর্তীকালে একটি অলঙ্কারের দোকান খোলেন রাজসাহী বোয়ালিয়ায়। *হিন্দুরঞ্জিকা*-র ৭.৯.১৮৮৭ সংখ্যায় সেই দোকানের বিস্তৃত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। প্রাপ্তব্য অলঙ্কারাদি ও তার মূল্যের বিবরণসহ বিশিষ্ট ক্রেতাদের তালিকাও দেওয়া হয়েছিল।

শিল্প-বিজ্ঞানবিষয়ক সচিত্র পত্রিকা *রামধনু*-র সম্পাদক সূর্যনারায়ণ ঘোষ ছিলেন ঢাকা কলেজের ল্যাবরেটরির অ্যাসিস্ট্যান্ট।

কিছু সম্পাদক আবার শিক্ষকতা থেকে শুরু করে সরকারি চাকরি এবং ব্যবসাও করেছেন। যেমন, *হেলেনাকাব্য* রচয়িতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য আনন্দচন্দ্র মিত্র ছিলেন মেধাবী ছাত্র। এই কাব্য রচনাকালে তাঁর বিলেত যাওয়ার ইচ্ছে হয়। সেজন্য তিনি বই লিখে এবং ধনবান ব্যক্তিদের সাহায্যলাভে বিশেষ সচেষ্ট হন। কিন্তু উপযুক্ত অর্থের যোগাড় না হওয়ায় ব্যবসার দ্বারা অর্থলাভের চেষ্টা করলেন। তা-ও নিষ্ফল হল। ব্যবসায়ে ঋণগ্রস্ত হলেন। বিলেত যাওয়ার ইচ্ছে তাঁর পূরণ হয়নি। অবশেষে আনন্দচন্দ্রকে কলকাতা কর্পোরেশনের অফিসে চাকরি নিতে হয়। এতেও শেষরক্ষা হয়নি। এই ঘোরতর বিপদের দিনে তাঁর সহায় হয়েছিলেন বন্ধু শরচ্চন্দ্র এবং বিদ্যাসাগর। *পাক্ষিক সমালোচক, মালঞ্চ, বঙ্গ নিবাসী, বঙ্গবাসী,* পত্রিকার সম্পাদক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় প্রথমে প্রধান শিক্ষক, এরপর কোর্ট অব ওয়ার্ডসের চাকরি, সবশেষে জমিদারিতে ম্যানেজারি।

পাঁচ

সম্পাদকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অনেক পত্রিকা সাধারণত বন্ধ হয়ে যেত। কখনো কখনো অবশ্য অপর কোনো মানুষ নিজের কাঁধে ওই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন। তবে পত্রপত্রিকা সম্পাদনায় পারিবারিক ঐতিহ্য বা পারিবারিক গণ্ডি বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল। দেখা গেছে, পূর্ববর্তী সম্পাদকের মৃত্যু, কর্মান্তরে ব্যস্ত হওয়া, দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করা বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, বেশ কিছু পত্র-পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়েছে তাঁরই নিকট-আত্মীয় পরিজনের ওপর। সম্ভবত এক্ষেত্রে পারিবারিক স্বার্থটি বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল। কখনো-বা একই পরিবারের একাধিক মানুষও পত্রিকা সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করেছেন।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন কলেজ স্ট্রিট নিবাসী হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিন বছর পত্রিকাটি সম্পাদনা করার পর কর্মান্তরে যাওয়ায় সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন আমড়াতলার বিখ্যাত ধনী পরিবারের সন্তান উদয়চাঁদ আঢ্য। উদয়চাঁদ কলকাতা ট্রেজারি, সল্ট বোর্ড, আবগারি বিভাগের চাকুরে ছিলেন। এর পর থেকে পত্রিকাটি দীর্ঘদিন পারিবারিক গণ্ডি আর পেরোয়নি। বছর দুয়েক পর উদয়চাঁদ দায়িত্ব ছাড়লেন। এলেন তাঁর বড়ো ভাই অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য। অদ্বৈতচন্দ্র চাকরি করেছেন ফোর্ট উইলিয়মের অস্ত্রাগারের হিসেবরক্ষকের পদে, কলকাতা ট্রেজারিতে, সল্ট বোর্ডে এবং কাস্টমস্ সুপারিন্টেনডেন্ট

পদে। ব্যবসাটা ভালো বুঝতেন। দীর্ঘ ৩২ বছর পত্রিকাটি চালিয়েছেন। সরকারি চাকরি ও পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি নিজের ১২ নং আমড়াতলার বাড়িতে 'অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য এন্ড কোং' নামে একটি অফিস খুলেছিলেন। সেই অফিস কোম্পানির কাগজ, বাড়ি, বাগান, জমি প্রভৃতি কেনাবেচার কাজ করত। এছাড়া অল্প সুদে টাকা ধার দেবার জন্য আর একটি অফিস খুলেছিলেন। ১৮৭৩-এ তাঁর মৃত্যুর পর দায়িত্ব বর্তাল পুত্র গোবিন্দচন্দ্র আঢ্যের ওপর। তিনিও ১৩ বছর সেটি সম্পাদনা করেছেন। পত্রিকার পঞ্চম সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ আঢ্য। অদ্বৈতচন্দ্রের খুড়তুতো ভাই নবীনচাঁদ বা নবীনচন্দ্র *বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা পত্রিকা* সম্পাদনা করতেন।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র রাজকৃষ্ণ (*সমাচার চন্দ্রিকা*) পিতার মৃত্যুর পর পত্রিকার দায়িত্ব নেন। কিন্তু ততদিনে *প্রভাকর, পূর্ণচন্দ্রোদয়* ইত্যাদি পত্রিকা বাজার জাঁকিয়ে বসেছে। ফলে ভবানীচরণ যে-প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, পুত্র রাজকৃষ্ণ তা ধরে রাখতে পারলেন না। ঋণের দায়ে দেউলিয়া হয়ে পত্রিকার স্বত্ব বিক্রি করে দিলেন ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। সেকালের জনপ্রিয় লেখক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বেশ কিছু পত্র-পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর জামাই অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা করতেন *সহোদর* পত্রিকা। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুজ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় *পূর্ণিমা*-র সম্পাদক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর পর অনুজ রামচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। উমেশচন্দ্র বসু (*সারস্বতপত্র*) কালীপ্রসন্ন ঘোষের জামাই। কালিদাস মিত্র (*মিত্রপ্রকাশ, সুবোধিনী*) হরিশচন্দ্র মিত্রের অগ্রজ। কুমারদেব মুখোপাধ্যায় (*এডুকেশন গেজেট*) ভূদেব-পুত্র। ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য (*সম্বাদ ভাস্কর, সম্বাদ রসরাজ*), গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের পালিত পুত্র। তিনি গৌরীশঙ্করের মৃত্যুর পর দুটি পত্রিকাকেই পুনর্জীবিত করেন। গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় (*সমাজ ও সাহিত্য*) ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র। পিতা-পুত্র উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

নব্যভারত পত্রিকার প্রথম সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেটি অবশ্য বিশ শতকের কথা। প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর (*সমাচার চন্দ্রিকা*) রামনারায়ণ তর্করত্নের বড় ভাই। *মধ্যস্থ*-সম্পাদক মনোমোহন বসুর দুই পুত্র প্রিয়নাথ ও মতিলাল বসু পত্রিকা সম্পাদনার জগতে এসেছেন। প্রিয়নাথ সম্পাদনা করতেন *শিক্ষা*, মতিলাল *গান ও গল্প*। প্যারীচরণ সরকারের ভাইপো ডাক্তার ভুবনমোহন সরকার পিতৃব্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। সম্পাদনা করতেন *বঙ্গ মহিলা*। প্যারীচরণের কনিষ্ঠ পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ সরকার *প্রয়াস*-এর সম্পাদক ছিলেন। মতিলাল ঘোষ (*অমৃতবাজার পত্রিকা*), শিশিরকুমার ঘোষের অনুজ। পত্রিকা প্রতিষ্ঠার সময় বসন্তকুমার, শিশিরকুমার ও মতিলাল একযোগে কাজ করেছেন। বিশ শতকে শিশিরকুমারের মৃত্যুর পর মতিলাল পত্রিকার একমাত্র সম্পাদক হন। রাধাপ্রসাদ রায় (*সম্বাদ কৌমুদী*) রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রামমোহনের বিলেত যাত্রার পর রাধাপ্রসাদ কিছুদিন *কৌমুদী* পরিচালনা করেন। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজে *ভ্রমর* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পর পাঁচ বছর *বঙ্গদর্শন* পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন 'পত্রখানি (*ভ্রমর*) অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল ; ...প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ

লিখিতেন।' বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। *প্রচার* পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম থাকলেও, এর মূল উদ্যোক্তা ও সাহায্যকারী হলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। ব্রাহ্ম শশিভূষণ বসু সম্পাদনা করতেন *ধর্মবন্ধু*। পরবর্তী সম্পাদক তাঁর ভাই অধরচন্দ্র বসু।

মহিলাদের মধ্যে যাঁরা সম্পাদনার ক্ষেত্রে এসেছেন তাঁরাও পরিচিতিহীন নন। থাকমণি দেবী (*অনাথিনী*) *সহোদর*-সম্পাদক অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। বনলতা দেবী (*অন্তঃপুর*) সেবাব্রতী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা, স্ত্রীশিক্ষার প্রচারক। মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় (*বঙ্গমহিলা*) ডবলিউ সি ব্যানার্জির বোন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত হত মেয়েদের জন্য উঁচুদরের মাসিক পত্রিকা *পরিচারিকা*। সম্পাদনা করতেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কয়েক বছর পর এটি সম্পাদনার দায়িত্ব বর্তায় আর্য্য নারীসমাজের ওপর। তখন থেকে পত্রিকাটি হয়ে পড়ে কেশবচন্দ্রের পরিবারের গণ্ডিতে আবদ্ধ। প্রথমে জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ মোহিনী দেবী, এরপর যথাক্রমে কেশবচন্দ্রের দুই কন্যা সুচারু দেবী এবং মণিকা দেবী পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

ছয়

বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র সম্পাদনে বাঙালি হিন্দুর অনুপাতে বাঙালি মুসলমানের সংখ্যা হাতে গোনার মত। এর কারণ, পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে মুসলমান সমাজে প্রথমাবধি ছিল প্রবল অনীহা। সেই অনাগ্রহ দুর করতে কোনো কোনো মুসলমান নেতা এগিয়ে এসেছিলেন। ১৮৬৬ সালে মুখ্যত বাঙালি মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য ভাবধারার ঘনিষ্ঠ পরিচয় দান করার জন্য আবদুল লতিফের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল 'মহামেডান লিটারারি সোসাইটি'। মোটামুটি একই উদ্দেশ্যে সৈয়দ আমীর আলির নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল 'ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন।' তবে এই সংস্থাটি বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যে 'ইংরেজ বিরোধী চেতনা বিকাশের উদ্দেশ্যে যেসব সভাসমিতি গঠিত হয়' তাদের সঙ্গে একত্র চলতে চেয়েছিল।

মুসলমান সমাজের নবজাগ্রত শিক্ষাচেতনার ফলে উনিশ শতকে সত্তরের দশক থেকে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি দেখা গেল বেসরকারি উদ্যোগও। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বা সম্মিলিত প্রচেষ্টাতে বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল। ইতিমধ্যে তিরিশের দশক থেকে বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার সন্ধান মিললেও প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন সম্পাদক উনিশ শতকে ছিলেন মাত্র কয়েকজন।

উল্লেখযোগ্য সম্পাদকের মধ্যে আছেন কবি আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী (*আহমদী*) (১৮৪৫-১৯১০)। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার সুযোগ তিনি বেশি পাননি। ইউসফজয়ী টাঙাইল, দেলদুয়ার এস্টেটের এক অংশের ম্যানেজার। এই পত্রিকায় মশাররফের *গো জীবন* প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি উদার অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য খ্যাত ছিল। মহম্মদ নইমুদ্দিন (*আখবারে এসলামিয়া*) মাঝারি জোতদার। শিক্ষক ও সাংবাদিক। মহম্মদ রওসন আলি (কোহিনূর) (১৮৭৪-১৯৩৩) সাংবাদিক, সাহিত্যিক। রাজনৈতিক চিন্তাবিদ। কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। বঙ্গভঙ্গ, খিলাফৎ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপনে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। মহম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ (*মুসলমান, মুসলমান বন্ধু, নব সুধাকর, ইসলাম প্রচারক*) অধ্যাপক, জমিদারি এস্টেটের ম্যানেজার। মীর মশাররফ

হোসেন (*আজীজন নেহার, হিতকরী*) পিতা ছিলেন সম্পন্ন জোতদার, গান-বাজনা ও বাঈ নাচের প্রতি আসক্ত। মশাররফের পড়াশুনা বেশিদূর হয়নি। ম্যানেজারি করেছেন কুষ্টিয়ার দেলদুয়ার ও পদমদী এস্টেটে। মোজম্মেল হক (*লহরী, মোসলেম ভারত*) শিক্ষকতা করেছেন। *সময়* পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কবি। ঔপন্যাসিক শেখ আবদুর রহিম (*সুধাকর, মিহির, হাফেজ, মিহির ও সুধাকর, মোসলেম ভারত*) পিতা ও মামা দুজনেই শিক্ষক। তাঁর লক্ষ্য ছিল ইসলামের ভাবধারার আলোকে বাংলার মুসলমান সমাজে নবজাগরণের আন্দোলন।

সাত

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার ধর্ম ও সমাজ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। ধর্ম যেমন সমাজের আচার-অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল, তেমনি সামাজিক সংস্কারাদির আন্দোলনও ধর্মের গোড়ায় আঘাত করেছে। *সম্বাদ কৌমুদী*-তে সহমরণ বিষয়ে লেখালেখি শুরু হবার পর অন্যতম সম্পাদক ভবানীচরণ বেঁকে বসেন। বিষয়টিকে হিন্দু সমাজের পক্ষে মানহানিকর মনে করে তাঁদের সংস্রব ত্যাগ করলেন। বার করলেন নতুন কাগজ *সমাচার চন্দ্রিকা*। *কৌমুদী-চন্দ্রিকা*-য় দ্বৈরথ বাধল সহমরণ নিয়ে। সংবাদপত্র জড়িয়ে গেল সামাজিক সমস্যা নিয়ে তর্ক-বিতর্কে। লক্ষণীয়, তখনকার সমাজ সহমরণকে আর পাঁচটার মত একটা প্রথা হিসেবেই মেনে নিয়েছিল। তাই *কৌমুদী*-র প্রগতিশীলতাকে তারা ধর্মের ওপর আঘাত বলেই মনে করেছে। এ কারণে 'ভবানীচরণের *সমাচার চন্দ্রিকা* প্রচারিত হওয়ায় *কৌমুদী*-র গ্রাহক সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছিল।'

আত্মরক্ষা ও প্রতি-আক্রমণের তাগিদে উনিশ শতকে রক্ষণশীল দলের মুখপত্র বা প্রচারক হিসেবে অনেক সংবাদ-সাময়িকপত্রের আবির্ভাব ঘটল। এদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা অবশ্যই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *সমাচার চন্দ্রিকা*-র। *সম্বাদ কৌমুদী* পত্রিকায় একদা রামমোহনের ঘনিষ্ঠ এবং পরবর্তীকালে রামমোহনের ঘোরতর বিরোধী ভবানীচরণ কৌলীন্যপ্রথা, সতীদাহ প্রথার অন্ধ সমর্থক, 'ধর্মসভা'-র সংস্থাপক ও আমৃত্যু সম্পাদক, স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী, রক্ষণশীল হিন্দু। ভবানীচরণের *চন্দ্রিকা* ধর্মকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপ পছন্দ করেনি। *সমাচার চন্দ্রিকা*-য় সমসাময়িক কলকাতার দুর্নীতি, 'বাবু' গোষ্ঠীর ভণ্ডামি, ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর মাত্রাতিরেক—এসবের বিরুদ্ধে শাণিত বিদ্রূপের পরিচয় রয়েছে। রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি সমাজশোধন চেয়েছিলেন। স্রোতের বিপরীতমুখী হলেও, সে চেষ্টায় কোনো ফাঁকি ছিল না। সবটুকুই আন্তরিক।

ভবানীচরণের মতামতের সঙ্গে উনিশ শতকে একই পথের পথিক হলেন আরও অনেক সম্পাদক। তাঁরা সর্বপ্রকার সংস্কারের ঘোরতর বিরোধী। যেমন কৃষ্ণমোহন দাস (*সম্বাদ তিমিরনাশক*), কালাচাঁদ রায় (*সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা* এবং *ব্যবহারদর্পণ*), লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার (*শাস্ত্রপ্রকাশ*), মধুসূদন দাস (*সম্বাদ রত্নাকর*), পার্বতীচরণ দাস (*সম্বাদ মৃত্যুঞ্জয়ী*), নন্দকুমার কবিরত্ন (*নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা*), মথুরামোহন দাস (*দুর্জ্জন দমন মহানবমী*), হরিনারায়ণ গোস্বামী (*হিন্দুধর্ম্ম চন্দ্রোদয়*), উমাচরণ ভদ্র (*হিন্দুবন্ধু*), গোবিন্দচন্দ্র দে (*সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা*), গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (*ধর্ম্মমর্ম্ম প্রকাশিকা*), ষোড়শীচরণ মিত্র (*হিন্দুদর্পণ*), কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন

(*ধর্ম্মপ্রচারক*), দুর্গাদাস দে (*মজলিস*), জানকীনাথ গাঙ্গুলি (*হালিশহর পত্রিকা*), বিনোদবিহারী গোস্বামী (*পূর্ণশশী*), ভূধর চট্টোপাধ্যায় (*বেদব্যাস*), বামদেব দত্ত (*প্রতিমা*), শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (*পল্লীবাসী*), কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (*সংসার*), ব্রজবল্লভ রায় (*সুবোধিনী*) ইত্যাদির মত অনেকেই। এঁরা নানাভাবে সনাতন হিন্দুধর্মের স্বার্থরক্ষায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। এমনকি *সংবাদ প্রভাকর*-ও প্রথমদিকে 'ধর্মসভা'র পোষকতা করত। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধিও হিন্দু ধর্মকর্মের গোঁড়া সমর্থক। যদিও পণপ্রথার বাড়াবাড়িকে তিনি সমর্থন করেননি।

সহমরণকে কেন্দ্র করে যুযুধান দুই পক্ষের যে তর্ক-বিতর্কের শুরু, তার রেশ ছড়িয়ে পড়ল পুরো উনিশ শতক জুড়ে। তখন নারীকেন্দ্রিক সমস্যাগুলি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখক ও সম্পাদকদের অবিশ্রাম লেখালেখি চলেছে। সমর্থন এবং বিরোধিতায় অথবা মধ্যপন্থা অবলম্বনে মধ্যবিত্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবীর চারিত্র্যলক্ষণ ফুটে উঠছে। সতীদাহপ্রথার পর বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা ইত্যাদি সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে এবং বিধবাবিবাহ, স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদির সপক্ষে উদারপন্থী সমাজসংস্কারক সম্পাদকদের বিরামহীন সংগ্রাম সেকালের সংবাদ-সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠা ভরিয়ে রেখেছিল।

সংস্কারপন্থী সম্পাদকদের মধ্যে সকলেই যে যে-কোনো মূল্যে কুপ্রথার উচ্ছেদ চেয়েছেন এমন নয়। কেউ কেউ সংস্কার চেয়েও ধর্মকর্মে বা সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ পছন্দ করেননি। যেমন অক্ষয়কুমার দত্ত সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ পছন্দ করেননি। অথবা কেউ মনে করেছেন শিক্ষাবিস্তারের দ্বারাই কুপ্রথার উচ্ছেদ সম্ভব। যেমন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রগতিশীল সংস্কারপন্থী হলেও মনে করতেন শাস্ত্রসম্মত যে-কোনো সামাজিক প্রথায় সরকারি হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। শিক্ষাপ্রসারের দ্বারাই সামাজিক কুপ্রথার দূরীকরণ সম্ভব। আইনের সাহায্যে বহুবিবাহকেও রোধ করতে *সোমপ্রকাশ* ইচ্ছুক ছিল না। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক এবং বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পণপ্রথার বিরোধী। যদিও আইনের সাহায্যে বহুবিবাহ নিরোধ তিনিও চাননি। কারও কাছে স্ত্রীশিক্ষা সমর্থনযোগ্য হলেও স্ত্রীস্বাধীনতা রয়ে গেছে দূরে। উমেশচন্দ্র মিত্রের *বঙ্গসুহৃদ* কৌলীন্যপ্রথার প্রবল সমালোচক। কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতাকে সমর্থন করেনি। দ্বারকানাথের *সোমপ্রকাশ* স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন করলেও স্ত্রীস্বাধীনতাকে সমর্থন করেনি। ভুবনমোহন সরকারের *বঙ্গমহিলা* পত্রিকার উদ্দেশ্য বঙ্গবাসিনীর হস্তে সময়ে সময়ে নীতিগর্ভ ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধসকল উপহার দেওয়া। বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক হলেও স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে তিনি ততটা উদার হতে পারেননি। নবীনচন্দ্র আঢ্য বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহকে সমর্থন না করলেও স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন না। হরিনাথ মজুমদারের *গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা* পত্রিকাটি সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছিল মধ্যপন্থী। বিধবাবিবাহের সপক্ষে ও কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করলেও স্ত্রীস্বাধীনতার তার পূর্ণ সমর্থন পায়নি। দারভাঙা থেকে প্রকাশিত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের *পাক্ষিক সমালোচক*-ও স্ত্রীস্বাধীনতাকে সমর্থন করেনি। কেউ-বা যাবতীয় সামাজিক কুপ্রথার বিরোধিতা করলেও বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা মেনে নিতে পারেননি। শ্যামসুন্দর সেন (*সমাচার সুধাবর্ষণ*) মতামতের দিক দিয়ে ছিলেন মধ্যপন্থী। ধর্মকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপ পছন্দ করেননি। আবার কৌলীন্যপ্রথার বিরোধী হলেও,

বিধবাবিবাহ তাঁর সমর্থন পায়নি। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন *সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ*, ২য় খণ্ড, সম্পাদনা স্বপন বসু)।

সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে গঠনমূলক ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইয়ংবেঙ্গল-গোষ্ঠীভুক্ত সম্পাদক এবং ব্রাহ্মমতাবলম্বী সম্পাদকদের। এর বাইরে উচ্চশিক্ষিত আরও কিছু মানুষও আছেন। ব্রাহ্ম-ধর্মমতে বিভাজন হওয়ার আগে পর্যন্ত সামাজিক সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি একমুখীন থাকলেও পরবর্তীকালে বিভাজন যত বেড়েছে, মতামতের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য ততই অধিক হয়েছে। যদিও সকল ধারার ব্রাহ্ম সম্পাদকরা সাধারণভাবে প্রগতিশীলতারই পরিচয় দিয়েছেন। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র সংগ্রাম বিশেষ উল্লেখ্য। শিবনাথ শাস্ত্রীর *তত্ত্বকৌমুদী* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র। এতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মতামতই প্রতিফলিত হত। *মহাপাপ বাল্যবিবাহ, ঈষ্ট*-সম্পাদক নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় ত্যাজ্যপুত্র হন। ঢাকার বারবণিতা-কন্যা লক্ষ্মীমণিকে নবকান্ত বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেন। উমেশচন্দ্র দত্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার স্বাক্ষর রয়েছে *ভারতসংস্কারক* পত্রিকায়। উমেশচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী, বাল্যবিবাহ, সুরাপান, অশ্লীলতা ইত্যাদির বিরোধী। উমেশচন্দ্র-সম্পাদিত *বামাবোধিনী*-র কথা আগেই বলেছি।

কৌলীন্যপ্রথা থেকে শুরু করে যাবতীয় সামাজিক কুপ্রথার অবসান চেয়েছে অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত *সমাজ দীপিকা* পত্রিকা। অথচ সম্পাদক স্বয়ং স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা ও বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে উৎসাহী, সকল ঘৃণ্য সামাজিক প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার, অনাথবন্ধু গুহ, তিনকড়ি ঘোষাল, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (*উদ্দীপনা*), *অবলাবান্ধব*-সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গে ৗপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, বরদাচরণ ঘোষ (*বঙ্গবন্ধু*), *ভারতসুহৃদ* পত্রিকার শশিভূষণ গুহ, *ধর্মবন্ধু* ও *রবি*-র শশিভূষণ বসু, শিশিরকুমার ঘোষ, ইয়ংবেঙ্গল কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধানাথ শিকদার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মানুষ।

তিনকড়ি ঘোষালের *নবপ্রবন্ধ* সাহিত্যপত্রিকা হলেও, সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন ছিল না। বিধবাবিবাহের সমর্থন এবং কৌলীন্যপ্রথা বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করায় পত্রিকাটি ছিল ক্লান্তিহীন। স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের অগ্রণী দ্বারকানাথ ছাত্রাবস্থায় সমসাময়িক সামাজিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর *অবলাবান্ধব*-এর উদ্দেশ্য সংসারে স্ত্রীলোকের উপযোগিতা ও স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা করা। স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও প্রসারে প্যারীচরণ সরকারের অবদান চিরস্মরণীয়। রাধানাথ শিকদার যৌবনে হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করেও অন্য ধর্মের আশ্রয় নেননি এবং আজীবন বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও যুক্তিবাদকে সযত্নে পালন করেছেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নারীজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে সচেষ্ট ছিলেন। রামানন্দের *দাসী*-র উদ্দেশ্য বঙ্গীয় পুরুষ এবং রমণীগণের হৃদয়ে সেবার ভাব জাগানো।

রঙপুরের জমিদার শম্ভুচন্দ্র রায়চৌধুরীর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত *রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ* পত্রিকার প্রথম সম্পাদক মধুসূদন ভট্টাচার্য। উদার সমাজসংস্কারকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পত্রিকাটির। বাল্যবিবাহ বিরোধী, আইনের সাহায্যে বহুবিবাহ রোধের পক্ষে তারা মত প্রকাশ করেছে। হরিশ্চন্দ্র মিত্র তাঁর নাটক বা প্রহসনের মাধ্যমে ধর্মের কারণে হিন্দু সমাজে যে অনাচার কদাচার প্রবেশ করেছে তার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে চেয়েছেন। একই সঙ্গে মদ্যপান, বহুবিবাহ ও

বাল্যবিবাহপ্রথার বিরুদ্ধতা ও বিধবাবিবাহকে ব্যঙ্গ করেছেন। অথচ ১৮৬১-তে 'শুভস্য শীঘ্রং' প্রহসনে তিনি বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন।

আট

উনিশ শতকের প্রথম তিন দশক সাধারণ মানুষের মনে রাজনৈতিক সচেতনতার উন্মেষ দেখা যায়নি। অভিজাত ধনী শ্রেণীর অর্থনৈতিক জীবন ইংরেজের অনুগ্রহপুষ্ট ছিল বলে ইংরেজ শাসনকে এদেশের মাটিতে চিরস্থায়ী করা, ইংরেজকে সকল বিরোধিতা সম্পর্কে সচেতন করা ও রক্ষা করাই তাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় কিছুটা স্বাতন্ত্র্য ও স্পষ্টতা থাকলেও, তারা ইংরেজ শাসনের অবসান কল্পনা করেনি। বরং তারা মনে করেছে ইংরেজ শাসন ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ। যদিও ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর পরিচালনায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলিতে ইংরেজকে বিদেশি, স্বৈরাচারী বলা হয়েছে এবং কোম্পানির নানা নীতির সমালোচনাতেও তাদের আগ্রহ দেখা গেছে।

১৮৩৩-এর চার্টার আইনের আগে ও পরে মধ্যবিত্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবীর রাজনৈতিক চেতনার অস্ফুট বিকাশ লক্ষ করি কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় ও দু'একটি সভা-সমিতিতে। সে-সবের সঙ্গে অবশ্য সাধারণ মানুষের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তিরিশের দশক থেকে কয়েকটি রাজনৈতিক সভা (ভূম্যধিকারী সভা ১৮৩৭ , দেশহিতৈষিণী সভা ১৮৪১ : বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি ১৮৪৩ ; ভারতবর্ষীয় সভা ১৮৫১) গঠিত হয়। এরপর ভূম্যধিকারী সভা ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি এক হয়ে যায় 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' নামে। এই সভা দাবি করত তারা সমাজের সকল শ্রেণীর লোকদের কথাই তুলে ধরছে। যদিও বাস্তব চিত্রটি ছিল ঠিক তার বিপরীত। সভাটি জমিদার শ্রেণীর মুখপত্র হিসেবেই কাজ করত। 'ভারতবর্ষীয় সভা' ব্যতীত আর সব সভারই মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজ-তোষণ, রাজভক্তি।

রাজভক্তি প্রদর্শনে অনেক সম্পাদকই যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। বেশ কয়েকজন সম্পাদক এইসব সভা-সমিতির সদস্য ছিলেন। ব্রিটিশ সরকারও নানা ধরনের খেতাব বিতরণ করে তাঁদের প্রতি পত্র-পত্রিকার সম্পাদকদের আনুগত্য নিশ্চিত করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ ব্রিটিশ সরকার থেকে বেশ কিছু খেতাব লাভ করেছেন। ভিক্টোরিয়া সম্পর্কে লিখেছেন-- 'কোন কালে কোন রাজ্য এমন লোকবৎসলা দয়াবতী রাণী কর্ত্তৃক শাসিত হয় নাই।' *ঢাকাপ্রকাশ* বরাবর রাজানুগত্য দেখিয়েছে। ১৮৭০-এর ৩ জুলাই (তখন সম্পাদক ব্রাহ্ম গোবিন্দপ্রসাদ রায়) পত্রিকাটি লেখে--

> তাঁহারা (ইংরেজরা) আমাদিগের প্রতি অনেকগুলি দোষের আরোপ করেন। সর্ব্বদাই বলেন, এদেশীয়েরা অকৃতজ্ঞ, ইহাদের রাজভক্তি মাত্র নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কিরূপে বুঝিলেন, আমরা অকৃতজ্ঞ এবং আমাদের রাজভক্তি নাই। প্রকৃত কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তি কাহাকে বলে, তাহা কি তাঁহারা জানেন? অকৃতজ্ঞ অর্থ কি? ছোট বড, ভদ্র অভদ্র, সৎ অসৎ সমুদয় ইংরাজের পদুকারহন ও দাসত্ব করা কি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা? ...প্রকৃত রাজভক্তিরই বা অর্থ কি? রাজার অন্যায় দেখিলে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিলে যদি রাজভক্তি না থাকে, তবে বলা যায়, আমাদের রাজভক্তি নাই। ...সদ্বিবেচক ব্যক্তিরা আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ ও রাজভক্তিশূন্য বলিতে নিতান্ত ব্যথিত হইবেন। আমরা যদি (ইংরেজের) প্রতি অকৃতজ্ঞ ও ভক্তিশূন্য তবে আর পৃথিবীতে এমন জাতি নাই যে তাহাদিগকে কৃতজ্ঞ ও রাজভক্ত বলিতে পারি।

১৮৮৬-র সেপ্টেম্বরে এ কারণে তারা লিখেছে--

> ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট কাকুতি মিনতি করিয়া বলি, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে স্বায়ত্বশাসনের সম্পূর্ণ অধিকার দেন বা না দেন, উচ্চপদে অভিষিক্ত করেন বা না করেন, যাহাতে আমরা মোটা ভাত খাইয়া, মোটা কাপড় পরিয়া, কোনমতে দিনপাত করিতে পারি শীঘ্র তাহার উপায় করুন।

শতক-শেষে ১৮৯৭-এর ২০ জুন লিখছে--

> ...দূরদর্শিতা আমাদিগকে বিক্টোরিয়ার রাজত্বের অধিকতর পক্ষপাতী করিয়াছে। কলির স্বাভাবিক মহিমায় যেরূপ রাজা হওয়া উচিত; মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বও তন্মধ্যে শ্লাঘ্য। হয়ত তাঁহার পরে এমন রাজত্ব আসিতে পারে, যাহাতে আমাদের ধর্ম্মজীবনে অধিকতর আঘাত লাগিবে। সেই আশঙ্কাতেই আমরা মহারাণীর রাজত্বের পক্ষপাতী।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাকর ইংরেজের সমালোচনা করেছে ঠিকই, কিন্তু কোনো বিকল্প পথ নির্দেশ করেনি। স্বয়ং সম্পাদক তাঁর কবিতায় বলেছেন 'মুক্তমুখে বল সবে ইংরাজের জয়'। জমিদারশ্রেণীর আনুকূল্যপুষ্ট ছিল বলে জমিদারদের অত্যাচার সম্পর্কে পত্রিকাটি নীরব থেকেছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (*বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ, রহস্য সন্দর্ভ*) খেতাব কম পাননি। রাজা, রায়বাহাদুর, জাস্টিস অব পিস, সি আই ই উপাধিপ্রাপ্ত। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রথমে সদস্য, এরপর সহ সভাপতি ও সভাপতি ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি ধীরপন্থার পরিচয় দিয়েছেন। নবীনচন্দ্র আঢ্যের *বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা* মূলত রাজভক্ত। প্যারীচাঁদ মিত্র একইসঙ্গে বিজ্ঞান-সচেতন এবং সমাজ-সচেতন হয়েও ইংরেজদের স্বার্থরক্ষার বিষয়ে ছিলেন বিশেষ মনোযোগী। মনোমোহন বসু *মধ্যস্থ* পত্রিকায় মধ্যপন্থাই বেছে নিয়েছিলেন। নিজে হিন্দুমেলার অন্যতম উদ্যোক্তা। তাই পত্রিকায় জাতীয়তাবাদী চিন্তা প্রাধান্য পেত। এ সত্ত্বেও রাজভক্তি প্রদর্শনে খুব একটা পিছিয়ে ছিলেন না। 'ভিক্টোরিয়া গীতি' কবিতায় বেশ মুক্তমনেই রানির বন্দনাগান গেয়ে তাঁর কাছে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের প্রতিকার চেয়েছিলেন। রাধামাধব হালদার (*হুতম, কুসুম*) গ্রন্থকার। *সামাজিক দোষাদোষ উল্লেখ করা...সমাজ সংস্করণ এবং ভারতভূমির উন্নতিসাধন* হুতমের উদ্দেশ্য। অন্যদিকে ইনি আবার *যুবরাজের ভ্রমণ বিবরণ* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করেছিলেন ১৮৭৫ সালে প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতভ্রমণকে স্মরণীয় করে রাখা এবং রাজভক্তি প্রকাশ করার জন্যই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একই উদ্দেশ্যে *যৌবনে যোগিনী* রচয়িতা গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেছিলেন *ভাবী সম্রাটের ভারত ভ্রমণ* (১৮৭৫) সাপ্তাহিক পত্রিকা। রাধামাধব নিঃসন্দেহে করিৎকর্মা পুরুষ। পরের বছর তিনি *বাঙ্গালা রাজকীয় গেজেট* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। নামেই রাজভক্তির প্রকাশ। শ্রীনাথ সিংহের সম্পাদনায় *হিন্দুরঞ্জিকা*-য় রাজনীতির আলোচনা বড় একটা থাকত না। তবে রাজনীতির আলোচনা তার পক্ষে একেবারে এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব হয়নি। ইংরেজ শাসনাধীনে থাকাই তারা পছন্দ করেছে এবং অন্যান্য পত্রিকার মত প্রয়োজনমত রাজভক্তি প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেনি। ১৮৮৭-র ২৯ জুন পত্রিকাটি লেখে--

> পুনঃ পুনঃ রাজভক্তির পরীক্ষা দিয়াও আমাদিগের নিস্তার নাই। ভালবাসিলেই তাহার প্রতিদান হয় আমাদিগের কপালে এ মতের কোন মূল্য নাই সৈনিক বিভাগে হাওলাদারি ছাড়া উচ্চপদ আমাদিগের ভাগ্যে নাই। ...একদিকে রাজভক্তির কঠোর পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ অপরদিকে অস্ত্র নিগ্রহ তাহার পুরস্কার। এই কলঙ্ক ক্ষালনের উপায় কি?

হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পূর্ণচন্দ্রোদয়* পত্রিকায় 'বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি বিষয়ক হিতোপদেশ' ছাড়া

'নানা বিষয় ঘটিত রাজ্যের মঙ্গল বিবরণ...দেশাধিপতির কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট' করানোর লক্ষ্যও ছিল।

তবে একথাও স্বীকার করে নিতে হবে, রাজভক্ত সম্পাদকদের পাশাপাশি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন বেশ কয়েকজন সম্পাদকও সেকালে ছিলেন। যেমন গিরিশচন্দ্র বসু (*শক্তি*) নীল কমিশনে সাক্ষ্য দিয়ে কর্মে ইস্তফা দেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (*বঙ্গবাসী*) ব্রিটিশ-বিরোধী গোঁড়া বাঙালি। যশোদানন্দন সরকার ছোটোলাট ক্যাম্বেলের দেশীয় সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থার সমালোচনা করে সরকারি চাকরিটি খুইয়েছিলেন। *দিবাকর* পত্রিকার সম্পাদক 'আইন পাশ করে পোস্টমাস্টারি করতেন। কিন্তু রাজনৈতিক মতবাদে তিনি *সোমপ্রকাশ*-এর সপক্ষতা করায় রাজরোষে *দিবাকর*-এর মৃত্যু হয়। *প্রজাবন্ধু* পত্রিকার সম্পাদক প্রগতিশীল, সংস্কারপন্থী তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি করতেন শিক্ষাবিভাগে। ইংরেজ সরকারের সমালোচনা করায় কর্মচ্যুত হন। দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীকে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে মুদ্রাযন্ত্র আইনে জরিমানা দিতে বলা হলে তিনি *নব্যভারত* বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

মধ্যবিত্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবী এক রাজনৈতিক প্রশ্নে আলোড়িত হয়েছিল শতাব্দীর প্রায় শেষপ্রান্তে। সেটি ইলবার্ট বিল। ১৮৮২ সালের ৩০ জানুয়ারি বিহারীলাল গুপ্ত নামে এক আই সি এস অফিসার সরকারের কাছে বর্ণভিত্তিক বিচারনীতির প্রতিবাদ জানালেন। এরপর বর্ণভিত্তিক বিচারনীতি বিলুপ্তির জন্য ১৮৮৩-র ২ ফেব্রুয়ারি স্যর কর্টনি ইলবার্ট পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করেন। এই বিল নিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে প্রথমে তেমন সচেতনতা দেখা যায়নি। কিন্তু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজ বিলটির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে পড়ে। শক্তিশালী শ্বেতাঙ্গদের ভয়ঙ্কর বাধার বিরুদ্ধে ভারতীয়রা কার্যকরী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। ভাবত সরকারও মাথা নিচু করে বিলটি তুলে নিলেন। বিলটিকে কেন্দ্র করে পত্র-পত্রিকায় তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। একদিকে ইংরেজ মালিকানাধীন ইংরেজি পত্রিকা, অন্যদিকে বাঙালি মালিকানাধীন বাংলা পত্রিকা। ইলবার্ট বিলকে মুক্তকণ্ঠে সমর্থন জানিয়েছিলেন তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, বরদাচরণ ঘোষ প্রমুখ সম্পাদক।

সরকারি করনীতি, একচেটিয়া বাণিজ্যনীতি, জমিদার-প্রজা সম্পর্ক, নীলকরদের অত্যাচার ইত্যাদি অর্থনৈতিক-সামাজিক বিষয়, ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট (১৮৭৮), নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬), প্রজাস্বত্ব আইন বা 'টেনেনসি বিল' (১৮৮৫) ইত্যাদি সরকারি আইন মধ্যবিত্ত বাঙালি সম্পাদকদের আলোচনায় অগ্রাধিকার পেয়েছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম মানুষ, যিনি এদেশের শিল্প-বাণিজ্যে বিদেশি অর্থ বিনিয়োগের এবং বিদেশি প্রথার বিরোধিতা করেন। এ ব্যাপারে তিনি জমিদারদের তাঁদের সম্পদ দেশের কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যে বিস্তারে ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জানান। আবার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের স্বার্থরক্ষা করতে চেয়ে সরাসরি এও বলেছিলেন, ভারতে কিংবা পৃথিবীর অন্য যে কোনো সভ্য দেশে জমিদারদের অধিকার রক্ষা করা অন্য যে-কোনো শ্রেণির অধিকার রক্ষার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভাব ও ভাবনার পরিচয় যেসব পত্রিকায় পাওয়া যায় তাদের অন্যতম নীলরত্ন হালদার সম্পাদিত *বঙ্গদূত* পত্রিকা। পত্রিকাটি অবাধ বাণিজ্য নীতি সমর্থন করেছে, ইংরেজদের দ্বারা উপনিবেশকরণের মাধ্যমে দেশের

উন্নতিসাধনের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছে, আবার কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের ফলে বাংলার অর্থনৈতিক জগৎ যে বিধ্বস্ত হচ্ছিল সে সম্পর্কেও সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন ও ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের ঘোর বিরোধী। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ব্রাহ্মমতের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও, *ঢাকাপ্রকাশ* কংগ্রেসবিরোধী, জমিদারি ব্যবস্থার সমর্থক। অন্যদিকে আবার নীলকর ও চা-কর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও লেখনী ধারণ করেছে। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্বন্ধে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেছেন 'রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের আন্দোলন কিরূপে করিতে হয়, তিনিই প্রথম তাহা সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে দেখাইয়া দেন।' সরকারি নীতির অন্ধ সমর্থক *সোমপ্রকাশ* ছিল না ঠিকই, তবে রাজরোষে পড়ে দ্বারকানাথকে লিখিতভাবে রাজানুগত্য প্রকাশের অঙ্গীকার করতে হয়েছিল। ইংরেজের প্রচুর সমালোচনা করেও তাঁকে বলতে হয়েছে ইংরেজ হল পরোপকারী, প্রজারঞ্জক ও স্বাধীনতাপ্রদানকারী। *সোমপ্রকাশ* বিরোধিতা করেছে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট, নীলকর, চা-কর অত্যাচার ইত্যাদির। জমিদারদের সম্পর্কে দ্বারকানাথের আপোযমূলক মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের *এডুকেশন গেজেট* সরকারি নীতিকে সমর্থন করত। এজন্য তিনি নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনকে সমর্থন করেছেন, ১৮৭৮-এ ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট বিষয়ে প্রায় নীরব থেকেছেন। তবে সবচেয়ে বড়ো কথা, উনিশ শতকে অধিকাংশ সংবাদ-সাময়িকপত্র যেখানে নিজ নিজ ধর্মমত রক্ষায় ও পালনে ছিল তৎপর, সেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরক্ষায় এই পত্রিকাটির ভূমিকা অবশ্যই অভিবাদনযোগ্য। আবার সামাজিক স্তরবিন্যাসে জমিদার-কৃষক বিরোধে জমিদারদের দায়িত্বকেও অস্বীকার করেনি। রসিককৃষ্ণ মল্লিক কয়েকটি সরকারি নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। আদালতে ফারসির বদলে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। প্রেস অ্যাক্ট, চার্টার অ্যাক্ট, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইত্যাদি বিষয়ে রসিককৃষ্ণ প্রতিবাদে-সমালোচনায় ছিলেন সরব। *পরিদর্শক*-সম্পাদক রাধানাথ চৌধুরী। *পরিদর্শক* সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতা পরিদর্শক সম্পাদকের প্রধান গুণ ছিল এবং পরিদর্শকে তৎ সম্পাদকের গভীর স্বদেশ হিতৈষণা সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইত।'

একচেটিয়া বাণিজ্যনীতির সমালোচক, সরকারি করনীতির বিরুদ্ধাচরণ, দেশীয়দের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তি এবং বিচারব্যবস্থা ও কর্মক্ষেত্রে ভাবতীয়দের মর্যাদাদানের জন্য *অমৃতবাজার* উচ্চকণ্ঠ ছিল। শিশিরকুমারের ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৮৭৫-এ স্থাপিত হয়েছিল 'ইন্ডিয়ান লিগ'। শিশিরকুমার সম্পর্কে নবীনচন্দ্র সেন বলেছেন 'তিনি ও তাঁহার পত্রিকাই এই দেশে স্বদেশভক্তির পথ-প্রদর্শক।' পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় (২০/২/১৮৬৮) লেখা হল—

> এদেশীয় ও ইউরোপীয় বিবিধ সংবাদ, নূতন আইনের মর্ম্ম, ব্রিটিশ ও এদেশস্থ অন্যান্য রাজ্যের শাসনপ্রণালী, ও তাহাদের পরস্পরের গুণাগুণ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকটিত করিব। আমাদের বিশেষ যত্ন থাকিবে যে, যে স্বার্থশূন্য মহাত্মা ইংরাজ বাহাদুরেরা আমাদের দেশ, পরম অত্যাচারি যবন অধিকার হইতে স্বীয় হস্তে লইয়া আমাদের এত উন্নতি করিয়াছেন—যাহারা কেবলমাত্র আমাদের হিত ও স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত, রাজ্যশাসনের ন্যায় অতি ক্লেশকর ও কঠিনকার্য্যে আমাদিগকে হস্তক্ষেপণ করিতে দেন না, তাহাদিগের রীতি, নীতি, উদ্দেশ্য, স্বার্থশূন্যতা, ও কৌশল যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া তাহাদিগের নিকট যে ঋণপাশে আবদ্ধ আছি, তাহা পরিশোধের যত্ন করি।

আবার ২১ সংখ্যায় (৯/৭/১৮৬৮) লেখা হল--

আমাদের দেশীয়েরা কিরূপ অবস্থায় আছেন, তাহা তাঁহারদিগকে (ইংরেজকে) দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা ফটগ্রাফার মাত্র।

অমৃতবাজার প্রচার করেছে *আমরা ইংরেজ হইতে স্বতন্ত্র, কাজেই আমাদের পরস্পরের আদর্শ এবং পন্থাও বিভিন্ন।*

রায়তের স্বার্থরক্ষায় বিশেষ সক্রিয় ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার। জমিদার, মহাজন ও ইংরেজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ প্রজাদের আর্তনাদ শাসকগোষ্ঠীর কর্ণগোচর করার জন্য হরিনাথ মজুমদারের *গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা* পত্রিকাটির জন্ম। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় তিনি আমরণ সংগ্রামী। কৃষক বিদ্রোহে কৃষকদের পাশে নির্ভীকভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রথম প্রথম কৃষকের দুর্দশার প্রতি শিশিরকুমার ঘোষের সহানুভূতি লক্ষ করা গেলেও পরবর্তীকালে জমিদারদের স্বার্থরক্ষায় *অমৃতবাজার* অধিকতর মনোযোগী হয়েছিল। শিশিরকুমার নীলকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে *হিন্দু পেট্রিয়ট*-এ লিখেছেন।

ইংরেজদের ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে বেশ কিছু সম্পাদকের প্রতিবাদ ক্রমশ জোরালো হতে শুরু করে পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায়। জনমত গঠনে সেকালে তাঁদের ভূমিকা রীতিমত অভিনন্দনযোগ্য। স্বদেশচিন্তা ও স্বাদেশিকতাবোধের বিকাশ ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে এবং ক্রমশ তা ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের রূপ নেয়। তবে একথা স্বীকার করে নিতে হয়, ব্রিটিশ বিরোধিতা যতই বাড়ুক, সম্পাদকদের রাজভক্তির কিছুমাত্র হ্রাস ঘটেনি। যা-ই হোক, রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের ফলে ভারতবাসী এক সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তুলতে মনোযোগী হয়। এরই ফলশ্রুতিতে জন্ম হল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের (১৮৮৫)। যদিও জন্মলগ্নে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কংগ্রেসের নিবিড় যোগ ছিল না। তবে এক বছরের মধ্যে বাঙালির সঙ্গে সে-দূরত্বের বাধা কেটে যায়। কয়েকজন সম্পাদক কংগ্রেসের সদস্য হলেন। যেমন অক্ষয়চন্দ্র সরকার। তিনি ভারতসভার প্রথম যুগ্ম সহ-সম্পাদক। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে (১৮৮৬) উৎসাহী কর্মী। *হিতবাদী*-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কংগ্রেসকর্মী, মনেপ্রাণে স্বদেশী। *সঞ্জীবনী*-সম্পাদক ব্রাহ্ম কৃষ্ণকুমার মিত্র স্বদেশী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা। *অবলাবান্ধব*-সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় রাজনীতিতে কংগ্রেসের সদস্য, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য এবং কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পঞ্চানন তর্করত্ন (*জন্মভূমি*) জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল। বিপিনচন্দ্র পালের *পরিদর্শক* পত্রিকাটি ছিল সমগ্র বাংলার শিক্ষিত প্রগতিশীল জনমত প্রকাশের অন্যতম শক্তিশালী বাহন। কংগ্রেসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ১৮৮৬-তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগীর, সৈয়দ আমীর আলি, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ মানুষ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন।

স্বদেশপ্রেম উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সম্পাদকদের গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। উল্লিখিত সম্পাদক ছাড়া নাম করতে হয় গিরিশচন্দ্র বসু, বঙ্কিমচন্দ্রের বেয়াই দামোদর মুখোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ বসু, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এমন আরও অনেক খ্যাত-অখ্যাত সম্পাদকদের। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের *আর্য্যদর্শন*-এর নামকরণে বোঝা যায় বঙ্গদেশে

আর্যমাহাত্ম্য প্রচার এবং জাতীয়তাবোধের সঞ্চার সম্পাদকের লক্ষ্য ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, *আর্য্যদর্শন* প্রকাশের সমসাময়িক কালে (১৮৭৪) পত্র-পত্রিকায় 'আর্য্য'-আদি নামকরণের ঢেউ উঠেছিল। সত্তরের দশকে প্রকাশিত হয়েছিল--*আর্য্যধর্মপ্রকাশিকা* (১৮৭০), *আর্য্যোদয়* (১৮৭১), *আর্য্যাবর্ত্তরীতিবোধিকা* (১৮৭১), *আর্য্যপ্রবর* (১৮৭২), *আর্য্যবোধক* (১৮৭২), *আর্য্যদর্পণ* (১৮৭৭), *আর্য্যবিদ্যাসুধানিধি* (১৮৭৮), *আর্য্যপ্রদীপ* (১৮৭৮) ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মনেপ্রাণে খ্রিস্টান হয়েও রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক দিয়ে বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষের যাবতীয় উন্নতির জন্য ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করা প্রয়োজন। যদিও প্রথমদিকে তিনি বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির সভ্য হয়েছিলেন। তবে তার কার্যাবলীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেননি। প্রাণনাথ দত্ত (*বসন্তক*) কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচিত সদস্য। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও ইন্ডিয়ান লিগের সক্রিয় সদস্য। শ্লেষাত্মক মাসিক পত্রিকা *বসন্তক*-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রক্ষণশীল। জাতীয়তাবাদী এই পত্রিকা কোনোকিছুর আড়ম্বরকে সহ্য করেনি।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের জন্য আজীবন চেষ্টা করেছেন। লিখেছেন 'ব্রাহ্মণ এখনও হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়। ব্রাহ্মণের পুনরুত্থান সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক ; ব্রাহ্মণ উঠিলে সকলের উদ্ধার সহজ হইবে।' অমল হোমের পিতা গগনচন্দ্র হোম শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুপ্রেরণায় অনেকের সঙ্গে অগ্নিপ্রদক্ষিণ করে কয়েকটি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন, যার একটি হল--'আমরা একমাত্র স্বায়ত্বশাসনকেই বিধাতৃ নির্দিষ্ট শাসনব্যবস্থা বলিয়া মনে করি।' শপথ নিয়েছিলেন জীবনে কখনও ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরি করবেন না। তিনি ছিলেন হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের বিরোধী। শ্যামসুন্দর সেন ইংরেজ রাজত্বের অবসান চাননি। একদিকে সাঁওতাল বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি, অন্যদিকে ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহীদের দিল্লি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। ফলে রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পূর্ণচন্দ্রোদয়* মিশনারিদের হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ক্রমাগত কুৎসাপ্রচারের বিরোধিতা করেছে। তবে পরবর্তীকালে পত্রিকাটি রক্ষণশীলতাকে আঁকড়ে ধরে।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে মন্মথনাথ ঘোষ একটি প্রবন্ধে (*মানসী ও মর্ম্মবাণী*, পৌষ ১৩৩০) বলেছেন 'পাঁচকড়ি প্রকাশ্যেই স্বীকার করিতেন যে তিনি পেটের দায়ে কোনও বিশেষ নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ...বাস্তবিক তিনি স্বাধীনভাবে কিছুই লিখিতে পারেন নাই, সেইজন্য তিনি কিরূপ রাজনীতিক ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না।' প্যারীচরণ সরকার রাজনৈতিক বিষয়ে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। এ কারণে সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ সম্বন্ধে তাঁর কোনো কৌতূহল ছিল বলে জানা যায় না।

তথ্যসূত্র

আশিস খাস্তগীর, 'বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষা'।

ওয়াকিল আহমদ, 'উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা'।

তপংকর চক্রবর্তী, 'বরিশালের সংবাদ ও সাময়িকপত্র'।

নরেন্দ্রনাথ লাহা, 'সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি'।

বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র'।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িকপত্র' : ১, ২।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১, ২।

মুনতাসীর মামুন, 'উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র'।

লোকনাথ ঘোষ, 'কলিকাতার বাবু বৃত্তান্ত'।

শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, 'জীবনীকোষ।

'সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান'।

সুপ্রকাশ রায়, 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস'।

স্বপন বসু, *আর্যদর্শন* সম্পর্কে দু'চার কথা (প্রবন্ধ) : *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ১০৭ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা।

স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত 'উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি'।

স্বপন বসু, 'প্যারীচরণ সরকার'।

স্বপন বসু, 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস'।

স্বপন বসু, 'রাজরোষে দগ্ধ *প্রজাবন্ধু*' (প্রবন্ধ) : *বারোমাস*, শারদীয়, ২০০০।

স্বপন বসু, 'সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ' ১, ২।

কৃষ্ণ ধর

রাষ্ট্রশক্তির সংবাদশাসন

কথায় আছে Facts are sacred, comment is free সংবাদ বা তথ্য হবে অপাপবিদ্ধ পবিত্র, মতামত প্রকাশ হবে অবাধ। এ তো পুণ্যকথা। শুনতে ভাল লাগে। হামেশা সেমিনারে, আলোচনাচক্রে এরকম কথা শুনতেই পাঠক সুধীজন অভ্যস্ত। কার্যত কী দেখা যাচ্ছে, ইতিহাস কী বলে, সেটাই হল বিচার্য। আমাদের দেশে সংবাদ প্রকাশের ইতিহাসটা একটু বিচিত্র। ঔপনিবেশিক শাসনে সংবাদপত্রের জন্ম (১৭৮০), পলাশি যুদ্ধের বারুদের গন্ধ তখনও মেলায়নি। এমন সময়ে এক ভাগ্যান্বেষী, বেপরোয়া ইংরেজ জেমস্ অগাস্টাস্ হিকি এই কলকাতা শহরে, কোম্পানির সাহেবদের নাকের ডগায় কাগজ বের করলেন, *বেঙ্গল গেজেট* কিংবা *ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার।* লোকপ্রবাদে তার নাম হল হিকির গেজেট। খুবই হুজ্জুতি বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। জেল, জরিমানা, ঠ্যাঙাড়ে পাঠিয়ে এন্টালি এলাকায় পত্রিকার প্রেস ভাঙচুরের উদ্যোক্তা ছিলেন স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস, খোদ গভর্নর জেনারেল মহোদয়।

কেন এই বিপত্তি? আসল কথা হল সংবাদশাসন। সংবাদকে প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা গোড়া থেকেই ভয় পাচ্ছিলেন। হিকির কলমে যেসব কেচ্ছা কেলেঙ্কারি বেরোচ্ছিল তা পড়লে রোমাঞ্চিত হতে হয়। দুর্নীতি, ব্যভিচার, তহবিল তছরূপ সবই ঘটছিল কোম্পানির খাসমহলের বড়কর্তা ও তাঁর নায়েব গোমস্তা সেরেস্তাদারদের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায়। আজকের তেহলকা সাংবাদিকদের তথ্য তদন্তের ধরন ধারন অনেক উন্নত ও প্রযুক্তি সহায়তায় নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও একবিংশ শতাব্দীর শাসনকর্তারা সাংবাদিক তরুণ তেজপালকে কীরকম হেনস্তা করেছিলেন তা তো চোখের সামনেই দেখা গেল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে একুশ শতাব্দীর গোড়া পত্তনের সময় পর্যন্ত সংবাদশাসনের প্রক্রিয়ার হেরফের বিশেষ হয়নি।

এক ইংরেজ শাসনকর্তা বলেছিলেন যে পরাধীন জাতির পক্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা এসব অধিকার দাবি করার কোনো অর্থ নেই। এসব স্বাধীন দেশের নাগরিকদের ধারণা। মহামহিম লর্ড কার্জন তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ প্রসঙ্গে সোজা ভাষায় বলেই ফেললেন যে সততা, সত্যবাদিতা এইসব গুণ পাশ্চাত্যদেশের মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রাচ্যের মানুষের ক্ষেত্রে এসব অবাস্তব, অলীক। এরকম অপমানের বাতাবরণে সংবাদপত্র প্রকাশ করে তাতে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার আদর্শ অনুযায়ী সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দেওয়া খুব সহজ ছিল না। সংবাদপত্র প্রকাশের দিন থেকে প্রথম কয়েক দশক, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত, ইয়োরোপীয়রাই এদেশে সংবাদপত্র প্রকাশে অগ্রণী ছিলেন। আমাদের দেশের প্রতি তাদের কোনো দায় বা কর্তব্য ছিল না সাংবাদিক হিসেবে। সুতরাং আমরা বুঝতে চেষ্টা করব যখন

থেকে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং ভারতীয়দের প্রচেষ্টায় ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করে সেই সময়ে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সংবাদপত্রের দ্বন্দ্বের স্বরূপ কী রকম ছিল।

কোম্পানির আমলে লুণ্ঠনের রাজত্ব চলছিল। সংবাদপত্রে সেসব খবর প্রকাশিত হয়ে লন্ডনে গিয়ে যখন পৌঁছুতে লাগল তখনই শাসকরা প্রমাদ গুণলেন। প্রেস আইন বলে তখন কিছু ছিল না। কোম্পানির স্বার্থের পরিপন্থী এই অজুহাত দেখিয়ে কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হত। ইয়োরোপীয় সম্পাদকদের জেলে পাঠানো যেত না। তাদের ভারত থেকে বহিষ্কার করে লন্ডনের জাহাজে তুলে দেওয়া হত। সর্বপ্রথম একটা চাপের সৃষ্টি করা হয় কোম্পানির শাসকদের পক্ষ থেকে ১৭৯৯ সালে। এতদিন সংবাদপত্রে সম্পাদকের মুদ্রক বা প্রকাশকের নাম রাখার কোনো রেওয়াজ ছিল না। ওদিকে ওয়েলেসলি অভিযান চালাচ্ছেন মহীশূরে টিপু সুলতান ও তাঁর সহযোগী ফরাসিদের বিরুদ্ধে। এদিকে কলকাতার ইয়োরোপীয় পরিচালিত পত্রিকাগুলিতে নানারকম খবর বেরুচ্ছিল যা ইংরেজ প্রভুদের পক্ষে ছিল অস্বস্তিকর। ওদের ধারণা হল, এভাবে চলতে দিলে কোম্পানির রাজত্ব করা মুস্কিল। জারি করা হল সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ বিধি। এই নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি সংবাদপত্রে মুদ্রক, প্রকাশক, স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদকের নাম ছাপা আবশ্যিক করা হয়। এই imprint line ছাপার রীতি এখনও বর্তমান। এতেই সন্তুষ্ট না হয়ে শাসকগোষ্ঠি সম্পাদকদের নির্দেশ দিলে সমস্ত খবর ও সম্পাদকীয় মন্তব্যের পাণ্ডুলিপি ছাপার আগে সরকারের কাছে জমা দিতে। এই সেন্সর ব্যবস্থা চালু করেই তখনকার গুটিকয় স্বল্প প্রচারিত সংবাদপত্র শায়েস্তা করার পথ বেছে নেয় কোম্পানির শাসকরা। শুরু হল সংবাদশাসনের ট্রাডিশন।

সংবাদপত্রের ওপর এই শাসনপ্রক্রিয়া শিথিল করা হল প্রায় দুই দশক পর ১৮১৮ সালে। ততদিনে ইংরেজ শাসন অনেকটা স্থিতু হয়েছে। টিপু পরাজিত, ফরাসিরা পর্যুদস্ত। সুতরাং নতুন গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস তুলে দিলেন সংবাদপত্রের ওপর সেন্সর ব্যবস্থা। তবে সম্পাদকদের জানিয়ে দিলেন তাঁরা যেন সমঝে চলেন। ইংরেজ শাসনের পক্ষে ক্ষতিকর সংবাদ বা মন্তব্য সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন। ততদিনে ব্যাপটিস্ট যাজকরা শ্রীরামপুরে প্রেস বসিয়ে বাংলায় এবং ইংরেজিতে সংবাদপত্র ছাপতে শুরু করেছেন। বেরুচ্ছে *সমাচার দর্পণ, দিগদর্শন* ও ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া (১৮১৮)

রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ও তাঁর সমকালীন ইংরেজ সম্পাদক জেমস্ সিল্‌ক্ বাকিংহাম (১৭৮৬-১৮৫৫) তাঁদের পত্রিকা *সম্বাদ কৌমুদী, ব্রাহ্মণ সেবধি, ক্যালকাটা জার্নাল* ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজ সংস্কার ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা ও জনমত সংগঠন করতে শুরু করেন। বাকিংহাম কলকাতার ইয়োরোপীয় মহলে যথেষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতেন। তাঁর পত্রিকা দ্য *ক্যালকাটা জার্নাল* সব দিক দিয়ে একটি উত্তম সংবাদপত্ররূপে স্বীকৃত হয়েছিল। তিনি নিজে ইংরেজ হলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুশাসনের কঠোর সমালোচক ছিলেন। রামমোহন রায় তাঁর সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন পত্রিকা ও তাঁর লেখা নানা পুস্তিকা প্রকাশ করে। বাকিংহাম এই সংস্কার আন্দোলনে রামমোহনকে উৎসাহ দিতেন তাঁর কাগজে লিখে। নবশিক্ষিত বাঙালি সমাজে নতুন চিন্তাধারার স্রোত বইছিল। বাকিংহাম তাকে স্বাগত জানালেন। রামমোহনের চিন্তাধারায় তারই প্রতিফলন ঘটেছিল। কিন্তু কোম্পানি

শাসনের আমলাদের চক্ষুশূল হয়ে উঠলেন বাকিংহাম এবং তাঁর পত্রিকা *দ্য ক্যালকাটা জার্নাল*। কারণ তিনি তাঁর পত্রিকায় লিখলেন, 'সম্পাদকের দায়িত্ব হল শাসকদের তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা। তাদের ভুলভ্রান্তির জন্য তীব্রভাষায় তিরস্কার করা এবং অপ্রিয় সত্য বলা। এর ফলে তাঁকে ইংলণ্ডে ফিরে যেতে বাধ্য করল ঔপনিবেশিক শাসকরা। সেটা ১৮২৩ সালের ঘটনা।' বাকিংহাম বিলেতে গিয়েও চুপ করে থাকেননি। লন্ডনে *দ্য ওরিয়েন্টাল হেরাল্ড* নামে পত্রিকা প্রকাশ করে ভারতে ইংরেজ শাসনের সমস্ত কুকীর্তি ফাঁস করতে থাকেন।

বাকিংহামকে বিলেতের জাহাজে তুলে দেবার সাতদিনের মধ্যে অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল জন অ্যাডাম সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করলেন (১৮২৩)। একে বলা হয় Adam's Gag, এটাই বড় রকমের সংবাদশাসন ব্যবস্থা যা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই সংবাদপত্র প্রকাশনকে কণ্ঠরোধ করে মারার চেষ্টা করল। একটা ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশে সংবাদ অবাধে প্রকাশ করা হবে এবং সম্পাদকরা তার ভিত্তিতে জনমত ক্ষেপিয়ে তোলার সুযোগ নেবেন, এটা শাসকদের পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন হয়ে পড়ল। জন অ্যাডামের প্রেস নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রয়োগ করে সে পথ বন্ধ করে দেওয়া হল।

ইয়োরোপীয় সম্পাদকদের নির্বাসিত করে জন অ্যাডাম আসলে ঝিকে মেরে বউকে শেখাবার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। বাংলা সংবাদপত্র সবে বেরুতে শুরু করেছে, বোম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরেও সংবাদপত্রের আবির্ভাব ঘটছে। ঔপনিবেশিক শাসকদের পক্ষে তথ্যপ্রচার ও তার দ্বারা জনমত প্রভাবিত হওয়ার ঘটনা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ল। সংবাদপত্রের শক্তি অঙ্কুরেই বিনাশ করার জন্য তাঁরা উঠে পড়ে লাগলেন। এই সেন্সরশিপের প্রতিবাদে রামমোহন রায় তাঁর ফারসি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা *মিরাত-উল-আখবর* প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন। এতেই অবশ্য তিনি থেমে থাকলেন না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করলেন সুপ্রিম কোর্টে। তাতে স্বাক্ষর করলেন কলকাতার নাগরিকদের পক্ষে রামমোহন রায় এবং আরও পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তি--চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বোনার্জি এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর। শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে এটি একটি স্মরণীয় দলিল। ১৮২৩ সালেই কলকাতার বুদ্ধিজীবীমহল উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে সংবাদপত্র একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। সংবাদপ্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জনসাধারণের জানবার ও জানাবার মৌলিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ। অবশ্য রামমোহন রায়ের এই আর্জি তখনকার শাসকরা শোনেননি। ইংলন্ডের রাজার কাছেও আবেদন পাঠানো হয়েছিল। সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় স্বেচ্ছাচারী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী সেদিন তা উপেক্ষা করেছিল, কিন্তু তার মূল্য তাদের দিতে হয়েছিল পরবর্তীকালে ১৮৫৭ সালে মহবিদ্রোহের সময়ে। সে আলোচনা আমরা পরে করব।

ঔপনিবেশিক শাসকদের মধ্যেও মত ও পথের হেরফের কখনো-কখনো ঘটত। অ্যাডামের মতো গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কোনোরকমেই ভারতবর্ষে সংবাদপত্রকে সংবাদ প্রকাশ ও মতামত ব্যক্ত করার স্বাধীনতা না দেওয়া। দেখা গেল ১৮৩৫ সালে স্যার চার্লস মেটকাফ গভর্নর জেনারেলের অস্থায়ী কার্যভার পাওয়ার পর ভিন্নদৃষ্টিতে গোটা

বিষয়টি দেখলেন। তিনি সরকারের আইন বিভাগের সদস্য মেকলেকে একটি প্রেস আইন তৈরির জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ততদিনে ফারসির বদলে ইংরেজি সরকারি কাজকর্মের ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের সুযোগ সুবিধাও বাড়ল শাসকদের প্রয়োজনেই। মেকলের পরামর্শ অনুযায়ী লর্ড মেটকাফ এতদিনকার প্রচলিত কুখ্যাত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রত্যাহার করে নিলেন। কলকাতা শহরে ইংরেজি শিক্ষিত গণ্যমান্য নাগরিকগণ মেটকাফকে ধন্য ধন্য করলেন। তাঁকে জনসম্বর্ধনা দেওয়া হল সংবাদপত্রের মুক্তিদাতা হিসেবে। চাঁদা তুলে তাঁর নামে 'মেটকাফ হল' নির্মাণ করা হল। এই প্রথম কোম্পানি শাসনে স্বল্পকালের জন্য হলেও সংবাদশাসন শিথিল হল। সংবাদপত্রের প্রচার ও প্রসারও বাড়তে লাগল। বেঙ্গল প্রেস রেগুলেশনস্ (১৮২৩) বোম্বে প্রেস রেগুলেশনস্ (১৮২৫-১৮২৭) সবই বাতিল হয়ে যায় মেটকাফেব আদেশনামায়। নতুন আইনে সংবাদপত্রের মুদ্রক ও প্রকাশকের নাম ঠিকানা ও মুদ্রণের ঠিকানা ছাপা আবশ্যিক করা হয়। এই ঘোষণাপত্র না থাকলে ৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং দু বছর পর্যন্ত জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল। মেটকাফ নিশ্চয়ই একজন উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীর ভূমিকাই পালন করেছিলেন সেদিন। তাঁর বক্তব্য ছিল খুব স্পষ্ট। বললেন, সংবাদপত্রের সমালোচনা সহ্য করার ক্ষমতা যদি না থাকে তা হলে বুঝতে হবে ভারতবর্ষ শাসন করার যোগ্যতা আমাদের নেই। জনমত প্রকাশের সুযোগ বন্ধ করে দিয়ে যদি শাসন চালাতে হয়, তাহলে তার আয়ু বেশিদিন টিকতে পারে না। যদি জনমত অবাধ প্রকাশের কারণে শাসনকাঠামো বিপন্ন হয় তাহলে সে রকম শাসন ব্যবস্থা দিয়ে কি ভারতবর্ষের কোনো উপকার করা সম্ভব?

একজন ইয়োরোপীয় উদারপন্থীর মতোই কথা। কিন্তু এতে লন্ডনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মহামান্য পরিচালকবর্গের খুবই গোঁসা হয়। কারণ চার্লস মেটকাফ বিলেতের কর্তাদের না জানিয়েই এমন একটা যুগান্তকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, ইয়োরোপে যা প্রযোজ্য ভারতীয় নেটিভদের ক্ষেত্রে কি তা খাটে? কিন্তু আইন বদলের ঝুঁকি তক্ষুনিই নেওয়া হল না। তাই ১৮৩৫ থেকে ১৮৫৬ অর্থাৎ মহাবিদ্রোহের আগে পর্যন্ত ভারতে সংবাদপ্রবাহ ছিল নিয়ন্ত্রণমুক্ত। এই সময়েই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের *সংবাদ প্রভাকর* এবং ডিরোজিও-র আদর্শে অনুপ্রাণিত ইয়ংবেঙ্গলের বুদ্ধিজীবীদের প্রেরণায় *জ্ঞানান্বেষণ, বঙ্গদূত, মুখার্জিস্ ম্যাগাজিন, মাসিক পত্রিকা, সমাচার চন্দ্রিকা,* অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় *তত্ত্ববোধিনী* প্রভৃতি অনেক সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয় যার মাধ্যমে রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, শিল্প, চারুকলা, বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা জনচেতনাকে সমৃদ্ধ করেছিল। তাতে ভূমিসংস্কারের দাবি যেমন থাকত, তেমনি ঔপনিবেশিক শাসনের কঠোর সমালোচনাও বাদ যেত না। হরিশচন্দ্র মুখার্জির সম্পাদনাতে *দ্য হিন্দু পেট্রিয়ট* সাংবাদিকতার উচ্চমান স্পর্শ করে ব্রিটিশ শাসকদেরও সম্মান ও স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়।

এই অবস্থার পরিবর্তন হয় ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি টলে যাবার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায়। নতুন করে কঠোর সংবাদ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে শাসকগোষ্ঠী। লর্ড ক্যানিং তখন গভর্নর জেনারেল। সংবাদপত্রের কণ্ঠ আবার রুদ্ধ করা হল নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করে। সেটা ছিল ১৮২৩ সালের কুখ্যাত অ্যাডাম রেগুলেশনেরই রকমফের। প্রত্যেক প্রেস মালিককেই লাইসেন্স নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। সরকারের মর্জির ওপর নির্ভর

করত লাইসেন্স দেওয়া ও তা বাতিল করার সিদ্ধান্ত। কোনো সংবাদপত্র বা বই ছাপা সরকারের অনুমোদন ছাড়া নিষিদ্ধ করা হয়। সারা ভারতেই এই আইন বলবৎ হল এক বৎসরের জন্য।

ক্যানিং-এর সংবাদ নিয়ন্ত্রণ এক বৎসরের মেয়াদের মধ্যেই অনেক সংবাদপত্রের বিপদ ডেকে আনে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের *বেঙ্গল হরকরা* সাময়িকভাবে প্রকাশ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। তার সম্পাদককে পদত্যাগ করতে বলে সরকার। সম্পাদক সিডনি লামান ব্লানচার্ড ইস্তফা দেবার পর পত্রিকাটি ছাপার জন্য নতুন লাইসেন্স দেওয়া হয়।

ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের পত্রিকা *দ্য ফ্রেন্ড অভ ইন্ডিয়ার* সম্পাদক হেনরি মিডকে হুঁশিয়রি দেওয়া হয় 'দ্য সেন্টিনারি অভ পলাশি' প্রবন্ধ ছাপার জন্য। প্রবন্ধটিতে ব্রিটিশ শাসনের প্রশংসাই করা হয়েছিল এই যুক্তিতে যে ভারতের প্রাক-ব্রিটিশ যুগের শাসকরা ছিলেন নানাকারণেই অযোগ্য। লর্ড ক্যানিং ঝানু শাসনকর্তা। তিনি বললেন, এই বিদ্রোহের সময়ে এমন ধরনের মন্তব্য নতুন বিপদ ডেকে আনবে। কলকাতার সংবাদপত্রের ওপরেই ইংরেজদের রাগ ছিল বেশি। অন্যান্য অঞ্চলে এই আইন তেমনভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। যদিও ইয়োরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত বোম্বের সংবাদপত্রগুলিতে ভারতীয়দের অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে তাদের শাস্তি দেবার জন্য সরকারকে উপদেশ দিত। একমাত্র রবার্ট নাইট তাঁর *বোম্বে টাইমস্* পত্রিকায় ভারতীয়দের পক্ষে লড়াই চালিয়ে যান। গোটা ঊনবিংশ শতাব্দীতে দুইজন ইয়োরোপীয় সম্পাদক ব্রিটিশ শাসনের স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে অবিরাম কলমের যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন—বাকিংহাম এবং রবার্ট নাইট। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে তাঁদের দান স্মরণীয়। আরেকজন ইয়োরোপীয় সরকারকে এ বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ সদুপদেশ দিয়েছিলেন সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে। তিনি হলেন যাজক জেমস্ লং।

শাসকদের বেশি আতঙ্ক ছিল বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়ে। ইয়োরোপীয় আমলারা দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র নিজেরা পড়তেন না, অজ্ঞতা এবং অবজ্ঞাবশত। নির্ভর করতেন শোনা কথা, গুজব ও অতিরঞ্জিত আলাপচারিতার ওপর। তার ফল হল মারাত্মক। ভারতীয়দের এই সাম্রাজ্যবাদীরা মানুষ বলেই মনে করতেন না। বলা যেতে পারে তাদেরই উত্তরসূরি কিপলিং, চার্চিল এবং তাঁদের জ্ঞাতিভ্রাতা রিচার্ড নিক্সন ও হেনরি কিসিংগার। ইন্দিরা গান্ধিকে 'বুড়ি ডাইনি' এবং ভারতীয়দের 'বেজন্মা বজ্জাত' বলতে তাঁদের রুচিতে আটকায় না। কিন্তু ভারতীয়রা এই জাতীয় ইংরেজ শাসকদের অবজ্ঞার সমুচিত জবাব দিতেন তাঁদের কলমে। শাসকদের গা জ্বালা করত। তখনই তাদের ওপর নেমে আসত জেল, জরিমানা ও সংবাদপত্র বন্ধ করে দেবার শাস্তি।

লর্ড ক্যানিং-এর অনুরোধে রেভারেন্ড জেমস্ লং ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র বিষয়ে একটি রিপোর্ট দেন। মহাবিদ্রোহ তখন দমিত হয়ে গেছে। রেভারেন্ড লং লিখলেন যে এই পত্রিকাগুলি দেখতে সাধারণ হলেও তার লেখাগুলি যথেষ্ট উচ্চমানের। ইংরেজ শাসনের অন্যায়, অবিচার ও কুকীর্তি এই সমস্ত সংবাদপত্র নিপুণভাবে প্রকাশ করে। নীলকরদের অত্যাচারের বিবরণ ও জেলাশাসকদের ভুলভ্রান্তি স্বেচ্ছাচারিতার কথা তারা প্রচার করে। ইংলন্ডে যে সব অপরাধ হয় তার বিবরণও এই সংবাদপত্রগুলিতে স্থান পায়। পাঠকরা তাতে

বুঝতে পারে যে বিলেতে সমাজও দুষ্কর্মমুক্ত নয়।। জনসাধারণের ওপর এই সংবাদপত্রগুলির প্রভাব খুবই বেশি। কিছু সংখ্যক ইয়োরোপীয় সম্পাদক ভারতীয়দের সম্পর্কে যে ধরনের কটূক্তি ও গালাগাল করেন, সেগুলোর তর্জমা এরা প্রকাশ করে। তাতে স্থানীয় জনসাধারণের মনে ইয়োরোপীয় বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। ইংরেজি সংবাদপত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতিবিদ্বেষের মনোভাবসম্পন্ন।

তিনি সরকারকে পরামর্শ দেন ভারতীয় পত্রিকার জন্য সরকারি তরফের সংবাদ ও তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করতে। তাতে সরকারের বক্তব্য ও শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের কর্মসূচি ও সিদ্ধান্ত সম্পাদকদের পক্ষে জানা সম্ভব হবে।

লর্ড ক্যানিং তাঁর এই সুপারিশের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেন এবং সংবাদপত্র সম্পর্কে তাঁর আগেকার মনোভাবের পরিবর্তন করেন। ততদিনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ভারত সাম্রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করেছেন। লর্ড ক্যানিং প্রতিদিন লোক পাঠিয়ে ভবানীপুরে হরিশ্চন্দ্র মুখার্জির অফিস থেকে তাঁর সংবাদপত্র *দ্য হিন্দু পেট্রিয়ট* সংগ্রহ করে আনতে লাগলেন। হরিশ মুখার্জির কলম তখন নীলচাষীদের পক্ষ নিয়ে নীলকর সাহেবদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সরকার এ সম্পর্কে তদন্ত কমিশন বসাতে বাধ্য হয় এবং নীলচাষ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে এটাই সর্বপ্রথম সাংবাদিকতার শ্রেষ্ঠ বিজয়লাভ।

ঔপনিবেশিক শাসনে নিয়ন্ত্রণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতীয় সংবাদপত্রের পক্ষে জনমত সংগঠনের এই কৃতিত্ব হরিশ্চন্দ্র মুখার্জির প্রাপ্য। তাঁর অকাল মৃত্যুতে (১৮৬২) শোকাহত দেশবাসী লোকগানে এই মহান সাংবাদিক যোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। (নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করল এবার ছারখার। অসময়ে হরিশ ম'ল লঙের হল কারাগার।)

অবশ্য এই উদারনীতির মধুচন্দ্রিমা ফুরোতে বেশি সময় লাগল না। বাঘ কি কখনও ডোরা পালটাতে পারে? ঔপনিবেশিক স্বার্থের শত্রু জনমত এবং সেই জনমতের প্রতিফলন ঘটে সংবাদপত্রে। একটা বড় রকমের সংবাদশাসন প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ইংরেজ শাসকরা ১৮৭৮ সালে ভার্নাকুলাব প্রেস আইন চালু করে। এবারেরও লক্ষ্য বাংলা ভাষার সংবাদপত্র। শিক্ষিত বাঙালিদের চিন্তাধারা রামমোহন রায়ের আমল থেকেই ইয়োরোপীয় উদারনীতি, যুক্তিবিজ্ঞান, মানুষের অধিকার এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রভাবিত। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা, টম পেইনের বই 'রাইটস্ অফ্ ম্যান' 'এজ অভ রিজন' মিল, বেন্থাম, কোঁৎ, রুশো, ভলতেয়ার ভাবনাদর্শে নিষিক্ত বাঙালি শিক্ষিত শ্রেণীর অগ্রণী অংশ গোটা ভারতবর্ষের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সুতরাং বাংলা সংবাদপত্র তথা ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করা হল এই কঠোর নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করে।

এই আইন প্রণয়নের নাটের গুরু ছিলেন বাংলার ছোটলাট স্যার অ্যাশলি ইডেন। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ যাতে সেগুলি এমন সংবাদ ও মতামত প্রচার করতে না পারে যা রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক। ইয়োরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রের সঙ্গে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের পার্থক্য সৃষ্টি করে ইডেন বোঝাতে চাইলেন যে ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদকরা এ বিষয়ে

দায়িত্বশীল, তারা লেখেন শিক্ষিত শ্রেণীর জন্য। রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক লেখা সেই শ্রেণীর পাঠক বরদাস্ত করবে না। কিন্তু বাংলা সংবাদপত্র কিংবা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। তারা নাকি ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে লোক ক্ষেপিয়ে তোলে, উস্কানি দেয় রাষ্ট্রদ্রোহিতার। শিশিরকুমার ও মতিলাল ঘোষের *অমৃতবাজার পত্রিকার* ওপরই রাগ ছিল বেশি। *অমৃতবাজার পত্রিকা* তখন বাংলায় ছাপা হত। ইডেন চেয়েছিলেন আর্থিক দাক্ষিণ্যের প্রলোভন দেখিয়ে *অমৃতবাজার পত্রিকাব* সম্পাদককে হাত করতে। শিশিরকুমার মতিলাল সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। নতুন আইনে বাংলা পত্রিকার ওপর কার্যত সেন্সরশিপ চালু হয়। জেলাশাসক ও পুলিশ কমিশনারদের ক্ষমতা দেওয়া হয় সংবাদপত্রের মুদ্রক ও প্রকাশকের কাছে এই লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় করতে যে তারা আপত্তিকর কোনো সংবাদ বা মতামত ছাপবেন না। কোনো সংবাদ আপত্তিকর মনে হলে সংবাদপত্রের মুদ্রক, প্রকাশকের কাছে জামানত দাবি ও তা বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয় জেলাশাসক ও পুলিশ কমিশনারকে।

বাংলার ছোটলাট ইডেন ও বড়লাট লর্ড লিটন উভয়ে মিলে সংবাদশাসনের এক কলঙ্কজনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এই আইন পাশ করে।

তবে *অমৃতবাজার পত্রিকা* রাতারাতি বাংলা থেকে ইংরেজিতে রূপান্তরিত হয়ে ইডেনের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পেরেছিল। মতিলাল ঘোষ লিখলেন, 'An autocrat of autocrats, Sir Ashley Eden sought to rule Bengal with an iron hand'. লৌহমুষ্টিতে বাংলা শাসনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই ইডেনের ভার্নাকুলার প্রেস আইন প্রবর্তন। কিন্তু বাংলার মানুষ তা নীরবে মাথা পেতে নেয়নি। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, রবার্ট নাইট প্রমুখ বিদ্বজ্জনএর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। বহু সভা অনুষ্ঠিত হয় দেশের বিভিন্ন জায়গায়। বিলেতে তখন নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছিল। লিবারেল নেতা গ্ল্যাডস্টোন নির্বাচনী প্রচারে ভার্নাকুলার প্রেস আইনের তীব্র নিন্দা করেন। ১৮৮০-তে তিনি নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী হন। লর্ড রিপনকে তিনি পাঠান ভাইসরয় হিসেবে। গ্ল্যাডস্টোনের প্রতিশ্রুতি মত লর্ড রিপন কার্যভার গ্রহণ করার পর এই আপত্তিকর এবং বৈষম্যমূলক সংবাদ নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল করে দেন (১৮৮১)।

কয়েক বৎসর পরেই জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৮৫)। কংগ্রেসের প্রতিটি অধিবেশনেই বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে নরম গরম প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। সংবাদপত্রের আলোচ্য বিষয়ে এই সমস্ত প্রস্তাব প্রাধান্য পেতে থাকে। শাসক গোষ্ঠীর নজরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে সংবাদপত্রের ওপর। সংবাদ নিয়ন্ত্রণের জন্য অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট বলবৎ হয় ১৮৮৯ সালে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে বাংলার সংবাদপত্রগুলির ওপর নতুন করে দমননীতি চালু করে ব্রিটিশ সরকার। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের পক্ষে জোরালো সমর্থনে এগিয়ে আসেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, কৃষ্ণকুমার মিত্রের মতো দিকপাল সাংবাদিক ও জননেতাগণ। ব্রহ্মবান্ধবের *সন্ধ্যা*-র আগুন ঝরানো সম্পাদকীয় ও ব্যঙ্গাত্মক শিরোনাম শাসকদের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। ব্রহ্মবান্ধবকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হয়। বিচারের সময় এই নির্ভীক সন্ন্যাসী সাংবাদিক

ঘোষণা করেন যে তিনি ব্রিটিশ আদালতের বিচার মানেন না। একজন দেশপ্রেমিকের বিচার করার এক্তিয়ার নেই বিদেশী শাসকদের। বিচারাধীন অবস্থায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় কারাগারে। স্বাধীনতা সংগ্রামের শহিদের মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

স্বদেশি আন্দোলনের তীব্রতার পাশাপাশি দেখা যায় সশস্ত্রপন্থায় বিশ্বাসী সংগ্রামীদের গুপ্ত সমিতি। সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ কঠিনতর হল নতুন প্রেস আইন জারি করে। সংবাদশাসন ব্যতীত ঔপনিবেশিক শাসন নিরাপদ নয়, এই যুক্তিতে কার্জনের পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড মিন্টো তাঁর অস্ত্রাগারে মজুত শাণিত অস্ত্রগুলি একে একে প্রয়োগ করলেন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে। এগুলোর নানা নাম কিন্তু উদ্দেশ্য একই--সংবাদপত্রকে দমন করা।

অফিসিয়্যাল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট, পাবলিক মিটিংস অ্যাক্ট, প্রেস অ্যাক্ট, সিডিশন আইন ইত্যাদি নানাবিধ প্রহরণ যৎসইভাবে ব্যবহৃত হতে লাগল বঙ্গভঙ্গবিরোধী স্বদেশি আন্দোলন এবং তা থেকে উৎসারিত বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ বা সংবাদ দমনের উদ্দেশ্যে।

১৯১০ সালের প্রেস আইন চালু হবার পর থেকে পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে ৩৫০টি ছাপাখানা এবং ৩০০-এর বেশি সংবাদপত্রের জরিমানা হয় এবং ৫০০ ইস্তাহার ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করে বৃটিশ সরকার। সংবাদপত্র দমননীতির শিকার হয় *অমৃতবাজার পত্রিকা, বম্বে ক্রনিকল, দা হিন্দু, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, দা ট্রিবিউন, দা পাঞ্জাবি, দৈনিক বসুমতী, স্বদেশমিত্রন, ভারতমিত্র* প্রভৃতি পত্রিকা-যাদের অপরাধ ছিল সরকারি স্বৈরনীতির সমালোচনা প্রকাশ।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ইয়োরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৯) প্রতিক্রিয়ায় ভারতে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের অনিবার্যতা রোধ করতে ব্রিটিশ সরকারের নীতি প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। প্রতিবাদ স্তব্ধ করে দেওয়া হয় জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের (১৯১৯) দ্বারা। পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করে সংবাদের উৎস বন্ধ করে শাসকরা। *বম্বে ক্রনিকলের* সম্পাদক বেঞ্জামিন গী হর্নিম্যান জাতে আইরিশ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শরিক। তিনি নিজে পাঞ্জাব পরিদর্শন করে এসে সামরিক আইন প্রয়োগকারীদের অত্যাচারের তথ্য ফাঁস করে দেন। ইয়োরোপীয় সম্পাদককে জেলে পাঠানোর কোনো ক্ষমতা ছিল না শাসকদের। কিন্তু কোম্পানির আমলের পুরনো আইন মোতাবেক এই সাহসী সম্পাদককে তারা বিলেতের জাহাজে তুলে দিয়ে এদেশ থেকে নির্বাসিত করে।

ইতিমধ্যে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মহাত্মা গান্ধি। সংবাদপত্রের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেই। তিনি সেখানে *ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন* (১৯০৪) নামে পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ভারতে এসেও তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার সহযোগী হিসেবে *ইয়ং ইণ্ডিয়া* (১৯২৫) এবং *নবজীবন* নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে হরিজন নামে পত্রিকাও তাঁরই সম্পাদনায় বেরুত। সরকার তীক্ষ্ণ নজর রাখত এই পত্রিকাগুলির ওপর। ত্রিশের দশকে বাংলায় বিপ্লবীদের তৎপরতা বৃদ্ধি হলে সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি হয়। চল্লিশের দশকে সরকারি অর্ডিন্যান্স জারি করে সংবাদপত্রে যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরুদ্ধে কোনো রকম সংবাদ বা মন্তব্য প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়। এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সংবাদপত্র প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। গান্ধিজি এই নির্দেশের প্রতিবাদে *হরিজন* বন্ধ করে দেন। *ন্যাশনাল হেরাল্ডের*

মতো সংবাদপত্র যার সঙ্গে জওহরলাল নেহরু ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন তার সম্পাদকের ওপর আদেশ জারি হয় যে যুদ্ধের খবরের শিরোনামগুলি ছাপার আগে সরকারের তথ্যবিভাগের সচিবের কাছে পাঠাতে হবে পরীক্ষা করার জন্য। এর প্রতিবাদে *ন্যাশনাল হেরাল্ড* ছ'মাস যুদ্ধের খবর ছাপে শিরোনাম বা হেডলাইন ছাড়াই। ছমাস পর এই আদেশ প্রত্যাহৃত হয়। বিয়াল্লিশের (১৯৪২) আগস্টে কুইট ইন্ডিয়া বা ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দেয় কংগ্রেস। সেই ক্রান্তিকালে সংবাদপত্রেব ওপর দমনপীড়নের জন্য ভারত রক্ষা আইন অনুযায়ী ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে আন্দোলনের সরকারি ভাষ্য ছাড়া কিছুই প্রকাশ করা সম্ভব হত না। ফলত, গোপন প্রচারপত্র বা আন্ডারগ্রাউন্ড সংবাদপত্র মারফৎ আগস্ট আন্দোলনেব সংবাদ দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রচার করা হত। এই দুঃশাসনের রাজত্ব শেষ হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তর ও খণ্ডিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের দিনটিতে।

দুই

মনে করার কোনো কারণ নেই যে, সংবাদ শাসনের দুঃস্বপ্ন স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। দীর্ঘদিনের সংগ্রামী ভূমিকা ছিল ভারতের সংবাদপত্রের। স্বাধীন ভারতবর্ষের পরিবর্তিত বাতাবরণে সেই ভূমিকা আরও অর্থবহ হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। ১৯৪৭ সালের পরবর্তী তিন বছর অর্থাৎ ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি গণতান্ত্রিক সংবিধান গৃহীত হওয়া পর্যন্ত ছিল এক অন্তর্বর্তী কালের শাসন। কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে স্বপ্নভঙ্গের বেদনায়। ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিষ্করুণ আমলাতান্ত্রিকতার শিকার সাধারণ মানুষের আশাভঙ্গের বেদনার প্রতিফলন ঘটবে সংবাদপত্রে এটা স্বাভাবিক। ভারতের সংবিধানের ১৯(২) ধারায় বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকৃত। সরাসরি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ না থাকলেও এই অনুচ্ছেদই মূলত সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উৎস। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু এ বিশ্বাস নবগঠিত সরকারের সমর্থকদের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে প্রযোজ্য ছিল না। বিরোধীদের সমালোচনায়, বিক্ষোভে তাঁরা বিচলিত হতেন। বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসন কর্তৃপক্ষ নানাভাবে সংবাদপত্রের সমালোচনা স্তব্ধ করে দেবার জন্য নিয়ন্ত্রণাদেশ জারির উদ্যোগ নেয়। বিচারালয়ে সে-সব প্রচেষ্টা সংবিধান বিরোধী বলে বাতিল হয়ে যেতে থাকে। এর প্রতিকারের জন্য কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি প্রেস (আপত্তিকর বিষয়) বিল (১৯৫১) সংসদে পেশ করেন। প্রচুর নৈতিক উপদেশমূলক বাক্য তাতে সন্নিবিষ্ট ছিল। স্বাধীন ভারতে সংবাদশাসনের জন্য এরকম একটি আইন হতে পারে তা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সাধারণ মানুষ বুঝতে পারলেন যে শাসন বদল হলেও, শাসকচরিত্র 'অঙ্গার শতধৌতেন' নীতিবচনের মতোই তার মলিনত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে না। সংসদে বিলের ওপর বিতর্কের সময় বিরোধীরা রাজাগোপালাচারিকে মনে করিয়ে দেন সংবাদপত্র দমনের জন্য এই আইন ব্রিটিশ আমলে ১৯৩১ সালের প্রেস আইনেরই নবরূপ। অম্লানবদনে রাজাগোপালাচারি এই আপত্তি হজম করে নিয়ে বলেছিলেন যে যেহেতু চল্লিশকোটি লোকের মধ্যে কেউ না কেউ স্বাধীনতার অপব্যবহার করবে সেহেতু দমনমূলক আইনও থাকবে।

চমৎকার যুক্তি সন্দেহ নেই। এতে বোঝা যায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও তার সমালোচনার অধিকারকে শাসকগোষ্ঠী তখনও মনেপ্রাণে স্বীকার করতে পারেনি। ১৯৫২ সালে প্রথম প্রেস কমিশন গঠিত হবার পর এই বিতর্কিত আইনটির প্রয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ সংবাদপত্রের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কিত বিষয়সহ সর্বাঙ্গীণ তদন্তের ভার তখন ন্যস্ত হয়েছে নবগঠিত প্রেস কমিশনের ওপর। সংবাদশাসনের জন্য এমনিতেই সরকারের হাতে বেশ কিছু প্রহরণ ব্রিটিশ আমল থেকেই মজুত ছিল। মানহানি, সরকারি গোপন তথ্য সংরক্ষণ, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, সামরিক তথ্য বিষয়ে সতর্কতা ইত্যাদি নানাবিধ আইন রয়েছে যা প্রয়োজন হলেই সংবাদপত্র বা যে কোনো গণমাধ্যমকে নিরস্ত করার জন্য কাজে লাগানো যায়। বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোয় বিভিন্ন ধরনের মতবাদ প্রকাশের যেমন অধিকার আছে, তেমনি সত্যিকারের সিভিল সোসাইটির অন্তর্নিহিত সহনশীলতার গুণে ভিন্নমত প্রয়োজনীয় বলেই বিবেচিত হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল পরশাসনের কবলিত থাকার ফলে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও শাসকগোষ্ঠী সংবাদপত্রের সমালোচনার বিষয়ে অতিমাত্রায় স্পর্শকাতরতার পরিচয় হামেশাই দিয়েছে।

চিন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের (১৯৬২) সময় এবং পাক-ভারত যুদ্ধের (১৯৬৫) সময়ে ব্রিটিশ আমলের কুখ্যাত ভারত রক্ষা আইন জারি করা হয়। তাতে নাগরিকদের অধিকারই শুধু খর্ব হয়নি, নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে সংবাদপত্রের ওপরও চোখ রাঙানি দিব্যি চলেছিল। সবচেয়ে কলঙ্কিত আচরণ ছিল ইন্দিরা গান্ধির জমানায়। শুধুমাত্র নিজের গদি রাখার জন্য ১৯৭৫ সালের জুন মাসে জারি করা হয় জরুরি অবস্থা। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণসহ সংবাদপত্রের তথ্য পরিবেশন ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সেন্সরশিপ প্রবর্তন করা হয়। ব্রিটিশ আমলেও সিডিশন বিলের (১৮৯৮) বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখতে পেরেছিলেন 'কণ্ঠরোধ' যা তিনি টাউন হলের জনসভায় পাঠ করেছিলেন। সংবাদপত্রের ওপর খবরদারি চাপালেই সংবাদ চাপা থাকে না, তা আত্মগোপন করে লোকের মুখে মুখে ছড়ায়। এমারজেন্সির সময় অজস্র গোপনে মুদ্রিত ইস্তাহার মানুষের হাতে হাতে ঘুরেছে। প্রকাশ্য সংবাদের পথ রুদ্ধ হলে তা জনরব বা গুজবের আকার নেয়। তার ক্ষমতা ভয়ঙ্কর। রবীন্দ্রনাথ থাকলে তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধের ভাষারই পুনরুক্তি করে হয়তো বলতেন 'সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে, স্বাভাবিক নিয়মানুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না।' জরুরি অবস্থায় সংবাদের উৎসও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সংবাদ এজেন্সি পি. টি. আই এবং ইউ. এন. আই ভেঙে দিয়ে গড়া হয় সমাচার। সমাচারের অফিসে বসানো হয় সরকার নিযুক্ত সেন্সর অফিসার। কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিং থেকে প্রধান সংবাদপত্রগুলির অফিসে সেন্সর-দূত পাঠান হত। সমস্ত সংবাদ ও সম্পাদকীয় নিবন্ধের কপি তার সমীপে নিবেদন করা ছিল বাধ্যতামূলক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আকাট অফিসাররা সম্পাদকীয় নিবন্ধের প্রকৃত অর্থ, তির্যক মন্তব্য, শ্লেষ ইত্যাদি কৌশল ধরতেই পারতেন না। ফলত ইচ্ছামতন কাঁচি চালানো হত। বহু সংবাদপত্র প্রতিবাদে সম্পাদকীয় কলাম সাদা রেখে দিত। কেননা রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের উদ্ধৃতিও এই ব্যক্তিদের কাছে বিপজ্জনক মনে হত।

এমন অভাবনীয় পরিবেশ ব্রিটিশ আমলেও সংবাদপত্রের কর্মরত সাংবাদিকদের প্রত্যক্ষ করতে হয়নি। স্বাধীন ভারতবর্ষে সত্তরের দশকের এমারজেন্সি বা জরুরি অবস্থাকালীন সংবাদশাসন ইন্দিরা গান্ধির এক ঐতিহাসিক ভ্রান্তি যার মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছিল। ক্ষমতা

মানুষকে শুধু নীতিবিবর্জিতই করে না, তার বুদ্ধিশুদ্ধিও কার্যত লোপ পায়। প্রায় একই ভুল করতে যাচ্ছিলেন রাজীব গান্ধি মানহানি আইনের এক্তিয়ার ও প্রকরণ পরিবর্তন করে। সেটা আশির দশকের ঘটনা। বফোর্স কামান কেনার দালালিঘটিত চাঞ্চল্যকর তথ্য তখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত। সরকার ব্যতিব্যস্ত, বিব্রত এবং অনেকটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সরাসরি সেন্সর চালু না করে মানহানিকর সংবাদ প্রকাশের জন্য সম্পাদককে হয়রানি ও শাস্তি দেবার অবাঞ্ছিত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আইন সংশোধনের প্রস্তাব আনা হয়। কিন্তু দেশব্যাপী প্রবল প্রতিবাদের মুখে শেষ পর্যন্ত সেই সংশোধিত বিধি সংসদে পাশ করাতে পারবে না ভেবে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

PRESS AND DEMOCRACY
A STATESMAN SUPPLEMENT

A GREAT OPPORTUNITY
By S. NIHAL SINGH

Battle For Press Freedom

OLD NEWS AGENCY SET-UP RESTORED
By G. G. MIRCHANDANI

জরুরি অবস্থায় সংবাদশাসন

সংবাদপত্রের মালিকরা অবশ্যই সবাই ধোয়া তুলসিপাতা নন। সংবাদ ম্যানেজমেন্টের প্রযুক্তিবিদ্যা তাদের ভালই জানা আছে। সব সংবাদপত্র দায়িত্বশীল এ কথাও বলা যায় না হলফ করে। অভিসন্ধিমূলক সংবাদ বা পক্ষপাতিত্বমূলক মন্তব্য, বিশ্লেষণ, শিরোনাম কিংবা বিশেষ স্বার্থে তথাকথিত তদন্তমূলক প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে নিয়ম-নীতি বা সাংবাদিকতার আচরণ বিধি সবাই মেনে চলেন এ কথাও বলা শক্ত। প্রেস কাউন্সিলে এ বিষয়ে প্রচুর অভিযোগ জমা হয়। ক্ষমতাবান সংবাদপত্র গোষ্ঠী প্রেস কাউন্সিলকে তোয়াক্কা করে না, মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করে ত্রুটি স্বীকারে কার্পণ্য করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বতঃসিদ্ধ প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে। দুটি প্রেস কমিশনের রিপোর্টেই সংবাদপত্রের চালচলন, পরিচালনা ও সংবাদ পরিবেশনের বিষয়ে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। এর জন্য জনচেতনা প্রসার ও সাংবাদিকদের নিজস্ব উদ্যোগ ও সাংগঠনিক শক্তি গড়ে

তোলা প্রয়োজন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাষ্ট্র বা কোনো দল, সংগঠন বা গোষ্ঠীর পক্ষে সংবাদপ্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যুক্তিসম্মত নয়। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে বলার থাকলে প্রকাশ্য আলোচনায় তা যেমন আসতে পারে, তেমনি দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিচারালয়ের কাছে আবেদন করার পথ তো খোলাই আছে। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের পথ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সংবাদপত্রের প্রচার ও প্রসার নির্ভর করে তার বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর। একমাত্র পাঠকই তার বিচারক। রাষ্ট্রের হাতে সেই বিচারের ভার দেওয়া যায় না।

হা বি ব র হ মা ন

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি : বাংলা পত্রিকার ভূমিকা

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন এই সম্প্রীতি হুমকির সম্মুখীন হয়. সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্য বিনষ্ট হয়ে দেখা দেয় বিদ্বেষ, বিরোধ এবং জিঘাংসা। বন্ধুত্বের বদলে মানুষ তখন হয়ে দাঁড়ায় একে অপরের শত্রু, ভূমিকা নেয় পরস্পর যুযুধানের। এই রকম পরিস্থিতিতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় নানাবিধ পন্থাবলম্বনের মাধ্যমে তাঁদের মানবিক ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসেন। এসব পন্থার মধ্যে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রয়াস-প্রচেষ্টা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে। এমনকি বৈদ্যুতিন প্রচারমাধ্যমের প্রযুক্তিগত অভাবিত উন্নতির এই যুগেও পত্র-পত্রিকার ভূমিকা অক্রিয় হয়ে যায়নি। যদিও শেষ পর্যন্ত কারও কোনো প্রচেষ্টাই ফলবতী হয়নি, ভয়ংকর ও জঘন্য সাম্প্রদায়িক হানাহানি এবং তার সঙ্গে যুক্ত ছোটো-বড়ো আরও কারণের ফলে ১৯৪৭ সালের আগস্টে রক্তাক্ত ভারতবর্ষ ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল, তবু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আন্তরিক প্রয়াসে সমকালীন পত্র-পত্রিকা যে-ভূমিকা রেখেছিল তা নিঃসন্দেহে গৌরবজনক। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বাংলা পত্রিকার সেই ভূমিকা সন্ধানের প্রয়াস পাব। তবে মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা দরকার মনে করি।

গঠনগত দিক থেকে সাম্প্রদায়িক বা সাম্প্রদায়িকতা শব্দের অর্থ যা-ই হোক, প্রায়োগিক দিক থেকে বর্তমানে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ, অসম্প্রীতি ও তজ্জনিত কারণে হানাহানি। ভারতবর্ষ মুখ্যত হিন্দু-মুসলমানের আবাসভূমি। এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা যা হয়েছে এবং এখনও কখনো কখনো হয়ে থাকে তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই দুই ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে। ভারতবর্ষ বিভক্তিরও অন্যতম গুরুতর কারণ হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ। এই আলোচনায় তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বলতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতিকে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে।

বাংলাসহ সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায় সংঘটিত হয়েছে ইংরেজের শাসনামলে। এর আগে মুসলিম শাসনকালে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ-বিসংবাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা যে হয়নি তা নয়, কিন্তু সে-সব ছিল নিতান্ত বিচ্ছিন্ন ও স্থানিক ঘটনা। ইংরেজ আমলে প্রথম এই বিরোধ রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। ১৮৮২ সালে দয়ানন্দ সরস্বতীর গোহত্যা নিবারণী আন্দোলনকে বিরোধের ক্ষেত্রে প্রথম সংঘবদ্ধ অনুঘটক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।[১] এই আন্দোলন বিরোধকে অনেক ব্যাপ্ত করে দেয়। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "এতদিন পর্যন্ত যা ছিল দুই সম্প্রদায়ের উচ্চ আর মধ্যবিত্তের স্বার্থসংঘাত, তার সঙ্গে এবার যুক্ত হয়ে গেল এমন একটি ধর্মীয় বিষয় যা

নিম্নবর্গের মানুষকেও উত্তেজিত করে তুলতে পারে।"[২] আর ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও তজ্জনিত সরকারবিরোধী আন্দোলনে এর রাজনৈতিক রূপের সূচনা। সময় অতিক্রমের সাথে সাথে নানা ঘটনাধারায় এটি ঘনীভূত ও মারাত্মক হয়ে উঠতে থাকে। পরিণামে ঘটে দেশবিভাগ।

সন্দেহ নেই, হিন্দু-মুসলমান অসম্প্রীতি বৃদ্ধি ও বিস্তারে ইন্ধন যোগাতে লোকের অভাব যেমন ঘটেনি, তেমনি সম্প্রীতি সৃষ্টি ও রক্ষার ক্ষেত্রেও বহু মানুষকে ভূমিকা রাখতে দেখা গেছে। কেবল ইতিহাস বা ইতিহাসমূলক গ্রন্থাদি নয়, বাংলা পত্র-পত্রিকাও এর সাক্ষ্য ধারণ করে আছে। বস্তুত পত্র-পত্রিকায় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ও সম্প্রীতি রক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে এত বেশি লেখালেখি হয়েছে যে তা বিস্ময় উৎপাদন না করে পারে না। বিস্ময় এ কারণে যে এত করেও শেষ রক্ষা হতে পারল না। সে যা-ই হোক, অসংখ্য পত্র-পত্রিকার সেই অজস্র লেখার বিবরণ দেওয়া প্রায় অসম্ভব। *শিখা* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল "হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্বন্ধে যত বক্তৃতা হইয়াছে তাহা একত্র ছাপিলে আকারে হয়তো *Encyclopaedia Britanica*-কেও ছাড়াইয়া যাইতে পারে।"[৩] এ মন্তব্যে অতিশয়োক্তি নেই। ফলে আমাদের একটি সহজ পথ অবলম্বন করতে হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের যে-যে কারণ পত্রিকার সম্পাদক ও লেখকেরা চিহ্নিত করেছেন এবং তা নিরসনের উপায় নির্দেশ করেছেন সেগুলোকে একরকম শ্রেণীকরণ করে নিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হয়েছে। তবে এ আলোচনায় কবিতা, গল্প বা উপন্যাসের প্রসঙ্গ তোলা হয়নি, মূলত প্রবন্ধ ও প্রবন্ধধর্মী রচনাকে অবলম্বন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার মনে করি। অবস্থানগত কারণে সীমিত সুযোগের ফলে পত্র-পত্রিকা ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, কিন্তু যেটুকু সন্ধান করা গেছে তাতে মোটামুটিভাবে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর অনেকটা অংশ দেখা যাবে বলে আশা করি।

দুই

হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সবচেয়ে বেশি ঘনীভূত কালপর্ব দুবার বঙ্গবিভাগের মধ্যবর্তী সময়। এই সময়ের মধ্যে বাংলায় বহু সংখ্যক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এসব পত্রিকার প্রকৃতি অবশ্যই একরকমের ছিল না, কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেশোন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে যে-সব পত্রিকা বেরিয়েছিল তার অনেকগুলোরই ঘোষিত নীতি ছিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা এবং এমন কোনো লেখা না ছাপা যাতে কোনো সম্প্রদায় আহত হয়। গোলাম কাদেরের *হিন্দু-মোসলমান সম্মিলনী* (১৮৮৭), এস. কে. এম. মুহম্মদ রওসন আলীর *কোহিনূর* (১৮৯৮), সেখ হবিবর রহমানের *বঙ্গনূর* (১৯১৯), চিত্তরঞ্জন দাশের *বাঙ্গলার কথা* (১৯২১), মোহিনীমোহন দাসের *সাধক* (১৩২৯), রমণীমোহন দাস ও অচ্যুতচরণ চৌধুরীর *কমলা* (১৩৩১), গোলাম সামদানীর *আহমদী* (১৩৩২), মোহাম্মদ জাফর আলী ও মোহাম্মদ হানিফ পাঠানের *সবুজ পল্লী* (১৩৩৩), ভূপেন্দ্রনাথ শ্যামের *বর্তমান* (১৩৩৭), জাহানারা চৌধুরীর *রূপরেখা* (১৩৩৯)[৪], আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী ও আলী আহমদ ওলী এসলামাবাদীর *নয়া বাংলা* (১৩৪০), মহম্মদ আজিজুর রহমানের *জাগরণ* (১৩৪৪) প্রভৃতি সংবাদ-সাময়িকপত্রের কথা উল্লেখ করা যায়।

এক্ষেত্রে লক্ষযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে ধর্মচিন্তায় রক্ষণশীল হয়েও দেশহিতের প্রশ্নে হিন্দু-মুসলিম মিলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে কোনো কোনো পত্রিকা। যেমন মধুমিয়া ওরফে মুনশীময়েজউদ্দীন আহমদ সম্পাদিত *প্রচারক*। ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যায় (মাঘ ১৩০৬) সম্পাদক লেখেন :

> হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকত্ব এবং হৃদয়ের বিভিন্নত্ব যতদূর সাধ্য মোচন করিতে যত্নশীল থাকিব। পবিত্রতার আধার সমাজ-সংস্কারক শিক্ষকগণের বর্তমান আসরে উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইব। শিক্ষাই একমাত্র জ্ঞানের ভিত্তি, জ্ঞানই বিবেকের ভিত্তি : বিবেকই আত্মোদ্ধারের প্রধান ভিত্তি। সেই স্বর্গীয় ভাব সকলের প্রাণে জাগরিত হউক, ইহাই একান্ত বাসনা।[৫]

কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত *সঞ্জীবনী* লখনৌর এক গ্রামের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংবাদ পরিবেশন শেষে মন্তব্য করে :

> আমরা হিন্দু মুসলমানের ভেদ বিচার বুঝি না, হিন্দু মুসলমান উভয়েই এদেশের অধিবাসী ; হিন্দু মুসলমান উভয়েরই স্ব স্ব ধর্মাচরণে সমান অধিকার। ...হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই যে সম্প্রদায়গত ধর্মান্ধতাবশত এই সাধারণ সত্য বিস্মৃত ইহাই গভীর পরিতাপের বিষয়। হিন্দু এবং মুসলমান কেহই একে অন্যকে ছাড়িয়া এদেশে বসবাস করিতে পারিবেন না, উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদিগেরই ইহা জানা এবং বোঝা আবশ্যক ; এবং যাহাতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা ও যত্ন করা কর্তব্য। যাহাতে একে অন্যের প্রাণে অকারণে কষ্ট প্রদান না করে, উভয় সম্প্রদায়েরই তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।[৬]

সাম্প্রদায়িক বিরোধ-বিদ্বেষের নৈরাশ্যজনক কালে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সম্পাদনায় বেশ কয়েকটি পত্রিকার প্রকাশ ঘটেছে—বর্তমান প্রসঙ্গে এ তথ্যটিও উল্লেখ করবার মতো। পান্নালাল দে ও সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল হকের *হিন্দু-মুসলমান* (১৯২৬), নারায়ণকৃষ্ণ মজুমদার ও আবু নছর মহম্মদ হারেছউদ্দিনের *যুগের আলো* (১৩৩৯), এম. এস. উদ্দীন ও বিমল সেনের *বাঙালী* (১৯৩২), রকিবুস সুলতান ও নির্মল রায়ের ব্রতী (১৩৪০), আশরাফ আলী খান ও নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের *নও-জোয়ান* (১৩৪৫), হুমায়ুন কবীর ও বুদ্ধদেব বসুর *চতুরঙ্গ* (১৩৪৫), গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা ও গোলাম নবীর *নবজাগরণ* (১৯৪৫) প্রভৃতি পত্রিকা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সাক্ষ্য বহন করে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষিতার কারণে যৌথ সম্পাদনার অন্তত একটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। কাজী নজরুল ইসলাম পরিচালিত ও মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *লাঙল* (১৯২৫)-এর নাম পরিবর্তন করে পরের বছর প্রকাশিত হয় *গণবাণী*। পত্রিকার ডিক্লারেশন নেওয়া হয় মুজফফর আহমদের নামে। তাঁর উপরই প্রায় পুরোপুরি পত্রিকার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। কিন্তু এই অবস্থা বেশিদিন চলেনি। ১৯২৬-এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে, মুজফফর আহমদ লিখেছেন, "মুসলমান নামধারী সম্পাদকের অর্থাৎ আমার সম্পাদিত *গণবাণী* হিন্দুরা কেনা কমিয়ে দিলেন। তখন আমার সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদক রূপে প্যারীমোহন দাশের নাম ছাপা হতে থাকে। তারপর কালীকুমার সেনের নামও যুগ্ম সম্পাদক রূপে ছাপা হয়েছে।"[৭]

তিন

কিন্তু শত শত বছর পাশাপাশি বাস করেও কেন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ-বিসংবাদ? এ নিয়ে অনেকে ভেবেছেন ও পত্রিকায় লিখেছেন। একজন লেখকের মতে "নানা কারণে

এদেশে সাম্প্রদায়িক কলহ দিন দিন কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে। তন্মধ্যে সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মসম্বন্ধীয় এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত কারণগুলিই শ্রেষ্ঠ। এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের কেন্দ্রগুলির উভয় দিক নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে হিন্দু মুসলমান কলহের গোপন সত্যটি আপনি বাহির হইয়া পড়ে। তখন এই কালগ্রাসী ব্যাধির প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ করাও সুকঠিন নয়।"[৮] বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত অনেকের লেখা থেকে এই 'নিরপেক্ষ' ভাবনা ও বিচারের পরিচয় পাওয়া যাবে।

হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও দাঙ্গার প্রাথমিক কারণগুলোর মধ্যে একটি বড় কারণ ছিল মুসলমানের গরু জবাই বা গোবধ। ভারতবর্ষে এটি সত্যি সত্যিই অতি স্পর্শকাতর একটি বিষয়। কেননা গরু হিন্দুদের কাছে দেবতাতুল্য, সুতরাং অবধ্য ; অন্যদিকে মুসলমানের কাছে কেবল ভক্ষ্য নয়, গো কোরবানি দিলে তার পুণ্য লাভ হয়। তাই গরুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বোধ-বিশ্বাস। এক্ষেত্রে কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি নয়। এমনকি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় বাস্তবতার আলোকে যুক্তির আশ্রয়ে গোবধের পক্ষে বা বিপক্ষে কথা বললে স্বসম্প্রদায়ের কাছে অপ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়ে যায়। এ নিয়ে একটি মারাত্মক ও দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল মীর মশাররফ হোসেনের জীবনে। *গো-জীবন* (১৮৮৮) নামে একটি প্রবন্ধে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও আরও কিছু কারণ দেখিয়ে তিনি মুসলমানদের গোমাংস ভক্ষণ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিলে তাঁকে কাফের ও তাঁর স্ত্রী তালাকের ফতোয়া জারি করা হয়।[৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটার সম্ভাবনা ছিল না। তবু তাঁর অনেক মতামতের মতো আলোচ্য বিষয়ে ব্যক্ত একটি উক্তিতে হিন্দু সম্প্রদায় অখুশি হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। *প্রবাসী* পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩২৪ সংখ্যায় 'ছোটো ও বড়ো' নামে প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "নিজে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর-কোনো নাম দেওয়া যায় না।"[১০]

বোঝা অসম্ভব নয় যে ধর্মীয় কারণে মুসলমানরা গরু কোরবানি দিতে ও গোমাংস ভক্ষণ থেকে বিরত থাকবে না। আবার হিন্দুও গোবধ হতে দেবে না। তাহলে সম্প্রীতির উপায় কী? যদুনাথ চক্রবর্তী নামে জনৈক ব্যক্তি এ সম্পর্কে *কোহিনূর* পত্রিকার শ্রাবণ ১৩০৫ সংখ্যায় 'হিন্দু ও মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন,

> প্রত্যেক জাতি, স্বীয় ধর্ম ও জাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও দেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারে। তারপর একের ধর্ম কার্যের দ্বারা যেখানে অন্যের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত লাগিতে পারে, সেইসব স্থানে একটু ধীরতা, একটু বিবেচনার সহিত কাজ করিলেই সব গোল মিটিয়া যায়। মুসলমানগণ গো বধ করিয়া থাকেন, হিন্দুর শাস্ত্রে গো বধ নিষিদ্ধ ; গো মাতৃতুল্যা। এরূপ স্থানে মুসলমানগণ যদি যাহাতে এ বিষয়ে হিন্দুর মনে আঘাত না লাগিতে পায়, সেইভাবে কাজ করেন, তবে বোধহয় আর গোলযোগের সম্ভাবনা থাকে না, বিদ্বেষ বহ্নি ধূমায়িত হইতে পায় না।[১১]

খেয়াল করলে বোঝা যাবে যদুনাথ চক্রবর্তী মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে ঠিক স্পষ্ট কোনো উপায় বাতলে দেননি। স্পষ্ট একটি উপায় বরং নির্দেশ করছেন *সহচর* সম্পাদক সৈয়দ নওশের আলী। 'হিন্দু-মুসলমান' শিরোনামে আষাঢ় ১৩৩৭ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে তিনি জানিয়েছেন গো-কোরবানি নিয়ে মুলতানে হাঙ্গামা হলে কংগ্রেস প্রবর্তিত অনুসন্ধান

সমিতি সেখানকার মুসলিম নেতাদের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি করলে নেতৃবৃন্দ ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করে গরু জবাইয়ের কসাইখানা শহরের বাইরে তুলে আনার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব সমর্থন করে সম্পাদক লিখেছেন, "তাহাতে স্পষ্টই ধারণা হয় যে সাধারণ মুসলমানও তাহাদের চিরাভ্যস্ত প্রথা ছাড়িয়া দিতে গররাজী হইলেও তাহারা হিন্দুদিগের শান্তভাবকে তিতাইয়া তুলিতে ইচ্ছুক নহে। প্রত্যেক শহরে ও নগরে এইভাবে গো-বধ গৃহগুলি হিন্দু-চক্ষের অন্তরাল করিয়া লইলে হয়ত হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ অনেকটা কমিয়া যাইতে পারে।"[১২]

ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার্থে গো-বধের বদলা নিতে মনুষ্য-বধের বিষয়টি নিয়ে কেউ কেউ বিদ্রূপ করতেও ছাড়েননি। *প্রবাসী* পত্রিকার আষাঢ় ১৩৩৫ সংখ্যায় লেখা হয় :

> এবারেও বকরীদে মানুষের রক্তপাত হইয়াছে। তবে বেশী জায়গায় হয় নাই। তাহাতে হিন্দু মুসলমান ও পুলিশের ঈশ্বর প্রীত হইয়াছেন কি না, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন। যাঁহাদের ঈশ্বর পশুবলি চান ও তাহাতে সন্তুষ্ট হন, তিনি মনুষ্যবলিতে অধিক সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি? কারণ মানুষ তাঁহার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব। যাঁহারা গোরক্তপাত নিবারণের জন্য নিজেদের ও অন্য মানুষদের প্রাণকে তুচ্ছ করেন, তাঁহাদের মতে নিশ্চয়ই "মানুষ গোরুর চেয়ে নিকৃষ্ট জীব" ইহাই ঈশ্বরের উপদেশ। অতএব গরুর প্রাণ রক্ষা করিতে মানুষের প্রাণহানিতে তাঁহাদের ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি না বিবেচ্য। (পৃ. ৫০৩)

ধর্মবিশ্বাসজনিত কারণে এই হাস্যকর হানাহানিতে কোনো কোনো মুসলিম লেখককেও বিদ্রূপ করতে দেখি ; তবে তা গো-বধ নিয়ে নয়, মসজিদের সামনে দিয়ে হিন্দুদের বাদ্য বাজানো নিয়ে। বলাবাহুল্য বাদ্যব্যাপারটি নিয়েও ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক কলহ কম হয়নি। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফফর আহমদ একবার লেখেন,

> মসজিদে, মসজিদে মুসলমানরা নামাজ পড়ে থাকেন। সেই নামাজের নাকি ভয়ানক ব্যাঘাত ঘটে হিন্দুরা তার সম্মুখ দিয়া বাদ্য বাজিয়া গেলে। বড় বড় শহরে ট্রামের ঘর-ঘরানিতে নামাজের ব্যাঘাত হয় না, মোটরের ভোঁ ভোঁতেও কোনো ব্যাঘাত হয় না, এমনকি মোহররমের বাদ্য যত তুমুলভাবেই বাজুক না কেন তাতেও নামাজে এতটুকু ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয় না,—হয় কেবল হিন্দুর বাদ্য-ধ্বনিতে।[১৩]

সিরাজউল ইসলাম নামক একজন লেখক লেখেন, "মসজিদের সামনে বাজনা বাজালে মুসলমান ধর্মের যে কি ক্ষতি হয় কিম্বা মসজিদের সামনে বাজনা বন্ধ করলে হিন্দু ধর্মের যে কি ক্ষতি হয়, তা আমার ক্ষুদ্র মাথায় কেন, বর্তমান জগতের বড় বড় মনীষীদিগের মাথায়ও খেলে না।"[১৪] শ্রাবণ ১৩৩৫ সংখ্যায় *প্রবাসী* পত্রিকার 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-এ বলা হয়, "কোনও ধর্মাবলম্বী লোকেরা তাঁহাদের ধর্মালয়ে যখন উপাসনায় রত থাকেন, তখন কোনও প্রকার গোলমাল করিয়া তাহাতে ব্যাঘাত উৎপাদন ভদ্রতাসঙ্গত নহে, ধর্মসঙ্গতও নহে। এরূপ আচরণ না করা সকলেরই কর্তব্য।"[১৫] *প্রবাসী* আরও লেখে যে, কিন্তু জোরপূর্বক সব সময়েই মসজিদের সামনে গানবাজনা বন্ধ করার ন্যায্য অধিকার কারও নেই। কেননা এরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে বিশেষ করে মসজিদেরই অপমান হয় বা মুসলমানদের ঈশ্বরেরই অপমান হয় তা সত্য নয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বলেন যে, মহরমের সময় মুসলমানরা মসজিদের নিকটে ও সামনে ঢাকও বাজিয়ে থাকে। এতে তাদের মসজিদ অপবিত্র হয় না, ইসলামের অপমান হয় না এবং তাদের ঈশ্বরও অসন্তুষ্ট হন না। প্রায়

অনুরূপ কথা লিখেছিলেন ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখক কাজী আনোয়ারুল কাদির তাঁর বিতর্কিত একটি প্রবন্ধে। মসজিদের সামনে বাজনা বাজালে মুসলমানদের কিছু অসুবিধা হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে তাদের গোনাহ্ (পাপ) হয় তা স্বীকার করতে তিনি রাজি নন। কেননা বাজনা তো বাজাবে হিন্দুরা, তাতে মুসলমানের পাপ হবে কেন? হিন্দুদের সবিনয়ে অনুরোধ করা সত্ত্বেও যদি না শোনে তবে মুসলমানদের পাপ হওয়ার কথা নয়। এরপরও যদি কোনো মুসলমান বলে যে এতে তাদের পাপ হবে, তাহলে লেখকের সবিনয় জিজ্ঞাসা এর জন্য কী করতে বলেন তারা? এর জন্য কি মুসলমানদের প্রাণ দিতে হবে?[১৬]

আহমদী কর্তৃপক্ষ ভরতপুর রাজ্যে একই প্রাঙ্গণে মন্দির ও মসজিদের অবস্থানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে উভয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে লেখেন,

> ...তথায় হিন্দু-মুসলমান উভয়ে শান্তির সহিত নিজ নিজ উপাসনালয়ে যোগ দিয়া থাকেন। কখনও কাহার সঙ্গে বিবাদ হয় না। তবে যে কলিকাতার বুকের উপরে, আজ একমাস যাবৎ হিন্দু-মুসলমানে জীবন-মরণ লড়াই চলিয়াছে, ইহার কারণ কি? হে কলির মানুষ। তোমরা জিদ ছাড়! হে হিন্দু জিদ ধরিয়া মসজিদের সামনে ঢাক ঢোল বাজাইয়া নামাজের সময় বাধা দিও না। হে মুসলমান, তুমিও জিদ ধরিয়া হিন্দুর বাদ্য বন্ধ করিতে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিও না। ভ্রাতৃভাবে একে অন্যের দোষত্রুটি দূর করিতে চেষ্টা কর। ইহাই মিলনের প্রকৃষ্ট উপায়।[১৭]

চার

একথা সত্য যে হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতিতে পার্থক্যের পরিমাণ কম নয়। এই পার্থক্যকে অনেকে দুই সম্প্রদায়ের মিলনের প্রধান অন্তরায় বিবেচনা করেছেন। কেননা এক্ষেত্রে কেউ ছাড় দিতে রাজি নয়, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর। কিন্তু যারা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ও দেশের কল্যাণার্থে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন তারা এই পার্থক্যকে দুস্তর বাধা হিসেবে দেখেননি। এমনকি স্বাতন্ত্র্যপন্থীদেরও কেউ কেউ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করেছেন। আবার এই পার্থক্যকে প্রধান অন্তরায় বিবেচনা করেও মিলনের উপায় সন্ধান করা হয়েছে। মোহাম্মদ আবদুল হাকিমের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে :

> আমাদের মতে হিন্দু-মোসলমানের ধর্মগত সংস্কারই তাহাদের মিলনের প্রধান অন্তরায়। এই অন্তরায় দূর করিতে হইলে হয় উভয় সম্প্রদায়কে পরস্পরের ধর্মকর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্ত থাকিতে হইবে ; অথবা উভয় সম্প্রদায়কে উদারতা প্রকাশ করিয়া পরস্পরের ধর্মকর্ম সম্বন্ধে সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে কিংবা ত্যাগ স্বীকার করিয়া উভয় সম্প্রদায়কে পরস্পরের আপত্তিকর ধর্মকর্ম ও আচারানুষ্ঠানগুলি ত্যাগ করিতে হইবে। তাহা না করিয়া মোসলমানকে "গো-কোরবানী" বন্ধ করিতে বলিলে তাহারা হিন্দুর প্রতিমা পূজা ও বলি বন্ধ করিবার দাবি উপস্থিত করিবেই। ফলতঃ যেদিক দিয়া হউক না কেন, এরূপ একতরফা বিচারে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের পরিবর্তে অমিলই তীব্রভাবে জাগিয়া উঠিবে।[১৮]

কিন্তু 'ধর্মগত সংস্কার'-এর ভেদকে হিন্দু-মুসলিম অসদ্ভাবের কারণ হিসেবে দেখতে রাজি নন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তাঁর জিজ্ঞাসা : "একতার সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধ কি? আমি হিন্দু, তুমি মুসলমান ; তোমার আমার সৌহার্দ্য হইবে না কেন?" শেষে লেখকের সিদ্ধান্ত : "হিন্দু ও

মুসলমানের মধ্যে ধর্ম-বিদ্বেষ যে নিতান্ত অহেতুক ও পরিতাপের বিষয়, তাহা বিবেচনাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে সক্ষম।"[১৯] মহম্মদ মিলনানন্দ স্বামী *আহমদী* পত্রিকার সম্পাদককে একটি চিঠিতে লেখেন,

> কিছুকাল হইতে একদল লেখক ও ভাবুক সকাল সন্ধ্যায় শুধু এই বাণী আওড়াইতেছেন যে হিন্দু মোছলমানের মিলন হইতেই পারে না, কারণ তাহারা যে দুই সভ্যতার ধারা ভারতে বহন করিয়া আনিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। এই কথাটী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির দ্বারা এটা চরম ও পরম সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ...গান্ধী মহারাজও এই সম্মোহন বাক্যের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যদি প্রথম হইতেই ধরিয়া লওয়া যায় যে, হিন্দু-মোছলমানের মাঝে একটা দুস্তর সাগর বিদ্যমান, তবে যাঁহারা উভয়ের মিলন প্রয়াসী, তাঁহারা শুধু সমুদ্রের উপর সাঁকো বাঁধিতে চান। আমার বিশ্বাস, হিন্দু-মোছলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের যত চেষ্টা হইয়াছে, তাহার মধ্যে আন্তরিক বিশ্বাসের অভাব ছিল বলিয়াই ঐ সকল চেষ্টা সাফল্য লাভ হইতে পারে নাই। উভয়ের মধ্যে কেন যে মিলন হইবে না, আমি ত তাহার কারণ খুঁজিয়া পাই না।[২০]

মহম্মদ মিলনানন্দ স্বামীর পরিচয় আমাদের জানা নেই। তিনি যদি *আহমদী*-র কল্পিত কোনো ব্যক্তি হয়েও থাকেন, তবু পত্রিকার উদ্দেশ্যকে অশ্রদ্ধেয় ভাবা ঠিক হবে না। আহমদি সম্প্রদায়ের এই মুখপত্রটি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি সাধনের লক্ষ্যে যে-ভূমিকা রেখেছিল তা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্ম ও ধর্ম-সংস্কৃতিব বৈপরীত্যজনিত বিরোধকে কবি নজরুল ইসলাম তীব্র বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করেছেন। তাঁর মতে এ আসলে ধর্মের বহিরাবরণের বিরোধ, যে-আবরণকেই লোকে ধর্ম বলে জানে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁকে বলেছিলেন, 'দেখ, যে ন্যাজ বাইরের তাকে কাটা যায়, কিন্তু ভিতরের ন্যাজকে কাটবে কে?' নজরুল লিখেছেন,

> ...এই যে ভেতরের ন্যাজ, এর উদ্ভব কোথায়? আমার মনে হয় টিকিতে ও দাড়িতে। টিকিপুর ও দাড়িস্তানই বুঝি এর আদি জন্মভূমি। পশু সাজবার মানুষের একি "আদিম" দূরন্ত ইচ্ছা।—ন্যাজ গজাল না বলে তারা টিকি দাড়ি জন্মিয়ে যেন সান্ত্বনা পেল। সেদিন মানব মনের পশুজগতে না-জানি কী উৎসবই সাড়া পড়েছিল, যেদিন ন্যাজের বদলে তারা কোনো কিছু একটা আবিষ্কার করলে।[২১]

মনুষ্যরূপী পশু নয়, সহজাতভাবে পরস্পর শত্রু সত্যিকার দুটি পশুর মধ্যে মিলনের কথা বলে আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করব। জীবেন্দ্রকুমার দত্ত নামে একজন লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ঘটনাটি বিবৃত করেছেন। প্রতিবেশীর বাড়ির একটি কুকুর ও বিড়ালকে একদিন তিনি নির্জনে উৎফুল্লভাবে খেলা করতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, "যদি দুইটি ইতর প্রাণীও একস্থানে কয়েকমাস বাস করাতে, স্ব স্ব স্বভাব-বৈর বিস্মৃত হইয়া এইরূপ সৌহার্দ্য সুত্রে আবদ্ধ হইতে পারে, তবে জ্ঞান-গরিমায় শ্রেষ্ঠ জীব যে হিন্দু ও মুসলমান, এই পবিত্র ভারতবর্ষে যুগ যুগ ব্যাপিয়া বস-বাস করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মিলন কি অসম্ভব।..."[২২]

পাঁচ

মুসলমানের প্রতি হিন্দুর ঘৃণা ও অবজ্ঞাকে মিলনের আরেকটি অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে এই ঘৃণা ও অবজ্ঞার সঙ্গে হিন্দু-মানসে বিজয়ী ও বিজিতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াজাত ঐতিহাসিক সম্পর্ক যেমন ছিল, তেমনি হিন্দুর ধর্মবোধও কম ক্রিয়াশীল ছিল না। বিশেষত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর প্রতি উচ্চবর্ণের হিন্দুর মনোভাব ও আচরণের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। বলা দরকার, ইসলামের ধর্মনীতিতে না থাকলেও সমাজে উঁচু-নীচু ভেদ ছিল। উভয় সম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যেকার এই ভেদাভেদ বৃহত্তর মিলনের ক্ষেত্রে একটি সূক্ষ্ম বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে বলে মনে করেছেন চিন্তাশীল লেখক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী। তিনি লিখেছেন,

> ...হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনের একটী সূক্ষ্মতর দিকের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মিলনের মধ্যে এক একটী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মিলনও স্বীকৃত সত্য বলিয়া গৃহীত হওয়া কর্তব্য। এই জন্যই মহাত্মা গান্ধী হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্পৃশ্যতা দোষ নিবারণের জন্য বেশী করিয়া চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। মুসলমানদের মধ্যেও এক শ্রেণীর "জাতিভেদ" স্থান পাইয়াছে। ইহাও দূরীভূত হওয়া হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনের একটি অঙ্গ। আমি যদি আমার নিজের সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতিই সাম্য ও প্রীতিমূলক ব্যবহার করিতে না পারি, তবে অন্য সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইতে যাওয়া আমার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইবে?...
>
> সুতরাং হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনের স্থূলতর অর্থ বিভিন্ন ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন এবং সূক্ষ্মতর অর্থ বিভিন্ন ভারতীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা।[২৩]

অন্যদিকে হিন্দুর প্রতিও মুসলমানের ঘৃণা ছিল। যারাই হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির পক্ষে কথা বলেছেন ও কাজ করেছেন তারা সবাই এই পারস্পরিক ঘৃণার কথা স্বীকার করে তা মন থেকে মুছে ফেলার অনুরোধ জানিয়েছেন। *মাতৃমন্দির* পত্রিকায় অক্ষয়কুমার নন্দী লেখেন, "আজ জিজ্ঞাসার দিন আসিয়াছে--হিন্দু ভ্রাতা ভগিনীগণ, আপনারা কি মুসলমান ভ্রাতাদিগকে এ পর্যন্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন নাই? মুসলমান ভ্রাতা ভগিনীগণ, আপনারাও কি হিন্দুদিগকে ভালবাসিতে পারিয়াছেন?"[২৪] বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক আবুল হুসেন এই অবস্থার সমাধান নির্দেশ করেছেন এভাবে :

> ...হিন্দু যতদিন না আপনার হিন্দুয়ানী মনোভাব...ত্যাগ করতে পারবে, ততদিন মুসলমান তাদের সঙ্গে যোগ দিতে সাহস পাবে না। কেননা হিন্দু সংখ্যায় বেশী ও শক্তিতে প্রবল। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি স্বদেশ প্রেমের চেয়ে অধিকতর প্রবল। সুতরাং হিন্দু যতদিন তার ঐশ্বর্যের মদে মত্ত হয়ে আপনার অস্তিত্বকে ভারতের অস্তিত্বের সঙ্গে এক বলে মনে করবে, ততদিন মুসলমান তার শক্তি ও ঐশ্বর্যের ভয়ে ভীত হয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টাতেই উদ্বিগ্ন হয়ে ফিরবে ও মাঝে মাঝে হয়ত প্রতিশোধেরও চেষ্টা করবে। মুসলমানের মনে অনেক দুঃখ আছে--হিন্দুর ব্যবহারের জন্যই সে দুঃখ জমেছে। সেইরূপ মুসলমানও হিন্দুকে যথেষ্ট দুঃখ দিয়েছে। এখন এই দ্বন্দ্ব দ্বেষাদ্বেষি মিটিয়ে ফেলবার প্রধান উপায় আমার মনে হয়--উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি দুঃখের পরিমাণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা, তারপর সে দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করা।[২৫]

আমরা আগেই বলেছি মুসলমান কর্তৃক ভারতবিজয় হিন্দু-মানসে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। স্বভাবতই এই বিজয় একেবারে নিরুপদ্রব ও রক্তহীন ছিল না। মুসলিম শাসনাবসানে ইংরেজের রাজত্বকালে শিক্ষাদীক্ষা ও অর্থবিত্তে অগ্রসর হিন্দু সমাজের একটি অংশ নানাভাবে সেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকে। সাহিত্য ও সংবাদ-সাময়িকপত্র ছিল তার বড় মাধ্যম। কিন্তু এতে যে কোনো লাভ নেই, বরং নানাদিক থেকে এটি যে ক্ষতির কারণ হচ্ছে এ সত্য উভয় সম্প্রদায়ের অনেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর পূর্বোক্ত 'হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি' প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

> অতীত কাহিনীর পুনরুল্লেখ দ্বারা ঈর্ষা ও দ্বেষের সৃষ্টি করিতে যাঁহারা প্রয়াসী, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষেই সমাজের বিপ্লবকারী ও দেশের শত্রু। পুরাতন কাসুন্দী ঘাটিলে আর লাভালাভ কি ভাই? মনুষ্য মাত্রেই অপূর্ণ ; প্রত্যেকেই ইন্দ্রিয়গ্রামের বশীভূত। তোমারও ক্রোধ আছে, আমারও ক্রোধ আছে। তুমি দুটো অন্যায় কথা বলিলে, বীরত্ব জানাইবার জন্য 'হামবড়া' 'হামবড়া' করিয়া গাত্র ঝঙ্কার দিয়া উঠিলে, আমিও নীরব রহিব কেন? কাজেই সংযমবিহীন আমরা উষ্ণ রক্তের জোরে একটা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধাইয়া বসিলাম। ভাই ভাইয়ে লাঠালাঠি করিলে পরিণাম ফল যাহা হয়, তাহাই হইল। বাহিরে শত্রু জাগিল, গৃহ বিচ্ছেদ বাড়িল, লাঞ্ছিত দলিত আমরা, — লাঞ্ছিত-দলিতই রহিয়া গেলাম। ...এমন নিজের মাথায় নিজে কুড়াল মারিয়া, কত যুগ যুগান্তর কাটাইয়াছি। বল কি লাভ হইয়াছে ভাই! তাহাতে আমাদের কপাল পোড়া ভিন্ন, কি লাভ হইয়াছে?[২৬]

বিদেশি শক্তির কাছে পদানত হওয়া তো কেবল ভারতবর্ষে ঘটেনি, পৃথিবীর আরও বহু দেশে ঘটেছে এবং তা যে অনেক ক্ষেত্রে কল্যাণেরও জন্ম দিয়েছে এ সত্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন,

> ...ইতিহাসের বিস্মৃত রক্তমাখা কয়েকটী ছিন্ন পাতা আর ভগবানের স্বরূপের অজ্ঞান লইয়া কলহ ভাই ভাইকে ঠাঁই ঠাঁই করিয়াছে। পরদেশের লোভে তরবারি হাতে কত লুণ্ঠক কত দেশে আসিয়াছে, কিন্তু রক্তে মিশিয়া তাহারাই ত আবার বিজিতের সহিত কত নব পরাক্রান্ত সভ্যতা সাম্রাজ্য গড়িয়াছে। ...বিজেতা ও বিজিতের সম্বন্ধ দুদিনের, মানবের রক্তের ডাক হৃদয়ের মিলনের ডাকই ত নিত্য ও চিরজয়ী। ভগবানের নাম ও তত্ত্ব মানুষে মানুষে একাত্মতা ঘটায়, ছিন্ন ভিন্ন করে না। ধর্মের নামে অন্ধ গোড়ামীর বশে যত ভ্রাতৃহত্যা যত দম্ভ তাহারাই করে, যাহারা পরম-ধন জ্ঞানে মরা শ্লোক বা বয়েৎ বহিয়া ধর্ম বলদ-জীবন-যাপন করে।[২৭]

আবুল হুসেন হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব দ্বেষাদ্বেষির জন্য দায়ী করেছেন তাদের অতীত মোহকে। হিন্দুরা চাচ্ছে তাদের দু-হাজার বছর আগেকার আর্যশক্তির পুনরুত্থান, আর মুসলমানরা স্বপ্ন দেখছে তাদের আরবি সাম্রাজ্যের। এই মোহ ও প্রচেষ্টার ফলে "...বর্তমানের দুঃখ দৈন্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি যেন ঘুলিয়া গেছে। সমস্ত ফেলে এই অতীতের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার অহঙ্কারে প্রমত্ত হয়ে দ্বন্দ্ব-হিংসায় সমস্ত শক্তি, অর্থ তারা অকাতরে ধ্বংস করে ফেলছে।"[২৮]

ছয়

শক্তির অপচয় ঘটেছে বাংলা সাহিত্যেও—প্রথমে হিন্দুর, পরে মুসলমানের রচনায়। এ নিয়ে মসীযুদ্ধ কম হয়নি ; তাতে মূল বিরোধ কতখানি কমেছে বলা শক্ত, যদিও সম্প্রীতিবাদীরা

প্রবল আশা পোষণ করেছেন যে একমাত্র সাহিত্যের মধ্য দিয়েই উভয় সম্প্রদায়ের মিলন সম্ভব। 'মিলনের উপায়' প্রবন্ধে আহমদ মিয়া বলেন যে কাঙ্ক্ষিত মিলনের জন্য সর্বপ্রথম সাহিত্যেরই সাহায্য ভিক্ষা করতে হবে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক পুস্তকাদির প্রণয়ন ও প্রচার বন্ধ করতে হবে। লেখাটিব সঙ্গে সংযুক্ত সম্পাদকীয় টীকায় বলা হয় : "...কথিত শ্রেণীর হিন্দু লেখকগণের রচনার প্রতিক্রিয়ারূপে ইদানীং মুসলমান সমাজে হিন্দু-বিদ্বেষমূলক গ্রন্থের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। আমরা উভয় সম্প্রদায়কে এইরূপ পরস্পর ধ্বংসকারী কার্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করি।"[২৯]

প্রতিক্রিয়ার শঙ্কাজনক পরিণাম চিন্তা করে *আল-এছলাম*-এর মতো ধর্মকেন্দ্রিক পত্রিকায়ও (ফাল্গুন ১৩২৪) লেখা হয় :

> প্রতিক্রিয়া যখন আরম্ভ হইয়াছে, তখন ইহার নিবৃত্তি যে সত্বর হইবে, তাহা মনে হয় না। কিন্তু ইহার ফল দেশের পক্ষে মারাত্মক হইবে। এই সমস্ত দেখিয়া যাঁহারা দেশের জন্য বাস্তবিক চিন্তা করেন, তাঁহারা গোপনে নীরব রোদন করিতেছেন মাত্র। এই সময় সাহিত্যের দিক দিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা নিষ্পত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য, সেই সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ দেশের থিয়েটারগুলির সংস্কার হওয়াও অতীব প্রয়োজনীয়। দেশহিতকামী ভ্রাতা-ভগিনীগণ এই মহৎ পুণ্য ব্রতে অগ্রসর হউন।[৩০]

১৯০৩ সালে মেদিনীপুর থেকে গিরিজাকুমার বসুর সম্পাদনায় *রেণু* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মূলত স্কুলের ছাত্র ও নবীন সাহিত্যসেবীদের 'মাতৃভাষার সেবাব্রতে' নিয়োজিত করা ছিল এর লক্ষ্য। কিন্তু সেই সাথে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি স্থাপনও পত্রিকা কর্তৃপক্ষের একান্ত কাম্য ছিল। সম্পাদক তাই বলেন, "হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মধ্যে যাহাতে সমধিক মিত্রতা সংস্থাপিত হয় সে বিষয়ে, কি হিন্দু কি মুসলমান সকলের সমান চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।"[৩১] সেজন্য তিনি মুসলমান লেখকদেরও *রেণু*-তে লেখা পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন এই আশায় যে তাতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির একটি বন্ধন গড়ে উঠবে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ *আঙুর* (বৈশাখ ১৩২৭) নামে কিশোরপত্র বের করলে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটি পত্রিকার ৫ম সংখ্যায় 'পত্র' নামে ছাপা হয়। বৃহৎ-হৃদয় দীনেশচন্দ্র সম্পাদককে লেখেন,

> ...আমি কি লিখিব? একটা কথা মনে হইতেছে। আজকালকার এই সাম্যবাদের দিনে হিন্দু ধর্ম ও মুসলমান ধর্মে কোন ঝগড়া থাকিতে পারে না। দেখুন না আপনার মত আরবী ফার্সীর মৌলভী সশ্রদ্ধ হইয়া বেদ পড়িতেছেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন যেন আমরাও সশ্রদ্ধ হইয়া কোরান পড়িতে পারি। দুই জাতির ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্য যদি পরস্পরে পাঠ করেন, তবেই আমাদের ঐক্য দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারিবে। পরস্পরের সঙ্গে গভীররূপে পরিচয় স্থাপন করিতে হইলে আপনার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে হইবে। যিনি হাফেজ ও চণ্ডীদাস পড়িবেন, তিনি দেখিবেন, ফার্সী ও বাঙ্গালী কবি দুই সহোদর—তাহাদের হৃদয় একই প্রীতির সূত্রে গ্রথিত।...[৩২]

আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ করি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ক্ষেত্রে সাহিত্য-সংস্কৃতির ভূমিকা বিষয়ে পত্রলেখক ও প্রাপকের মধ্যে মতের গভীর মিল। এই ঘটনার কয়েক বছর পর 'দেশের কথা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লেখেন, "...আমি বিশ্বাস করি কল্‌চরের মধ্য

দিয়াই আমাদের মিলন হইবে। যে পর্যন্ত মুসলমান হিন্দু কলচর সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিবে এবং হিন্দু মুসলমান কল্চার সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিবে, সে পর্যন্ত কখনই আন্তরিক মিল হইবে না।..."[৩৩]

সাহিত্য তথা সংস্কৃতির মাধ্যমে পারস্পরিক চেনা-জানার মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের একের প্রতি অপরের শ্রদ্ধাভক্তির অভাব দূর করে মিলনসাধন সম্ভব--উভয় সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ পত্র-পত্রিকায় এই গভীর বিশ্বাস ব্যক্ত করে কত যে লেখালেখি করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। উল্লেখ্য, এ প্রসঙ্গে এমন কথাও বলা হয়েছে যে, "এই মিলন সাহিত্যের ভিতর দিয়াই সাধন করিতে হইবে। রাজনৈতিক pact-এর দ্বারা কখনও সম্ভবপর হইবে না।"[৩৪]

সাহিত্য প্রসঙ্গে শিক্ষার প্রতিও আলোকপাত করা যেতে পারে। মুসলিম-মানস আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে হিন্দু-রচিত এমন সাহিত্যের প্রতি মুসলমানদের যেমন অভিযোগ ছিল, তেমনি অভিযোগ ছিল স্কুল-কলেজের পাঠ্যতালিকা সম্পর্কেও। কেননা এসব তালিকায় এমন এমন প্রসঙ্গ ছিল যাতে মুসলমান শিক্ষার্থী মনে আঘাত পেতে পারে এবং হীনম্মন্যতায় ভুগতে পারে। বস্তুত শিক্ষা-বিষয়টিও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বিনষ্টির ক্ষেত্রে কম ভূমিকা রাখেনি। উদারপন্থী অনেক হিন্দু লেখক সত্যটির প্রতি চোখ ঠারেননি। এমনকি সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টিতে কেউ কেউ সরাসরি আধুনিক অর্থাৎ সমকালীন শিক্ষাকে দায়ী করেছেন। ডাঃ বিপিনচন্দ্র পাল লেখেন যে অতীতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে-সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক ছিল তা আজ আকাশ কুসুম বা রূপকথায় পরিণত হতে চলেছে। উপমার সাহায্যে এরপর লেখক সুন্দর করে বলেছেন, "আজ আর সৌহৃদ্ধ (সৌহৃদ্য) ধুনার সুরভিত ধুম নির্গত হয় না--সেখানে মাঝে মাঝে ভয়াবহ অনল শিখা আত্মপ্রকাশ করে দুটিকেই বিনাশ করতে উদ্যত হয়ে থাকে। আমরা কিন্তু শুনতে পাই ক্রমেই দেশের অজ্ঞ অন্ধকারে শিক্ষার আলোক বাড়ায়ে দেওয়া হতেছে, কিন্তু জানি না সে কেমন শিক্ষা যে শিক্ষা সৌহৃদ্ধের (সৌহৃদ্যের) মুলে কুঠারাঘাত করে।"[৩৫]

প্রচলিত ভ্রান্ত শিক্ষার স্বরূপ তুলে ধরে আবুল হাসেম খান চৌধুরী নামে একজন লেখক আহ্বান জানান :

> দেশে শিক্ষা বিস্তার কর। শিক্ষার সংস্কার কর। দেশের সন্তান যাহাতে দেশবাসীকে ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে শিখে, তাহার বন্দোবস্ত কর। পাঠ্যপুস্তক ও সাহিত্যের পরিবর্তন কর, যাহাতে হিন্দুর সন্তান মুসলমান জাতির ইতিহাস পড়িয়া তাহাদের ভারতে আগমনে ভারতের সৌভাগ্য বলিয়া মনে করে তদ্রূপ ইতিহাস লিখ। যাহাতে মুসলমান সন্তান হিন্দুর ইতিহাস পড়িয়া সে জাতিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে শিখে, তাহার চেষ্টা কর। নাটকে নভেলে সাহিত্যে স্বদেশকে এবং স্বদেশবাসীকে উজ্জ্বল রূপে অঙ্কিত কর। হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কোমলমতি বালক-বালিকার সম্মুখে ধর। অবশ্য বিরোধ লোপ পাইবে, প্রীতির উদ্রেক হইবে।[৩৬]

কোমলমতি বালক-বালিকাদের সামনে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরার যে-কথা লেখক বলেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এ সত্য সকলেই জানেন অন্তত বাঙালি হিন্দু-মুসলমান ছেলেমেয়েরা প্রায় শিশুকাল থেকে যেভাবেই হোক নিজেদের হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং এই সচেতন হয়ে ওঠার মধ্যে তাদের

অবচেতনে ও সংস্কারে পারস্পরিক ঘৃণাবোধের একটি বীজ গোপনে গোপনে উপ্ত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে বড়োদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সম্পাদক নরেন্দ্র দেব মূলত এই ভূমিকা পালন করার জন্যই প্রকাশ করেছিলেন *পাঠশালা* নামে মাসিক পত্রিকা (১৯৩৭)। তাতে সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়েছিল, "...হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের মানুষ করে গড়ে তুলবার সদুদ্দেশ্য নিয়ে পাঠশালা পরিচালিত হবে।"[৩৭] হিন্দু-মুসলমান হানাহানির সেই বিষাক্ত কালে কিশোর-কিশোরীদের জন্য এই জাতীয় পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ ছিল নিঃসন্দেহে মহৎ কর্ম।

সাত

একালের উদার ও যুক্তিপন্থী ইসলামি চিন্তাবিদ আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার সাম্প্রদায়িকতার মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে লিখেছেন, "আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ইহজাগতিক দাবিসমূহ নিছক কোন বিশেষ ধর্মমতে বিশ্বাসী হবার জন্য যখন সেই ধর্মীয় সম্প্রদায় উপস্থাপনা করতে থাকে, আমার মতে তখনই তা সাম্প্রদায়িকতার মূল বিন্দু হয়ে ওঠে। এর অভিব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের বা বহু বিচিত্র হতে পারে। কিন্তু মূল বিচার্য হল — ইহজাগতিক দাবিসমূহকে ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ভাষায় আবরিত করে উত্থাপন করা হচ্ছে কি না? সাম্প্রদায়িকতার কেন্দ্রে ইহজাগতিকতা ; কিন্তু এর বহিরাবরণ ধর্মীয়। আর এই বহিরাবরণই প্রায়শ আমাদের প্রতারিত করে।"[৩৮]

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের দিকে তাকালে এই বিশ্লেষণের সত্যতা গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। গোবধ, মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো বা অন্যান্য ধর্মীয় আচরণাদি পালন হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের নিতান্ত গৌণ কারণ ; এর মূল কারণ নিহিত রয়েছে উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যে, যার সঙ্গে কম-বেশি মিশে ছিল ধর্ম। ১৯২৬ সালের জানুয়ারিতে মুজফফর আহমদ লেখেন, "ধর্মের ভেদবুদ্ধির ভিত্তির ওপরে জগতে কোনোদিন কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি,...। কিন্তু ভারতে হিন্দুতে আর মুসলমানে মিলে যে একটা সংহতি গড়বার চেষ্টা চলছিল, কিংবা আজো পর্যন্ত চলেছে, তাতে এই ধর্মের ভেদ-বুদ্ধির একটা প্রণোদন সব সময়ে ছিল এবং আজো আছে।"[৩৯] এর পরেও তা অব্যাহত ছিল। ফলে আধুনিক ভারতবর্ষের রাজনীতি যে-ধর্মসম্পৃক্ততা দিয়ে শুরু হয়েছিল তা দেশবিভাগ হয়ে আজও বহমান বলা চলে।

রাজনীতি-চেতনার সঙ্গে ধর্মসম্পৃক্ততা হিন্দু স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তার ধারণাকে যেমন সংকীর্ণ করে দিয়েছে, তেমনি মুসলমানেরও সাজাত্যবোধ বিশ্বমুসলিমবাদে (Pan-Islamism) মিশে গিয়ে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী চেতনার নির্মাণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। মূলের এই বিচ্ছিন্নতার বীজের মধ্যেই নিহিত ছিল পরিণামের বিচ্ছিন্নতার মহীরূহ। তরুণ চট্টোপাধ্যায়ের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে খুবই প্রণিধানযোগ্য মনে হয় —

> অনেক হিন্দু নেতাই যখন অখণ্ড হিন্দুস্থানের কথা বলেন তখন তাঁদের মনের কোণে লুকিয়ে থাকে ব্রিটিশ-বিদায়ের পর ভারতে অখণ্ড হিন্দু-শাসনের বাসনা। জিন্না সাহেব যখন পাকিস্থানের (পাকিস্তান) কথা বলেন তাঁর মনে লুকিয়ে থাকে তাঁর এবং তাঁর চেলাচামুণ্ডাদের

বাদশাহ হবার ইচ্ছা। কোন পক্ষই আসলে গণতান্ত্রিক উপায়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতের কথা আন্তরিকভাবে চিন্তা করেন না। সেইভাবে চিন্তা করলে জিন্না সাহেব ব্রিটিশের কাছে পাকিস্তান ভিক্ষা করতেন না। সেই ভাবে চিন্তা এবং কাজ করলে কংগ্রেসকে আজ মুসলমান ভারতবাসীকে হারাতে হোত না। কারণ, তাহলে মুসলমানরা অখণ্ড হিন্দুস্থানের নামে আঁৎকে উঠতো না এই ভেবে যে হিন্দুরা আমাদের গ্রাস করতে চায়। ফলে লীগ-নীতির কংগ্রেসের কাছে হার হোত এবং মুসলমানরা কংগ্রেসেই থাকতো।[৪০]

রাজনীতিকে এই সাম্প্রদায়িক বিভাজনের হাত থেকে মুক্ত রাখার ক্ষেত্রে উদারপন্থী বাংলা পত্রিকা প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। যে-খণ্ডিত জাতীয়তাবাদী চেতনা পরাধীন ভারতের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে শক্তিশালী করেছে, প্রথমেই প্রয়োজন ছিল তাকে নির্মূল করে 'ভারতীয় জাতীয় মন' গঠন করা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্মকেই একমাত্র নিদান ভাবার বিরোধিতা করে *জাগরণ* পত্রিকায় প্রশ্ন তোলা হয়,-- "আমাদের দেশে হিন্দু মনে করে হিন্দুত্বই তার ধর্ম। মুসলমান মনে করে ইসলামই তাদের ধর্ম। তাদের চক্ষে মাতৃভূমি কিছু নয়, ধর্মই তাদের কর্তা, রক্ষক, ধর্মই তাদের ত্রাণ করবে, তাদের মুক্তি আনবে। যার Nationality জ্ঞান নেই তার কি করে ধর্ম জ্ঞান থাকতে পারে?" এর সমর্থনে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদের জীবন থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে জন্মভূমিকে তিনি এত ভালোবাসতেন যে ইসলাম যদি তাঁর ডান হাত হয়ে থাকে তবে আরব ছিল বাম হাত।[৪১]

বিশ্ব-বাণী পত্রিকার বৈশাখ ১৩৩৭ সংখ্যায় কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর 'হিন্দু মুসলমান' নামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির স্বপ্ন রচনার আবহ সৃষ্টির পর থেকে স্বপ্ন ভেঙে-যাওয়া এবং বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার ইতিহাসকে সংক্ষেপে বাস্তবসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। লেখকের মতে খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান এক বড় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে জাতীয়তার ভাবে কতকটা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেও অন্তরে কোনো সম্প্রদায়েরই 'মহান স্বার্থ' ছিল না, ফল যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। এরপর লেখকের পথ-নির্দেশনা :

> আদর্শের প্রতি প্রবল নিষ্ঠা থাকিলেই এবং সকল সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বিসর্জন দিলেই যাহা সৃষ্টি হয় তাহাই প্রকৃত স্বদেশপ্রেম। এইরূপ স্বদেশপ্রেমের মধ্যে জাতি গঠনে প্রকৃত জাতীয়তার ভাব নিগূঢ়ভাবে থাকিবেই। তাই যদি হিন্দুকে ও মুসলমানকে প্রকৃত মিলনের পথে চলিতে হয়, পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করিতে হয় তবে একমাত্র স্বদেশপ্রেম এই আদর্শই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। হিন্দুকে তখন আর কেবলমাত্র হিন্দু ভাবিলে চলিবে না, মুসলমানকে শুধু মুসলমান ভাবিলেই চলিবে না, উভয়কেই ভাবিতে হইবে আমরা আগে ভারতবাসী, তাহার পর হিন্দু ও মুসলমান। ভাবিতে হইবে আমরা সকলেই ভারতবাসী আমরা সকলেই মানুষ এই সত্যই প্রথম সত্য। (পৃ. ২৮-২৯)

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নে ঠিক এই মানুষ হওয়ার কথা বলেছেন তরীকুল আলমও তাঁর 'জাতীয় শিক্ষা' রচনায় : "...যদি ভারতের জাতীয় মন বলে কিছু না থাকে, তা হলে সেই মনকে গড়ে তোলার এই প্রকৃষ্ট সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। জাতীয় বিদ্যালয়গুলির কর্তব্য হচ্ছে ভারতবাসীর ভিতরে ভারতবাসীকে ফুটিয়ে তোলা।"[৪২] সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের নিদান হিসেবে ভারতীয় জাতি গঠন প্রসঙ্গে আবদুল কাদিরের মতও

উল্লেখযোগ্য : "নানক-কবীর-আকবর-দাদু-দারা-রামমোহন প্রমুখ মধ্যযুগীয় সাধকবৃন্দ বিভিন্ন সভ্যতার সমন্বয়ে ভবিষ্যতের বিরাট ভারতীয় জাতি গঠনের যে মহিমময় স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছেন তাহাকে কার্যে পরিণত করা ভিন্ন এ-সমস্যার অন্য সমাধান নাই।"[৪৩]

ইংরেজের শাসনাধীনে ভারতের পরাধীনতা ও শাসকের ভেদনীতি হিন্দু-মুসলমান বিরোধের একটি অন্যতম কারণ। প্রায় একটি তাত্ত্বিক সত্যের মতো এই বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন আবুল হাসেম খান চৌধুরী : "...হিন্দু বা মুসলমান এদেশে স্বাধীন হইলে হয়তো এ বিবাদের অনেকদিন উপশম হইত। হয়তো ক্ষমতাশীল জাতির উদারতায় পরাধীন জাতি মুগ্ধ হইত বা তাহাদের শাসনে পরাধীন জাতির স্বীয় জাতীয়তাবোধ বিলুপ্ত হইত। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা হইবার উপায় নাই। নিরপেক্ষ তৃতীয় শক্তি যখন এদেশের রাজা, তখন স্বভাবতই তাঁহারা হিন্দু-মুসলমান কাহাকেও স্ব স্ব পৃথক সত্ত্ব হারাইতে দিবেন না।..."[৪৪]

১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় নবজাগ্রত ও ক্রমপ্রসারমান জাতীয় চেতনার বিনষ্টিসাধন। এই চেতনা জাগ্রত হয়েছিল শিক্ষিত হিন্দু-বাঙালির মনে। প্রবল আন্দোলনের ফলে ইংরেজকে নতি স্বীকার করে ভাঙা বাংলাকে জোড়া লাগাতে হলেও অন্য একটি দূরপ্রসারী সুবিধা সে পেয়ে গেল। সেটি হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ। বস্তুত বঙ্গভঙ্গ ও তা রদ এই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের রাজনৈতিক রূপের প্রথম স্পষ্ট রেখা। এরপর সরকার মুসলমানদের যত সুবিধা দিতে চেয়েছে বিরোধ ততই ঘনীভূত হতে থেকেছে। সংখ্যায় অল্প হলেও বিচারশীল মুসলমানরা কিন্তু ইংরেজের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি উপলব্ধি করেছেন। *সহচর* পত্রিকার আষাঢ় ১৩৩০ সংখ্যায় 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয় :

> ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগিরি ও জেলা বোর্ডের সভ্যগিরির অজুহাতে ভারতীয় শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আজ যে রেষারেষি মূর্তিমান হইয়া দেখা দিয়াছে তাহা বাস্তবিকই নূতন, এবং মন্টেগু-চেমসফোর্ড প্রবর্তিত নূতন শাসন সংস্কারেরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল। নূতন শাসন সংস্কার অনুসারে জাতি (সম্প্রদায় অর্থে--হা. র) হিসাবে সভ্য নির্বাচিত হয়। এই জাতি হিসাবে সভ্য নির্বাচনই আজকালের এই জাতিগত বিদ্বেষের মূল কারণ।

সম্পাদকের ধারণা ইংরেজ যদি এই স্বতন্ত্র নির্বাচনপ্রথা চালু না করত তাহলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে হয়ত বিবাদ-বিসংবাদ রূপ ধারণ করত না। একে তাই তিনি শাসন সংস্কারের 'রাঙা ফল' বলে অভিহিত করেছেন, যার মধ্যে ভারতের সর্বনাশের গরল কতখানি ভরা আছে তা কারও জানা নেই।[৪৫]

ইংরেজের এই উদ্দেশ্যমূলক শাসননীতির কালো থাবা থেকে মুক্ত হয়ে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বজায় রাখার তাহলে উপায় কী? বাংলা পত্রিকায় সে উপায়ও সন্ধান করা হয়েছে। আমরা একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব। বিশ শতকের একেবারে শুরুতে ১৩১৩ সালের মাঘ এবং ফাল্গুন সংখ্যা *কোহিনূর* পত্রিকায় ইংরেজের Divide and rule নীতির স্বরূপ উন্মোচন করে হিন্দু-মুসলমানের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, "...যখন দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইংরাজ জাতি মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুকে উত্তেজিত করিতেছেন বা উত্তেজিত করণ জন্য প্রয়াস পাইতেছেন, অথবা যখন দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মুসলমানকে হিন্দুর

বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন, তখনই আমাদের কর্তব্য হইবে যে, ইংবাজ জাতির কথা স্বার্থযুক্ত ব্যক্তির কথা বিবেচনা করিয়া একে অন্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত না হওয়া।"[৪৬]

আট

হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক হানাহানির স্থানগত পটভূমির দিকে তাকালে যে-কারও চোখে পড়বে যে এই বিষ শহরের লোকদের যতখানি জর্জরিত করেছে, গ্রামের লোকদের ততখানি নয়। পৌষ ১৩২৭ সালে *মোসলেম ভারত* পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন কথাও লেখেন যে, "...বঙ্গীয় পল্লীগ্রাম অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে মুসলমান এবং হিন্দুতে বিবাহাদি চলে না এই যা কেবল, -- তা বই দেশ সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে ভাই ভাই সম্বন্ধের প্রাদুর্ভাব খুবই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।"[৪৭] *সবুজ পল্লী* পত্রিকায় লেখা হয়,

> ...ওগো শিক্ষিত একবার শিক্ষার গর্ব ছেড়ে পল্লীপানে ছুটে আস, দেখ আজও পল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমান, যাদের অশিক্ষিত বর্বর বলতে তোমাদের রসনা একটি বারও কেঁপে ওঠে না তারাই জাতি বর্ণ ভুলে কেমন একে অন্যের সুখে দুঃখে নিতান্ত আপনার মত প্রাণপাত করে থাকে, কেমন করে গলাগলি করে হাসতে কাঁদতে জানে, আজও তাদের ভিতর কেমন প্রাণঢালা দাদা, কাকা, মামা, জ্যেঠা আদি সুমধুর সম্বন্ধ তেমনি অচল অটল রয়ে গেছে, তারপর এই সৌহৃদ্ধ (সৌহৃদ্য) গঙ্গায় স্নান করে তোমাদের সুশিক্ষিতদের আবাসভূমি সহরের রক্তগঙ্গাব পারে দাঁড়ায়ে বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, এই রক্তগঙ্গার ফেনিল ঢেউগুলি তোমাদের সুশিক্ষার গর্ভজাত কি না?[৪৮]

লেখকের মতে মুসলমানের স্পর্শ করা কতকগুলো খাদ্যসামগ্রী, গোমাংস ইত্যাদি ব্যাপারগুলো হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কারণ নয়। কেননা এসব ব্যাপার 'অতি পুরাতন' কালেও ছিল। আসলে আধুনিক শিক্ষাই এর জন্য দায়ী। কেননা এই শিক্ষাপ্রাপ্তরা 'নিতান্ত হিংস্র পশুর মত একে অন্যের টুটি টিপে মারতে পারলেই আপনাকে ধন্য' মনে করে।

ইংরেজ-প্রবর্তিত এই শিক্ষাই এদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সৃষ্টি করে। উনিশ শতকে এই শ্রেণিটি ছিল মুখ্যত হিন্দু সম্প্রদায়ের। এরা সরকারের দেওয়া সুযোগ সুবিধার সিংহভাগ দখল করে। পরে যখন মুসলিম মধ্যবিত্তের জন্ম হয় তখন দুই মধ্যবিত্তে শুরু হয় সংঘাত। এই সংঘাতকে সুকৌশলে সাম্প্রদায়িকতার আবরণে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। একজন গবেষক এ সম্পর্কে লিখেছেন, "যতদিন মুসলমানরা সম্প্রদায়গতভাবে নমিত ছিল ততদিন হিন্দু ধনী বা মধ্যশ্রেণীর মনে মুসলমানদের নিয়ে কোন প্রশ্ন জাগেনি। কিন্তু যখনই মুসলমান মধ্যশ্রেণীর বিকাশ শুরু হয়েছিল, এক কথায়, যখন সম্প্রদায়গতভাবে মুসলমানদের মনে আলাদা চেতনা গড়ে উঠল তখন অনিবার্যভাবেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে ফাটল ধরেছিল।"[৪৯]

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল। অর্থ উপার্জনের পথও সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। এই অবস্থায় "হিন্দু-মুসলমান ক্ষুধিত কুকুরের মত যৎসামান্য যে কয়েকটী অর্থ সমাগমের পথ আছে, তাহা লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত। ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, উভয় জাতিই নিজ নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য অন্য জাতিকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেছি। তজ্জন্যই সরকারী চাকরী বা কাউনসীল, ডিস্ট্রিক বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃত্ব লাভের জন্য এত ঝগড়া বিবাদ।"[৫০] এই বিবাদের জন্য লেখক উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত শ্রেণিকেই দায়ী

করেছেন। অশিক্ষিত জনগণ এদের দ্বারাই চালিত হয়েছে। ফলে সাম্প্রদায়িকতা কম-বেশি পল্লীঅঞ্চলকেও প্রভাবিত করেছে।

প্রশ্ন হলো স্বার্থগত এই সংঘাত থেকে পরিত্রাণের কী উপায় ছিল? ১৩১৪ বঙ্গাব্দে কংগ্রেসের পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে বলেন, "মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্য-বশত জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তাহা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক, ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি।"[৫১] কবির ধারণা ছিল এই 'সমকক্ষতা' স্থাপিত হলে উভয় সম্প্রদায় 'একই সমচেষ্টার মিলনক্ষেত্রে' এসে হাত ধরে দাঁড়াবে। হয়তো একই ধারণা থেকে আরও পরে দেশবন্ধু 'বেঙ্গল প্যাক্ট' রচনা করেছিলেন। তারও পরে *বিশ্ব-বাণী* পত্রিকা লেখে, যে-যে কারণে মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছে সে-সব কারণ দূর করে তাদের দ্রুতবেগে অগ্রসর হতে হবে এবং

> ...হিন্দুদেরও যে সকল মুসলমান এতদিন পিছাইয়া পড়িয়াছে তাহাদের আগাইয়া দ্রুতবেগে লইয়া নিজেদের সমকক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। ইহা না করিয়া যদি উভয় সম্প্রদায় রাষ্ট্রতন্ত্রে নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হয় তাহার ফল বড়ই বিষময় হইয়া উঠিবে এবং রাষ্ট্রতন্ত্র আত্মকলহে জর্জরীভূত হইয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে। এই প্রকৃত সত্যের উপর রাষ্ট্রতন্ত্র স্থাপিত করিবার প্রচেষ্টা সকলেরই হওয়া উচিৎ।[৫২]

এই প্রচেষ্টার সম্ভাব্যতা ও সাফল্য সম্পর্কে অনেকেরই সন্দেহ ছিল। কমিউনিস্টদের কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প যে সারা দেশের, বিশেষত বাংলার সমগ্র পরিমণ্ডলকে ছেয়ে ফেলেছে তা আসলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে সুশীলকুমার বসু বলেন যে, সাম্প্রদায়িক বিরোধ বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে একটি কৃত্রিম ভেদরেখা টেনে দিয়ে প্রকৃত ভেদরেখাটিকে অস্পষ্ট করে দিচ্ছে এবং এর ফলে অর্থনৈতিক বা অন্য কোনো রাজনৈতিক ভিত্তিতে দলগঠন সম্ভব হচ্ছে না। দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রবল রয়েছে বলেই —

> ...হিন্দু ও মুসলমান কৃষক পরস্পরকে আত্মীয় না ভাবিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অর্থশালী স্বার্থবিশিষ্ট লোকদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সকল লোকের স্বার্থ যে তাহাদের স্বার্থবিরোধী, ইহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই যে তাহাদের ব্যবহার করেন, তাহাদের প্রকৃত স্বার্থের কথা যে ইহারা কখনই বলিতে পারেন না, একথা হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণ বুঝিতে পারিতেছেন না। এই দিক দিয়া হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ শুধু যে বর্তমানেই শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইতেছে তাহা নহে, ইহা আমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথও রোধ করিয়া আছে।[৫৩]

তরুণ চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর প্রাগুক্ত 'সাম্প্রদায়িক দুর্যোগের নানাদিক' প্রবন্ধে একই ধারণা ব্যক্ত করেছেন। তিনি মনে করেন 'শ্রেণী সংঘাত' সম্পর্কে সচেতন না হলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দূর হবে না।[৫৪] আর ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম সংগঠক মুজফফর আহমদ তো সরাসরি বলেছেন, "একটিমাত্র জিনিষ, কম্যুনিজম—আজ ভারতবর্ষকে ধ্বংস হতে রক্ষা করতে পারে।"[৫৫] অন্যত্র বলেছেন,

পরাশ্রিত ও শোষণকারিগণের হাত হতে আপনারা হৃত সর্বস্ব উৎপাদকদিগকে রক্ষা করে উৎপাদিত সামগ্রির যথাযথ বন্টনের ব্যবস্থা করতে পারেন তবেই সকল প্রশ্নের সমাধান হবে, নতুবা নয়।[৫৬]

নয়

ভারতবর্ষে ছোটো-বড়ো যত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে তার সবগুলোর পেছনে সর্বদা যে সংঘটিত বাস্তব কোনো কারণ ক্রিয়াশীল ছিল তা নয়, এর পেছনে ছিল কুশলী অপপ্রচার। আর এই অপপ্রচারে কিছু পত্র-পত্রিকার ছিল নির্লজ্জ ভূমিকা। সেজন্য সম্প্রীতির পক্ষপাতী অনেক পত্রিকায় এ বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে সচেতন ও সাবধান থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আহমদ মিয়া 'মিলনের উপায়' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন যে কয়েকটি বিশেষ সংবাদপত্র মাঝে মাঝে দু-একটা আজগুবি এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষিতাপূর্ণ প্রবন্ধ ও খবর প্রকাশ করে অন্যের মনে ব্যথা দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।[৫৭] তরুণ চট্টোপাধ্যায় তো সরাসরি পত্রিকার নামোল্লেখ করে বলেন যে *আজাদ হিন্দুস্থান* ধরনের পত্রিকাগুলো বিভ্রান্ত হিন্দু-মুসলমানকে বিপথে যেতে সাহায্য করছে।[৫৮] ভূপেন্দ্রনাথ শ্যাম তাঁর *সাপ্তাহিক বর্তমান* পত্রিকার নীতি ব্যাখ্যা করে লেখেন, "বিভিন্ন কথার জালে ও মিথ্যা প্রচার, সংবাদ প্রকাশের ভুল তথ্যে শাসক ও শোষিতের মধ্যে সহযোগিতায় অনেক বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। রাজনৈতিক নানা কারণে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। সেই কারণে এই পত্রিকার কাজ সকল পক্ষেরই বার্তা যথাসাধ্য বহন করে পরস্পরের সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত করা।"[৫৯]

অপপ্রচারের একটি বড় দৃষ্টান্ত হিসেবে নারীনির্যাতনের কথা উল্লেখ করা যায়। গত শতকের বিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলায় নারী-অপহরণ ও লাঞ্ছনার ঘটনা খুব বেড়ে গিয়েছিল। এটি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করে। *সঞ্জীবনী*-র মতো পত্রিকাও এ ঘটনার জন্য প্রধানত মুসলমানদের দায়ী করে। *প্রবাসী* অবশ্য লেখে যে অপহরণকারীদের মধ্যে দুই সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্তই রয়েছে। শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী তাঁর *বাঙ্গালার নারী নিগ্রহ* গ্রন্থে (১৯৩৬) তথ্য দিয়ে দেখিয়েছিলেন নিগৃহীতা নারীরা উভয় সম্প্রদায়ের, এবং দুর্বৃত্তরা শুধু মুসলমান নয়।[৬০]

উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারের সাথে উল্লেখ করা যায় দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বিশেষ কিছু লোকের ভূমিকার কথা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষপাতী পত্রিকা এক্ষেত্রেও উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থান্বেষী লোকদের দায়ী করে। সাপ্তাহিক *ছোলতান*-এর মতো মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী পত্রিকাও লেখে,

> একদিকে দেশের নেতৃবর্গ হিন্দু-মোছলমানের বিবাদ-বিসংবাদের মূল কারণগুলি বিদূরীত করিয়া উভয় সম্প্রদায়কেই মিলনের চিরবন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছেন, ...অন্যদিকে উভয় সম্প্রদায়ের দুষ্ট কুচক্রী ও যাহারা হিন্দু-মোছলমানের বিরোধ ঘটাইতে পারিলেই মহালাভ বলিয়া মনে করে তাহাদের গুপ্ত চেষ্টায় ভারতের এই দুইটি মহাজাতির মধ্যে স্থানে স্থানে অধুনা প্রায়ই সংকীর্ণ স্বার্থ লইয়া বিরোধ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। ...ইহা যে দেশ ও জাতির পক্ষে মহা অমঙ্গলজনক তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই।[৬১]

আবুল হাসেম খান চৌধুরী 'হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও তাহা নিবারণের উপায়' শীর্ষক প্রবন্ধে উভয় সম্প্রদায়ের অসম্প্রীতি দূর করে সম্প্রীতি স্থাপনের বেশ কয়েকটি উপায়

নির্দেশ করেছেন। প্রবন্ধটির কথা আগেও উল্লিখিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-বিষয়ক এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এতে তিনি একটি, বলা চলে, অভিনব কিন্তু বাস্তবে অধিকতর কার্যকর পন্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তথা দেশের হিতসাধনের মন্ত্রে যারা অনুপ্রাণিত তাদের নিয়ে তিনি সঙ্ঘ গঠনের কথা বলেন। এদের জীবনের ব্রতই হবে সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিবারণ। এরপর লেখক সরাসরি নির্দেশাত্মক বাক্য ব্যবহার করেছেন : "তৎপর কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও। সভা, সমিতি, বক্তৃতা সংবাদপত্রে রচনা দ্বারা এই মন্ত্র প্রচার কর। সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত কর।..."[৬২]

ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য, এই প্রকৃতির সঙ্ঘ গঠনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, কিংবা নেওয়া হলেও তা শক্তিশালী হয়নি। আমরা স্মরণ করতে পারি প্রমথ চৌধুরীর সেই প্রবাদপ্রতিম বাক্য : 'ব্যাধিই সংক্রামক. স্বাস্থ্য নয়।' হিন্দু-মুসলিম বিরোধ যে দেশের সার্বিক উন্নতির অন্তরায় তার নানাদিকের ব্যাখ্যা-বিবরণ দিয়ে কত বিপুল সংখ্যক পত্রিকায় যে মিলনের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে তার পরিসংখ্যান বের করা অসাধ্য। তবুও অস্বাস্থ্য ক্রমসংক্রামিত হয়ে একদিন সারা দেশকে মুমূর্ষু করে ফেলেছে। আজ পেছন ফিরে মনে হয় যে-হিন্দু-মুসলমান বিরোধ মীমাংসার জন্য দেশবিভাগ হয়েছিল তার সম্পূর্ণ নিরসন অদ্যাবধি না হলেও, সেদিন দেশবিভাগ ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। আর দেশবিভাগ মানেই তো হিন্দু-মুসলমান বিরোধ। এই বিরোধ দূর করে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি সাধনের ইচ্ছা ও প্রয়াসের যে-সাক্ষ্য প্রমাণ বাংলা পত্রপত্রিকার বিবর্ণ, জীর্ণ ও হারিয়ে যাওয়া অজস্র পাতায় লিপিবদ্ধ আছে ও ছিল তা নিয়ে গৌরববোধ করার যথেষ্ট কারণ বাঙালি জাতির রয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা. ১৯৬৪, পৃ. ৮৩
২. 'বিশ শতকের বাঙালি সমাজ : হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক', *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি. কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১৪৯
৩. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, 'হিন্দু-মুসলমানের কথা', *শিখা সমগ্র*, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৬১৬
৪. ৩য় সংখ্যা থেকে এই বার্ষিক পত্রিকাটির নাম রাখা হয় বর্ষবাণী। অনুপম হায়াৎ, 'বিস্মৃত সম্পাদিকা জাহানারা চৌধুরী', *নিরীক্ষা*, জুলাই ২০০৪ সংখ্যা, ঢাকা, পৃ. ২৭
৫. আবদুল কাদির, 'প্রচারক', *মুসলিম বাংলা সাময়িক পত্র*, পাকিস্তান পাবলিকেসন্স, পৃ. ৭৪
৬. ২ আষাঢ় ১৩১১ ; *সাময়িকপত্রে সমাজচিত্র : সঞ্জীবনী*, কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা. ১৯৮৯, পৃ. ৩৪১
৭. *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি* : উদ্ধৃত, গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী* (১৯১৫-১৯৩০),, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ২৪০
৮. মুহম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, 'সাম্প্রদায়িক সমস্যা', *মাসিক মোহাম্মদী*, আশ্বিন ১৩৪৬. পৃ. ৮৬৪
৯. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

১০. পরে *কালান্তর গ্রন্থে* সংকলিত। *রবীন্দ্র রচনাবলী* (১২শ খণ্ড), সুলভ সং., বিশ্বভারতী, ১৩৯৭, পৃ. ৫৫৬
১১. কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত *মোসলেম পত্র-পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি*, পুথিপত্র, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৭
১২. ঐ, পৃ. ৫৩
১৩. 'কোথায় প্রতিকার?' *লাঙল*, ২৮ জানুয়ারি, ১৯২৬, ঐ, পৃ. ৭৬
১৪. 'মিলনের একদিক', *জাগরণ*, আষাঢ় ১৩৩৫, পৃ. ১০৪
১৫. পৃ. ৬৩১-৩২
১৬. 'বাঙ্গালী মুসলমানের সামাজিক গলদ', *শিখা*, ১ম বর্ষ ১৯২৭ ; সংকলিত, *শিখা সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
১৭. 'বিবিধ প্রসঙ্গ', বৈশাখ ১৩৩৩ ; কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
১৮. 'হিন্দু-মোসলমানের মিলনের অন্তরায়', *বঙ্গনূর*, মাঘ ১৩২৬, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
১৯. 'হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি', *নবনূর*, শ্রাবণ ১৩১১, ঐ, পৃ. ১৮-১৯
২০. 'স্বামীজির চিঠি' *আহমদী*, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ ; ঐ, পৃ. ৭৪-৭৫
২১. 'হিন্দু-মুসলমান', *গণবাণী*, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬, ঐ, পৃ. ৯৬
২২. 'হিন্দু ও মুসলমানের মিলন কি অসম্ভব?', *নবনূর*, অগ্রহায়ণ ১৩১১ ; ঐ, পৃ. ১৯
২৩. 'যুগ সাধনার স্বরূপ', *সহচর*, মাঘ ১৩২৮ ; ঐ, পৃ. ৪৯
২৪. *মোহাম্মদী* পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত, ৪র্থ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ১৩৩৮ ; ঐ, পৃ. ১১০
২৫. 'অতীতের মোহ', *সাহিত্যিক*, আষাঢ় ১৩৩৪ ; ঐ, পৃ. ১১৭
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
২৭. 'আবাহন', *মোসলেম ভারত*, আষাঢ় ১৩২৭ ; ঐ, পৃ. ৪০
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪
২৯. *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, শ্রাবণ ১৩২৬ ; উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯, পৃ. ২২৬
৩০. আহমদ আলী, 'হিন্দু মুসলমান প্রশ্ন' উদ্ধৃত, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *মুসলিম সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্রে ধর্ম ও সমাজচিন্তা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৭৫
৩১. উদ্ধৃত, গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী* (১৯০০-১৯১৪), বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৩২
৩২. কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
৩৩. *ছোলতান*, ১৮ মে ১৯২৩ ; উদ্ধৃত, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ২৬১-৬২
৩৪. তসদ্দক আহমদ, মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর ১ম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ (১৯২৭) ; সংকলিত, হাবিব রহমান, *মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর বার্ষিক অধিবেশন : সভাপতিদের অভিভাষণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৪৬
৩৫. 'হিন্দু-মুসলমান', *সবুজ পল্লী*, ফাল্গুন ১৩৩৩, পৃ. ৫০
৩৬. 'হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও তাহা নিবারণের উপায়', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
৩৭. গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী* (১৯৩১-১৯৪৭), বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২১৬

৩৮. *Communalism and Communal violence in India* (Delhi, 1989) গ্রন্থ থেকে অনূদিত হয়ে উদ্ধৃত, শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *দাঙ্গার ইতিহাস*, মিত্র ও ঘোষ পাব. প্রা. লি., কলকাতা, ১৩৯৯, পৃ. ২১
৩৯. 'কোথায় প্রতিকার'? প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
৪০. 'সাম্প্রদায়িক দুর্যোগের নানা দিক', *মাসিক বসুমতী*, অগ্রহায়ণ ১৩৫৩, পৃ. ১০৯-১০
৪১. সিরাজউল ইসলাম, 'মিলনের একদিক', প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
৪২. *শিক্ষক*, আষাঢ় ১৩২৯ ; কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৪৩. 'সম্পাদকের পাঁজি', *জয়তী*, আষাঢ় ১৩৩৭, পৃ. ১২২
৪৪. 'হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও তাহা নিবারণের উপায়', *আহমদী*, বৈশাখ ১৩৩৩ ; কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
৪৫. কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত পৃ. ৫৩
৪৬. ও, আলি (সম্ভবত ওসমান আলি), 'হিন্দু মুসলমানের বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায়' ; *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, পৃ. ২৫৭
৪৭. 'হিন্দু ও মুসলমানদিগের গৃহ বিচ্ছেদের শান্তি' ; কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৪৩
৪৮. ডাঃ বিপিনচন্দ্র পাল, 'হিন্দু-মুসলমান', *সবুজপল্লী*, ফাল্গুন ১৩৩৩ ; পৃ. ৫১
৪৯. মুনতাসীর মামুন, 'বাংলা সংবাদপত্র—দায়বদ্ধতা' ; *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৪৪৯
৫০. আবুল হাসেম খান চৌধুরী, 'হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও তাহা নিবারণের উপায়', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
৫১. *হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক : রবীন্দ্ররচনার সংগ্রহ*, নিত্যপ্রিয় ঘোষ সংকলিত, মৃত্তিকা, কলকাতা, ১৪০৯, পৃ. ৫৭
৫২. 'দ্যোতনা', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭, পৃ. ৭৯-৮০
৫৩. 'সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও শ্রেণীসংগ্রাম এক পর্যায়ের কি না', *বিচিত্রা*, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩, পৃ. ৬৭৯-৮০
৫৪. *মাসিক বসুমতী*, পৌষ ১৩৫৩, পৃ. ২৫৫-৫৯
৫৫. 'কোথায় প্রতিকার?', প্রাগুক্ত পৃ. ৭৮
৫৬. 'খোলা চিঠি' (শিক্ষিত তরুণ মুসলিমগণের বরাবরে), *গণবাণী*, ১২ আগস্ট ১৯২৬ ; উদ্ধৃত, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২
৫৭. *বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, প্রাগুক্ত পৃ. ২২৬
৫৮. 'সাম্প্রদায়িক দুর্যোগের নানা দিক', *মাসিক বসুমতী*, অগ্রহায়ণ ১৩৫৩, পৃ. ১০৮
৫৯. উদ্ধৃত, *বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী* (১৯১৫-১৯৩০), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮-৪৯
৬০. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩
৬১. 'হিন্দু-মোছলমানে বিরোধ', ৪ জানুয়ারি ১৯২৪ ; *ছোলতান পত্রিকায় বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনীতি*, ইমরান হোসেন ও সুনীলকান্তি দে সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৬৫
৬২. কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত পৃ. ৭২

শে খ র ভৌ মি ক

আঞ্চলিক পত্রিকা

১৮১৮ সালের *সমাচার দর্পণ* বা *দিগ্‌দর্শন* থেকে ধরলে বাংলা সংবাদ-সাময়িকীর বয়স হল ১৮৭ বছর। এই বিস্তীর্ণ সময়কালে কত সংবাদ-সাময়িকপত্র যে প্রকাশিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সামাজিক ইতিহাস রচনার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে এইসব পত্র-পত্রিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই গবেষকরা এই দিকটিতে মনোনিবেশ করেন। এই গবেষণারই ফল স্বরূপ ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয় কেদারনাথ মজুমদারের *বাংলা সাময়িক সাহিত্য*। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* বইটিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩৪১-৪২ সাল নাগাদ পুরস্কৃতই করেছিল 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ হিসাবে।'[১]

সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা। কারণ এই রাজধানী শহরেই উনিশ শতকের নবজাগরণ-এর জন্ম আর বৃদ্ধি। ব্রজেন্দ্রনাথ তো সংবাদ-সাময়িকপত্রকে এই নবজাগরণের ফল বলেই মনে করতেন। যদি তাই হয়, তাহলে বুঝতে হবে এই নব্য ভাবধারা, উদ্দীপনা মফস্‌সলেও প্রসারিত হয়েছিল। কারণ ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাভাষায় প্রকাশিত ৩৬টি সংবাদপত্রের মধ্যে ১৯টিই ছিল কলকাতার বাইরের,[২] যে সংখ্যা পরবর্তীকালে আরও যে বেড়েছিল সে নিয়ে সন্দেহ নেই।

মফস্‌সল থেকে এত সব সংবাদ-সাময়িকপত্রর প্রকাশ মোটেই আকস্মিক নয়। এর এক নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট ছিল। ইংরেজ আমলে ঔপনিবেশিক সরকারের প্রশাসনিক প্রয়োজনে বেশ কয়েকটি এলাকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিছু জায়গা আবার বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবেও পরিচিতি অর্জন করে। ড. প্রদীপ সিন্‌হা ঠিকই লিখেছেন—

> The Inpact of urbanism on interior Bengal generally tended to create 'rural towns' which were mainly centres of country trade and regional administration.[৩]

নগরায়ণের স্বাভাবিক নিয়মেই তখন এইসব শহরে এসে হাজির হয় নানা পেশার মানুষজন, কাজের সন্ধানে—সেরেস্তাদার, 'কোর্ট আমলা', নাজির, পেশকার, করণিক বা 'ব্ল্যাক রাইটার', 'নেটিভ ডক্টর', 'মাস্টার' ইত্যাদি। এরাই মধ্যবিত্ত নামে আখ্যায়িত, বেইলির 'Service gentry'।[৪] বিনয় ঘোষ আবার এদের পাশাপাশি 'মধ্য ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকানদার ও বিচিত্র রকমের শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সব কর্মচারী'[৫]দেরও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা যায় বলে মন্তব্য করেছেন।

যাই হোক এইসব পেশাজীবী মানুষজন নিয়েই মফস্‌সলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল। এরাই পৌরসভা, জেলাবোর্ড, কৃষি সমিতি, 'রেট পেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন', জেলা

সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা করেছেন, সারস্বত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেছেন, সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশ করেছেন। কিছু ব্যতিক্রম নিশ্চিত ছিল, তবে মোটামুটি আঞ্চলিক সংবাদপত্রগুলোর প্রকাশক বা সম্পাদকদের পেশাগত পরিচয় বিশ্লেষণ করলেই (যেটুকু জানা গিয়েছে) বোঝা যায় যে কারা এই উদ্যোগের পুরোধা ছিলেন। মোটামুটি বহুক্ষেত্রেই এরা বঙ্কিমচন্দ্রের বাবুর এক একটি 'অবতার'।[৬] একেবারে প্রথম দিককার আঞ্চলিক কাগজ *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*-র (১৮৪৭) সম্পাদক গুরুচরণ রায় ছিলেন সরকারি চাকুরে। প্রাথমিকভাবে যিনি সাহায্য করেছিলেন তিনি রংপুরের কুণ্ডী পরগণার জমিদার কালীচন্দ্র রায়।[৭] *রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ*-ও ১৮৬০ সাল নাগাদ রংপুরের কাকিনীয়া 'ভূগোলক বাটী'র জমিদার শম্ভুচন্দ্র রায়চৌধুরীর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল।[৮] আরও একজন জমিদার--রাজসাহীর তাহিরপুরের শশিশেখরেশ্বর রায়, যাঁর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল *সদর ও মফঃস্বল*[৯] পত্রিকাটি।

কেরানি প্যারীমোহন দাস-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল *শ্রীহট্ট প্রকাশ*।[১০] মাস্টার, ব্রাহ্ম, ডাক্তার বা উকিলরাও বাদ ছিলেন না। ময়মনসিংহের ব্রাহ্মদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল *ভারতমিহির*। উদ্যোক্তাও ছিলেন এক ছোটোখাটো জমিদার--রাজসাহীর খেজুরা গ্রামের কালীনারায়ণ সান্যাল।[১১] *ঢাকা প্রকাশ* সম্পাদক দীননাথ সেন পূর্ব্ববঙ্গের বিশিষ্ট ব্রাহ্ম।[১২] ময়মনসিংহের *চারুবার্ত্তা* সম্পাদক দীনেশচরণ বসু পেশায় ছিলেন নাসিরাবাদ মাইনর স্কুল-এর শিক্ষক।[১৩] আরও তিনজন 'মাস্টার'--*বরিশাল হিতৈষী* সম্পাদক রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়, *বরিশাল বার্ত্তাবহ* সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র কর এবং শ্রীহট্টের *পরিদর্শক* প্রকাশক বিপিনচন্দ্র পাল। যিনি সিলেটস্থ জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক।[১৪] *ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা* সম্পাদক রামচন্দ্র ভৌমিক ছিলেন ঢাকা সদর আদালতের উকিল[১৫] আর *বাঁকুড়া দর্পণ*-এর প্রকাশক-সম্পাদক রামনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন চিকিৎসক--'ডাক্তার'। দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে ক্লান্তিকর বর্ণনায় না গিয়ে এর থেকেই একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। বলা যায় এই শ্রেণির মানুষই ছিলেন পত্র-পত্রিকার প্রকাশক। খবরের কাগজে এঁদের মূল্যবোধ, ভাবনাচিন্তা আর দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত হয়েছিল। এঁরাই বার্নার্ড কহ্ন এর 'local elite' গ্রামসীর 'traditional intellectual'[১৬], যাঁরা বাস করেন গ্রামাঞ্চলে, ছোটোখাটো শহরগুলোতে।

পাশাপাশি এও সহজেই অনুমেয় যে, অন্তত প্রথম দিকে এই সব সংবাদপত্রের গ্রাহকবর্গও প্রায় একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ১৮৭৯ সালের সরকারি নথি[১৭] অনুযায়ী--"They were Government officers, Zeminders, Vernacular school masters, mukhtars and court and Zeminder omlahs' *ভারতমিহির* বা চুঁচুড়ার *সাধারণী*-র অনুরাগী ছিলেন--'Educated, higher and middle classes of the native community...in the metropolitan districts.'

দুই

কাকে আমরা আঞ্চলিক পত্রিকা বলতে পারি। ড. স্বপন বসুর বক্তব্য হল--

> কোনো একটি অঞ্চলের ইতিহাস, তার আচার আচরণের বৈশিষ্ট্য, সেখানকার মানুষের অভাব-অভিযোগ --এগুলো তুলে ধরবার লক্ষ্য নিয়ে যখন কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তখন সেই পত্রিকাকেই আমরা আঞ্চলিক পত্রিকা বলতে আগ্রহী।[১৮]

আমার মনে হয় এই সংজ্ঞাটি নিয়ে কারোর কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। অনেকে বলেন, কোনো এলাকা থেকে যদি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাহলেও তা আঞ্চলিক পত্রিকাই। কিন্তু *তমোলুক পত্রিকা* প্রসঙ্গে স্বয়ং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ই একবার বলেছিলেন-- 'পত্রিকার নাম তমোলুক পত্রিকা হলেও তাতে তমলুকের নামগন্ধও নেই।' আবার *সঞ্জয়* নামে অঞ্চলের নামগন্ধও ছিল না, অথচ তা ছিল আঞ্চলিক পত্রিকা। ফরিদপুরের মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরা এবং তার প্রতিবিধান চাওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য।[১৯] সুতরাং পত্রিকার কেবল নামটি দেখে স্বরূপ নির্ধারণ করতে গেলে বিপদ অনিবার্য।

তবে আঞ্চলিক সাহিত্য পত্রিকা হলেও অনেক সময় সেখানে স্থানীয় বিবরণ, স্থানীয় সমস্যা বা খবর প্রকাশিত হত। *তমোলুক পত্রিকা*-র সম্পাদকীয়তেই এ কথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে--

> এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি পল্লীগ্রাম হইতে প্রকাশিত হইতেছে, অতএব অগ্রে স্থানের অবস্থার বিষয় পাঠকগণকে গোচর না করিলে, পত্রিকার প্রতি তাঁহাদের স্নেহ ও যত্ন কি রূপে আশা করা যাইতে পারে।[২০]

সুতরাং বাজারের দিকে তাকিয়েই এই বাস্তব সত্যটি প্রকাশকরা বুঝেছিল। আবার ধরা যাক *হালিসহর পত্রিকা*-র কথা। খোদ বঙ্কিমচন্দ্রকে নাস্তানাবুদ করা[২১] এই কাগজেও রাজনীতি প্রসঙ্গে পাঠকদের অবহিত করা হত। ১৮৭৩ সালে সরকারের শিক্ষানীতির সমালোচনা করায় সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।[২২] অন্যদিকে সাহিত্য পত্রিকা হওয়া সত্ত্বেও *দিনাজপুর পত্রিকায়* দিনাজপুরের ঐতিহাসিক তথ্যমূলক প্রবন্ধ, স্থানীয় দুর্ভিক্ষ, ডাকাতি, খুন-খারাপি--[২৩] এই সবও ছাপা হত। সুতরাং স্থানীয় বিষয় বা অঞ্চল 'মাহাত্ম্য' প্রচার কম বেশি সব কাগজকেই প্রাধান্য দিতে হয়েছিল। তাই সাহিত্য চর্চা আর নিলামী ইস্তাহার নিয়ে ডুবে থাকলেও *দিনাজপুর পত্রিকা*-র মত কাগজে মাঝে মাঝেই প্রকাশিত হত এই ধরনের আঞ্চলিক ভাবাবেগ আর অহঙ্কার--

> কোথায় রুক্মিনীকান্ত ভক্ত মনোহর?
> কোথায় মন্দির তাঁর শোভার আকর?
> কোথায় প্রকৃতি হেন জুড়ায় নয়ন?
> দিনাজপুর বিনে আর কোথায় এমন।...[২৪]

তিন

এ পর্যন্ত জানা প্রথম আঞ্চলিক সংবাদপত্রটির নাম *মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী*। ১৮৪০ সালের ১০ মে তারিখে প্রথম প্রকাশিত এই পত্রিকা কাশিমবাজার রাজ কৃষ্ণনাথ রায়ের আনুকূল্যেই ছাপানো গিয়েছিল। ১৮৪৯ সালের ১০ এপ্রিল *সম্বাদ ভাস্কর* লিখেছিল--

> কলিকাতা নগরে সমাচারপত্র অনেক হইয়াছে, পল্লিগ্রামে অধিক হয় নাই, রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুর সর্ব্বাগ্রে স্বকীয় রাজধানীতে মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী নামে এক সংবাদপত্রী করিয়াছিলেন, মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটের কোপে উক্ত রাজবাহাদুর বর্ত্তমানেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়...।[২৫]

এইসব পত্রিকা এতই দুষ্প্রাপ্য যে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখবার মতো বেশি তথ্য

আমাদের হাতে নেই। তবু যৎসামান্য যা পেয়েছি তার ভিত্তিতে দু'চারকথা বলা যেতে পারে। কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার ওরফে কাঙাল হরিনাথের *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* দিয়েই শুরু করা যাক। জমিদার, মহাজনের অত্যাচারে সাধারণ মানুষের দুর্দশা দেখে উদ্বিগ্ন হরিনাথ তা সরকারের কাছে পৌঁছোনোর জন্য পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্প করেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে ওই পর্যন্ত বাংলা কাগজ যা বেরিয়েছিল তা নগরের কথাতেই পরিপূর্ণ, গ্রামের কথা বিশেষ থাকত না। তাই তিনি পত্রিকা প্রকাশ করে অত্যাচারিত গ্রামবাসীদের কথা সরকারের কানে তুলতে চাইছেন।[২৬] পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে হরিনাথ ঘোষণা করেছিলেন--

> যেমন চিকিৎসক রোগীর অবস্থা সুবিদিত না হইলে তাহার প্রতিকারে সমর্থ হন না, তদ্রূপ দেশহিতৈষী মহোদয়গণ গ্রামের অবস্থা অবিদিত থাকিলে কিরূপে তাহার প্রতিকারে যত্নবান হইবেন? যাহাতে গ্রামবাসী দিগের অবস্থা, ব্যবসায় রীতি-নীতি, সভ্যতা, গ্রামীণ ইতিহাস, মফস্‌সল রাজকর্মচারীগণের বিচার এবং আশ্চর্য ঘটনাদি প্রকাশিত হয় তাহাই এই পত্রিকার প্রধানোদ্দেশ্য...।[২৭]

একই কথা বলেছিল ১৮৬৭ সাল নাগাদ প্রকাশিত হওয়া বিক্রমপুরের *পল্লী বিজ্ঞান*। প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় লিখিত হয়েছিল যে, বহু জায়গায় মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হয়েছে, পত্রিকাও বের হচ্ছে, কিন্তু পল্লীসমূহের অবস্থা সংশোধনোপযোগী গ্রাম্য পত্রিকার অভাব তাতে মেটেনি। অথচ পল্লীগ্রামের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি। এই অভাব মোচনের জন্যই পত্রিকার প্রকাশ--

> যাহাতে পল্লীসমূহের বিশেষতঃ বিক্রমপুরের বিদ্যা ও শিক্ষার উপযুক্ত চর্চ্চা হইতে পারে, যাহাতে আচার ব্যবহারাদি পরিমার্জ্জিত হইয়া সমাজের উন্নতি হইতে পারে...সেই সকল বিষয়ই এই পত্রিকায় আন্দোলিত হইবে।[২৮]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে নিজ এলাকার, নিজ গ্রামের উন্নয়নের বিষয়টি স্থানীয় সচেতন মানুষদের ভাবিয়ে তুলেছিল। তাই বহু পত্রিকার লক্ষ্যই হয়ে দাঁড়ায় পল্লী উন্নয়ন। সম্ভবত উনিশ শতকের শেষার্ধে প্রকাশিত উলুবেড়িয়ার *গ্রামবাসী*-র উদ্দেশ্যই ছিল ওই অঞ্চলের মানুষকে রাজনীতি বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া।[২৯] *হালিসহর পত্রিকা*-র প্রথম সংখ্যায় একটু অন্যরকম কথা শোনা গিয়েছিল। সম্পাদক বলছেন--

> পল্লীগ্রামস্থ লোকদিগকে সদুপদেশ প্রদানার্থে নানা প্রকার নীতিগর্ভ ও চিত্তানন্দপ্রদ প্রবন্ধ সকল এই অভিনব পত্রিকায় প্রকটন করিবার সঙ্কল্প করা গিয়াছে...।[৩০]

সময়ের সাথে এই পল্লী উন্নয়নের সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হয়েছিল, সে উদ্যোগে ভাটা পড়েনি। ১৩২৫ বঙ্গাব্দে বসিরহাট-এর *পল্লীবাণী* লিখেছে কলকাতাকে কেন্দ্র করে প্রচুর পত্রপত্রিকা বেরোলেও, পল্লীগুলির প্রাণ স্বরূপ মহকুমা মণ্ডলীর কণ্ঠ এখনও নীরব। বলা হয়েছে এই নীরবতার আড়ালে কত বিলুপ্ত প্রায় ইতিহাস, গাথা, কাব্য প্রতিভা, আত্মপ্রকাশের শুভ মুহূর্ত অপেক্ষা করে আছে। নিদ্রাতুর মহকুমাবাসী 'দূর জগতের কল্লোলের প্রতি একান্ত বধির'। তাই তাদের মধ্যে জীবনী সঞ্চারের 'মহৎ উদ্দেশ্য মস্তকে বহন করিয়া এই পল্লীবাসী অবতীর্ণ হইয়াছেন।'[৩১]

আবার নির্দিষ্ট করে জেলার কথা তুলে ধরতেই যাদের প্রতিষ্ঠা তারা কি বলেছিল দেখা যাক। ১৩০০ বঙ্গাব্দের ১২ আষাঢ় প্রকাশিত *চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ*-র অনুষ্ঠানপত্রে লিখিত হয়েছিল--

> হুগলী জেলার অভাব ও অভিযোগ, প্রয়োজনীয় সংবাদ এবং হিন্দুধর্ম, হিন্দু সমাজ ও রাজনীতি সংক্রান্ত নানা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রচার ও আলোচনা করাই সংবাদপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।[৩২]

অন্যদিকে 'বহুতর অভাব', এর কথা রাজশক্তির কাছে তুলে ধরে প্রতিবিধান চাওয়াই *শ্রীহট্ট-দর্পণ* তার উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছিল।

> শ্রীহট্টের সমুদায় বিষয় যাহাতে ভালরূপ প্রতিফলিত হইতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই ক্ষুদ্র মাসিক পত্র প্রকাশিত হইল।[৩৩]

অকল্পনীয় প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছিল প্রকাশকদের। অনেকেরই অকালে মৃত্যুও হয়েছিল। *ঢাকা প্রকাশ* বা *বাঁকুড়া দর্পণ* নেহাৎই ব্যতিক্রম। প্রথমটি বেঁচেছিল ৯৬ বছর[৩৪] আর দ্বিতীয়টি টিকে ছিল প্রায় ৫০ বছর। কিন্তু এই আয়ু সবাই পায়নি। *পল্লী বিজ্ঞান* বেঁচেছিল মোটে এক বছর। কিন্তু উত্তরসুরীকে তা হতাশ করতে পারেনি। তাই *বিক্রমপুর* সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৩২০ বঙ্গাব্দে পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় লিখেছেন--

> সিদ্ধিদাতা জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া বিক্রমপুর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। বিক্রমপুর হইতে এইরূপ কোন পত্র প্রকাশের চেষ্টা এই নূতন নহে। সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক সকল শ্রেণীর পত্রই বিক্রমপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং জলবুদ্বুদের মত কাল সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। *বিক্রমপুর*-ও ত্রৈমাসিক রূপে কাল-স্রোতে ভেলা ভাসাইল -সর্ব্ব নিয়ন্তা জগদীশ্বরই বলিতে পারেন কোথায় ইহার পরিণতি।[৩৫]

আঞ্চলিক ঐতিহ্য তুলে ধরবার যে প্রবণতা *বিক্রমপুর*-এ পাওয়া গিয়েছে সেই একই ছবি *নোয়াখালী*তেও। ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই কাগজে বলা হয়েছিল নিজের দেশকে না জানার জন্যই সর্ব বিষয়ে পণ্ডিতরা দেশে থাকা সত্ত্বেও দেশের কোন উন্নতি হয়নি। এই আত্মজ্ঞানের অভাবহেতুই যত সমস্যা। তাই গল্প বা কাহিনি নয়, নোয়াখালির প্রাচীন কাহিনি প্রবাদ--এইসবই প্রকাশ করার অঙ্গীকার করা হয়েছিল। কারণ সে বুঝেছিল--"নোয়াখালী লইয়াই *নোয়াখালী*-র জীবন, নোয়াখালী ছাড়িলেই ইহার মৃত্যু।"[৩৬]

সে কালের অনেক পত্রিকা জুড়েই থাকত নিলামি ইস্তাহার। বাঁচিয়ে রাখার জন্যই হয়ত এগুলো প্রকাশিত হত। হুগলির জজ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল স্থানীয় দেওয়ানি আদালতের নিলামি ইস্তাহারের সংবাদ প্রকাশের অনুমতি দিয়ে ওই কাগজের উপযোগিতাই বাড়িয়ে দেন বলে সুধীরকুমার মিত্র লিখেছেন।[৩৭] এই গাদাখানেক নিলামি ইস্তাহার অনেকেরই পছন্দ হয়নি। তাই একটু অন্যরকম স্বাদ পৌঁছে দেবার লক্ষ্য নিয়েও অনেকের আবির্ভাব ঘটে। এই প্রসঙ্গে মনে আসছে রামপুরহাটের *রাঢ় দীপিকা*-র কথা। সে লিখেছে--

> মফস্বল হইতে যে সকল সংবাদপত্র বাহির হয় তাহাতে পাঠোপযোগী কিছুই থাকে না, গ্রাহকগণ উহাতে কেবল নিলামী ও অন্যান্য বিজ্ঞাপন এবং স্থানীয় পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের স্তুতিবাদ দেখিতে পান।[৩৮]

এই কলঙ্ক মোচনের জন্যই নাকি এই পত্রিকাটি বের হয়েছিল।

সুতরাং পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ও কারণ ছিল বিবিধ। ঔপনিবেশিক শাসনের বিচার বিশ্লেষণও ছিল অনেকের লক্ষ্য। উনিশ শতকের *চন্দননগর প্রকাশ* বলেছিল--ইংরাজ রাজনীতির স্বাধীনভাবে ও সততার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা এবং ইংরেজ রাজনীতির সমালোচক নির্ভীক ফরাসী সংবাদপত্রগুলোর সারভাগের অনুবাদ প্রকাশিত হবে।[৩৯] এই

চন্দননগরেরই *সেবক* আবার নিজেকে বলত 'জনসাধারণের মুখপত্র'। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যায় লিখিত হয়েছিল—'দেশের সেবার জন্য *সেবক* বাহির হইল। বিশেষ করিয়া গরীবের সেবায় সেবক সদাই অবহিত থাকিবে।'[৪০]

পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হেতু কাগজ ছাপার নজিরও আছে। *ঢাকা প্রকাশ*-এর ভাষ্য অনুযায়ী ১৮৭৫ সাল নাগাদ *ঢাকা দর্শক* নামের যে সাপ্তাহিক কাগজটি বেরিয়েছিল তার উদ্দেশ্য সেরকমই ছিল মনে হয়—

> ঢাকা প্রকাশের একজন পত্র-প্রেরক যাহার প্রকাশ্য চরিত্র অতি তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনিই উহার জন্মদাতা। নিন্দিত ব্যক্তি গাত্র জ্বালায় দগ্ধীভূত হইয়া অন্তরালে অবস্থান পূর্ব্বক ইহার প্রচারারম্ভ করিয়াছেন। *ঢাকা প্রকাশ* ও ইহার সাহায্যকারীদিগের নিন্দাবাদ ও নিজের...বন্ধুবর্গের গুণকীর্তনই নাকি দর্শকের প্রধান উদ্দেশ্য...।[৪১]

চুঁচুড়ার *দর্শক*ও নাকি *চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ*-র প্রতিদ্বন্দ্বী[৪২] হিসাবে আসরে নেমেছিল। ওই চুঁচুড়ারই *সাধারণী* আবার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার এর 'রাজনীতিজড়িত সাহিত্যিক সক্ মিটাইবার জন্য'[৪৩] বেরিয়েছিল। দেখা যাচ্ছে পল্লী উন্নয়ন, জেলার উন্নতি, গরীবের কথা, রাজনীতি মায় নিখাদ সাহিত্যচর্চার জন্যও আঞ্চলিক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

চার

আঞ্চলিক পত্রিকায় স্থানীয় বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। *উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা*-য় ধারাবাহিকভাবে *Topography oj Ooterparah* বা চন্দননগরের *প্রজাবন্ধু*-তে *চন্দননগরের ইতিবৃত্ত, পল্লী-বিজ্ঞান*-এ *বিক্রমপুর ও বিক্রমপুরবাসিগণ*[৪৪]—সবই ছিল এই ধারার রচনা। আবার ঠিক ইতিহাস বা বিবরণী আকারে রচনা না থাকলেও, জন্মস্থানের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াস কিন্তু প্রতিটি আঞ্চলিক পত্রিকারই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কীর্ণাহারের (বীরভূম) *বীরভূমি* লিখেছিল—

> যাহাতে বীরভূম জেলার ইতিহাস ও সাহিত্যের উদ্ধার হয়, সে সম্বন্ধে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োজিত করিতে ত্রুটি করি নাই।[৪৫]

নোয়াখালী অঙ্গীকার করেছিল যে, 'এই পত্রিকায় প্রাচীন ইতিহাসের সহিত নোয়াখালীর বর্তমান অবস্থার সম্যক আলোচনা' থাকবে। এই 'প্রাচীন ইতিহাস' বলতে চন্দ্রগঞ্জ, চৌমুহনী, পরশুরাম-এর মতো বড়ো বড়ো বাজারের বিবরণ, খিলপাড়ার চৌধুরী বা শ্রীরামপুর গুহদের মতো বড়ো পরিবারবর্গের কথা, হিন্দু মুসলিম সন্ন্যাসী ফকিরদের কথা। আর 'বর্তমান অবস্থা' বলতে গ্রাম্য পাল-পার্বণ, কামার-কুমোর, যুগী-জোলার জীবনযাত্রা প্রণালীর বর্ণনা ইত্যাদি।[৪৬] অর্থাৎ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরে নিজ নিজ এলাকার মানুষজনের মধ্যে একটি আঞ্চলিক ঐক্যবোধ জাগ্রত করার জন্যই বোধহয় এইসব হয়েছিল। স্বদেশবাসী হিন্দু-মুসলিম ভাইদের প্রতি *শ্রীহট্ট-বার্ত্তা*-র যে কাতর অনুরোধ—'আপনারা সঙ্ঘবদ্ধ হউন। শ্রীহট্টের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করুন। ...জগতের বুকে শ্রীহট্টের বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করুন'[৪৭]—তা কি এই কথাই প্রমাণ করে না?

এই ধরনের আঞ্চলিকতা নিশ্চিত আগেও ছিল। পত্র-পত্রিকা থেকে তেমন ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে। ১৮৭৬ সালে *ভারত মিহির* লিখেছিল—

> কলকাতার উন্নতিতে আমরা ঈর্ষিত নই। দুঃখ হয় পূর্ববঙ্গের পশ্চাদমুখীনতা দেখে। অথচ

পূর্ববঙ্গের এককালের গরিমার কথা কে না জানে?[৪৮]

'বাঙ্গাল' বলে প্রচ্ছন্ন একটি ব্যঙ্গ তো *হুতোম প্যাঁচার নক্সা*-তেই ছিল। মাহেশের স্নানযাত্রায় আগত 'বাঙ্গাল' বাবুদের বর্ণনা এইভাবেই দেওয়া হয়েছিল—

> ঢাকাই জালার মত, পেল্লাদে পুতুলের ও তেলের কুপোর মত শরীর, দাঁতে মিসি, হাতে ইষ্টিকবচ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তাতে ছোট ছোট ঢোলের মত গুটি দশ মাদুলী ও কোমরে গোট, ফিন্‌ফিনে ধুতি পড়া ও পৈতের গোছা গলায় মৈমনসিংহ ও ঢাকা অঞ্চলের জমিদার, সরকারী দাদা ও পাতান কাকাদের সঙ্গে খোকা সেজে ন্যাকামি কচ্চেন...এরাই কেউ কেউ রঙ্গপুর অঞ্চলে বিদ্যোৎসাহী কবলান![৪৯]

সুতরাং এইরকম ঠাণ্ডা লড়াই ছিলই। তবে পশ্চিমবঙ্গ বা কোলকাতা 'আক্রমণ'-এ সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছিল *বিক্রমপুর*। খোদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর বিরুদ্ধেই গুরুতর অভিযোগ এনেছে সে—

> তাহার দৃষ্টিও পশ্চিমবঙ্গের দিকেই সন্নদ্ধ। যদি বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ঢাকা সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতির সৃষ্টি না হইত তাহা হইলে আমরা বঙ্গের বহু স্থানের বহু ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইতে পারিতাম না।[৫০]

বছর দুই পর সে আরও চাঁচাছোলা ভাষায় আঘাত হানে—

> পূর্ব্বঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত হয় ইহা যেন অনেকের ইচ্ছা নয়।' আবার '...যখন স্বদেশী আন্দোলনে দেশ মাতাইয়া বাহবা নিতে হইবে,—National University-র জন্য অর্থের প্রয়োজন হইবে...তখন এই পশ্চিমবঙ্গবাসী নেতাগণ কলিকাতা হইতে আগমন করিয়া খুব স্বদেশহিতৈষণার বক্তৃতা করিয়া যান, ভাই ভাই বলিয়া গলাগলির ভাব দেখান কিন্তু তারপর, পূর্ব্ববঙ্গের উন্নতি বিষয়ক কোনও প্রস্তাব সম্বন্ধে তাহাদের সহানুভূতি দেখিনা।[৫১]

সুতরাং এই তরজার উৎস কত প্রাচীন তা বোঝা যাচ্ছে।

পাঁচ

স্থানীয় সমস্যা বা স্থানীয় উন্নয়ন নিয়ে উদ্বেগ ছিল সবারই। *বরিশাল হিতৈষী* থেকে *বাঁকুড়া দর্পণ* বা আসানসোলের *রত্নাকর* সকলেই জলকষ্ট নিয়ে চিন্তিত ছিল।[৫২] এই কষ্ট নিবারণে জেলাবোর্ডগুলোকে সরকার হাজার পাঁচেক করে টাকা দেবার কথা বলেছিল তাদের আবেদনক্রমে। কিন্তু কুমিল্লার *ত্রিপুরা হিতৈষী* লিখেছিল যে বহু গ্রামবাসীই সরকারি আদেশনামাটি সম্পর্কে অজ্ঞ ও তারা অনেকেই আবার অক্ষরজ্ঞানহীন।[৫৩] ওদিকে পুজো নিয়ে মাতামাতিতে রানাঘাট-এর *গ্রামবাসী* লিখেছে[৫৪]--

> চাঁদাদারেরা যদি বারইয়ারীর চাঁদা দিতে কষ্ট বোধ না করিয়া থাকেন তবে ইহা দ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে উপস্থিত দুর্ভিক্ষের জন্য বড় ভয় ও কষ্ট নাই।

এইসবের মাধ্যমে সংবাদপত্রগুলোর এক সহানুভূতিপ্রবণ মনেরও পরিচয় পেয়েছি আমরা।

হাসপাতাল, পুলিশ, বিচারব্যবস্থা বা রেল নিয়ে সেদিনও কাগজগুলোর অভিযোগ ছিল সীমাহীন। নিতান্ত অসহায় হলেও কলেরা রুগিরা মেদিনীপুরের 'পাবলিক ডিসপেন্সারি' তে যেতে চায় না, কারণ গেলে মৃত্যু নিশ্চিত—লিখেছিল *মেদিনী বান্ধব*।[৫৫] আবার পুলিশ

কিভাবে 'রন্দগাস্তি'র ছলে পতিতাগৃহে প্রবেশ করে আমোদ প্রমোদের মতলবে থাকে এবং সুযোগ পেলেই 'হাম পলিষ' বলিয়া বলপূর্বক বারাঙ্গনার ঘরে অনধিকার প্রবেশেরও চেষ্টা পান', প্রতিবাদ করলে পতিতাকে যে তুলে এনে হেনস্থা করে সে বিষয়ে *রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ*[৬]-এ ছাপা হয়েছিল এক চিত্তাকর্ষক খবর। বিচারালয় সংক্রান্ত অভিযোগগুলোও ছিল বেশ মজাদার। ময়মনসিংহের *চারুমিহির* একবার লিখেছিল যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ উকিল-মোক্তার নিয়োগ না করলে সাফল্যের আশা থাকে না, তার ওপর টাঙ্গাইলের মুন্সেফ অনিলচন্দ্র দত্তর মত লোকেরাও এক উৎপাত, বিষয়বস্তু না বুঝে রায় দেন, টিফিনে এক দেড় ঘণ্টা নষ্ট করেন[৭] ইত্যাদি।

বাঁকুড়া-দর্পণ

বাঁকুড়া জেলার সংবাদপত্র ও মুখপত্র।

সারিবাদি কষায়
বাত রোগের মহৌষধ।
সারিবাদি কষায়
চর্ম্ম রোগের মহৌষধ।
সারিবাদি কষায়
রক্ত দোষের মহৌষধ।
সারিবাদি কষায়
পারদ-দোষের মহৌষধ।

টাক নিবারণে মহৌষধ
শিরোরোগে মহৌষধ

বাঁকুড়াবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্য প্রকাশিত হয়েছিল *বাঁকুড়া দর্পণ*

একই রকম সজাগ ছিলেন সম্পাদকরা রেল নিয়েও। কোলকাতা বা অন্যান্য জায়গা থেকে আসা যাত্রীদের 'প্লেগ' পরীক্ষার নামে অপরাধীর মতো তাদের সঙ্গে রেল কর্তৃপক্ষর আচরণ নিয়ে সরব হয়েছিল *খুলনা*।[৫৮] আবার বর্তমান 'মেছেদা লোকাল' এ গিয়ে সাড়ে দশটার আগে শিয়ালদহ, খিদিরপুর অফিস করায় বাগনানের লোকেদের অসুবিধার কথা লিখেছিল *হাওড়া হিতৈষী*, ১৯০৫ সালে।[৫৯]

অভাব-অভিযোগগুলো তুলে ধরবার সময় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় দিয়েছিল সংবাদপত্র। রায়পুর থানায় আটক ১১ জনের জবানবন্দী উদ্ধৃত করে *বাঁকুড়া দর্পণ*-এ লিখিত হয়েছিল যে ৪/৫ দিন অভুক্ত থাকার পর তারা ওই কুকর্মটি করতে বাধ্য হয়।[৬০] শুধু একবার নয়, বারবার ডাকাতির সঙ্গে অভাবকে যুক্ত করেছে সে। উন্নয়ন নিয়ে খোদ লেফটেন্যান্ট গভর্নরকেও ছাড়া হয়নি--বাঁকুড়া এসে রাস্তাঘাট ও মানুষজনের প্রশংসা করলেন ঠিকই, কিন্তু বাঁকুড়াবাসীর দিন কিভাবে কাটছে তা তিনি বুঝলেনই না।[৬১]

আর একটি বড় 'টার্গেট' ছিল স্থানীয় পৌরসভা, একালের মতোই। ১৮৬৫-তে ঢাকা পুরসভার গৃহকর চালু করা নিয়ে *ঢাকা প্রকাশ* লিখল বাড়ি বসে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কর যেভাবে নির্ধারিত হল তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।[৬২] 'রঙ্গপুর মিউনিসিপাল কমিটীর মেম্বরগণ কেবল লোকের অনিষ্ট সাধনেই তৎপর থাকেন, কিন্তু কর্ত্তব্য কার্য্যের কিছুই করেন না'- লিখেছিল *রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ*।[৬৩] আবার পাট আর কাগজ কলের জন্য লোকজনবৃদ্ধি হেতু পুরকর বাড়লেও ভাটপাড়াবাসী যা দেয় তার অর্ধেকও তাদের জন্য ব্যয় করে না নৈহাটি পুরসভা, এরকমই অভিযোগ তুলেছিল *চুঁচুড়া বার্তাবহ*।[৬৪] ইংরেজদের 'sanitation', 'conservancy' আর 'public health'-এর তত্ত্ব মফস্‌সলের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যেও কিভাবে শিকড় বিস্তার করেছিল পুরুলিয়ার *মানভূম* থেকে *চারুমিহির*[৬৫] এর মতো অজস্র আঞ্চলিক পত্রিকায় প্রকাশিত নগর বা পল্লীর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংক্রান্ত খবরগুলো থেকেই তা বোঝা যায়। না হলে আর *বসিরহাট সুহৃদ* কেন পাট আর ম্যালেরিয়ার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করবে?[৬৬] এইসব নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলছিল কলকাতায়। তারই প্রভাব পড়েছিল এই সব অঞ্চল -'সুহৃদ' এ। তবে ভালো করতে গিয়েও অনেক সময় বিরূপ সমালোচনার মুখে পড়েছিল পুরসভা--সে নজিরও আছে। বেচারা দক্ষিণ শ্রীহট্ট লোকাল বোর্ড যখন সমসেরনগর মৌলবী বাজার রাস্তা 'ড্রেস' করাচ্ছিল তখন *শ্রীহট্ট-বার্তা*-র বিচারে তা 'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ' বলেই বিবেচিত হয়েছিল।[৬৭]

সমালোচনার ভাষাও ছিল বেশ মজাদার। 'স্বার্থান্ধ' পুরপিতার কাজকারবার দেখে *সেবক* লিখেছে--

> এই সব কাউন্সিলরগণ কি মিউনিসিপালিটীকে ছেলে খেলার যায়গা না বাসরঘর পাইয়াছেন যে তাঁহারা বৎসরে দুই তিনবার করিয়া মেয়র বরণ করিতেছেন।

শুধু তাই নয়, পতিতাদের স্বাস্থ্য বিধি তুলে দেওয়ায় পত্রিকা এই বক্রোক্তি করতেও ছাড়েনি—

> বেশ্যাদের প্রতি মিলিত দলের সকাউন্সিল মেয়র মহাশয়ের এই অনুকম্পার কারণ কি? তাহারা ভোট যোগাড় করিয়া দিয়াছিল বলিয়া না অন্য কোন কারণে?[৬৮]

সুতরাং সন্তুষ্ট করা যায়নি। বোধহয় তা সম্ভবও ছিল না। 'উপযুক্ত কমিশনার' এর সংজ্ঞা বা যোগ্যতাটি পত্রিকার কাছে এতই লম্বা-চওড়া ছিল যে তা পূরণ করাই ছিল কষ্টকর--

রোগে শোকে যিনি সহানুভূতি প্রকাশে কুণ্ঠিত নন, যিনি মিউনিসিপালিটির পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া আমাদের কি কি বিষয়ে বা অসুবিধা তাহার খবরাখবর লইতে সমর্থ, পথঘাট কখন কোন স্থানে বেদুরস্থ বা মুন্সীপাল কর্ম্মচারীগণের শৈথিল্যে অপরিষ্কার রহিয়াছে তাহার তদন্তে প্রস্তুত আছেন, তৃষ্ণায় জলদানের সুব্যবস্থা ও রোগের রোগীর রোচর্য্যার জন্য সুব্যবস্থা করিতেও যিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন তাঁহাকেই আমরা উপযুক্ত কমিশনার বলিয়া মনে করি।

সিউড়ি পৌরসভার নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৯০৯ সালে এই 'শর্তাবলী'টি প্রকাশিত হয়েছিল *বীরভূম-বার্তা*-য়।

তবে প্রশংসা বা সহানুভূতিও ছিল। সর্বদাই পুরসভার নিন্দায় ব্যস্ত *ঢাকা প্রকাশ*ও পরিশ্রুত জল সরবরাহের সূচনালগ্নে পুরসভার প্রশংসা করেছিল।[৬৯] অনেকেই সমস্যাটি বুঝতেনও। ম্যালেরিয়া নিবারণের আর্থিক সামর্থ্য পুরসভার নেই, তাই সরকারকেই সেদিকে নজর দিতে বলেছিলেন *শ্রীহট্ট দর্পণ* সম্পাদক।[৭০] *সাধারণী* লিখেছে—'যতদিন অধিবাসীরা সম্পূর্ণ মিউনিসিপাল স্বাধীনতা না পাইবে, যতদিন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মিউনিসিপালিটীর হর্তাকর্তা থাকিবেন'[৭১] ততদিন কোন সুফল ফলবে না। এই বক্তব্য ছিল *ঢাকা প্রকাশ* এরও।[৭২] এইসব লেখাপত্র নজরে আসায় সরকার বা পুরসভা মাঝে মধ্যে যে নড়েচড়ে বসত না, এমন নয়। *বাঁকুড়া দর্পণ*-এ পুরসভা বিষয়ক সমালোচনা দেখে পৌর দপ্তর ১৯০১ সালের অক্টোবরে 'Report on Native Newspapers' এর অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে বিষয়টি জানিয়েওছিল।[৭৩] আবার দু'মাস যাবৎ কাঠের সাঁকো ভেঙে পড়ে থাকা নিয়ে *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা*-র 'ক্রন্দন' সত্ত্বেও তার দিকে পুরসভার নজর না পড়ায় পত্রিকা লিখেছে কাজ দেখে বোধ হয় না যে *কুমারখালির মিউনিসিপালিটীর কেহ মা বাপ আছেন।* এর পরের মাসেই ওদিকে নজর পড়েছিল পুরসভার।[৭৪] এইসবকে তো আঞ্চলিক পত্রিকার সাফল্য হিসাবে গণ্য করাই যায়।

ছয়

সংবাদপত্রেই যুগ পরিবর্তনের প্রথম পর্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত দেখতে পেয়েছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। ছোটো ছোটো জায়গার পত্রিকার খবরের মধ্যেই বহু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ধরা পড়েছিল। বেশ কিছু ঘটনা বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, কিভাবে বিদেশি শাসকরা অনেক ক্ষেত্রে, অনেক প্রতিষ্ঠানে আগেকার সহজ সরল পরিবেশ, প্রথার পরিবর্তে এক নতুন গাম্ভীর্যপূর্ণ মূল্যবোধ, আদবকায়দা বা 'system' চালু করেছিল। মফস্‌সল শহরও বাদ পড়েনি। বাঁকুড়ার ফৌজদারি আদালতে 'ডিপুটীবাবুর এজলাসের সম্মুখ দিয়া হাসিতে হাসিতে যাইতে ছিল' বলে রসিক বাবুটির দু'টাকা অর্থদণ্ড হয়ে যায়। এই *বাঁকুড়া দর্পণ*-ই আবার লিখেছে, নতুন জেলা শাসক এসে কিভাবে প্রধান করণিক, সেরেস্তাদার, মোক্তার সহ সকলকে পাগড়ি বাঁধার হুকুম দিয়ে 'কাছারি কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন।'[৭৫] বাস্তবিকই এই সব খবর যুগ পরিবর্তনের সুস্পষ্ট প্রতিফলন। তবে খবরের কাগজ নির্বিবাদে সব মেনে নেয়নি। ১৮৮৯ সাল নাগাদ অশৌচ চলাকালীন পাগড়ি না বাঁধায় এক দেশীয় উকিলবাবুকে সওয়াল করতে না দেবার জন্য হুগলির জজসাহেবের সমালোচনা করতে ছাড়েনি উলুবেড়িয়ার *গ্রামবাসী*।[৭৬] ধুতি-চাদর পরিহিত এক দেশীয় মানুষকে নারায়ণগঞ্জের মহকুমা শাসক হাওয়ার্ড সাহেব ভদ্রলোক হিসাবে গণ্য না করায় বিস্ময় প্রকাশ করেছিল *ঢাকা প্রকাশ*।[৭৭]

সুতরাং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মানানসই পোষাক ছাড়া প্রবেশ নিষেধ, হাসতেও মানা। ঠিক এরই সঙ্গে, একইভাবে বাঙালি জীবনের বহু আমোদ-প্রমোদ, আচার-অনুষ্ঠানও নিন্দিত হতে বা নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হতে শুরু করেছিল এই সময়েই। তার জন্য আইন দরকার হয়নি। সমাজ, ভিক্টোরিয়ান নীতিবোধে শিক্ষিত বাঙালি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা এই সব আমোদ-প্রমোদের নিন্দায় সরব হয়েছিল। নাম করতে গেলে প্রথমেই আসবে মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনের কথা। ভিক্টোরিয়ার ইংল্যান্ডে 'Temperance Movement' এর কালে বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এখানেও *সুলভ সমাচার* এর মতো বহু কাগজেই মদ্যপানের কুফল নিয়ে নিয়মিত লেখা ছাপা হত। এভাবেই মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়ে উঠল, অনৈতিক বলে বিবেচিত হল।[৭৮] কলকাতার বাইরের ভদ্রলোকরাও বাদ থাকেননি। মেদিনীপুরের *কান্তিতে বঙ্গের সুরা সমস্যা, বাঁকুড়া দর্পণ*-এ *এক পেয়ালা মদ, গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*-য় *সুরা কি রাক্ষসী নহে রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ*-এ *সুরাপানে সর্ব্বনাশ*[৭৯]—এইরকম শিরোনামে আলোচিত মদ্যপানের কুফল বিষয়ক প্রবন্ধাবলী সে কথাই প্রমাণ করে।

এরকমই হিড়িক পড়েছিল অশ্লীলতা বিরোধী অভিযানের। বহু আমোদ-প্রমোদ, বিনোদন বা পেশা সভ্যতার পরিপন্থী রূপে নিন্দিত হল। হীরেন গোহাঁঞি খুব সুন্দর লিখেছেন—

> The new culture pioneered by them under the impact of the western ideas was marked by 'সভ্যতা'—civility. This identity of the 'সভ্য' is maintained by clear-cut differences from marked as 'অসভ্য'[৮০]

ইউরোপীয় মূল্যবোধ আর ধ্যানধারণার সঙ্গে এক সত্তা নির্মাণে এই ভদ্রলোকরা সচেষ্ট ছিলেন বলে লিখছেন জফ্রে ওডিও।[৮১] ওডিও বা গোহাঁঞির এই মন্তব্য মোটেই অতিরঞ্জিত মনে হয় না যখন উনিশ শতকের শেষার্ধে কলকাতার বহু দূরে অবস্থিত এক শহরের পত্রিকা—*রাজসাহী সমাচার*-এ প্রকাশিত এক খবরের সন্ধান পাই। বারোয়ারি পুজোর সমর্থনেই লিখিত হয়েছে—

> আমোদ শূন্য সমাজে আর নিরানন্দ প্রার্থনীয় নহে। চক্ষু কর্ণের অসহনীয় কবিগান, নেশার ধূম, বেশ্যাবৃত্তির প্রাদুর্ভাব এবং জুয়া খেলা প্রভৃতি কুৎসিত আমোদ অবশ্যই চেষ্টা করিলে অনেক নিবারণ করা যাইতে পারে। এগুলি নিবারিত হইলে আমাদের সভ্য শ্রেণীর লোকদিগের যোগ দিবার কোনই বাধা থাকে না।[৮২]

এখানেই শেষ নয়। বহু কাগজ আবার বিকল্প এক মূল্যবোধ-এর কথা বলেছিল। যেমন *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*-র কয়েকটি লাইন মনে পড়ছে, ১৮৫০ সালের। বলা হচ্ছে বইপড়া যে সময় কাটানোর এক সৎ পন্থা এই দেশের ভদ্রলোকরা তা স্বপ্নেও ভাবেন না। 'এদের জীবনযাত্রা নিতান্তই সাদামাঠা—বিছানায় উত্তানশায়ী হইয়া চালের বাতা গণিয়া সময় সম্বরণ করেন, কেহ বা কুৎসিত আমোদে লিপ্ত থাকেন'[৮৩], আর এইসব আমুদে লোকের সংখ্যা এত বেশি যে, *শ্রীহট্ট-দর্পণ* লিখছে শ্রীহট্ট শহরের কিছু লোক মাঝে মাঝে একত্রিত হয়ে স্বদেশানুরাগের আবেগে কোন হিতকর কাজের প্রস্তাব দিলেও তা 'নিশি-প্রভাতেই বাদসাহের হাতি-খরিদার নিশাখুরের নিশার মত না জানি কোথায় উড়িয়া যায়।'[৮৪]

সুতরাং এই ধরনের সংস্কৃতি চর্চাই হয়ে দাঁড়াল জাতে ওঠার, ভদ্র বলে শিষ্ট সমাজে পরিচিতি অর্জনের প্রাক-শর্ত। কবিগান আর মদ্যপানের মতই গণিকাবৃত্তিও এদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। পতিতারা কিভাবে খবরের কাগজের বিচারেও অচ্ছুত বলে পরিগণিত হলেন তার

সমর্থনে ১৮৬৯ সালের ২৮ মার্চ *ঢাকা প্রকাশ*-এর একটি খবর উল্লেখ করা যেতে পারে। দুঃখ করে ফরিদপুরের সংবাদদাতা লিখেছেন--

> 'কৃষ্ণ নয়নী' কুলটাদিগের কুৎসিৎ নয়নভঙ্গী ও শ্রোণিকম্পন দর্শনে অনেকে বিশেষত (শিক্ষিত) সম্প্রদায়ীরা এক্ষণে বীতস্পৃহা হইয়াছেন বলিয়া আমাদিগের (অস্পষ্ট) সংস্কার জন্মিয়াছিল, কিন্তু সেদিন এক ব্যক্তির আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া আমাদিগের সে সংস্কার একেবারে অপনীত হইয়াছে।[৮৫] নদীর ধার দিয়ে বরিশাল শহরের বারবিলাসিনীদের গাড়ি হাঁকিয়ে বৈকালিক ভ্রমণে *কাশীপুর নিবাসী* রীতিমত ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। *ত্রিপুরা হিতৈষী*-র মত অনেকেই চেয়েছে শহরের কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকাতেই যেন এদের বসবাস সীমাবদ্ধ থাকে।[৮৬] *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* তো কসবীয় ছুকরীকে বাহির করা ও তদ্বিষয়ে ফৌজদারীতে নালিশ হওয়া...জাতীয় বক্তব্য প্রদানেও পত্র প্রেরকদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিল। কারণ এমন লোক নেই যাঁরা ঐ 'ঘৃণার্হ ব্যাপারে প্রবর্ত্ত না হয়েন...।[৮৭]

সাত

পতিতাদের এই দৃষ্টিতে দেখলেও সামগ্রিকভাবে 'উনিশ শতকের বাঙালি সমাজজীবনের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নারী জাতির কল্যাণের প্রতি আগ্রহ ও মমতা।'[৮৮] দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য (কেউ প্রগতিশীল কেউবা হিন্দু পুনরুত্থানবাদী) হয়ত ছিল. স্ববিরোধও ছিল, তবে প্রত্যেকেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিল। *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* আগাগোড়া স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এসেছিল। সম্পাদক একবার লিখেছিলেন--কেউ ''বলেন, 'অবলা কুলবালা দিগের বিদ্যাশিক্ষা কেবল সর্ব্বনাশের সোপান মাত্র। এই স্থলে আমরা আপত্তি করি।'[৮৯] তুলনায় শ্রীহট্টের কাগজ আবার একটু প্রাচীনপন্থী। *পরিদর্শক* উনিশ শতকের শেষার্ধেও মনে করছে সুগৃহিণী হতে পারার শিক্ষা না দিলে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, বরং কুশিক্ষাতেই পরিণত হয়।[৯০] *শ্রীহট্ট-দর্পণ* আবার লিখেছিল--

> নাটক, নভেল, পাঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহাতে ভাল গৃহিণী হইতে পারা যায় তদ্রূপ গৃহ কার্য্যাদি শিক্ষাই প্রয়োজন।'

আবার গৃহিনীদের উৎসাহিত করতে সে আরও লিখছে--'প্রবল পরাক্রান্ত রুষ সম্রাট ২৩ দিবস যাবৎ জ্বরে শয্যাগত থাকা অবস্থায় তদীয় পত্নী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া এবং অন্য কোন পরিচারিকার সাহায্য অথবা মুখাপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং অবিশ্রান্ত ভাবে স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন। সতীর এই প্রকার সৎ দৃষ্টান্ত সকলেরই অনুকরণীয়।'[৯১]

বাঁকুড়া দর্পণ আবার আরও চরমপন্থী, লিখছে--

> স্বামী তাড়না করিলে যে কামিনী প্রতি তাড়নার অভিলাষিণী হয়, তাহাকে চিরকাল নরক ভোগ করিতে হয়।[৯২]

অর্থাৎ শুধু স্ত্রী-শিক্ষার বিপদই নয় সতীত্ব, পাতিব্রত্য সম্পর্কেও কাগজগুলোতে মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটত।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ-ও বরাবরই ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে এসেছিল। আশিব দশকেব মাঝামাঝি নাগাদ *ঢাকা প্রকাশ*-এর মতো কাগজও বিধবা বিবাহকে শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলে মত দিয়েছিল। কিন্তু ১৮৬৮-তে রঙ্গপুরের এই কাগজ লিখেছে--

> শুনা গেল রাজাবাড়ী স্টেশনের অন্তর্গত রাউৎভোগ গ্রামে একটি সামান্য জাতীয়া বিধবার গর্ভ হওয়াতে সমাজ ভয়ে উহার আত্মীয়গণ ঔষধ প্রয়োগ বশতঃ তাহা নষ্ট করে...বিধবা বিবাহ না দেওয়ার এই বিষম ফল!

এক গোয়ালা ৯ বছর বয়সী একটি বালিকাকে বিবাহ করবার পর দিনই মারা যাওয়ায় এই কাগজই লিখেছে যে, গোয়ালার ভাগ্যে দ্বিতীয় বিবাহ যত সহজে হতে পেরেছিল, তার চিরদুঃখিনী বালিকা ভার্য্যার পক্ষে কোনদিন কি তা হতে পাববে? 'বঙ্গদেশের এরূপ শুভদিন সহসা প্রত্যাশা করা যায় না।'[৯৩] এই শুভদিন যাতে দ্রুত আসে তাই অনেক কাল পরে কাঁথির *নীহার* সমাজের অগ্রণীদের এগিয়ে আসতে বলেছিল, আর তাহলে 'অতি সহজেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধবা বিবাহ প্রথা এ দেশে প্রচলিত হইতে পারে।'[৯৪]

আঞ্চলিক পত্রিকা পণপ্রথা নিয়েও মাথা ঘামিয়েছে। বিবাহব্যয় সংকোচনের উদ্দেশ্যে আন্দোলনকারী বিহারের মুন্সী প্যারেলাল-এর মত কোন মানুষ এ দেশে তৈরি হল না বলে আক্ষেপ করেছিল *সাধারণী* (মার্চ, ১৮৭৬, পৃঃ ২৪৫)।[৯৫] *নীহার* লিখছে- এ দেশের কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে শিক্ষিত যুবকগণ এ বিষয় চিন্তা করিবেন?[৯৬]

দেখা যাচ্ছে যে শুধু আঞ্চলিক বিবরণ বা সমস্যা নয়, বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক বিষয়েও এইসব স্থানীয় পত্রিকা রীতিমত সচেতন। একইভাবে জাতীয় সমস্যা, ব্রিটিশ শাসন, ঔপনিবেশিক সরকারের চরিত্র ইত্যাদি নিয়েও তারা মতামত ব্যক্ত করেছে। জাতীয় খবর বলতে--

> শীকরাণি ফিরোজপুরে আনীতা হইয়া অতি কঠিন প্রহরীবেষ্টনে রহিয়াছেন, তাঁহার দাসীরাও কাপড় ঝাড়া না দিয়া নিকট যাতায়াত করিতে পারে না[৯৭] বা দুইজন ব্রহ্মদেশীয় লোক উদ্ধি পরিবার সময় অধিক পরিমাণে অহিফেন সেবন করাতে তাহাদিগের মৃত্যু ঘটিয়াছে।[৯৮]

আট

উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোক যে ঔপনিবেশিক শাসন সৃষ্ট ও পুষ্ট তা সকলেরই জানা। *বঙ্গদূত* (১৩ জুন, ১৮২৯) এর ভাষ্য অনুযায়ী 'যে সকল লোক পূর্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে...।'[৯৯] ফলে মধ্যবিত্তদের অপছন্দ ছিল না ইংরেজ শাসন। পরাধীনতার যন্ত্রণার পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষা আর নানাবিধ সুযোগ সুবিধার হাতছানি তো ছিলই। কারণ এই 'Yes, no, very well' এর জোরেই তো তারা সেকালে ইংরেজ এর সাহায্যে বহু টাকা উপার্জন করেছেন।[১০০] তাই এই শাসন তারা ভবিতব্য বলেই মেনে নিয়েছিলেন। ইংরেজদের সভ্যতা সম্পর্কে মোহাচ্ছন্ন ছিলেন এঁরা। তা থেকেই 'খারাপ ইংরেজ' 'Un British'—এই সব 'মিথ' এর জন্ম, এগুলোই তো ইংরেজ শাসনকে টিকে থাকতে সাহায্য করেছিল।

খুব সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় *বাঁকুড়া দর্পণ* থেকে। অনুবাদকের বর্ণনানুযায়ী ইংরেজদের সে ভারতবাসীর 'heaven appointed guardian'[১০১] বলত। ১৯০৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর সে বিষ্ণুপুরের এক বিচারকের সমালোচনায় লিখেছিল--

> হাকিম হইয়া যিনি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হন, তিনি ইংরাজ রাজত্বের বিচারালয় কলুষিত করিবার জন্য হাকিমী করিতেছেন।

বীরভূমবাসী আবার বুঝতেই পারেনি যে, কেন ভারতবাসী নিজের ও ইংরেজের সম্পর্ক বিস্মৃত হয়ে ইংরেজের সমকক্ষতা দাবি করবে?[১০২] তাই তো এহেন ইংরেজ আর দেশীয়দের মধ্যে ক্রিকেট খেলায় অভিভূত *শ্রীহট্টদর্পণ* লিখেছে--

> ইংরেজ এবং দেশীয় লোকের মধ্যে এই প্রকার সম্মিলন অত্যন্ত সুখকর এবং পরস্পর মধ্যে সদ্ভাব বর্ধনের কারণ।[১০৩]

উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা তো কবিতাই ছাপিয়ে ফেলেছিল--ব্রিটিশের জয় বল ব্রিটিশের জয়.....।[১০৪] আর *বীরভূমি* রাণী ভিক্টোরিয়াকে তুলনা করেছে সীতা, সাবিত্রীর সঙ্গে।[১০৫] এই আনুগত্য বহাল রাখার 'টনিক' হিসাবে রানাঘাটের *বার্ত্তাবহ* লিখেছে এদেশের 'বিপথে' চালিত যুব সম্প্রদায়কে প্রাচীন হিন্দু আদর্শবোধে শিক্ষিত করা উচিত, যা তাদের মধ্যে আনুগত্য ও শান্তিপ্রিয় মানসিকতা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।[১০৬]

এই মোহ ভাঙতেও সময় লাগেনি। যদিও উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই মফস্সলের বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠে অন্য কথা শোনা যাচ্ছিল। ১৮৪৯ সালেই *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* লিখেছিল--

> বর্ত্তমান রাজশাসন যে প্রকার প্রজাপীড়ক হইয়াছে, তাহা মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় হইয়াও আপনাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গোচর হইল না, ইহাও এক পরমাশ্চর্য্যের বিষয় বটে।...[১০৭]

ইংরেজদের প্রতি বিদ্রূপ প্রায় শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছেছিল। *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*-র একটি সংখ্যার কথা মনে পড়ছে, যেখানে লিখিত হয়েছে--

> ইংরাজেরা কলির ভুদেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগের সহিত কোনবিষয়ে তর্কবিতর্ক করা আর নরলোকের কর্ত্তব্য নহে।[১০৮]

আর দুর্ভিক্ষপীড়িত বর্ধমানে কার্জনের সফর উপলক্ষে ব্যঙ্গ করেই *বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী* লিখেছিল যে, এই আনন্দোৎসবে অভুক্ত, পীড়িত মানুষ নীরব থাকুক। জামা না থাকলে ধার করে জামা পরে আসতে বলা হচ্ছে, নচেৎ সাহেবের বুক ফেটে যাবে যে![১০৯]

আসলে আগাগোড়া দালালির দলিলে নেই বাঙালি ভদ্রলোক। মুনতাসীর ঠিকই বলেছেন যে, ভদ্রলোকদের মধ্যে এই বোধ জন্মেছিল যে, বিদ্যা, বুদ্ধি কিছুতেই তারা কম নয়, সুতরাং কেন তারা অধস্তন শ্রেণী হিসাবে থাকবে? এভাবেই বাঙালি তথা ভারতবাসীর মনে জাতীয়তাবোধের উদ্ভব হয়েছিল।[১১০] এই বোধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছিল সময়ের সাথে সাথে। তাই শুধু 'সদর'-এ নয়, মফসসলের কাগজেও পাল্লা দিয়ে ইংরেজদের সমালোচনা শুরু হয়। 'মিথ'গুলো ভাঙতে আরম্ভ করে। ইংরেজদের ভারত শাসন নিয়ে *সাধারণী* লিখেছিল--

> মদ্যপায়ী যেমন অধিক পরিমাণে মদ্য পান করিলে কখনই ঠিক পথে চলিতে পারে না, একবার রাস্তার এ দিক একবার ও দিক করিতে ২ চলিয়া যায়, ভারতীয় শাসন প্রণালী অবিকল সেই ভাবে চলিতেছে।[১১১]

চন্দননগর প্রকাশ

সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

১ম খণ্ড। } চন্দননগর: বৃহস্পতিবার ১লা ডিসেম্বর, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ। ১৭ই অগ্রহায়ণ ১২৯৯ সাল। ৪র্থ সংখ্যা।

হরিদ্বারে মেলা

চন্দননগর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল *চন্দননগর প্রকাশ*

চন্দননগর প্রকাশ-এর উদ্বেগ ছিল ইংরাজ রাজ্যে 'সুবিচার ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হইতেছে' বলে।[১১২] আর এ কারণেই, বিচারাভাবে 'অত্যাচার কাহিনী' নামে এক স্বতন্ত্র 'কলাম'ই চালু করেছিল চন্দননগরের *ধূমকেতু*,[১১৩] ইংরেজদের অত্যাচারের বিবরণ 'সম্যকরূপে আলোচনার্থে'। আবার ইংরেজরা অপরাধের মূলে না গিয়ে কেবল অপরাধীকে ধরে এনে শাস্তি দিতেই ব্যস্ত—এইরকম অভিযোগও শোনা গিয়েছিল কুচবিহারের *কাঙ্গাল*-এর কাছে।[১১৪]

এই সমালোচনার একটি বড় কারণ বোধহয় জাত্যভিমান, বঞ্চনাবোধ, দেশীয়দের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই। নিজেদের একটি মর্যাদা আদায়ের লক্ষ্যে ক্রমশ ঝুঁকেছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তারা কোন অংশে কম নয় এটি তুলে ধরাই ছিল উদ্দেশ্য। এ থেকেই পরিণামে স্বাজাত্যবোধের উদ্ভব। আর এই ধরনের চিন্তাভাবনা প্রতিবিম্বিত হয়েছে আঞ্চলিক সংবাদপত্রেও। দায়িত্বপূর্ণ পদে দেশীয়দের পদোন্নতিতে বাংলা সরকারের ঔদাসীন্যে, বিতৃষ্ণাকে দুর্ভাগ্যজনক বলেছিল[১১৫] বহরমপুরের *প্রতিকার*। *ভারতমিহির* বলেছে--দু-একটি উচ্চপদে দেশীয়দের নিয়োগ হয়েছে বটে, কিন্তু রানির প্রতিশ্রুতি মত জাতি বর্ণের বৈষম্য সরকার নির্মূল করতে পারেনি।[১১৬] *প্রজাবন্ধু* তাই দুঃখ করে বলছে 'সাহেবগণ সাহেবের বিচারভার দেশীয়দিগের হস্তে দিতে কোনমতেই প্রস্তুত হন নাই।' অতএব দেশীয়রা কোট-টুপী পরুক, সাবান মাখুক, বিলেত ঘুরে আসুক--তবু সাহেব হতে পারবে না।[১১৭] সব দেখে শুনে জোরালো বক্তব্য রেখেছিল *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ১৫ জন 'নেটিভ' হত্যার জন্য এক 'ইউরোপীয়ান' এর ৩০ টাকা জরিমানা হয়। তাতে বিস্মিত সম্পাদক স্বদেশবাসীকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন কিভাবে ইংরেজরা স্বজাতির স্বার্থে অসম্ভবকেও সম্ভব করে তোলে। তিনি আরও বলছেন--মুসলমানরা বলছে হিন্দুদের মারা হয়েছে অতএব তারা কেন এগোবে? আর হিন্দুরা ভাবছে উল্টোটি। কবে এদের চৈতন্য হবে--দুই সম্প্রদায় এক হয়ে বদলা নিক, আর এই ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেটের থেকে শিক্ষা নিক তারা দেশপ্রেমের।[১১৮]

এভাবেই বাঙালি জীবনে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব। শাসক-শাসিতর দূরত্ব বৃদ্ধির ছবি আঞ্চলিক পত্রিকা ঘাঁটলেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সরকারি গোপনীয়তা আইন বা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুমোদন নিয়ে চট্টগ্রামের *জ্যোতি* লিখেছিল--সরকার আর দেশীয় জনমতের তোয়াক্কা করে না।[১১৯] *বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী*-র কাছে কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়ায় শক্তিক্ষয় মাত্র।[১২০] তাই এবার ভিক্টোরিয়ান 'Self-help'--*ঢাকা প্রকাশ* বলছে ভিক্ষা করে দেশবাসী কিছুই পায়নি। অতএব সরকারের দিকে না চেয়ে জাতীয় উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাওয়াই উচিত।[১২১] এক পরামর্শ ছিল *বরিশাল হিতৈষী*-রও--তৃষ্ণার্ত পাখির মতো মেঘের দিকে এক ফোঁটা জলের জন্য না তাকিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াও। দেশীয় শিল্পে মনোনিবেশ কর। যারা নিজের দেশবাসীর স্বার্থে ভারতীয়দের শোষণ করে যাবে, সেই ইংরেজের দয়ায় বাঁচার আশা না করাই ভালো।[১২২]

এভাবেই ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে ক্ষোভ তীব্র হয়েছে। সময়টাও ছিল নরমপন্থার শেষের দিক। এই হতাশা আর কার্জনী কাজকারবার সামগ্রিকভাবে দেশবাসীকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। যশোরের *যশোহর* তাই জাতীয় জাগরণের পরোক্ষ কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছিল কার্জনের সরকারকে।[১২৩] এই জাগরণ কালের নিয়মে দেশবাসীকে আরও বৈপ্লবিক করে

তোলে। তারও সাক্ষী আঞ্চলিক সংবাদপত্র। ভারতবাসীর অপমানের চেয়ে বেদনাদায়ক আর কিছু হতে পারে না বা ডয়ার এর হত্যালীলা—এই সব কথা কবিতার মাধ্যমেও *পাবনা বগুড়া হিতৈষী*[১২৪]র মতো কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল, যুব সম্প্রদায়কে উদ্দীপিত করতে। এমন বহু উদাহরণই রয়েছে। এই যুব সম্প্রদায় আর নোয়াখালি, পাবনা, বর্ধমান বা বাঁকুড়ার যুবসমাজ নয়, গোটা দেশের যুবসমাজ, সামনে তখন আর জেলা নয়, দর্পণে ভেসে উঠেছে ভারতবর্ষ। স্বদেশী যুগে যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর এই ১৯০৫ এর অব্যবহিত পরেই জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কলকাতা থেকে মফসসলে 'Shift' করেছিল বলে ম্যাকলেনও লিখেছেন।[১২৫]

REGISTERED NO. C. 211.

নীহার।

সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ।

খাসা ওয়াচ। । বিজয়া বটিকা। । বড় সস্তা। বড় সস্তা। । লোমনাশক পাউডার।

দীর্ঘদিন প্রকাশিত হবার গৌরব অর্জনকারী কাঁথির *নীহার*

চারু মিহির বা *বরিশাল হিতৈষী*-র মত কাগজ আগাগোড়াই বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিল। দ্বিতীয়টির সম্পাদক দুর্গামোহন সেন-এর তো এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডই হয়ে গিয়েছিল। ঢাকার *পূর্ব্ববঙ্গ*, বাগেরহাট-এর *পল্লীচিত্র*, *হাওড়া হিতৈষী* বা *যশোহর* কিংবা *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*--সকলের বিরুদ্ধেই সমন জারি হয়েছিল।[১২৬] এইভাবে কণ্ঠরোধে সরকার খুব লাভবান হয়নি, বরং পত্রিকা পরিচালকেরা নতুন কৌশল অবলম্বনের কথা ভাবতে শুরু করেছিল। ১৯০৬ সালের ৬ মার্চ *নীহার* লিখেছে--

এক্ষণে আমরা বুঝিলাম যে আবেদন নিবেদনে আর কোনও সুফল পাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা। এমন করিয়া কোন জাতি কখন আপনার অধিকার বজায় রাখিতে পারে নাই। এখন আমাদের কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।[১২৭]

এই মিলিত সাধনাই শেষ পর্যন্ত ১৯১১-য় বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা প্রত্যাহারের কারণ হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিক্ষা দপ্তর কেন পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে স্বতন্ত্রীকরণ করত তা নিয়ে ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেনি বাগেরহাট এর *জাগরণ*।[১২৮]

তবে রিপন বা হার্ডিন্‌জ এর মতো 'ভাল ইংরেজ'-এর মিথ তখনও গুঁড়িয়ে যায়নি। ১৯১৫ সালেও 'ভারত প্রেমিক' হার্ডিন্‌জ এর কার্যকালের মেয়াদ একবছর বৃদ্ধির আবেদন নামঞ্জুর হওয়ায় দুঃখ পেয়েছিল *চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ*-র মত অনেক কাগজ।[১২৯] স্বদেশী যুগেও দ্বন্দ্ব ছিল বহু বুদ্ধিজীবীর, যা প্রতিফলিত হয়েছে মফসসলের সংবাদপত্রে। কার্জন যা ভাবছেন তা যখন করবেনই, তখন তাকে না চটিয়ে সাহেবের বিবেকের কাছে আহ্বান জানানোই শ্রেয় বলে মনে করেছিল *পাবনা হিতৈষী*-র[১৩০] মতো কাগজ। কিন্তু উনিশ শতকের 'ব্রিটিশ সিংহ', 'দয়াবতী মহারানি' জাতীয় স্তুতি বহু কাগজ থেকেই অন্তর্হিত হয়েছিল। ১৯২৯ সালে নোয়াখালির *দেশের বাণী*-র কয়েকটি লাইন প্রসঙ্গত মনে আসছে, সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ব্রিটিশ তার শৌর্যের বলে ভারত জয় করেনি, দেশীয়দের দুর্বলতা, বিভেদকামী মানসিকতা, নন্দকুমারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা আর ক্লাইভের চাতুরীই হল ভারতস্থিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি।[১৩১]

নয়

শুধু রাজনীতি নয়, জাতীয় জীবনের নানা বিষয় সম্পর্কে আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকার সচেতন মনের প্রকাশ ঘটেছে। *রাঢ়দীপিকা* দুঃখ পেয়েছিল সরকার রায়তের দাবি উপেক্ষা করায়।[১৩২] আসন্ন জেল সম্মেলনে দেশীয়দের জেল তত্ত্বাবধায়ক পদে নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে বলেছিল *হাওড়া হিতকরী*[১৩৩], আর ভারতের এই ঘোরতর দুর্দিনেও 'বড়লাট তাঁহার অফিস ও কেরানীগুলি লইয়া সিমলা শৈলে গমন করে অহেতুক বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা' ব্যয় করছেন দেখে পীড়িত হয়েছিল *কাণ্ডি*।[১৩৪] তেমনই ১৮৯১-এর জনগণনা প্রতিবেদনে ইংরেজ সরকার যে যথাযথতার দাবি করে তা খারিজ করেছিল ডায়মন্ডহারবার এর *সেবিকা*।[১৩৫]

দেশীয় সংবাদপত্র আইন নিয়ে তো বহু চর্চা চলেছিল। *সাধারণী, ভারত মিহির* থেকে হাওড়ার *বিশ্বদূত* সকলেই এটিকে মশা মারতে কামান দাগার স্বরূপ বলে গণ্য করেছিল।[১৩৬] ওদিকে চিনগামী গবাদি পশুর জন্য ভারতকে পশুখাদ্য সরবরাহ করতে বলায় বিস্মিত *খুলনা* লিখেছে যে, ভারত নিজেই ধুঁকছে, তৃণভূমি শুকিয়ে কাঠ, পশুরা খাদ্যাভাবে মারা যাচ্ছে। এই অবস্থায় এ ধরনের প্রস্তাব এল কীভাবে?[১৩৭] আবার যারা 'ভারতবর্ষের দারিদ্রের কথাটা কানে তুলিতেছে না' তাদেরকে 'স্যর ক্লীগ এর গ্রন্থ' এবং 'Indian Witness' নামক খ্রিস্টান মিশনারিদের মুখপত্র উদ্ধৃত করে সে বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করেছে *বীরভূম-বার্ত্তা*।[১৩৮] পাশাপাশি ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের দিকে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আর 'এ দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি সেইরূপ দৃষ্টি নাই' বলে *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* দুঃখ করেছিল।[১৩৯]

দেশজ চিকিৎসার প্রতি এই শ্রদ্ধা তো স্বদেশীয়ানাই। না হলে আর শ্রীহট্ট শহরে আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় স্থাপনে *শ্রীহট্ট দর্পণ* আহ্লাদিতই বা হতে যাবে কেন?[১৪০]

অঞ্চল নয়, দেশ সম্পর্কে এই সচেতনতার ধারা অব্যাহত ছিল স্বাধীনতার প্রাক্কালেও। যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা তখন দেশকে কলুষিত করেছিল, বিশেষত পূর্ববঙ্গকে, সে সম্পর্কে হিন্দু ভাবাবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে *বীরভূম বার্ত্তা* লিখেছিল লুণ্ঠন, হত্যা, নারী নিগ্রহ--ত্রিপুরা, ঢাকা বা নোয়াখালিতে যে বীভৎস নির্যাতন চলছে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। এর অবসান ঘটাতে হলে 'ভারতের হিন্দুদিগকে সেই নির্য্যাতীতের অসহনীয় আকুল ক্রন্দনে অবিলম্বে সাড়া দিতে হইবে...'।[১৪১]

দশ

এই সন্দর্ভটি লিখবার আগে কয়েকটি প্রশ্ন বারবার ঘুরেফিরে এসেছিল। আঞ্চলিক পত্রিকাগুলোর দায়বদ্ধতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। অঞ্চলের পাশাপাশি গোটা দেশের বা বৃহত্তর সমাজের কথাও তারা সঠিকভাবে তুলেছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'বিধবা বিবাহ' থেকে জাতিবৈর--সব বিষয়েই তারা কথা বলেছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল খবরের বিষয়বস্তু হিসাবে এরা কোনগুলোকে প্রাধান্য দিতেন বা আদর্শ সাংবাদিকতার সংজ্ঞাই বা তাদের কাছে কেমন ছিল, কেমন ছিল পত্রিকাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক, কতটা নির্ভীক ছিলেন সম্পাদকরা আর চলতই বা কীভাবে? সূত্র বেশি ঘাঁটবার সুযোগ না মেলায়, আমার কাছে এর উত্তরও সংক্ষিপ্ত।

সাংবাদিকতা বিষয়ে তাঁদের ধ্যানধারণা বিষয়ে যা দু'একটি তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা নিশ্চিতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এ বিষয়ে প্রথমে ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত *সাধারণী*-র[১৪২] একটি লেখার উল্লেখ করা যাক। বলছে, কিছু কাগজ সরকারের নিন্দা ও অপযশ প্রচার করে জনপ্রিয় হচ্ছে। সরকারের কাজ যে সমালোচ্য নয় তা বলা হচ্ছে না। বরং তা নিয়ে যত বাদানুবাদ হয় ততই ভালো। কারণ--

> সম্বাদপত্র সকল সাধারণের মুখস্বরূপ এবং গবর্ণমেন্টের ক্রিয়াকলাপের ফলাফল সাধারণকেই ভোগ করিতে হয়। এমন অবস্থায় যদি সম্বাদপত্র সকল উভয়ের মধ্যস্থ হইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দেন তাহা হইলে উভয়েই উপকৃত হয়েন এবং তাঁহাদিগেরও যাহা কর্ত্তব্য তাহা সুসিদ্ধ হয়। কিন্তু এরূপ কর্ম্ম কয়খানি সম্বাদপত্র দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে?

ধূমকেতু-র বক্তব্য ছিল আরও চমৎকার। বলছে বাংলায় খবরের কাগজের সংখ্যা কম নেই। কিন্তু মনে হচ্ছে কিছু কাগজ উদ্দেশ্যচ্যুত হচ্ছে--'ময়মনসিংহে একটি গাভীর তিনটি কান হইয়াছে, বা ইংরাজ ভারতের সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বনাশ করিল লিখিলে সংবাদপত্র লেখা হইল না।' পরের অংশ পড়ে সত্যিই অবাক হতে হয়। বলছে--

> বিচক্ষণ বহুদর্শী প্রাপ্ত বয়স্ক লোক ভিন্ন সম্পাদকের ভার বহন করিতে আর কেহ সমর্থ নহে ; যিনি পরের দুঃখে কাঁদিতে জানেন, দেশের জন্য পাগল, জাতি বিচারে পক্ষপাতশূন্য, তিনিই সংবাদপত্র সম্পাদকের সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র...বয়সের বিজ্ঞতা না থাকিলে, সংবাদপত্রখানি প্রবলবেগে অগ্নু্যদ্গীরণ করিয়াই নিভিয়া যায়।...

সহযোগী একবার দেশীয় সম্পাদকদের সম্পাদকীয় কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত বলায় তুলোধোনা করেছিল *ধূমকেতু*। বলছে নেটিব বলিয়াই যত অপরাধ, আর সর্ব্ব দোষ হরে গোরা।[১৪৩]

দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া 'পত্রিকা-ওয়ালা'দের পারস্পরিক সম্পর্কও খারাপ ছিল না। 'সিনিয়র'রা উৎসাহ দিত 'জুনিয়র'দের। পাশাপাশি অন্যের দুর্দিনে তারা কষ্টও পেয়েছে। *হালিসহর পত্রিকা* উঠে যাচ্ছে শুনে দুঃখ পেয়েছিল রানাঘাটের *গ্রামবাসী*।[১৪৪] *এডুকেশন গেজেট* ও *সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ* লিখেছিল (৭ অগস্ট, ১৮৫৭)।

> উপনগর বা ভদ্রগ্রাম বিশেষের অবস্থা বিবৃত পত্রিকা বা পুস্তিকা যত প্রচার হয় ততই আহ্লাদের বিষয়, যেহেতু তদ্দারা গ্রাম্যগণের অবস্থা সংশোধনের বিশেষ উপযোগিতা হয়, অতএব উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা উন্নতিপথারূঢ় হয়েন ইহা প্রার্থনীয় বটে।'[১৪৫]

বৈদ্যবাটী থেকে *পল্লীগ্রাম বার্ত্তাবহ* বেরনোর খবরে *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* লিখেছিল--

> পল্লীগ্রামের অবস্থা ও সংবাদ প্রকাশ করাই পল্লীগ্রাম বার্ত্তাবহের প্রধানোদ্দেশ্য।...নগরের বার্ত্তা প্রকাশ করে এরূপ সংবাদপত্র অনেক আছে। পল্লীগ্রামের মঙ্গলার্থ যত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ততই তাহার হিতসাধক হইবে।[১৪৬]

অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ থেকে *মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি* আর *প্রতিকার* প্রকাশের খবর পেয়ে *সাধারণী* বলেছে--

> আমরা ভরসা করি, এই বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয় পূর্ব্ববর্ত্তী অগ্রজগণ অপেক্ষা চিরজীবী হইবেন এবং কখন কোনরূপ গৃহবিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য দৃঢ় ব্রতে পালন করিবেন।[১৪৭]

শুধু গদ্যে নয়, কোন পত্রিকার প্রকাশ রহিত হলে অন্য পত্রিকা কবিতা আকারেও আপশোশ করেছিল। *প্রজাবন্ধু*-রই একটি কবিতা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে--

> হলো কি গো অস্তমিত ভারত-মিহির
> চারুবার্ত্তা নাহি বার্ত্তা হইনু অস্থির[১৪৮]

সুতরাং সমমর্মিতা বোধ নিয়ে কোন সংশয়ই নেই।

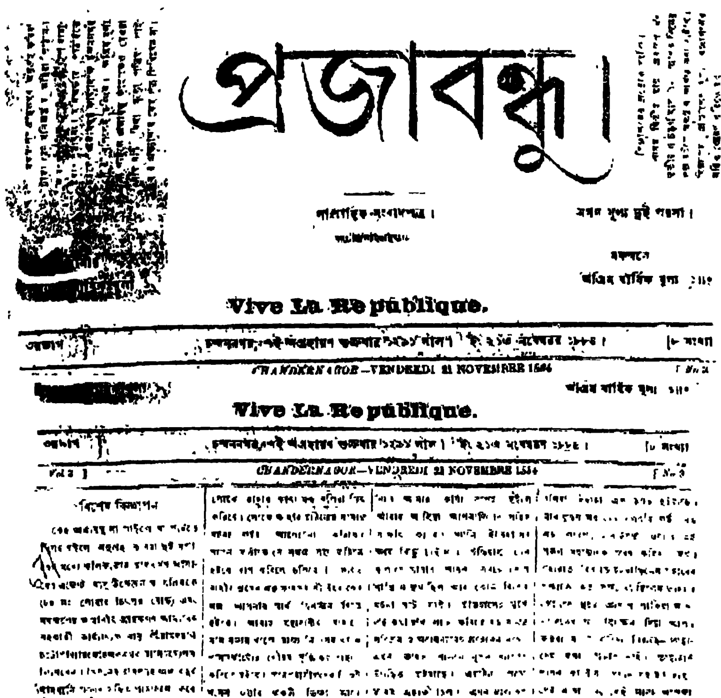
সম্পাদকের নির্ভীকতা আর সততার সপক্ষে ঝুড়ি ঝুড়ি প্রমাণ আছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ভুল মৃত্যু-সংবাদ ছাপানোয় এবং তার জন্য সমালোচিত হওয়ায় *মুর্শিদাবাদ পত্রিকা*-র 'বশম্বদ সম্পাদক' মশাই ক্ষমা চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*-য়।[১৪৯] মানিকগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্যামচাঁদ নাথকে ঘুষখোর না বলা সত্ত্বেও জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট অন্যায়ভাবে *ঢাকা প্রকাশ*-এর থেকে ১০০ টাকা জরিমানা ধার্য করেছিল। *সোমপ্রকাশ* লিখেছিল এতে 'ঢাকা প্রকাশ কোনরূপে যেন ভগ্নোৎসাহ না হন'।[১৫০] এই সততার জন্যই *ঢাকা প্রকাশ*-কে বহুবার লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল--

> ইহার মধ্যে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির তদানীন্তন সাহেব সেক্রেটারী মিঃ সার্গিস, ঢাকা সহরের প্রধান ধনী রূপলাল দাস এবং সাহিন মেডিক্যাল হলের স্বত্বাধিকারী কর্ত্তৃক আনীত তিনটী মানহানির মোকদ্দমাই প্রধান।

নোয়াখালি আদালতেও *ঢাকা প্রকাশ*-এর বিরুদ্ধে একটি 'লাইবেল মোকদ্দমা'র খবর পাওয়া গিয়েছে।[১৫১] এই সমস্ত আঘাতই সে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল। পাঠকদের সমর্থনও হয়ত তার একটি বড় কারণ। আধারবাড়ির জনৈক কালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী কাগজে লিখেছিলেন--

> পূর্ব্বঙ্গের একমাত্র প্রাচীন সংবাদপত্র ঢাকা প্রকাশ ভগবানের আশীর্ব্বাদে আগামী বৈশাখ মাসে সপ্ততিবর্ষে পদার্পণ করিবে।...এই দীর্ঘকালের মধ্যে কত বাঙ্গালা সংবাদপত্র, জন্মিল প্রতিষ্ঠা

লাভ করিল--আবার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল, তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ সহজ নহে—কিন্তু ঢাকা প্রকাশ তাহার সেই সনাতন রূপটি লইয়া আজিও বেশ বাঁচিয়া রহিয়াছে। আশাকরি ভগবান্ ইহার আরও দীর্ঘজীবন বিধান করিয়া দেশবাসীকে ধন্য করিবেন।[১৫২]



প্রজাবন্ধু।

Vive La Republique.

Vive La Republique.

দেশীয় স্বার্থরক্ষায় তৎপর আঞ্চলিক পত্রিকা *প্রজাবন্ধু*

নির্ভীকতার দণ্ডও সম্পাদকদের কম দিতে হয়নি। ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত বীরভূমের *দিবাকর* বা বাংলাদেশের *দৈনিক জ্যোতি*-র মত অনেকেরই কয়েক বছরের মধ্যে রাজরোষে মৃত্যু হয়েছিল।[১৫৩] আবার মেদিনীপুরের *মেদিনী* সম্পাদক ব্রাহ্ম অখিলচন্দ্র দত্ত এত নির্ভীকতার সঙ্গে সংবাদপত্র সম্পাদনা করতেন যে 'তাঁহার ভয়ে মেদিনীপুরের ইংরাজ ও বাঙ্গালী গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীরা জড়সড় হইয়াছিলেন'।[১৫৪] কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করায় তাঁর নামে অভিযোগ আসে। নিম্ন আদালত থেকে ৩৫০ টাকা জরিমানা ও ৬ সপ্তাহের কারাবাস এর আদেশ হয়। তবে *প্রজাবন্ধু* আহ্লাদিত হয়েছে কারণ আপীলে জজ সাহেব 'তাঁহাকে খালাস দিয়াছেন'।[১৫৫]

তবে পরস্পরের সম্পর্ক কখনও খারাপও হয়েছে। স্বাস্থ্যকর মত-পার্থক্যর পাশাপাশি কটু বাক্য বিনিময়ও হয়েছিল। পটুয়াখালির ঘটনায় অনুবাদকের বর্ণনানুযায়ী *হিতবাদী* সম্পাদক

জেলাশাসক ওয়েস্টন সাহেবকে Stupid বলায় *বরিশাল হিতৈষী* তার কারণ খুঁজে পায়নি।[১৫৬] আবার *শিলচর* পত্রিকাটি সম্পর্কে প্রেরিত পত্র উদ্ধৃত করে *শ্রীহট্ট-দর্পণ* বলেছিল--

> শীলচর ভাগিনেয় মাতুল শ্রীহট্ট দর্পণের উপর এত রাগ করিয়াছেন কেন? মাতুল যে গুরুজন তাহা কি ভাগিনার জ্ঞান নাই। কাণ্ডজ্ঞান বিহীন, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম বিচার রহিত, নাস্তিক ভাগিনেয়গুলীর আচরণ এই প্রকারই।'[১৫৭]

ঢাকা প্রকাশ-এ প্রায়শই এ ধরনের মন্তব্য লক্ষ করা গিয়েছে।

বৰ্দ্ধমান চন্দ্ৰোদয় একবার বোধহয় বন্ধ হয়েছিল। পরে তা আবার চালু হলে *সংবাদ প্রভাকর* লিখেছিল--'বোধহয় চন্দ্র রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া এক্ষণাবধি আমারদের প্রতি পীযূষময় বিমল কিরণ বিতরণে আর বিরত হইবেন না।' শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত *সংবাদ শশধর*-কে যশোধর হউন,[১৫৮] বলতেও প্রভাকর পিছপা হয়নি। তবে *ঢাকা প্রকাশ* নতুন পত্রিকাকে বোধহয় অনেক সময়ই এরকম সুনজরে দেখেনি। অনেক সময়ই তার মধ্যে দাম্ভিকতাপূর্ণ একটি অবয়ব ধরা পড়েছিল। ১৮৮৬ সালে যখন ঢাকার *গরীব* প্রকাশিত হয় তখন সে লিখেছে--

> ঢাকা প্রকাশের বয়সে ঢাকায় অনেক সংবাদপত্র হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকই বিলয় পাইয়াছে, তাহাতেই আমাদের আশঙ্কা হয় গরীব বেচারা এ দুর্দিনে টিকে কিনা?

আবার বরিশালের *পরিমল বাহিনী* সাময়িক পত্রটি (১৮৭২ সালে) তার কাছে মনে হয়েছে--

> অপরিণত বুদ্ধি আধুনিক যুবকদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা লেখার যে একটি অপ্রতিকার্য্য রোগ জন্মিয়াছে এখানি তাহার অন্যতর নিদর্শন স্বরূপ।'[১৫৯]

এই *ঢাকা প্রকাশ*-ই এক সম্পাদককে ছাঁটাই করেছিল কারণ--

> পূৰ্ব্বতন সম্পাদক তত্রত্য দেশহিতৈষিণী সভার যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন। তাহাতে তত্রত্য নব্য সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তির অসারবৎ ব্যবহারের বিষয় লিখিত হইয়াছিল।

সোমপ্রকাশ এটিকে *ঢাকা প্রকাশ* কর্তৃপক্ষের কাপুরুষোচিত ব্যবহার বলেই মনে করেছিল।[১৬০]

ব্যাপক আর্থিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছিল এই সব আঞ্চলিক সংবাদপত্রগুলোকে। *শ্রীহট্ট-দর্পণ*-এর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ছিল--

> দেশের একমাত্র ভরসাস্থল জমিদার মহোদয়গণ অথবা ধনাঢ্য ব্যক্তি দেশের উপকার জন্য সাহায্য না করিলে মফস্বলে সম্বাদপত্র পরিচালনা সুকঠিন।[১৬১]

কোনো কোনো গ্রাহক এই সমস্যা অনুধাবনও করেছিল। ১৮৪৮ সালে *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* সম্পাদককে লেখা এক চিঠিতেই পত্রপ্রেরক বলছেন--

> জানিবেন যে সৰ্ব্বাংশেই আপনি টহলদার বৈরাগির সমান অবস্থাতে পতিত হইয়াছেন, অর্থাৎ তাহারা যেমন বাড়ী বাড়ী টহল দিয়া মরে, অথচ দক্ষিণা আদায় করার সময় নানা জনের কথা শুনিতে হয়। বার্ত্তাবহের মূল্য আদায় করিতে প্রবর্ত্ত হইলে মহাশয়কেও সেই রূপ দুরবস্থায় পতিত হইতে হইবে...।[১৬২]

সবচেয়ে করুণ সুরে বলেছিলেন কাঙাল হরিনাথ--

> আমি লেখক, আমিই সম্পাদক, আমিই পত্রিকা লেফাপা ও বিলিকারক এবং আমিই মূল্য আদায়কারী অর্থসংগ্রাহক। আবার আমিই আমার স্ত্রী পুত্রাদি সংসারের সংসারী। দীনজনের দীনতার দিন এই ভাবে দিন দিন গত হইতেছে।

শেষঅবধি ১২০০ টাকা ঋণ হয় তাঁর। ওদিকে বয়সও বাড়ে, 'অতএব গ্রামবার্ত্তার কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলাম।'[১৬৩] এভাবেই লোকসান হওয়ায় *গরীব* সম্পাদক ৩০০ টাকায় কাগজ বিক্রী করেছিলেন *ঢাকা প্রকাশ*-এর কর্মচারী বরদাশংকরের কাছে।[১৬৪] এভাবেই বহু স্বপ্নের মৃত্যু হয়েছিল।

বর্তমান কালে দাঁড়িয়ে এইসব পত্র-পত্রিকাগুলোর মান নিয়ে বহু প্রশ্ন থাকতেই পারে। কিন্তু বুঝতে হবে তাদের পরিবেশকে, জানতে হবে সময়কে। ছোটো খাটো এলাকায় অর্থনৈতিক সমস্যার পাশাপাশি আরও প্রচুর সমস্যা ছিল। ছাপাখানাও সর্বত্র উচ্চমানের ছিল না। কিন্তু যতটুকু যা ছিল তা দিয়েই হরিনাথের মত লোকেরা তাদের 'সাধ' পূরণ করেছেন। এ সাধ হল দেশসেবার বাসনা। তাই দারিদ্র্য উপেক্ষা করেই তাঁরা লড়ে গিয়েছিলেন। মানুষকে নানা বিষয়ে ওয়াকিবহাল করার পাশাপাশি 'নিলামী ইস্তাহার' এর মত বহু 'Item' ছাপিয়ে তাঁরা কাজের কাজও করেছিলেন। এই অবদান পাঠককুল ভোলেনি। মনে পড়ে ১৯০৪ সালে কলাবেড়িয়া স্কুলের শিক্ষক হরেকৃষ্ণ দাস অধিকারী লিখেছিলেন--ইস্তাহার *নীহার*-এ ছাপা শুরু হওয়ার আগে কোনো কোনো ডিক্রিদার নিলামী ইস্তাহার গোপন করে সমস্ত সম্পত্তি নিলাম করে নিত--

> এখন নীহারে তাহা প্রকাশিত হওয়ায় দেনীগণ উপযুক্ত সময়ে তাহা জানিতে পারিয়া যে কোন উপায়ে তাহা প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক সম্পত্তি রক্ষা করে।[১৬৫]

যাইহোক, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এই সব খবরের কাগজ চালিয়ে যাওয়া যে কত দুরূহ তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে এই *নীহার*-ই পত্রিকার ৪১তম জন্মদিনে লিখেছিল--

> আজ একচল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতায় এইটুকু বুঝতে পেরেছে নীহার, যে পরাধীন দেশে, কোনও ক্ষুদ্র জনপদের এক ক্ষুদ্রতম সংবাদপত্রের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে যথার্থ দেশসেবা করা একান্ত অসম্ভব।...পরাধীন জাতির এ দুর্ভোগ, সহ্য করেও নীহার আজ তার জন্মদিনে, সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের আশীর্বাদ চাইছে এবং সহৃদয় গ্রাহক লেখক ও পৃষ্ঠপোষকবর্গের অনুগ্রহ লাভের আবেদন জানিয়ে, সকলকে তার অকপট শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।[১৬৬]

একথা *নীহার*-এর একার নয়, সকলের--

'গ্রাহকদিগের অনাবধানতায়' নিজের কাগজটির 'বিঘ্নোপস্থিত' হলে তীব্র জ্বালায় আর ঘৃণায় তাই কাঙাল হরিনাথও লিখেছিলেন--'ধন্য আমাদিগের দেশ / ধন্য আমাদিগের 'নেব দেব না' প্রবৃত্তি।'[১৬৭] কান পাতলে এইরকম চাপা আর্তনাদ অনেকই শোনা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র

১. মুনতাসীর মামুন, *বাংলা সংবাদপত্র-দায়বদ্ধতা*, স্বপন বসু, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত, *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৪১৩-১৫

২. Uma Dasgupta. *Rise of an Indian Public, Impact of official policy,* 1870-1880, Calcutta, 1977, p. 13

৩. *Nineteenth Century Bengal, Aspects of social history,* Calcutta, 1965, p. 80

৪. C. A. Bayly, *Rulers, Townsmen and Bazaars, North Indian Society in the age of British expansion,* 1770-1870, OUP, New Delhi, 2000, p. 467

৫. বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা,* ১৮০০-১৯০০, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ১৭৫

৬. *লোকরহস্য, বঙ্কিম রচনাবলী*, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, কলকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১

৭. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ব বাংলার সংবাদ-সাময়িকপত্র* ১৮৪৭-১৯০৫, প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ ১৩৭ (এরপর কেবল *সংবাদ সাময়িকপত্র* নামে উল্লেখ করা হবে), *রঙ্গপুর বার্তাবহ* (১৮৪৮-১৮৫১), ড রতনলাল চক্রবর্তী, সুশান্তসিংহ খাঁ সম্পাদিত, কলকাতা, ২০০১, পৃ. Vii (এরপর কেবল *রঙ্গপুর বার্তাবহ* নামে উল্লেখ থাকবে)

৮. *সংবাদ-সাময়িকপত্র* (প্রাগুক্ত), পৃ. ৪৪

৯. তদেব, পৃ. ৬৫

১০. তদেব, পৃ. ৫৭

১১. তদেব, পৃ. ৫৬-৫৭

১২. তদেব, পৃ. ১৩৭

১৩. তদেব, পৃ. ১৩৯

১৪. তদেব, পৃ. ৫৯

১৫. তদেব, পৃ. ১৩৭

১৬. Bernard S. Cohn, *An Anthropologist among the Historians and Other Essays*, OUP, New Delhi, 1987, 3rd impression, 1994, p. 127, Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (translated and edited), *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*, London, 1971, pp. 6-7

১৭. Quoted from *Proceedings of the Home (Public) Deptt*, August, 1879, pt B. No. 330) in Uma Dasgupta, op. cit. p. 37

১৮. ড. স্বপন বসু, *উনিশ শতকের আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকা*, তুষারকান্তি ঘোষ সম্পাদিত *রবিবাসর* (বার্ষিক সংখ্যা-৩৬, ১৪১১ বঙ্গাব্দ) কলকাতা, পৃ. ৮০

১৯. তদেব

২০. ১ পর্ব্ব, ২য় খণ্ড, ১২৮১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৮

২১. আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথা (তৃতীয় স্তবক), বিপিনবিহারী গুপ্ত, *পুরাতন প্রসঙ্গ*, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ২৭৬

২২. Uma Dasgupta, op. cit., p. 272

২৩. মেহ্‌রাব আলী, *দিনাজপুরে সাংবাদিকতার একশ বছর*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২৩ ও ২৫

২৪. *দিনাজপুর পত্রিকা*, কার্তিক, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪

২৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক পত্র*, ১৮১৮-১৮৬৭ প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২৭-১২৮, (এরপর *প্রথম খণ্ড*, নামে উল্লেখ করা হবে)

২৬. নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, *'গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী' কাঙাল হরিনাথ মজুমদার ও তাঁর 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা': কিছু প্রসঙ্গ*, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত *ইতিহাস অনুসন্ধান*--১১, গ্রন্থে, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫৮

২৭. তদেব

২৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রথম খণ্ড*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ৩২৪

২৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িকপত্র* ১২৭৫ (ইং ১৮৬৮)-১৩০৭ (ইং. ১৯০০), *দ্বিতীয় খণ্ড*, কোলকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৮ (এরপর *দ্বিতীয়* খণ্ড) নামে উল্লেখ করা হবে)

৩০. বৈশাখ, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২-৩

৩১. বৈশাখ, পৃ. ২
৩২. সুধীরকুমার মিত্র, *হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় মিত্রাণী সংস্করণ, কলকাতা ১৯৭৫, পৃ. ৫১৩
৩৩. ২৫শে আষাঢ়, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১
৩৪. ডঃ স্বপন বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
৩৫. সূচনাভাগ
৩৬. মাঘ, পৃ. ৪-৬, বৈশাখ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫৬, শ্রাবণ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬৭
৩৭. সুধীরকুমার মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৩-১৪
৩৮. *বীরভূম-বার্তা*, ৯ মার্চ, ১৯১৮
৩৯. ১ ডিসেম্বর, ১৮৯২, পৃ. ৪
৪০. ২২ মার্চ, পৃ. ১
৪১. *সংবাদ-সাময়িকপত্র* (প্রাগুক্ত), পৃ. ৫৬
৪২. সুধীরকুমার মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০
৪৩. তদেব, পৃ. ৫১৫
৪৪. ১২৬৩ বঙ্গাব্দের ১৫ চৈত্র, ১২৬৪ বঙ্গাব্দের ৩১ বৈশাখ, ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৫ ও ৩১ আষাঢ় ও ১৫ শ্রাবণ (*উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা*), ১২ নভেম্বর ও ৩ ডিসেম্বর ১৮৮২ ও ২৯ মে, ১৮৮৩ (*প্রজাবন্ধু*) এবং ৮ম ও ১০ম ভাগ (*পল্লীবিজ্ঞান*)
৪৫. অগ্রহায়ণ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬১
৪৬. বৈশাখ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫৭
৪৭. আষাঢ়, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩২
৪৮. *সংবাদ-সাময়িকপত্র* (প্রাগুক্ত), পৃ. ১২০
৪৯. কালীপ্রসন্ন সিংহ *হুতোম প্যাঁচার নক্সা*, ১৮৬২, বসুমতী সংস্করণ (প্রকাশকাল অনুল্লেখিত), পৃ. ৮১
৫০. আষাঢ়, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১৮-১৯
৫১. জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮৭-৮৮
৫২. *রত্নাকর*, ২৩ এপ্রিল, ১৯০৪, *Report on Native Newspapers* (hereafter *R.N.P.*), Week ending, 30th April, 1904
৫৩. R. N. P., Week ending, 7th July, 1900
৫৪. *সাধারণী*, ২২ মার্চ, ১৮৭৪, পৃ. ২৬০
৫৫. ৪ জুলাই, R. N. P., Week ending 14th July, 1900
৫৬ ২৫ নভেম্বর, ১৮৬৯, পৃ. ১-২
৫৭. ২৬ জুন, R. N. P., Week ending 7th July, 1900
৫৮. ৫ জুলাই, R. N. P., Week ending 14th July, 1900
৫৯. ২৫ মার্চ, R. N. P., Week ending 8th April, 1905
৬০. R. N. P., 1892, p. 692
৬১. তদেব, পৃ. ৭৩৮
৬২. Sharif Uddin Ahmed, *Dacca : Study in Urban History & Development.*, London, 1968, p. 174
৬৩. ২৪ মার্চ, ১৮৭০, পৃ. ২

৬৪. ১১ মার্চ, R. N. P., Week ending, 17th March, 1894
৬৫. *মানভূম,* ২৪ জুলাই, *চারুমিহির* ৩ জুলাই, R. N. P., Week ending, 4th August and 14th July, 1900
৬৬. ২৩ সেপ্টেম্বর, R. N. P., Week ending, 30th September, 1899
৬৭. জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৪
৬৮. ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪, পৃ. ১-২, ১২ মে, ১৯৩৪, পৃ. ৬
৬৯. Sharif Uddin Ahmed, op.cit., p. 207
৭০. শ্রাবণ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫
৭১. ৭ ডিসেম্বর, ১৮৭৩, পৃ. ৮৩
৭২. ১৪ মে, R. N. P., Week ending 20th May, 1893
৭৩. *Proceedings of the Municipal (Municipal) Deptt.*, December, 1901, No. B. 319, File No.- M-3S-5- *Insanitary condition of Bankura – Extract* from R. N. P., W.B. State Archives.
৭৪. ৪ জুন (পৃ. ৫৮) ও ৯ জুলাই (পৃ. ৯৭), ১৮৭৬
৭৫. *সংবাদ প্রভাকর,* ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯২, পৃ. ২ ও ১৯ অগাস্ট, ১৮৯২, পৃ. ২
৭৬. ২৮ ডিসেম্বর, ১৮৮৯, R. N. P., Week ending 4th January, 1890
৭৭. ৮ জুলাই, R. N. P., Week ending 14th July, 1900
৭৮. John Mcguire, *The Making of a colonial Mind, A quantitative Study of the Bhadralok in Calcutta,* 1857-1885, Australian National University Monographs on South Asia, No. 10, 1983, p. 61
৭৯. *কান্তি* পঞ্চম সংখ্যা, ১৮৯৭, *বাঁকুড়া দর্পণ,* ৭ জুলাই ১৯০৭, *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা,* ১১ জুন, ১৮৭৬, *রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ,* ৩১ ডিসেম্বর, ১৮৬৮
৮০. Hiren Gohain, *The Idea of Popular Culture in the Early Nineteenth Century Bengal,* Calcutta, 1991, p. 24
৮১. Geoffrey Oddie, *The Western-educated elites and popular Religion : The Debate over the Hook-Swinging issue in Bengal and Madras,* c 1830-1894 in Peter Robb (ed.), *Society and Ideology, Essays in South Asian History,* O. U. P, Delhi, Bombay etc., 1993, p. 178
৮২. *সাধারণী,* ১৩ জুন, ১৮৭৫, পৃ. ১০৬
৮৩. *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ,* ১৬ জুলাই, ১৮৫০, পৃ. ১৬৪-১৬৫
৮৪. ভাদ্র, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯
৮৫. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র* (১৮৪৭-১৯০৫), নবম খণ্ড, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৪৭
৮৬. *কাশীপুর নিবাসী,* ১৮ জুলাই, *ত্রিপুরা হিতৈষী,* ১৭ জুলাই, R. N. P., Week ending 28th and 21st July, 1900
৮৭. ১৭ অক্টোবর, ১৮৪৮, পৃ. Viii
৮৮. মুনতাসীর মামুন, পূর্বোক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত ড. স্বপন বসুর মন্তব্য, পৃ. ৪২৮
৮৯. *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ,* ১২ জুন, ১৮৪৯, পৃ. ৯৫-৯৬
৯০. মহিউদ্দিন শীরু, *সিলেটের শতবর্ষের সাংবাদিকতা,* সিলেট, ১৯৯৮, পৃ. ২৭-২৮
৯১. শ্রাবণ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬, ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৭

৯২. ৮ জুলাই, ১৯০৭, পৃ. ৬

৯৩. ২৬ নভেম্বর, পৃ. ৪, ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৯, পৃ. ৩ ও মুনতাসীর মামুন পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ৪৩০

৯৪ ১৩ অক্টোবর, ১৯০৫, পৃ. ২

৯৫. Rochona Majumdar. *Snehalata's Death : Dowry and Women's agency in Colonial Bengal* in *The Indian Economic and Social History Review*, October-December 2001, p. 461

৯৬ [illegible] জুন, ১৯০৪ [illegible] ২

৯৭. *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* [illegible] জুন, ১৮৪৮, পৃ. ২১৮

৯৮. *সাধারণী*, ১৬ নভেম্বর, ১৮৭৩, পৃ. ৪৬

৯৯ বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

১০০ [illegible]

১০১ [illegible] সেপ্টেম্বর, R. N. P. Week ending 19th September, 1914

১০২. ১ মে, R. N. P., Week ending 10th May, 1919

১০৩. পৌষ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৭

১০৪. *উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা*, ১৫ শ্রাবণ, ১২৬৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২০৯

১০৫ মাঘ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ ৯৮

১০৬. ১৫ মে, R. N. P. of 29th May, 1915

১০৭. ৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৯, পৃ ২৪

১০৮. ১১ জুন, ১৮৭৬, পৃ. ৬৭

১০৯ ২৯ মার্চ, R. N. P., Week ending 9th April, 1904

১১০ *সংবাদ-সাময়িকপত্র* (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৩৩

১১১. *সাধারণী*, ৮ জুন, ১৮৭৪, পৃ. ৮৫

১১২. ১ ডিসেম্বর, ১৮৯২, পৃ. ২

১১৩. ২৯ জুলাই, ১৮৮৭, পৃ. ২

১১৪. ১২ সেপ্টেম্বর, R. N. P., Week ending 22nd September, 1900

১১৫. ১৬ ফেব্রুয়ারি, R. N. P., Week ending 24th February, 1877

১১৬. ৯ ফেব্রুয়ারি, R. N. P., Week ending 17th February, 1877

১১৭. ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩

১১৮. ১৩ জুলাই, R. N. P., Week ending 28th July, 1900

১১৯ R. N. P., Week ending. 2nd April 1900

১২০ ২৯ মার্চ, R. N. P., Week ending 9th April, 1904

১২১. ২৭ মার্চ, R. N. P., Week ending 2nd April, 1904

১২২. ৯ এপ্রিল, R. N. P., Week ending 23rd April, 1904

১২৩. ১২ মে, R. N. P., Week ending 20th May, 1905

১২৪. ১৩ ফেব্রুয়ারি, R. N. P., Week ending, 2nd March, 1929

১২৫. John R. Mclane. *Calcutta and the Mofussilization of Bengali Politics* in Richard L. Park (ed.) *Urban Bengal*, Asian Studies Center, Michigan State University. South Asian Series Occasional Paper No. 12 August, 1969, p. 63

১২৬. Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal*, 1903-1908, New Delhi, 1973, Reprinted edition 1977, pp. 262-263
১২৭. ৬ মার্চ, ১৯০৬, পৃ. ২
১২৮. ১৬ অগস্ট, R. N. P., Week ending 29th August, 1914
১২৯. ২৩ মে, R. N. P., Week ending 29th May, 1915
১৩০. ১৫ মার্চ, R. N. P., Week ending 25th March, 1905
১৩১. ১৯ ফেব্রুয়ারি, R. N. P., Week ending 2nd March
১৩২. ১৩ এপ্রিল, R. N. P., Week ending 23rd April, 1921
১৩৩. ৮ ফেব্রুয়ারি, R. N. P., Week ending 3rd March, 1877
১৩৪. ১ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৮৯৭, পৃ. ৮০
১৩৫. জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, R. N. P., Week ending 21st July, 1900
১৩৬. Uma Dasgupta, op.cit., pp. 281-282
১৩৭. ১২ জুলাই, R. N. P., Week ending 21st July, 1900
১৩৮. ১ ডিসেম্বর, ১৯১৯
১৩৯. ৫ মে, ১৮৭৭, পৃ. ২৭
১৪০. জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪০
১৪১. ২১ অক্টোবর ,১৯৪৬
১৪২. ১১ জানুয়ারি, ১৮৭৪, পৃ. ১৩৮
১৪৩. ২৯ জুলাই, ১৮৮৭, পৃ. ১
১৪৪. *সাধারণী* ২০ ডিসেম্বর, ১৮৭৪, পৃ. ৯৩
১৪৫ সুধীরকুমার মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৩
১৪৬. তদেব, পৃ. ৫৩৫
১৪৭. ৯ এপ্রিল, ১৮৭৬, পৃ. ২৮৫
১৪৮. ২১ নভেম্বর, ১৮৮৪, পৃ. ৩০
১৪৯. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*, ২৬ মে, ১৮৭৭, পৃ. ৫৪
১৫০ ৯ মার্চ, ১৮৬৩, পৃ. ২২২
১৫১. *ঢাকা প্রকাশ*, ৭০ ভাগ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৭, *সাধারণী*, ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৬
১৫২. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, প্রথম সংখ্যা (প্রাগুক্ত), পৃ. ৪০
১৫৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দ্বিতীয় খণ্ড* (প্রাগুক্ত), পৃ. ২৭, কাজী জাফরুল ইসলাম, *ব্রিটিশ যুগে বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাময়িকী*, ১৮৪৭-১৯৪৭, ঢাকা, ২০০১, পৃ ১০৩-১০৪
১৫৪. রাজনারায়ণ বসুর *আত্মচরিত*, ১৯০৯, হরিহর শেঠ সম্পাদিত সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৫২, পৃ [illegible]
১৫৫. ১২ নভেম্বর, ১৮৮২, পৃ. ৪৯
১৫৬. ৪ জুলাই, R. N. P., Week ending 14th July 1900
১৫৭. ভাদ্র, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯
১৫৮ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রথম খণ্ড*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৭০, *সংবাদ প্রভাকর*, ৭ জুলাই ১৮৫২, পৃ ৩
১৫৯. *সংবাদ-সাময়িকপত্র* (প্রাগুক্ত), পৃ. ৬১ ও ৭৫
১৬০. ২৪ নভেম্বর, ১৮৬২, পৃ. ১৯

১৬১. ভাদ্র, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৮
১৬২. *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ,* ২৭ নভেম্বর, ১৮৪৮, পৃ. ২২৩
১৬৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ),* সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৩৫ নং), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৫০, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮ ও ২২
১৬৪. *সংবাদ-সাময়িকপত্র* (প্রাগুক্ত), পৃ. ৬১
১৬৫. ২ অগাস্ট, ১৯০৪, পৃ. ২
১৬৬. ১৮ অগাস্ট, ১৯৪২, পৃ. ২
১৬৭. *সংবাদ-সাময়িকপত্র* (প্রাগুক্ত), পৃ. ৪৭

কয়েকটি আঞ্চলিক পত্রিকার নাম ও প্রকাশকাল (১৮৪০-১৯০০)

নাম	প্রকাশকাল	প্রকাশস্থান
মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী (সা.)	১৮৪০	
সংবাদ মুক্তাবলী (সা.)	১৮৪৮	শিবপুর, হাওড়া
সংবাদ বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী (সা.)	১৮৪৯	
বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয় (সা.)	১৮৪৯	
সংবাদ বর্দ্ধমান (সা.)	১৮৫০	
মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ (মা.)	১৮৫১	
সংবাদ শশধর (সা.)	১৮৫২	শ্রীরামপুর
উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা	১৮৫৬	
রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ (সা.)	১৮৬০	
ঢাকা প্রকাশ (সা.)	১৮৬১	
বিশ্ব মনোরঞ্জন (সা.)	১৮৬২	আজিমগঞ্জ
ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা (সা.)	১৮৬২	
সংবাদ ভারতবন্ধু (সা.)	১৮৬৩	আজিমগঞ্জ
গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা (সা.)	১৮৬৩	কুমারখালি, কুষ্টিয়া
ভারত পরিদর্শন (সা.)	১৮৬৩	শান্তিপুর
ঢাকা দর্পণ (সা.)	১৮৬৩	
পাবনা দর্পণ (মা.)	১৮৬৪	
ভারতরঞ্জন (সা.)	১৮৬৪	বহরমপুর
মুর্শীদাবাদ সংবাদসার (পা.)	১৮৬৬	ঐ
পল্লী-বিজ্ঞান (মা.)	১৮৬৭	বিক্রমপুর
পল্লীগ্রাম বার্ত্তাবহ (পা.)	১৮৬৮	বৈদ্যবাটি
বরিশাল বার্ত্তাবহ (পা.)	১৮৭০	
রাজসাহী সম্বাদ (পা.)	১৮৭০	
মুর্শিদাবাদ হিতৈষিণী (পা.)	১৮৭০	
হালিশহর পত্রিকা (মা. পরে ১২৮০ সাল নাগাদ সাপ্তাহিক-এ রূপান্তরিত)	১৮৭১	

চুঁচুড়া প্রকাশিকা (মা.)	১৮৭১	
মুর্শিদাবাদ পত্রিকা (সা.)	১৮৭২	
বরাহনগর সমাচার (পা.)	১৮৭৩	
গ্রামবাসী (মা.)	১৮৭৩	রানাঘাট
গ্রামদূত (পা.)	১৮৭৩	বরিশাল
সমবেদক (সা.)	১৮৭৩	বহরমপুর
সমাজ-দর্পণ (পা.)	১৮৭৩	চন্দননগর
সাধারণী (সা.)	১৮৭৩	চুঁচুড়া
গোয়ালপাড়া হিতসাধনী (পা.)	১৮৭৪	
প্রচারিকা (মা. পরে ১৮৭৪-এ সাপ্তাহিক-এ রূপান্তরিত)	১৮৭৪	বর্ধমান
হিতমিহির (সা.)	১৮৭৪	খড়দহ
উচিত বক্তা (পা.)	১৮৭৪	আজিমগঞ্জ
সত্যপ্রকাশ (পা.)	১৮৭৪	বরিশাল
পারিল বার্ত্তাবহ (পা.)	১৮৭৪	মানিকগঞ্জ, ঢাকা
সুহৃদ (সা.)	১৮৭৫	মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ
রাজশাহী সমাচার (সা.)	১৮৭৫	
ঢাকা দর্শক (সা.)	১৮৭৫	
ভারত মিহির (সা.)	১৮৭৫	ময়মনসিংহ
মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি (সা.)	১৮৭৬	
প্রতিকার (সা.)	১৮৭৬	বহরমপুর
মেদিনীপুর সমাচার (মা.)	১৮৭৬	
শ্রীহট্ট প্রকাশ (পা.)	১৮৭৬	
দিবাকর (মা.)	১৮৭৬	বর্ধমান
ত্রিপুরা পত্রিকা (পা.)	১৮৭৬	
কাল্‌না প্রকাশ (সা.)	১৮৭৮	
বর্ধমান সঞ্জীবনী (সা.)	১৮৭৮	
দিবাকর (সা.)	১৮৭৮	বীরভূম
পূর্ব প্রতিধ্বনি (পা.)	১৮৭৯	চট্টগ্রাম
মেদিনী (সা.)	১৮৭৯	
সংশোধিনী (সা.)	১৮৭৯	চট্টগ্রাম
ত্রিপুরা বার্ত্তাবহ (সা.)	১৮৮০	
পরিদর্শক (সা.)	১৮৮০	সিলেট
বিক্রমপুর প্রকাশ (মা.)	১৮৮১	ঢাকা
চারুবার্ত্তা (সা.)	১৮৮১	শেরপুর, ময়মনসিংহ
বার্ত্তাবহ (সা.)	১৮৮২	পাবনা

প্রতিভা (সা.)	১৮৮২	ঢাকা
প্রজাবন্ধু (সা.)	১৮৮২	চন্দননগর
ঘাঁটাল পত্রিকা (পা.)	১৮৮৩	
পল্লীগ্রাম (মা.)	১৮৮৫	রানাঘাট
ঢাকা গেজেট (সা.)	১৮৮৬	
ধূমকেতু (সা.)	১৮৮৬	চন্দননগর
গ্রামবাসী (পা.)	১৮৮৬	উলুবেড়িয়
পল্লীপ্রকাশ (মা.)	১৮৮৬	কুচবিহার
চট্টল গেজেট (সা.)	১৮৮৮	চট্টগ্রাম
চন্দ্রবিলাস (সা.)	১৮৮৮	বহরমপুর
চন্দ্রহাস (সা.)	১৮৮৮	বহরমপুর
কাশীপুর নিবাসী (সা.)	১৮৮৮	বরিশাল
ফরিদপুর হিতৈষিণী (সা.)	১৮৮৯	
শিলচর (পা.)	১৮৮৯	
বাঁকুড়া দর্পণ (পা., ১৮৯৪ থেকে সাপ্তাহিক-এ রূপান্তরিত)	১৮৯২	
শ্রীহট্টবাসী (সা.) ১৩০০ সাল থেকে *পরিদর্শক* ও *শ্রীহট্টবাসী* নামে	১৮৯২	
মুর্শিদাবাদ হিতৈষিণী (সা.)	১৮৯৩	
চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ (সা.)	১৮৯৩	
দর্শক (সা.)	১৮৯৫	চুঁচুড়া
বগুড়া দর্পণ (সা.)	১৮৯৫	
নদিয়াবাসী (মা.)	১৮৯৫	
বরিশাল হিতৈষিণী (সা.)	১৮৯৬	
কান্তি (মা.)	১৮৯৬	কাঁথি, মেদিনীপুর
পল্লীবাসী (পা.)	১৮৯৭	কালনা
নদীয়া দর্পণ (মা.)	১৮৯৭	কৃষ্ণনগর
মেদিনী বান্ধব (সা.)	১৮৯৯	মেদিনীপুর
মানভূম (সা.)	১৮৯৯	
কাঙ্গাল (সা.)	১৮৯৯	কুচবিহার
বীরভূমি (মা.)	১৮৯৯	কীর্ণাহার, বীরভূম,
কালিকাপুর গেজেট (মা.)	১৯০০	কালীপাহাড়ি, বর্ধমান
নীহার (সা.)	১৯০০	কাঁথি

কয়েকটি আঞ্চলিক পত্রিকার প্রচার (১৮৯০-১৯০০)

পত্রিকার নাম	১৮৯০	১৮৯২	১৮৯৫	১৯০০
উলুবেড়িয়া দর্পণ	—	৭০০	--	--
কাশীপুর নিবাসী	৩০	২৮০	২৮০	৫০০
গরীব	৩০০০	--	--	--
গ্রামবাসী	৮০০	১০০০	--	-
চারু মিহির	—	—	৯০০	৮০০
চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ	--	--	--	৫০০
চন্দ্র বিলাস	২৫০	---	..	-
চট্টল গেজেট	৮০০		---	--
জ্যোতি	—	--	--	১০০০
ঢাকা প্রকাশ	১২০০	২২০০	৪৫০	৩৭৫
ঢাকা গেজেট	--	-	-	৬০০
ত্রিপুরা হিতৈষী	--	--	--	২৫০-৩০০
নীহার	—	--	--	১৫০
পূর্ব দর্পণ	৭০০	--	--	--
পরিদর্শক	৪৫০	৪৮০	--	৫০০
প্রতিকার	৬০০	৬০৯	৬০৩	৬০০
ফরিদপুর হিতৈষিণী	--	--	--	প্রায় ৩০০
বর্ধমান সঞ্জীবনী	৩০২	৩৩৫	—	৩০০
বাঁকুড়া দর্পণ	—	—	৫০০	৯০০
বিক্রমপুর	—	—	৫০০	--
বরিশাল হিতৈষী	—	—	—	৪০০
বিকাশ	—	--	--	১০০০
মানভূম	—	—	--	৫০০
মেদিনী বান্ধব	—	—	—	৪০০
মুর্শিদাবাদ হিতৈষী	—	--	২৮০	৪০০
মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি	৩৫০	--	২০০	--
রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ	২০৫	--	৩০০	—
শিলচর	৫০০	৫০০	--	--
শ্রীহট্ট মিহির	—	৩৩২	—	--
সহযোগী	—	৩৪২	—	--

প্র ভা ত কু মা র দা স

কবিতা-বিষয়ক পত্রিকা : পূর্বাপর উত্তরাধিকার

কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর শৈশব বয়সের কাব্যচর্চায়, পিতার উত্তরাধিকার তথা বংশধারায় কবিতানুরাগের সঙ্গে মাতৃভূমির 'প্রাকৃতিক কবিত্বময়ী' সর্বাত্মক পরিবেশে যে কাব্যপ্রভাব নিহিত ছিল সে কথা স্মরণ করে লিখেছিলেন : 'বনমাতার দিগন্তব্যাপী পর্ব্বতমালায় কবিতা তরঙ্গায়িত হইতেছে, তাঁহার পাদস্থিত নির্ঝর-কণ্ঠে কবিতা অবিরল গীত হইতেছে, তাঁহার নীল ফেনিল সিন্ধু-গর্ভের তরঙ্গ-ভঙ্গে কবিতা নদীতরঙ্গ দেখাইতেছে, তাঁহার বহু নদ-নদী-স্রোতে রজত ধারে কবিতা বহিয়া সেই সিন্ধুমুখে ছুটিতেছে। মাতার অধিত্যকায়, উপত্যকায়, বনে বনে কবিতা ; বৃক্ষে বৃক্ষে লতায় লতায়, ফুলে ফলে কবিতা ; পর্ব্বত-বিভক্ত পীত শ্যামল শস্যক্ষেত্রে কবিতা। মাতার সমুদ্র গর্জ্জনে কবিতা, নির্ঝরিণীর তর তর কণ্ঠে কবিতা সংখ্যাতীত বনবিহঙ্গের কলকণ্ঠে কবিতা।' অবশ্য ততদিনে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কারণে 'গেয়' পদ্ধতির পথ ছেড়ে দিয়ে 'অগেয়' এবং মুদ্রিত মাধ্যমে কবিতা ভিন্নতর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর *সংবাদ প্রভাকর*-এর মাধ্যমে কবিতার প্রচারকে এমনই বিস্তার দিয়ে ছিলেন যে, সমসাময়িককালে কবি যশঃপ্রার্থীদের কাছে একমাত্র অনুকরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল, দশ-এগারো বছর বয়সে ষষ্ঠশ্রেণিতে পাঠরত কিশোর নবীনচন্দ্রও 'গুপ্তজার অনুকরণ করিয়া কবিতা' লিখতে চেষ্টা করতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের অদ্বিতীয় কীর্তি বাংলা সাহিত্যের ভাগ্য-বিধাতা *সংবাদ প্রভাকর* সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন : 'দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন।' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কৃতিত্বের প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : 'দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশের চিহ্ন-পরিচয়হীন ফল্গুধারাকে তিনি আপন বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া গঙ্গোত্রীর মত আলো-বাতাসের বাজ্যে উৎসাবিত করিয়াছিলেন বলিয়াই মধুসূদন-বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও সিদ্ধি সম্ভব হইয়াছে এবং অন্য দিকে কবি ও শিল্পী ভারতচন্দ্রর কবি-টপ্পা-পাঁচালি-হাফ আখড়াইয়ের খিড়কি-দ্বারে যে সম্ভ্রমহীন গ্রাম্যতায় বাংলা কবিতার অপমৃত্যু হইতে বসিয়াছিল, ঈশ্বরচন্দ্রর চেষ্টায় তাহাই ঐশ্বর্য্য-সমারোহে উন্নীত হইয়া সদরের রাজ্যপাটে নবজীবন ও মুক্তিলাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ বাংলা কাব্য-সাহিত্যে পুরাতন ধারার তিনি শেষ কবি এবং নূতন ধারার তিনি উদ্যোক্তা।' বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রয়াণের বর্ষটির তাৎপর্য উল্লেখ করে বলেছিলেন : '১৮৫৯। ৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরান দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঈশ্বরচন্দ্র তদানীন্তন তরুণতর ছাত্র কবিদের উৎসাহিত করার জন্য *সংবাদ প্রভাকর*-এর মাধ্যমে এক আশ্চর্য 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ' প্রবর্তন করেছিলেন যা পাঠকদের কাছে উপভোগের সামগ্রী হয়ে উঠেছিল।

১২৫৯ বঙ্গাব্দের ২ চৈত্র তিনি আলোচ্য পত্রিকায় ঘোষণা করেছিলেন : 'হিন্দু কলেজের সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র, হুগলী কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ অধিকারী এই ছাত্রত্রয়ের বিরচিত গদ্যপদ্য পরিপূরিত তিনটি প্রবন্ধ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, এই সকল রচনার কিছুমাত্র পরিবর্তন ও সংশোধন না করিয়া অবিকল প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমারদিগের সহযোগীগণ গুণগ্রাহক গ্রাহকগণ বিশেষাভিনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া যাঁহার রচনা যেরূপে ও যেভাবে উৎকৃষ্ট বোধ করিবেন, তাহাকে সেইরূপে সেই ভাবে পুরস্কৃত করিবেন। আমরা এ বিষয়ে আগে কোনো কথাই উল্লেখ করিব না।' দীনবন্ধু ও বঙ্কিমের কবিতা পড়ে দ্বারকানাথ লিখেছিলেন 'সরস্বতীর মোহিনী বেশ ধারণ'—তাতে ওই দুই কবির প্রতি ব্যঙ্গোক্তি ছিল। এতে তাঁদের তিনজনের মধ্যে বেশ কবিতা যুদ্ধ বেধে যায়—এবং বছরকাল ধরে সেই কবিতাগুলি *প্রভাকর*-এ প্রকাশিত হয়। এই কবিতাযুদ্ধ পাঠ করে রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত কুণ্ডির সাহিত্যসেবী জমিদারবাবু কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী দ্বারকানাথকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করে পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন। সেই টাকা প্রাপকের সম্মতিক্রমে *প্রভাকর*-সম্পাদক তিন প্রতিযোগীকে সমান অংশে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। *প্রভাকর*-এর প্রতি সংখ্যায় এই তিন যুবক গদ্যে ও পদ্যে সাহিত্যিক লড়াই সৃষ্টি করেছিলেন। দ্বারকানাথ দীনবন্ধুকে 'সহুরে কবি' ও বঙ্কিমচন্দ্রকে 'চট্টোকবি' বলে লিখতেন, দীনবন্ধু দ্বারকানাথকে বলতেন 'বুনো কবি'। এই কবিতা যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন দ্বারকানাথ, কিন্তু অকাল প্রয়াণে তাঁর কবি-প্রতিভা সম্পূর্ণ বিকশিত হতে পারেনি।

ঈশ্বরচন্দ্রের প্রয়াণের বছর খানেকের মধ্যে, তদানীন্তনকালের যুগসন্ধিক্ষণের সময় বাংলা কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। সে-সময় *'বাঙ্গালার শূন্য কবিকুঞ্জে'* ঢাকার কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রতিদ্বন্দ্বীহীন কবি, শুধু তাই নয় মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত *তিলোত্তমা সম্ভব* তখন সপ্তন্ত্রীতে বেজে উঠলেও 'বাঙ্গালীর কানে' অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। তাই বাঙালির কবিতানুরাগী পাঠকসমাজ কৃষ্ণচন্দ্রকেই শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান প্রদান করেছিল। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে (বঙ্গাব্দ ১২৬৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৮২ শকাব্দ) সেই কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল *কবিতাকুসুমাবলী* নামে প্রতি সংখ্যা দেড় আনা মূল্যের একটি মাসিক পত্রিকা। অন্যদিক থেকেও তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব উল্লিখিত হওয়া দরকার, বাঙ্গালা যন্ত্র থেকে মুদ্রিত সেটিই ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের প্রথম সাময়িকপত্র। কৃষ্ণচন্দ্র নিজে গদ্যপদ্য রচনায় সিদ্ধ হস্ত ছিলেন বলে, সমবয়সী হরিশ্চন্দ্র মিত্রকে 'সাহিত্যরসের রসিক' বুঝতে পেরে, তাঁর সঙ্গে পরম আগ্রহে সাহিত্যচর্চায় নিবিষ্ট হতেন এবং তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন 'একখানা পদ্য পরিপূর্ণ মাসিক পত্রিকা' বার করার। ফলে তাঁর উৎসাহ এবং উপদেশে হরিশ্চন্দ্র মিত্র *কবিতাকুসুমাবলী* নাম্নী এই কবিতাময়ী পত্রিকাটি প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। পত্রিকাটি প্রকাশের পর কৃষ্ণচন্দ্রই প্রধান উপদেষ্টা এবং কার্যত সম্পাদক নিযুক্ত হন, যদিও সম্পাদক হিসেবে পত্রিকায় কোনো নাম মুদ্রিত হত না। কেদারনাথ জানিয়েছেন : 'কবিতাকুসুমাবলীতে সম্পাদকের নাম না থাকিলেও তাঁহার তৎকালীন প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা এবং তাহার প্রতি প্রকাশক মিত্র কবির আনুগত্য স্বীকার হইতে ইহা স্পষ্টই মনে হয় যে তিনি কবি কৃষ্ণচন্দ্রের সাহায্যেই কবিতাকুসুমাবলী পরিবেশন করিয়াছিলেন।' তৃতীয়

সংখ্যায় 'কবিতা আলোচনার আবশ্যক' শীর্ষক একটি গদ্য প্রবন্ধে তাঁরা এ ধরনের পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানান : 'কবিতা পাঠ প্রলভনীয় সমুদায় ফলবত্তা প্রলাভ করা যাইতে পারে বঙ্গভাষায় এরূপ বিশুদ্ধ কাব্যের সংখ্যা অত্যল্প দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বতন বঙ্গীয় কবিগণ যে সমস্ত কাব্য প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই উলঙ্গ আদিরস দোষে দূষিত। তৎপাঠে উপকার হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত অপকারেরই সম্ভাবনা। অতএব অধুনা দেশমধ্যে অভিনব কাব্যকথা বিভাসিত হইয়া জনসমাজের কল্যাণ বিধান করে, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, এই বাঞ্ছিত বিষয়ের সুসিদ্ধি সম্পাদনে আধুনিক বহুল মার্জিত বুদ্ধি কোবিদগণ লেখনী ধারণ করিয়াছেন, আমাদের কবিতাকুসুমাবলীও তাহাদিগের সহকারিতা সাধনোদ্দেশ্যে বিকশিত হইয়াছে। ফলতঃ বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষ সাধন ও বিশুদ্ধ কাব্যকলা প্রচার দ্বারা জনমণ্ডলীর কল্যাণ বর্দ্ধনই এতৎ পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য।'

সাংবাদিকতা ও কাব্যচর্চায় কৃষ্ণচন্দ্রের প্রধান প্রেরণাদাতা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র, প্রাথমিকভাবে *সংবাদ প্রভাকর* তাঁর শিক্ষানবিশিকে প্রশ্রয় দান করেছিল। মাইকেল মধুসূদন বিরচিত *মেঘনাদবধকাব্য* প্রকাশ কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বছর হিসেবে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দটি স্মরণীয়। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর *সদ্ভাবশতক* (১৮৬১) কাব্যের জন্য দীর্ঘস্থায়ী খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন, যে কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই আলোচ্য পত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত হয়। পত্রিকাটির কণ্ঠদেশে শোভা পেত নিম্নলিখিত শ্লোক :

সন্তোষয়তু সর্ব্বেষাং সতাং চিত্তমধুব্রতান্।
নানারস সমাকীর্ণা কবিতাকুসুমাবলী।।

প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত 'মঙ্গলাচরণ'-এর অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হচ্ছে :

ভো বিভো! কিঙ্করে করি করুণা কিঞ্চিত।
কবিতা কুসুমাবলি, কর বিকশিত।।
তব প্রসন্নতা বায়ু হোয়ে প্রবাহিত।
করুক সৌরভে তার দিক আমোদিত।।
ভাবুক মানসভৃঙ্গ হয়ে প্রলোভিত।
ভাব রস আস্বাদনে হোক বিমোহিত।।

ইত্যাদি

উদ্যোগ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত হয়েছিল পত্রিকাটি প্রকাশ করা হবে শুধু পদ্যে, যে-জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা কেবল পদ্যেই প্রকাশিত হয়। পরে সময়ের অবস্থা ও গ্রাহকের রুচি অনুসরণ করে পরিচালকগণ তাঁদের মত বদলিয়ে, মাঝে মাঝে গদ্য প্রবন্ধও প্রকাশ করেন। প্রথম দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় 'রয়েল অষ্টাংশিত এক ফর্ম্মা' আকারে। তৃতীয় সংখ্যা থেকে পত্রিকাটির পরিসর বৃদ্ধি করা হয় দুই ফর্মায়। এরকম বারোটি সংখ্যা ১৭২ পৃষ্ঠা হয়েছিল। বার্ষিক মূল্য ছিল প্রথমে এক টাকা, পরে পৃষ্ঠা বেড়ে যাওয়ায় দেড় টাকা এবং প্রতিসংখ্যা দশ পয়সা করা হয়। এই পরিবর্তন বিষয়ে দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশক হরিশ্চন্দ্র মিত্র স্বাক্ষরিত (১৫ আষাঢ় ১৭৮২ শক) বিজ্ঞাপনে জানানো হয় : 'কবিতাকুসুমাবলীর প্রথম সংখ্যা প্রচারিত হইলে অনেক সহৃদয় ব্যক্তি এই রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে কেবল কবিতা কলাপে পরিপূর্ণ হইলে কবিতা কুসুমাবলী সাধারণের সম্যক হৃদয়গ্রাহিণী হইতে পারিবে না। ইহাতে

সময় সময় গদ্যেও কোন কোন প্রবন্ধ প্রকটিত হইলে ভাল হয় ; আমরাও বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, তাহাদিগের অভিপ্রায় নিতান্ত সুসঙ্গত। কেননা জগতে সমুদয় লোকের মনের গতি সমান নহে। কেহবা সুললিত গদ্য পাঠে অনুরক্ত, কেহবা গদ্যপদ্য উভয়েরই রসাস্বাদনে প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং কোন পত্রিকা নিরবচ্ছিন্ন পদ্যে অথবা গদ্যে পরিপূরিত হইলে সমুদায় পাঠকের মানসিক সুখোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের একান্ত ইচ্ছা এই পত্রিকাখানি গদ্যপদ্য উভয়েই অলঙ্কৃত করি। কিন্তু, কবিতা কুসুমাবলীর যেরূপ ক্ষুদ্রায়তন ইহাতে আমাদের কল্পিত সমুদায় বিষয়ের সুন্দর সমাবেশ হওয়া কঠিন। সকল বিষয়েই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া প্রকাশ করিলে গ্রাহকগণের মনতৃপ্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। এতন্নিবন্ধন আমরা আগামী সংখ্যা হইতে এতৎপত্রিকার আকার আট পেজি ফর্ম্মার দুই ফর্ম্মা ও মাসিক মূল্য আড়াই আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।।০ টাকা নির্দ্ধারণ করিতে মনস্থ করিয়াছি।'

কবিতাকুসুমাবলী-র প্রধান লেখক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র এবং হরিশ্চন্দ্র। নতুন লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জগদ্বন্ধু ভদ্র এবং ভারতচন্দ্র সরকার--প্রথমজন লিখেছিলেন *ছুছুন্দরী বধ কাব্য*, আর দ্বিতীয়জন ছিলেন *ভূধর বর্ণন কাব্য*-এর প্রণেতা। এছাড়াও লালমোহন বসাক, রাধারমণ শীল, প্রভাতচন্দ্র রায় লিখতেন। চাচরতলার 'গ' কুসুহাটিনিবাসিন 'আর', ঢাকা কলেজের 'এইচ' প্রভৃতি নাম যুক্ত লেখাও প্রকাশিত হত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রামদাস সেনের কয়েকটি সংগীতও এই পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। নতুন লেখকদের উৎসাহিত করতে কবিতার পাদপূরণের ব্যবস্থা থাকত। সম্পাদক কবিতার শেষ পংক্তিটি মুদ্রিত করে, লেখকদের আহ্বান করতেন--নতুন লেখকগণ তাতে পাদপূরণ করে দিলে মনোনীত কবিতা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হত। *কবিতাকুসুমাবলী*-তে প্রধানত যেসব বিষয়ে পদ্য ও গদ্য প্রবন্ধ থাকত, সেগুলি : ১. ইংরেজি ও পার্সি কবিতার মর্মানুবাদ, ২. নাট্য সাহিত্য (দময়ন্তী নাটক), ৩. সংগীততত্ত্ব, ৪. মনস্তত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান, ৫. সংগীত সংগ্রহ, ৬. রহস্যরচনা ৭. পাদপূরণ ৮. স্বভাব বর্ণনা ও সাধারণ কবিতা।

প্রথম বছর সম্পাদনা করেন কৃষ্ণচন্দ্র, তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন : "আমি, হরিশ্চন্দ্র মিত্র এবং প্রসন্নকুমার সেন--এই তিনজনে ক্রমে 'কবিতাকুসুমাবলী' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি। বৎসরখানেক উহা আমি চালাইয়াছিলাম।" কেদারনাথ লিখেছেন : "'কবিতাকুসুমাবলী' এক বৎসরের অধিককাল বাঁচিয়াছিল কি না, আমরা বহু অনুসন্ধানেও তাহার সংবাদ অবগত হইতে পারি নাই।' তবে তাঁর প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায়, আলোচ্য পত্রিকাটির দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল, প্রকাশকাল ২০ ভাদ্র বুধবার ১৭৮৩ শকাব্দ। শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র, প্রকাশক হিসেবে বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করেছিলেন, এরপর থেকে প্রতি মাসে বিশ তারিখে নিয়মিতভাবে পত্রিকাটি গ্রাহকগণের কাছে পাঠানো হবে। তাঁর এই ঘোষণা থেকেই জানা যায় বিগত বর্ষের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম প্রকাশের পর কিছুদিন নিয়মিত প্রকাশিত হলেও, নানা কারণে সেটি অনিয়মিত হয়ে যায়। তবে নিশ্চিত ততদিনে পত্রিকাটি পাঠকগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণীয় হয়েছিল, না হলে দ্বিতীয় ভাগের অবতারণার প্রয়োজন হত না। হরিশ্চন্দ্র উক্ত বিজ্ঞাপনে জানিয়েছিলেন, 'যাহা হউক এক্ষণে জগদীশ্বরের ইচ্ছায় কতিপয় বন্ধু বিশেষ আনুকূল্য করিয়া ইহার জীবন রক্ষণে অঙ্গীকৃত হইয়াছেন বলিয়াই আমরা ইহার পুনঃপ্রচারণে সাহস করিলাম। এক্ষণে গ্রাহকগণ কিঞ্চিৎ আনুকূল্য ব্যবহার করিলেই বোধহয়

আর পত্রিকাকে সংশয়িতপ্রাণা হইতে হইবে না।' হরিশ্চন্দ্র এই নতুন উদ্যোগে সম্পাদনার ক্ষেত্রে খুব বেশি কিছু বদলের কথা না বললেও, একটি অভিনব ব্যবস্থার কথা জানিয়েছিলেন : 'গত বর্ষে যে প্রণালীতে এতৎ পত্রিকার রচনাকার্য সম্পাদন করা গিয়াছে, এবারেও সেই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। বিশেষের মধ্যে এই যে প্রথম ভাগের মধ্যে মধ্যে গদ্য প্রবন্ধেরও সন্নিবেশ করা যাইত, এবারে সেই নিয়মটি প্রায় অবলম্বন করা যাইবে না। যেহেতু আমাদের গ্রাহকবর্গের মধ্যে অনেকেই কবিতাকুসুমাবলীতে সমধিক কবিতা দর্শনের স্পৃহা রাখেন, এবং সেই স্পৃহা পরিপূরণার্থে আমাদিগকে ভুয়ো ভুয়োঃ অনুরোধ করিয়াছেন।'

কবিতাকুসুমাবলী উঠে যাওয়ার পর ঢাকা থেকে *চিত্তরঞ্জিকা* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হল ১২৬৯ বঙ্গাব্দের পয়লা জ্যৈষ্ঠ। পত্রিকাটির সম্পাদক কে ছিলেন জানা না গেলেও প্রকাশক ছিলেন সারদাকান্ত সেন, ঢাকা কলেজের তদানীন্তন ছাত্র। গিরিশকান্ত ঘোষ লিখেছেন : 'কাহারও কাহারও বিশ্বাস কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক ছিলেন।' এই অনুমানের কারণ ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্র ঠিকানায় হরিশ্চন্দ্র অবস্থান করতেন এবং *ঢাকা প্রকাশ*-এর সহকারী সম্পাদকের কাজ করতেন। প্রথম সংখ্যার ভূমিকা স্বরূপ বিজ্ঞাপনে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় : 'সম্প্রতি মাসিক প্রভাকর ব্যতীত সদ্ভাব ও রসপূর্ণ পদ্যময়ী পত্রিকা আর দেখা যায় না। বোধহয় তন্নিবন্ধন কাব্যপ্রিয় মহোদয়গণ কবিতা কুসুমের সৌরভ সম্ভোগে বঞ্চিত হওয়া প্রযুক্ত সর্ব্বদাই ক্ষোভগ্রস্ত থাকেন। আমরা সাধ্যানুরূপ সেই ক্ষোভ অপনয়নার্থ এই পত্রিকা খণ্ড প্রকাশ করিলাম। এতদ্দ্বারা দেশের কিঞ্চিৎ মাত্রও হিত সাধিত হইবে এমন প্রত্যাশা করিতে পারি না, তথাচ সজ্জনগণের বিদ্যানুরাগে উৎসাহিত ও কারুণ্যগুণে আশ্রিত হইলে কর্ত্তব্যকর্ম নিষ্পাদনে যথাসাধ্য চেষ্টা করণে ক্রটী করিব না।' এরপরে তাঁরা জানালেন, 'স্বকপোলকল্পিত' কবিতা ছাড়াও 'সদ্ভাবপূর্ণ কবিতা কলাপের অনুবাদ অথবা তাহাদের সারমর্ম্মও' প্রকাশ করবেন। পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁরা বললেন : 'পরন্তু সাধারণের স্পৃহা এক প্রকার নহে। ক্রমাবচ্ছিন্ন কবিতা পাঠে কেহ কেহ বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারেন এই আশঙ্কায় গদ্য রচনায় ও অনুবাদেও ক্ষান্ত থাকিব না। অপিচ নানা গ্রন্থ হইতে গদ্যপদ্য রচনার নিয়মাবলী সঙ্কলন করিয়া সময়ে সময়ে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব। আমাদের পত্রিকায় প্রকাশার্থ যাহা প্রেরণ করিবেন কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব এবং তদ্দ্বারা জন সমাজের কিঞ্চিৎমাত্রও উপকার ও চিত্তরঞ্জন সম্ভব হইলে প্রকাশ করিতে ক্রটী করিব না।' পত্রিকার প্রকাশন সম্পর্কিত বিবরণের উল্লেখে তাঁরা জানালেন : 'সম্প্রতি এই পত্রিকার আয়তন কবিতাকুসুমাবলীর ন্যায় ৮ পেজি দুই ফরমা করা গেল, তথাপি ইহার মূল্য তদপেক্ষা ন্যূন নির্দ্ধারিত হইল। স্থানীয় গ্রাহকগণের প্রতি এক টাকা চারি আনা ও বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি ডাক মাশুল সমেত দুই টাকা মাত্র। অভিলাষ রহিল সজ্জনগণের কৃপা নয়নে পতিত হইলে চিত্তরঞ্জিকার কলেবর আরও বৃদ্ধি করা যাইবে।' তাঁরা এও জানালেন : 'ঢাকা নূতন যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হইবে'। এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পত্রিকা প্রকাশিত হত কি না তা অবশ্য নির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় নি। *চিত্তরঞ্জিকা*-য় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হরিশ্চন্দ্র মিত্র ছাড়াও আহম্মদ ও এইচ নামক মুসলমান কবিদ্বয় এবং ময়মনসিংহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক গং, চং, সং প্রভৃতি কবিতা লিখতেন। বিলাত যাওয়ার পূর্বে *সোমপ্রকাশ*-এ প্রকাশিত মাইকেলের 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটি *চিত্তরঞ্জিকা*-র দ্বিতীয় সংখ্যায় মুদ্রিত

হয়েছিল। *চিত্তরঞ্জিকা*-র স্থায়িত্বকাল সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা সম্ভব হয়নি।

চিত্তরঞ্জিকা প্রকাশের ষোলো বছর পরে কলকাতা থেকে বঙ্গাব্দ ১২৮৫ বৈশাখ মাসে (১৮৭৮ এপ্রিল), 'নানা বিষয়িনী কবিতা-প্রসবিনী' *বীণা* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় *অবসর সরোজিনী* কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের সম্পাদনায়। পত্রিকাটিতে কবিতার পাশাপাশি মুখ্যত গান ও স্বরলিপি প্রকাশিত হত। আর, প্রবন্ধও লেখা হত পদ্যে। শুধু পাদটীকা অংশ মুদ্রিত হত গদ্যে। কবিতাগুলির মধ্যে বেশ কিছু লেখা হত দেশাত্মবোধের প্রেরণায়, লেখকের নাম মলাটে সূচিপত্রে উল্লিখিত হত, সাধারণভাবে প্রতিটি লেখার শেষে 'শ্রী' :--উল্লেখে লেখকের নাম উহ্য থাকত। প্রথম বর্ষের ফাল্গুন সংখ্যায় 'উদ্দীপনা' শীর্ষক কবিতায় পরাধীন দেশের জনগণের উদ্দেশে কবি বলেছেন :

ছাড় ঘুম ঘোর, গায়ে কর জোর,
রে ভারতবাসী! হল নিশি ভোর,
জাগিল সকলে ; তোমরা কি বলে
এখনো শয়ান র'য়েছ ভাই।

বীণা-র দ্বিতীয় বর্ষে 'গ্রন্থ সমালোচনা'র সূচনায় পত্রিকার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল : 'বাঙ্গালা সংবাদ পত্র বা সাময়িক পত্রের সম্পাদকগণ কোন পুস্তক সমালোচনার্থ উপহার না পাইলে সমালোচনা করেন না, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় সেরূপ করা ভাল নহে। উপহার না পাইলেও, অন্ততঃ ইচ্ছানুসারে কোন কোন গ্রন্থ ক্রয় করিয়াও সমালোচনা করা উচিত। আমরা বীণায় উপহার প্রাপ্ত এবং ক্রীত পুস্তকাবলির সমালোচনা করিব। বীণার কলেবর অতি ক্ষুদ্র, সুতরাং ইহাতে সংক্ষিপ্ত ব্যতীত বিস্তৃত সমালোচনা হইবার সুবিধা নাই। বীণায় গ্রন্থ সমালোচনা করিবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না, কিন্তু অনেকগুলি গ্রন্থকারের অনুরোধে সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইল। এক্ষণে একটি কথা এই,--হয়ত গ্রন্থ সমালোচনা সম্বন্ধে কোন কোন গ্রন্থকার আমাদের উপর চটিতে পারেন, কিন্তু আমরা অযথা তাঁহাদের গ্রন্থরচনার কেবল প্রশংসা না করিয়া যথাযথ দোষগুণ দেখাইয়া দিয়া যদি তাহাদিগকে চটাইয়া ফেলি, তবে সে দোষ আমাদের নহে--তাঁহাদেরই। যে পুস্তকখানি আমাদের চক্ষে যেমন লাগিবে, আমরা তেমন ভাবেই সমালোচনা করিব, কেননা, 'ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ।' এই সমালোচনা নিরপেক্ষতা অবলম্বনে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁরা বললেন : 'পরিশেষে আর একটি কথা,--কোন কোন সুপ্রসিদ্ধ সাময়িক বা সংবাদপত্র সম্পাদক এবং সমালোচক আপন আপন আত্মীয় বন্ধুদিগের গ্রন্থ সমালোচনার সময় যেরূপ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং অপরিচিত গ্রন্থকারের পুস্তক ভাল হইলেও যেরূপ মন্দ বলিতে কুণ্ঠিত হন না, আমরা সেরূপ ভাবে সমালোচনা করিব না। কি পরিচিত কি অপরিচিত, আমরা সকলেরই গ্রন্থের দোষগুণ সমানভাবে দেখাইয়া দিব, ইহাতেও গ্রন্থকার ও সমালোচক উভয়েরই ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট নাই।' আলোচ্য সংখ্যাতে তাঁরা ক্রয় করে এনে লেখকের নাম নেই এমন একটি গ্রন্থ *উদাসিনী*-র সমালোচনা দিয়ে এই বিভাগের শুরু করেন। আরও একটি বই এরকম লেখক নামহীন *কুসুমকাননে কণ্টকতরু*-র, এবং ধীরেন্দ্রনাথ পাল রচিত *যামিনী প্রভাত কাব্য* শীর্ষক উপহার পাওয়া বইটির সমালোচনা করেন গদ্যে।

বীণা-র প্রথম সংখ্যার সূচনা হয়েছিল রাজকৃষ্ণ রচিত 'বাজল বীণা, নাচল জল' গান

দিয়ে। ব্রহ্ম সংগীত বিদ্যালয়ের অন্যতর সংগীত-অধ্যাপক মদনমোহন বর্মণ সেটির স্বরলিপি করেছিলেন, যেটি ওই প্রথম সংখ্যার ক্রোড়পত্রে মুদ্রিত হয়। প্রথমবর্ষে ক্রোড়পত্রে সর্বমোট আটটি বাংলা গানের স্বরলিপি স্থান পায়, যেগুলি প্রস্তুত করেছিলেন মদনমোহন বর্মণ, বৈকুণ্ঠনাথ বসু ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী।

রাজকৃষ্ণ রায়ের সম্পাদনায় পত্রিকাটি চারবছর ধরে চলেছিল, তবে নিয়মিত প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। প্রথম দু-বছর ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেও, তৃতীয় বর্ষে পৌঁছানোর পূর্বেই প্রকাশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তার কারণ, আলবার্ট প্রেস বিক্রয় হয়ে যাওয়ায় রাজকৃষ্ণ অসুবিধায় পড়েছিলেন। তাঁকে সাময়িকভাবে *বীণা*-র প্রচার বন্ধ করতে হয়েছিল। ১২৮৮ বঙ্গাব্দে তিনি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শে সামান্য ঋণ সংগ্রহে ৩৭নং মেছুয়াবাজার স্ট্রিট, ঠনঠনিয়ায় 'বীণা যন্ত্র' নামে একটি মুদ্রণালয় স্থাপন করেন। কিন্তু তাতে তিনি সম্পূর্ণ বাধামুক্ত হতে পারেননি। 'বীণাযন্ত্রে'র অবৈতনিক মুদ্রাকর শরৎচন্দ্র দেব লিখেছিলেন : 'বীণা যন্ত্রে অতিকষ্টে তৃতীয় বর্ষের বীণা শেষ হইয়া উহা বন্ধ হইল ; তৃতীয় বর্ষের শেষাংশও কবিতার পরিবর্তে তাহার অদ্ভুত ডাকাত ও দুই সন্ন্যাসী ও অপরাপর একজন লেখকের চীনের কলসী নামক গল্প বাহির হইয়াছিল।' তবে পত্রিকাটি নিয়মিত করার চেষ্টায় চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় কার্যাধ্যক্ষ শরৎচন্দ্র দেব 'বীণার গ্রাহকগণের প্রতি' বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন : 'এখনও কয়েকজন গ্রাহক বীণার অগ্রিম মূল্য পাঠাইলেন না। তথাপি আমরা বীণার ৪র্থ সংখ্যা তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিলাম। তাঁহারা এই সংখ্যা পাইয়া যেন আর মূল্য পাঠাইতে বিলম্ব না করেন। ঐ সংখ্যা প্রাপ্তির পর এক সপ্তাহের মধ্যে মূল্য না পাইলে রেজিস্টার হইতে তাঁহাদের নাম কাটিয়া দিব।'

এরপর ১২৯৩ কার্তিক থেকে ১২৯৪ আশ্বিন পর্যন্ত চতুর্থ খণ্ড প্রকাশের পর *বীণা* বন্ধ হয়ে যায়। এর কারণ, *বীণা* প্রকাশের প্রায় সমসাময়িক কাল থেকেই নাটক রচনা ও অভিনয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহও বৃদ্ধি পায়, যার পরিণতি বীণা-রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠা। *অনুসন্ধান* পত্রিকা (১২৯৪ ১৫ কার্তিক) সম্পাদকের পত্রিকার জগৎ থেকে এই বিদায় নেওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছিল : 'রাজকৃষ্ণবাবু ঠনঠনিয়া পল্লীতে নিজের একটি থিয়েটার খুলিতেছেন ; সেইহেতু অন্য কাজে লিপ্ত থাকিবার অবসর তাঁহার আদৌ নাই। তজ্জন্যই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে 'বীণা' বন্ধ করিতে হইল। সুতরাং 'বীণা'র পঞ্চম বর্ষের জন্য যে কয়জন গ্রাহক অগ্রিমমূল্য জমা দিয়াছিলেন এখন তিনি টাকা ফেরৎ বা তাহাদেব অভিলষিত পুস্তকাদি দিয়া তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিতেছেন।' এই রঙ্গমঞ্চের সেবা করতে অভিলাষী হয়ে তিনি নিদারুণ দুর্দশায় পতিত হয়েছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : 'বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের রচনা 'বীণা'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল। ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কয়েকটি প্রাথমিক রচনার সন্ধান ইহাতে মিলিবে ; মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তাঁহার প্রথম কবিতা "একদিন" প্রথমবর্ষের (কার্ত্তিক ১২৮৫) বীণাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। রামদাস সেন, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, অক্ষয়কুমার বড়াল, মনোমোহন বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রভৃতি 'বীণা'র লেখক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।' এর বাইরে বিভিন্ন সংখ্যার সূচিপত্র থেকে আর যেসব নাম সংগ্রহ করা গেছে তাঁরা হলেন : রাখালচন্দ্র পাল,

প্রকাশচন্দ্র ঘোষ, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, নরেশচন্দ্র মিত্র, কানাইলাল মিত্র, বেণীমাধব ন্যায়রত্ন প্রমুখ। তবে রাজকৃষ্ণ ও শরৎচন্দ্রই ছিলেন *বীণা*-র প্রধান লেখক।

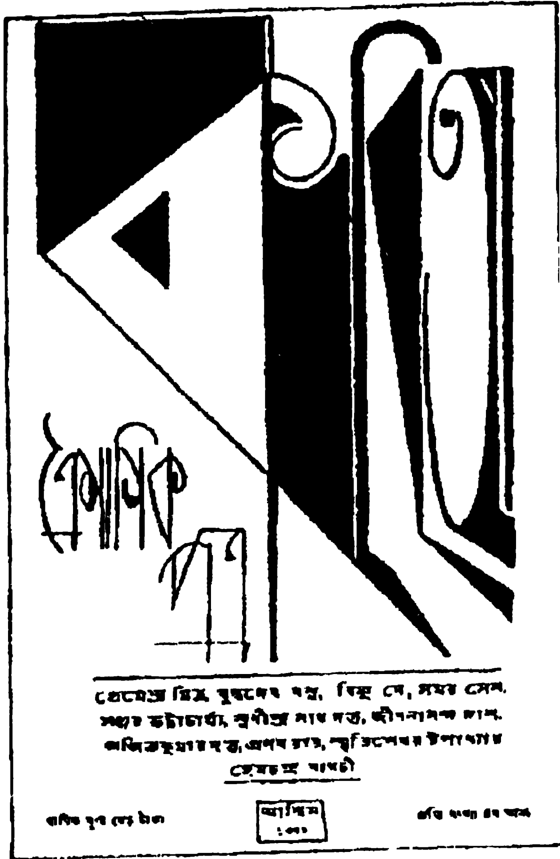
রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সৌকর্য্য-সাধনের জন্য রাজকৃষ্ণ যেমন ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তেমন বাংলায় গদ্য-কবিতা রচনাতেও তিনি পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। *বীণা* পত্রিকা তৃতীয় বর্ষের পর যখন স্থগিত ছিল সে-সময় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত *আর্যদর্শন* পত্রিকায় (১২৯১ শ্রাবণ) 'বর্ষার মেঘ' নামে একটি গদ্য-কবিতা প্রকাশ করে পাদটীকায় জানিয়েছিলেন : 'যে সকল গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব থাকে, সেই সকল গদ্যের কোন কোন বিষয় এইরূপ পদ্যপৌঙ্ক্তিক প্রণালীতে সাজাইয়া লেখা আমার বিবেচনায় ভাষার একটি নতুন অঙ্গ। লেখা তো হইল। এখন পাঠকমণ্ডলী কি বলেন।' তাঁর এই পরীক্ষা অচিরকালের মধ্যে নাট্য সংলাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে থিয়েটার-ব্যবসার পাকে জড়িয়ে কাব্যচর্চায় এই নিরীক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

দুই

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ চারদশক থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক, এই যে দীর্ঘ প্রায় সত্তর বছরের অধিক সময় এই বিশাল পর্বে সাময়িক পত্রিকা কম প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় শুধু কবিতার জন্য পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারটি তেমন গুরুত্ব পায়নি। যে সব সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়েছে, ধীরে ধীরে তাতে কবিতা স্থান পেলেও--নিছক পাদপূরণের জন্যই তা মুদ্রিত হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। এমনকী *প্রবাসী* বিষয়েও এমন গল্প চালু ছিল সেখানে রবীন্দ্রনাথ, পরে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছাড়া কবিতা ছাপা হত ইঞ্চি মেপে। গদ্যে-পদ্যে ভেদনীতি *সবুজপত্র* পালনীয় মনে না করলেও সেখানে কবিতা প্রকাশিত হত কম-সংখ্যক। *কল্লোল* প্রকাশের পর এই পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে যায়, সমসাময়িককালে *কালি-কলম* কিংবা *প্রগতি*-তে কবিতা প্রকাশকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হলেও--প্রথমোক্ত দুটি পত্রিকার খ্যাতি ছিল অতিআধুনিকদের কথাসাহিত্যের জন্য। এদের বিরোধীপক্ষীয় *শনিবারের চিঠি*-তেও প্রচুর কবিতা মুদ্রিত হয়েছে, কিন্তু অন্য রচনার থেকে খুব কিছু গুরুত্ব দেওয়ার কথা তাঁবা ভাবেননি। পাঁচ মিশেলি মাসিক পত্রিকার পাতায় গদ্য রচনার পাশে অত্যন্ত সংকোচে স্থান পাওয়া কবিতার জন্য খুব বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়নি *পরিচয়* কিংবা *পূর্বাশা*তেও, যদিও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা সঞ্জয় ভট্টাচার্য দুজনেই ছিলেন মূলত কবি।

বিংশ শতাব্দীর একেবারে সূচনা বর্ষে *লহরী* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০৭ বঙ্গাব্দে, সেই 'নানা বিষয়িণী কবিতাময়ী সমালোচনী'-র সম্পাদক ছিলেন মোজাম্মেল হক, যেটি প্রকাশিত হত শান্তিপুর থেকে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লেখকরাই সেই পত্রিকায় লিখতেন কিন্তু সেটির স্থায়িত্বকাল সম্ভবত বর্ষাধিক কাল অতিক্রম করেনি। ক্ষণস্থায়ী পত্রিকাটিতে লেখক হিসেবে যুক্ত ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জীবনকৃষ্ণ দত্ত, মোহাম্মদ ইসমাল্লি হোসেন, ভোলানাথ মজুমদার, সুরেশ্বর মুখোপাধ্যায়, মহম্মদ মীর আলী, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, তোয়াজ্জুল হোসেন, দেবেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ। প্রকৃতপক্ষে, শুধু কবিতার জন্য নির্দিষ্ট কোনো পত্রিকার মধ্য দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব প্রদর্শন করার প্রথম কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন

বুদ্ধদেব বসু, *লহরী* প্রকাশের পঁয়ত্রিশ বছর পরে।



বুদ্ধদেব বসুর বিখ্যাত পত্রিকা *কবিতা*

আমাদের সর্ববহ পত্রিকাগুলি কবিতার প্রতি যে শ্রদ্ধাহীন ব্যবহার করে থাকে, তা দেখে বুদ্ধদেব বসু অনেক দিন ধরেই মনে মনে পীড়া বোধ করতেন। 'গদ্য ভোজের এঁটো পাতে' কবিতার মুদ্রিত রূপ দেখে তাঁর মনে হত : 'বড়ো জোর আমিষান্নের ফাঁকে-ফাঁকে চাটনির মতো পরিবেশন, কিন্তু কবিতাটাই যে একটা ভোগ্য বস্তু এমন ভাব কোথাও নেই।' তাই 'পদপ্রান্তিক অবমাননা' থেকে বাঁচিয়ে শুধু কবিতা বস্তুটিকে একমাত্র প্রাধান্য দিয়ে তিনি একটি পত্রিকার কথা ভেবেছিলেন, যেটি হবে, অন্নিবাসের বদলে একেবারে রিজার্ভ করা সেলুন গাড়ির ব্যবস্থা অন্য কারো জায়গাই নেই সেখানে।' এই দুঃসাহসিক চিন্তাটি তাঁর মাথায় এসেছিল, অন্নদাশঙ্কর রায়ের হাতে *পোয়েট্রি* নামের একটি পত্রিকা দেখে। 'রোগা চেহারা, ইট-রঙের মলাটের উপর শেলির ছবি ছাপানো'—সেই পত্রিকাটির বর্ণনা দিয়ে তিনি

বলেছেন : 'ভাষা ইংরেজি, জাতি মার্কিন, ভিতরে ছিল চওড়া মার্জিনে সুন্দর করে সাজানো কবিতা, শুধু কবিতা, আর কবিতারই বিষয়ে কিছু আলোচনা। এই প্রথম আমি কবিতার কোনো পত্রিকা চোখে দেখলুম।' মার্কিনি এই নমুনার স্মৃতি চারবছর ধরে লালন করে শেষপর্যন্ত, ঘনিষ্ঠতম সঙ্গী প্রেমেন্দ্র মিত্র ও প্রধান উৎসাহদাতা বিষ্ণু দে ও সমর সেন-এর সহযোগিতায় বঙ্গাব্দ ১৩৪২-এর আশ্বিন-এ (অক্টোবর ১৯৩৫) প্রকাশ করলেন *কবিতা*। সম্পাদক দু-জন, বুদ্ধদেব ও প্রেমেন্দ্র, আর সহকারী সম্পাদক সমর সেন, তখনো তিনি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র, বুদ্ধদেবের থেকে আট বছর বয়ঃকনিষ্ঠ। প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হল, বুদ্ধদেবের অস্থায়ী বাসস্থান ভবানীপুরের ১২ যোগেশ মিত্র রোড থেকে। কবিতার জন্য ধার্য তেত্রিশ পাতার লেখক তালিকায় ছিলেন যথাক্রমে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অজিতকুমার দত্ত, প্রণব রায়, স্মৃতিশেখর উপাধ্যায় [সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র], হেমচন্দ্র বাগচী। 'কবিতার দুর্বোধ্যতা' নামে সম্পাদকীয় নিবন্ধটির পরিসর সাত পৃষ্ঠা—মোট চল্লিশ পাতার বিজ্ঞাপনহীন ক্ষীণকায় এই ত্রৈমাসিকটির মূল্য ধার্য হয়েছিল প্রতি সংখ্যা ছ আনা, বার্ষিক দেড় টাকা। অনাড়ম্বর পত্রিকাটি বিনামূল্যে ছেপে দিয়েছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সত্যপ্রসন্ন দত্ত-র সদ্যস্থাপিত 'পূর্বাশা' প্রেস থেকে।

উল্লিখিত প্রথম সংখ্যার তালিকায় রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত, তা সত্ত্বেও যাঁদের কবিতা ছাপা হয়েছে তাঁদের কয়েকজন যথা বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে, সমর সেন এবং সর্বোপরি জীবনানন্দ দাশ, পরবর্তী কয়েক বছরে প্রধানত *কবিতা*-কে অবলম্বন করেই প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রবর্তী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর জীবনের প্রান্তবেলায় *কবিতা*-কে উপেক্ষা করেননি, বরং তিনি প্রথম সংখ্যা পাঠ করে বুদ্ধদেবকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন : 'এর প্রায় প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে এক বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্য বারোয়ারীর দল বাঁধা লেখার মত হয়নি। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পাঠকদের সঙ্গে এরা নতুন পরিচয় স্থাপন করেছে।' *কবিতা* পত্রিকার পক্ষে এ মন্তব্য অত্যন্ত শ্লাঘার, বলা যায় সামগ্রিকভাবে আধুনিক কবিতার জয়ধ্বনি ঘোষিত হল কবিগুরুর এই অভিমতে। বুদ্ধদেব আশ্বস্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতা প্রার্থনা করলেন, তিনি আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে পাঠালেন 'ছুটি' নামের কবিতা, *কবিতার* সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ জীবিতাবস্থায় ছিন্ন হয়নি, বরং মৃত্যুর পরে এই পত্রিকায় প্রধান আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি পত্রিকাটির গুরুত্ব অনুধাবন করে বুদ্ধদেবকে লিখেছিলেন : 'তোমাদের পত্রিকা নতুন কবিদের খেয়ার নৌকো। যাদের হাতে উপযুক্ত মাশুল আছে তাদের পার করে দেবে সর্ব্বজনের পরিচয়ের তীরে।' বস্তুতপক্ষে এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল শীঘ্রই। শুধু নতুন কবিদের আবিষ্কার ও তাকে প্রচারের বৃত্তে তুলে ধরা নয়, 'অনুকূল অনুষঙ্গে' তিনি কবিতার পাঠক তৈরি করতেও বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। প্রথম বছরের চারটি সংখ্যায় সম্পাদকীয়গুলি যথাক্রমে 'কবিতার দুর্বোধ্যতা', 'আধুনিকতার মোহ', 'গদ্যছন্দ' ও 'কবিতার পাঠক'। শেষোক্ত রচনায় তিনি বলেছিলেন : 'পৃথিবীতে ভালো কবির সংখ্যা অল্প, ভালো পাঠকের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। এ পর্যন্ত, অন্তত কবিতার ইতিহাস এই রকমই সাক্ষ্য দেয়।'

পূর্বোক্ত সম্পাদকীয় গুচ্ছের 'গদ্যছন্দ' শীর্ষক রচনাটিও খুব উল্লেখযোগ্য, সেসময় গদ্য কবিতাকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল, তাতে কবিদের মধ্যে দুটি স্পষ্ট বিভাজন

পরিলক্ষিত হয়েছিল। বুদ্ধদেব তাঁর সম্পাদকীয়তে গদ্য কবিতার সমর্থনে কয়েকটি যুক্তি দেখিয়েছিলেন। তাছাড়া প্রথম সংখ্যাটি পাঠানোর সময় রবীন্দ্রনাথের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতেও বুদ্ধদেব জানিয়েছিলেন : 'আমরা একটি ত্রৈমাসিক কবিতা পত্র বার করেছি--তার প্রথম সংখ্যা আজ আপনাকে পাঠালাম। একটা জিনিস আপনার চোখে পড়বেই--এ সংখ্যার অধিকাংশ কবিতাই গদ্যে। পুনশ্চতে আপনি যে গদ্যছন্দের প্রবর্তন করেছেন, তা বিভিন্ন কবির হাতে বিভিন্ন রকম রূপ নিয়ে বাঙলা কবিতায় স্থায়ী হ'তে চ'লেছে বলে মনে হয়। আমার নিজের বিশ্বাস, ভবিষ্যতে বাংলা কবিতা পদ্যে যতখানি লেখা হবে গদ্যে তার চেয়ে কম নয়।' ধূর্জটিপ্রসাদ প্রথম সংখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে *কবিতা* পত্রিকাকে 'পুনশ্চ-র পৌনঃপুনিক' বলে আখ্যাত করেছিলেন। প্রথম সংখ্যার বিষয় আর একটি সমালোচনা উল্লেখ্য, সেটি ১৯৩৬-এর ফেব্রুয়ারিতে *টাইম* পত্রিকার সাহিত্য ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হয়, অস্বাক্ষরিত সেই সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির লেখক সে সময়কার একমাত্র শ্বেতাঙ্গ, যিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করে থাকেন, নাম এডওয়ার্ড টমসন। টমসন *কবিতা*-র সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : 'এই কবিরা এমন একটি আন্দোলনের প্রতিভূ, বাংলার চিন্তাকে যা নতুন রূপ দেবে, আর বাংলার ভিতর দিয়ে সর্বভারতীয় চিন্তাকে।'

প্রকাশের পর থেকে পাঁচ বছরে, বাংলা কবিতার অগ্রগতি ও প্রচারের ক্ষেত্রে *কবিতা* পত্রিকার মাধ্যমে বুদ্ধদেব শুধু কবিতার জন্য অত্যন্ত সচেতন নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তদানীন্তনকালে বাংলা কবিতার বৈশিষ্ট্য ও আধুনিকতার ব্যাখ্যায়, অপরাপর তরুণ কবিদের মধ্যে স্পষ্ট দুটি বিভাজন প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধদেব, তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ তরুণ সহযোগী বিষ্ণু দে ও সমর সেনকে নিয়ে যে দলটির নেতৃত্ব দেন *কবিতা* তাঁদের চিন্তার মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য-র নেতৃত্বে সদ্যসৃষ্ট একটি দল আধুনিকতার নামে কবিতার দুর্বোধ্যতা, গদ্যকবিতা, ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব ইত্যাদির বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। প্রকৃতপক্ষে, এই শেষোক্ত দলের মুখপত্র হিসেবে *নিরুক্ত* নামের নতুন একটি ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকার জন্ম হয় বঙ্গাব্দ ১৩৪৭-এর আশ্বিন মাসে। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় *নিরুক্ত* প্রকাশিত হতে থাকে *পূর্বাশা* কার্যালয় থেকে।

কবিতা-র তৃতীয় বর্ষের সূচনাতেই সম্পাদকীয় পরিবর্তনটি উল্লেখযোগ্য, প্রথম সংখ্যাতেই সম্পাদক পদে বুদ্ধদেবের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র-র স্থলে ঘোষিত হল সমর সেনের নাম।। *কবিতা*-র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন প্রেমেন্দ্র, এবং এ-ঘটনাও তাৎপর্যপূর্ণ, *কবিতা*-র প্রথম সংখ্যার অন্যতম কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য, পরবর্তী বছর কবিতার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিলেন। বুদ্ধদেব শেষ সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদক হিসেবে স্থায়ী হলেও *কবিতা*-র চৈত্র ১৩৬৫ থেকে সমর সেনের নাম প্রত্যাহৃত হয়, পরে পৌষ ১৩৬১ থেকে পৌষ ১৩৬৫ পর্যন্ত সহকারী সম্পাদক হিসেবে যুক্ত হন নরেশ গুহ, একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌষ ১৩৬৬ সংখ্যায় সহযোগী সম্পাদকপদে ঘোষিত হন জ্যোতির্ময় দত্ত। চৈত্র ১৩৬৭ *কবিতা*-র শেষ সংখ্যা, পরবর্তী আর মাত্র ক'টি সংখ্যা প্রকাশিত হলে পঁচিশ বছর পূর্ণ হতে পারত। *কবিতা* তার দীর্ঘ সময়ে তেরোটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে, রবীন্দ্র, নজরুল, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ-- এই চারটি সংখ্যার কথা বাদ দিলেও মার্কিন সংখ্যা, ইংলিশ ট্রান্সেলেশন ফ্রম মডার্ন বেঙ্গলি

পোয়েট্রি এবং শততম ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ-ল্যাঙ্গুয়েজ সংখ্যা'টি খুবই উল্লেখযোগ্য। সাড়া জাগানো আন্তর্জাতিক সংখ্যায় ফরাসি, ইতালি, জার্মানি, সার্বোক্রোট ও ইংরেজি ভাষায় রচিত কবিতার মধ্যে প্রথম চারটি ভাষার ইংরেজি অনুবাদ এবং শেষোক্ত ভাষার মূল রচনা ও ভারতীয় ভাষায় বাংলা, ওড়িয়া, গুজরাতি, মালয়ালম ও হিন্দী কবিদের রচনা অনূদিত হল। বাংলা কবিতা স্থান পেয়েছিল তিনটি গুচ্ছে, প্রথম গুচ্ছে আটজন, দ্বিতীয় গুচ্ছে চার জন এবং শেষ গুচ্ছে সাতজন। সম্পাদকীয় ছাড়া পাঁচ পৃষ্ঠা ব্যাপী সাতচল্লিশজন লেখকের পরিচিতি, আর জ্যোতির্ময় দত্ত লিখেছিলেন 'এ নোট অন বেঙ্গলি পোয়েম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ। আজকের দিনে অনেকেই বিস্মৃত, কিন্তু বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। *কবিতা*-র এই বহুশ্রুত শততম সংখ্যাটি, পরবর্তী সময়ে 'বিশেষ সংস্করণ' হিসেবে মুদ্রিত হয়েছিল. সম্ভবত কোনো কবিতার সাময়িক পত্রিকার সংস্করণ এর আগে করার প্রয়োজন হয়নি, অন্য কোনো পত্রিকার পক্ষেও এরকম উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে এমন জানা নেই।

নিরুক্ত প্রথম সংখ্যার আবির্ভাব সংবাদ দিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র কবিগুরুর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে লিখেছিলেন : 'বর্তমান বাংলা কবিতার কোথাও কোথাও যে নকল করা বাতুলতার হুজুগ চলছে তাতে আপনার সহানুভূতি ও স্নেহ থাকতে পারে না বলেই আমার ধারণা। আমাদের মনে হয়েছে গালাগালি দিয়ে নয়, সত্যকার কাব্যাদর্শ যেখানে সম্মানিত এমনতর বাংলা কাব্যের বাহন গড়ে তোলার চেষ্টা করেই হুজুগ ব্যর্থ করা যায়। সেই আশা নিয়েই নিরুক্ত বার করবার আয়োজন করেছি। আপনার আশীর্বাদ ও উৎসাহ আমাদের সর্বাগ্রে একান্তভাবে দরকার।' রবীন্দ্রনাথ নবাগত সাহিত্য বাহনটিকে স্বাগত জানালেন : 'তোমরা কয়েকজন মিলে নিরুক্ত প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছ এ সংবাদে সুখী হয়েছি। কিছুকাল থেকে ভাষার বিকৃতি ছন্দের স্খলন ও ভাবের দুর্বোধ্য অসংলগ্নতা নিয়ে অকবির পথে কবিযশঃপ্রার্থীর সংখ্যা অবাধে বেড়ে চলেছে।' তবু তিনি আশা প্রকাশ করে উপদেশ দিলেন : 'তোমাদের রচনায় তোমরা সাহিত্যের সূক্ষ্ম স্বরূপ প্রকাশ করতে থাকো। সেই দৃষ্টান্তের ফল যতটুকু হয় ততটুকু ভালো।' *নিরুক্ত* প্রথম সংখ্যার প্রথমেই কবিগুরুর চিঠিটির হস্তাক্ষর প্রতিলিপি মুদ্রিত হল। প্রেমেন্দ্র তাঁর সম্পাদকীয়তে লিখলেন : "বাংলা সাম্প্রতিক কাব্যে এমন কয়েকটি লক্ষণ কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে যা অসুস্থ বিকারেরই পরিচয় বলে আমাদের ধারণা; শুধু আমাদের নয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও বাংলা কাব্যের এই উন্মার্গ যাত্রা যে ব্যথিত ও চিন্তিত করেছে, এই সংখ্যাতে উদ্ধৃত তাঁর পত্রটি থেকেই তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে; এই রুগ্ন কাব্যকে নীরবে অবজ্ঞা করা চলত যদি না এর মধ্যে সংক্রামতার বিপদ বর্তমান থাকত। কিন্তু শুধু ভর্ৎসনা বা সমালোচনা এই সংক্রামতার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিষেধক নয়। কাব্যের সুষ্ঠ আদর্শ অটুট রাখবার চেষ্টাই এই সংক্রামক নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করেই 'নিরুক্ত' প্রকাশ করার এই আয়োজন।' এই সম্পাদকীয়কে কটাক্ষ করে *পরিচয়* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : 'নিরুক্তর প্রথম সংখ্যা পড়ে কাব্যের সুস্থ আদর্শ সম্বন্ধে পাঠকের বিন্দুমাত্র জ্ঞান বৃদ্ধি হবে তা মনে হয় না। তবে নিরুক্তর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। পত্রিকাটি শুধু সাম্প্রতিক কবিদের মুখপত্র নয়। প্রমাণ শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের কবিতা এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে

রাজনীতি ক্ষেত্রের মতন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একাধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত। যদি নিরুক্ত সাম্প্রতিক ও অসাম্প্রতিক সকল কবি গোষ্ঠীরই মুখপত্র হয় নিশ্চয়ই তা আনন্দের কথা। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র অভিজ্ঞ সম্পাদক ও কৃতী সাহিত্যিক সুতরাং তাঁর চেষ্টায় এই রকম একটি পত্রিকা গড়ে উঠবে এই আশা করা অসঙ্গত হবে না।' একথা সত্যি *নিরুক্ত*-র প্রথম সংখ্যা দেখে, প্রকৃতপক্ষে পত্রিকাটি সনাতনপন্থীদের না অর্বাচীনদের—সে বিষয়ে যথার্থ সিদ্ধান্তে আসা মুশকিল। কেননা পত্রিকাটির আলোচ্য প্রথম সংখ্যার লেখক তালিকায় রয়েছেন অন্তত তিনজন যাঁরা সনাতনপন্থী হিসাবে সমধিক পরিচিত--মোহিতলাল, সজনীকান্ত এবং যতীন্দ্রনাথ—এঁদের মধ্যে প্রথম দুজন অতি আধুনিকদের নেতৃস্থানীয় বুদ্ধদেব বসুর কট্টর বিরোধী ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কবিতা পত্রিকার অষ্টমবর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (কার্তিক ১৩৪৯ শারদীয়) বুদ্ধদেব তাঁর সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন : 'এই পত্রিকাটির পরিকল্পনা প্রথম যখন আমাদের মনে আসে তখন আমরা এর অভ্যর্থনা সম্পর্কে ঘোর সন্দিগ্ধ ছিলুম, কিন্তু এ ধরনের পত্রিকার যে প্রয়োজন ছিল তার প্রমাণ এই যে কিছুদিনের মধ্যেই পরপর কয়েকটি কবিতা পত্রিকা বাংলাদেশে দেখা দিলে, তার মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত নিরুক্তই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।' কবিতার পঁচিশ বছরের ইতিহাসে বুদ্ধদেব বসুর কলমে এই একবার মাত্র *নিরুক্ত*-র নাম পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে, ভিন্ন কোনো কোনো প্রসঙ্গে সঞ্জয়-এর কথা হয়তো উঠেছে, কিন্তু *নিরুক্ত*-র প্রসঙ্গে নীরব থেকেছেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে কবিতা বিষয়ে ভিন্নতর বোধের থেকেই তাঁদের মত পার্থক্য, উভয়ের সম্পাদনায় তার ছাপও স্পষ্ট।

মাত্র পাঁচ বছর আয়ু ছিল *নিরুক্ত*-র, পঞ্চম বছরের চতুর্থ সংখ্যাই শেষ সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৫২)। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও *নিরুক্ত* বাংলা কাব্য জগতে নিছকই একটি পত্রিকামাত্র ছিল না, জীবনানন্দর তদানীন্তন কাব্যচিন্তার নতুন ফসলকে দ্বিধাহীন উদ্যমে প্রকাশ করার ব্যাপারে কিছুটা দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিল। যদিও একথা ঠিক, সম্পাদকীয় স্তম্ভে নিরন্তর ঘোষণা থাকলেও, *নিরুক্ত*-র মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতার কোনো স্বতন্ত্র ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হয়ত তার সময়ও পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় সূচনা সময়ে প্রধানত *পূর্ব্বাশা*-র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পরই *নিরুক্ত*-র উত্থান, এবং যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তার অবলুপ্তি--ফলে মাত্র বছর পাঁচেকের আয়ুতে কোনো আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যাওয়া খুবই দুরূহ কর্ম। *নিরুক্ত*-র শেষ পর্যায়ে, সঞ্জয়,--প্রায় বছর চারেক স্থগিত রাখবার পর *পূর্ব্বাশা*-র পুনঃপ্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ১৯৪১-৪৩ সালের কালপর্বকে কবিতার ক্রান্তিকাল বলেছিলেন সঞ্জয়, নাম দিয়েছিলেন, 'নিরক্ত'--আন্দোলন। ক্রান্তিকাল কিনা, এবং আক্ষরিক অর্থে কোনো আন্দোলন কিনা, কিংবা সেই আন্দোলনের সার্থকতা বা ব্যর্থতার বিষয় বর্তমান রচনায় বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু একথা মানতেই হয়, কলকাতা থেকে শুরু করে দূর মফসসলে, বাংলা কাব্যচর্চায় ব্যাপৃত আছেন, এমন অনেক অনামা কবিকে তিনি *নিরুক্ত*-র মাধ্যমে প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

অন্যদিকে *নিরুক্ত*-কে *কবিতা*-র প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা বলে ভাবেননি বুদ্ধদেব বসু। তবে একবারই নামমাত্র উল্লেখ ছাড়া কোনো উচ্ছ্বাস দেখাননি কোনো সময়, তবে যে সংখ্যার সম্পাদকীয়তে *নিরুক্ত*-র প্রসঙ্গ তুলেছিলেন তার সঙ্গে আরও দুটি পত্রিকার কথাও বুদ্ধদেব

বলেছিলেন। একটি সুশীল রায় সম্পাদিত *জীবানু* এবং অন্যটি শুদ্ধসত্ত্ব বসু সম্পাদিত *একক*-তবে এ দুটির মধ্যে প্রথমটি নিতান্তই ক্ষীণজীবী, কিন্তু শেষোক্তটি বাংলা ভাষায় দীর্ঘস্থায়ী কবিতা পত্রিকার মধ্যে অন্যতম। তবে *কবিতা*-র মতো *একক* নতুন কাব্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে তরুণ কবিদের উপর তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি, যদিও খ্যাত অখ্যাত কবিদের প্রচুর কবিতা বহুদিন ধরে প্রকাশিত হয়ে *একক*-এর অস্তিত্ব সজাগ রেখে কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে অন্যতর দায়িত্ব পালন করেছে। *কবিতা* পত্রিকা প্রথম পনেরো বছর প্রায় ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখলেও ১৩৫৭-৫৮ বঙ্গাব্দে কিছুটা অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল, শুধু যে আর্থিক কারণ এর জন্য দায়ী তা নয়--কখনো কখনো সম্পাদকের বিদেশ বাসের কারণে তার গতি মন্থর হয়েছিল। বুদ্ধদেব তাঁর সম্পাদনার ধারাবাহিকতায় পূর্বোক্ত ১৩৫৭-৫৮ বর্ষকাল বাদ দিয়েছিলেন, একুশ বছর আরম্ভ করতে গিয়েও সেটিকে বিংশ বর্ষ হিসেবেই চিহ্নিত করে সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন : 'তা কুড়ি হোক বা একুশ হোক, কোনো কবিতা-পত্রিকার পক্ষে আমরা বড়ো দীর্ঘকাল টিকে আছি, এ-কথা এখন মানতেই হয়। হয়তো অসংগত রকম দীর্ঘকাল। পাঁচ, সাত, দশ বছরের উজ্জ্বল জীবনের পরে আমরা যদি অবসতি হতুম, সেইটাই যেন স্বাভাবিক হতো, সাহিত্যের উত্তম ঐতিহ্যের অনুগামী। ক্লান্তি নামে নি তা নয়, অন্ধকার প্রহর আমরা জেনেছি, কিন্তু সেই মুমূর্ষুতা অতিক্রম করার প্রেরণা কখনো হারিয়ে যায় নি, তা যেন এই পত্রিকারই প্রবাহের মধ্যে নিহিত ছিলো ; তারই আদেশ পালন করে চলেছি আমরা।'

বিংশ বর্ষের শুরু থেকে *কবিতা*-য় অনুবাদের একটা প্রাধান্য লক্ষ করার মতো। প্রধানত বুদ্ধদেব ও বিষ্ণু দে বিদেশি কবিতার অনুবাদ করছেন, রিলকে, হোল্ডারলিন, বদলেয়ারের কবিতার পাশাপাশি কালিদাসের মেঘদূত অনুবাদে সম্পাদক মনোযোগী। কিন্তু আধুনিক বাংলা কবিতার তদানীন্তন তরুণতর কবিদের প্রধান এবং সম্মানজনক বাহন হিসেবে *কবিতা*-র ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এমনকী *কবিতা*-য় প্রকাশিত হওয়ার মাপকাঠি দিয়েও তরুণতর কবিরা তাঁদের পারস্পরিক মূল্যায়ন করতে চাইতেন। বিংশ বর্ষের পূর্বোক্ত সম্পাদকীয়র অপর একটি অংশে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন : "আজ ভেবে দেখলে মনে হয়, 'কবিতা' আরম্ভ হয়েছিলো কবিতার পত্রিকা রূপে নয়, কবিদের পত্রিকা-রূপে। অর্থাৎ, প্রতি সংখ্যায় কিছু কবিতা—এমনকি, কিছু ভালো কবিতা ছাপা হবে, আমাদের লক্ষ্য ঠিক এই রকম ছিল না ; সমসাময়িক সৎ কাব্যের সমগ্র ধারণাটিকে আমরা এর মধ্যে সংহত করতে চেয়েছিলাম। একটি সৌভাগ্যময় সমাপতন আমাদের সহায় ছিলো ; তিরিশের বছরগুলিতে যে-সব কবিরা নতুন দৃষ্টি ও নতুন সুর নিয়ে এসেছিলেন, যাঁদের ক্রিয়াকলাপ কোনো সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কাব্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তাঁদেরই বাহন এবং প্রচারক-রূপে আমাদের যাত্রারম্ভ। তারপর এই কুড়ি বছরে আরো অনেক তরুণতর সঙ্গ পেয়েছি ; পেরিয়ে গেছি বিতর্ক, সহ্য করেছি বিচ্ছেদ, দেখেছি খ্যাতির উত্থান ও পতন, তুচ্ছ এবং মহৎ পরিণাম।"

জীবনানন্দর প্রয়াণের পর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রয়াণে বুদ্ধদেব অত্যন্ত ব্যথিত বোধ করেছিলেন। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কর্মময় *কবিতা*-র রঙ্গভূমি থেকে নিজেকে একটু ভিন্ন অর্থে গুটিয়ে নেবেন। পঞ্চবিংশ বর্ষ প্রথম-দ্বিতীয় যুগ্ম সংখ্যাটি 'সুধীন্দ্রনাথ স্মৃতি

সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশিত হয়, পরের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশের পর তিনি ভেবেছিলেন আর একটি সংখ্যা প্রকাশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত আবু সয়ীদ আইয়ুবকে পত্রে (১ নভেম্বর ১৯৬১) লিখেছিলেন : 'একটা খবর জানানো হয়নি : "কবিতা"র আর একটি সংখ্যা বেরোবে তারপর বন্ধ করে দেবো।' শেষপর্যন্ত অবশ্য সেটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। তবে উল্লেখ্য, সর্বশেষ সংখ্যাটি প্রকাশের সময় বুদ্ধদেব বিদেশে, তাঁর অনুপস্থিতিতে সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন জ্যোতির্ময় দত্ত, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্রাজিৎ দত্ত--যদিও সম্পাদক-প্রকাশক-মুদ্রাকর হিসেবে বুদ্ধদেবের নামই মুদ্রিত হয়েছে।

পত্রিকা প্রকাশনায় বুদ্ধদেব ছিলেন সব বিষয়েই মনোযোগী, মুদ্রণ বিষয়ে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে, বানান ও যথাযথ পংক্তিবিন্যাস বিষয়ে সতর্ক। শুধু পাঠ্য বিষয়ের মুদ্রণ নয়, বিজ্ঞাপনগুলির হরফ বিন্যাসেও তাঁর সমান আগ্রহ। সর্বোপরি সম্পাদনা কর্মে তাঁর সযত্ন দক্ষতা ও অতিপরিচ্ছন্ন রুচিবোধের পরিচয় উত্তরকালের সম্পাদকদের কাছে শিক্ষণীয় হয়ে আছে আজও। বাংলা কবিতার বর্ধমান প্রচারে তিনি নিরন্তর নব নব উদ্যোগ নিয়েছেন, অপেক্ষাকৃত তরুণ অপরিচিত কবিদের গ্রন্থ প্রকাশে 'যে সদ্যগর্ভিণীর অরুচি' ছিল প্রকাশকদের, তা তাঁরই পরিচর্যায় অবসিত হতে হতে দ্রুত চরম সার্থকতায় পৌঁছেছিল। তা সত্ত্বেও একদিন সে পত্রিকা বন্ধ করে দিতে হল কেন, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি একবার জানিয়েছিলেন, 'আসলে ইচ্ছেটাই মন থেকে সরে গিয়েছিল। তার কারণ কিছুদিন ধরেই আমার মনে হচ্ছিল যে, বছরে চারটি সংখ্যা ভরাবার মতোও চলনসই রকমের ভালো কবিতা ও সমালোচনা পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু একেবারে আসল কারণ বোধ হয় এই যে, আমি নিজেই পত্রিকা পরিচালনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। নিজের জন্য নিজের বোঝার জন্য আরও বেশী সময় চাচ্ছিলাম। পত্রিকা সম্পাদনা যৌবনের কাজ। যৌবন পেরিয়ে এসে তা না করাই উচিত।' কবিতা মনস্ক যে কোনো পাঠক স্বীকার করবেন, বিগত শতাব্দীর বাংলা কাব্যচর্চায়, আধুনিক কবিতার বিবর্তনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা--একটানা প্রায় পঁচিশ বছর ব্যাপী *কবিতা* পত্রিকার প্রকাশ।

নামজাদা বা অনামজাদা যার লেখাই হোক না কেন--শ্রদ্ধার সঙ্গে ছাপতে হবে এই রুচি তৈরি করে দেওয়ার পেছনে *কবিতা* দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহ্য তৈরি করেছিল। পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার বছর ছয়-সাত আগে একটি প্রবন্ধে বুদ্ধদেব আধুনিক বাংলা কবিতার জন্য যে 'একান্ত রঙ্গমঞ্চ'টি প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন তার ফলশ্রুতি পর্যালোচনা করে এরকম একটি পত্রিকার প্রয়োজন ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলেছিলেন : 'সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে শুধুমাত্র কবিতাকে এই প্রাধান্য দেবার প্রয়োজন ছিলো, নয়তো সেই উঁচু জায়গাটি পাওয়া যেতো না, যেখান থেকে উপেক্ষিত কাব্যকলা লোকচক্ষুর গোচর হতে পারে। 'কবিতা' যখন যাত্রা করেছিলো, সেই সময়কার সঙ্গে আজকের দিনের তুলনা করলে এ-কথা মানতেই হয় যে কবিতা নামক একটা পদার্থের অস্তিত্ব বিষয়ে পাঠক সমাজ অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন, সম্পাদকেরাও একটু বেশি অবহিত—এমন কি সে এত দূর জাতে উঠেছে যে কবিতা লিখে অর্থপ্রাপ্তির আজকের দিনে কল্পনার অতীত হয়ে নেই।'

তিন

কবিতা-র শেষের দিকে বছরে চারটে সংখ্যা ভরাবার মতো ভালো লেখা পাচ্ছেন না, এরকম ধারণা থেকে বুদ্ধদেব পত্রিকাটি তুলে দেবার কথা ভেবেছিলেন। অন্যদিক থেকে বুদ্ধদেবের *কবিতা* পত্রিকার আদর্শের সঙ্গেও একমত হতে পারছিলেন না একদল তরুণ কবি, তাঁরা মনে করতেন : "বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' সেই ধরনের কবিতা বিষয়েও পক্ষপাত প্রমাণ করতো যা তিরিশের দশকের কবিদেরই প্রতিধ্বনি, নতুন কোনো কাব্য আন্দোলন যে শুরু হতে পারে এমন ধারণা 'কবিতা' পত্রিকার ছিল না।" এরকম মনে হওয়া থেকেই তাঁদের নিজস্ব একটা পত্রিকার পরিকল্পনা প্রথম মাথায় এসেছিল যে দুজনের, তাঁদের একজন আলোক সরকার, সদ্য বি. এ. পাশ করা বেকার যুবক। আর অন্যজন দীপংকর দাশগুপ্ত, পুরোপুরি বেকার নয়, *গণবার্তা*-র সাংবাদিকতা বিষয়ে শিক্ষানবিশি করে মাসিক দশটাকা হাত খরচা পান। আলোক সরকার জানিয়েছেন : 'আলফা কাফে নয়, 'শতভিষা'র প্রথম পরিকল্পনা হয়েছিলো রাসবিহারী আর মহীশূর রোডের মোড়ের এক ছোট্ট চায়ের দোকানে।' আর সেই পরিকল্পনার প্রতিষ্ঠাকালীন উদ্দেশ্য কী ছিল সে সম্পর্কেও তিনি জানিয়েছেন : "কবিতার কাগজ বের করতে হবে যার লক্ষ্য শুধু কবিতাই। কবিতার কাগজ বের করতে হবে কেবল আধুনিক কবিতার জন্য--আধুনিকতা অর্থাৎ প্রবহমানতাকে মেনে নিয়ে বিশ্বপ্রকৃতি বারে বারেই ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত নতুন, সেই ব্যক্তিকতাই হবে আমাদের অন্বিষ্ট। 'শতভিষা' তরুণ কবিদের মুখপত্র নয় ; প্রবীণ কবিদের মুখপত্র নয়, কবিতার ব্যাপারে বয়স-বিচার হাস্যকর ; 'শতভিষা' কবিতারই মুখপত্র, যে কবিতা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করে না, ফ্যাশনের দাসত্ব করে না, হুজুগে মাতে না, যে কবিতা ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত, একই মঞ্চে সৌন্দর্যময় অ-পূর্ব বস্তু নির্মাণ ক্ষমতার প্রজ্ঞা প্রমাণ করতে সক্ষম।' আলোক এও জানিয়েছেন : " 'শতভিষা'র সমস্ত পরিকল্পনাটাই দীপংকর দাশগুপ্তর। খরচের টাকা যেমন প্রায় সবটাই তিনি দিতেন, সেই রকম 'শতভিষা'-র প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন তিনি। আমি প্রধান পরামর্শদাতা, সঙ্গে তরুণ মিত্র।"

সিদ্ধান্ত মতো প্রথম সংখ্যাটি ১৩৫৮ শারদীয় সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়। 'পূর্বরঙ্গ' নামে একটি ছোটো গদ্যে *শতভিষা*-র পক্ষ থেকে দীপংকর তদানীন্তন পরিস্থিতিতে একটি কবিতা সংকলনের উদ্যমকে যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে 'দুঃসাহসিক বলে অভিহিত করা যেতে পারে' মন্তব্য করে জানালেন : 'প্রশ্ন ওঠার অবকাশ আছে : সংকলনের হাটে আরো একটি মৃতের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভই বা কী, আর এমন কী দৃষ্টিভঙ্গিই বা এর মধ্যবর্তীতায় প্রচারিত হবে, যাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানানো যেতে পারে? স্পষ্টতঃ কবিতা সম্পর্কে একটি দৃষ্টিভঙ্গি কেই আমরা আপাতত মর্যাদা দেবো, সেটি হল কবিতার রসোত্তীর্ণতা, তা কবিতার বিষয় চাঁদ-ফুল-পাখিই হোক আর মিছিল-ধর্মঘট-নিয়েই হোক, কেন না কবিতায় কী মতবাদ প্রচারিত এবং তা গ্রাহ্য কিনা সেটা পাঠকদের বিচার্য। কোনো সার্থক দৃষ্টিভঙ্গি এ সংকলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে যদি, কোনো স্মরণযোগ্য কবিতা এতে প্রকাশিত হয়, তবে নিজেদের গৌরবান্বিত অবশ্যই মনে করবো। আর কাব্যানুরাগীদের যথোচিত সমাদর পেলে সংকলনটির অপমৃত্যু ঘটবে না বলেই মনে করি। কবিতা আজকাল কেউ বড় একটা পড়েন না বলে অভিযোগ সুপ্রচলিত, তবু যাঁরা পড়েন, তাঁদের মুখ চেয়েই আমাদের অভিযাত্রা।' পত্রিকাটির

প্রকাশ সংক্রান্ত আরও কিছু তথ্য জানিয়ে এরপর তিনি লিখলেন : 'স্থির হয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে সংকলনটির আয়তন ষোল পৃষ্ঠাই রাখা হবে ; এর ক্ষুদ্র পরিসরে স্থান লাভ করবে কবিতা আর কবিতা সম্পর্কিত ছোট্ট একটি প্রবন্ধ বা আলোচনা। কবি মাত্রেই এখানে সাদরে আমন্ত্রিত এবং চারপৃষ্ঠার মধ্যে প্রকাশিত হতে পারে কবিতা সম্পর্কিত এমন যে কোনো মনোজ্ঞ প্রবন্ধও এ-সংকলনের উপযোগী।'

শতভিষা-র উদ্যোগীরা প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন, 'যা কিছু কবিতা নয় তাকে কবিতা থেকে বাদ দিতে হবে।' এই বিশুদ্ধ কবিতার ধারণা সামনে রেখেই তাঁদের পত্রিকার সূচনা। আলোক সরকার পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণে জানিয়েছিলেন : 'পঞ্চাশের আগের দশক চল্লিশের দশক, বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি চরম বিপর্যয়ের সময়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, রাজনৈতিক অস্থিরতা, আগস্ট আন্দোলন এবং পরিশেষে দেশ বিভাগ ও তজ্জনিত উদ্বাস্তু ছিন্নমূল মানুষের অস্থির হাহাকার সব মিলিয়ে সে একটা দুঃস্বপ্ন পটভূমি। তার প্রভাব অবধারিতভাবে আক্রমণ করেছিল বাংলা কবিতাকে--ব্যঙ্গ বিদ্রূপ চিৎকার অসহায় হাহাকারে বাংলা কবিতা হারিয়েছিল তার অবিমিশ্র মনটি। আমরা কবিতাকে আবার কবিতার কাছে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলুম। কবিতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলুম তার বিশুদ্ধ পটভূমিতে। কবিতা কোনো অর্থেই ঘোষণা নয়--সে ঘোষণা শরীর ধর্মেরই হোক বা সমাজ বিদ্যার পরিকল্পনার। কবিতার কাজ শুধু কবিতা হয়ে ওঠা তার বেশি কিছু নয়।' এদিক থেকে তাঁরা ছিলেন 'একই সঙ্গে বিদ্রোহী ও শিকড় সন্ধানী', পূর্ববর্তী কবিদের সম্পূর্ণ সরিয়ে রেখে নতুন কোনো অভিযাত্রা নয়। যদিও পূর্ববর্তী কাব্যধারায় সন্তুষ্ট ছিলেন না তাঁরা তা সত্ত্বেও পূর্ববর্তী অগ্রগণ্য যাঁরা তাঁদেরকেও অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

নতুন-পুরাতনের সম্মেলনের উদ্যোগে চল্লিশের কবিদের পাশাপাশি তাই সদ্যতনের সংযোগ। প্রথম সংখ্যার তরুণতমদের মধ্যে পরবর্তীকালে কাব্যক্ষেত্রে অনেকেই পরিচিতি লাভ করেছিল। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুটি কবিতা দিয়ে সংখ্যাটির সূচনা ; তারপর যথাক্রমে অরুণকুমার সরকার, অরবিন্দ গুহ, কল্যাণ সেনগুপ্ত, আলোক সরকার, মানস রায় চৌধুরী, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র বিশ্বাস, নরেশ গুহ, শ্রীমৃণালকান্তি, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য, কবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, এছাড়া ইয়েটস-এর অনুবাদ করেছেন তরুণ মিত্র, সবশেষে *শতভিষা*-র পক্ষ থেকে 'পূর্বরঙ্গ' শীর্ষক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন দীপংকর দাশগুপ্ত। *শতভিষা*-র প্রথম সংখ্যায় অনুপস্থিত কিন্তু পরবর্তীকালে ডাকযোগে আমন্ত্রিত হয়েছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আর ডাকযোগে পাঠানো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের তৃতীয় কবিতা 'ঝর্নাকে' মুদ্রিত হল ষষ্ঠ সংকলনে। অলোকরঞ্জন যুক্ত হলেন তৃতীয় সংকলনে। শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে *শতভিষা*-র সংযোগের সময় লেগেছে আট বছর, কেন না উদ্যোক্তারা তাঁর ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারেননি। অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সংযুক্ত হয়েছেন, কিন্তু আলোক সরকারের মতে প্রেমেন্দ্র মিত্র তখন গান লিখছেন বলে আমন্ত্রিত হননি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতার বিনিময়ে অন্তত সামান্য সম্মান দক্ষিণার কথা বলেছিলেন, তাই আর্থিক সঙ্গতিহীন তাঁরা পরে যোগাযোগে অনিচ্ছুক থেকেছেন। জীবনানন্দ দাশ তাঁদের উপেক্ষা করেননি, তৃতীয় সংকলনেই যুক্ত হয়েছেন, যদিও তাঁদের কাব্যচর্চায় তখন প্রধান বাধা হয়ে আছেন জীবনানন্দই, কেননা তাঁর প্রভাব কাটিয়ে সত্যিকার নতুন কিছু

করা একটা ভয়ানক কঠিন ব্যাপার। এমন কি পত্রিকার নামকরণে যে নক্ষত্র প্রেমের দ্যুতি, হয়তো জীবনানন্দের কবিতায় উপেক্ষিত এই নক্ষত্রকে স্মারক হিসেবে গণ্য করে নিজেদের যাত্রাপথকে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন।

শতভিষা প্রকাশের বছর খানেক বাদে মেডিক্যাল কলেজের কয়েকজন ছাত্র সুবোধ গুপ্ত কবিরাজকে সম্পাদক করে *ময়ূখ* নামে একটি কবিতার পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে শারদীয় সংখ্যা হিসেবে। এক ফর্মা ষোলো পাতা, দশ পয়সা মূল্যের *ময়ূখ* দ্বিতীয় মলাট থেকে চতুর্থ মলাট পর্যন্ত শুধু কবিতায় ঠাসা, কোনো সম্পাদকীয় লেখার জায়গা হয়নি। এক বছর চলার পর সেটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৩-তে তরুণ ডাক্তার ছাত্র ভূমেন্দ্র গুহ নতুন করে উদ্যোগ নিয়ে পত্রিকাটিকে নিয়মিত করেন। তখন সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হয় জগদীন্দ্র মণ্ডল ও সমর চক্রবর্তীর উপর। পত্রিকাটি প্রথমে ছিল দ্বিমাসিক, পরে ত্রৈমাসিক হয়ে একটা সময় ইচ্ছায়িক ভাবে প্রকাশিত হয়ে একেবারে বন্ধ হয়ে যায় ১৯৫৮-তে। তাঁদের এই কালপর্বে 'জীবনানন্দ স্মৃতি' (পৌষ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১-৬২) সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় যেটি জীবনানন্দের বিষয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংখ্যা হিসেবে আজও অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এই পত্রিকায় প্রধান নেতৃত্বের দায়িত্বে ছিলেন ভূমেন্দ্র গুহ, তিনিই স্নেহাকর ভট্টাচার্যকে প্ররোচিত করেন, এবং স্নেহাকরের আগ্রহে পূর্বোক্ত সমর, জগদীন্দ্র এবং প্রতাপ গোস্বামী--প্রধানত টিউশনির টাকার উপর ভরসা করেই পত্রিকাটি চালিয়েছিলেন। সভাসমিতি, হই-চই করে চারদিক মাতিয়ে কবিতাচর্চায় তাঁরা কোনো আন্দোলনের অংশীদার হয়ে কিছু করতে চাননি। বরং বলা যায় নিও ক্লাসিক বা রোমান্টিক কাব্যচর্চায় তাঁরা বিশেষ মনোযোগী। প্রবীণ নবীন কোনো ভেদরেখা তৈরি করেও তাঁরা পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হননি, তবে সম্পাদনার সময় একটা অলিখিত নিষেধাজ্ঞা পালন করে চলতেন, সেটা হল--সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে এবং বুদ্ধদেব বসুর কবিতা তাঁরা ছাপবেন না। কারণ--সুধীন্দ্রনাথকে মনে হত খুব উঁচু মার্গের, তাঁদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। বিষ্ণু দে-র তাত্ত্বিকতায় তাঁদের আগ্রহ ছিল না, বিশেষ করে মার্ক্সিজম না অনুসরণ করলে কবিতা লেখা যাবে না, এ ধারণায় তাঁদের বিশ্বাস ছিল না। বুদ্ধদেবকে মনে হত, নারী ও প্রেম ছাড়া তাঁর কাছে অন্য কোনো বিষয়ই নেই। তবু বুদ্ধদেবের বদলেয়ার অনুবাদ সংগ্রহ করে এনেছিলেন কোনো বন্ধু, সেটিই একমাত্র কোনোভাবে ছাপা হয়ে যায়। তাঁরা জীবনানন্দ ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে খুব কাছের মানুষ মনে করতেন--এঁদের দুজনের প্রতি তাঁরা অনুরাগ পোষণ করতেন।

প্রথমবার *ময়ূখ* প্রকাশের পর, *পরিচয়* পত্রিকায় (পৌষ ১৩৫৯) একটি ঘোষণায়, 'প্রগতিশীল বাংলা কবিতার ত্রৈমাসিক মুখপত্র' হিসেবে প্রকাশিত *সীমান্ত* নামে একটি পত্রিকার কথা জানানো হয়। মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত সেই পত্রিকাটি কেন প্রকাশ করা হচ্ছে, সে বিষয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, মৃগাঙ্ক রায়, ও সিদ্ধেশ্বর সেন, ননী ভৌমিক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম রায়, রাম বসু, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, পূর্ণেন্দু পত্রী, মণীন্দ্র রায় স্বাক্ষরিত একটি পত্রাকার প্রতিবেদনে পত্রিকাটি প্রকাশের বিষয়ে জানানো হয় : 'বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই পরিবর্তিত বাস্তব সত্যকে প্রতিফলনের তাগিদে বাংলা কবিতা উল্লেখযোগ্য মোড় নিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সময় এবং তার পরবর্তী দশকে ভঙ্গিবাহুল্য এবং একান্ত

বুদ্ধিনির্ভরতার ফলে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত উপভোগের বস্তু হয়ে ওঠায়, বৃহত্তর পাঠক সাধারণের কাছ থেকে কবিতা যে ক্রমশ অনেকখানি দূরে সরে গিয়েছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই সময়টা বেশীর ভাগই ব্যয়িত হয়েছে আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আর সেদিক থেকে তৎকালীন অনেক কবির মূল্যবান প্রয়াস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তবু লেখক পাঠকে যোগাযোগের প্রয়োজনীয় কর্তব্য যে তখন অবহেলিত কিংবা অসমাপ্ত থেকে যাচ্ছিল তা মানতে হবে।' *সীমান্ত* তার পাঠকদের কাছে কোন 'প্রচেষ্টা ও সার্থকতারই ইতিহাস' বহন করে আনতে চায়, তার সংক্ষিপ্ত কর্মধারা বিষয়ে তাঁরা জানালেন : 'কিন্তু পঞ্চম দশকে কবিদের যাত্রা শুরু হল স্পষ্টতর সমাজ বাস্তবের মুখোমুখি। ভঙ্গিমাত্র নয়—নতুন জীবনবোধের অঙ্গীকার, বুদ্ধিগ্রাহ্য, নিতান্ত গোষ্ঠী নির্ভরতা নয়—পূর্ববর্তীদের পরীক্ষালব্ধ ফল আত্মস্থ করে সার্বজনীন আবেগের স্বভূমিতে কবিতার প্রতিষ্ঠা, এই হল শেষোক্তদের সাধনা। আজ কবিতার মাধ্যমে দেশের বৃহত্তম জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করে কবিতাকে করে তুলতে হবে জাতির দর্পণ।' তাঁরা এই ঘোষণায় উল্লেখ করেছিলেন : 'প্রথম সংখ্যা আগামী জানুয়ারিতে প্রকাশিতব্য'--কিন্তু সামান্য বিলম্বে সেটি প্রকাশিত হল চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯-৬০ সংখ্যা হিসেবে। সম্পাদকীয়তে পূর্বের ঘোষণাটির সারমর্মই সংক্ষেপে উল্লেখিত হল : 'সুস্থ এবং শান্তিকামী সামাজিক জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করাই এ পত্রিকার উদ্দেশ্য। সেইজন্য একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠিত এবং নবাগত লেখকদের সহযোগিতায় বাংলা কবিতাকে আমরা আঙ্গিকগত ত্রুটি থেকে মুক্ত করে স্বচ্ছন্দ ও প্রাণবান করে তুলতে চাই, অন্য দিকে তেমনি দেশপ্রেমিক পাঠক-সাধারণের আন্তরিক প্রীতির সমর্থনে কাব্যসাহিত্যকে আমরা জাতীয় মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাই।'

সীমান্ত প্রকাশিত হত মণীন্দ্র রায়ের ১/১ ঘোষাল স্ট্রীট, কলকাতা-১৯ ঠিকানা থেকে, দু-মাসের ব্যবধানে উত্তর কলকাতা থেকে বঙ্গাব্দ ১৩৬০-এর শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হল *কৃত্তিবাস* নামের আর একটি পত্রিকা। সম্পাদক তিনজনই কলেজ পড়ুয়া যুবক, আনন্দ বাগচী, দীপক মজুমদাব ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। শেষোক্ত দু-জন আবাল্য সহপাঠী, এঁদের মধ্যে দীপক ছাত্রাবস্থাতেই অনেক খ্যাতি-অখ্যাতির অধিকারী এবং রীতিমতো একজন রোমাঞ্চ-বিলাসী, 'স্কুল-বয়স থেকেই বাউণ্ডুলে ও বিখ্যাত, বামপন্থী রাজনীতিতে জড়িয়ে দু-বার সে জেল খাটে এবং তখনই প্রখ্যাত সব পত্রপত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। তুলনায় সুনীল নিরীহ প্রকৃতির—কবি বা কাগজের সম্পাদক হওয়ার চেয়ে জাহাজের চাকরি নিয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোর ভবিষ্যৎ স্বপ্নে মগ্ন, যদিও নিছকই কৈশোর প্রণয়ের তাড়নায় কয়েকটি কবিতা লিখে ফেলেছে সে, এবং তাঁর পাঁচ-ছটি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের অনুকরণে এখনই এই দুই যুবক কবির একটি কাব্য সংকলন প্রকাশিত হওয়া উচিত—এই বিবেচনায়, অত্যুৎসাহী দীপক এমন একটি নতুন কবিতার বইয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যার প্রচ্ছদে থাকবে রামকিঙ্কর বেইজের করা স্কেচ, অন্যান্য আনুষঙ্গিক অঙ্গসজ্জার দুর্লভ সম্মান পাবেন সত্যজিৎ রায়ের মতো কৃতী শিল্পী এবং অবশ্যই গ্রন্থটির প্রকাশক হবেন ভারতবিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা সিগনেট প্রেস। 'বাস্তব বিবর্জিত দুই অর্বাচীন' এক রবিবারের সকালে সরাসরি পাণ্ডুলিপি সমেত উপস্থিত হলেন সিগনেট প্রেসের সদর দপ্তরে, দিলীপকুমার গুপ্তর সঙ্গে কথা বলতে যিনি লেখক বা প্রকাশক

মহলে ডি. কে, নামেই পরিচিত। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রচারে সিগনেট প্রেস সদা কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে সদ্যতন এই নতুন দুই যুবকের প্রস্তাব অবহেলা না করে বরং উলটে তিনিই তাঁদের অন্যতর একটি পরামর্শ দেন। শুধু দুজনের কাব্য সংকলনের পরিবর্তে 'সদ্যকালের বাংলা কবিতার ছবি ফুটে উঠবে' এমন একটি পত্রিকা প্রকাশে তাঁদের অনুপ্রাণিত করে, পত্রিকাটির নামকরণও করে দেন তিনি।

কৃত্তিবাস—অর্থাৎ আদি কবির নামে পত্রিকার নাম, তাতে লিখবে শুধু তরুণতর কবিরা। তরুণরা বিপ্লব, ধ্বংস বিস্ফোরণ যা কিছু ঘটাক, সূত্র থাক বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যে—এই ছিল নামকরণের প্রধানতম উদ্দেশ্য। ডি. কে. উপদেশ দিলেন, 'লিটল ম্যাগাজিনের দায়িত্ব শুধু নতুন ধরনের রচনা প্রকাশেই শেষ নয়, পত্রিকার চেহারা ও ছাপার ব্যাপারেও অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা দরকার।' প্রথম সংখ্যার মলাটের ডিজাইন, ব্লক, কাগজ, লে-আউট সবই তাঁর ভাবনাপ্রসূত, এবং এ ঘটনাও উল্লেখ্য, শুধু মলাট ছেপে দেওয়ার ব্যবস্থা করেননি, একবার পছন্দ না হওয়ায় দ্বিতীয়বার ছাপবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া প্রথম সংখ্যার প্রয়োজনীয় কাগজ তিনি সরবরাহ করেছিলেন একটি মাত্র বিজ্ঞাপনের পরিবর্তে।

সম্পাদকত্রয়ের মধ্যে দীপক-এর লক্ষ্য ছিল, সবদিক থেকেই একটা অভিনব উদ্যোগ হিসেবে *কৃত্তিবাস*-কে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। 'মূল্যবান কাগজ, পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, প্রতিপৃষ্ঠায় উপরে নীচে ওয়েভরুল', আবির্ভাব মুহূর্তেই মর্যাদাবান প্রকাশন হিসেবে পাঠক মহলে দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আকার ডাবল ডিমাই, ষোলো পৃষ্ঠা, আড়াই ফর্মার দু-পাতা বিজ্ঞাপন বাদে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা আটত্রিশ, ছ-আনা মূল্যের প্রথম সংখ্যাটি ছাপা হল পাঁচশো কপি। কোনো রকম বিজ্ঞাপন বা পূর্বপ্রচার ছাড়াই পত্রিকাটি একদিন সর্বসমক্ষে এসে পড়ে হঠাৎ। শুরুতেই দু-পাতা অস্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়, পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে শান্ত কণ্ঠে জানানো হয় : 'কৃত্তিবাস বাংলাদেশের তরুণতম কবিদের মুখপত্র। একেবারে তরুণদের সার্থক না হলেও ভাল নতুন কবিতার গতিপথের একটা নিরিখ যাতে পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যেই তাঁদের কবিতা এতে একত্র করা হবে। আলোচ্য সম্পাদকীয়তে স্পষ্ট করে তরুণদের একটি গোষ্ঠী বা দল গড়ে তোলার চেষ্টার কথা বলা হল এবং এও জানানো হল, তদানীন্তন পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) কবিদের সঙ্গে পরবর্তী সংখ্যা থেকে যোগাযোগ করা হবে। পাঠক-পাঠিকাদের সহৃদয় সহযোগিতায় *কৃত্তিবাস* কল্পতরু হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় পাঁচ ফর্মা নিয়মাবলিও উল্লেখ করলেন, যার একটিতে তাঁরা জানিয়ে দিলেন : 'কৃত্তিবাসে তরুণতম কবিদের ভাল ভাল কবিতা সাদরে গ্রহণ করা হবে। কৃত্তিবাসের জন্য প্রবন্ধ লিখবেন আধুনিক বাংলা কবিতার পূর্বসূরীরা।' রচনা, চিঠিপত্র, টাকাকড়ি পাঠানোর জন্য প্রথম সংখ্যার পরিকল্পক ও অধিকাংশ রচনার সংগ্রহকারী দীপক মজুমদারের বাসস্থান ১২/১ মহারানী হেমন্তকুমারী স্ট্রিট কলকাতা ৪ ঠিকানাটি ব্যবহার করা হল। প্রথম সংখ্যায় গদ্য লিখলেন : সমর সেন ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। কবিতা লিখলেন : শঙ্খ ঘোষ, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, আলোক সরকার, অরবিন্দ গুহ, শিবশম্ভু পাল, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, অন্নপূর্ণা বাগচী, বটকৃষ্ণ দে, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আনন্দ বাগচী, দীপক মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সবশেষে 'কাব্যসভা' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন লেখক সু. গ. সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রথম সংখ্যায় 'কোনো লড়াকু মনোভাব' না থাকলেও, তিন চারটি সংখ্যা প্রকাশের পরই

পত্রিকাটি উগ্র আধুনিকদের লড়াইয়ের মুখপত্র হয়ে ওঠে। যদিও পরপর তিনটি সংখ্যা প্রকাশের পরই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যেতে পারত, কেন না প্রধান উদ্যোক্তা দীপকের ধৈর্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। আনন্দ বাগচী কোনোদিনই পত্রিকা প্রকাশের বাস্তব ব্যাপারে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু ততদিনে সুনীল 'একাই এই পত্রিকার হাল ধরতে উদ্যোগী হবার মতো সাহস সঞ্চয়' করতে পেরেছিলেন। প্রথম থেকেই তাঁর ধারণা তৈরি হয়েছিল, 'পাঁচ দশজন মিলে চাঁদা তুলে পত্রিকা চালানো একটা অবাস্তব ব্যবস্থা। পত্রিকার দায়িত্ব বিশেষ একজনকেই নিতে হয়।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দ্বিতীয় সংখ্যা যথাসময়ে প্রকাশিত হয়নি বলে প্রকাশকালীন সময় হিসেবে হেমন্ত উল্লেখ করা হল, তেমন তৃতীয় সংখ্যায় ঋতু কিংবা মাসের উল্লেখ না করলেও বোঝা যায়, শীত অতিক্রম করে সংখ্যাটি বসন্তে প্রকাশিত হয়েছিল। চতুর্থ সংখ্যায় এসে কৃত্তিবাস প্রকাশের চূড়ান্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়, কেননা পরবর্তী পঞ্চম একত্রিত করে যুগ্ম সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হল। সম্পাদকের পদে ঘোষিত হল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একক নাম। সম্পাদকীয় দপ্তর পরিবর্তিত হল সুনীলের তদানীন্তন বাসস্থান ২বি বৃন্দাবন পাল লেনের ঠিকানায়।

নতুন একটি কবি গোষ্ঠী তৈরি করাই ছিল *কৃত্তিবাস* পত্রিকার আবির্ভাবকালীন অন্যতম উদ্দেশ্য। ধীরে ধীরে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, তারপদ রায় প্রমুখ কবি এই দলে যুক্ত হয়ে তাঁদের আড্ডা নতুন চরিত্র লাভ করে। এমনকী তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্যচর্চায় একটা সর্বগ্রাসী বিশৃঙ্খল ও উন্মুখর পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই পরিবর্তন চূড়ান্ত রূপ পায়—১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে অ্যালেন গিনসবার্গ নামে এক বিটনিক কবির সঙ্গে সংযোগে। তারই ফল ষোড়শ সংখ্যার প্রকাশ, শরৎকুমারের ভাষায় সেটির ভিতর দিয়েই অকস্মাৎ 'কৃত্তিবাস' সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়। *কৃত্তিবাস* প্রকাশের পর *শতভিষা*-র সঙ্গে প্রকাশ্য কোনো বিরোধ হয়নি, যদিও কবিতার আধুনিকতার প্রশ্নে তাঁরা ঐক্যমত স্থাপন করেননি। অথচ দক্ষিণের আর উত্তরের দুই দল কবি প্রায়ই মিলেছেন তাঁদের দুই দলের দুটি পত্রিকায়, লেখার সূত্রে পারস্পরিক বিনিময়ে, স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে। এমন কী ক্রমান্বয়ে এই দুই পক্ষের জীবনযাপন পদ্ধতিও যে ভিন্ন পথে প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল তাতে তাঁদের পারস্পরিক বন্ধুতা বজায় রাখার পক্ষে ক্ষতিকর হয়নি। *কৃত্তিবাস*-এর অষ্টম সংকলনে সুনীল লিখেছিলেন : "'শতভিষা'ই সম্ভবত বাংলাদেশের একমাত্র পত্রিকা যা পাঠক ও ক্রেতার মুখাপেক্ষী নয়। 'শতভিষা' শুধু কবিদের পত্রিকা।"

কৃত্তিবাস প্রকাশের পরবর্তী সময়ে কবিতার পত্রিকা হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে *উত্তরসূরি* সম্ভবত ১৩৬১ বঙ্গাব্দ থেকে। অরুণ ভট্টাচার্যর সম্পাদনায় সে পত্রিকা শুধু বাংলা কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে দীর্ঘায়ু নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এমন নয়, সব বয়সের কবিদেব রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে, সেটি নতুন কবিদের প্রচারের একটা মাধ্যম হিসেবে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে পরবর্তী দু-তিন দশক জুড়ে। পত্রিকাটি *দ্বিমাসিক উত্তরসূরি* নামে প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৯ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হিসেবে নারায়ণ চৌধুরী ও শিবনারায়ণ রায়ের সম্পাদনায়। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধের পাঁচমিশেলি বাহন রূপে। প্রথম তিনটি সংখ্যার পরই সেটি অনিয়মিত হয়ে পড়ে, পরে সেটি পুরোপুরি কবিতা পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। ১৯৫৭-র পঁচিশে বৈশাখ *কবিপত্র* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, *শতভিষা*-র অনুকরণে বা প্রেরণায়। সদ্য স্কুলের

গণ্ডি ছেড়ে আশুতোষ কলেজের সান্ধ্য শাখায় ভর্তি হয়েছেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সর্বক্ষণের সঙ্গী সহপাঠী মৃণাল দত্তকে নিয়ে একটা কবিতার পত্রিকা করার উদ্যোগ নেন। অর্থাভাব আর সঙ্কোচের কারণে, পবিত্রর গৃহকর্ত্রী, যাঁর সাহিত্যপ্রীতি ছিল--সেই শ্রীযুক্তা শান্তি সেনকে সম্পাদিকা করা সাব্যস্ত হল, আর সহ-সম্পাদক হলেন পবিত্র ও মৃণাল। সঞ্জয় ভট্টাচার্যর কবিতা দিয়ে তাঁদের যাত্রা শুরু--প্রথম সংখ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্র আশীর্বাণী দিলেন। সমসাময়িক কালের প্রায় সব তরুণ কবিদের কাছ থেকে লেখা সংগৃহীত হল। অচিরকালের মধ্যে ষাট দশকের কবিদের কাব্যকৃতির অন্যতম বাহন হিসেবে *কবিপত্র*-র পরিচয় প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, পরবর্তী আটচল্লিশ বছর ধরে সে পত্রিকা--নানা বাঁকে বদল হতে হতে আজও প্রকাশিত হয়ে চলেছে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়।

পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে *শতভিষা* (বৈশাখ ১৩৬৬) পত্রিকায় 'সাম্প্রতিক কবিতা' শিরোনামে একটি বিতর্কমালার সূত্রপাতে প্রথম কথিকা হিসেবে প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর বক্তব্য প্রকাশিত হয়। তিনি লেখেন : 'এই কলকাতা শহরে কবির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, দেখতে শুনতে মন্দ নয় এরকম পদ্য আজকাল অনেকেই লিখছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অন্য যে কোনো বাজারের মত কাব্যচর্চারও একটা বাজার আস্তে ধীরে গড়ে উঠছে।' এক অর্থে কাব্যক্ষেত্রে তখন যে সর্বাত্মক ক্লান্তির, অতৃপ্তির, অবক্ষয়ের হতাশার ছায়া চতুর্দিকে দেখা দিয়েছে, সেদিকেই তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, বিষণ্ণতায় পরিব্যাপ্ত কবিতার আকাশ মেঘলা হয়ে আছে, অথবা পরবর্তী নতুন দশকের সূচনায় যে পট পরিবর্তন হবে, পঞ্চাশের শেষ প্রান্তে যেন তারই নীরব প্রস্তুতি ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে উঠছে।

চার

বাংলা কবিতা পত্রিকা প্রকাশের ধারাবাহিকতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে *কবিতাকুসুমাবলী* নামের মাসিক পত্রিকাটি যে ঐতিহাসিক প্রবর্তনার সূত্রপাত করেছিল, তারই শতবর্ষ অতিক্রম করার মুহূর্তে অত্যাশ্চর্য এক সমাপতন পরিলক্ষিত হল। পত্রপত্রিকা প্রকাশে সারা ষাটের দশক জুড়ে যেসব পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে এই কলকাতা শহরে, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে তা হয়নি। শুধু সংখ্যায় নয়, বৈচিত্র্যের বিচারেও গত শতাব্দীর ষাটের দশক কবিতা পত্রিকার প্রকাশনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

বঙ্গাব্দ ১৩৬৭ বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হল কবিতার মাসিক পত্র *ধ্রুপদী*, সম্পাদক সুশীল রায়ের ১৩বি কাঁকুলিয়া রোড কলকাতা ১৯ ঠিকানা থেকে। প্রায় সাঁইত্রিশ বছর আগে, তিনি *জীবাণু* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন--সে পত্রিকা মাত্র বছর দুয়েক চলেছিল। বুদ্ধদেব বসু সে পত্রিকার অবসানের কথা লিখেছিলেন : 'রসেটির Germ-এর অনুসরণে জীবাণু নামে একটি পত্রিকা কিছুদিন তরুণ লেখকদের কাব্যচর্চা পরিবেশন করে বন্ধ হয়ে গেছে।' সুশীল রায় লিখেছেন : 'এক সময় আমাদের বয়সও কম ছিল। সুতরাং তখন পাগলামোও করা গিয়েছে বিস্তর। সেই সময়ে কবিতার মাসিক পত্রিকা বের করা গিয়েছিল, তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'জীবাণু'। এবং ঘোষণা করা হয়েছিল—"কবিতা এক রকমের ব্যাধি, জীবাণু তার অগ্রদূত।" দীর্ঘকাল পরে এই নতুন পত্রিকাটি প্রকাশে কোনো

বিতর্কমূলক অভিপ্রায় না জানিয়ে পত্রিকার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল : 'কবিতাকে অনেকে শিল্প বলেন। আমরাও বলি। আমরা আর একটু বেশি বলি—সুকুমার শিল্প বলি। এই শিল্প কাজে যাঁরা নিজেদের নিযুক্ত করেছেন—নবীন প্রবীণ বৃদ্ধ বা তরুণ—তাঁদের সকলের রচনা এই পত্রিকায় মুদ্রিত হবে।' কারণ হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করলেন : 'কোনো—একটি নিভৃত প্রকোষ্ঠে আমরা আমাদের আবদ্ধ রাখতে ইচ্ছে করিনে, আমরা একটু অবারিত জীবন পছন্দ করি। এই কারণে এই পত্রিকার দ্বার উন্মুক্ত রাখা হবে।' আর, 'সম্পাদকের কথা'য় তাঁরা জানালেন : 'এই পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে আমরা একটা ষড়যন্ত্র করেছি—তিনজন প্রবীণ ও তিনজন নবীন কবিকে নিয়ে সম্পাদনা-সমিতি গঠন করেছি। পত্রিকা পরিচালনা ও রচনা-নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ দেবেন এই কমিটি অব সিক্স।' একজনের অভিরুচির উপর নির্ভর না করে আরও পাঁচজনের রুচির উপর নির্ভব করাকে কেন শ্রেয় মনে করেছিলেন সম্পাদক, সে-প্রসঙ্গে এরপর বললেন : 'মানুষের মুখের আকৃতি যেমন মানুষে মানুষে ভিন্ন, মানুষের মনের প্রকৃতিও সেই রকম। কবিতা অনেকটা মনের প্রকৃতিরই প্রতিধ্বনি বলে আমাদের ধারণা। সুতরাং কবিতার রূপ ও কল্প ও ভিন্ন ভিন্ন কবির কলমে ভিন্ন হবে। আবার, যাঁরা কবিতা পাঠ করেন তাঁদের মধ্যেও রুচির অনুরূপ ভেদ আছে, তাদের কাছে যাতে নানা রূপকল্পের কবিতা পৌঁছে দেওয়া যায় সেই জন্যেও আমাদের এই ষড়যন্ত্র।'

ধ্রুপদী প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় 'সম্পাদকের কথা'-য় জানিয়েছিলেন—দণ্ডকারণ্য থেকে *কল্পদ্রুম* নামের একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত (১৯৬০-এর ২৯ জুন) হয়েছে। এই সময় থেকে কলকাতা থেকে যেমন এক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, তেমন কলকাতার বাইরে মফসসল শহর থেকেও নানা ধরনের কবিতা পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় *নক্ষত্রের রাত* (১৯৬০), *নান্দীমুখ* (১৯৬০), *আধুনিক কবিতা* (১৯৬১), *গঙ্গোত্রী* (১৯৬১), *উচ্চারণ* (১৯৬১), *কবিকণ্ঠ* (১৯৬৩) *কর্ণিক* (১৯৬৪) *অলিন্দ* (১৯৬৪) প্রভৃতি। শেষোক্ত পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদক প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত বলেছিলেন : 'বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকা তখন বন্ধ। আমি চেয়েছিলাম তারই সমধর্মী ও পরিপূরক একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে'--, তিনি সচেষ্ট হন, 'গোষ্ঠী নিরপেক্ষ ভাবে' প্রকাশযোগ্য কবিতা ছাপতে। প্রথমাবধি সম্পাদকের পক্ষপাত ছিল, অপেক্ষাকৃত অনুচ্চকণ্ঠ অথচ গভীর কবিতার প্রতি--'শান্ত' কবিতার প্রতি। *অলিন্দ*-র একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল--জন্মাবধি অনিয়মিত, জন্ম মুহূর্তে এরকম ভাগ্যলিপি নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী কোনো সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে কিনা সন্দেহ।

ষাটের দশকে প্রথমের দিকে 'হাংরি জেনারেশন' নামে এক আন্দোলনের কাব্যচর্চা নিয়ে প্রচণ্ড হই-চই আরম্ভ হয় *কৃত্তিবাস*-ভাঙা একদল কবির প্ররোচনায়, তাতে প্রধান নেতৃত্ব দেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। ১৯৬২-র এপ্রিল মাসে একটি বুলেটিন প্রকাশিত হয় 'হাংগরি জেনারেশন' নামে, তিন কলমে ডাবল ক্রাউন ১/৮ কাগজের এক পাতায় বর্জাইস অক্ষরে ছাপা। স্রষ্টা : মলয় রায়চৌধুরী, নেতৃত্ব : শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা : দেবী রায়। মলয় প্রথম বুলেটিনে আন্দোলনের বিষয়ে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার শেষাংশে তিনি লেখেন : 'শিল্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবিতা সৃষ্টির প্রথম শর্ত। শখ করে ভেবে ভেবে, ছন্দে গদ্য লেখা হয়তো সম্ভব,

কিন্তু কবিতা রচনা তেমন করে কোনো দিনই সম্ভব নয়। অর্থ ব্যঞ্জনা ঘন হোক অথবা ধ্বনি পারম্পর্যে শ্রুতিমধুর, বিক্ষুব্ধ প্রকাশ চঞ্চল অন্তরাত্মার ও বহিরাত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তির শক্তি না থাকলে, কবিতা সতীর মতো চরিত্রহীনা প্রিয়তমার মতো যোনিহীনা, ঈশ্বরীর মতো অনুন্মেষিণী হয়ে যেতে পারে।' এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, সমীর রায়চৌধুরী—যাঁরা পঞ্চাশের লেখক হিসেবে পরিচিত, বাকিরা ষাটের। সুবো আচার্য, শৈলেশ্বর ঘোষ, সুভাষ ঘোষ, দেবী রায়, প্রদীপ চৌধুরী, সুবিমল বসাক, বাসুদেব দাশগুপ্ত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ফাল্গুনী রায়, অরণি বসু, শম্ভু রক্ষিত, ত্রিদিব মিত্র, তপন দাস, মিহির পাল প্রমুখ। এঁদের মধ্যে সন্দীপন, বাসুদেব, সুভাষ, সুবিমল গদ্যলেখক হিসেবেই পরিচিত—তাঁরা কবিতার পাশাপাশি গদ্যকেও বিশেষত কথাসাহিত্য রচনাকেও এই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। অশ্লীলতার অভিযোগে এই আন্দোলনের লেখকদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয়। দীর্ঘদিন মামলা চলার পর প্রধান অভিযুক্ত মলয়কে বাদ দিয়ে ১৯৬৫-তে আর সবাইকে রেহাই দেওয়া হয়। মলয়ের মামলা নিষ্পত্তি হয় আরো বছর দুয়েক পরে। মলয় রায়চৌধুরী বলেছেন : 'তরা মে ১৯৬৫কে বলা যায় হাংরি আন্দোলন ভেঙে যাবার দিন। তার মানে হাংরি আন্দোলনের জীবনকাল ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫।'

১৯৬৫-এর এপ্রিলে প্রকাশিত হল *শ্রুতি*, নতুন আর একটি আন্দোলনের মুখপত্র, সম্পাদকনামহীন ষোলো পাতার এই কাগজটির প্রকাশক মৃণাল বসুচৌধুরী। প্রথম সংখ্যায় পাঁচজন কবি হলেন : পুষ্কর দাশগুপ্ত, মৃণাল বসুচৌধুরী, অনন্ত দাস, পরেশ মণ্ডল ও সজল বন্দ্যোপাধ্যায়। পরপর ছটি সংখ্যাতেই সম্পাদক হিসেবে কারও নাম উল্লিখিত হয়নি। ৯-১০ দুটি সংখ্যার সম্পাদনা করেছেন মৃণাল বসুচৌধুরী। ৬-৭-৮ সংখ্যায় পরেশ ও সজল সম্পাদক হিসেবে উপস্থিত। তপনলাল ধর ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ সংখ্যার প্রকাশক। এই *শ্রুতি*-কে কেন্দ্র করে একটি লেখক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল—যাঁরা প্রচলিত কবিতার থেকে বেরিয়ে এসে নতুন রীতির কাব্যচর্চায় বিশ্বাসী। প্রথম সংখ্যায় পুষ্কর 'কবিতা সম্পর্কে' যে কটি সূত্র উল্লেখ করেছিলেন সেগুলিতে এঁদের কাব্যচর্চার গতিপ্রকৃতির একটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন : 'জৈব আর্তনাদ কিংবা সমাজ-চিন্তার স্থান যেখানেই হোক কবিতায় নয়। কবিতার সার্থকতা বিচার করে পাঠকের মন। কবির দিক থেকে উপলব্ধির প্রকাশকে সঞ্চারণক্ষম করে তোলার ক্ষমতা ও নৈপুণ্য প্রয়োজন। কবিকেও তাই শিক্ষিত হতে হয়। প্রথম শিক্ষা আত্মমগ্নতার। দ্বিতীয় শিক্ষা প্রকাশের।' ইত্যাদি। তাঁদের আঙ্গিক-চর্চা ক্রমশ প্রাধান্য পেয়েছে রচিত কবিতাগুলিতে, সম্মিলিত প্রয়াসেই। নতুন ধরনের মুদ্রণবিন্যাসের সাহায্যে কবিতার দৃষ্টিগ্রাহ্য অনুষঙ্গ সৃষ্টিতে তাঁরা মনোযোগী হলেন, ছেদচিহ্নের বিলোপ, পংক্তিবিন্যাস ও স্পেস তাঁদের কবিতা রচনায় নতুনত্ব এনে দিয়েছিল। দ্বিতীয় সংখ্যায় পুষ্কর 'কবিতা সম্পর্কে' বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন : 'আধুনিক কবিতার মুদ্রিত প্রকাশে দৃষ্টিগ্রাহ্যতা-সৃষ্টি বা নতুন বিন্যাসের ব্যাপারে মালার্মে, আপলিন্যার, মায়াকোভসকি, কামিংস, অমিয় চক্রবর্তী প্রভৃতি কৃতকর্মা কবির প্রয়াস স্মরণীয়। এবং মুদ্রণবিন্যাসে দৃষ্টিগ্রাহ্যতা সৃষ্টি বাংলাকবিতায় চর্চার দ্বারা জীর্ণ হয়নি বলেই তা প্রকরণ হিসেবে অকর্ষিত ভূমির মতোই সম্ভাবনাপূর্ণ।' সত্তরের দশকের শুরু পর্যন্ত এই পত্রিকাটির অস্তিত্ব ছিল, শেষ চতুর্দশ সংখ্যাটি

প্রকাশিত হয়েছে আগস্ট ১৯৭১-এ।



আলোড়ন সৃষ্টিকারী *কবিতা সাপ্তাহিকী*

১৯৬৬-র ৭ জানুয়ারি কলকাতার কবিতা জগতে একটি চাঞ্চল্যকর খবর *কবিতা সাপ্তাহিকী* নামে একটি এক ফর্মার পত্রিকার প্রকাশ। সম্পাদক শক্তি চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীকালে এরকম উদ্যোগ গ্রহণের কারণ হিসেবে যুক্তি দেখান : 'সেই সময় অর্থাৎ কবিতা নিয়ে একটা হৈ-চৈ শুরু হলো। আমি দীর্ঘদিন ধরে ভারছিলাম সব কিছু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এখন যদি কবিতা নিয়ে একটা সাপ্তাহিকী মতন করা যায় তবে মন্দ হয় না। প্রতি সপ্তাহে তাজা, নতুন কিছু কবিতা থাকবে তার সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণও থাকবে আর কবিতা বিষয়ক কিছু গদ্যও থাকবে—খুব ছোট কাগজ এক ফর্মার কাগজ করবো। তো...এই সব নানা

কারণে...আর সামান্য খরচ...খরচও তেমন বেশী ছিলো না সে সময়ে, ভাবলাম এই সব নিয়ে একটা কবিতার পত্রিকা প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার / শনিবার নাগাদ বার করবো।' শক্তি ওই সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তাঁদের বন্ধু মৃণাল দেব, টাকা কড়ি দিতেন, তিনি *কবিতা সাপ্তাহিকী*-র প্রকাশক। কিন্তু মাত্র পনেরোটি সংখ্যা প্রকাশের পর প্রকাশকের সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটে। সেই পর্বে তাঁর সম্পাদনায় ২২ এপ্রিলই শেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়। শক্তি ছেড়ে দেওয়ার পর সম্পাদক হন মৃণাল দেব। কিছুদিন চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। তারপর দ্বিতীয় বছরে যুগ্ম সম্পাদক হন নিতাই ঘোষ, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় বছর থেকে আবার নিয়মিত উদ্যোগ গৃহীত হয় মৃণাল দেব-এর প্রধান সম্পাদকতায়, যুগ্ম সহযোগী সম্পাদক হন পবিত্র বল্লভ, দীনেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর *দেশ* পত্রিকার সমালোচনায় প্রশংসা করে বলা হয়েছে : 'বাংলা কাব্যের ইতিহাসে একটি সম্পূর্ণ নতুন ও চমকপ্রদ ঘটনা। ইতিপূর্বে যতদূর জানি ত্রৈমাসিক ও মাসিকপত্র প্রকাশ পেলেও সাপ্তাহিক কবিতা আব প্রকাশ পায়নি।' নলিনীকান্ত সরকার পণ্ডিচেরী থেকে একটি চিঠি লিখে আলোচ্য পত্রিকাকে অবশ্য প্রথম সাপ্তাহিকীর কৃতিত্ব দিতে রাজি হননি, তিনি জানান : শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র (দাদাঠাকুর) মহাশয় তাঁর *বিদূষক* সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন ১৩২৯ সালের মাঘ মাসে। আগাগোড়া কবিতা। কবিতায় সপ্তাহের প্রধান প্রধান সংবাদ, কবিতায় সম্পাদকীয়, কবিতায় টীকা টিপ্পনী। এছাড়া রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতির নানা বিষয় নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গময় কবিতা *বিদূষক*-এর বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু ছিল।'

১৯৬৬-র পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনকে উপলক্ষ করে আর একটি নতুন উদ্যোগ দেখা গেল। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ থেকে, পরপর পনেরো দিন *দৈনিক কবিতা* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হল, বিমল রায়চৌধুরী শান্তি লাহিড়ীর সম্পাদনায়। প্রথম সংখ্যায় তাদের পক্ষ থেকে জানানো হল : 'দৈনিক কবিতা প্রকাশিত হলো। "পৃথিবীর প্রথম কবিতা দৈনিক" আমাদের বহু বিজ্ঞাপিত এই দাবী পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর খুব সম্প্রতি বিশ্বস্তসূত্রে আমরা জানতে পারলাম যে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়মিত প্রতি বসন্তকালে একটি কবিতা দৈনিক প্রকাশিত হয়। ইংল্যাণ্ড থেকেও এ ধরনের একটি কবিতা দৈনিকের খবর আমাদের গোচরে এসেছে। বর্তমান কবিতা দৈনিককে তাই পৃথিবীর প্রথম বলা যায় না। সেই হিসেবে তৃতীয় বা চতুর্থ সারিতে এর স্থান।' তাঁরা এও জানালেন : 'চন্দননগর থেকেও একটি কবিতা দৈনিক প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের কাছে স্বল্প যে-কটি সংখ্যা এসেছে তাতে একে কবিতার হ্যাণ্ডবিল বলাই বোধহয় সঠিক।' এই কবিপক্ষেই আর একটি ঘটনা, শক্তি চট্টোপাধ্যায় *সাপ্তাহিক বাংলা কবিতা* নামে আবার একটি পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন ৩০ বৈশাখ থেকে। নামকরণে সামান্য বদল হলেও, মূল পরিকল্পনা প্রায় পূর্বের মতোই একই ছিল বলা যায়। বিশেষত পূর্বোক্ত প্রচেষ্টায় যেমন অধিকাংশ কবিতার সঙ্গে কবির একটি ভাষ্য সংযুক্ত হত, দ্বিতীয় পর্যায়ে সেটির অবিকল অনুকরণ না করে, একটি কবিতার নির্মাণের নানা স্তর কবির নিজস্ব গদ্যে বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা হল। পঞ্চাশের কবিদের মধ্যে অনন্য যাঁরা, তাঁরা এইভাবে প্রতি সংখ্যায় একজন করে অংশ নিলেন। এই পর্বে কিছুদিন পরে শান্তি লাহিড়ীকে সঙ্গে নিয়ে

সম্পাদনা করেন। বছর দু-তিন পরে এই পত্রিকার নবপর্যায় শক্তির একক সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর সহযোগী হিসেবে কাজ করেন শান্তিকুমার ঘোষ, কিন্তু সে ব্যবস্থাও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

পূর্বোক্ত *দৈনিক কবিতা*-র তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হল একটি রোমাঞ্চকর সংবাদ, শিরোনাম *কবিতা ঘন্টিকী*। জানা গেল ঘড়ির ঘণ্টার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে শনিবাব (২২ বৈশাখ) বেলা ১০-টায় যে-কাগজ বেরিয়েছিল, মাত্র ৮ সংখ্যা বেরুবার পর সম্পাদকমণ্ডলী বেলা ৫টার সময় জানিয়েছেন "অতি দুঃখের সঙ্গে আমরা ঘোষণা করছি যে এই সংখ্যা ঘণ্টিকী প্রকাশ করে আমরা এর প্রকাশ আপাতত বন্ধ রাখছি।" লেখার মান এবং স্বল্পতাই এর অন্যতম কারণ বলে সম্পাদকমণ্ডলী জানিয়েছেন। ভবিষ্যতে অন্য কেউ অর্ধ-ঘণ্টিকী সিকি-ঘণ্টিকী বের করলে সম্পাদকমণ্ডলী "মুহূর্ত মানিক" নামে কবিতা পত্রিকা বের করবেন বলে জানিয়েছেন।' পঞ্চদশ সংখ্যাই *দৈনিক কবিতা*-র শেষ সংখ্যা হতে পারত, কিন্তু প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের সম্পাদনায় বিশেষ জীবনানন্দ সংখ্যাটি প্রকাশিত হল শুক্রবার ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ তারিখে। এই সংখ্যায় তাঁরা বিজ্ঞপ্তিতে জানালেন : 'দৈনিক কবিতার কাল শেষ হল। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আমরা দৈনিক কবিতা প্রকাশে ব্রতী হয়েছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কবিপক্ষকে উপলক্ষ্য করে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার সঙ্গে কবিতাবিমুখ পাঠকের সাযুজ্য স্থাপন করা। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করি এই পত্রিকার নাম পত্র-পত্রিকায় ঘোষিত হওয়ামাত্র চারদিকে হুজুগের হৈ চৈ হাওয়া যেভাবে বইতে শুরু করেছে তাতে বাংলা কবিতার বিশেষ সম্মান বৃদ্ধি ঘটবে বলে মনে করি না।' এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁদের পরবর্তী কর্মসূচি বিষয়ে তাঁরা জানালেন : 'দৈনিক কবিতা বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু দৈনিক কবিতার উত্তরাধিকার রক্ষার নিমিত্তে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পত্রিকাটি প্রকাশের আয়োজন অনতিবিলম্বে সম্পন্ন হবে।'

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু তাঁরা এই নামটিকে অপরিবর্তিত রেখে একটি নতুন উদ্যোগে উৎসাহিত হয়ে *দৈনিক কবিতা সংকলন* প্রকাশ করলেন অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৬৬ সংখ্যারূপে। এবারে সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন বিমল রায়চৌধুরী, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। তাঁরা এই সংকলনের সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই স্বীকার করলেন নামটি অপেক্ষাকৃত বিভ্রান্তিজনক। এই বিভ্রান্তি সরিয়ে দিতে তাঁরা জানালেন : "'কবিতা দৈনিক' মানে এমন কোনো যান্ত্রিক ষড়যন্ত্র নয়, যার ফলে কবিরা বাধ্যত এবং নিয়মিত কবিতা লিখবেন, বা--একটু ঘুরিয়ে বলা চলে--'দৈনিক কবিতা' পত্রিকাটির জন্যে একদল পথভ্রষ্ট কবি প্রতি অপরাহ্নে কবিতা লিখতে বাধ্য হবেন' 'দৈনিক কবিতা' মানে কবিতার দৈনিক সৃষ্টি বা রচনা নয়, কবিতার দৈনিক প্রকাশ। এখানে 'রচনা' এবং 'প্রকাশ' শব্দ দুটির মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক তার ওপরেই আমরা জোর দিতে চাইছি।' নাম এক থাকলেও, এই নবপর্যায়ের শুভারম্ভ অত্যন্ত সুফলপ্রসূ হয়েছিল, সুন্দর মুদ্রণে কবিতা ও প্রবন্ধের এরকম সংকলন কাব্যপ্রিয় বাঙালি পাঠকের কাছে খুব আশাপ্রদ ভূমিকা পালন করতে উদ্যোগী হয়েছিল। যার ফল, একটি সংখ্যা মুদ্রণ সৌষ্ঠবের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কারও অর্জন করেছিল। কিন্তু অন্যদিকে তখন কাব্যচর্চার এমনই একটা হুজুগ তৈরি হয়েছিল যে, *কবিতার টেলিগ্রাফ* নামে একটা পত্রিকাও বেরিয়েছিল। আজীবন কবিতার প্রতি অনুরক্ত, কাব্যপত্র প্রকাশে যিনি

যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছেন *কবিতা* প্রকাশ করে—সেই বুদ্ধদেব বসু তাঁর আমেরিকা প্রবাসী জ্যেষ্ঠা কন্যা মীনাক্ষী দত্তকে একটি পত্রে (৫ মে ১৯৬৬) পরিহাস করে লিখেছিলেন : 'আর কোন দেশে "কবিতা" এমন বিসূচিকার মহামারীর মতো প্রাদুর্ভূত হয়, বা রোমকূপ থেকে ঘামের মতো, অথবা সুস্থ যুবকের বৃক্ক থেকে মূত্রের মতো এমন অনর্গল ভাবে বেরিয়ে আসে, তা কি তোমরা বলতে পারো?' এমনকী আক্ষেপ করে একথাও জানাতে তিনি দ্বিধা করেননি : 'আমি আশীর্বাদ করি—আমার দুই দৌহিত্র চাঁদে যাক, বা আন্দামানের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হোক, বা হিমালয়ে আলুর ফসল ফলাক, অথবা হোক প্রথম বাঙালি ন্যাকামি-মুক্ত চিত্রকর—কিন্তু কবিতার ক-অক্ষর কখনো যেন তারা না জানে।' অথচ এই সময় ইন্দ্রজিৎ *দেশ* পত্রিকায় 'দিনে দিনে, প্রহরে প্রহরে' শীর্ষক স্বভাবরসিকতার ঢঙে লিখেছিলেন : 'কবিতা দৈনিকী এবং কবিতা ঘন্টিকী নিয়ে পক্ষকাল ধরে অনেকের মুখে হাস্য পরিহাস শুনেছি, এটাকে তাঁরা বঙ্গদেশের একটা রঙ্গ হিসেবে দেখেছেন। আমার কিন্তু জিনিসটা বেশ লেগেছে। অন্তত এটা ঠিক, একমাত্র বঙ্গদেশেই এটি সম্ভব ছিল, এবং আমি মনে করি এটা রঙ্গ নয়, এ হচ্ছে বাঙালী চরিত্রের অঙ্গ, বাংলা দেশের প্রাণের লক্ষণ। একবার ভেবে দেখুন কেমন সময়ে এঁরা কবিতাকে নিত্য দিনের সামগ্রী হিসাবে গ্রহণ করেছে—ঠিক যখন নিত্য দিনের সমস্ত সামগ্রী দুর্ঘট হয়ে উঠেছে, লোকের ঘরে যখন চাল নেই, তেল নেই, চিনি নেই, কেরোসিন নেই, আরো কত কি নেই—ঠিক তখন বাংলাদেশের ছেলেরা বলেছেন—কবিতা চাই, কবিতা চাই, আরো কবিতা চাই। বলতে গেলে গায়টের অন্তিমকালীন ব্যাকুলতার মত—আলো, আলো, আরো আলো চাই। ঠিক সেই মুহূর্তে যে এঁরা একথাটি বলতে পেরেছেন তাতে বাংলাদেশের গৌরব বেড়েছে। এই যে অভাব অনটনের একঘেয়ে মলিন জীবন তারই মধ্যে একটু নতুন স্বাদ এঁরা এনে দিয়েছেন, এটা মস্ত বড় কথা। চাল না পেলে কি করে বাঁচব, সেটা যেমন একটা প্রশ্ন, কবিতা না হলে কি নিয়ে বাঁচব সেটাও একটা প্রশ্ন। কি করে বেঁচে থাকব আর কি নিয়ে বেঁচে থাকব, এই দুই নিয়েই মানুষের জীবন—শুধু একটা দিয়ে জীবন চলে না।'

কৃত্তিবাস পত্রিকার ২৩-তম সংকলনের সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, তিনি 'সম্পাদকীয়' লিখতে বসে তদানীন্তন কাব্যচর্চার এক অদ্ভুত পরিসংখ্যান দিয়েছিলেন : 'ইতিমধ্যে এক অভূতপূর্ব কবিপক্ষ আমরা যাপন করেছি, যখন সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে গিয়ে শুধু কবিতার কাগজই বেরোচ্ছিল প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে। ফল : ঘুনধরা বাংলাদেশে কবিদের পপুলেশন এক্সপ্লোশন—শতকরা তিনশো ; কবিতার নিন্দুক বৃদ্ধি শতকরা পঞ্চান্ন, এবং কবিতার পাঠক, শতকরা পাঁচ।' তবে, একথা অবশ্যই স্বীকার করতেই হয় *দৈনিক কবিতা*-র সমসাময়িক কালে যে হই-চই বা হুজুগ সৃষ্টি হয়েছিল তার নিরসন হতে বেশি সময় অতিবাহিত হয়নি। সম্ভবত পরের বছর পঁচিশে বৈশাখ ৯ মে ১৯৬৭ তারিখে *শতবার্ষিক কবিতা*-র সংখ্যা-১ প্রকাশের মধ্য দিয়ে তার অবসান হয়েছিল। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা হলেন আনন্দ বাগচী, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল রায়। উল্লেখ্য শেষোক্ত জনের নেতৃত্বেই বিগত বর্ষে *কবিতা-ঘন্টিকী* প্রকাশিত হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে তিনি জানালেন : 'সময়কে এর আগে আমরা খুব ছোট আকারে টুকরো করে নিতে অভ্যস্থ

হয়েছিলাম। এবার সে অভ্যাস ত্যাগ করে সময়ের আকার একটু বড় করে নেওয়া গেল।' পরবর্তী চারটি সংখ্যার সম্ভাব্য প্রকাশ বছরের উল্লেখ করে তিনি উপসংহারে মন্তব্য করলেন : 'কোনো দুইটি সংখ্যায় একই জীবিত লেখকের লেখা মুদ্রিত হবে না—স্বজনপোষণের ও বন্ধুবাৎসল্যের প্রশ্রয়দাতারূপে খ্যাত হতে শতবার্ষিক কবিতা সম্মত নয়।'

কবিতা দৈনিক প্রকাশের অব্যবহিত আগে, ১৩৭২ বঙ্গাব্দের শ্রীপঞ্চমীর দিন *কবি ও কবিতা* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হল, সম্পাদক জগদীশ ভট্টাচার্য। বাংলা কবিতা ও কাব্য সমালোচনার এই ত্রৈমাসিকটি বছরে চারটি সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন : শ্রীপঞ্চমী, পঁচিশে বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণ এবং মহালয়া। কী তাঁদের উদ্দেশ্য, সংক্ষেপে তাঁরা সে কথা উল্লেখ করেছিলেন সূচিপত্রের সঙ্গে সংলগ্ন ঘোষণায় : 'সুস্থ কবি কল্পনার পুনরুজ্জীবন, কবিতার ছন্দোময় রূপসৃষ্টিতে উৎসাহদান, এবং কাব্যতত্ত্ব ও কাব্য শিল্প সংক্রান্ত আলোচনার জন্যেই কবি ও কবিতার সৃষ্টি। দল ও মত নির্বিশেষে সকলের লেখাই এতে প্রকাশিত হবে। অনাগত যুগের নবীন কবিকে আবিষ্কার করাও কবি ও কবিতা প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য।' সম্পাদকীয়তে জানানো হল : "কবি ও কবিতা'র দুটি ভাগ। কবিতা ও কাব্য সমালোচনা। বাংলার সাহিত্য সমালোচনা এখনো দ্বিধা-বিভক্ত। একদিকে সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র অন্যদিকে য়ুরোপীয় বিচারপদ্ধতি। বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায় এ দুয়ের মধ্যে এখনো সুষ্ঠু সমন্বয় সাধিত হয়নি। এক্ষেত্রে বাঙালীর নিজস্ব চিন্তা ও নিজস্ব রীতির আবিষ্কার ও প্রবর্তন আমরা কাম্য মনে করি। আশা করি 'কবি ও কবিতা'র বুকে ধীরে ধীরে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।" এরকম একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগে প্রবাসী কবি অমিয় চক্রবর্তী অত্যন্ত খুশি হয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন : 'বাংলার নূতন লেখকদের কাছ থেকে আপনারা উজ্জ্বল সাহসিক নবীন যুগের রচনা উদ্ধার করে নিন। বিগতকালের তিক্ত রসিকতা, ঈর্ষা, উত্তেজনা, অক্ষম তীব্রতা আপনাদের নূতন পত্রিকায় প্রবেশ না করুক। বাংলা ভারতীয় দিগন্তে যা চিরন্তন তাই দেখা দিক, নির্মল অধ্যায়ে, ভাষার চিন্তায় বীর্যের পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে উঠুক আমাদের আগামী সাহিত্যিক প্রাঙ্গণে।' পত্রিকায় কবিতা ও নিবন্ধ ছাড়াও, বুদ্ধদেব বসুর 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার অনুরূপ একটি আয়োজন *কবি ও কবিতা*-য় পরিলক্ষিত হল 'এক গুচ্ছ নতুন ফসল' শিরোনামে এক ফর্মার কাব্য পুস্তিকার মুদ্রণে। সম্পাদক এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেছিলেন : 'নবাগত কবিদের উৎসাহ দেওয়া এবং পাঠক সমাজের কাছে তাঁদের রচনার একটি মোটামুটি পরিচয় দেওয়াই এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য। অবশ্য 'একগুচ্ছ নতুন ফসল' গ্রন্থমালায় প্রতিষ্ঠিত কবিগণের নতুন রচনা প্রকাশ করতে পারলে যে আমরা আনন্দিত হবো তা বলাই বাহুল্য।' তাঁরা গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে জানালেন এই গ্রন্থমালার সূচনা হবে অমিয় চক্রবর্তী রচিত *পুষ্পিত ইমেজ* দিয়ে। এই গ্রন্থমালায় প্রতিষ্ঠিত এবং নবীন অনেকেই লিখেছিলেন।

দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে *কবি ও কবিতা*-র পক্ষ থেকে একটি উপদেষ্টা পর্ষৎ গঠিত হয়েছিল, সেই পর্ষদের সম্পাদনা বিভাগে যুক্ত হয়েছিলেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দেবীপদ ভট্টাচার্য, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রবীণ অধ্যাপক সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকাটি পড়ে অভিনন্দনপত্রে 'খুব উচ্চমানের হয়েছে' প্রশংসা করে প্রস্তাব দিয়েছিলেন : 'তুমি যদি প্রত্যেক কবিতার সঙ্গে একটি রসাস্বাদনমূলক টীকা সংযোজন

করবার ব্যবস্থা করতে পার, তবে অনেকের কাছেই আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হতে পারে। জানি বেরালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে কেউ রাজি হবে না। কিন্তু তা না হলে আধুনিক কবিতার মর্যাদার পুনরুদ্ধারও সম্ভব হবে না।' প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় এই পত্রটি উদ্ধৃত করে জগদীশ ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, 'বেরালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবার' কাজে দুঃসাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের প্রাক্তন ছাত্র তরুণ কবি শ্রীমান অমরেন্দ্র চক্রবর্তী-- 'তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা-সমালোচনার মাসিক সংকলন "কবিতা-পরিচয়" পত্রিকাখানি বিগত বৈশাখ থেকে প্রতি মাসে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।'

কবিতা-পরিচয়-এর প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল বৈশাখ ১৩৭৩, কোনো হৈ-চৈ বা উচ্চকণ্ঠের ঘোষণা নয়, সম্পাদকীয়হীন পরিচ্ছন্ন সাদামাঠা মুদ্রণে পাঁচজন কবির--রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে-র এক-একটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করলেন যথাক্রমে শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অশ্রুকুমার সিকদার, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, অরুণ সেন। চতুর্থ মলাটে বলা হল : 'আধুনিক কবিতা পাঠে সম্ভাব্য সহায়তার প্রয়াসে পরিকল্পিত কাব্য-সমালোচনার মাসিক সংকলন। প্রতি সংকলন, আলোচিত কবিতাগুলির পুনর্মুদ্রণসহ, প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।' তৃতীয় সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় 'সম্পাদকের কথা'-তে জানানো হল : 'রবীন্দ্রনাথ থেকে সাম্প্রতিক কাল : এই নির্বাচিত কাল পরিধির মধ্যে প্রকাশিত কবিতাই আমাদের সমালোচনার বিষয়। কিন্তু পৃথকভাবে কোনো একটি সংকলনকে আত্মসম্পূর্ণ গ্রন্থ করে তোলায় আমরা আগ্রহী নই। অনেকেই অভিযোগ করেছেন, তাই বলতে হলো : কোনো কবিতা আপাতত অনালোচিত থাকলে তা কোনো অর্থেই সেই কবিতা বা তার কবির প্রতি আমাদের অন্যমনস্কতার সূচক নয়।' প্রথম চারটি সংখ্যা যথাসময়ে প্রকাশিত হলেও পঞ্চম-ষষ্ঠ যুগ্ম সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তী সংখ্যাগুলির পক্ষে সময় রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। শেষতম দ্বাদশ সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭। সেটিকে ত্রৈমাসিক হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও পরে আর কোনো সংখ্যা সম্ভবত প্রকাশিত হয়নি। সেদিক থেকে *কবি ও কবিতা* প্রায় আঠারো বছর ধরে অব্যাহত গতিতে চলেছে, সেটির শেষ সংখ্যার প্রকাশকাল বাইশে শ্রাবণ ১৩৯১।

দৈনিক কবিতা-র সমসাময়িক কালে একই নামে আরও দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, একটি কলকাতা থেকে আর একটি হুগলি থেকে, আর কলকাতা থেকে বেরিয়েছিল *সান্ধ্য কবিতা দৈনিক*। প্রভাত চৌধুরী বলেছেন : 'আমাদেরটাই টিকে ছিল বেশি দিন। পৃথিবীর দীর্ঘস্থায়ী কবিতা দৈনিকের কৃতিত্ব আমাদেরই।' একই বছরে পুজোর আগে (১০ অক্টোবর) প্রকাশিত হল *সাম্প্রতিক* নামে একটি দশ পয়সা মূল্যের পাক্ষিক পত্রিকা। এই পত্রিকাতেই ঘোষণা করা হয় পরবর্তী নভেম্বর মাসে মাসিক কবিতা পত্রিকা হিসেবে *সাম্প্রতিক* প্রকাশিত হবে কবিতা আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে। ৬৬-র নভেম্বর থেকে ৬৭-র অক্টোবরের মধ্যে ৭টি সংকলন প্রকাশিত হয়। *সাম্প্রতিক*-এর প্রায় সকলেই ছিলেন সাউথ সুবার্বন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। *সাম্প্রতিক* অষ্টম সংখ্যায় এসে ঘোষণা করল : 'মানব সভ্যতার ক্রান্তিমুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রজ্ঞাময় উপলব্ধির মহৎ উচ্চারণ : ধ্বংসকালীন কবিতা।' এই সংকলনে কবিতা প্রকাশিত হল পবিত্র মুখোপাধ্যায়, কাননকুমার ভৌমিক ও প্রভাত চৌধুরীর, ধ্বংসকালীন কাব্য আন্দোলনের নমুনা হিসাবে। এর পর এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত

হয়েছিলেন দীপেন রায়, অনন্ত দাশ, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, রবীন সুর প্রমুখ কবিরা। ডাকযোগে কবিতা পাঠালেন তুষার চৌধুরী। ১৯৬৮তে প্রকাশিত হল পাক্ষিক *কবিতা সংবাদ*, প্রধান সম্পাদক প্রভাত চৌধুরী। অঞ্জন কর তাঁর *বক্তার* বন্ধ করে দিয়ে ধ্বংসকালীনে যুক্ত হন। ধ্বংসকালীন বন্ধ হবার জন্য একমাত্র নিজেকে দায়ী করে প্রভাত বলেছেন : "সেই সময়ের সঠিক দায়িত্ব পালন করলে 'ধ্বংসকালীন' বন্ধ হত না, কিছুদিন চালানো যেতো।"

ষাটের দশকের শেষাংশে যেসব পত্রপত্রিকা শুধু কবিতার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে *অনুভব, অন্তর, কেতকী, এষা, লা পয়েজি, এবং, কণ্ঠস্বর, সংবেদ, আত্মপ্রকাশ, রাঙামাটি, জীবনানন্দ, মাসিক বাংলা কবিতা* এবং *কবিতা* উল্লেখযোগ্য। এ সময় মণীন্দ্র গুপ্ত নগেন্দ্র দাশের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *পরমা*, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন মুদ্রণে পত্রিকাটি কবি মহলে সমাদৃত হয়েছিল। ১৯৬৭-তে *জিগীষা* নামে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় রাণা চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, এর পূর্বে ১৯৬৫-তে তাঁরা তাঁদের কৈশোরে *প্রতিবিম্ব* নামে একটি কবিতার কাগজ কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন।

উত্তরোত্তর কবি ও নির্ভেজাল কবিতা পত্রিকার সংখ্যাধিক্য ক্রমবর্ধমান হচ্ছে দেখে, অনেকের মনে সংশয় দেখা দিয়েছিল সে তুলনায় কবিতার প্রতি একান্তভাবে অনুরক্ত পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে কি না। শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত *সাপ্তাহিক বাংলা কবিতা*-য়, 'কবিতার পাঠক চাই' শিরোনামে লিখেছিলেন : 'বাজারে গুজব, আধুনিক কবিতার পাঠক ক্রমে কমছে। কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, কথাটা মিথ্যে। গুজব যিনি রটাচ্ছেন, তিনি আমাদের শত্রু। তাঁকে হাতে-ভাতে মারা আমাদের কাজ নয়—অবাধ অজস্র পদ্য লিখেই তাঁকে জব্দ করতে হবে। রাজনীতি আমাদের হাতে কেঁদো লাঠি, অব্যর্থ তীরধনুক তুলে দেয়নি--আমরা নিয়েছি কলম আর রাজকীয় নীল কালো কালি। আমাদের লড়াইটাও একটু পুরোনো ধাঁচের। আমরা চাই পাড়ায় পাড়ায়, প্রতি ঘর পিছু একজন বিশ্বস্ত কবিতার পাঠক আর পাড়া পিছু একজন কবি। তাহলেই বাংলা কবিতার বিশ্বজয় অবশ্যম্ভাবী।' অন্যত্র, প্রায় সমসাময়িক কালেই, 'বাংলাদেশে কবির সংখ্যা নক্ষত্রের সমান' জেনেও, মাত্র দশজন ষাটের দশকের কবির দশটি কবিতার বই বিষয়ে স্বল্প পরিসরে নিজের অভিমত জানাতে গিয়ে শক্তি বলেছিলেন : 'নানা কারণে ভাবপ্রবণ বাংলা ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে সম্প্রতি। এখন সাধারণ চিঠিপত্রেও বেশ একটা কবিতার আঁচ পাই। বাতাসে সম্প্রতি কবিতা ভেসে বেড়ায়। সুতরাং আপ-টু-ডেট ভাবনার জন্যে গ্রন্থের মুখাপেক্ষী হবার প্রয়োজন তেমন পড়ে না। শুধু কবিতা কেন, যে-কোনো রচনা লিখে ফিরি করার জন্য মুদ্রাযন্ত্র বহাল। হাতের কাছে ফি-কবি পিছু এক-একটা লিট্‌ল ম্যাগাজিন।'

পাঁচ

ষাটের দশকের শেষের দিকে কবিতা বিষয়ক পত্র পত্রিকার প্রকাশ পরবর্তী সত্তরের দশকে এসে একটা বিস্ফোরণের চেহারা নিয়েছিল। পুরোনো পত্রিকাগুলির মধ্যে—*কৃত্তিবাস* ষাটের শেষে অনিয়মিত হয়ে পড়ে, সেই অবস্থায় সম্পাদক নতুন এক সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন তাঁর বন্ধু সমীর রায়চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠিতে : 'আমি কৃত্তিবাসের ভার ছেড়ে দিচ্ছি। এই একটা সংখ্যা পুরো সম্পাদনা করছে শরৎ, আগামী সংখ্যা সমরেন্দ্র অথবা তারাপদকে

সম্পাদক হতে অনুরোধ করেছি। যে সংখ্যায় যে সম্পাদক, সেই সংখ্যার সম্পূর্ণ ভার তার, আমার কোনো দায়িত্ব নেই। যদি এই ভাবে কাগজ চলে, নইলে আর চলার সম্ভাবনা কম।' সুনীলের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। তবে ১৯৬৮তে পঁচিশতম সংকলনে 'সম্পাদকের কথা'য়, একেবারে শেষে বলেছিলেন, 'গুজব শোনা যাচ্ছে কৃত্তিবাস আর বেরুবে না। আমি গুজবে বিশ্বাস করিনা।' বন্ধ হতে-হতেও হয়নি, বেলাল চৌধুরীর দায়িত্বে পরবর্তী তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। তারপরেও আবার বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থায় সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত-র সম্পাদনায় অষ্টাদশ বর্ষ সেপ্টেম্বর সংখ্যা হিসেবে সম্পূর্ণ নতুন ঝকঝকে চেহারায়, প্রকাশিত হল বঙ্গাব্দ ১৩৭৮-এর আশ্বিনে। পরবর্তী বছর তিনেক তাঁরই সম্পাদনায় মোট প্রকাশিত হয়েছে, মাসিক হিসাবে রূপান্তরের আগে পর্যন্ত--কিন্তু সেই মাসিক পর্যায় শুধু কবিতার জন্য নির্দিষ্ট ছিল না, সুনীল ১৩৮১, শারদীয় সংখ্যায় যাত্রারম্ভের সময় কিছুটা করুণ সুরে আক্ষেপ করেছিলেন : 'কৃত্তিবাস কবিতা পত্রিকার মৃত্যু হয়ে গেল। এর চেয়ে দীর্ঘায়ু কোনো লিটল ম্যাগাজিনের মানায় না। মাসিক কৃত্তিবাস একটি নতুন ও পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য পত্রিকা।' এই পর্বেও শেষ পর্যন্ত নিয়মিত করা সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কৃত্তিবাস-এর প্রথম পর্বেই বেশ কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল, এমনকী একই দিনে কৃত্তিবাস নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল একবার, একটি শুধু কবিতার, অন্যটি গল্পের। যাহোক আবার ১৯৯৯ থেকে তাঁর আবির্ভাব ঘটতে দেখা যাবে নব কলেবরে, তবে পুনরায় অবিমিশ্র কবিতার কাগজ হিসেবেই, কিন্তু বার্ষিক সংখ্যা রূপে। পর পর তিনবছর একটি করে প্রকাশের পর, বছরে দুটি করে দেখা গেল তারপরের দু-বছর। ২০০৪ থেকে সেটি বছরে চারটি করে প্রকাশিত হচ্ছে, এবং নির্দিষ্ট দিনে : পুজোর সময় (অক্টোবর-ডিসেম্বর), বইমেলা (জানুয়ারি-মার্চ), ২৫ বৈশাখ (এপ্রিল-জুন) এবং জন্মদিন সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর)। আগাগোড়া প্রতিপাতায় উপরে নীচে ওয়েভরুল, দামি কাগজ প্রতিটি সংখ্যায় নতুন প্রচ্ছদ--পঞ্চাশ বছরের সময় সীমায় দাঁড়িয়ে একেবারে অন্যচেহারায়। নবপর্যায় একাদশ সংখ্যায় 'বিজ্ঞপ্তি'র একটা অংশে তাঁরা স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন : 'কৃত্তিবাস কবিতা এবং কবিতাসংক্রান্ত গদ্যের পত্রিকা। ভুল করেও কেউ যেন গল্প বা উপন্যাস পাঠাবেন না।'

পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করে এখনো প্রকাশিত হয়ে চলেছে *সীমান্ত*-যদিও তার নানা পর্বে সম্পাদকীয় বদল ঘটেছে বেশ কয়েকবার। ১৯৬০, ৬৭, ৬৮, ৬৯--এক দশকেই চারবার পরিবর্তন হয়েছে, যদিও তরুণ সান্যাল প্রতিবারেই উপস্থিত থেকেছেন অন্যান্যদের সঙ্গে। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন দীপেন রায় ১৯৭২-এ, তারপর ১৯৭৭ এবং ৮৯-এ দু-বার বদল হয়ে বর্তমানে আবার এককভাবে ভারপ্রাপ্ত কার্যকরী সম্পাদক দীপেন রায়, ১৯৮৬ থেকে সেটির নাম হয়েছে *কবিতা সীমান্ত*। প্রগতিশীল কাব্যধারার যে প্রচার তাঁরা সূচনালগ্নে নিজেদের দায় মনে করেছিলেন আজও সেটির প্রাধান্য দিতে চান তাঁরা। চল্লিশের দশকের শুরুতে প্রকাশিত হয়েছিল *একক*, সে পত্রিকাটি একাই আজীবন প্রকাশ করে গেছেন শুদ্ধসত্ত্ব বসু, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর সম্পাদিত শেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে ২০০০ মে-তে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনিয়মিত হলেও পত্রিকাটি প্রকাশ করছেন লিপিতা সরকার--২০০২-এর এপ্রিলে ষাট বছর পূর্তি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে *একক*-এর। শুরু থেকে একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকাটি, চল্লিশ বছরের প্রথম

সংখ্যায় সেকথা স্মরণ করে সম্পাদক লিখেছিলেন : '১৯৪১ সালে যখন এককের প্রথম আবির্ভাব, দুর্বোধ্যতার জোয়ার এসেছে বাংলা কবিতায়, পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, সে সময়ের উপজাত নবায়মান দুর্বোধ্যতার জঞ্জাল সরিয়ে কবিতার সুষ্ঠুরূপের উদ্ভাসকে বিকীর্ণ করার কাজে একক ব্রতী ছিল। পরবর্তীকালে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে এককের দুর্মর অভিযান সুস্থ ও শালীন মনস্কতার সব মানুষের দ্বারাই অভিনন্দিত হয়, সে জন্যে দলমত নির্বিশেষে সব কবিই একককে নিজের কাগজ বলে ভাবতে পেরেছেন। সাহিত্যে কোটারি রচনাকে একক কখোনই পাত্তা দেয়নি এবং গোষ্ঠীতন্ত্রের বন্দনায় নিজেকে বিকৃত ও বিক্রীত করেনি।' এই সঙ্গে অবশ্যই দীর্ঘায়ু কবিতার পত্রিকার তালিকায় উল্লেখ করতে হয় *উত্তরসূরি*-র কথা, যে পত্রিকাটি অরুণ ভট্টাচার্য ১৯৮৫-র মে মাসে তাঁর প্রয়াণের অব্যবহিত কয়েকমাস আগেও শেষবারের মতো সম্পাদনা করেছেন। শেষের দিকে পত্রিকার মলাটে তাঁর বয়ানে একটি আবেদন মুদ্রিত হত : '১৯৩০-৮০ পঞ্চাশ বছরের অস্থির দিনগুলি পার হয়েছে। বন্ধুগণ এবার আপনারা ব্যাঁবো বোদলেয়ার অথবা এলুয়ার মায়াকভস্কি থেকে ফিরে আসুন মহাজন পদাবলী আর রামপ্রসাদের কবিতায়, শ্রীধর কথক আর নিধুবাবুর গানে।' দীর্ঘস্থায়ী কবিতার পত্রিকা হিসেবে গোষ্ঠীনিরপেক্ষভাবে আশির দশকের প্রথম কয়েক বছর পর্যন্ত অনেকটাই নিয়মিত ভাবে *কবি ও কবিতা* প্রকাশিত হয়েছে—উভয় বাংলার প্রবীণদের পাশাপাশি নবীনদের সম্মিলিত প্রায় চারশো জন কবি এই পত্রিকায় লিখেছেন। পুরোনো পত্রিকা *কবিপত্র*, গত আটচল্লিশ বছরে নানা বদলের মধ্যেও পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এখনও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। পত্রিকাটির পঁচিশ বছর শুরু হওয়ার অল্প আগে *কবিপত্র প্রকাশ* নাম ধারণ করে, পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও শৈবাল মিত্রর সম্পাদনায় একটা নতুন পর্ব শুরু হয়েছিল থার্ড লিটারেচার আন্দোলনকে বিস্তারিত করার লক্ষ্যে—কিন্তু সে কাজ শেষপর্যন্ত কোনো স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারেনি।

সত্তরের দশক থেকেই কবিতা বিষয়ক পত্রিকার প্রকাশে জেলাশহর থেকে শুরু করে বিভিন্ন মহকুমা স্তরে একটা উন্মাদনা দেখা দেয়। কবি ও কবিতা পত্রিকার সংখ্যাধিক্য এমনই একটা পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল যে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও বিরক্ত হয়ে *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় উত্তর সম্পাদকীয় রচনায় প্রশ্ন তুলেছিলেন : 'এত কবি কেন?' কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় পুরো সত্তর দশক জুড়ে মনে রাখবার মতো পত্রিকা কম প্রকাশিত হয়নি। শহর-মফস্‌সল মিলিয়ে কয়েকটি পত্রিকার নাম উল্লেখ করা যায়, যেমন : *কবিতা এবং কবিতা, সত্তরের কবিতা, বেলা অবেলা, সম্প্রতি, ত্রিবৃত্ত, মহাপৃথিবী, সীমান্ত সাহিত্য, নির্বেদ, সময়ানুগ, সুচেতনা, পিলসুজ, মহাদিগন্ত, ফিনিক্স, চিত্রক, এখন, কবিতাযুগ, কবিকৃতি, কবিস্বর, এখন নতুন কবিতা, রক্তমাংস*,—এরকম অজস্র পত্রিকার মধ্যে অনেকগুলি যেমন বিলুপ্ত, তেমন এখনও অনেক নিয়মিত-অনিয়মিত পত্রিকার প্রকাশ অব্যাহত আছে। এখন যেমন বইমেলায় নতুন সংখ্যা প্রকাশের একটা আগ্রহ দেখা দেয়, তেমন একটা সময় রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে পত্রপত্রিকার সংখ্যা প্রকাশের প্রবল উন্মাদনা দেখা দিত। যোগব্রত চক্রবর্তী সম্পাদিত *পঁচিশে বৈশাখের কবিতা* ১৯৭৭-এ তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। উপর্যুক্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে *বেলা অবেলা* কিংবা *রক্তমাংস* দুটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে, প্রথমটিতে কবিরা তাঁদের আত্মজীবনী লিখেছেন ছোটো পরিসরে, যেমন

শেষোক্ত পত্রিকাটিতে কবিদের নিয়মিত সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হচ্ছে আকর্ষণীয় ভাবে।

বিগত শতাব্দীর শেষপাদে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি উদ্যোগ নিয়েছিলেন, একটি লিটল ম্যাগাজিন মেলা অনুষ্ঠিত করে পারস্পরিক পত্রিকাগোষ্ঠীর মধ্যে আদান-প্রদান ও মত বিনিময়ের প্রয়াস সংগঠনের। এই উপলক্ষে তারা যে তথ্যপঞ্জি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছিলেন, তাতে পত্রপত্রিকার তালিকা থেকে শুধু কবিতার জন্য নির্দিষ্ট পত্রিকাগুলির একটা হিসাব তুলে ধরা যায়। জেলাভিত্তিক পত্রিকাগুলির নাম এখন উল্লিখিত হচ্ছে : উত্তর চব্বিশ পরগনা □ *মৌমাছি; প্রিয় মেঘদূত; মেঘদূত; আজ বসন্ত; অভিষেক সাহিত্য পত্র; অ্যাগোয়াস; দ্যনুক; মধ্য দুপুর; শূন্যদশক; উপাংশু*। কলকাতা □ *রাজধানী; সেই ময়ূখ; সৈনিকের ডায়রি; অন্তরীপ; পদ্যবন্ধু; কবিতা কথালাপ; পঁচিশে বৈশাখ; দৌড়; বব্বল; ক্লেদজ কুসুম; কবিতার সৌতা; ইন্দ্রাণী; উত্তরমেঘ; ঋক্ বৈদিক; এখন কবিতা; কবিতা ক্যাম্পাস; কবিতা যাপন; কবিতা বাসর; কবিতা বারোমাস; কলকাতার কবিতার কাগজ; কুরুক্ষেত্র, এখন কবিতা; কবিতার আসর; ছড়ামুখ; প্রতিশ্রুতি; প্রথম আলো; বাল্মীকি স্মরণ; বৃষ্টিদিন; বিজল্প; মধ্যবর্তী নির্বাচন; যুগন্ধর; ভাষানগর; শঙ্খমালা; শব্দ যাপন; উন্মুখ; দরগা রোড; সুন্দর; সংবর্তিকা*। জলপাইগুড়ি □ *অন্যপক্ষ; কবিতাপত্র*। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা □ *আমি; বিপ্রতীপ; গ্রামনগর; বেলাভূমি; দীপন; পদ্যচর্চা; অনুপ এখন; বোলতা*। নদিয়া □ *জলঙ্গী; ছড়াপাখি; কৌণিক; ঋত্বিক; একালের বোধিমঞ্চ; কবিতার কাগজ, বাংলার পানশি; কবিতা মাসে মাসে; এপার বাংলা ওপার বাংলা; কবিতা কুটীর; কাব্যকলা; কুড়ি; তৃণমূল, কাকতাড়ুয়া; মাসে মাসে কবিতা; মধুবন; বিরোধীপক্ষ; বিদ্রোহী মানুষ; পাললিক; প্রহর; পরাগ; উন্মেষ; ঋদ্ধি; ফিনিক্স; সূর্যমেলা; সেতু*। পুরুলিয়া □ *কেতকী; জিরাফ, সঞ্চিতা, ছড়াকার্ড; তথাগত; নাট্যমন্দির; পায়েল; বনসাই; অন্নজল; হিমযুগ; মৃত্তিকা*। বর্ধমান □ *কবিকণ্ঠ; উজ্জ্বল একঝাঁক; ঋতু; এই মুহূর্ত; ঋজু; কল্পবিভাগ; ক্রমান্বয়; ছড়াক্কা; দহন, দুর্গাপুরের আনন্দধারা; নাট্যমন্দির; বিনোদিনী*। বাঁকুড়া □ *রামকিঙ্কর, কবিতা দশ দিনে*। বীরভূম □ *ঋত্বিক; হিজিবিজি; কবিতা বারোমাস; স্বপ্ননীড়; হাড়মাস*। মেদিনীপুর □ *প্রতিবেশী, মহাপৃথিবী; হায়চিল; সংকলিত সুচেতনা, সুরঞ্জনা; চর্যাপদের হরিণী; হৃদয়ে পুষ্পচাপ; ছড়াপত্র সুসাথী; আড্ডা; ঝরাপালক; পথ রাঙামাটি; রামধনু; অন্যথা*। হাওড়া □ *মহাপৃথিবী; কবিকৃতি; রক্তমাংস; যখন চেতনা; সংরাগ; সমকালীন কবিতা*। হুগলি □ *আত্মজ; অর্চি; অন্তিক; দাহপত্র; আধুনিক সময়; অতিথি; মউল; বিষয় কবিতা; পটভূমি ৪*। উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহার, মালদহ, মুর্শিদাবাদ--এই চারটি জেলায় পাঁচমিশেলি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হলেও পূর্বোক্ত তালিকায় নথিভুক্ত হয়েছে এমন কোনো কবিতা পত্রিকার নামের উল্লেখ নেই।

বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে, 'কবিতার জন্য পরিচ্ছন্ন আর নিভৃত একটু স্থান করে দেওয়ার পক্ষে', *কবিতা পাক্ষিক* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হল 'কবিতা চর্চার নিজ বাসভূমি' হিসেবে। প্রধান সম্পাদক প্রভাত চৌধুরী পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা ও মূল পরিচালক। ১৯৯৩-র ৭ মে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে পরবর্তী বারোবছর তার গতি অব্যাহত রেখেছে, ইতিমধ্যে ৩০৯ সংখ্যা নিয়মিত বেরিয়েছে প্রতি চৌদ্দদিন অন্তর। শুধু তাই নয়, জেলায়-জেলায় ঘুরে ঘুরে তাঁরা কবিতাপাঠের আয়োজন করে চলেছেন, এমনকী প্রত্যন্ত গ্রামে কোনো কবির বাড়িতে, কলেজে-স্কুলে-লাইব্রেরিতে তাঁরা এই আসর বসিয়েছেন নানা সময়ে।

প্রভাত চৌধুরী সম্পাদনা করেছেন প্রথম চারবছর, নাসের হোসেন করেছেন পরবর্তী চারবছর, তারপর দুবছর করেছেন শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে মুরারি সিং সম্পাদনা করে চলেছেন। মফস্‌সল বাংলার অনেক তরুণ কবির পৃষ্ঠপোষকতায় *কবিতা পাক্ষিক* এখন একটা বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করছেন। এই পত্রিকারই প্রায় সমসাময়িক কালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় *কবিতা প্রতিমাসে* নামে একটি পত্রিকা। বীজেশ সাহার সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশের পর অনিয়মিত হয়ে যায়, পঞ্চম সংখ্যাই (ডিসেম্বর ১৯৯৫) সেটির শেষ সংখ্যা। বছর দশেক পরে, সেটারই পুনঃপ্রকাশ শুরু হয় ২০০৫-এর এপ্রিলে, সূচনা সংখ্যা হিসেবে। এই সংখ্যাতেই তাঁরা জানালেন শুধু কবিতা নয়, সুন্দর কাগজে ঝকঝকে ছাপা, এই পত্রিকায় কবিতা-কেন্দ্রিক সংবাদ, আলোচনা, কবিতাপাঠ, ওয়ার্কশপ সহ কবিতা-বিষয়ক সব রকম তথ্যের সন্ধান দিতে চান তাঁরা। খুব নিয়মিতভাবে পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে এমন দাবি করা যায় না, তবে প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যার সম্পাদকীয়তে তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্পর্কে তারা বলেছেন : 'মূল ভূখণ্ডে বাংলা কবিতাচর্চার পাশাপাশি সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন বাংলা কবিতার কবি, কবিতাকর্মী ও পাঠকেরা। অন্য ভাষাতেও কবিতাকে ঘিরে চলেছে অনেক মৌলিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আমরা চাই সকলের সঙ্গেই নিবিড় সম্পর্কের সেতু গড়ে তুলতে।'

কবিতা প্রতিমাসে পত্রিকার এই নবপর্যায় শুরু হওয়ার আটমাস আগে প্রকাশিত হল একালের কাব্যচর্চার সবচেয়ে উল্লেখ্য পত্রিকা *কবি সম্মেলন*। প্রায় তিনদশক আগে তমলুক আবাশবাড়ি থেকে কবিতা সংবাদ নামে 'কবিতা ও কবিতা বিষয়ক একটি পাক্ষিক সংবাদ সংকলন' প্রকাশে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যিনি, সেই শ্যামলকান্তি দাশের সম্পাদনায় ২০০৪-এর সেপ্টেম্বর 'কবির কাগজ, কবিতার কাগজ', নামাক্ষরলিপির সঙ্গে মলাটে এই ঘোষণা পত্রিকাটির মূল চরিত্রটিকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। 'সবিনয় নিবেদন' শিরোনামে সম্পাদক জানালেন : 'কবিতার নানা পত্রপত্রিকায় বাংলা সাহিত্যের আসর ভরে আছে। অজস্র কবি, অঢেল কবিতা। বহুবর্ণ সব কবিতায় আকীর্ণ হয়ে আছে হাজার হাজার সাদা পাতা। বিপুল কবিতা আমাদের সঙ্গে দিনরাত কথা বলছে, জাগিয়ে রাখছে প্রতিদিন। তবু যে আবার একটি নতুন পত্রিকা, কবিতার পত্রিকা, বের করতে হল তার নানা কারণ আছে। সবচেয়ে বড় কারণটি অবশ্যই কবিতা। প্রকৃত কবিতা। আমরা চাই, তরুণ দীপ্তিমান কবিদের সারবান, প্রাণদায়ী রচনায় ভরে উঠুক এই পত্রিকা। তাঁদেরই নিজস্ব মুখপত্র হয়ে উঠুক কবি-সম্মেলন।' কলকাতা শহর, কিংবা পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছে যেসব অসংখ্য শক্তিমান তরুণ কবি তাঁদেরই যথার্থ সম্মেলন ঘটানোই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। তাছাড়াও প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রবীণ ও নবীন কবিরা কীরকম লিখছেন, তারও একটা বিস্তৃত পরিচয় *কবিসম্মেলন*-এর পাতায় নিয়মিত তুলে ধরতে চান তাঁরা। নিবেদনের শেষ পংক্তিতে তাঁদের একান্ত আকাঙ্ক্ষা : 'আমরা চাই কবিসম্মেলন কবিদের নিজস্ব কাগজ হয়ে উঠুক।' আলোচ্য পত্রিকাটি দীর্ঘায়ু হলে হয়তো সংগঠকদের সে প্রত্যাশা বাস্তবায়িত হবে।

কবিতা কুসুমাবলী-র সূচনা থেকে *কবিতা* পত্রিকার অবসান পর্যন্ত সময়সীমা প্রায় শতবর্ষের, তারপরেও অতিক্রান্ত চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরে কত যে কবিতা-পত্রিকা প্রকাশিত

হয়েছে আবার অবসিতও হয়েছে যথা নিয়মে, তার কোনো যথাযথ হিসাব পাওয়া কঠিন। তবু এই দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় বাংলা ভাষায় রচিত কবিতা এই পত্রিকাগুলিকেই অবলম্বন করে কত বিচিত্রভাবে বিবর্তিত হয়েছে। সাময়িকপত্র বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই অসাধারণ উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলা যায় : 'এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। একখানি সাময়িকপত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না। যে সকল নিয়মের বলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকল পত্রের জন্ম, জীবন এবং মৃত্যু তাহারই প্রক্রিয়া। এই সকল সামান্য ক্ষণিকপত্রেরও জন্ম, অলঙ্ঘ্য সামাজিক নিয়মাধীন, মৃত্যু ওই নিয়মাধীন, জীবনের পরিমাণ ওই অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন। কালস্রোতে এ সকল জলবুদ্‌বুদ মাত্র।' কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্‌বুদ্-স্বরূপ শতশত পত্রিকা যেমন ভেসে উঠেছে, তেমন নিয়মবলে বিলীনও হয়েছে। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী সে সবের জন্ম একেবারে নিষ্ফল হয়েছে এমন ভাবার কারণ নেই। কেননা, 'এসংসারে জলবুদ্‌বুদ্‌ও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।'

সুমন ভট্টাচার্য

আশ্রয়ের জাতি ও আঘাতের বর্ণমালা : বাংলা সাময়িকী

'ছিল নিপাট নির্দয়তা' : জাতপাতের কবিয়ালি

১৮৪৪-এর ১৭ জুলাই প্রকাশিত হয় *কায়স্থ কৌস্তুভ*, আর তার সঙ্গে প্রথম প্রকাশিত হল, ব্রাহ্মণ্য দমনতন্ত্রের এক প্রতিস্পর্ধী উচ্চারণ। এই পত্রিকার আখ্যাপত্র উদ্ধৃত করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ--

> ১. ...কায়স্থ উৎপত্তির বিবরণ এবং তাহারদের ক্রিয়া সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার বহু পণ্ডিত সম্মত মীমাংসা দ্বারা প্রকাশিত হইল. এবং নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ শ্লোক সকল অবিকল লিখিত হইল। : প্রথম সংখ্যা
>
> ২. .কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয় বর্ণ ইহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ শাস্ত্রোক্ত বচন দ্বারা...শাস্ত্রাধীন যুক্তিদ্বারা কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় বর্ণ ইহাই দৃঢ়রূপে পণ্ডিতদিগের বোধার্থে এবং সন্দেহভঞ্জনার্থে প্রকট করা যাইতেছে। : দ্বিতীয় সংখ্যা
>
> --*বাংলা সাময়িকপত্র ১৮১৮-১৮৬৮ / পৃ. ৮৫*

এ যাবৎ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী রাজনারায়ণ মিত্র সম্পাদিত *কায়স্থ কৌস্তুভ*-ই জাতিবর্ণ-সংক্রান্ত প্রথম বাংলা সাময়িকী। যদিও জাতিবর্ণ-কেন্দ্রিত সমস্যা বা সে-বিষয়ে স্বতন্ত্র মনোযোগের পরিসর দেখা গেছে, রামমোহন রায় তথা 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা'-র *ব্রাহ্মণ সেবধি*-তে—'আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্ব্বপ্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়' (*বাংলা সাময়িকপত্র* / পৃ. ১৭)। *সমাচার দর্পণ*-এও কৌলীন্যপ্রথা উপহসিত হলে তার পাল্টা সাধতে বেরোয় *সম্বাদ কৌমুদী* (১৮২১)--তবে কেবলমাত্র জাতিবর্ণপ্রসঙ্গ আর তার গুণগানই সে পত্রিকার বিষয় ছিল না। বরং *সমাচার চন্দ্রিকা*-য় আলোচিত *দলবৃত্তান্ত* পত্রিকার প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রতিবেদনটি একবার দেখা যেতে পারে। যেখানে বলা হচ্ছে--

> এতন্মহানগরে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থদিগের পূর্ব্বে দুই দল ইহার দলপতি বৈকুণ্ঠবাসী মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর এবং স্বর্গীয় মদনমোহন দত্তজ মহাশয় এই দুই দলপতির দলভুক্ত প্রায় নগরস্থ সমস্ত লোক ছিলেন তৎপরে নগরের লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি হইল এবং অনেক ধনাঢ্য লোক নগরে বাস করিতে লাগিলেন পরে ক্রমে ক্রমে অনেক দল হইয়াছে বিশেষতঃ নবশাক জাতীয় সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির দলভুক্ত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহারদিগের স্ব স্ব জাতীয়েরও বিশেষ বিশেষ দল আছে। অপর নবশাকভিন্ন সুবর্ণ বণিকাদিরও অনেক দল আছে অতএব দলাদলির বিষয়...যদ্যপি কোন ব্যক্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করেন তাহাতে লোকের মহোপকার বোধ হইবে...।
>
> —*বাংলা সাময়িকপত্র / পৃ. ৪৬*

তাহলে, গড়ে ওঠা মহানগরীর জীবনযাত্রায় জাতিবর্ণ-পরিচয়ের ভূমিকা ফুরোচ্ছে না। আর মানুষজনও, সেই জাতিবর্ণ-পরিচয়কে আশ্রয় করেই পেতে চাইছেন, একটি তুলনামূলক সম্মানিত এবং সুবিধাপ্রদ অবস্থান। ১৮৩২-এ প্রকাশিত *দলবৃত্তান্ত* তার উদ্দেশ্যভূমি থেকে সমাজের যে পরিচয়কে চেনাল, তারপরে *কায়স্থকৌস্তুভ*-এর প্রকাশ, ইতিহাসেরই অনুক্রম, এবং অনিবার্য।

কোন পরিস্থিতিতে রাজনারায়ণ মিত্র এই পত্রিকা প্রকাশ করেন, সে ইতিবৃত্ত প্রাসঙ্গিক। *হুতোম প্যাঁচার নকশা*-য় 'রাজা রাজনারায়ণ কায়স্থের পইতে দিতে উদ্যোগ করলেন' (পৃ. ১০৬)—এই কথার সমান্তরাল যন্ত্রণাকে দেখা প্রয়োজন :

> আন্দুল রাজবংশে রাজনারায়ণ রায় ১৮০৯ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন...এঁদের কৌলিক পদবি 'কর' উপাধি 'রায়'। রাজনারায়ণ হিন্দু কলেজের ছাত্র, সংস্কৃতেও তাঁর দখল ছিল।...তীর্থভ্রমণ করতে বৃন্দাবন গিয়ে গোবিন্দজীউ বিগ্রহকে রত্নহার পরাতে যান, তখন পুরোহিতরা নিষেধ করে বলে যে বাঙলার কায়স্থরা যজ্ঞোপবীতহীন বলে বিগ্রহ স্পর্শ করার অধিকার তাদের নেই। অপমানিত হয়ে রাজনারায়ণ প্রতিজ্ঞা করেন যতকাল তিনি কায়স্থদের শূদ্রত্ব মোচন করাতে না পারবেন ততকাল কোনো তীর্থে যাবেন না। এরপর তিনি কায়স্থরা উপবীত ধারণ না করলেও তারা যে মূলত ক্ষত্রিয় এই মর্মে পণ্ডিতদের ব্যবস্থা নিয়ে স্বয়ং পুত্রসহ উপনয়ন গ্রহণ করেন ও কায়স্থদের অনুরূপ কার্যে উৎসাহিত করতে শুরু করেন।
>
> : *সটীক হুতোম প্যাচার নকশা* / অরুণ নাগ, টীকা-৩২২ / পৃ. ১১৭-১৮

এই ক্রিয়া খুব স্বাভাবিকভাবেই সমাজ মানেনি। ১৮৪৭-এ বেরোনো *দুর্জ্জন দমন মহানবমী*-তে যখন হিন্দুধর্মের ক্রমিক অধঃপাত বিষয়ে হা-হুতাশের লগ্নেই লেখা হয়ে যায়--'কেহ বা ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির যজ্ঞোপবীতি দানে প্রবর্ত্ত' তখন *কায়স্থ কৌস্তুভ* যে আঘাত সমাজকে দিতে সমর্থ হয়েছিল, তার স্বরূপ অনুমান করা যায়। তা যে কেবলমাত্র একটি 'নতুন হুজুগ' হয়েই ফুরিয়ে যায় নি, তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় সাময়িকীর গ্রন্থরূপ এবং একাধিক সংস্করণের তথ্যে। 'মজুমদার শ্রী গুরুচরণ বর্ম্মদেবস্য' প্রকাশিত ১২৮২ সন (১৮৭৫) সংস্করণে প্রকাশকের ভূমিকায় 'মজুমদার শ্রী গুরুচরণ' লেখেন :

> ...চিত্রগুপ্ত বংশজ কতিপয় কায়স্থ সেই কৌস্তুভের তৃতীয় সংখ্যা লিখিত যে ব্যবস্থাতে ব্রহ্মর্ষিতুল্য* অভয়চরণ তর্কালঙ্কার [য.],* জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন,* হলধর চূড়ামণি প্রভৃতি ৩৯ জনের মতে কায়স্থকে ক্ষত্রিয়ত্বে প্রমাণ করিয়াছিলেন সেই ব্যবস্থা বেদের স্বরূপ জ্ঞান করিযা শূদ্রত্বভাব পশ্চাৎ রাখিয়া ক্ষত্রিয়ত্বভাব গ্রহণপূর্বক গত শ্রাবণ মাসে শ্রী শ্রী হরিস্মরণানন্তর উপবীত ধারণ করিয়াছেন...মহাত্মা মিত্রজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ইংরাজিতে সুশিক্ষিত শ্রীমান্ হরিশচন্দ্র মিত্র বাবু...এক ইংরাজি মহাসভাতে জাতীয় বিষয় দীর্ঘ বক্তৃতা ইংরাজিতে নানা পুরাণ শাস্ত্র হইতে কায়স্থ শূদ্র নহে কোন কোন অংশ বৈশ্যের ন্যায় ব্যবহার এবং স্পষ্ট ক্ষত্রিয় সপ্রমাণ করিয়াছেন তাহার একখানি ইংরাজি গ্রন্থপ্রকাশ আছে। --ভূমিকা / পৃ. ৯০

জাতিবর্ণ-সংক্রান্ত পত্রিকার সূচনা এই *কায়স্থ কৌস্তুভ*-এর প্রকাশে। ১৮৪৪ থেকে ১৯০২—দীর্ঘ পাঁচ দশকের চলিষ্ণুতার এই আত্মপরিচয় প্রকাশের মাধ্যম খুঁজেছে। বিভিন্ন রীতির কুলজীগ্রন্থে সেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটেনি। তার জন্যই প্রয়োজন ছিল সাময়িকপত্রের শৃঙ্খলার-যা নিত্যসংযোগের উপযোগী।

শুধুমাত্র জাতপাতের পরিচয়কে প্রকাশ করবার জন্যই পত্রিকা বের করা একটু আশ্চর্যের। কিন্তু বাংলা সাময়িকপত্রের প্রথম যুগ তো এই প্রচারধর্মিতারই পর্ব। *গসপেল*

ম্যাগাজিন (১৮১৯), *খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি* (১৮২২) থেকে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* (১৮৪৩)-র মধ্যে ধর্মাদর্শ প্রচারের যে আদিকল্পটি প্রতিষ্ঠা পায়, সেখান থেকেই জাতি-পরিচয় সংক্রান্ত পত্রিকা প্রকাশের প্রত্যয় উঠে এসেছিল।

বর্ণাশ্রম-চিহ্নিত হিন্দু সমাজ কাঠামোয় বর্ণগত পরিচয়ের সম্মান ও গ্লানির যূথযাত্রার ফল কী, তার পরিচয় ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতিতেই পঠিত হয়। প্রসঙ্গত এইটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন, তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী পর্বের ইসলামীকরণ আর আঠারো-উনিশ শতকের ব্রিটিশ পর্বে খ্রিস্টধর্মের বিকাশ কিন্তু শুধু বিজয়ীপক্ষের পেশীশক্তির সাফল্য নয়। অপরপক্ষের সাগ্রহ অনুমোদনও ছিল। উনিশ শতকের এই প্রেক্ষিতে অধ্যাপক স্বপন বসুর পাঠ অনুসরণ করা যেতে পারে :

> ১. নিম্নবর্ণের লোক, জাতিচ্যুত ও নিতান্ত দরিদ্ররাই খ্রিষ্টান হত, এর পেছনে লোভের হাতছানিটাই ছিল বড়। ...২ মে, ১৮৩১-এ 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত সংবাদে দেখি 'ঈশুখ্রিষ্ট ভজিবার যখন প্রথম গোল উঠিল তখন কোন কোন হতভাগ্যের মনে এমনি স্থির হইয়াছিল সে খ্রীষ্টীয়ান হইলে এক বিবি ও এক বাড়ী আর একলক্ষ টাকা পাইব এই প্রাপ্ত্যাশায় কয়েকজন ইতরজাতি মজিয়াছিল। এক্ষণে তাহারা কেহ বাগানের মালি কেহ বা দরয়ান কেহ বা খেজমতগার হইয়া দিনপাত করিতেছে।' : পৃ. ৬৫
>
> ২. এরপর ধর্মান্তরিত হলেন হিন্দু কলেজের নামকরা ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রথম একজন উচ্চশিক্ষিত সুপরিচিত কুলীন ব্রাহ্মণ ধর্মান্তর গ্রহণ করলেন।...নিম্নবর্ণের হাজারজনকে ধর্মান্তরিত করার চেয়ে এই একজনের ধর্মান্তর গ্রহণ সমাজমনকে অনেক বেশি নাড়া দিল। —'বাংলার ধর্মীয় অবস্থা' / *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস* পৃ. ৬৭-৮

অর্থাৎ এই জাতিবর্ণ সংস্কার ভারতীয় সমাজে এমন এক অনড় অভিমান, যে ভিনদেশি ধর্মপ্রচারকও এই বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছেন। আর বিশ শতকের আধুনিকতার উজ্জ্বলতর পর্যায়ে কেন সহসা জাতিবর্ণ-সংক্রান্ত পত্রিকা প্রকাশের ধারা এক দুর্নিবার গতি এবং সংখ্যাধিক্য অর্জন করল, তারও এক সংকেত এখানে পঠিত হয়।

উদ্ধৃত অংশে জাতিচ্যুতির প্রসঙ্গটি একটু দেখবার। পাঠক সহজেই মনে করতে পারবেন বঙ্কিমচন্দ্রের *দেবী চৌধুরাণী*-তে প্রফুল্ল আর তাঁর মা-র জাতি সংক্রান্ত অপবাদ রটনার জের বা শরৎচন্দ্রের *দত্তা*-য় একঘরে নরেন অথবা ত্রৈলোক্যনাথের *কঙ্কাবতী*-তে জাতিচ্যুতির পরিহাসশাণিত উপাখ্যানগুলি। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের এই প্রবল পরাক্রম কিন্তু কলকাতার নগরবিকাশের ইতিকথায় ক্রমশ রূপকথা হয়ে গেল। বালক নরেন্দ্রনাথ দত্তের জাত যাওয়ার পদ্ধতি দর্শনের ব্যবহারিক পরীক্ষা, সত্য হোক বা কিংবদন্তি হোক, জাতিচ্যুতির সামাজিক প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব যে কমে এসেছিল তার সংকেতবহ।

বলা যেতে পারে, জাত মারবার মধ্যযুগীয় সন্ত্রাস স্তিমিত হয়ে এলে পর দেখা দিল জাতে ওঠার পরিকল্পনার সাহস। আর এখান থেকেই এই জাতিবর্ণ-সংক্রান্ত পত্রিকার পাঠ শেষ পর্যন্ত সমাজের একটি ন্যূনতম মানসিক আধুনিকতা অর্জনের পাঠ হয়ে দেখা দেয়।

'ভাস্করের হাতে গড়া আদম' : সুমারি আর পুরাণের কথা

১৮৯১ সালে শ্রীশচন্দ্র তা-র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি*। জাতিবর্ণকেন্দ্রিক সাময়িকীর পাঠে এই পত্রিকার গুরুত্ব এখানে, যে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য-র মতো সামাজিক সুবিধাভোগী জাতিবর্ণগোষ্ঠীর বাইরের তুলনামূলক অনগ্রসর গোষ্ঠীর এই পত্রিকায় সেন্সাস-

সংশোধনীর আবেদন ওঠে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন গোষ্ঠীই এই দাবি তুলবে। এখানে একই সঙ্গে সমাজপ্রগতির মনন, সাহস আর দীর্ঘকালের সংস্কারের প্রতি মান্যতার আগুটান-পিছুটানের যৌথতাকে পড়া যায়। একদিকে অবমানিত অবস্থানের পরিবর্তে উন্নততর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রমাণ-সংগ্রহ ও তার উপস্থাপনা। অন্যদিকে সহবাস-সম্মতি বিল-এর বিরোধিতা। তবে উনিশ শতকের পটে এই দ্বিধা আশ্চর্যের নয়, বরং স্বাভাবিক।

উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি-র প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয় এই পত্রিকায় উদ্দেশ্য আর কর্মসূচি—

> বহুদিন হইতেই আমাদের মনে জাতীয় সমাজের উপাদান-নির্ণয়ের বাসনার উদয় এবং তৎসঙ্গেই উহার অভাব উপলব্ধি হয়। সেই হেতু একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া নিদ্রিত জাতীয় সমাজকে উদ্বোধিত করণের বাঞ্ছা জন্মে।...অর্থের অনটনবশতঃ মনের ইচ্ছা মনেই চাপিয়া রাখিতে হইয়াছিল। এক্ষণে সময়ের গুণে জাতীয় সমাজ স্বয়ং জাগরিত হইয়াই আত্মপরিচয় গ্রহণে উদ্বিগ্ন এবং অভাববোধের সহিত অভাব পরিপূরণে—উন্নতিকরণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। পৃ. ৩

এই "বহুদিন"-এর কালপরিমাপ আর "এক্ষণে সময়ের গুণে"-র অনুষঙ্গ স্পষ্ট হয়, হরিদাস সাঁই-এর 'উগ্রক্ষত্রিয় সমিতি'তে :

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সমীপে উগ্রক্ষত্রিয়-সমিতির আবেদন।

উগ্রক্ষত্রিয়পাঠকগণ, বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন যে, "উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির" [illegible] অধিবেশনে " [illegible] অবধারিত হয়, তন্মধ্যে একাদশ মন্তব্যে নির্দ্ধারিত হয় যে, "মাননীয় বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত এইচ, এইচ, রিস্‌লি সাহেব বাহাদুর যে জাতিমালা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তাহাতে উগ্রক্ষত্রিয়-জাতি সম্বন্ধে যে বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। উক্ত পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ কালে যাহাতে ঐ ভ্রম সংশোধিত হয়, সেজন্য সাহেব বাহাদুরের সংগৃহীত বিবরণের যথার্থ প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে অবগত করা নিতান্ত আবশ্যক। ঐ প্রতিবাদের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার ভার শ্রীযুক্ত হরিদাস সাঁই মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হইল।"

এতদনুসারে যে আবেদনপত্র প্রস্তুত ও মুদ্রিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট সমীপে প্রেরিত হইয়াছিল, পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহার [illegible] অনুলিপি প্রকাশিত হইল। ভরসা করি এই আবেদনের ফলাফল সকলেই [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করিতে সমর্থ হইব।

এই অধিবেশনের মন্তব্যগুলি দ্বিতীয় খণ্ড [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

আবেদনপত্র।

To

THE HON'BL H. H. RISLEY

B. A., C.S., C.I.E., &c.

Secretary to the Government of Bengal in the Revenue Department.

Sir,

We the undersigned members of the Ugra-Kshattriya-Samiti most respectfully beg leave to submit the following review of the account of our caste as embodied in the official edition of your "Tribes and Castes of Bengal" and hope you may be pleased to favour them with as much consideration as you may be able to afford in the varied business of your official life. It would not, we trust, be quite out of place to mention here that some time ago when the draft articles of the work under notice were circulated piecemeal, we had the honour to submit certain criticisms on this very subject; but to

উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির ক্ষুব্ধ সদস্যদের আবেদন

সম্প্রতি কিছুদিন হইতে বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক বঙ্গদেশস্থ জাতিনিচয়ের ইতিহাস রচিত হইবার জন্য প্রত্যেক জাতির উৎপত্তি এবং প্রাচীন ও আধুনিক আচার ব্যবহারানুমত বিবরণ সংগৃহীত হইতেছে। তদুপলক্ষে আমাদের উগ্রক্ষত্রিয় জাতি সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক ও একান্ত অসঙ্গত।...

বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের সংগৃহীত বিবরণীর প্রতিবাদ এবং স্থায়ী রূপে জাতীয় হিতসাধনের জন্য একটী সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। সেই সমিতির নামই "উগ্রক্ষত্রিয় সমিতি"।...

বিগত ১২৯৫ সালের ১৫ই আশ্বিন শুভদিনে "উগ্রক্ষত্রিয় সমিতি"র জন্ম।

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা / পৃ. ২৭

এই ১২৯৫ সন অর্থাৎ ১৮৮৮-তেই প্রকাশিত হয়েছে হারবার্ট রিস্‌লে-র *Tribes and Castes of Bengal*--আর দ্বিতীয় বর্ষের নবম সংখ্যায় দীর্ঘ প্রতিবেদন--'বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট সমীপে উগ্রক্ষত্রিয়-সমিতির আবেদন' (পৃ. ২৬৯-২৭৯)। এই প্রতিবেদন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। আর সামাজিক অবমাননার দম-চাপা পরিবেশই তাঁদের এই আত্মঘোষণার প্রক্রিয়ায় পৌঁছে দেয়। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে দেখা যায়--

পাঠকবর্গ বলিতে পারেন "একখানা নগন্য [য.] কাগজ প্রকাশ করিয়া এত আনন্দপ্রকাশের কারণ কি?" তদুত্তরে আমাদের নিবেদন এই যে, আমরা স্বয়ং কৃতী পুরুষ নহে ; সুতরাং কৃতিত্বজনিত আনন্দপ্রকাশ করিতেছি না।...

অভাবই উন্নতির মূল। অভাব হইতেই আকাঙ্ক্ষা জন্মে। আকাঙ্ক্ষাই আন্দোলন আলোচনার জননী। আন্দোলন-আলোচনায় কার্য্যকারিণী বৃত্তি উত্তেজিতা হয়।...

কিয়দ্দিবস হইতে আমাদের উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ মধ্যে আন্দোলন-আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ স্বীয় সামাজিক উপাদানের অভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সেইজন্যই আত্মপরিচয় প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে।

--১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা / পৃ. ১-২

এখানে 'আত্মপরিচয়-প্রাপ্তি'কে আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা-র রূপে পড়াই সঙ্গত এবং সম্মানিত আত্মপরিচয়। ২০০৫-এর পাঠদৃষ্টিতে এই যুক্তিবিন্যাস কিঞ্চিৎ কৌতুকপ্রদ মনে হতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'লোকহিত' প্রবন্ধটি মনে করা যেতে পারে, তার বক্তব্যও একই সমভূমিতে গিয়ে পৌঁছয়।

ফলত এই আত্মবোধ অবশ্যই ইতিবাচকতার ইঙ্গিত। ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যায় রিস্‌লে-কে পাঠানো চিঠিটি মুদ্রিত হয়, আর এখানেই উঠে এল আত্মপরিচায়নের সেই কাঠামো, যা অনুসৃত হবে পরবর্তী ছয় দশকের জাতিবর্ণ-সংক্রান্ত পত্রিকার চারিত্রে। রিস্‌লে-কে প্রেরিত পত্রে, উগ্রক্ষত্রিয় সমিতি আট-টি বিষয়ে তাঁদের আপত্তি জানান। প্রথমত,—

To begin with nomenclature assigned to the Ugra-Kshatriyas. In all humility we beg to point out that as "Baman" is but a corruption of Brahman and "Kaiyath" of Kayastha so is the term "Aguri" a corruption of Ugra-Kshatrtiyas.

2. Our second objection consists in the use of the word "Cultivating" in reference to our caste. By "Cultivating caste" we generally understand a caste the members of which are all ploughmen. ..We would in this place, humbly suggest the substitution of the word *agricultural* for cultivating in as much as the former is more extensive in its signification and may therefore comprehend the varied classes of the Ugra-Kshatriyas holding tenures, under-tenures, raiati holding. E. & C. পৃ. ২৭০

এই সূত্রেই উপস্থাপিত হয়েছে শাস্ত্রকথা। *মনু-সংহিতা* কথিত :

ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্র কন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপূর্জ্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে।। -- ৯ : ১০

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় পিতা ও শূদ্র মাতার সন্তান ক্ষত্রিয় ও শূদ্রের যুগ্ম-লক্ষ্মণ পায় ও উগ্র অর্থাৎ ক্রূর নিষ্ঠুর আচরণে আনন্দিত হয়। এই বক্তব্যের সমান্তরে দাবি করলেন :

> Besides, Manu is not the only authority : there was other law-givers such as Ushana, Goutam, Harit & C., quotations from whose works bearing upon this point would have been as much decisive and authoritative as those from Manu...We may however, be permittad [Sic / permitted] to quote here a few of the passages from other works... পৃ. ২৭২

উশনঃসংহিতা-র কুল্লুকভট্ট টীকা ও হলায়ুধ-কথিত, "উগ্রো যুদ্ধক্রিয়াবৃত্তিঃ" উদ্ধৃত করে তাঁদের যুদ্ধজীবী ক্ষত্রিয় সম্ভব পরিচয়ের শাস্ত্রীয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবং শেষত অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে তুলনামূলক সম্মানের পরিসরে তাঁদের বক্তব্য :

> Our...last objection refers to the social status of the Caste as mentioned in the book...As far, however, as the position of the Ugra Kshattryas [Sic] in Burdwan and western Bengal is concerned. We beg leave emphatically to assert that they always take rank higher than the Naba-sakhas. পৃ. ২৭৪

নিজেকে জানান দেওয়ার প্রত্যয় যেমন স্পষ্ট, তেমনি স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই একই জাতিগত ক্রমোচ্চবিন্যাসের অভিমানরেখা।

দশ বছরের ব্যবধানে বিশ শতকের শুরুতেই প্রকাশিত হল *কায়স্থ-পত্রিকা* (বৈশাখ, ১৩০৯), সম্পাদক, নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ঘোষিত উদ্দেশ্য--

কায়স্থ পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিষয় আলোচিত হইবে :--

১। কায়স্থ-জাতির উৎপত্তি ও বর্ণনির্ণয়।
২। উত্তর রাঢ়ীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই চারিশ্রেণীর কায়স্থের উৎপত্তি ও কুলক্রমিক সামাজিক ইতিহাস।
৩। পূর্ব্বকাল হইতে উক্ত চারিশ্রেণীর পরস্পর সম্বন্ধ-বিচার।
৪। চারি সমাজের স্মরণীয় মহাত্মাগণের জীবনী প্রকাশ।
৫। সমাজের একতা ও ভাবী কল্যাণসাধনের উপায় নিরূপণ।
৬। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের কায়স্থজাতির বিবরণ ও ইতিহাস সংগ্রহ।
৭। কায়স্থসমাজের হিতকল্পে অনুষ্ঠিত ও বিবাহব্যয় সংক্ষেপকরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠেয় ব্যাপারের আলোচনা।
৮। কায়স্থ জাতি সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশ।
৯। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভায় প্রতিমাসে কার্য্যনির্ব্বাহকে বা বিশেষ সমিতির যে সকল অধিবেশন ও যে যে বিষয় আলোচিত হইবে, কার্য্য বিবরণী মধ্যে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ।

এই ঘোষণার গড়ন থেকেই পত্রিকার মনোভাব খানিকটা বোঝা যায়। কায়স্থজাতির উদ্ভব ও বর্ণ-নির্ধারণ অবশ্যই একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্ণাশ্রম কাঠামোয় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-র ক্রমোচ্চবিন্যাসে কায়স্থ কোথায়? যখন পঞ্চমবর্ণের অস্তিত্বই অস্বীকৃত। অবশ্য যদি আম্বেদকরের বক্তব্য মেনে নেওয়া হয়, যে চতুরাশ্রম চারটি বর্ণেই সীমিত নয় শূদ্রেরও নিচে

থাকে, অনুক্ত এক অতিশূদ্র সম্প্রদায়। কিন্তু কায়স্থ তো সেই সহজলভ্য শূদ্রাতিশূদ্র পরিচয়ে পৌঁছতে চান না। স্মার্ত রঘুনন্দনের বিধানে যখন, বাংলায় ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র-র চরম প্রান্তিকতাই সমাজ মেনে নিয়েছে তিন শতকের সুদীর্ঘতায়! রাজা রাজনারায়ণ কায়স্থের যে দ্বিজাতি পরিচয় তথা ক্ষত্রিয়-বর্ণসিদ্ধতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, বঙ্গীয় কায়স্থ সভা-ও সেই দ্বিতীয় বর্ণের প্রতিষ্ঠায় স্থিতি চাইলেন। আর ১৯০১-এর সেন্সাস-এ যখন বৈদ্যগোষ্ঠীকে কায়স্থের ওপরের থাকে স্থান দেওয়া হল—তখন, *কায়স্থ পত্রিকা*-র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, কুঞ্জলাল রায়ের 'সেনসাস রিপোর্ট ও কায়স্থ সমাজ'-এ :

> জাত্যভিমান বঙ্গদেশে যেমন প্রবল, এমন বোধ হয় আর কোন দেশ নাই, তাহা এবার বিভিন্ন জাতির পদমর্যাদা বিচার করিতে গিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন।...কুড়ি মাস খাটিয়া অনেক বুঝিয়া শুঝিয়া গবর্ণমেন্টের অনুগৃহীত সিবিলিয়নপ্রবর গেট সাহেব বঙ্গ বাসীর নিকট সেই সুফল উপস্থিত করিয়াছেন!...কায়স্থ-ভ্রাতৃমণ্ডলী [য.]! মহামতি গেট সাহেব আপনাদের সম্মুখে যে দর্পণখানি ধরিয়াছেন, তাহাতে স্ব স্ব বদনকমল একবার নিরীক্ষণ করুন! ...শুনুন, গেট সাহেব কি লিখিয়াছেন—
>
> "They (Baidyas) claim precedence over the Kayasthas on the following additional grounds .–"
>
> (1) The Kayasthas are Sudras and have been held to be so by a High Court ruling to which a Kayasth [Sic] Judge subscribed.
>
> (2) The Kayasthas mourn for 30 days like the Sudras, whereas the Baidyas mourn for 15 days only.
>
> (3) When the Sanskrit College was first opened the only castes admitted were Brahamans and Baidyas.
>
> (4) The Kayasthas were originally the servants of the Brahamans and Baidyas and when poor they are still found taking employment as domestic servants, whereas the Baidyas will never do so. ...
>
> (Gait's *Bengal Report*, p. 279)

কায়স্থ সম্প্রদায়ের এই ক্ষোভ অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ কায়স্থ এবং বৈদ্যসমাজের এই দুই প্রাগ্রসর শ্রেণী বর্ণাশ্রমের চতুরঙ্গে অনুপস্থিত। ফলত, জীবিকাক্ষেত্রে তুল্যমূল্য হয়েও সামাজিকতার পংক্তি ভোজে ভিন্নতর বা নিম্নতর আসন, তাঁদের অভিমানে আঘাত করে।

এই প্রসঙ্গে সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াও উল্লেখ্য। কারণ সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় অর্ধসহস্রাব্দীরও বেশি সময় পতিত-সম্প্রদায়ের পরিচয়ে অপমানিত অবস্থানের গ্লানি সহ্য করতে বাধ্য হয়েছেন। ফলত, জনগণনা কার্যক্রমের পর্যায়ে বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক সম্মিলনীর পক্ষ থেকে হৃষীকেশ লাহা, সেন্সাস-তত্ত্বাবধায়ককে একটি দীর্ঘ পত্রে এই সামাজিক অপমানের ইতিবৃত্ত ও শূদ্র পরিচয়ের পরিবর্তে বৈশ্য বর্ণের পরিচয় দাবি করেন। *সুবর্ণবণিক সমাচার*-এর ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যায় এই পত্র (পৃ. ৯-২২) এবং সুপারিন্টেন্ডেন্টে অব সেন্সাস অপারেশন, বেঙ্গল—ডব্লু. এইচ. থমসন-এর উত্তর (পৃ. ২২-৩) মুদ্রিত হয়েছে। থমসন-এর বক্তব্যের সূত্রে দেখা যায় :

> ১. On the occasion of certain former Censuses, caste was a matter into which extensive enquiries were made. This was especially the case in 1901. At the last census 1911, no arrangement of castes in the order of their social status was attempted, but the figures for the number of

persons of each caste were given in the table in the alphabetical order of the caste names.

২. I have received many applications, especially from leaders of the cultivating and fishing communities, who have put forward claims to caste-names differing from those usually applied to their castes, but have avoided examining the Shastric basis of such claims (as indeed I know myself wholely incompitent to do) and have gone into the matter solely with a view to avoid the vitiation of the caste figures through persons of different communities returning themselves by same caste-name



ব্যঙ্গচিত্রে জাতি গৌরবের বাড়াবাড়ি

এখান থেকে, ভিন্নতর পরিচয়-প্রতিষ্ঠা-প্রত্যাশী জাতিবর্ণ গোষ্ঠীগুলির প্রতি কর্তৃপক্ষের মনোভাবের একটি ধরনকে পড়া যায়। কৃষিকর্ম-সম্পৃক্ত উগ্রক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর দাবি পূর্বদৃষ্ট মৎস্যজীবী সম্প্রদায় বলে চিহ্নিত গোষ্ঠীর দাবি পঠিত হয় মাহিষ্য সমাজের আত্মঘোষণার বয়ানে। নদিয়া থেকে কৃষ্ণভাবিনী বিশ্বাস-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *মাহিষ্য মহিলা* (১৩১৮)। এখানে একটি অস্বাক্ষরিত নিবন্ধে এই ইতিবৃত্তের আঁচ পাওয়া যায় :

> ...জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমরা কি কৈবর্ত্ত গাঁ [য.]? তোমরা কি মাছটাছ ধর?"...সে যেন একটু গরম হইয়া উত্তর করিল "কৈবর্ত্তেরা কি মাছ ধরে নাকি? মাছ ত জেলেরাই ধরে"! তখন ঐ পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকটি...বলিল "আমাদের দেশের কৈবর্ত্তরা ভাই মাছ ধরে তাই মনে ক'রেছিলাম তোমরা বুঝি সেই কৈবর্ত্ত। আগে বলতে হয় যে তোমরা চাষী", ...স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, যে আমরা নিজেরাই আমাদিগের জাতিকুল মর্যাদা এবং সম্মান নষ্ট করিতে বসিয়াছি ; আমরা যদি চাষী কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচয় না দিয়া কেবলমাত্র মাহিষ্য বলিয়া পরিচয় দিই, তাহা হইলে আমাদিগকে আর এরূপভাবে যখন তখন লাঞ্ছনাভোগ করিতে হয় না। ১ম ভাগ / পৃ. ২-৩

এখানে থমসন-এর মন্তব্যের পটভূমি খানিকটা বোঝা গেল। পূর্বোদ্ধৃত পত্রের শেষ দুই অনুচ্ছেদও উদ্ধারণীয় :

> The case of your community is different from these. In your case there is no wish to avoid the use of the name Suvarnavanik commonly applied to you, for it is not in any way considered derogatory. Persons of your community do not wish to disguise their true caste identity by the adoption of a new tille [sic]. Your claim is that the Suvarnavaniks are to be associated in origin with the Varna Vaishya. ...
>
> I have the honour to assure you that the census report shall contain no suggestion that the Suvarnavaniks are not to be associated with the Varna Vaishya পৃ. ২৩

পত্রিকার পক্ষ থেকে এই আবেদন-পত্রের মুদ্রিত অনুলিপি "অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিটসহ পত্র লিখিলে" উৎসাহী জনের কাছে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

১৮৭১ থেকে ১৯৩১-এর সাতটি সেনসাস পরিচালিত হয়েছে জাতপাতের ভিত্তিতে। আর ১৯০১ থেকে ১৯৪৭-এর ব্রিটিশ ভারতের কাঠামোয় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় শ'খানেক পত্রিকা বেরিয়েছে প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে এই জাতিবর্ণ পরিচয়ের সমস্যাকে সামনে রেখে।

অবশ্য সব সময়েই তা সমস্যা নয়। যেমন, *বারেন্দ্র পত্রিকা* গুরুত্ব দিয়েছে বিভিন্ন বিশিষ্ট বারেন্দ্র পরিবারের ইতিবৃত্ত আর গৌরব জ্ঞাপনে। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের পত্রিকা *অধিকার*, তাঁদের সামাজিক অসম্মানের সমস্যার তীব্রতর ভূমিতেই, একটি প্রতিরোধের বক্তব্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। আবার *শ্রীহট্ট ব্রাহ্মণ পরিষৎ পত্রিকা*-ও বেরিয়েছে, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদ কল্পে, বলা বাহুল্য, একে সমস্যার সত্যতায় গ্রহণ করা কূট-তর্ক সাপেক্ষ। কিন্তু যা বিশেষভাবেই লক্ষ্য করবার তা হল এই যে ব্রাহ্মণেতর জাতিবর্ণ গোষ্ঠীগুলি, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতি অসহিষ্ণু। তাঁরা ব্রাহ্মণ্যকে প্রতিবাদ করবার জন্য ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের মোক্ষম অস্ত্র পুরাণকেই ব্যবহার করছেন—এই কার্যক্রম যেমন, ইতিবাচক, তেমনি এই পুরাণ-শরণের সূত্রে পুনর্বার সেই ব্রাহ্মণ্যেরই মুখাপেক্ষিকতায় গিয়ে পড়ছেন, এই নেতিবাচকতাও তেমনি প্রত্যক্ষ। এই দ্বিধার প্রকৃতি থেকেই সময়ের সমাজ ভাবনার পাঠ-পুঞ্জ উঠে আসে, জাতিবর্ণ সংক্রান্ত পত্রিকাবাহিত বক্তব্যের সমন্বয়ী পাঠের মনস্কতায় বা অন্য মনস্কতায়।

'অবসন্ন শরিকের দিঘি' : আত্মঘোষণার উজানে

বাংলার সমাজকাঠামোয় জাতপাতের ভূমিকা কেমন? তার কোনো সরল উত্তর নেই। উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের মতো তা চরম নয়, ঠিকই, কিন্তু জাতিবর্ণ-অভিমান, তার অহং এবং

আত্মাবমাননার যৌথরূপেই স্বপ্রতিষ্ঠ। সামাজিক এবং পারিবারিক ক্রিয়া-কর্ম-শোক-উৎসবের আচার পালনের বৃত্তে ব্রাহ্মণ-শাসন একটি বিশেষ নিয়ন্ত্রক-ভূমিকায় স্থিত। ষোড়শ শতকে স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁর *অষ্টবিংশতিতত্ত্বদীধিতী*-তে এই সমাজ কাঠামোকে কঠোর নিয়মকানুনে বাঁধলেন। যেহেতু বিবাহ থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত যাবতীয় মুখ্য সামাজিক-আচার পরিচালনার রাশ ব্রাহ্মণেরই হাতে, ফলত, তাঁর বিচারে সমাজের মাথায় রইলেন ব্রাহ্মণ এবং অপরাপর পরিষেবাদায়ী গোষ্ঠী বিবেচিত হল শূদ্রের পর্যায়ে। প্রত্যক্ষ কায়িক পরিষেবাদায়ী নবশাখ তো বটেই, প্রশাসনিক কর্মজীবী কায়স্থ এবং চিকিৎসাজীবী বৈদ্যরাও সেই শূদ্রের পরিচয়েই গণ্য হলেন। যুদ্ধ তথা আরক্ষা বা প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত উগ্র, এবং উৎপাদন ও ক্রেতার সংযোগবাহ বণিক শ্রেণি, সকলেই বিবেচিত হলেন শূদ্র পর্যায়ে। প্রশাসনিক ও প্রাকৃতিক - বিবিধ বিপর্যয়ের পর্যায়বন্দী সমাজমানুষ, কার্যকারণের শৃঙ্খলাকে যুক্তিনিষ্ঠভাবে পাঠ করবার বদলে ধর্মীয় অনুশাসনের যে খণ্ডে সংস্কার-বদ্ধতা, তাকেই আশ্রয় করলেন। ফলে তাঁদের কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেল। এখানে একটি বিষয়ের প্রতি প্রাসঙ্গিক মনস্কতা জরুরি--তা হল, চৈতন্যদেবের 'তিরোভাব' এবং স্মার্ত রঘুনন্দনের 'আবির্ভাব'-এর সমান্তরতা। চৈতন্যদেবের জাতিভেদ বিলোপের মানসিকতা ও ক্রিয়াধারা যতই বিপুলভাবে অভিনন্দিত হোক, শেষপর্যন্ত পালিত হয়নি। আর সামাজিক সুবিধাপ্রাপ্ত মধ্যশ্রেণির মানুষও তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। এক আশ্চর্য সমাপতনে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দুই বিশিষ্ট রচয়িতার মন্তব্য পড়া যেতে পারে :

১. বঙ্গে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র ছাড়া কোন জাতি নাই,--এই ঘোষণা করিয়া ব্রাহ্মণেরা...পার্থিব প্রতিপত্তিকে হতাদর করিলেন। এই ভাবে ক্ষত্রিয়শক্তি ও বৈশ্য প্রভাবের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া নব-ব্রাহ্মণ তাঁহার অপ্রতিহত বৈজয়ন্তী সমস্ত বঙ্গদেশের উপর দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিলেন। নব-ব্রাহ্মণ্য এই সকল শিক্ষা নানারূপ অলৌকিক উপাখ্যান ও পৌরাণিক গল্পের মধ্য দিয়া দেশে প্রচার করিলেন। ১ম খণ্ড / পৃ. ৪৮৩-৪

২. এই সময়ে নবদ্বীপের রঘুনন্দন সংস্কৃত সর্বশাস্ত্র মন্থন করিয়া যে স্মৃতি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গলাদেশে এখনও কোটী কোটী হিন্দুর একমাত্র অবলম্বন..।

বৃহৎবঙ্গ / দীনেশচন্দ্র সেন ২য় খণ্ড , পৃ. ৭২৭

৩. পুরাতন বাংলার ইতিহাস প্রধানত হিন্দুর উচ্চবর্ণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, বিশেষত রাঢ়ী ও বারেন্দ্র সমাজ। 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস' নামে এই বইখানি সেই উদ্দেশ্যেই লেখা।

-'ভূমিকা' / ড অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩৫-এ দীনেশচন্দ্র এবং ১৪১০-এ দুর্গাচন্দ্র সান্যাল-এর *বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস*-এর পুনঃপ্রকাশ পর্বে অসিতকুমার যে মন্তব্য করলেন, তার মানসিকতার গড়নে কোনো প্রভেদ নেই। কিন্তু *বৈদ্য-হিতৈষিণী*-র সম্পাদক রূপেই দীনেশচন্দ্র তো জানতেন, বৈদ্য শ্রেণি উপবীত গ্রহণের অধিকার না হারালেও, নব-ব্রাহ্মণ্যের বিধানে, বৈদ্যও শূদ্র পরিচয়েই শেষত গণ্য। কারণ ব্রাহ্মণ-পরিবারের সঙ্গে তাঁদের বৈবাহিক সম্পর্ক নেই।

এই অনধিকারের বিতর্ক থেকেই বর্ণাশ্রম শাসিত সমাজের অংশ এবং সামাজিক পরিচয়ের অপমানপীড়িত শরিকেরা এই বিশ শতকের পর্বে তাঁদের সম্মানিত আত্মপরিচয় দাবি করলেন। তাম্বুলি, যোগি, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, ক্ষৌরকার প্রভৃতি শ্রেণি তাদের বক্তব্য জানালেন। এই আত্মঘোষণার ধারার পটভূমিতেই রবীন্দ্রনাথ 'লোকহিত' প্রবন্ধে নিজেকে

জানান দেওয়ার কথা বলেন, ইয়োরোপের উদাহরণে বলেন, সেখানকার মানুষ শুধু সেন্সাসের রিপোর্টেই আত্মসচেতন রূপ দেখে না, তার কর্মভূমিতেও দক্ষতা প্রদর্শন করে।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পত্র

বঙ্গদেশের অতিপ্রসিদ্ধ স্মার্তশিরোমণি কাব্য-স্মৃতি-
[illegible] গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষা সমূহের পরীক্ষক
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ ভট্টাচার্য্য স্মৃতিতীর্থ
মহাশয়ের পত্র

বৈদ্য-হিতৈষিণী পত্রিকার বৈদ্যদের ব্রাহ্মণ-পরিচয়ের স্বীকৃতিপত্র, ফাল্গুন/১৩৩১ বঙ্গাব্দ পৃ. ৭৫

বাংলার সমাজে এই কর্মভূমিতে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার একটি প্রতিকূলতা যে, এই বর্ণাশ্রমী মন, তার পরিচয় সুবিদিত। আর তা এতটাই দৃঢ়মূল যে মুসলমান সমাজও তার সংক্রমণ এড়াতে পারেননি। অধ্যাপক নূরউল ইসলাম তাঁর *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত* গ্রন্থে ইসলাম প্রচারক (২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯১), *সাম্যবাদী* (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা,

মাঘ ১৩২৯) প্রভৃতি পত্রিকার সংবাদ উল্লেখ করে নির্দেশ করেছেন, এই জাত্যভিমানের অনভিপ্রেত সঞ্চারের চেহারা। আর এই মানসিকতার পাথরবাধা ঠেলতেই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে আত্মঘোষণা করতে হয়েছে—বক্তব্য আর পরিচয় প্রতিষ্ঠার বিবিধ বিন্যাসে। সেই সার্বিক অসম্মানিত অবস্থানের একই সমতলে বা অবতলে দাঁড়িয়েই পারস্পরিক অন্তর্বিবাদ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলেছে। তবু তারই মধ্যে যা শোনা গেল, তার ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিমেয়। কারণ ভাবা যায়নি শৌণ্ডিক শ্রেণি তাঁদের কথা বলবেন। তাম্বুলী আর বারুজীবীদেরও বক্তব্য আছে, আচার-আচরণ বিষয়ক জিজ্ঞাসা আছে--সাময়িকপত্রের মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'-অধ্যুষিত জগৎ আগে তা বুঝে উঠতে পারেননি। বুঝতে চেয়েছিলেন কি না, সেটাও একটা বড় প্রশ্ন। কারণ গল্প-উপন্যাস-কবিতার পত্রিকা নয়। সম্পূর্ণত প্রচারধর্মী এইসব পত্রপত্রিকা বহন করেছে, তাঁদের বিতৃষ্ণার লেখচিত্র আর তারই তথ্যবহ বা তত্ত্ব-সমর্থ পুরাণ-ইতিহাস-কিংবদন্তি আর বিবিধ দৃষ্টান্তের আঁতিপাঁতি। যেমন, যোগী ও যুগী সম্প্রদায়ের প্রথম সাময়িকী, অধরচন্দ্র নাথ সম্পাদিত *যোগিসখা* (১৩১১)। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় 'আমাদের উদ্দেশ্য' (পৃ. ৭-১০)-তে লেখা হল--

> বঙ্গাধিপতি বল্লাল সেনের রাজত্বের পর হইতে সুপবিত্র যোগীজাতি বহুদিবস অবধি বঙ্গদেশে উপবীত ত্যাগের মহিমায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া অতি নীচ দাস জাতিবৎ আচরিত ও ঘৃণার্হ হইতেছিলেন।...মহিমান্বিত ইংরাজ বাহাদুরের সুবিচারের ও সুশাসনের ফলে অদ্য প্রায় বিশ বৎসর হইল বিভিন্ন দেশস্থ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত মণ্ডলীর নানা তর্ক বিতর্কের পর সকলে একমত হইয়া এই দরিদ্র সুপবিত্র যোগীজাতির পুনঃসংস্করণ কার্য্যে মত প্রকাশ করিলে পর অনেক সুব্রাহ্মণের বিশেষ সাহায্যে ...তাঁহারা পুনঃসংস্করণ আরম্ভ করিয়াছেন। ...জাতিগত উন্নতি সাধন করিতে গেলে ইহা অপেক্ষা আর উপযুক্ত সময় পাওয়া কঠিন...। সংবাদপত্র প্রচারিত হওয়াতে দেশের কত ভ্রম ও দোষাদি বিদূরিত হইতেছে। এই সুযোগে যদি আমরা একটু উন্নতিসাধন করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদিগকে পরে বিশেষ অনুতাপ করিতে হইবে।

তাহলে আত্মঘোষণার আগেও ছিল প্রস্তুতির দুই দশকের নীরবতা! গোপাল ভট্ট-র *বল্লাল চরিতম্*-এর অনুবাদ ও পাদটীকায় মূলপাঠ উদ্ধৃত করে ব্যক্ত হয়েছে যোগীজাতির পাতিত্যের ইতিহাস। বল্লাল সেন, তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধে দান প্রত্যাখ্যান করা যোগীদের উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন। একদিন, রাজপুরোহিত বলদেব ভট্ট জটেশ্বর মহাদেবের প্রাঙ্গণে যখন পূজা-উপচার ও ধনরত্ন নিয়ে উপস্থিত, তখন প্রাঙ্গণবর্তী যোগিরাজ তাঁকে বলেন, এই আনীত দ্রব্য ও উপচার যোগীদের প্রাপ্য। এই কথা থেকেই বচসার সূচনা এবং রাজপুরোহিতের প্রতি অসম্মাননায় পূর্বক্রোধ-ও ইন্ধন পেল, বল্লাল সেন 'ধর্ম্মগর্ব্বিত' যোগীদের যোগপট্ট ও উপবীত হরণ করলেন। ফলত, রাজরোষে কাতর ও নির্যাতিত যোগীসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজন 'আপন সুবিধানুসারে নিন্দিত ও অনিন্দিত বহুবিধ ব্যবসায়ের আশ্রয় গ্রহণ' করেছেন ও 'ঐ সময় এতদ্দেশে বস্ত্রব্যবসায় বিলক্ষণ লাভজনক' হওয়ায় এক বৃহদংশ এই বয়নবৃত্তির আশ্রয় নেন।--এই ইতিহাসের, বিচার নয়, শরণ নেওয়ার, বিশ্বাস করবার মানসিকতাই এখানে দেখবার। একদিকে উপবীত-সংস্কারের প্রতি দুর্মর আগ্রহ, অন্যদিকে পরিষেবাদায়ী বৃত্তির প্রতি বিতৃষ্ণার গড়ন, এই 'প্রত্নতত্ত্ব' (১ম বর্ষ, ১০ সংখ্যা / পৃ. ১৮১), অস্বাক্ষরিত ধারাবাহিক প্রবন্ধের মুখ্য পাঠ্য।

যোগীসম্প্রদায় ব্রাহ্মণ-পরিচয় দাবি করেছিলেন। সে দাবির যৌক্তিকতাও তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন, আচার-পরায়ণতা ও শুদ্ধি-সংরক্ষার কঠিন ব্রত যে যোগী সম্প্রদায়ের সামাজিক আচারবৃত্তে স্বীকৃত ও অবশ্যমান্য তার ধারাবাহিক যুক্তিক্রম উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন :

> ...বিবিধ দুরবস্থায় পতিত হইয়াও, যোগিসন্তানগণ আবহমানকাল যাতে ব্রাহ্মণবৎ দশরাত্র অশৌচ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারাও সামবেদোক্ত মন্ত্রে বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সমস্ত ক্রিয়া...পূজা প্রভৃতি আপনারাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। হুগলী জেলাস্থিত মহানাদ, দমদমার নিকটবর্ত্তী গোরক্ষবাসিনী, সুন্দরবনস্থিত কপিলমুনির মন্দিরে ও বারুণী স্নানের সময় নানাস্থানে আজকালও যোগিগণ তীর্থযাত্রীদিগের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা কোনও শূদ্রকে টোলে অধ্যয়ন করিতে দেন না ; কিন্তু অদ্যাপি তাঁহারা যোগিসন্তানকে টোলে শাস্ত্রশিক্ষা দিয়া থাকেন।

এই একই বক্তব্যের নিরন্তর বিভঙ্গ বিন্যাস দেখা যায়। নবম বর্ষের *যোগিসখা*-র ২য় সংখ্যায় অরবিন্দবন্ধু নাথ-এর সংলাপধর্মী লেখা 'ষষ্ঠ বঙ্গ হিন্দু শিক্ষা সম্মিলনী ও কমিশন' (পৃ. ৩৪)-এও একই সূত্র—'যোগীজাতির ব্রাহ্মণ নাই। কারণ যোগিগণ ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ মাত্র...।'

কিন্তু কথা এই যে তাঁরা ব্রাহ্মণ হলেও, দীর্ঘকাল যাবৎ অসম্মানিত অবস্থানে থাকতে বাধ্য হওয়ায়, এই গ্লানির স্বরূপ তো তাঁদের জানা, তবু অন্য জাতিগোষ্ঠীর প্রতি অসম্মানকর দৃষ্টি তাঁরা ত্যাগ করতে পারলেন না। যোগী সম্প্রদায়ের আরেকটি পত্রিকা, রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত *যোগি-সম্মিলনী-পত্রিকা*-য় দেখা যায় :

> তবে যে সকল জাতি ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতির সঙ্গে একত্র পান করিতে পারেন না, তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্যই উক্ত ছাত্রাবাসে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আবার এই সকল জাতির মধ্যে কোন কোন জাতি (যেমন যোগিজাতি *) ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির পাচিত কিম্বা পরিবেশিত অন্ন ভোজন করেন না। সুতরাং...এই সমস্ত জাতির জন্য সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। : 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও উপেক্ষিত জাতি' / ভাদ্র, ১৩১৯

তারকাচিহ্নিত প্রসঙ্গটি একই পৃষ্ঠার (পৃ. ৩০৩) পাদটীকায় বিস্তৃত করা আছে '* কোন কোন স্থলের যোগিগণ ব্রাহ্মণের পাচিত অন্নও গ্রহণ করেন না।'--ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এই কট্টর আচারনিষ্ঠার অতিরেক তথা অত্যাচার-পন্থার জন্ম দেয়। কর্তৃত্বের স্বাদ মানুষের প্রকৃতিকে বদলায়। আবার অন্যদিক থেকে অপমানের তীব্রতাও একটি ভিন্নতর অহং-তাড়নার জন্ম দেয়, যার মৌলসূত্র আক্রমণেই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠতা। তবু প্রশ্ন থাকেই--বৈষ্ণব শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট চৈতন্যচরিতামৃত-ব্যাখ্যাতা অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ নাথ যার সম্পাদক, সেখানেই পাঠককে থমকাতে হয়। কারণ কোনো একরেখ উত্তরে এই জিজ্ঞাসার নিরসন হয় না।

বস্ত্রবয়নকারী যোগীকে তাঁর ব্রাহ্মণ-পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য যেভাবে যুক্তি বিস্তার করতে হয়েছে, সামাজিকভাবে প্রাগ্রসর বৈদ্য-গোষ্ঠীর সেই দায় থাকবার কথা নয়। কারণ বৈদ্যদের উপবীত সংস্কার অক্ষুণ্ণ ছিল এবং 'বদ্যির বামুন' শব্দবন্ধও অসম্মাননার পরিচায়ক নয়, তবু তাঁদেরকেও সেই স্থিত-পরিচয়ের বনিয়াদকে দৃঢ় করতে হয়েছে। তার একটি কারণ--নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর *বিশ্বকোষ*-এ কায়স্থ বিষয়ে প্রায় অর্ধশতাধিক পৃষ্ঠায় পরিসর দিয়েছেন। পক্ষান্তরে বৈদ্য নেই, আছে অম্বষ্ঠ এবং মাত্র একটি অনুচ্ছেদ। আর বৈশাখ, ১৩১৬-য় এই গোষ্ঠীর প্রথম পত্রিকা, লালবিহারী মজুমদার সম্পাদিত *অম্বষ্ঠদর্পণ*। ১৩২১-এ *বৈদ্য সম্মিলন*, ১৩২২-এ *বৈদ্য সঞ্জীবনী*, হয়ে ১৩৩১-এ *বৈদ্যপ্রতিভা* ও সেই বছরই দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় বেরোয়, *বৈদ্য-হিতৈষিণী*। বস্তুত বৈদ্য গোষ্ঠীকে যুঝতে হয়েছিল অম্বষ্ঠ-পরিচয়ের সঙ্গে। ব্রাহ্মণ

পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান অম্বষ্ঠ, *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* মতে তাঁরা সৎশূদ্র। আর *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* মতে উত্তম-সংকর। কৌলিক বৃত্তি চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদচর্চা, একারণেই এঁদের অপর অভিধা বৈদ্য। ঔষধ-প্রস্তুতি ও বিপণনের জন্য বৈশ্য শ্রেণিতেও গণ্য করা হয়, আর ধর্মজীবনে এঁদের স্থান শূদ্রসম। তবে পঠনপাঠন বৃত্তে প্রাগ্রসর এই শ্রেণি বিষয়ে ১৯২১-এর সেনসাস-এ বলা হয় :

> The Baidyas, the traditional medical men of Bengal...have advanced further in education and in civilization....

বৈদ্য-প্রতিভা / জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ / পৃ. ৫৯

তবু জনমানসে তথা জাত্যভিমান-তাড়িত জনমানসে বৈদ্য বিষয়ে ধারণার একটি গতিরেখা পাওয়া যায় যোগেন্দ্রমোহন সেনশর্মার প্রবন্ধ 'লাভ লোকসান'-এ :

> ১. ...কোনও জাতিই বৈদ্যদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিবেন না.. বৈদ্যরা "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লী করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।"...
>
> এই আন্দোলনের পূর্ব্বে কিরূপ সদ্ভাব ছিল...নমুনা প্রদান করিতেছি : তখন ব্রাহ্মণাচার দূরের কথা বৈশ্যাচার গ্রহণ করিতেও কেহ ইচ্ছুক ছিল না :--
>
> ক। "জারজ অম্বষ্ঠের উপনয়ন নাই"! "..শুনিতে চাই উপপত্নীতে জাত অম্বষ্ঠের উপনয়ন হইতে পারে কিরূপে?"
>
> *বৈদ্য-রহস্য* ; ৯৭ পৃঃ যদুনাথ ন্যায়রত্ন (বারেন্দ্রব্রাহ্মণ, পাবনা)...
>
> খ। যাহারা বর্ণসঙ্কর তাহাদের আবার উপনয়ন অধিকার কোথায়?
>
> জাতিবিচার, অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী. পৃ. ৩৫।

অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণ-পরিচয়ও নিষ্কণ্টক নয়। আবার ব্রাহ্মণ-পরিচয়ের প্রতিষ্ঠাও নিষ্কণ্টক নয়, কারণ, সেক্ষেত্রে :

> ১. শুধু সরকারী খাতায় সাধারণ ব্রাহ্মণের সংখ্যা স্ফীত করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভের প্রয়াস প্রবল প্রতাপান্বিত বৈদ্যগণের পক্ষে হাস্যাস্পদ বলিয়াই মনে হয়। পৃ. ১০৫
>
> ২. যদি...'বৈদ্য ব্রাহ্মণ'...লিখি, 'তাহা হইলে যেমন ভাট ব্রাহ্মণ, জলদাস ব্রাহ্মণ, যুগী ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ, লগ্নাচার্য্য ব্রাহ্মণ প্রভৃতির ন্যায় আমরা একটা স্বতন্ত্র জাতি হইয়া পড়িব...। পৃ. ১০৭
>
> ৩. যাজক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের শরীরে সেইরূপ নানা জাতীয় রক্ত প্রবেশ করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বকে বিনষ্ট করিয়াছে এইক্ষণ যাবৎ বৈদ্য সম্প্রদায়ের শরীরে তদ্রূপ হীন জাতির রক্ত প্রবেশ করে নাই। সুতরাং জাতিতে ব্রাহ্মণ লিখিয়া জাতীয় বৈশিষ্ট [য.] নষ্ট করিতে বহু চিন্তাশীল বৈদ্যব্রাহ্মণ স্বীকার করিবেন না। 'আদম সুমারী ও বৈদ্য' / বিধুভূষণ সেনশর্মা পৃ. ১০৮

বৈদ্য-প্রতিভা-য় বেরনো এই প্রবন্ধে বৈদ্যদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার সমস্যা এবং তাঁদের দৃষ্টিকোণ বোঝা যায়। *বৈদ্যহিতৈষণী, বৈদ্য-সঞ্জীবনী* প্রভৃতি সাময়িকীর পৃষ্ঠা অধিকার করে থাকে, এই বিপ্রত্ব-প্রতিষ্ঠার যুক্তিক্রম। শেষত আদালতের এভিডেবিট পত্র এমনকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পত্র ও (*বৈদ্য হিতৈষিণী* / ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ৭৫) প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ-মতে উত্তম-সংকর ও *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* মতে সৎশূদ্র পরিচয়ে চিহ্নিত অপর এক জাতিগোষ্ঠী—তাম্বলী। জাতিবর্ণ-সংক্রান্ত সাময়িকীর ধারায় বিশ শতকের তৃতীয় আত্মঘোষণাকারী গোষ্ঠী এই তাম্বলী বা তাম্বুলি সমাজ। এখানেও সেই বর্ণাশ্রমধর্ম এবং উৎপত্তির কাহিনির বিস্তার :

> হিন্দুর পূর্ব্ব গৌরব এখন নষ্ট হইতে বসিয়াছে।...
>
> অসূয়ারহিত চিত্তে...তিন বর্ণের সেবা শূদ্রগণের একমাত্র কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণবিভাগ ও প্রত্যেক বর্ণের কার্য্যাদি বিবৃত হইয়াছে। এক বর্ণের লোক সাধারণতঃ অন্য এক বর্ণের জন্য

নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে পারিত না। এইরূপ বর্ণ বিভাগের দ্বারা যে সামাজিক সুশৃঙ্খলা রক্ষিত হইত এবং তদ্দ্বারা লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধিত হইত তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। —'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম' / রাজেন্দ্রনাথ সোম, ফাল্গুন ১৩২৩ : পৃ. ৮৯-৯১

কিন্তু আন্তঃসামাজিক আচার-সংস্কার বিষয়ে-ও এই পত্রিকা মনোযোগী। বিশেষত 'থাক ভাঙ্গা বিবাহ' বিষয়ে। পত্রিকার 'পঞ্চদশ-বার্ষিক কার্য্যবিবরণী' অংশে দেখা যায় :

আমরা কাহারও কাহারও মুখে এইরূপ শুনিয়াছি যে, পত্রিকায় কেবলমাত্র জাতিতত্ত্ব আলোচিত হইয়া এবং জাতীয় সংবাদ প্রচারিত হওয়া উচিত...। ৩য় বর্ষ / ৪র্থ সংখ্যা / পৃ. ১৫১

কিন্তু সম্পাদনা-কর্তৃপক্ষ শুধু জাতিতত্ত্বের আলোচনায় উৎসাহী নন, এবং "স্বজাতির" উদীয়মান লেখকদের লালনে উৎসাহী। আর 'থাকভাঙ্গা বিবাহ' সম্পাদনের সংবাদ তাঁরা প্রচার করতে উৎসাহী।

মাহিষ্য-সমাজ

"আবার তোরা মানুষ হ'।"

ত্রয়োদশ বর্ষ	বৈশাখ, ১৩৩০	প্রথম সংখ্যা

বিশ্বকোষের গলদ।

[illegible]

মাহিষ্য-সমাজ পত্রিকার আখ্যাপত্র

> পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া অর্থাৎ সন ১৩২২ সালের পৌষ হইতে আজ পর্য্যন্ত আমরা ৫টী থাকভাঙ্গা বিবাহের সংবাদ পাইয়াছি ;...৭ গ্রামী ও ৪২ গ্রামীতে ১টী, ৪২ গ্রামী ও ১৪ গ্রামীতে ১টী, ...আমরা যে সকল থাকভাঙ্গা বিবাহের কথা বলিলাম তাহাতে এ পর্যন্ত [য.] কোন সামাজিক নির্য্যাতনের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পৃ. ১৪৯-৫০

প্রত্যেকটি জাতি গোষ্ঠীই তাঁদের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরবার প্রয়াসী হয়েছেন। জাতিবর্ণ-পরিচয় সংক্রান্ত সামাজিক সম্মানের আকাঙ্ক্ষা এবং সমাজের অন্তর্বর্তী বিভিন্ন আচার-আচরণ বিশ্বাসের সংকট যে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তা বিভিন্ন উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়। তিলি, বারুজীবী, মোদক, ক্ষৌরকার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ পরিষেবাদায়ী জাতিবর্ণ গোষ্ঠীর বিষয়ে একটি অমনস্কতার পরিচয় বাংলা সাহিত্যের আখ্যান ধারায় অল্পবিস্তর পাওয়া গেছে। কিন্তু তার লেখক উচ্চবর্গ ও উচ্চবর্ণের মানুষ। ফলত সে পরিচয় থেকে তাঁদের সামাজিক অবমাননা বোঝা যায়, কিন্তু উজ্জীবন বৃত্ত নয়।

এ প্রসঙ্গে মাহিষ্য সমাজের অনুষঙ্গ জাগে। কারণ, *সন্দীপন পাঠশালা* উপন্যাসটি প্রকাশের পর, হাওড়ার মাহিষ্যগোষ্ঠী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাওড়ার সাহিত্যসভায় জুতোর মালা পরান। তারাশঙ্কর পরবর্তী সংস্করণে সে প্রসঙ্গ সংশোধন করেন। তাঁর নির্যাতনের প্রতিবাদে কলম ধরা সজনীকান্ত পুনর্বার লেখেন, যে তারাশঙ্করকে তিনি চিনতেন তাঁর বুঝি মৃত্যুই হয়েছে। কিন্তু তারাশঙ্কর জানিয়েছিলেন, তাঁর ধারণার সীমাবদ্ধতার কথা। বাংলার অঞ্চলভেদে যে জাতিকাঠামো ভিন্নতর হতে পারে, বীরভূম আর হাওড়ার মাহিষ্য যে এক নয়, সে ধারণা তাঁর ছিল না। *মাহিষ্যসমাজ*-এর আশ্বিন, ১৩৩০ সংখ্যায় 'বঙ্গ সাহিত্যে মাহিষ্য প্রসঙ্গ। (২)'-এ, সত্যবন্ধু দাস লেখেন :

> ১. ...বঙ্কিমচন্দ্রের কথা ধরা যাউক,...ইনি লিখিয়াছেল [য.]--
>
> > "এক্ষণে বাঙ্গালায় কৈবর্ত্তদিগের মধ্যে কতকগুলি চাষা কৈবর্ত্ত, কতকগুলি জেলে কৈবর্ত্ত। পূর্ব্বে সকলেই মৎস্য ব্যবসায়ী ধীবর ছিল সন্দেহ নাই।... বিবিধ প্রবন্ধ...
>
> তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রপুরাণাদিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তির বিশেষ রূপে অনুসন্ধান না করিয়া একটী সজ্জাতি সম্বন্ধে ওরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। "মুচিরাম গুড়ের জীবনী"তে তিনি মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণকে লইয়া যেভাবে রঙ তামাসা করিয়াছেন, তাহাও নিতান্ত অভদ্রোচিত হইয়াছে। পৃ. ২৫৪-৫
>
> ২. ..."বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তকে .. দক্ষিণ রাঢ়ীয় কৈবর্ত্ত বংশোদ্ভব ...রামদাস আধক...রচিত "অনাদি মঙ্গল" নামক ধর্ম্মকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে... [দীনেশচন্দ্র সেন] "রামদাস কৈবর্ত্ত" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।...যদি কেহ দীনেশ সেন না লিখিয়া "দীনেশ বৈদ্য" বলিয়া তাঁহাকে উল্লেখ করেন...সেটা...শ্রুতিসুখকর হইবে? পৃ. ২৫৬

এই প্রতিপ্রশ্নের সজ্জা ও তাকে উচ্চারণ তথা প্রকাশের প্রত্যয়ই ওই ধারার পত্রপত্রিকার উপযোগ। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র *আনন্দমঠ*-এ যে শ্বেতাঙ্গ নিধনের ইতিবৃত্ত সাজালেন, কর্তৃপক্ষের রোষের জন্য সেই শ্রেণিকেই বদলে ফেলতে বাধ্য হলেন। কিন্তু যেখানে প্রতিবাদী পক্ষের কল্পনাই নেই, সেখানে তাঁর অভ্যাস সাবলীল। আর এই উচ্চারণ তো কোনো একজন বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্চারণ নয়, সামাজিক বদভ্যাসেরই প্রতিফলন। এটাই দেখবার যে, এই প্রবন্ধের রচনাকালে দীনেশচন্দ্র জীবিত। অর্থাৎ লেখক কোনো নিরাপদ দূরত্বের আড়াল খোঁজেননি।

এভাবেই অপরাপর পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছত্রে ছত্রে উৎকীর্ণ হয়ে আছে এক

সমান্তরাল সমাজ ইতিহাস। প্রায় অর্ধশতাব্দীর ব্যাপ্তিতে এই জাতিবর্ণ-সংক্রান্ত পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়েছে। আর এই সময়কাল পরাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও এক ক্রান্তিবলয়। কিন্তু এখানে ব্রিটিশ পক্ষ সর্বদাই সদাশয় সরকার বাহাদুর, তাঁদের সুবিচার আর সুবিবেচনায় কারো দ্বিধা নেই। আর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষও এই অভিমানকে বুঝতে ভুল করেননি। বর্ণাশ্রমী কাঠামোর প্রথম যথাযথ ভাঙন তো ধরেছে উনিশ শতকের কলকাতাতেই। যখন, যে কোনো জাতিবর্ণের মানুষের শিক্ষা গ্রহণের অধিকার স্বীকৃত হল। তা সত্ত্বেও উচ্চবর্গের মানুষ সেই শিক্ষা গ্রহণের সদ্য অধিকার পাওয়া মানুষজনকে কি তাঁদের মেধামানে মর্যাদা দিয়েছেন? *সন্দীপন পাঠশালা*-র সেই অসামান্য ব্যঙ্গোক্তি :

চাষা-পণ্ডিত এণ্ডু শৌণ্ডিক ছাত্র
কাগজং কলমং খরচং মাত্র।

মনে করা যেতে পারে ছয়ের দশকে প্রকাশিত বিমল কর-এর *যদুবংশ*-তে এক তরুণ কবিযশঃপ্রার্থী-র বিষয়ে অপর এক "কবি"র মন্তব্য--মোদক পদবির লোক আবার কবি হয় কবে?--বর্ণ-বর্গ আধিপত্য-শাসিত সমাজমনের একই অনড় স্থবিরতার বাহকতা করে। আর এই নেতিদৃষ্টি থেকে মুক্তির একটি দিশা দেখাতেই পারত এই সাময়িকপত্র ধারা।

যদিও এই সাময়িকপত্রগুলি ব্রাহ্মণের ভূমিকাকে অস্বীকার করেনি। ব্রাহ্মণ্য বিষয়ে সেভাবে প্রশ্নও তোলেনি। কিন্তু ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী তাঁদের আধিপত্যের নিশ্চয়তা যে বিনষ্ট হতে পারে তা বুঝেছিলেন। তাই ব্রাহ্মণগোষ্ঠীকেও পত্রিকা বের করতে হয়েছে। আর জাতিবর্ণ-কাঠামোর ক্রমোচ্চবিন্যাসে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে অপর ব্রাহ্মণ শ্রেণি।

নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ সভা থেকে প্রকাশিত *ব্রাহ্মণ সমাজ* (১৩১৯)-এর লেখাপত্রে ভিন্নতর উষ্মার প্রকাশ ঘটেছে, অধিকার বিচ্যুতি আর তার প্রতিকার ক্ষমতাহীন অসহায়ের বিহ্বলতা। দেখা যেতে পারে 'সংবাদ। কৃষি কৈবর্ত্ত' (১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা / পৃ. ৪৫) :

> ১. ...এই মাহিষ্য নামধারী কৈবর্ত্তগণের মধ্যে এক সম্প্রদায় পক্ষাশৌচ পাইবার জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। তাহাতে ব্রাহ্মণ সমাজের চঞ্চলতা উপস্থিত হয়। ...শাস্ত্রীয় অশৌচকাল ইচ্ছানুসারে বা কাল্পনিক প্রমাণে হ্রাস করিলে, অশৌচ মধ্যেই তাহাদের সংস্পৃষ্ট জল ব্যবহার করিতে হয়--এই অনাচারের আশঙ্কায় ব্রাহ্মণসমাজ সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের জন্য যত্ন করেন।
>
> ২. বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম নিঃস্বার্থতার উপর সংস্থাপিত ছিল...। কিন্তু এক্ষণে রাজন্য ব্রাহ্মণ রক্ষক নহে...আর শূদ্র ব্রাহ্মণবিদ্বেষী।
>
> --'এখন কি কর্ত্তব্য' / ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা / পৃ. ৮

যে "ভালোবাসার" ভিত্তিতে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতিষ্ঠা তার ক্ষীরভাগ ব্রাহ্মণেরই জন্য। **ফলত, তিনি ভালোবাসাই দেখবেন। আর তার বিচলনে প্রতিরক্ষার অস্ত্র সন্ধান করবেন ওই অতীতাশ্রয়ী ক্রিয়াপদের তূণীর থেকেই। তাই রবীন্দ্রনাথের *অচলায়তন*-এ বিপর্যস্ত ব্রাহ্মণমূর্তি তাঁদের ক্রুদ্ধ করে, কিন্তু সেই ক্রোধ-প্রকাশের শিল্প-ভাষা-ও অনায়ত্ত। ফলত শেষটায় লিখতে হয় :**

> **১. বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্রাহ্মণ জাতির বিকৃত চিত্র দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম। অধুনা শাস্ত্র বেদ পরিশোধিত সদাচার ও উপাসা মন্ত্র তন্ত্রাদি...হাস্যরসের পরিপুষ্টির জন্য গৃহীত হইতেছে দেখিয়া, মহাকালের অচিন্ত্য মাহাত্ম্যের বিষয়ই চিন্তা করিতেছি।**

২. ...কিন্তু নাটক শব্দের এইরূপ অস্থান ব্যবহার যে এই সাহিত্যিক যুগে অনেকেরই আক্ষেপের কারণ হইবে, একথা বলা বোধ হয় গুরুতর অন্যায় হইতেছে না,...ইহাকে নাটক না বলিয়া প্রহসন বলিলে আর কোনও অনিষ্টের কারণ ছিল না, নাটকের মর্য্যাদাটাও অক্ষুণ্ণ থাকিত। --'অচলায়তন' / ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা / পৃ. ৩৯

প্রতিষ্ঠাবৃত্ত থেকে স্খলিত হয়ে যাওয়া মানুষের আশ্রয় অন্বেষার এই ভাষা চিনতে ভুল হয় না। কারণ—জাতিনাশ, একঘরে করা, পাতিত্য ঘোষণা বা আরো নানারকম কর্তৃত্ব ঘোষণার সামাজিক মান্যতার ভূমি সরে গেছে। তবু অভ্যাস আর সংস্কারের বহুবিধ নখ-দাঁত নিজের নিয়মেই শানিয়ে যেতে হয়। *ব্রাহ্মণ-সমাজ* পত্রিকার অন্যতম লেখক ছিলেন বিশিষ্ট পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ। যখন এই জাতিবর্ণ-সংক্রান্ত পত্রিকার প্রকাশ গতি অর্জন করেছে, তখন তার মনস্ক পাঠক ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এই জাতিপ্রথা আর বর্ণাশ্রণী মানসিকতার বিরুদ্ধে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন, প্রতিবাদ পত্রের উত্তর দিয়েছেন, বেশ কিছু পত্রপত্রিকায়, বিশেষত *প্রবাসী*-তে। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ লিখলেন :

স্যার প্রফুল্লচন্দ্র সভাসমিতিতে হাটে বাজারে মাঠে ঘাটে সুযোগ পাইলেই হিন্দুধর্ম্মের কুৎসা করেন। ছাত্রদের মধ্যে ধর্ম্মবিদ্বেষ জাগাইয়া একটা দল সৃষ্টিও করিতেছেন। আমরা তাঁহার প্রতিভা এইরূপ অকল্যাণকর বিষয়ে প্রযুক্ত দেখিয়া সত্যই দুঃখিত।

: *ব্রাহ্মণসমাজ* জ্যৈষ্ঠ / ১৩৩১ / পৃ. ৩২৯

কিন্তু ব্রাহ্মণ-শ্রেণির কর্তৃত্ব যথার্থত প্রশ্নের মুখে পড়ে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের পত্রিকা *অধিকার*-এ।

সেনসাস প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছিল, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে ন্যূনতম আত্মঘোষণার জন্য ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায় ব্যবহার করেছিলেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রেরই নির্মাণ—পুরাণকথাকে। আর তারই বিষদাঁত বসে গিয়েছিল তাঁদেরও সমাজ ভাবনার মনে ও মননে। যে কারণে, প্রতিটি জাতিবর্ণ গোষ্ঠীই অপর গোষ্ঠীগুলির প্রতি অসহিষ্ণু। এখানে *অধিকার* পত্রিকা ব্রাহ্মণ্যের শরণাগত চরিত্রকেই প্রাণপণ অস্বীকার করতে চেয়েছে। কিন্তু ঘাড়ে চেপে থাকা মান্ধাতা অত সহজে মুক্তি দেয় না। আর একদিকে সংরক্ষণ-বিধি আর অন্যদিকে ১৯৩১-এর পরে জাতিবর্ণ ভিত্তিক জনগণনার রীতি বদলে গেলে পর, এই পত্রিকাধারাও স্তিমিত হয়ে আসে। যদিও এখনও বেশ কিছু জাতিবর্ণ সংক্রান্ত পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যেমন *গন্ধবণিক* বা *মাহিষ্যসমাজ* পত্রিকা, কিন্তু তা মুখ্যত সামাজিক সম্মেলনের। তবে ক্ষোভের কারণ ঘটলে, আবারও ঝলসে ওঠে জাতিবর্ণ অভিমানের বিষ।

১৯৭৮-এ যখন বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ মণ্ডলের নেতৃত্বে মণ্ডল কমিশন বসছে, তার সমসময়েই প্রকাশিত হয়েছে জাতিভেদ বিরোধিতার বক্তব্যবাহী *শরসন্ধান*. (প্রথম সংখ্যা-মার্চ, ১৯৮০ : সম্পাদনা : অশোক ভট্টাচার্য) আখ্যাপত্রেই মুদ্রিত হয়েছে 'জাতিভেদবিরোধী সমিতির মুখপত্র' পরিচয়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে শঙ্খ ঘোষের কবিতা 'অন্ত্যজ' (সপ্তম পৃষ্ঠা / সংখ্যা : ১) বিমল রায়ের প্রবন্ধ 'ধর্ম, ঈশ্বর ও জাতিভেদ' (সংকলন-৬), পবিত্র সরকারের--'জাতপাতের ভাষা—ভাষার জাতপাত' (সংকলন-১৫)। অর্থাৎ এক ইতিযাত্রার এষা না থাকলে এ পত্রিকা বের করতে হত না। তারপরেও নয়ের দশকে আদার ব্যাকওয়ার্ড কাস্ট্‌স্ বা ওবিসি-র আসন সংরক্ষণের পটভূমিতে প্রকাশিত হয় *ওবিসি সমাচার*। আবার ২০০২-এর অক্টোবর-এ সুপ্রীম কোর্ট যখন, শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু জন্মসূত্রে অব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যের অধিকার ঘোষণা করে, তখনই পুরোহিত সভার মুখপত্র *পুরোহিতবার্তা*-য় তার প্রতিবাদ

জ্ঞাপন করা হয়—কারণ, তা জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর শেষতম একচেটিয়া জীবিকায় আঘাত করেছে।

মানুষের যে পরিচয়ে তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, সেই পরিচয়েই তাকে চিহ্নিত করা একান্ত মূঢ়তা। তবু সাম্প্রত পর্বেই ভারতীয় পটভূমিতে রাজনীতির গণিতে বা মিড্-ডে-মিল-এর আয়োজনের গতিতে জাতিভেদগত অভিমান আর অপমানের যে, আলোর নয় অন্ধতার চিত্রপটকে "উন্নত" করা হল, লালন করা হল, তাতে মনে হয় একুশ শতকেও আবারও এই শ্রেণির সাময়িকী বা সাময়িকীর বিকল্প কোনো ভিন্নতর মাধ্যম দেখা দেবে। তফাৎ এই, যে তাতে আর গল্প-কবিতা-র পাদপূরণ থাকবে না. তা শুধুই আচারের মান্যতার শুদ্ধিতে বা শুদ্ধির তাণ্ডবে বা তাণ্ডবের তত্ত্ব-সমর্থনে বিচারের বাণীকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং নীরবে নিভৃতে কাঁদতে দেখবে। কাঁদতেই দেখবে।

পরিশিষ্ট : 'ঘাড়ে চেপে আছে যে মান্ধাতা'

জাতপাতের খেলা তো সামাজিক ক্ষমতা দখলেরই অভিজ্ঞান। সেখানে ক্ষমতা আর সুযোগ যে-দিকে গড়ায় জাতে ওঠার লড়াইটাও সে-দিকেই ঢলে। তাই তফশিলভুক্ত হওয়ার জন্য যেমন ভুয়ো শংসাপত্র বা নথি জমা হয়, বিভিন্ন প্রশাসন-আধিকারিকের দপ্তরে—তেমনি, আবারও জাতিঘৃণার আকার-প্রকার দেখা দেয়। ২০০৪-এর ডিসেম্বর-এ *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র খবর :

জাতপাত দূর করতে চাঁদা তুলে পঙ্‌ক্তিভোজ

অশোক সেনগুপ্ত

..স্কুলের যে-সব পড়ুয়া তথাকথিত নিচু জাতের মহিলার রান্না করা খাবার বয়কট করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, বাঁকুড়ার সেই বীরভানপুরের পঙ্‌ক্তিভোজ থেকে 'জাতপাতের ঊর্ধ্বে' ওঠার ডাক দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি।...

...আদিবাসী কল্যাণমন্ত্রী উপেন কিস্কু বলেন..."এলাকায় গাঁয়ের লোকেরাই চাঁদা তুলেছেন...ওই দিন দুপুরে কারও বাড়িতে হাঁড়ি চড়ানোর দরকার নেই। বাগদি, মুচি, আদিবাসী, মুসলিমেরা রাঁধবেন। ওঁদের সঙ্গে বসে খাবেন ব্রাহ্মণেরাও।"

...এলাকার বাসিন্দা শিশির ত্রিপাঠী ও দুর্গাদাস ত্রিপাঠী বলেছিলেন, তাঁরা ধর্মপ্রাণ মানুষ। এই কারণে নিম্নবর্গের লোকের হাতের রান্না খেতে বাচ্চাদের নিষেধ করেছেন। দিনের পর দিন সারেঙ্গার ব্রাহ্মণ পরিবারের বাচ্চারা মিড-ডে মিল বয়কট করায় স্থানীয় বি ডি ও মনিরুল ইসলাম এলাকার প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শককে নিয়ে এলাকায় প্রচার চালান।...

৭.১২.২০০৪ / পৃ. ৮

সালটা ১৯০৪ বা ১৮০৪ বলেই মনে হয়—২০০৪-এর পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে এ খবর পড়বার প্রস্তুতি থাকবার কথা নয়। কিন্তু সমাজমনে জাতের গুরুত্ব এখনও কিরকম অনড়—তা বোঝা যায়। আর তা'তেই বোঝা যায়—কেন বিশ শতকের প্রথমার্ধ ব্যেপে প্রকাশিত হয়েছে জাতিবর্ণ-কেন্দ্রিত সাময়িকপত্রগুলি। কিন্তু আশ্চর্যবোধও তো সভ্যতার মতোই অনাদি ও অনন্ত—তাই মিহির সেনগুপ্ত-র *বিষাদ বৃক্ষ* গ্রন্থে যোগী জাতি বিষয়ক মন্তব্যের প্রতিবাদ দেখা দিল *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র চিঠিপত্রের পৃষ্ঠায়—

আনন্দবাজার পত্রিকা / ৫/০৭/০৫

যুগির মান

মিহির সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর আত্মজীবনী 'বিষাদ বৃক্ষ'-এর জন্য বর্তমান বছরে আনন্দ পুরস্কার পাওয়ার জন্য আমরা খুশি হয়েছি। তিনি তাঁর একটি লেখায় বাংলাদেশের এক বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন (আ.বা.প. ১৫ এপ্রিল, ২০০৫)। তবে আমরা রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তথা নাথ সম্প্রদায় তাঁর লেখার একটি বাক্যে খুবই মর্মাহত হয়েছি। তিনি লিখেছেন--"নিম্নবর্গের যুগি, জোলা, আউল-বাউলরা সে রকমই রয়ে গিয়েছে।" এখানে তিনি যুগি সম্প্রদায় তথা নাথ সম্প্রদায়কে নিম্নবর্গের জোলা, আউল-বাউলদের সমকক্ষ হিসাবে তুলে ধরেছেন ; কিন্তু এটা ঠিক নয়।

আসলে যুগি একটি অপভ্রংশ শব্দ। আসল শব্দটি হল যোগী। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রাচীন সম্প্রদায়টির অবদান চিরস্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যের জনকও নাথ যোগীগণ (ড. শহিদুল্লা) আবার হিন্দি সাহিত্যের জনকও নাথ যোগীগণ (ড. মোহন সিং)। চর্যাপদের বেশির ভাগ চর্যারই রচয়িতা নাথ যোগী। তাঁরাই ভারতে ও বিশ্বে শৈব যোগ সংস্কৃতির প্রচারক। যোগীনাথগণ সামবেদীয় উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণ। তাঁরা নিম্নবর্গের নন। অথচ শ্রীসেনগুপ্ত তাঁদেরকে নিম্নবর্গের মধ্যে ফেলেছেন। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ও অবমাননাকর।

তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি। সম্ভবত যোগীনাথদের সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সম্যক ভাবে না-জানার কারণেই তিনিই মন্তব্য করেছেন। তাই আমরা তাঁর কাছে ওই অবমাননাকর উক্তি প্রত্যাহার করার আবেদন জানাই। সেই সঙ্গে নাথ সম্প্রদায় সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পড়ার আবেদন জানাই। ১) অধ্যক্ষ ড. রাধাগোবিন্দ নাথের The Yogis of Bengal (১৯১০), ২) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগ্রন্থ (১৯৫০) মহামহোপাধ্যায় ড. কল্যাণী মল্লিকের 'নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী', ৩) অধ্যাপক ড. দোলগোবিন্দ শাস্ত্রীর কটক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি করা গবেষণাগ্রন্থ (১৯৬৯) 'নাথ ধর্মের ক্রমবিকাশ', ৪) অক্ষয়কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ৫) পণ্ডিত গোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্যের রুদ্রজ ব্রাহ্মণ পরিচয়। ৬) ভারত-তত্ত্ববিদ ড. বলরাম চক্রবর্তীর 'শৈবধর্ম ভারতে ও বিশ্বে' প্রমুখ...।

উপেন্দ্রকুমার দেবনাথ। সাধারণ সম্পাদক, নিখিল ভারত রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী, কলকাতা-১৪

এই পরিচয়—কোন পরিচয়? তাহলে কি এক শতকেও পাথরভার সরেনি? এখনও উচ্চবর্ণের অবস্থান চিহ্নিত মানুষ তথাকথিত নিম্নবর্ণ-বিষয়ে একই রকম উদাসীনতায় অমনোযোগী? আর সেই মানুষের প্রাণের ভেতরে সেই একই সামাজিক অসম্মানের আঘাত, একই অভিমানের জন্ম দেয়—তাহলে কি রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকার-আদায়ের খেলায় আবারও সেই জাতিবর্ণ-পরিচয় মুখ্য ক্ষমতায় দেখা দেবে? ১৯৮০-তে 'অন্ত্যজ' কবিতায় শঙ্খ ঘোষ যা লিখেছিলেন, যে জিজ্ঞাসার যন্ত্রণাকে, যন্ত্রণার সত্যকে খোদাই করেছিলেন :

> আজও ওই কপালে সে এঁকে রাখে চন্দন-তিলক
> বলে, 'চেয়ে দেখো, আমি সকলের চেয়ে ভিন্ন জাত!'
> তখনই ঝলক দিয়ে চন্দন সিঁদুর হয়ে ওঠে
> নিমেষে বানায় তাকে রক্তভৃষাতুর কাপালিক।

তাই হয়ে থাকবে ২০০৫-এরও অন্তহীনতা?

জাতিবর্ণ-সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকার নির্বাচিত তালিকা :

১. *চাষা ও ব্রাত্যক্ষত্রিয় প্রতিনিধি* / বৈ. ১৩০৮ / নরেন্দ্রনাথ অধিকারী
২. *কায়স্থ পত্রিকা* / বৈ. ১৩০৯ / নগেন্দ্রনাথ বসু / বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা
৩. *তাম্বুলী সমাজ* / আশ্বিন ১৩০৯ / শরৎচন্দ্র দত্ত ও ভূতনাথ পাল
৪. *যোগিসখা* / বৈ. ১৩১১ / অধরচন্দ্র নাথ
৫. *গন্ধবণিক* / বৈ. ১৩১২ / অবিনাশচন্দ্র দাস
৬. *ব্রাহ্মণ* / শ্রা. ১৩১২ / তেজেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন
৭. *অম্বষ্ঠ দর্পণ* / বৈ. ১৩১৬ / লালবিহারী মজুমদার
৮. *ক্ষত্রিয় সমাজ পত্রিকা* / বৈ. ১৩১৬ / তুলসীদাস বর্মা
৯. *সমাজ* / অগ্র ১৩১৬ / রাধাগোবিন্দ নাথ (যোগীজাতির মুখপত্র)
১০. *বৈশ্যপত্রিকা* / ভা. ১৩১৭ / প্রসন্নগোপাল রায় / (বৈ. বারুজীবী)
১১. *বঙ্গীয় বৈশ্য সুহৃদ* / আশ্বিন. ১৩১৭ / প্রভাতচন্দ্র দত্তগুপ্ত
১২. *সুবর্ণবণিক* / কা, ১৩১৭ / কিরণগোপাল সিংহ
১৩. *পতাকা* / বৈ, ১৩১৮ / হরিচরণ দাস (সূত্রধর জাতির মুখপত্র)
১৪. *মাহিষ্যসমাজ* / বৈ. ১৩১৮ / সেবানন্দ ভারতী
১৫. *মাহিষ্যমহিলা* / ১৩১৮ / কৃষ্ণভাবিনী দাস / নদীয়া
১৬. *যোগী সম্মিলনী পত্রিকা* / কা. ১৩১৮ / রাধাগোবিন্দ নাথ
১৭. *মাহিষ্য সুহৃদ* / মাঘ. ১৩১৮ / হরিপদ হালদার
১৮. *মাহিষ্য বান্ধব* / বৈ. ১৩১৯ / মহেন্দ্র তত্ত্বনিধি
১৯. *স্বর্ণকার বান্ধব* / বৈ. ১৩১৯ / নগেন্দ্রনাথ শী / (বঙ্গীয় বৈদ্য স্বর্ণকার সমিতির মুখপত্র)
২০. *ব্রাহ্মণসমাজ* / আশ্বিন. ১৩১৯ / বসন্তকুমার তর্কনিধি (বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা / নবদ্বীপ)
২১. *সম্মিলন* / অগ্র ১৩১৯ / কুঞ্জবিহারী দাস / (ক্ষৌরকার জাতির মুখপত্র)
২২. *সমাজচিত্র* / বৈ. ১৩২০ / সতীশচন্দ্র রায় / (বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের মুখপত্র)
২৩. *ক্ষত্রিয় শৌণ্ডিক ও ব্রাত্যক্ষত্রিয়* / কা. ১৩২০ / সম্পাদকের নাম নেই
২৪. *তাম্বুলী পত্রিকা* / শ্রা. ১৩২১ / যোগেন্দ্রনাথ সিংহ ও রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
২৫. *বৈদ্য সম্মিলন* / ১৩২১ / সম্পাদকের নাম অপ্রাপ্ত
২৬ *ক্ষত্রিয় বান্ধব* / পৌ. ১৩২২ / নাগেশ্বর প্রসাদ সিংহ
২৭. *বৈদ্যসঞ্জীবনী* / ১৩২২ / বারাণসী গুপ্ত ও ভোলানাথ গুপ্ত
২৮. *নমঃশূদ্র হিতৈষী* / বৈ. ১৩২৩ / ভারতচন্দ্র সরকার / ঢাকা
২৯ *পতাকা* / কা. ১৩২৩ / মুকুন্দবিহারী মল্লিক (নমঃশূদ্র জাতির মুখপত্র)
৩০. *সুবর্ণবণিক সমাচার* / অগ্র. ১৩২৩ / নৃসিংহপদ দত্ত
৩১. *তিলির গৌরব* / ৩০ মাঘ, ১৩২৪ / শশিভূষণ কুণ্ডু
৩২. *সেনভূমি* / বৈ. ১৩২৫ / গিরিজাকণ্ঠ রায় / সেনভূমি বৈদ্য সমাজ / পুরুলিয়া
৩৩. *তিলি সমাচার* / বৈ. ১৩২৬ / হৃদয়কৃষ্ণ কুণ্ডু

৩৪. *হিন্দুর গৌরব* / ভা. ১৩২৬ / শশিভূষণ কুণ্ডু / (অধুনা লুপ্ত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের সামাজিক পুনরুদ্ধার)
৩৫. *কায়স্থসমাজ* / কা. '২৬ / উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
৩৬. *ক্ষত্রিয়* / বৈ. ১৩২৭ / যোগেন্দ্রনাথ রায় ও প্রসন্নকুমার বর্মা
৩৭. *কর্মকারহিতৈষী* / পৌ. ১৩২৭ / ভোলানাথ কর্মকার / রিজলী ও কর্মকার জাতি
৩৮. *মোদক সংহিতা* / মাঘ-চৈ. ১৩২৭ / মণিলাল দাক্ষী ও শিবচন্দ্র দাস মোদক
৩৯. *গন্ধবণিক* / নবপর্যায়-মাঘ. ১৩২৮ / এবি. দাস, তারাকান্ত সাধু
৪০. *বঙ্গীয় কপালী বৈশ্য ও তদীয় ব্রাহ্মণ হিতৈষী* / বৈ. ১৩২৯ / উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস / যশোহর
৪১. *গোপ মিত্র* / আশ্বিন ১৩২৯ / বঙ্কুবিহারী ঘোষ
৪২. *কংসবণিক পত্রিকা* / বৈ. আ. ১৩৩০ / আশুতোষ দত্ত
৪৩. *কায়স্থ* / বৈ. '৩০ / ভূপতি রায়চৌধুরী
৪৪. *বৈদ্য তিলি হিতৈষী* : আশ্বিন ১৩৩০ / অমৃতলাল কুণ্ডু, লক্ষ্মণচন্দ্র দে
৪৫. *পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার* / কা. ১৩৩০ / ক্ষীরোদচন্দ্র দাস
৪৬. *বৈদ্যপ্রতিভা* / বৈ. ১৩৩১ / শ্যামাচরণ সেন / চট্টগ্রাম
৪৭. *রাজহাটী তাম্বুলী সমাজ* / জৈ. ১৩৩১ / আশুতোষ কুণ্ডু / বাঁকুড়া
৪৯. *তেলীবান্ধব* / শ্রা. ১৩৩১ / প্রমথনাথ দে গুপ্ত
৫০. *বঙ্গীয় বৈশ্য তন্তুবায় পত্রিকা* / কা. ১৩৩১ / শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
৫১. *বৈদ্য হিতৈষিণী* / পৌ. ১৩৩১ / দীনেশচন্দ্র সেনশর্মা
৫২. *তন্তু ও তন্ত্রী* / বৈ. ১৩৩২ / শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা -- *ব. বৈ. ত. পত্রিকা*-র পরিবর্তিত নাম
৫৩. *বৈশ্য সাহা সুহৃদ* / বৈ. ১৩৩২ / শশীমোহন সাহা
৫৪. *বঙ্গীয় তিলিসমাজ পত্রিকা* / আশ্বি. ১৩৩২ / রাধাগোবিন্দ সাহা, ললিতমোহন পাল, বিনয়কৃষ্ণ তরফদার
৫৫. *চন্দ্রিল* / পৌ. ১৩৩২ / ক্ষীরোদচন্দ্র শীল দাস / ক্ষৌরকার জাতির মুখপত্র
৫৬. *বার্মার ক্ষত্রিয় বান্ধব* / বৈ. ১৩৩৩ / সত্যগোপাল রায়বর্মন (কর্মকার)
৫৭. *বঙ্গীয় শোলাঙ্কি রাজপুত পত্রিকা* / বৈ. ১৩৩৩ / প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৮. *শ্রীহট্ট ব্রাহ্মণ পরিষৎ পত্রিকা* / বৈ-আ. ৩৩ / কামিনীকুমার ভট্টাচার্য
৫৯. *অধিকার* / বৈ. ১৩৩৪ / রসিকলাল বিশ্বাস, শরৎচন্দ্র মজুমদার, মাধবচন্দ্র বিশ্বাস (নমঃশূদ্র জাতির পত্রিকা)
৬০. *বারেন্দ্র পত্রিকা* / আ. ১৩৩৪ / হেমদাকান্ত চৌধুরী
৬১. *কর্মকার বার্তা* / আশ্বি. ১৩৩৪ / নরেন্দ্রনাথ দত্ত
৬২. *কর্মকার পত্রিকা* / অগ্র. ১৩৩৪ / নিত্যগোপাল রায়
৬৩. সদ্গোপ পত্রিকা / শ্রা. ১৩৩৫ / বঙ্কুবিহারী ঘোষ
৬৪. *বৈশ্য-শক্তি* / কা. ১৩৩৫ / বলাইচাঁদ দত্ত, দেবরতি, দুলিয়াচাঁদ বড়াল (বৈশ্য সুবর্ণ বণিক / জাতিভেদ বিরোধী)
৬৫. *বৈদ্য-সংরক্ষণী* / বৈ-আ-১৩৩৬ / কালীচরণ সেন - সত্যেন্দ্রনাথ সেন

৬৬. *সমাজ* - অগ্র-১৩৩৭ / বারিদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায় / (অস্পৃশ্যতা বর্জন ও জাতিভেদ বিনাশ)

৬৭. *তন্তুবায় সমাচার* / ভা. ১৩৩৮ / সতীশচন্দ্র ভড়

৬৮. *বৈশ্যসমাজ* / অগ্র. ১৩৩৪ / শশীভূষণ কুণ্ডু (পরবর্তীতে *বৈশ্য হিতৈষী*)

৬৯. *ক্ষাত্রবাণী* / মাঘ. ৪৪ / নিতাইচন্দ্র লস্কর

৭০. *বৈদিক-ব্রাহ্মণ* / বৈ-আ-৪৫ / ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সভা)

৭১. *মৎসজীবী*

৭২. *হরিজন* পত্রিকা

তথ্যসূত্র : *বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী* / গীতা চট্টোপাধ্যায়

চ ণ্ডী লা হি ড়ী

রঙ্গরসের পত্রিকা

বাংলা গদ্য সাহিত্যে রঙ্গরসের ধারাটি বড়ই ক্ষীণ। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে মধুসূদনের *বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ*, দীনবন্ধুর *জামাইবারিক*, শেকসপিয়রের *কমেডি অফ এররস* অবলম্বনে বিদ্যাসাগরের ভ্রান্তিবিলাস ছাড়া খুব বেশি উল্লেখযোগ্য বই নেই। যুদ্ধোত্তর কালে রঙ্গব্যঙ্গকে আশ্রয় করে প্রচুর নক্‌সা, রম্যরচনা, ছোটগল্প লেখা হয়েছে এবং রঙ্গব্যঙ্গের পত্রিকার ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষ থাকলেও টিভি, বেতার ও থিয়েটারের জন্য প্রচুর হাসির লেখা হয়ে চলেছে। পরাধীন ভারতে মানহানির কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড ছিল না। আইনটি সেকালের মত একালেও সমান অস্পষ্ট। আমাদের এখনকার সমাজ যত খোলামেলা, কয়েকবছর আগেও তত আলো বাতাস মিলত না।

ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার ব্যাপারটি অভিভাবকরা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু বিধবা-বিবাহ যদি নিজের ঘরে ঘটে, তবে মেনে নিতে অনেকেরই আপত্তি। ইন্টারকাস্ট বিয়ে খুব ভালো জিনিস, কিন্তু আদিবাসী কন্যার সঙ্গে বিয়েতে ঘোর আপত্তি। এসবের বাইরে, বলা যায়, সবার ওপরে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের জন্য সম্পাদকদের ভাবনাচিন্তায় বাধা পড়েছে। রাজনীতি সব দেশেই রঙ্গ-ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু। এদেশে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কিছু বলা যেত না। সম্পাদকরা বলতে চাইতেন। সেজন্য ইংরেজের বদলে পাঠান-শাসকদের বিরুদ্ধে বলে যেতেন যদিও তারা বহুকাল শাসন ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত। ইন্ডিয়ান চারিভরি ভারতীয়দের নিন্দা করত খুব। ভারতীয়দের সমালোচনা করায় কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু ভারতীয়রা পাল্টা প্রতিবাদ করতে সাহস কবত না। করলে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের চোখরাঙানি।

রঙ্গব্যঙ্গ চর্চার আর এক অন্তরায় স্ট্যান্ডার্ড ভাষার অভাব। প্যারীচাঁদ যে ভাষায় *আলালের ঘরের দুলাল* লিখেছিলেন সেটা যেমন নিষিদ্ধ পল্লীর ভাষা নয়, তেমনি উচ্চকোটির ভাষাও নয়। কলকাতায় তখনও ফারসি ভাষার মিশ্রণ ছিল খুব। ফারসি-প্রধান আদালতি ভাষায় ট্রামের গায়ে লেখা থাকত 'বিশজন বসিবেক'। থিয়েটারের হ্যান্ডবিলে বিদ্যাসাগরী প্রভাব ছিল। এই প্রভাব অমান্য করে প্যারীচাঁদ ইতরজনের ভাষায় বই লিখলেন সেটা রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠল। জনপ্রিয়তা এজন্য নয় যে উচ্চকোটির সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ তাকে গ্রহণ করেছিল। বিদ্যাসাগরী বাংলার সঙ্গে ভদ্রসমাজের পরিচয় ছিল আগেই। কিন্তু তাতে গালাগালি দেওয়া বা ক্রোধ প্রকাশ করা যেত না। মনের নিরুদ্ধ আবেগ অশ্লীল ভাষায় এক ধরনের স্ফূর্তি লাভ করে। ভদ্রভাষায় যেটা সম্ভব নয়। নিতম্বে লাথি মারব না বলে পাছায় লাথি মারব বলে অনেকে তৃপ্তি বেশি পান। প্যারীচাঁদ আলালের ভাষার যে ধারা প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁর প্রিয় শিষ্যের পত্রিকা হওয়া সত্ত্বেও, সেই ভাষা *বসন্তকে* অনেক মার্জিত। মনে হয়, মাইকেল মধুসূদন *বসন্তকের* অন্তরালবর্তী পরিচালক হওয়ার ফলেই *বসন্তক*-কে

কিছু পরিমাণে মার্জিত হতে হয়েছে। আলালের নির্দিষ্ট কোন বিষয় ছিল না। *বসন্তক*-কে বিষয়মুখী হতে হয়েছে। আলাল রাজনীতির পাশ কাটিয়ে আমোদ-প্রমোদে গা ভাসিয়েছে--*বসন্তক* আমোদ প্রমোদকে খুব কাছ থেকে ব্যঙ্গ ও বিশ্লেষণ করেছে। রাজনীতি পরিহার করা দূরে থাক, *বসন্তক* রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিয়েছে। *বসন্তক* এখন দুর্লভ। তবু পাঠক যদি দেখার সুযোগ পান--বহু নতুন শব্দ ও বাক্য-বিন্যাসের সন্ধান পাবেন যা এখনকার কলকাতার ভাষায় অনুপস্থিত। হারিয়ে যাওয়া শব্দগুলির অর্থভেদ এবং প্রয়োগপ্রণালী উত্তরকালের পাঠকদের কৌতূহল সৃষ্টি করবে। বার্টান্ড রাসেল তাঁর 'অলসতার প্রশংসা' নামক প্রবন্ধে বলেছিলেন, চায়ের টেবিলে যখন এপ্রিকট খাই, তখন একটি অনুষঙ্গ মনে পড়ে। এপ্রিকট শব্দটির অর্থ এঁচোড়ে পাকা বা প্রিকোসাস--অথচ এটি এখন একটি ফলের নাম। এ রকম শব্দের অর্থ আমূল পাল্টেছে অনেক ক্ষেত্রেই।

অবতার নামক পত্রিকার একটি কবিতায় আমরা 'ভরা' শব্দটি পেয়েছি। একালে অচলিত এই শব্দটির অনুষঙ্গে ভেসে আসবে--গঙ্গার ঘাটে পর্তুগিজ দস্যুরা স্নানরতা মেয়েদের অপহরণ করত এবং সেই মেয়ে বিক্রি করত অন্য ঘাটে। যে বিশেষ নৌকা এই কাজে ব্যবহৃত হত তার নাম ভরা। ভরার মেয়ে অর্থাৎ জলদস্যুদের দ্বারা অপহৃত মেয়ে। সে ক্রীতদাসীর মত অন্য বাড়িতে খাটত, কোনো সামাজিক সম্মান পেত না।

রসতরঙ্গে-র একটি গ্রাম্য রুচিসম্পন্ন কবিতা (যেটি সন্দেহ হয়, কোন খেমটা গান থেকে আত্মসাৎ করা) ছাপা হয়েছে তার শিরোনাম প্রথম পাতনামা। এই পাতনামা একেবারে গ্রাম্য শব্দ আর অর্থ পাদ্যঅর্ঘ। এক কুলটা রমণীর চরণে নিবেদিত 'পাদ্যঅর্ঘ'--অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ সেকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের গৃহে আগমন ঘটলে গামছা, জল এবং শঙ্খ বাদনের দ্বারা পাতনামা করা হত। এই কবিতায় 'এখন হাবু গোনো বিনোদিনী' নামে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। গ্রাম বাংলায় নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা ভিক্ষা করত এক অভিনব উপায়ে। নিজের পিঠে নিজেই বেত্রাঘাত করত এক দুই তিন চার গুনতে গুনতে। এরই নাম হাবু গোনা।

বাংলা গদ্য তার কবিতা ও ছোটোগল্পসহ প্রবলভাবে ইংরেজি সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত। এখনও নতুন শব্দ সন্ধানের জন্য ইংরেজি লেখকদের শরণ নিতে হয়, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষে। কিন্তু রঙ্গ ব্যঙ্গ রচনার ক্ষেত্রে ইংরেজি সাহিত্যের সূক্ষ্ম রসবোধ, উইট আর হিউমারের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং সর্বোপরি ভাষার শালীনতা--বাংলা রসসাহিত্যে আসেনি। তার ফলে বাংলা সাহিত্যের এই শাখাটি গুণের দিক থেকে নিকৃষ্ট। যারা বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের কারবারী তাদের ব্যক্তিগত রুচির মান বড়ই হীন। ঈশ্বর গুপ্ত হয়ত বঙ্কিমকে হাত পাকাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন বলে তাঁর কাছে পূজ্য হতে পারেন কিন্তু তিনি ইলিশ পাঁঠা, তপসে মাছ, তরুণী মেয়ে ইত্যাদি নিয়ে যে সব কবিতা লিখেছিলেন সে সব সাহিত্য পদবাচ্য নয়। রঙ্গ কবিতার এই স্থূল যাত্রাপথ বরাবরই রুচিহীন মোটা দাগের রয়ে গেল। সফিস্‌টিকেসন কোনো দিনই আসেনি। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে মাত্র তিনজন লেখক স্থূল-সূক্ষ্ম ব্যাপারটা বুঝতেন। প্রমথনাথ, পরিমল গোস্বামী এবং অজিতকৃষ্ণ বসু। প্রমথনাথ বিশি কোন রঙ্গ ব্যঙ্গ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হননি। পরিমল গোস্বামী *শনিবারের চিঠি* এবং অজিতকৃষ্ণ বসু *ব্যঙ্গমা*-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ছিলেন রাগী যুবক--সদা অসহিষ্ণু এবং সর্বাবস্থায় আপোষ বিরোধী! বেশি রাগ স্যাটায়ারের মানকে তুলতে পারে,

হিউমারকে সেক্ষেত্রে মাথা নিচু করে থাকতে হয়। এই হতভাগ্য দেশে মুড়ি-মিছরি সমমূল্যে বিকোয়—গোপাল ভাঁড় ও ফলস্টাফের-পার্থক্য কেউ বোঝে না। বনবিহারী চিকিৎসক হলেও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর বৈদগ্ধ্য প্রশ্নাতীত। তাঁর *বেপরোয়া* পত্রিকাব চিন্তাভাবনায় উন্নত রুচির ছাপ ছিল প্রকট। কিন্তু তিনি স্যাটায়ারে যেমন দক্ষতা দেখিয়েছেন, হিউমারে ততটা নয়।

আমাদের এই উদ্যোগের আগেও কেউ কেউ, বলা ভালো তাঁরা সবাই সম্পাদক, রঙ্গ বাঙ্গ সাময়িকপত্রের তালিকা তৈরি করেছেন। সেই তালিকা অনুসরণ করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছি। পত্রিকার নামের সঙ্গে 'রস' শব্দটি আছে বলে তাঁরা পত্রিকাটি রসসাহিত্য বলে উল্লেখ করেছেন। নিজে হাতে পত্রিকা খুলে দেখি--রসের সঙ্গে রস-সাহিত্যের কোন সম্পর্ক নেই। সেটিতে রসায়ন-শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

বসন্তক নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম কয়েক বছর আগেই। *বসন্তক* যখন শুরু হয় তখন সাহেব-পাড়ায় ইংরেজি পাঞ্চ পত্রিকা প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হচ্ছে। *বসন্তক* সম্পাদক প্রথম প্রস্তাবনাতেই *অমৃতবাজার পত্রিকা*-র প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন তাঁরা পাঞ্চের অনুকরণে একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন বলে দাবি করছেন। ভুল খবর। আমরা *বসন্তক* প্রকাশ করছি *পাঞ্চ*-এর অনুকরণে। *বসন্তক* নিয়ে যে কোনো আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি মুদ্রণ ব্যবস্থা বিশেষত ব্লক-নির্মাণ নিয়ে কিছু বাক্য ব্যয় করা না হয়। *বসন্তকে* কাঠের ব্লক ব্যবহৃত হয়েছে অথচ দিল্লি ডেসপ্যাচ (যেটি হুবহু *পাঞ্চ*-এর নকল) কার্টুন ছেপেছেন তামার পাতে এচিং করে। তামার পাতে এচিং করলে ছবিতে সূক্ষ্মতা আসে। এচিং-বিদ্যাটা এতাবৎ ভারতে জানা ছিল না। *বসন্তক* কাঠের গায়ে খোদাই করে যে সূক্ষ্মতার প্রমাণ রেখেছেন, সেটাই বা প্রাণনাথ দত্তের পক্ষে সম্ভব হল কি করে? মনে রাখতে হবে, কাঠের গায়ে খোদাই করে যেখানে তরল সোনা ঢেলে গয়না বানানো খুব সহজ। গয়নার ডিজাইনে কাঠের গায়ে ছেনি বাঁটালি দিয়ে খোদাইকর্ম এবং কাঠখোদাই ছবি—দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। দত্ত ভ্রাতারা দক্ষতার সঙ্গে কাঠের ব্লক তৈরি করেছিলেন কার্টুনের প্রয়োজনে। এটা মুদ্রণ শিল্পে মস্ত বড় এক বিপ্লব। এযাবৎ অপ্রকাশিত অজানিত কিছু তথ্য প্রকাশ করছি।

উনবিংশ শতকের নবজাগরণের হদিস পেতে হলে ৩৩৬ নং চিৎপুর রোডের বাড়িটার খবর নিতে হবে। বাড়িটি সেকালের উদারমনস্ক জমিদার গোরাচাঁদ বসাকের কাছারি বাড়ি। মধ্যে চওড়া রাস্তা। ওপারে বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট পেরিয়ে বসাকদের অন্দরমহল ও ঠাকুর বাড়ি। কাছারি বাড়ি থেকে অন্দর মহলে যাবার জন্য প্রতিদিন কার্পেট পেতে দেওয়া হত। এই বাড়িতেই ২০ জানুয়ারি ১৮১৭ সালে স্থাপিত হয়েছিল হিন্দু কলেজ। আসলে ওটা ছিল স্কুল। অল্পদিন পরে স্থানাভাব হওয়ায় হিন্দু কলেজ উঠে যায় ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ি। এরপর ১৮.৮.১৮৫৪-তে এই ৩৩৬ নম্বর চিৎপুর রোডের বাড়িতে স্থাপিত হল স্কুল ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট। এই নতুন আর্ট স্কুলের প্রথম সভাপতি হজসন প্রাট। প্রধান পৃষ্ঠপোষক সিসিল বিডন। এখানেই শুরু হল ধাতুর পাত খোদাই এবং আধুনিক কাঠ খোদাই। স্বর্ণ শিল্পের জন্য কাঠ খোদাই চিৎপুরে আগেও হত। এবার শুরু হল ইওরোপীয় পদ্ধতিতে। রোজ-উড আনা হয়েছিল বিলেত থেকে, যে লোহায় নরুণ কাঠ খোদাই-এর জন্য লাগে ইংরেজি নাম বুলি, তাও আনা হয়েছিল বিলেত থেকে। এই নতুন আর্ট স্কুলের আর এক বৈশিষ্ট্য উন্নত মানের লিথোগ্রাফি মুদ্রণ। লিথোগ্রাফি শেখাতেন রিগো (M. Rigue) নামক এক ইওরোপীয় শিক্ষক।

এই রিগোর ছাত্র ছিলেন *বসন্তক*-এর গিরীন দত্ত। একদিকে কাঠখোদাই শিখেছিলেন অন্যদিকে লন্ডন থেকে *পাঞ্চ* পত্রিকার আগমন—দুয়ে মিলিয়ে *বসন্তক* প্রকাশে আগ্রহ। নতুন এই আর্ট কলেজের অধ্যাপক রিগো ছাত্রদের ফিগার ড্রইং শেখাতেন। ফিগার ড্রইং শিখেছিলেন বলেই লাটসাহেব, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটসহ দেশী-বিদেশি ব্যক্তির কার্টুন নির্মাণ করতে পেরেছিলেন।

এই আর্ট স্কুল পরে হীরালাল শীলের বাগানবাড়িতে স্থানান্তরিত হল। হীরালাল শীলের বাগানবাড়ি অনেক পরে মাধববাবুর বাজারে পরিণত হয়। এই মাধববাবুর বাজারেই এখনকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বসন্তক-এর পর *কৌৎকা* বলে যে পত্রিকাটি বের হয় সেখানেও কার্টুনের ছড়াছড়ি। ড্রইং আরও উন্নত মানের। যদিও হিউমার খুবই নিম্নরুচির। ততদিনে চিৎপুরের বইগুলিতেও কাঠের ব্লক দিয়ে চিত্রিত করা শুরু হয়ে গিয়েছে। ব্লক নির্মাণ ও ছবি আঁকার অ্যাকাডেমিক চর্চা না থাকলে এসবের মান উন্নত হত না। মান উন্নত হয়েছিল বলেই চিত্রিত বইয়ের চাহিদা বেড়েছিল। *বসন্তক*-এর গুরুত্ব এখানেই যে ভালো ছবি এঁকে ও ছেপে তাকে জনপ্রিয় করেছিল পাঠক মহলে। নিছক রঙ্গব্যঙ্গের বাইরে এ এক বড় পাওনা।

বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারির গা ঘেঁসে একটি বাড়িতে তৈরি হয়েছিল ইস্টার্ন টাইপ ফাউন্ড্রি অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস। চিৎপুরের বই-ব্যবসার প্রাণ এই টাইপ ফাউন্ড্রি। সেকালের প্রায় সব বই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এই ফাউন্ড্রির টাইপ দিয়ে।

বাংলা রঙ্গ-ব্যঙ্গ সাহিত্যের ধারা নিয়ে আলোচনা করার এই কাজে আনন্দ পেয়েছি খুব। নিজে পেশাদার কার্টুনিস্ট হওয়ায় কিছু দর্প সঞ্চিত ছিল মনের অগোচরে। সেই দর্প চূর্ণ হয়েছে। আমার জানা বহু তথ্য অসম্পূর্ণ ছিল। কার্টুনের ইতিহাস জানা ও রসসাহিত্যের অনুপুঙ্খ খবর রাখা স্বতন্ত্র বিদ্যা। সত্তরের দশকে *বসন্তক*-এর সব সংখ্যা ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে কপি করেছিলাম তার মূল্য না বুঝেই। সেখান থেকেই *হুতোম* কপি করেছি ও অর্বাচীন বুদ্ধিবশত বই আকারে একদা ছেপেছিলাম। একটি জীর্ণ কপি ঘরে ছিল। *সচিত্র ভারতের* অন্তিমপর্বে অজিতকৃষ্ণ বসু ছিলেন সম্পাদক। তাঁর বকলমে আমিই দেখাশোনা করতাম। সবই এতদিনে কাজে লাগল। সর্বাগ্রে ধন্যবাদ ড. স্বপন বসুকে। বার্ধক্যে নিজের ওপর আস্থা যখন প্রায় শূন্যে ঠেকেছে সে সময় তিনি আমায় কাজে লাগিয়েছেন। *সচিত্র ভারতের* নিয়মিত লেখক ছিলেন অরুণোদয় ভট্টাচার্য। পুরাতন পূজা-সংখ্যাগুলি তিনি সযত্নে রেখেছেন। দেখতে দিয়েছেন। রঙ্গ-ব্যঙ্গ বিষয়ক-গোষ্ঠীর বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায় নিজেদের পত্রিকা ছাড়াও *বেপরোয়া* সম্পর্কে প্রচুর তথ্য দিয়েছেন। চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় *কিঞ্জল*-এর ২৫ বছরের ফাইল ছাড়াও *অচলপত্রের* বহু হারিয়ে যাওয়া সংখ্যা সরবরাহ করেছেন। বন্ধুবর জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী। কোন লাইব্রেরির গোপন কক্ষে কোন রত্ন লুকোনো আছে তাঁর সবই জানা। তাছাড়া চিৎপুর পাড়া, যাকে বাংলা বইয়ের আঁতুড় ঘর বলা হয়, সেই পাড়ায় একদা রাজপথ-গলিপথ তাঁর সঙ্গে ঘুরেছি। ত্রিশ বছর আগের সেই ফিল্ড স্টাডি খুব কাজে লেগেছে।

বিদূষক ১২৭৭ সাল (১৮৭০)

বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন ব্যক্তিদ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম। কলিকাতা সাহিত্যযন্ত্রে শ্রী কার্তিকচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত। মূল্য দুই পয়সা।

পত্রিকার রচনা বলতে একটাই। বড়োলোকের বখাটে পুত্রের কাহিনি। আলালের ঘরের

দুলালের অন্ধ অনুকরণ। বালকটির লেখাপড়া শেখা হয়নি। কিন্তু আমাদের কিছু লাভ হয়েছে। লেখাপড়ার পদ্ধতি কি রকম ছিল সেটার অনুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়।

'আগে তালপাতা, তারপর কলাপাতা। ১২১২ সালের ১১ মাঘ শ্রীপঞ্চমীর দিবসে কলাপাতা ধল্লেম। তেরিজ, জমাখরচ, জমা ওয়াশিল বাকী কাঠাকালি শিখতে আরম্ভ কল্লেম। মতিবাবু অঙ্ক বোলে দেন, গুরুমহাশয় পরীক্ষা করেন। দেখতে দেখতে কলাপাতা সাঙ্গ হোল। পর বছর রথের দিন কাগজ ধল্লেম। আমাদের জ্ঞানানন্দ বাবাজী বাবার কাছে এসে খড়ি পেতে দেখলেন। আমার ভাবী বিদ্যে হবে। বয়স প্রায় ১০০ বছর।

বাবা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে একমালসা আলোচাল আর চারটা পয়সা দুটি পৈতা দক্ষিণা দিলেন।

পাঠশালা ত্যাগ কল্লেম। মতিবাবুও ত্যাগ কল্লেন। আমার সঙ্গে যারা লিকতো পড়তো তারাও ত্যাগ কোল্লে। ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হোলেম। তখন সবে এদেশে ইংরেজির নতুন পত্তন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত আর হেয়ার সাহেব তখন ইংরাজীর পেট্রন। আমরা ইংরাজীতে ABC মুখস্থ করে স্পেলিং আরম্ভ কোল্লেম। মানে করাও আরম্ভ হল। Come আইস, Go যাও, God ঈশ্বর, Lord খোদা, A man এক মনুষ্য, A cat এক বিড়াল, A dog এক কুকুর, A fat pig—এক মোটা শুকরের ছানা, A mad dog এক পাগলা কুকুর। পাড়ায় ধ্বনি উঠলো মনিলাল মিশ্রের ছেলে বিদূষক মিশ্র ইংরাজী বাংলায় মহাপণ্ডিত হয়েছে।'

বিদূষক এরপর ১৩২০ বা ১৯১১ সালে বের হয়েছিল। এখানে হেডপিসে চশমাপরা চোখ' ব্যবহৃত।

নিয়মাবলী বেশ আকর্ষণীয় ভাষায়

(১) বিদূষকের বার্ষিক *ডাকবরদারী* বারো গণ্ডা পয়সা, নগদ *নমস্কারী রোক কোম্পানী* এক আনা মাত্র অবশ্য পোষ্ট আপিসের সেলামী সমেত। তবে ব্রাহ্মণ বিদূষক কেহ কিছু অধিক দিলে প্রত্যাখ্যান করা হইবে না।

(২) রসের সাগর রসিক নাগর বিদূষক অচিত্র অমাসিকপত্র ও অসমালোচন হইলেও কৃপা করিয়া প্রতিমাসের প্রতি সপ্তাহেই ছবিতে ছক্কাকার হইয়া অনুগত ভক্তজনকে দর্শন দেন। নিরপেক্ষ সমালোচনায় *বিদূষক* একমেবাদ্বিতীয়ম। যদি স্বল্প ব্যয়ে ছ'শো রগড় উপভোগ করিতে চান তবে বিদূষকের গ্রাহক হন।

(৩) বিদূষকের উদ্দেশ্য রঙ্গরসের পিচকারী ছুড়িয়া রসিক রসিকাগণের মনোরঞ্জন করা এবং ধর্মসাহিত্য সমাজের ঘটি চোরগণকে ধরাইয়া দেওয়া। সেই উদ্দেশ্য রক্ষা করিয়া রসে রসবড়া গোচ প্রবন্ধ কবিতা পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে। রাজনৈতিক প্রবন্ধ বা একঘেয়ে প্রেম পিরিতের কবিতা কেহ পাঠাইবেন না।

বিদূষক নাম দিয়ে দাদাঠাকুর (শরৎচন্দ্র পণ্ডিত) জঙ্গীপুর থেকে যে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন তাতে হাস্যরসের একান্তই অভাব। এর প্রকাশ ১২ ফাল্গুন ১৩২৯ সাল। দাদাঠাকুর নিজেকে পত্রিকার সেবাইত রূপে পরিচয় দিয়েছেন। দাম /০ (এক আনা) নগদ /০ আনা দিলে তৎক্ষণাৎ আপনাকে তাহা বিকাইয়া দিবে। পুরো মজুরী পাইলে বিদূষক যে কোন ঘোষণাপত্র (বিজ্ঞাপন) বাহির করিতে রাজী আছে।

রসতরঙ্গ ১২৭৮ (১৮৭১)

কলিকাতা নন্দরাম সেনের স্ট্রিট ১ বা ১১ নম্বর ভবনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মূল্য ১ পয়সা। সাপ্তাহিক হিসেবে কয়েক সপ্তাহ একটানা প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকাতেই সর্বপ্রথম ছাপার ভুলের জন্য দুঃখপ্রকাশ করা হয়েছে।

রসতরঙ্গের প্রথম পাতাতেই থাকত একটি কবিতা। খেমটা গানের ঢং-এ লেখা একটি কবিতা।

প্রথম *পতিনামা*

কলকেতাতে প্রকাশ ছিলি গুপ্ত হলি কেন ধনি।
বলবো দুটো রসের কথা দেখা দেনা চাঁদবদনি।
যখন ছিলি কুলবালা, তখন ছিলি কুলের জ্বালা
এখন খোঁপা বেঁধে ছেঁড়াচুলে *নাস্তে উলে* ঘোমটা দিলে?
গেল যে লজ্জা সরম, গেল যে লজ্জা সরম মানের ভরম্
আব্রু দিয়ে মাথা খেয়ে হাতে একটি পয়সা পেলে?
কোথা সে গেল বাবু, কোথা সে গেল বাবু হয়ে কাবু
এখন *হাবু গোন* বিনোদিনী
কলকাতাতে প্রকাশ ছিলি, গুপ্ত হলি কেন ধনি,
বলবো দুটো রসের কথা দেখা দেনা চাঁদবদনি।

***কৌতুক প্রবাহ*। সাল নেই। *বঙ্গদর্শন* যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন এর প্রকাশ ঘটে।** সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে একটি মাত্র কপি যা সংরক্ষিত আছে, তাতে সাল নেই। তবে রঙ্গের চেয়ে ব্যঙ্গের পরিমাণ বেশী। সমসাময়িককালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মতামতের জন্য কীভাবে নিন্দিত হয়েছিলেন তার কিছু নমুনা পাওয়া যায়।

বঙ্গদর্শন-এ বঙ্কিমচন্দ্র মাইকেল মধুসূদনের নিন্দা করেন। এতে মধু-পন্থীরা রেগে যায়। সে সময় প্যারী কবিরত্ন এক কবিতায় বঙ্কিমকে আক্রমণ করেন। মধু-পন্থীরা সেখানেই থামেননি। *কৌতুক প্রবাহ* সাময়িকপত্রটি মনে হয় বঙ্কিমকে কটাক্ষ করার জন্যই ছাপা হয়েছিল।

বঙ্কিম ঈশ্বর গুপ্তের স্মৃতিরক্ষার জন্য উদ্যোগ নেন। তাঁর নিজের সাহিত্যচর্চার হাতেখড়ি হয় ঈশ্বর গুপ্তের *সংবাদ প্রভাকর*-এ। স্বভাবত তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধ তাঁকে একাজে উৎসাহিত করেছিল। এর মধ্যে তেমন অন্যায় কিছু নেই। তবু *কৌতুক প্রবাহ*-এ লেখা হয়েছে—

> ঈশ্বরগুপ্তের নাম ধরাধাম হতে তিরোহিত হবে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বোধ হয় মরবার সময় মহাদেব উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বোধ হয় কেন, অবশ্যই পেয়েছিলেন। তা না হলে এই দুর্দান্ত চেলা মহাদেবের চেলার ন্যায় ইতস্ততঃ লম্ফ ঝম্ফ করে মেদিনী কাঁপিয়ে বেড়াবে কেন? হুজুর, আপনিও কাব্য ব্রজধামে রাখালরাজ হবার চেষ্টায় উঁকিঝুঁকি মাবছেন নাকি? সাবধান আবার না গোপধামে যেতে হয় "ভুইফোড় মাইকেল মধুবন ভঙ্গ" কি মিষ্টি নামই পেয়েছিলে, বলিহারি যাই, মুখে আগুন, মরনা। মধুবন ভঙ্গ করতে গিয়ে মুকতো পুড়িয়ে বসে আছ। আর কেন দশজনের মাথা খাবার চেষ্টায় ঘুরে ফিরে বেড়াও।

মর্কট বিদূষক নামে একটি কবিতাও আছে। সেখানেও বঙ্কিমকে কটাক্ষ করে বলা হয়েছে—ঈশ্বরের বিষ্ঠাভস্ম গায়ে তুমি মাখো / বাছাধন যাদুমণি. বিদ্যা কিছু শেখ।

পাশে একটি দীর্ঘ কবিতা ছাপা হয়েছে যাতে বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছেন। মাইকেল (এক্ষেত্রে পত্রিকার সম্পাদক) বলছেন—

আমি এ অক্ষয় মধু শ্রী মধুসূদন
করেছিল অতিকষ্টে কিছু আয়োজন।
পরতে গিয়ে সেই মধু মর্কটের হয়ে
বিষম লাগিয়ে বুঝি এবে প্রাণ যায়
জানিরে বিশেষ আমি তোর গুণপনা
যার জোরে এত জোর আছে বেশ জানা।
যাসনেরে মরকট আর মধুবনে
হোওনারে মত্ত যাদু হিংসা মধুপানে।'

বসন্তক / ১

১৮৭৪ সালের জানুয়ারির শেষ দিন প্রকাশিত হয়। ৩৩৬ চিৎপুর / সুচারু যন্ত্র দাম আট আনা / হরিসিং দ্বারা প্রকাশিত। গোরাচাঁদ বসাকের কাছারী বাড়ি বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট

বসন্তক নিয়ে বহুস্তরীয় আলোচনা।

(১) ব্লক নির্মাণের ইতিহাস। ৩৩৬ নম্বর বাড়িতে School of Industrial Art এখানে বসানো হয় উন্নত মানের লিথোগ্রাফি। মি. রিগো এখানে Wood engraving শেখাতেন। গিরীন দত্ত এখানে কাঠখোদাই শিখেছিলেন। এর আগে গরানহাটা ছিল স্বর্ণকারদের প্রাণকেন্দ্র। এখানে কাঠখোদাই হত।

গিরীনবাবু এখানে Figure drawing-এর academic training নেন। *বসন্তক*-এ গভর্নর, ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্যদের মুখ হুবহু কার্টুনে আঁকতে পারতেন, কারণ সাহেব শিক্ষকের কাছে ফিগার ড্রইং-এর শিক্ষা নিয়েছিলেন। মাইকেলের প্রথম দুখানি বইয়ের অলংকরণ গিরীন বাবুর। এদেশের প্রথম Type foundry তৈরি হয় এই ৩৩৬ নম্বর বাড়ির ঠিক পাশেই—Eastern type foundry and Oriental Printing Press.

প্রাণনাথ দত্ত প্রাবন্ধিক *রহস্য সন্দর্ভ*-এর সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পর্কিত শ্যালক। সৌদামিনীর সম্পর্কিত ভাই প্রাণনাথ। প্যারীচাঁদ মিত্রের ঠিক পাশের বাড়ি। প্যারীচাঁদের শিবপুরের অফিসে ব্যবসা পরিচালনার শিক্ষানবিশী করেছেন প্রাণনাথ।

মাইকেল দত্তদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। রাজকৃষ্ণ দত্তের প্রথম বিবাহ যেখানে হয় তারা ছিল থিয়েটার পাগল। মাইকেলকে দুঃসময়ে দত্তরা অর্থ সাহায্য করতেন। *বসন্তক* প্রকাশের ঠিক আগেই কায়স্থ সভার নেতৃত্ব শোভাবাজারের দেব পরিবার থেকে রামদুলাল সরকারদের হাতে চলে যায়। ছাতু-বাবু/লাটু বাবুদের আত্মীয় এই দত্তরা।

দেবরা বিধবা-বিবাহ সমর্থন করেননি। বিদ্যাসাগরকে একঘরে করার চেষ্টা করেছিলেন। মাইকেল একে খ্রিস্টান, তায় হিন্দু দেবদেবীদের নিয়ে লিখছেন এটাও দেবদের পছন্দ ছিল না। বাংলা থিয়েটারে মেয়েরা নারী ভূমিকায় অভিনয় করুক এটা প্রকাশ্যে বলেছিলেন মাইকেল। রক্ষণশীল দেবরা থিয়েটার ব্যাপারটাই পছন্দ করতেন না। হাটখোলার দত্তরা বিদ্যাসাগর ও মাইকেলকে শ্রদ্ধা করতেন। টাকা ও সম্মান দিয়েছেন।



বসন্তক পত্রিকার আখ্যাপত্র

বসন্তক / ২

ব্রাহ্মণদের কোঁদল

ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণরা চিরদিনই শোভাবাজারের স্নেহধন্য। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ সমর্থন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও তদীয় বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ভূদেবের চুঁচুড়া-হুগলি গঙ্গার ওপারে, এপারে নৈহাটি / মনের উদারতা সে সময় ভাটপাড়ার বামুনদের ছিল না। নবদ্বীপও তাই। হাটখোলার দত্তরা বিধবা বিবাহের সমর্থক। পরিচয়হীন, মেদিনীপুরের গ্রামের গরীব পরিবারের মানুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে মানুষ বলেই নৈহাটির ব্রাহ্মণরা গণ্য করতেন না। এহেন ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ বই লিখছেন, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হয়ে কাজ করছেন এবং মতভেদ হওয়ায় সাহেবের নাকের ডগায় পদত্যাগ করে বলছেন, দরকার হলে ভিক্ষা করে খাব।

ইংরেজ শাসনের প্রবল সমালোচনা *বসন্তক*-এর পাতায় পাতায়।

সমাজের অভ্যন্তরীণ ঠাণ্ডা লড়াইটা জানা থাকলে *বসন্তক*-কে পড়া ও বোঝা সহজ হবে।

বসন্তক স্পষ্ট ভাষায় ইংরেজ-শাসন ও সেই শাসনের তোষামোদকারীদের নিন্দা করেছে। প্রতি বছর দুর্ভিক্ষ হত। ইংরেজ ব্যবসাদার চাল মজুদ করে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি। পাটনায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ভূদেব তাঁর *এডুকেশন গেজেট*-এ সরকারের হয়ে সাফাই গেয়েছেন। একে সিভিলিয়ান, তাই উচ্চ বেতনভোগী। 'তিনি প্রাণপণে বিলক্ষণ লেয়াকতির সঙ্গে গভর্নমেন্টের সপক্ষতা লেয়াকতি করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি 'আর এক প্রকার দুর্ভিক্ষ' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রস্তাব লিখিয়া গর্ব করিয়াছেন যে—ক্যাম্পবেলকে দুইশত অভিশম্পাৎ না করিয়া কোন সম্পাদক জল গ্রহণ করিতেন কিনা সন্দেহ। বাকি ছিলেন ব্রাহ্ম সম্পাদকগণ এবং আমরা অন্যান্য সম্পাদকদের যদি বার্ষিক দুই হাজার টাকার কি মাসিক ৭/৮ শত টাকার খাতির থাকিত। তবে তাহারাও আজ ঐরূপ গর্ব করিতে পারিতেন।"

প্রসঙ্গত বলি, ভূদেব দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে ইংরেজদের কোনো দোষ দেখেননি। কিন্তু সরকারি Agricultural Gazette-এ দুর্ভিক্ষের জন্য পাটনার ইংরেজ শাসকের নিন্দা করা হয়। সম্পাদক ইংরেজ, পত্রিকাও ইংরেজ শাসকদের। সম্পাদককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে ঠিক হয়। সাসপেন্ড হবার আগেই রবার্ট নাইট পদত্যাগ করলেন।

> দুর্ভিক্ষ যে সরকার সৃষ্টি করে একথা *বসন্তক* স্পষ্ট বলেছে।--দুর্ভিক্ষ হইবে না এরূপ ভয় করিবার কোন কারণ নাই। আমি এখানে সহস্র সহস্র ইংরাজ কর্মচারী বহাল করিয়াছি। তাহার মধ্যে অনেকানেক প্রধান ইংরাজ কর্মচারী আছেন। একটি সামান্য ইংরাজের কতটি কর্মচারী বিবেচনা করে দেখুন। এমতাবস্থায় এই সমুদায় কর্মচারীর খানসামা, সরকার, বেহারা, খিদমতগার, বাবুর্চি, ধুবী, আয়া, মেথর, পাংখাদার, সহিস কোচম্যান, ঘাসকাটা সমুদয় এদেশে আসিয়া উপস্থিত হওয়ার পূর্বে যদিও দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ভয় ছিল, এখন আর তাহা করিবার প্রয়োজন নাই।"

বঙ্গদর্শন ৩য় বর্ষে *বসন্তক*-এর সুচারু যন্ত্রে ছাপার জন্য বঙ্কিম দেন। যখন ছেপে বের হল তখন বঙ্কিমের মনে হল তাঁকে অপমান করা হয়েছে। প্রথমত প্রকাশকের নাম ছোটু সিং-- দত্তদের বাড়ির দারোয়ান। কোনো ভদ্রলোক নয়। দ্বিতীয়ত ছাপা হয়েছে মাত্র এক হাজার। সাধারণত দেড় থেকে দু হাজার ছাপা হত। এরপর বঙ্কিম দত্তদের দরজায় আর যাননি। কিন্তু রাগটা পুষে রেখেছিলেন। *স্বর্ণলতা* নামে একটি নাটকের সমালোচনা করলেন *বঙ্গদর্শনে* এভাবে—

> বাঙ্গালী মাছভাত খায়, মুর্গী খায় না। এই কুপ্রথায় অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে। এই নৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া মুর্গী নাটক নামে একটি উৎকৃষ্ট নাটক হইতে পারে। এদেশে অশ্বের দ্বারা চাষ না হইয়া বলদের দ্বারা চাষ হয়। এই কুপ্রথার নিন্দায় 'বলদ মহিমা' নামে আর একখানি নাটক হইতে পারে।

ইলবার্ট বিলের পটভূমি

দেশি ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর বিচারের ব্যবস্থা ছিল। কৃষ্ণাঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে মিয়ার্স সাহেবের বিচার করেন। সে সময় দেশি ম্যাজিস্ট্রেটরা বহু অত্যাচারী ইংরেজকে শাস্তি দেন। ইংরেজ শাসক ও ব্যবসায়ীরা এই ব্যবস্থার অবসানের জন্য আন্দোলন শুরু করেন।

বিচার চলাকালে মিয়ার্স চড় মারেন বঙ্কিমকে। এ নিয়ে খুব হই-চই-এর পর বঙ্কিম বদলি হয়ে চলে যান। মিয়ার্স বঙ্কিমের কাছে ক্ষমা চান। কিন্তু *বসন্তক*-এর ধারণা, বঙ্কিমই সাহেবের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। একদল দেশী সম্পাদক বলতে লাগলেন, এত ক্ষমতা দেশী ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে থাকা ঠিক নয়। এর ঠিক পরেই আসে ইলবার্ট বিল। ইলবার্ট বিল প্রণয়নে বঙ্কিমের ইংরেজ অপরাধীকে শাস্তি দেবার ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। *বসন্তক* এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ ছিল না।

বসন্তক-এর বঙ্কিম-বিরোধিতার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের বিবর্তনটাও জানতে হবে। রাজা নবকৃষ্ণ দেবদের হাত থেকে ধনী ব্যবসায়ী রামদুলাল সরকারের হাতে কায়স্থ সভার নেতৃত্ব চলে যায়। পরে রামদুলালের নাতিরা ছাতুবাবু ও লাটুবাবু কায়স্থ সমাজের নেতা হন। রামদুলাল সরকাব শৈশবে হাটখোলার মদনমোহন দত্তের আশ্রিত ছিলেন, মদনমোহনের টাকাতেই তিনি ব্যবসা শুরু করেন। মদনমোহন আমৃত্যু হাটখোলার দত্তদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। পরে অবশ্য দুই পরিবারে বৈবাহিক সম্বন্ধও হয়েছে। *বসন্তক* দত্তবাড়ির পত্রিকা--উদারমনস্ক। শোভাবাজারের দেবরা রক্ষণশীল, তাঁদের মাথায় ভট্টপল্লীর আশীর্বাদ নিত্য বর্ষিত হত। বঙ্কিম সেই ভট্টপল্লীর রক্ষণশীলতার উত্তরাধিকার বহন করতেন। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের গভীরের এই মানসিক স্তরটি ছুঁতে না পারলে *বসন্তক*-কে বোঝা যাবে না।

হুতোম-সাপ্তাহিক নকসা। জুনিয়র টেকচাঁদ। ১৮৭৫ সালের ২৪ এপ্রিল প্রথম প্রকাশিত হয়ে কিছুদিন চলেছিল। দাম দু-আনা। রাধামাধব হালদারের এই পত্রিকা দেখাশোনা করতেন ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়। এগারোটি সংখ্যা আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। মাথার দিকে নকসা প্রকাশের কারণ হিসাবে দু-লাইন সংস্কৃত শ্লোক লেখা থাকত।

ক্রুধ্যন্তি মূর্খা ন বিপশ্চিতো জনা।
আকর্ণ্য তথ্যং বহুশোহবাভাষিতম্।।

রোয়াকি-আড্ডার ভাষাকে কেন্দ্র করে প্রথম নক্সা লিখলেন প্যারীচাঁদ মিত্র আলালের ঘরের দুলাল। তাঁকে অনুসরণ করে হুতোম প্যাঁচার নক্সা। এই দুটি বইয়ের জনপ্রিয়তায় গা ভাসিয়ে প্রকাশিত হল *হুতোম* নামক সাপ্তাহিক। জুনিয়ার টেকচাঁদ সাপ্তাহিক *হুতোম*-এ 'হুতোম প্যাঁচার নকসা' সম্পর্কে লিখেছেন--সে হুতোমের নক্সাখানির রচনা চমৎকার কিন্তু বিশেষ স্মরণ করিয়া পাঠ করিলে মহোদয় টেকচাঁদ ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট সংগ্রহই বলিতে হইবে। আমরা এবং অপর অপর পাঠক মহোদয়েরা যাহাকে অনেকেই টেকচাঁদের ট্রু কপি বলিয়া থাকি।

জুনিয়ার টেকচাঁদ তাঁর এই সাপ্তাহিক *হুতোম* উৎসর্গ করেছিলেন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে। কালীপ্রসন্নকে আক্রমণ করে ভুবনবাবু বই লিখেছিলেন 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'।

এই সাপ্তাহিক *হুতোম* (যার সম্পাদক জুনিয়র টেকচাঁদ এবং রচনা সাদৃশ্যে অনুমান হয় ইনিও ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) অনেক বেশি খোলা চোখে কলকাতার নগর সভ্যতাকে দেখেছেন। যারা সুতানুটি-কালচার নিয়ে এখন বাজার গরম করছেন, তাঁদেরও চাঁদের উল্টোদিকের ছবিটা জানা দরকার। সাপ্তাহিক *হুতোম* ১৮৭৪ সালের চৈত্রমাসের দেখা

কাঁসারীপাড়ার সং-এর বিস্তারিত যে বর্ণনা দিয়েছে তাকে একালের ক্রিকেট-ফুটবলের ধারাবিবরণীর পথিকৃৎ বলা যেতে পারে।--

> আজ চন্ত্রাশে চৈত্র রবিবার : অদ্য প্রাতঃকাল থেকেই সহর গাজন উৎসব উৎসাহে পরিপূর্ণ। কাঁসারীপাড়ার কাঁসারীদের সং বেরুবে। তাই দেখবার জন্য সহরের সমস্ত লোকেই শশব্যস্ত। গরীব কেরানীরা ছ দিন কলম ঠেলে, মুনীবের মন যুগিয়ে রবিবারের দিন একটু বিশ্রাম সুখ লাভ করে থাকেন। সেদিন আর জ্বটা বাজতে না বাজতে তাড়াতাড়ি চোখে মুখে ভাত গুঁজতে হয় না। আহারের একটু বেলা হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু দুর্ভাগা কেরানীদের অদৃষ্ট গুণে আজ সে বিশ্রাম সুখও ঘটে উঠল না। আজ সং দেখবার খাতিরে, সেই তিন সকালে উদরপূরণ কার্যটী সম্পন্ন করতে আরম্ভ করে দিলেন। বারনারীরা সমস্ত রাত্রি নাগরের মনোরঞ্জনের জন্য জাগ্রত থেকে প্রত্যহ প্রাতঃকালে পালঙ্কে শুয়ে বিশ্রাম সুখ অনুভব করে থাকে, আজ সে সুখে বঞ্চিত হয়েছে। আজ তারা সকালেই শয্যাত্যাগ করে প্রাতঃকৃত্য সমাধা কচ্চে, সে কার্য্য দেড় প্রহরের পূর্বে কখনই করা হয় না। পূর্বরাত্রেই বেশ-বিন্যাসের আয়োজনও যোগাড় করে রাখা হয়েছিল, আজ সকাল থেকে কেবল সাবান রূপটান প্রভৃতি দেহ সংস্কারের উপকরণ লয়ে স্বীয় স্বীয় অঙ্গে মর্দ্দন লেপন করতে লাগলেন। কিঞ্চিৎ বিলম্বেই জলপূর্ণ টব গামলা কলসী আর ঘটীর প্রয়োজন হয়ে উঠল। সুন্দরীরা মুখ প্রক্ষালন ও গাত্রধৌতপূর্ব্বক ছোটবড আয়না সম্মুখে লয়ে তাড়াতাড়ি কেশপাশে যুবজন মনোহারিণী কবরী প্রস্তুত করে কপোল ও অধরদেশে সভ্য সাজের উপকরণ পাউডার, আর রোজ, অভাবে মেজেন্টর অথবা আলতা লাগাতে লাগলেন। ইন্দিবর অথবা কমলের সহিত কবিকুলের চিরবর্ণনীয় নয়নপ্রদেশ কজ্জলে সুশোভিত করে, নানাবর্ণের এবং অবস্থামত কারুকার্য্য নিষ্পাদিত আঙিয়া, কোরর্তা কাঁচুলী যথাস্থানে সজোরে বন্ধন করে ষোড়শী যুবতী সাজলেন। নিজের প্রতিবেশীর নিকট যাচঞা করা, ভাড়া করা, বিবিধ রকমের রকমওয়ারী সোনারূপার সাদা ডায়মানকাটা, আর জরাও ও গিল্টির গহনা গাত্রে সংলগ্ন করে, বাইজীরা বড় ফাঁদের ঢিলে পায়জামা ও পেশোয়াজ, খেমটাওয়ালীরা আর উঁচু দরের বেশ্যারা নানাবর্ণের রঙ্গীণ পরিধান ও ওড়না শ্রী অঙ্গে ধারণ করে, চীনে বাড়ির এবং সাহেব বাড়ির বারনিস করা চটিজুতা পায়ে দিয়ে, কেহবা পাল্কীতে, কেহবা বাবুর গাড়িতে, কেহবা ভাড়াটে ছেকড়াতে সওয়ার হয়ে সং দেখতে এবং ঢং দেখতে বাটী হতে যাত্রা করলেন। বিখ্যাত বণিক মহাশয়ের বাটীর দক্ষিণ সীমা থেকে চিৎপুর রোডের সমস্ত রাস্তার দুধারি বাটীতে এখন জনসমাগমের ধুম লেগে গেল। কলুটোলার প্রকাশ্য রাস্তার ধারে বাটী সকলেও তদ্রূপ আমদানী।

রাধামাধব হালদারের *হুতোম* প্রকাশিত হলে তার দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়। ভুবনমোহন হাটখোলার দত্তদের আশ্রিত ছিলেন। দত্তদের ৩৯ মানিক বসু ঘাট স্ট্রিটস্থ বাড়িতে বাস করতেন। এই বাড়ি থেকে হাটখোলার দত্তরা (নরেন্দ্রনাথ দত্ত) বের করেছিলেন *জন্মভূমি*। *জন্মভূমি*-তে লিখে হাত পাকিয়েছেন অ্যাটর্নি যতীন্দ্রমোহন দত্ত। যমদত্ত ছদ্মনামে তিনি *যষ্টিমধু*-তে লিখতেন। এই কলমচি যমদত্তর কাছ থেকে *বসন্তক* সম্পর্কিত বহু তথ্য পেয়েছেন।

কৌৎকা ১৩০৩ ভাদ্র

চারুচন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত। ৯৬ নং বিডন স্ট্রিট, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

এই ক্ষণজীবী মাসিক পত্রিকাটির রচনাংশে ধার বা ভার কোনোটিই প্রবল ছিল না। কিন্তু

কার্টুন অংশটি সেকালের তুলনায় যথেষ্ট উন্নত। *কোঁৎকা*-র ছবির মান সেকালের অন্যান্য পত্রিকার তুলনায় খুবই দৃষ্টি আকর্ষণকারী। সম্ভবত *বসন্তক*-এর মতো প্রকাশকের টাকার জোর ছিল না।

একটি কার্টুনে দেখানো হয়েছে, ভারতীয় মানুষ (যার মাথা নেই) তার দুই কাঁধে দুই বিদেশি শোষক নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ভারতের সম্পদ যথেষ্ট বোঝাবার জন্য ভারতীয় পুরুষটিকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট আকারে দেখানো হয়েছে।

পত্রিকাটি এতই জীর্ণ যে কার্টুনগুলির পুনর্মুদ্রণ অসম্ভব। একালের পাঠকদের কাছে দুঃসাহসিক ক্যাপসনটি তুলে ধরছি।

প্রজা--ওগো পরাণ গেল, আর সহে না, রক্ত ওঠে মুখে

রাজা--থাক থাক থাক। সহ্য কর। রইবি বড় সুখে।

কোঁৎকা--ওরা থাকবে, চোড় হাঁসবে। খালি মরম বেদন বুঝবে না মরিস বেটা, চুলোয় যা তুই। ওরা কিছু শুনবে না।

সেকালের সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরেছে কোঁৎকা। দুপাতা জুড়ে একটি কার্টুন--

বাঁদিকের পাতায় ঝাঁটা হাতে এলোচুলে রাগী এক যুবতী, ডানদিকে এক বৃদ্ধ মাথায় নকল চুল, ইউরোপীয় রীতিতে গাউন (মনে হয় কোন বিদেশি ছবির অনুকরণ)। নিচে দু পাতা জুড়ে দীর্ঘ কবিতা।

বুড়ো বরের প্রতি
ছুঁসনে মোরে হুতোম পেঁচা মাখা ডান
আবার ছুঁলে টেড়ডা পাবি, মলে দেবো কান।
আজ বাদে কাল মরে যাবি, ওরে বুড়ো ঢেঁকি।
বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ একি তোর দেখি।
বয়সের [illegible] ওর, বড় বাপের চেয়ে।
কেমন করে করি বিয়ে লাজের মাথা খেয়ে।
আবার সরে আসিস কাছে, নাইকো তোর লাজ
হ্যদেরে খেঁদির পুত সাধগে আপন কাজ।
চোখ দুটো তোর খুদে খুদে ঝরে তাতে জল
তার মাঝে নাকটা যেন ইদুর মারা কল।
মাথার মাঝে আঁধার-আলো মেশামেশি করে
চ'খের মাথা খেয়ে বাপ দিল এমন বরে।
কান দুটো তোর হাতির মত ছোট কপাল খান।
ঝাঁটার মতন গোঁপ যেন ঠিক জাম্বুবান।
হাঁদা পেটে জোরা পিলে বুকে রাজ্জির চল,
আমারি কি রূপের ছটা নাইকো সমতুল।

কোঁৎকা-র সবচেয়ে মজার অংশ এর শীর্ষ-চিত্র। একজন টিকিধারী পণ্ডিত চেয়ারে বসে। তাঁর টিকিতে লেখা, আমি এডিটর।

প্রথম সংখ্যায় শীর্ষচিত্রে এডিটরের ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যায় নিজের

আত্মপরিচয় দিয়েছেন অকপট ভাষায়।

কলির এডিটর
মাসিক পঞ্চরং

ভাঁড়ে মা ভবানী মোর, কলম ধরতে যাই
সরস্বতীর সঙ্গে মোর জানাশোনা নাই।
ঘুড়ি ওড়াই, ফুটবল আর কিৎকিৎ খেলি ছাতে,
নিউজ পেপার এডিটরী করি কেবল রাতে।
অদ্রবিনে বাপ মরেছে মা মরেছে হায়,
গিন্নিরানীর অলংকার ঢালছি শুঁড়ির পায়!
বয়স আমার সাড়ে তের, খাওয়ার দোষে বুড়ো
এই দেখ ভাই, লেজ রয়েছে হয়নি এখনো মুড়ো।
ব্যাঙ ব্যাঙাচির কথা তোমরা ভুলে নাই যেয়ো
বয়সের সাক্ষী লেজটি মোর তোমরা সবাই কোয়ো।
(এবার) সব পরিচয় দেব নাকো, কেঁদে ফেলবে শেষে,
কেঁদে ফেলেছে শুনলে আমায় মনটা যাবে ফেঁসে।
কেঁদনাকো কেঁদনাকো, ছোলার ছাতু দিব
হাসি মুখ দেখাইলে কত মজা দেখাইব।

কোঁৎকা এখন খুবই দুর্লভ পত্রিকা। সামান্য যা দেখার সুযোগ হয়েছে তাতে বোঝা যায়, *বসন্তক*-এর ধারাটি অব্যাহত রাখার চেষ্টা ছিল সম্পাদকের। বিশেষত কার্টুনের ক্ষেত্রে।

ভূত

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে মাত্র একটি কপি আছে। সম্পাদক-প্রকাশকের নাম জানা যায় না। সন তারিখ নেই কিন্তু সেটি বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই। লর্ড মিন্টো তখনও গভর্নর জেনারেল হয়ে ভারতে আসেননি। বঙ্গ-ভঙ্গ প্রকল্প বাতিল হওয়ায় ইংরেজ সরকার যথেষ্ট রুষ্ট। সংবাদপত্র এবং স্বদেশী আন্দোলন দমন করার লক্ষ্যে সরকার একটির পর একটি অর্ডিনান্স জারি করে চলেছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক সভা-সমিতির উপরেও চলেছে দমন-পীড়ন। বিচারপতি কিংসফোর্ড তখন (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮) *সন্ধ্যা*-র সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা চালাচ্ছেন। *সন্ধ্যা*-র সম্পাদক মানবেন্দ্র চ্যাটার্জিকে আগেই ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। ময়মনসিংহে ম্যাজিস্ট্রেট ব্যামফিল্ড ফুলার তিনজনের বেশি জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করেছেন এবং যে সব যুবক এই আদেশ অমান্য করেছিলেন তাদের উপর নিষ্ঠুরভাবে বেত্রাঘাত করে বিপ্লবীদের কুনজরে পড়েন।

ভারত-সচিব মর্লে চেয়েছিলেন দমন-নীতির নিষ্ঠুরতা কিছু কমাতে। এই রকম এক পরিবেশে লর্ড মিন্টো ভারতে আসছেন গভর্নর জেনারেল হয়ে। এর আগে ময়মনসিংহে বন্দেমাতরম বলার দায়ে বেশ কিছু যুবককে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

ভারত-সচিব মর্লে ছিলেন উদারনীতিক। তিনি গরম পরিবেশকে নরম করার উদ্যোগ নিলেন। *ভূত* পত্রিকায় লেখা হয়েছে।

'আমাদের ঠাকুরদাদা (এক্ষেত্রে ভারত-সচিব মর্লে) মহাশয় অনেক ভেবেচিন্তে শেষটা ঠিক করলেন যে বন্দেমাতরম বলাটা বড় কিছু অন্যায় নয়। আর আমাদের রাজনীতির বিরুদ্ধাচরণ নয়। তবে আর তাহাদের বন্দেমাতরম করতে মানা করার আবশ্যকতা নাই।

ফুলার সাহেবের ফুলহারে ময়মনসিংহবাসী এখন সশংকিত। তিনি নিয়ম করেছেন ত্রয়স্পর্শ ছাড়া বেশি লোক সদর রাস্তায় দাঁড়াইলে রাজপত্রে জনতা করার অপরাধে দণ্ডিত হইবেন।'

মজলিস ১৩২৯

প্রথম যে দুটি খণ্ড দেখেছি তাতে রঙ্গরসের তেমন ব্যাপার নেই। পৃষ্ঠপোষকদের তালিকায় বঙ্গীয় রাজন্যবর্গের কেউ বাকি নেই। দুই সম্পাদক -ব্রজবল্লভ রায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার। ব্রজবল্লভ পেশায় কবিরাজ এবং সেই সূত্রে পত্রিকায় কবিরাজী ওষুধের বিজ্ঞাপনের আধিক্য।

৩য় বর্ষ ১৩৩১ থেকে যে খণ্ড শুরু হয়েছে সেখান থেকে রঙ্গব্যঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। *মজলিস*-এ প্রকাশিত রঙ্গ কবিতা, প্যারডি এবং সমসাময়িক সাহিত্য ও সমাজনায়কদের প্রতি কটাক্ষ খুবই ধারালো। রাজনীতির চেয়ে সাহিত্যিকদের প্রতি আক্রমণে সম্পাদকরা বেশি আগ্রহী এবং সমালোচনা খুবই মৌলিক

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাসে মেসের ঝি নিয়ে সতীশের কাণ্ড কারখানা লিখে হই-চই ফেলে দিয়েছিলেন। *মজলিস* শরৎচন্দ্রকে একহাত নিয়েছে-

> আর মেসের ঝীর প্রতিও আমাদের অনুরোধ, তোমরা আর মেসে থাকিও না। তোমাদের আদর--আফিসের মৌতাতে--তোমাদের কদর রূপদক্ষের প্রতিভায়। তোমাদের মহিমা কবির কাম কল্পনায়। যে মেসে কলেজের ছাত্র থাকে, পাঠশালার পড়ুয়া থাকে সে মেসে ঝী দেখিলে আমরা ভয় পাই। মনে হয় কোনদিন হয়তো ঝী বর্মা জাহাজে চড়িবে। তাহার সেই অস্পষ্ট উধাও কাহিনী ছাপার অক্ষরে বাহির হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

ঐ বছর পরবর্তী এক সংখ্যায় গ্রন্থকারদের নিয়ে নির্মম ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

'গ্রন্থকার কাকে বলে--তাহাদের চক্ষু কোটরগত, কেশ রুক্ষ, বসন মলিন ও জীর্ণ। তাহাদের কটাক্ষ কুটিল, গতি কুটিল এবং চিত্তও কুটিল। যিনি মাতৃভাষায় অনভিজ্ঞ এবং অপর ভাষা যাহার পক্ষে বিষবৎ তিনিই অধুনা সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার নামে পরিচিত। যাহার রসনাগ্র ক্ষুরধার ও যাহার লেখনীর অগ্রভাগ সম্পূর্ণ ধারশূন্য তাহাকেই গ্রন্থকার বলিয়া জানিবে। কমলা যাহার দ্বারে পদার্পণ করেন না এবং যাহার প্রতাপে সরস্বতী পদ্মাসন ত্যাগ করিয়া সমুদ্রপারে পলায়ন করেন তিনিই নিশ্চয়ই গ্রন্থকার।

বেপরোয়া ১৯২৩

ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৮৮৬-১৯৬৫) নামটি একালের কেন, যখন তিনি রক্তমাংসের একটি শরীর নিয়ে রীতিমত বেঁচে আছেন, তখনও তাঁকে কেউ তেমন চিনতেন না। অথচ যদি একটু ঘুরিয়ে বলা যায় যে, 'অগ্নিশ্বর' নামক সিনেমাটি বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের অবিকল জীবনী, তাতে হয়ত কেউ কেউ চিনবে, কিন্তু ভাববে সিনেমার জন্য বানানো জীবনীটি আসলে একটি গল্প।

বনফুল একাধিকবার বলেছেন, অগ্নিশ্বর লিখতে তাঁকে রং চড়াতে হয়নি। ঘটনার ঘনঘটাও

বানাতে হয়নি। যেমনটি দেখেছেন, তেমনটি লিখেছেন। পরিমল গোস্বামী তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাঁর কথা পরিমলবাবুর *আমি যাদের দেখেছি* গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করি--

> কারটুন ছবি, ছন্দোরচনা, এবং গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ রচনা--এই তিনটি বিভাগেই অসাধারণ শক্তির অধিকারী বনবিহারী। এই তিনটি শক্তির সাহায্যেই তিনি সমাজের ইষ্ট করতে চেয়েছেন বাঙ্গালীর চিন্তার দুর্বলতা ভেঙ্গে দেওয়া এবং সামাজিক অন্যায় অন্ধকারের স্থানে প্রখর আলোকপাতন, এই ছিল তাঁর সমস্ত শিল্প প্রেরণার মূলে। তিনি কৌতুকসৃষ্টিতে হাসানোর চেষ্টা করেন নি, ব্যঙ্গ সৃষ্টি করে ভাবাতে ও কাঁদাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর আঁকা কারটুন ছবি যদি কেউ দেখে থাকেন তবে এ ব্যাপারেও যে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন তা বোঝা যাবে। বাংলা দেশে দুজন মাত্র শক্তিশালী কারটুনিস্টের আবির্ভাব ঘটেছিল গত যুগে--বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গগনেন্দ্রনাথের বিরূপবজ্র বই আকারে প্রচারিত হয়েছিল, যদিও তাঁর প্রতিও গোঁড়ামহলের বিরূপতা প্রসিদ্ধ। তখন তা অর্ধদগ্ধ জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের মতই এসে পড়েছিল সমাজের মাথায়। বনবিহারীর কার্টুনও বজ্র, কিন্তু লাইটনিং অর্থে মাথার ওপর কয়েক হাজার কোটি ভোল্টের আঘাত এসে লাগা।

বনবিহারীর কার্টুনগুলি নানা মাসিকপত্রের পাতায় ছড়িয়ে পড়ে আছে।

বাংলার মেয়েদের অসহায়তা স্মরণ করে তিনি বেদনা বোধ করেছেন। তাঁর অনেক স্যাটায়ারের প্রেরণাই এই বেদনাবোধ।

বনবিহারী ১৯২৩ খ্রি. *বেপরোয়া* নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশ করেন। বেপরোয়া একটি দল ছিল। দলের পরিচয়--চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, তুলসীচরণ ভট্টাচার্য ও বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য। বিষ্ণুচরণ ছিলেন সম্পাদক। এই কাগজে বনবিহারীই সবচেয়ে বেশি স্থান অধিকার করে আছেন। তাতে সন্দেহ থাকে না যে, এ পরিকল্পনা তাঁরই। বিজয়চন্দ্র মজুমদার তখন ছিলেন *বঙ্গবাণী*-র সম্পাদক। *বঙ্গবাণী* ৪৯ আশুতোষ মুখার্জি রোড থেকে স্বত্বাধিকারী রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় প্রকাশিত হত।

প্রবাসী-তে একটি খবর বেরোয়। বাঁকুড়ার দুটি হিন্দু বালিকাকে কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়াতে তারা আত্মহত্যা করে। এই ঘটনায় বিচলিত বনবিহারী 'কলির ফের' নামক ব্যঙ্গ-কবিতা লিখলেন। এটি গল্পের আকারে পদ্যে লেখা।

শনিবারের চিঠি ১৩৩১—সম্পাদক যোগানন্দ দাস

সহ-সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস

শনিবারের চিঠি শুরু থেকেই রাজনীতি-গন্ধী ছিল। সরাসরি না হলেও, পরোক্ষে এই পত্রিকার একটি রাজনৈতিক মতামত ছিল। মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্মের পর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে যে ভোট-পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, ফজলুল হক তাতে মুসলিম লিগের নেতৃত্ব দেন। কাজী নজরুল ইসলাম মুসলিম লিগের হয়ে প্রচারে নামেন। গাজী আব্বাস বিটকেল নাম দিয়ে M.L.A.চ্ছ নামক কবিতাটি আদ্যোপান্ত নজরুলের প্রতি কটাক্ষ। প্রথম সংখ্যার মলাটের ছবিতে আছে—একটি বুড়ো আঙুলে লাল রঙ। ভোটের সময় আঙুলে লাল রঙ লাগানো হত সে সময়। বুড়ো আঙুল দেখানোর উদ্দেশ্য—জেতার পর জয়ী এম-এল-এ ভোটারদের বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন অর্থাৎ কলা দেখাচ্ছেন। তখন সম্পাদক যোগানন্দ দাস, সে সময় চিত্তরঞ্জন দাস ও তাঁর স্বরাজ্য পার্টি মন্ত্রিত্বে যোগ দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। এই পশ্চাদপট মনে রেখে সাম্প্রদায়িক মুসলিম লিগের হয়ে নজরুলের প্রচারকর্ম বহু হিন্দুমনে আঘাত করেছিল।

সেই নির্বাচনে কাজী সাহেব মুসলিম লিগ এবং হক সাহেবের হয়ে প্রচারে নামলেও, পরে স্ত্রী প্রমীলার অসুস্থতার সময় হক সাহেব সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গ হয়। শ্যামাপ্রসাদ প্রমীলার চিকিৎসার ব্যবস্থা করায় কাজী লিগের সংস্রব ত্যাগ করেন।

নবপর্যায়ে *শনিবারের চিঠি*-র সম্পাদক হন সজনীকান্ত দাস এবং সহকারী হন পরিমল গোস্বামী। নবপর্যায়ে নতুন সংযোজন কার্টুন। পিসিয়েল এখান থেকেই কার্টুনিস্ট হিসাবে কাজ শুরু করেন। তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয় প্রমথ সমাদ্দারও অল্পদিনের মধ্যেই পিসিয়েলের নকলনবিশী শুরু করেন। পিসিয়েল তাঁর ড্রইং ও চিন্তায় একবারে মৌলিক। প্রমথ সমাদ্দার পিসিয়েলের ড্রইং এমনভাবে নকল করতেন যে প্রথম নজরে কোনো পার্থক্য ধরা যেত না। প্রমথ তাঁর ডাক নাম 'মণি' ব্যবহার কবতেন। চিন্তা পদ্ধতির মধ্যে মৌলিকত্বের একান্ত অভাব।

যোগানন্দ দাসের *শনিবারের চিঠি* সজনীকান্তেব হাতে পড়ে অনেকটাই পাল্টে যায়। সজনীকান্তের গভীর সাহিত্য চেতনা, ইতিহাসবোধ ও সমকালীন লেখকদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-মধুর সম্পর্কেব ছাপ এবং সর্বোপরি ব্যঙ্গ-বোধ *শনিবারের চিঠি*-কে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় ভূষিত করেছিল। সমকালে সজনীকান্ত ও তাঁর *শনিবারের চিঠি*-র মতামতকে উপেক্ষা করতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সাহস করেনি।

সজনীকান্তের ব্যঙ্গ-বোধের একটি নমুনা দিই।

বঙ্কিমচন্দ্র হঠাৎ মারা গেলেন কেন? এ নিয়ে সজনীবাবুর মৌলিক গবেষণা হল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস *বেদে* পাঠ করে। *বেদে* বইটির "যে জায়গাটায় মাস্টার কর্তৃক আল্‌হাদির গর্ভপাতের অপূর্ব বর্ণনা দেওয়া আছে বঙ্কিম সেইখানটা পড়িয়া বাস্তবতার মোহে এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে হার্টফেল করিয়া মারা যান।"

"হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথের কথা হইতেছিল। শুনিয়াছ কি, রবীন্দ্রনাথ বেদে বইটা সম্বন্ধে একটি মস্ত সার্টিফিকেট দিয়াছেন। দেখিতেছি তোমাদের কাগজে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে interviewটা ছাপাইয়া ভাল কাজ করিয়াছ। রবীন্দ্রনাথ যেই শুনিলেন বঙ্কিমচন্দ্র বেদের প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি অমনি কলম লইয়া বসিলেন--আমি কি কম! রবীন্দ্রনাথ নাকি বলিয়াছেন--অচিন্ত্যকুমারের প্রতিভা আছে। ইহার পর কোনদিন তাঁহাকে বলিতে শুনিব--সেকস্‌পীয়রেরও প্রতিভা আছে।" নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধনা দেবার জন্য বিপিনচন্দ্র পালের নেতৃত্বে কলকাতা থেকে কবি সাহিত্যিকের একটি দল শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অভিমানভরে সে সময় যে ভাষণ দেন তার সারমর্ম ছিল--স্বদেশের লোক তাঁকে চেনেনি। বিদেশে সম্মান লাভের পর তাঁর দেশবাসী তাঁকে চেনার চেষ্টা করছে।

রবীন্দ্রনাথের অভিমান এতই তীব্র ছিল যে ঊনবিংশ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি হয়েও তিনি ডাকযোগে ভাষণ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নিজে হাজির হননি। এই উপলক্ষে *শনিবারের চিঠি*-তে সজনীকান্ত একটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখলেন--

সবই বুঝিলাম। বুঝি নাই শুধু
হে কবিগুরু
এত অভিমান, কেন আয়োজন
করিলে সুরু?

সভাপতিপদ করিয়া গ্রহণ
চাঁদা সংগ্রহে দিলে শেষে মন।
এ যে রসিকতা, প্রাকৃত ধরণ
অতীব পুরু
পঞ্চাশোর্ধে শেষ না হইয়া
কাঁচিয়া সুরু।
ঠিকানা তোমার কেহ জানিল না
চমৎকার
বিপিনচন্দ্র পালেরে বহালে
অশ্রুধার
বক্তৃতা যদি লিখে রেখে গেলে
ভাগনে জামাই ভাইপো কি ছেলে
কারেও না দিয়ে পাঠাইতে মেলে
পয়সা চার
মাত্র খরচ, তাও তোমার জোটে নি আর

সজনীকান্তের প্রখর ব্যঙ্গবোধের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ, মাইকেলের সাক্ষাৎ। মাইকেল এসেছিলেন সজনীবাবুর কাছে। সজনীকান্ত চিনতে পারেননি।

'ভদ্রলোক করুণকণ্ঠে বললেন,--আমি একটা কাব্য লিখেছিলাম।

—বাপরে, আর অপেক্ষা করা ঠিক নয়। কোট প্যান্ট চাপ দাড়ি, আর কাব্যের combination মারাত্মক। হয়তো আমাকেই কাব্য শোনাতে চাইবে।

বললাম--মিথ্যা চেষ্টা। নরেনদা (কবি নরেন্দ্র দেব) বলেছেন, ভারতবর্ষে তাঁর কোন হাত নেই। হরিদাস চাটুজ্জে যা হুকুম করেন জলধর দাদা তাই করে খালাস। আপনি বরঞ্চ হরিদাসদার কাছে বইটা নিয়ে যান। পছন্দ হলে ভারতবর্ষে...

ভদ্রলোকের মুখে ম্লান হাসি দেখা গেল। বললেন--ছাপার জন্য নয়। সে অনেককাল ছাপা হয়ে গেছে।

—সমালোচনা? তা সম্পাদকের নামে রেজিস্ট্রি করে এক কপি দু কপি পাঠিয়ে দিলেই ভাল হয়।

—তাও নয়। সমালোচনাও ঢের হয়েছে।

--তবে কি গুরুদাস লাইব্রেরীকে এজেন্সি দেবেন?

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন।

—তাও না।

আমি পা চালাতে সুরু করলাম।

—আর এক মিনিট। নরেন্দ্র দেবকে কি একটু খবর দেবেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর খোঁজ করছিলেন।

যুগপৎ ক্রোধ ও বিরক্তিতে মন ভরে গেল। সকাল বেলায় ভালো পাগলের পাল্লায় পড়লাম যা হোক।

একটু হেসে বললাম--বেশ বেশ তা বলব। আপনার ঠিকানা?

ভদ্রলোক কাছে সরে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন। বরফের মত ঠাণ্ডা। এবার ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। ভাল করে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম।

--মাইকেলই বটে! আমার মূর্ছার উপক্রম হল। কাছাকাছি লোকজন কাউকে দেখলাম না। ভয়ে ও সম্ভ্রমে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বললাম--মাপ করবেন। চিনতে পারিনি। অজান্তে অনেক অশিষ্টতা করেছি।

মাইকেল ম্লান হেসে বললেন--না না রাগ করবো কেন? তুমি তো না জেনে করেছ। জেনে শুনেও অনেকে অনেক অপমান করেছে। সব সয়েছি। রাগ করবার পথ তো আমি রাখিনি।

ভারী লজ্জা হল। কথাটা পালটাবার জন্য বললাম-আপনি কি মেঘনাদ বধের কথা বলছেন?

--হ্যাঁ অনেক পরিশ্রম করে বইটা লিখেছিলাম। কিন্তু কেউ পড়লো না। দেবেনবাবুর ছোট ছেলে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। তাই ভাবছিলাম নরেন্দ্রবাবু যদি ওর একটা অনুবাদ করেন আর হরিদাসবাবু ছবিটবি দিয়ে ছাপেন তাহলে...

অবাক হয়ে বললাম--ওতো বাংলায় লেখা। ওর আবার অনুবাদ?

--বাংলা হলেও বড় শক্ত বাংলা। ছন্দটাও একঘেয়ে অমিত্রাক্ষর। এযুগে একেবারে অচল। তাই বলছিলাম, যদি আজকালকার চটুল ছন্দে...

--মাথা চুলকে বললাম--আমায় যদি অনুমতি করেন

--অগত্যা, চেষ্টা করে দেখ। তবে নরেন্দ্র দেব হলে ভাল হত। মাইকেল দূরে তাঁর কবরটা দেখালেন। তারপর ব্যাস্! কোথায় কি!

তখন সবে বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী বের হয়েছে। নীরদ চৌধুরী বইটি প্রকাশে অগ্রণী হন। প্রথম প্রকাশকালে *শনিবারের চিঠি*-তে বইটির যে বিজ্ঞাপন বের হয়, একালের পাঠকের কাছে সেটি খুবই কৌতূহল-উদ্দীপক।

পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ইহা নিত্য সত্য, অথচ সর্বসাধারণের নিকট বিপরীত মতই সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়--বিজ্ঞজনের বাক্যই সাধারণের এই ভ্রান্তি দূর করিতেছে।

শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত.

বিচিত্রা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত

পথের পাঁচালী (মূল্য ৩)

যে আধুনিক বাংলা উপন্যাস সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই সত্যও ক্রমশ প্রচারিত হইতেছে।

শনিবারের চিঠি ১৩৩৪ সালে মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়। ১৯৩৫ সালে নীরদ চৌধুরীও এতে যোগ দেন। ১৯৩৯-৪৪ এই পাঁচ বছর সম্পাদক হন পরিমল গোস্বামী। কিন্তু সর্বাবস্থায় সজনীকান্ত দাসই ছিলেন পত্রিকাটির প্রাণপুরুষ।

রবিবারের লাঠি ১৩৩৫ / সম্পাদক কেশব সেন

প্রথম সংখ্যায় প্রকাশকের ভূমিকাটি যতটা কৌতূহল উদ্রেক করবে ভিতরে সে অনুপাতে রসের বস্তু তেমন নেই। পত্রিকার নিয়মাবলীতে লেখা হয়েছে--

রবিবারের লাঠি আকস্মিক পত্র। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম যখনই আবশ্যক মনে করিবে তখনই সে আসরে আবির্ভূত হইবে। অসাধু নিশ্চিন্ত হইবেন না। তাহার একবার আবির্ভাবের পর পুনরাবির্ভাবের অন্তরাল এক মাসকাল নাও হইতে পারে।

রবিবারের লাঠি বৎসরে কতবার দেখা দিবে তাহার ঠিক নাই বলিয়া বাৎসরিক চাঁদা গ্রহণ করিবে না।

২য় সংখ্যায় স্বরাজ্য পার্টি নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে মস্করা করা হয়েছে। নামোল্লেখ না করে স্বরাজ্য পার্টির অন্যতম প্রার্থী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে সম্পাদক একচোট নিয়েছেন। মনে রাখা দরকার স্বরাজ্য পার্টির তরুণ প্রার্থী ডাঃ বিধান রায় ডাকসাইটে দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেন।

বঙ্গ মাতা ওয়েলিংটন স্ট্রিট আর ধর্মতলার জংসনে নামিয়া বিধান রায়ের বাড়ি গেলেন।

'সাহেব তখন প্রাতঃরাশ সারিয়া ইলেকসন বোর্ডের দৈনিক মিটিঙে হাজিরা দিবার জন্য গাড়ি জুতিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাতাকে দেখিয়া নমস্কার সারিয়া বলিলেন,--হ্যালো মাদার, আই থিঙ্ক ইউ আর অলরাইট? মা মুচকি হাসিলেন। বাছাধররা যা হইয়া উঠিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অলরাইট থাকা ছাড়া উপায় কি! সাহেব বলিলেন, কি মনে করে মা, তিন মিনিটের বেশি তো সময় নাই। তোমারই কাজে যেতে হবে বুঝলে কিনা।

মা বলিলেন--তোমাদের ইলেকসনের কাজ কি করে আমার কাজ হয় সে তর্ক এই তিন মিনিটেই নয়। কিন্তু বাবা লাজ টাজ নিয়ে কিছু....

ডাগদার বলিলেন, বাই জোভ, তুমি সিবিল ডিসওবিডিয়েন্সের কথা বলছো? সেতো সুভাষ ফিরে না এলে নয়। সতীন সেন কিছু কিছু বলছেন বটে। আর কুমিল্লায় আশ্রমওয়ালারা সোরগোল বাধাবার চেষ্টা করছে সত্য, কিন্তু সুভায না এলে বাংলায় ওসব হবার যো নেই।

তোমরা--

আমরা? পাগল হয়েছ মা? আমি যদি ওসবে ভিড়ি তাহলে রোগীর বোঝা কে নেয়? পিড়িতের, গড সেভ মি, পিড়িতের সেবাও তো কম কাজ নয়! চৌযট্টি টাকা ভিজিটের মধ্যেও এতে গ্লোরি আছে।

বাঃ সাড়ে তিন মিনিট হল।

বলিতে বলিতে ডাক্তার ছুটিয়া বাহির হইলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য পার্টির প্রার্থী তরুণ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে নিয়ে *রবিবারের লাঠি* যে রসিকতাই করুন না কেন, সেবার ১৯২৩ ঝানু রাজনীতিবিদ প্রবীণ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্বাচনে পরাজিত করেছিলেন।

অবতার ১৩৩০

কুলস্ক্যাপ সাইজের দীর্ঘাকার পত্রিকা, নিউজ প্রিন্টে ছাপা, সাপ্তাহিক পত্র। নিয়মাবলীতে লেখা আছে--

অবতারের বার্ষিক বিদায় অর্থাৎ দক্ষিণা ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক সহরে ও মফঃস্বলে দেড়টাকা মাত্র। নগদবিদায় এক পয়সা মাত্র। ব্যঙ্গ-পত্রের নিয়ম মেনে অবতারের শিরোনামে একটি ছবি প্রতি সংখ্যায় মুদ্রিত হত। মাথায় টপহ্যাট পরিহিত এক ভারতীয়ের পরিধানে একদিকে প্যান্ট অন্যদিকে ধুতি। গজপতি বিদ্যাদিগগজ/৫৬ নং সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট-

কলিকাতা। এই গজপতি বিদ্যাদিগগজের আসল নাম অমূল্যচরণ সেন। বাড়ি দক্ষিণেশ্বর। তাঁর পুত্র শিশির সেন আমার অগ্রজ সহকর্মী ছিলেন দৈনিক *লোকসেবক*-এ। লোকমুখে বহুল প্রচারিত হলেও, লিজেন্ডে পরিণত এই পত্রিকার একটি বিখ্যাত গল্প সম্পাদক-পুত্রের মুখ থেকে শুনেছি। *অবতার* পত্রিকায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একটি কার্টুন ছাপা হয়েছিল গুঁপো সরস্বতী শিরোনামে। আশুতোষ এতে বিলক্ষণ চটে যান। সম্পাদক অমূল্যবাবু স্যারের সঙ্গে দেখা করে বলেন, কাগজের প্রচার বৃদ্ধিব জন্য কার্টুন ছাপতে হয় দেশের সেরা ব্যক্তিকে নিয়ে। স্যার আশুতোষ ছাড়া আর দেশে কে আছেন যাকে নিয়ে কার্টুন করা যায়!

স্যার আশুতোষ এই জবাবে এতই খুশি হয়েছিলেন যে, এক বছর পত্রিকা প্রকাশের যাবতীয় খরচ তৎক্ষণাৎ সম্পাদককে দেন। আমরা দশম থেকে দ্বাদশ বর্ষের *অবতার*-এর যেসব সংখ্যা দেখেছি তাতে ভাষার মধ্যে গ্রাম্যতা ছাড়া, সর্বত্রই *অবতার*-সম্পাদক নির্মম সমালোচক ছিলেন। বিজ্ঞাপন প্রচুর থাকার ফলে তাঁকে রাজনীতিবিদদের সঙ্গে সমঝোতা করতে হয়নি।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর কলকাতার মেয়র হয়েছেন সন্তোষ বসু, পেশায় ব্যারিস্টার। দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার জন্য সাধারণের কাছে চাঁদার জন্য আবেদন করায় স্বরাজ্য পার্টির সদস্যদের উদ্দেশে বলেছেন--বাপের স্মৃতি রক্ষার জন্য অপোগণ্ড সন্তানরা পথে ভিক্ষায় নেমেছেন। ছেলেরা তো গরীব নয়। নিজেরা অর্থদান করে দেশবন্ধুর স্মৃতি রক্ষা করলেই পারতেন। পাবলিকের টাকা কেন?'

ব্রিটিশ শাসনের তীব্র বিরোধিতা করে, আন্দামান ফেরৎ বিপ্লবী বারীন ঘোষ রাজনীতি ক্ষেত্রে ডিগবাজি খেয়ে যখন ভারত-বিদ্বেষী ইংরেজ-মালিকের কাগজ *স্টেটসম্যান*-এ লিখতে আরম্ভ করলেন তখন ঐ দেশসেবকের প্রতি *অবতার*-সম্পাদক তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন--

> আলিপুর বোমার মামলার আসামী শ্রীযুক্ত বারীন ঘোষ এইবার শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ রূপে স্টেটসম্যান পত্রে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি কখনো গাহিতেছেন দাদা শ্রী অরবিন্দের প্রশস্তি, কখনো আলোচনা করিতেছেন রাজনীতি। লোকে বলিতেছে, সত্যমিথ্যা জানি না, চৌরঙ্গীর চেরাগে যখন তিনি তৈলদান করিতেছেন তখন যে তিনি তৈলবট না পাইতেছেন এমন নহে। আমরা বারীন ঘোষের স্টেটসম্যানে লেখনী চালনার বিরোধী নহি। তিনি স্টেটসম্যানের অঙ্গ যত ইচ্ছা পারেন ক্ষতবিক্ষত করুন। তাহাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু দোহাই বাবা! খেজুর গাছ তেল হইয়া গিয়াছে বলিয়া ভারতমাতাকে ধরিয়া আর টানাটানি করিও না। ঘুরাইয়া নাক দেখানো ভাল নয়। তাহার চেয়ে সোজা নাকে হাত দিয়া বল এই আমার নাক। ইহা মলিতে হয় মলিব, খৎ দিতে হয় দিব। পেটের কাছে আবার নাক। নাকের ক্ষয় হউক। কিন্তু পেট অক্ষুণ্ন থাকুক। পণ্ডিচেরিতেই থাকি বা বেহালাতেই থাকি, পেট তো সঙ্গেই থাকে। হায় পেট! তুমি নিরাকার হইলে না কেন?

উপরোক্ত তৈলবট শব্দের অর্থ তেলের দাম। বারীনবাবু *স্টেটসম্যান*-এ লেখার জন্য মোটা টাকা পাচ্ছেন এমন একটি রটনা ছিল।

২য় মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্বকালে মহিলা-মহলের অনেকটাই ছিল ঘেরাটোপের মধ্যে। স্ত্রী-স্বাধীনতার সামান্য লক্ষণও অসংখ্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করত সহজেই। প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কায় ইওরোপে স্ত্রী স্বাধীনতার বাঁধনগুলি শিথিল হয়ে গিয়েছিল। লং স্কার্ট ছেড়ে ছোট স্কার্ট পরা শুরু হয়। বিভিন্ন ক্লাবে 'একমাত্র' পুরুষ লেখা নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। মেয়েরা সেই সব ক্লাবে সদস্য হতে শুরু করে। তার ঢেউ এসে লাগে আমাদের দেশে। কিন্তু স্ত্রী

স্বাধীনতার এই নতুন হাওয়া *অবতার* সম্পাদক মেনে নিতে পারেননি। 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা' নাম দিয়ে সমকালীন ঘটনাবলী নিয়ে টিপ্পনি কাটতেন।

> ফুটবলে বলীয়ান বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের নিয়ে এবার মরসুমটা মেতে উঠেছে। খেলার ময়দানে এবার একটা নতুন দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। তরুণীর দলকে ইতিপূর্ব্বে গ্যালারীতে শোভা বর্দ্ধন করতে দেখা যায়নি। ভারত-উদ্ধারের যে আর বিলম্ব নাই তাহা সুনিশ্চিত। অত জনতার ভিতর প্রবেশ করতে গেলে কতটা ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে হয় তা ভুক্তভোগী উত্তমরূপে জানে। নারী-প্রগতি কিন্তু এটাই চায়। পুরুষ ঘেঁসা নারীগণের সাহস দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এই দেখ না, কবে শুনবে, 'অবলা ফুটবল ক্লাব পাঁচ গোলে চার্লি চ্যাপলিন স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে দিয়েছে।' পাশ্চাত্যে নারী প্রকৃতি প্রগতির রাস্তায় চলতে চলতে এমন পরিবর্তিত হয়েছে যে, শুনা যায় সেখানে গুম্‌ফবতীর সংখ্যা প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাচ্ছে।
>
> বিজ্ঞানবিদ বিশেষজ্ঞের মতে মদ্দাটে স্ত্রীগণ মাংস আহার করে বলে তাদের গোঁপদাড়ি গজায়। আবাব কেহ বলেন যে, সন্তানের জন্ম নিরোধ করার ফলে গুঁপে স্ত্রীলোকের আবির্ভাব হয়েছে। সে যাহাই হউক, পুরুষোচিত কার্য করতে করতে যদি বাঙ্গলী মেয়েদের ওষ্ঠাগ্রে গোঁপের রেখা দেখা দেয় তাহলে তাদের সৌন্দর্যের হানি হবে কিনা তৎ সম্পর্কে এসথেটিক কালচার কি বলে তাহা জানা দরকার। এম্নিই তো, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার অবস্থা শোচনীয় ইহার উপর যদি এক পুরুষেব পরে লোমশী কন্যারত্ন কাহারও সংসারে জন্মগ্রহণ করে তাহলে তার বব খুঁজে বার করা অসম্ভব হবে।

বিশ শতকের তিনের দশকে অবিভক্ত বাংলা ভয়াবহ ম্যালেরিয়ার কবলে পড়ে। বহু গ্রাম ম্যালেরিয়ার আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়। এই সময়ের এক করুণ চিত্র অবতারে পাওয়া যাচ্ছে একটি প্যারডি আকারে--

প্রেমময়ী ম্যালেরিয়া

(শ্রী ব্রজবল্লভ রায় লিখিত)

সই! কেবা শুনালে ম্যালেরিয়া নাম!
লেপের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।
না জানি কতই মধু ম্যালেরিয়া নামে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, কি জানি কখন গো,
এসে উপস্থিত একেবারে!
প্রেম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
গুষ্ঠি শুদ্ধ বসে বসে ভেবে সবি মরি গো
হাড় কয়খানা কৈছে রয়।
কোথায় বসতি তা'র নির্ণয় হ'লো না আর,
পিয়ার 'থিয়োরী' কেবা বোঝে?
কত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব পাগল হইয়া গো,
ভিলেজ ড্রেনেজ শুধু খোঁজে।

সেনিটারী ড্রেনগর্ভা মিউনিসিপ্যালিটী গো,
ওয়াটার পাইপে আছে ভরি।
সোনার এ কলকাতা খটখটে বার মাস ;
এখনও আছেন সুন্দরী।।
আদি নাই অন্ত নাই, বিরাজিত সর্ব্ব ঠাঁই
ম্যালেরিয়া মোর যে প্রেয়সী।
জীর্ণ শীর্ণ অবসন্ন বাঙ্গালীর বুকে গো
আছে তার মকরবী মৌরসী।।
কি সঞ্চারী ব্যভিচারী স্থায়ী আদি ভাব গো,
সকল ভাবেই ভাবময়ী।
শান্তি দাস্য সখ্য ভক্তি মধুর বাৎসল্য রসে
পহুঁ যে আমার বিশ্বজয়ী।।
পাসরিতে মনে করি পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়?
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে প্রেমিকের প্রাণ নাশে
পশি ধনি মজ্জায় মজ্জায়।।

সচিত্র ভারত ১৯৩৬–১৯৬১

২০ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট। আর্ট প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রতি সংখ্যা এক আনা। বিদেশে দু-আনা। নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ কর্তৃক প্রকাশিত।

একেবারে প্রথমে সম্পাদক ছিলেন প্রবোধকুমার সমাদ্দার এম-এ এবং পরিমল গোস্বামী এম-এ।

প্রবোধবাবু পাটনায় অধ্যাপনা করতেন। *সচিত্র ভারত*-এর সম্পাদক পদ গ্রহণ করে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। তাঁর ভাই কার্টুনিস্ট প্রমথ সমাদ্দার। প্রথম সংখ্যায় কোনো কার্টুন না থাকায় মনে হয়, এটিকে হাস্যরসাত্মক পত্রিকা করার স্পষ্ট লক্ষ্য ছিল না। প্রথম দিকে অনেক লেখাই সমকালীন নানা সমস্যা নিয়ে। যেহেতু নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রগতিশীল মানুষ ছিলেন, সেজন্য নারী প্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে রচনা নির্বাচন করা হত। প্রমথ সমাদ্দারের কার্টুনই একমাত্র রঙ্গ-রসের পরিচয় দিত। মনে হয়, পরিমল গোস্বামীর প্রভাবেই ধীরে ধীরে *সচিত্র ভারত* রঙ্গ-ব্যঙ্গের দিকে ঝোঁক দেয়। সে সময় বিদেশি সিনেমার স্বর্ণযুগ। মেট্রো গোল্ডেন মেয়ার, টোয়েন্টিয়েথ সেনচুরি ফক্স্ ইত্যাদি সিনেমা পরিবেশকরা প্রবল প্রতাপে ব্যবসা করছেন। তাঁদের বিভিন্ন ছবির স্টিল ফটোগ্রাফ পত্রিকায় অনেকটা স্থান দখল করত। রঙ্গ-ব্যঙ্গের পত্রিকায় সিনেমার ছবি ও তৎসম্পর্কিত নানা রসের সংবাদ *সচিত্র ভারত*-এ একেবারে শেষদিন পর্যন্ত স্থান পেত। এই সব স্টিল ছবি আসত বিজ্ঞাপনের অঙ্গ হিসাবে। নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জির বৈমাত্রেয় ভাই। স্যার রাজেন ভাইকে ভালবাসতেন--ভাই-এর জন্য আর্ট প্রেস তৈরি করে দিয়েছিলেন। প্রথমে *ইন্ডিয়া ম্যাগাজিন* নামে একটি ইংরেজি মাসিক সেখানে প্রকাশিত হত--

যার প্রধান কাজ ছিল ইংরেজদের তোষণ এবং গান্ধিজিকে গালিগালাজ করা। পরে *সচিত্র ভারত* প্রকাশিত হয়। এখানেও ব্রিটিশ শাসনের সামান্য নিন্দাও কখনও করা হয়নি। স্যার রাজেনের ইচ্ছানুসারেই *সচিত্র ভারত*-এ শেষ দিন পর্যন্ত (অরুণ মুখার্জি সম্পাদক থাকা পর্যন্ত) মার্টিন বার্নের বিজ্ঞাপন থাকত মলাটের শেষ পৃষ্ঠায়।

সচিত্র ভারত-র প্রথম দিকে যাঁরা লিখতেন, বেশির ভাগই ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। শ্রীদূরদর্শী, শ্রী চিত্রগুপ্ত, চন্দ্রহাস নামের আড়ালে কারা ছিলেন জানার উপায় নেই। নানা বিষয়ে এঁরা লিখতেন। সবই সামাজিক সমস্যা। কিন্তু রঙ্গরসের কোন স্পর্শ সেখানে নেই। প্রথম কয়েকটি সংখ্যার পর প্রমথ সমাদ্দারের কার্টুন ছাপা শুরু হয়।

প্রথম থেকেই *সচিত্র ভারত*-এর পূজা সংখ্যা খুব জনপ্রিয় হয়। কে নেই এই পত্রিকার লেখক তালিকায়। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, সজনীকান্ত দাস, প্রমথনাথ বিশী, আশু দে, পরিমল গোস্বামী, প্রভাতকিরণ বসু ইত্যাদি সেকালের দিকপাল লেখকদের সবাই হাজির। পূজা সংখ্যার আকৃতিতে বেশ স্থূলবপু হলেও দাম ছিল মাত্র দু-আনা। পূজা সংখ্যার দাম কম হওয়ায়, এবং বিষয়বস্তুতে হাস্যরসের প্রাধান্য থাকায়, সেই যুদ্ধের বাজারে (কারও মুখে সে সময় হাসি ছিল না) খুব বিক্রি হত। *সচিত্র ভারত*-এ নানা ধরনের বিজ্ঞাপন বেরত। সি-কে সেনের জবাকুসুম তেলকে আমরা সবাই জানি কেশবর্দ্ধক সাধারণ তেল। বাজারে আরও বহু তেল ছিল। জবাকুসুম সবাইকে টেক্কা দেবার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিল কেশবর্ধক ও মানসিক রোগ নিরাময়কারী। *সচিত্র ভারত*-এ চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে অ-কু-রা (অধীর কুমার রাহা) বিখ্যাত হাসির গল্পের অনুবাদক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সিফেন লিকক, জেমস থারবার ওডহাউস ইত্যাদির সফল অনুবাদক ছিলেন তিনি।

অচলপত্র ১৯৪৮

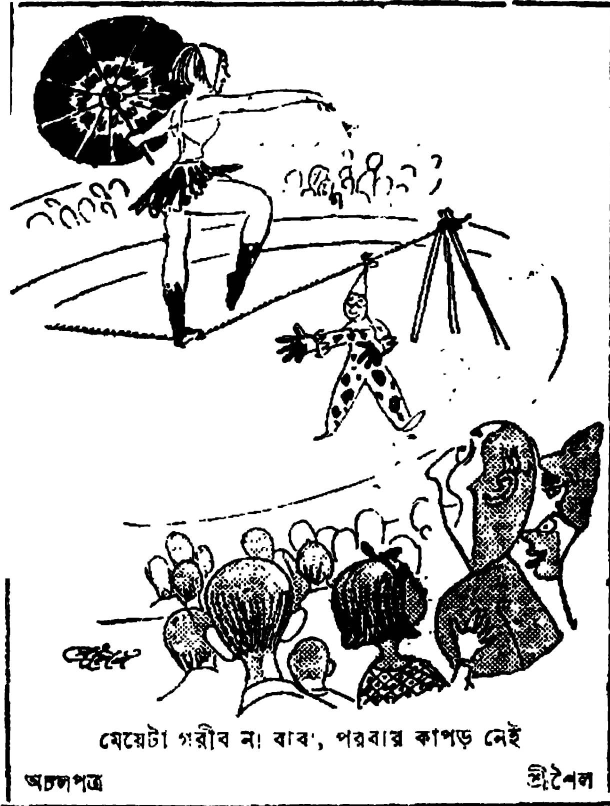
সম্পাদক-দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল। ২৭ সি চক্রবেড়ে (নর্থ) থেকে প্রকাশিত। দাম ছয় আনা ১৯৪৮ সালে কিছুদিন মাসিক হিসাবে প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১৯৬১-৬৬ পর্যন্ত দীপ্তেন্দ্র এটি সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশ করেন। তাঁর অকালমৃত্যুর পর স্ত্রী ১৯৭১ পর্যন্ত চালান। রঙ্গব্যঙ্গের পত্রিকাগুলির সাফল্য নির্ভর করে সম্পাদকের টিম পরিচালনার দক্ষতার উপর। *শনিবারের চিঠি*-র টিম পরিচালক যেমন সজনীকান্ত দাস, দীপ্তেন সেই ক্যাপটেনের ভূমিকা পালন করেছিলেন *অচলপত্র*-এ। রঙ্গব্যঙ্গ পত্রিকাগুলি ডাকযোগে প্রেরিত রচনাদির ওপর নির্ভর ক'রে চলে না। কে কি লিখবে, কতটুকু লিখবে, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করা হবে--এসব সম্পাদক আগে থেকে ঠিক করেন। দীপ্তেন হিউমার ও স্যাটায়ার দুটোই বুঝতেন, সেজন্য সরাসরি তাঁর তীরন্দাজীর দক্ষতা যারা স্বীকার করতেন না, তারাও আড়ালে ভয় করতেন। তাঁর জীবদ্দশায় এমন ফিল্ম ডিরেক্টর কেউ ছিলেন না যিনি দীপ্তেনের ধারালো কলমকে ভয় করতেন না।

দীপ্তেনের বাবা সুধীরেন্দ্র সান্যাল ছিলেন ইংরেজিতে সুদক্ষ, একাধিক বিদেশি সিনেমা কোম্পানির পাবলিসিটি অফিসার। সেই সুবাদে দীপ্তেন প্রচার-কৌশল যেমন বুঝতেন, তেমনি বিদেশি সাহিত্যে প্রচুর পড়াশোনা তাঁর রচনাকে করেছিল ঋদ্ধ।

মাসিক অচলপত্র ও *সাপ্তাহিক অচলপত্র*-এর টিম ছিল একই, সম্পাদকের সেই

আপোষবিরোধী মনোভাবও ছিল অপরিবর্তিত। *অচলপত্র* নামটিই যথেষ্ট কৌতুকময়। সাপ্তাহিকে প্রতি সংখ্যার টাইটেলে বিজ্ঞাপন থাকত—বড়োদের পড়বার ও ছেলেদের দুধ গরম করবার একমাত্র মাসিক।

কোনো রকম রাখঢাক নেই। সম্পাদকের স্পষ্ট ঘোষণা—*অচলপত্র* নিছক ব্যঙ্গ বা হাসির পত্রিকা নয়। এর সঙ্গে যথেষ্ট চিন্তার খোরাকও আছে। সে চিন্তা হল, কি করে যথেষ্ট বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়।



অচলপত্রে প্রকাশিত ব্যঙ্গচিত্র

বিজ্ঞাপনের উদার দাক্ষিণ্য কোনোদিনই তিনি পাননি। একই সময়ে জন্মানো দিল্লির *শংকরস উইকলি* যেখানে নিরন্তর নেহরু-তোষণ করে ভারত সরকারের সব ধরনের বিজ্ঞাপনে সমৃদ্ধ হয়েছিল, সেক্ষেত্রে দীপেন বড় বেশি পরিমাণে নেহরুর নিন্দায় নেমেছিলেন। তাঁর নেহরু বিরোধিতার একটু নমুনা দিই।

—তাঁর বংশগত উপাধি যেটা তার মানে হোলো যে 'নহর' অর্থাৎ খাল কাটে। সে নামের সভ্যতা

ক্রমশ প্রতিপন্ন হচ্ছে আমাদের দেশে। তিনি শুধু খাল কাটছেন না, সেই খাল দিয়ে নিয়ে আসছেন একটি কুমির। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিভাষায় যার নাম মার্কিন ধনতন্ত্র।

অচলপত্র-এর ফিচারগুলি ছিল খুব বুদ্ধিদীপ্ত। তিনটে-ছটা-নটা (সিনেমা) চিঠিপত্রের জঞ্জাল (চিঠি) পড়বার সময় পাঁচ মিনিট, এ মাসের স্পেশাল, বঙ্কিম কটাক্ষ, সাহিত্য-দুঃসংবাদ ইত্যাদি। এতগুলি ফিচার লেখার জন্য। তাঁর হাতে তৈরি একটি টিম ছিল যাঁরা হিউমার বুঝতেন।

দীপ্তেন যা বিশ্বাস করতেন অকপটে সেটা লিখতেন। বিখ্যাত অখ্যাত ভেদাভেদ তিনি মানতেন না। সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় সিনেমায় রূপান্তরিত করলেন চারুলতা নামে। সত্যজিৎ সে সময় ভারতীয় চলচ্চিত্রে এক নম্বর সেলিব্রিটি। কিন্তু দীপ্তেনও এক নম্বর সমালোচক। দুজনে পরস্পরকে চিনতেন। কিন্তু দীপ্তেন নিজের বিশ্বাস ব্যক্ত করতেন অকপটে।

> —বেশ কয়েক বছর আগে। বংকিমের চন্দ্রশেখরের চলচ্চিত্ররূপে অদলবদল করার জন্য জনৈক চিত্রপরিচালক সেনসার্ড হয়েছিলেন। সত্যজিৎ তার থেকে গুরুতর অপরাধ করেও তা হবেন না। একথা সবচেয়ে আগে যিনি জানেন তিনিই চারুলতার স্রষ্টা। বিশ্বপুরস্কারই সব চেয়ে বড বাধা। সত্যজিৎ সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে চায় না ভয়ে, কারণ, কি জানি বাবা, যদি এ ছবিও বাজি মেরে দেয় ক্যানে অথবা বের্লিনে কিংবা মস্কোয়। সত্যজিৎ তাই যা ইচ্ছা তাই করেন। এবং আমরা যা ইচ্ছা তা করি না। একটি মানুষও যদি আজ এদেশে থাকতো, সবাই যদি মেয়েমানুষ না হয়ে যেত, তাহলে সত্যজিৎ নষ্টনীড়কে চারুলতা করবার আগে বেটার সেন্স প্রিভেল করত। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়কে হিন্দী জালজালায় অপরূপান্তরিত হতে বাধা দেননি। এখন চারুলতা সম্পর্কেও একটি কথা বলবে, এ আশা তামাসা ছাড়া কিছু নয়। বিশ্বভারতী আজ নিঃস্বভারতীতে পরিণত।

অচলপত্র-এর প্রচার সংখ্যা সমকালীন অন্যান্য কিছু পত্রিকার তুলনায় অবশ্যই কম ছিল। কিন্তু সাহিত্যিক চিত্র-পরিচালক এমন কি বড় বাড়ির বড় সাপ্তাহিকের সম্পাদক ঠোঁটকাটা অপ্রিয় সত্যভাষী দীপ্তেন সান্যালের মতামত পড়ার জন্য আশংকা নিয়ে বসে থাকেন।

উত্তরকালে দীপ্তেনের বন্ধু মহলের সর্বাধিক খ্যাতিমান সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী। রমাপদ তখন *ইদানীং* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তাতেও রঙ্গরসের প্রাধান্য ছিল। *অচলপত্র*-এর তৃতীয় বছরে রমাপদর 'অন্বেষণ' নামে বড় গল্প দু কিস্তিতে ছাপা হয়। প্রথম দিকে দীপ্তেনের আবিষ্কার আরও দুই লেখক—স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেন্দ্রনাথ রায়। এছাড়া বারীন্দ্রনাথ দাস ও নারায়ণ দাস শর্মা তো তাঁর দুটো হাত।

অচলপত্র প্রকাশ কালে রেডিও ছিল গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়া। তাকে অবাধ ছাড়পত্র দিতে সম্পাদক রাজী নন। '৩৭০.৪ মিটার' নামক একটি ফিচারে রেডিওর সমালোচনা শুরু হয়েছিল। সে সময় গৃহিণীরা দুপুরে রেডিও শুনতেন। জনমত গঠনেও রেডিওর ভূমিকা ছিল।

রেডিও সমালোচনার নমুনা

গত ৮ই জানুয়ারী ২৩শে পৌষ সন ১৩৫৭...বেতার কেন্দ্রের ডাইরেক্ট এ্যাকসন ডে মহা ধুমধামে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করিয়াছেন ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমান আর আর দিবাকর। বাণীবদ্ধ ভাষণ শুনাইয়াছেন সর্বঘটের

বিশ্বদল বম বম বাবা (কৈলাসনাথ) পঞ্চাশ কিলোওয়াট শক্তি সমন্বিত ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মাঝারি তরঙ্গ-প্রেরক বেতার-যন্ত্র বসিয়াছে ঐদিন। কিম্ অতঃ পরম্। এখন হইতে মাস কিলিং চলিবে। দূর দূরান্তে যাহারা এতদিন পিতৃদত্ত কান লইয়া সুখে দুঃখে দিন গুজরান করিতেছিলেন—কলিকাতা বেতারের অনুষ্ঠান ভালভাবে শুনিতে পাইতেন না—এখন হইতে তাঁহারাও আর রেহাই পাইবেন না। তাঁহাদের কান কাটা যাইবে।



অচলপত্রে প্রকাশিত আরেকটি ব্যঙ্গচিত্র

অচলপত্র-এর একটি মজার ফিচার (যেটা দীপ্তেনের উদ্ভট মস্তিষ্ক প্রসূত)--আজিকে হয়েছে শান্তি। কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি নিজ জীবদ্দশাতেই তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা লিখে যাবেন। পাহাড়ী সান্যাল লিখেছেন তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনাবলী। জীবিত অবস্থাতেই।

'ব্যাটার ছেলে মারা গেল।' পাহাড়ী সান্যালের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হওয়ার পর তার নশ্বর বপুটিকে দেখে প্রথম যে উক্তিটি করলে তা হল ঐ—ব্যাটার ছেলে মারা গেল।

'কে কে শবানুগমন করছে দেখা যাক, এবং কার কার মনের ভাব কি রকম?' পাহাড়ী সান্যাল অর্থাৎ আমি আমার সন্ধানী দৃষ্টি চালিয়ে দেখতে লাগলাম।

অভিনেত্রী এসেছে অনেক। এদের মুখে বিষাদের চিহ্ন। অভিনেতারাও মলিন মুখে দাঁড়িয়ে। কিন্তু আমার যেন মনে হল, আমার অর্থাৎ পাহাড়ী সান্যালের মনে হল, একজনের কন্ট্রাক্ট গেল। এবার তাদের মধ্যে ভাগাভাগি হবার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় তারা যেন একটু খুসি খুসি। দীপ্তেন সান্যালকে দেখলাম আমার চিতায় শোয়ানো শরীরটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখছে সত্যি মারা গেছি কিনা। বেটার ছেলে বারেন্দ্র! একজনকে দেখছি না কেন? আমি শ্মশান ছেড়ে পৌঁছলাম ১৭ নং রোলাণ্ড রোডে মোবিলিটি লিমিটেডে।

—কমল তুই যাবি না ভাই, পাহাড়ী মারা গেছে।

কমল দে মাথা না তুলেই বল্লে—তোরা যা আমি এখুনি আসছি। আমি দেখলাম, কমল বিল্বপত্তর ঘাঁটছে। আমার মারা যাবার দিনে কমলের কাজ! আমি ক্ষুণ্ণ হলাম ফিরে আসছি। কানে এল কমলের আর্তনাদ :

—'এ্যাঁ! পাহাড়ী সাড়ে তিনহাজার টাকা বিল বাকী রেখে সট্‌কেছে।

মারা গিয়ে সেই প্রথম হাসলাম আমি।

অচলপত্র-এ কুমার অজিত, ভাদুভাই, রবীন ইত্যাদি অনেকেই কার্টুন করেছেন। কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে শৈল চক্রবর্তী গতানুগতিক কার্টুনকে উচ্চমানে তুলেছিলেন।

যষ্টিমধু (১৯৫১-১৯৭৫)

যষ্টিমধু একক উদ্যোগে পরিচালিত দীর্ঘজীবী রঙ্গ-পত্রিকা। সম্পাদক কুমারেশ ঘোষের প্রধান কৃতিত্ব এখানেই যে, তখন *শনিবারের চিঠি*-র মত বহুল প্রচারিত দাপুটে মাসিক পত্রিকা (যার অর্থ ও লেখক গোষ্ঠী ঈর্ষা করার মত) মধ্যগগনে বিরাজিত, তাকে উপেক্ষা করে নিজের স্বতন্ত্র গোষ্ঠী তৈরি করা সে সময় এক দুঃসাধ্য কাজ ছিল। হাসির পত্রিকার লেখক সংখ্যা চিরদিনই খুব কম। সেরা লেখকেরা শনিচক্রের সদস্য। কুমারেশ ঘোষ লেখক গোষ্ঠী তৈরি করে নিয়েছিলেন। কার্টুনিস্টদের উৎসাহ দিয়ে আইডিয়া দিয়ে গড়ে নিয়েছিলেন। প্রতি রবিবার সকালে গড়পার রোডে কুমারেশ বাবুর বাড়িতে চা-মুড়ির অবারিত আড্ডায় রসচর্চার যে স্রোত বয়ে যেত, সেখানেই মুখে মুখে তৈরি হয়ে যেত আগামী সংখ্যার বিষয়বস্তু। ইংরেজি সাল ১৯৫১-তে *যষ্টিমধু* প্রথম প্রকাশিত হয় এবং পঁচিশ বছর একাদিক্রমে চলার পর বার্ধক্য জনিত কারণে সবাইকে জানিয়ে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন। এ সময় অন্য দশজন বৃদ্ধের মত কুমারেশবাবুও ধর্মচর্চায় প্রবৃত্ত হন এবং চৈতন্যচরিতামৃতর সরল গদ্যানুবাদে লিপ্ত হন। *যষ্টিমধু*-র রঙ্গব্যঙ্গ বৃদ্ধ বয়সের পক্ষে বেমানান। হয়তো সেজন্যও পত্রিকাটি বন্ধ করেছিলেন। *যষ্টিমধু*-তে হাত দেবার আগে কিশোর বয়সেই *চাবুক* ও *সম্মার্জনী* নামে দুটি পত্রিকা তিনি প্রকাশ করেন। *যষ্টিমধু* প্রকাশের সময় একেবারে প্রথম সংখ্যার মুখবন্ধে লিখেছিলেন—

—ঔষধ হিসাবে যষ্টিমধু উপকারী। আরও জানতাম বার্ধক্যে সহায় যষ্টি এবং যৌবনে অপরিহার্য্য মধু। কিন্তু যষ্টি ও মধু একত্রে যে মহোপকারী তাহা তো জানিতাম না। তাই এক হাতে যষ্টি ও আর এক হাতে মধু লইয়া আমাদের এই অভিযান। নববর্ষে আমাদের যাত্রা হল সুরু। দেড় ফর্মা অর্থাৎ ২৪ পাতার এই ছোট পত্রিকার দাম মাত্র ১০ পয়সা। বার্ষিক চাঁদা এক টাকা ৭৫ পয়সা।

যষ্টিমধু-র দীর্ঘ যাত্রাপথে সমকালীন সব বিখ্যাত রসসাহিত্যিক লিখেছেন এবং সব খ্যাতিমান কার্টুনিস্ট ছবি এঁকেছেন। খ্যাতিমান ছাড়াও কুমারেশবাবু বহু প্রতিশ্রুতিবান

লেখককে তুলে ধরেছেন। অখ্যাত কার্টুনিস্টদের বিখ্যাত করেছেন দাদাঠাকুর, পরশুরাম, বনফুল, শিবরাম, পরিমল, প্রনাবি, যমদত্ত, সজনীকান্ত, অকৃব, প্রবুদ্ধ কে নেই সেই তালিকায়। কাফি খাঁ, প্রমথ, রেবতী, শৈল, চণ্ডী, সুকুমার ছাড়াও *যষ্টিমধু*-র একান্তই নিজস্ব ওমিও নিয়মিত কার্টুন করেছেন। দীর্ঘ যাত্রাপথে সাধারণ সংখ্যা ছাড়াও *যষ্টিমধু*-র বহু স্পেশাল সংখ্যা বের হয়েছে। প্রায় শুরু থেকেই বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সম্পাদক কুমারেশ ঘোষের দক্ষিণ হস্ত। উত্তরকালে সাহিত্য পরিষদের দক্ষ কর্মী বিশ্বনাথবাবু রবীন্দ্র সংখ্যা, প্যারডি সংখ্যা, সেকালের রঙ্গব্যঙ্গ চর্চা, একালের রঙ্গ ব্যঙ্গ চর্চা, সেকালের কার্টুন একালের কার্টুন, স্বদেশী বিচিত্রা, বিদেশী বিচিত্রা, হাসির গান ইত্যাদি প্রকাশনে কুমারেশ বাবুকে সাহায্য করেন। আজও এই সব বিশেষ সংখ্যা আকর গ্রন্থ রূপে আদৃত।

শনিবারের চিঠি-র আড্ডা দূর থেকে দেখেছি। বড়ই আভিজাত্য মণ্ডিত ব্যাপার--প্রবেশাধিকারও সীমাবদ্ধ। কিন্তু *যষ্টিমধু*-র আড্ডা, ছোটো বড়ো ভেদ নেই। খ্যাত-অখ্যাত নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই, খাদ্যবস্তুতেও মুড়ি তেলেভাজার অধিক কোন দাবিও কারও মনে আসেনি। আলোচ্য-বিষয়ের বৈচিত্র্য ছিল। "মেয়েদের মাথায় খোঁপায় মোজা গোঁজা হয় কেন" থেকে শুরু করে 'ষাঁড়ের ডাকে সত্যিই কি প্রেমের রস থাকে?'--তা নিয়ে তুমুল বিতর্ক। বর্তমান কলমচি নিজ অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, নতুন প্রতিভা খুঁজে তাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার ব্যাপারে কুমারেশ ঘোষের আন্তরিকতা পঞ্চাশ বছর আগে প্রায় কিংবদন্তীতে দাঁড়িয়েছিল। সজনীকান্ত দাস *শনিবারের চিঠি* প্রকাশ করতে গিয়ে বনফুল, শরদিন্দু, পরিমল গোস্বামী, অজিতকৃষ্ণ বসু, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ইত্যাদি রেডিমেড লেখকদের পেয়েছিলেন। এদের কেউ সজনীবাবুর দ্বারা সৃষ্ট হননি। কুমারেশবাবু শুরু থেকেই অখ্যাতদের নিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। পারিবারিক ব্যবসা ওরিয়েন্টাল মেসিনারি, কিন্তু সেই কোম্পানি থেকে যষ্টিমধুর জন্য কোনো টাকা নেননি, এমন কি দুঃসময়েও। বাবা মন্মথ ঘোষ স্বদেশিযুগে যশোরের চিরুণীকে শিল্প সম্মত রূপ দিয়ে বিদেশি চিরুণীর আমদানি বন্ধ করেছিলেন। একদিকে একটি হাসির কাগজ, অন্যদিকে পিতৃসূত্রে পাওয়া স্বদেশি শিল্পের পুনরুজ্জীবন--এই দুই ভিন্ন মাত্রিক ব্যাপারের মধ্যে সামঞ্জস্য এনে চলতে হয়েছে তাঁকে।

যষ্টিমধু-র প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৯ বৈশাখ মাসে। হেড পিসের নিচেই লেখা

যষ্টি মধুর
তিক্ত মধুর
খেল হয়েছে সুরু
আনন্দে কেউ হাসবে। কারোর
বক্ষ দুরু দুরু।

বৈশাখে বর্ষ শুরু। আবির্ভাব প্রতি মাসে। দাম মাত্র দশ পয়সা। মিঠে কড়া লেখা চাই। প্রথম কয়েকটি সংখ্যায় কোন কার্টুন ছাপা হয়নি। পরে অনেকেই ভিড় জমিয়েছেন। অনেক আকর্ষণীয় ফিচার ছিল *যষ্টিমধু*-তে। সম্পাদকের নিজের কলমের নাম ছিল যমস। এ-ছাড়াই বিখ্যাত-অখ্যাত বই নিয়ে সমালোচনা--বই বই বাঈ। চিঠি চাপাটি সম্পাদকীয় টিপ্পনির নমুনা--

আলিপুরের টাকশালের উদ্বোধন উপলক্ষে অধ্যক্ষ মেজর প্যাট্রিজ বলেছেন বর্তমানে এক পয়সার প্রচুর চাহিদা আছে।

—থাকবেই তো। এখানে ভিখারীর সংখ্যাও যে প্রচুর। তাছাড়া ছেঁদা পয়সা ওয়াশারের কাজ করে।

কিঞ্জল ১৯৭৮

সম্পাদক চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১১৬ লালমোহন ভট্টাচার্য রোড কলিকাতা ৭০০ ০১৪ প্রতি বৎসর একটি বিশেষ সংখ্যা।

১৯৭৮ সালে *কিঞ্জল* যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, সম্পাদক চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন বয়সে তরুণ। কলেজের ছাত্র। সাহিত্য-ব্যাধিতে সেই বয়সে অনেকেই ভোগে ও কবিতা লিখতে শুরু করে। চন্দ্রনাথ একটি নতুন ধরনের পত্রিকা প্রকাশ করলেন সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে। তাঁর পিতৃপরিচয় উল্লেখ করবার মত। বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সত্যজিৎ রায়ের একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। আড্ডাবাজ মানুষ, সঙ্গীত ও সাহিত্যে নিবেদিতপ্রাণ। তাঁর নিজের লাইব্রেরি এক দুর্লভ সংগ্রহ। বিমলবাবুর প্রত্যক্ষ আমন্ত্রণে কার্টুনিষ্ট সম্মেলন হয়েছিল তাঁরই বাড়ির বিরাট আঙিনায়—সতরঞ্জি ফরাস তাকিয়া বিছিয়ে। সম্ভবত *কিঞ্জল* এই আড্ডা থেকেই প্রকাশিত হয়। পূর্ব কলকাতা সংস্কৃতি সম্মেলনের মধ্যমণিও ছিলেন বিমলচন্দ্র। সঙ্গীত ও সাহিত্যের এরকম গঙ্গা-যমুনা সম্মেলন খুব কম ক্ষেত্রে ঘটেছে।

কিঞ্জল বিজ্ঞাপন-বঞ্চিত পত্রিকা। সবটাই বন্ধুদের অনুদানে চলে। বৎসরে অর্থের আনুকূল্য অনুসারে কখনও সাধারণত দুটি, কখনও তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। *কিঞ্জল*-এর বৈশিষ্ট্য হল, এদের অভিনব বিশেষ সংখ্যাগুলি। এদের Cartoon Calcutta নামক কার্টুন সংগ্রহ যারা সংগ্রহ করেছিলেন প্রকাশকালে (১৯৯০), তাঁরা ভাগ্যবান। এই সংখ্যাটি পরবর্তীকালে অনেক চেষ্টা করেও পাইনি। নারায়ণ গাঙ্গুলির বিখ্যাত চরিত্র টেনিদাকে নিয়ে যে বিশেষ সংখ্যা হয়েছিল, সেটি প্রকৃত টেনিদার নাম, পটলডাঙ্গার বাসার ঠিকানা, আসল স্বভাব কেমন, লেখার আদলে চেহারা আছে কিনা ইত্যাদি নিয়ে বিশদ আলোচনা। দেখা গেল, সত্যিই বাস্তবে একজন টেনিদা আছেন, যার চরিত্র অনুসরণ করেছিলেন নারায়ণ বাবু।

ছড়াকার এবং কার্টুনিস্টদের সাহায্যে প্রকাশিত হয়েছিল ব্যঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথ—বইমেলায় আগমন মাত্র সব সংখ্যা শেষ। কিঞ্জলের চণ্ডী লাহিড়ী, অমল চক্রবর্তী এবং বর্ষীয়ান শৈল চক্রবর্তী সংখ্যায় এই ত্রয়ী ব্যঙ্গচিত্রীর বহু ঘনিষ্ঠ খবর পাওয়া যায়। এ ধরনের উদ্যোগ এরাই প্রথম নিয়েছিল। এছাড়াও খাইবার পাস সংখ্যা, প্যারডি সংখ্যা, চুম্বন সংখ্যা প্রত্যেকটি যেন জঙ্গিদের হাতে বারুদ ঠাসা মেসিন গান।

কিঞ্জল-এর সবচেয়ে মজার সংখ্যা 'আপনার ঢাক আপুনি পেটাও'। গোটা দুনিয়াটাই চলছে প্রচারের ওপর। যে যত শূন্যগর্ভ, তার আওয়াজ তত বেশি। নিজের ঢাক নিজে না পেটালে কেউ যে তোমাকে তুলে ধরবে, তোমার নিহিত গুণাবলী অন্যের কাছে প্রচার করবে—আজকের যুগে সে রকম নিঃস্বার্থ মানুষ মেলে না। অতএব নিজের ঢাক নিজে পেটানোই ভাল। এবং সেটা এখনই। ১৯৭৮ সালে *কিঞ্জল*-এর ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলির একটি সার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। রঙ্গ-ব্যঙ্গ রচনায় দক্ষা শ্রীমতী নবনীতা দেবসেনের রচনাটি আপনার ঢাক আপুনি পেটাও সংখ্যা থেকে পুনরুদ্ধার করছি

স্নেহের চাঁদুকে অতি বিব্রত নবনীতাদির ঢক্কা নিনাদীয় বিশদ ব্যাখ্যা ও টিকা টিপ্পনী

নিজের ঢাক নিজে পেটাবো? বলিস কিরে চাঁদু? তাহলে তোরা আছিস কি করতে? আমি নিজেই একাজে হাত লাগালে আমার শত্তুরই বল, আর বন্ধুই বল (ওই তো একই হলো) তাদের যে একেবারে বেকার করে দেওয়া হবে রে। লোকে লিখবেই বা কি, বলবেই বা কী! এই তো ধর না, সুমিতাদি (গাঙ্গুলি) সেদিন বম্বে থেকে এসে রাগে গরগর করছেন। আমার কে এক বন্ধু তাঁকে বম্বেতে বলেছে--নবনীতার চেহারাটা কেমন গাঁট্টাগোঁট্টা দেখেছেন? ওই কি বিরহিনী নারীর চেহারা? একটুও দুঃখী দুঃখী বুড়ি বুড়ি না হয়ে দিব্যি খুকি খুকি ভাবখানা বজায় রেখে নেচেকুঁদে বেড়াচ্ছে। ও কি অম্নি হয়? ওর যে একটা দারুণ প্রাইভেট লাইফ আছে। শুনে সুমিতাদি রেগেই ফুটিফাটা। ওঁর আবার ও সব প্রাইভেট লাইফ টাইপ মোটেই পছন্দ নয়।

তক্ষুণি ভীষণ ঝগড়া করে বললেন, আমি বুঝি নবনীতার প্রাইভেট লাইফ জানি না। ওর লাইফ তো একটা ওপন বুক। with friends like those you do not need enemies সত্যি বলতে কি, সাদা বাংলায় কোনটাই খুব ভাল কথা নয। আর নিজের ঢাক? কবিতা মাত্রই তো তাই। নারে? আর আমার হাসির গল্পগুলো সবই তো তাই। সবই তো নিজের কথা। নিজের মা, নিজের মেয়েরা, নিজের কচি কাঁচা পুষ্যির দলবল, মায় বেড়াল কুকুর কাক পায়রা। কেউ বাদ যায় না। আরও কত ঢাক পেটাব? আমি কি মার্গারেট থ্যাচার? নাকি এলিজাবেথ টেলর? আমার কথা লোকে পড়বে কেন? তবে হ্যাঁ, অনেক ভবিষ্যৎ ঢাকী বেডি করে রেখেছি রে চাঁদু--বছর বছর ছাত্রছাত্রী বেরুচ্চে না? তাদের মুখ চাপা দেবো কেমন করে? স্বমুখে আমি যতই 'তারায়' গাইতে চাই না কেন, তারা উদারায় গেয়ে দিলে তো কিছু করার নেই? কি বল? গর্ভের সন্তান আর ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের ঠেকানো যাবেই না। তারা বুকের ভিতর থেকে সত্যিটাকে টেনে আনে। তাকে তুমি যাই বাজাও। তাচ্চে কাঁসিই ভালো। অর্থাৎ এই কাংস্যকণ্ঠে যদ্দুর যা চেঁচানো যায়--নিজের ঢক্কা বাদ দিয়ে।

কিঞ্জল ফিচার-ভিত্তিক পত্রিকা নয়। বিষয় ভিত্তিক। তার ফলে তাঁকে সরাসরি নির্ভর করতে হয়েছে অভিজ্ঞ লেখকদের ওপর। নিজস্ব গোষ্ঠী থাকার সুবিধা আছে। তাঁরা প্রয়োজনে দু-চারপাতা লিখে পাতা ভরাট করে দিতে পারে। বিষয়ভিত্তিক পত্রিকা স্পেশালিস্টদের ব্যাপার। আর একটি ব্যাপার--একটি বিশেষ সংখ্যা বের করার পিছনে সারা বছরের পরিশ্রম, প্রচুর গবেষণা, এবং কে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এটা জানা দরকার। পরিশ্রমসাপেক্ষ ও অধ্যবসায় নির্ভর বলেই সারা বছরে একটি মাত্র সংখ্যা বের করা যায়। সীমাবদ্ধ পাঠক, ততোধিক সীমাবদ্ধ অর্থের বরাদ্দ, সবচেয়ে সীমাবদ্ধ কার্টুনিস্ট ও রঙ্গ-ব্যঙ্গ লেখকদের সংখ্যা--এত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও *কিঞ্জল* ২৫ বছর নিষ্ঠার সঙ্গে পার করেছে।

ব্যঙ্গমা ১৯৮০

শুরুতে সব পত্রিকাই ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। অনেক সময় সমমনস্ক কয়েকজন পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। পত্রিকার নীতি নির্ধারণ ও বিষয়বস্তু নির্বাচনেও যৌথ চিন্তাধারার প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমে পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। কালক্রমে পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। পত্রিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে আড্ডা কেন্দ্রিক। *কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, পূর্বাশা*--সবারই মূলে একটি করে আড্ডা গড়ে উঠেছিল। আগে পত্রিকা, পরে তাকে কেন্দ্র করে একটি আড্ডা। পত্রিকার চরিত্রবৈশিষ্ট্য অনুসারে আড্ডারও চরিত্রবৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে।

এর ব্যতিক্রম হল *ব্যঙ্গমা*। *ব্যঙ্গমা* শুরু হয়েছিল রঙ্গ-ব্যঙ্গ রসিকদের আড্ডা দিয়ে। পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে বছরে মাত্র একটি। রঙ্গ-ব্যঙ্গ চর্চার অদম্য বাসনায় অজিত কৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব ছদ্মনামে বেশি পরিচিত) তাঁর টালিগঞ্জের বাড়িতে হাসির গল্প, কবিতা, ছড়ার লেখকদের

নিজ গৃহে ডাকেন। আপ্যায়ন করেন তাদের। পিছনে সংগঠক হিসেবে কাজ করেন ইনজিনিয়ার, ছড়াকার, ম্যাজিসিয়ান দিগম্বর দাশগুপ্ত। বেশ কিছুদিন হাস্যরসে রসিক সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই আড্ডায় মেলামেশার পর ঠিক করলেন বার্ষিক সংকলন প্রকাশ করবেন। সেই শুরু।—২০০৫-এ *ব্যঙ্গমা*-র বৈঠক ও সংকলন ২৫ বছরে পা রাখবে।

ব্যঙ্গমা-র বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়েছে। আড্ডাবাজদের প্রায় কেউই লেখক নয়। রস-সাহিত্যিক হিসাবে কোনো পরিচিতিও নেই। কিন্তু ঘরে-বাইরে জীবন সংগ্রামে নিত্যপিষ্ট হবার যে অভিজ্ঞতা থেকে রঙ্গ-ব্যঙ্গের রস নিষ্কাশিত হয়, সেই মানসিক চাপ সবাই ভোগ করেছেন। টেনসন কমাবার জন্য রঙ্গব্যঙ্গই তো প্রধান টনিক। সেজন্য বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, ইনজিনিয়ার, যাদুকর, সাংসদ, সরকারি আমলা সবাই এসেছেন আড্ডায়। সবাই নিজ নিজ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা আড্ডায় বর্ণনা করেছেন। পরে যে-সব লেখা হয়েছে।

আড্ডার মধ্যমণি অজিতকৃষ্ণ বসু বহুগুণের আধার ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন, বিজ্ঞাপনের কপি লিখেছেন, বড় মাপের ওস্তাদের কাছে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের তালিম নিয়েছেন এবং ইন্দ্রজালের ওপর বই লিখে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নরসিং দাস পুরস্কার পেয়েছেন। এহেন বহু বিদ্যাপারঙ্গম মানুষের আহ্বানে ব্যঙ্গমার বৈঠকে নানা স্রোতের জ্ঞানী-গুণীদের ভিড় জমবে এটা স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের মানুষ উপাচার্য সুশীল মুখোপাধ্যায়, আইনের মানুষ ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, রাজনীতির অঙ্গন থেকে সাংসদ কৃষ্ণা বসু, এবং বহু বিখ্যাত যাদুকর *ব্যঙ্গমা*-র অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। *ব্যঙ্গমা*-র হাস্যরসে জারিত বার্ষিকীগুলির বৈশিষ্ট্য এখানেই যে, যারা বাইরের জগতের মানুষের কাছে গুরু-গম্ভীর ব্যক্তিত্ব বলে পরিচিত। ব্যঙ্গমার লেখায় তাঁদের দ্বিতীয় আননটি ধরা পড়েছে। ডাঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেন শর্মা, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, মৃণাল রায় বিখ্যাত যাদুকর, কার্টুনিষ্ট রেবতীভূষণ, ছড়াকার উপেন্দ্র মল্লিক, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, পণ্ডিতপ্রবর ডাঃ কালীকিংকর সেনগুপ্ত, সরিৎশেখর মজুমদার--এরা কেউ রঙ্গ ব্যঙ্গ চর্চার প্রধান স্রোতের লোক নন। কিন্তু নিজেদের অনুভবকে হাস্যরসে জারিত করে--আড্ডাকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন—সেই সঙ্গে রচনাকেও। *ব্যঙ্গমা*-র বিভিন্ন আসরে এবং তাঁদের বার্ষিকীতে স্থান পেয়েছে বনফুল সন্ধ্যা, শিবরাম স্মরণে, কৌতুকময় নজরুল, লিমেরিকের আসর, কৌতুক লহরী, হাসির অনুগল্প ইত্যাদি। এক সময় সুকুমার রায়, সুশোভন সরকার, হীরণ সান্যালরা কলকাতায় ননসেন্স ক্লাব তৈরি করেছিলেন। সেই ঐতিহ্যের শেষ বাহক *ব্যঙ্গমা*।

রঙ্গ ব্যঙ্গ রসিকেষু

কলকাতার বেহালা থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক। বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির সম্ভাবনা যেখানে স্তিমিত। প্রচুর বিক্রি হলেও ব্যয়ের সামান্য অংশ উদ্ধারের সম্ভাবনা যেখানে নেই, অথচ রঙ্গ ব্যঙ্গ চর্চার প্রতি আগ্রহটা কুলীন সেখানে ত্রৈমাসিক ছাড়া উপায় কি! ত্রৈমাসিক হলেও, পত্রিকাটির প্রকাশ খুবই নিয়মিত এবং উদ্যোক্তাদের আন্তরিকতা বারবার পাঠকদের স্পর্শ করেছে। বর্তমানে আছেন দুজন দুঃসহ সম্পাদক এবং একটি সম্পাদকমণ্ডলী। বছরে চারটি নিয়মিত সংখ্যা প্রকাশের কথা--হালখাতা, বর্ষাতি, কলাবউ, লেপতোষক। বোঝা যায় ঋতুভিত্তিক

সংখ্যা প্রকাশের ব্যবস্থা। প্রথম প্রকাশকালে পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ২৪ দাম পাঁচ টাকা। এখন বড় আকারে ৬০/৭০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ২০ থেকে ২৫ টাকা।

বেশ মজার কয়েকটি ফিচার আছে--পাঁচফোড়ন, সংবাদ-সাহিত্য, আমাদের কথা, কিছু কথা, শব্দে কার্টুন অর্থাৎ ছড়া ইত্যাদি *রঙ্গ-ব্যঙ্গ রসিকেষু* যে কটি সংখ্যা দেখেছি (নিয়মিত পাই, সেজন্য দেখার সুযোগও হয়) তাতে রঙ্গরসের মান উচ্চাঙ্গের, রসিকতার নামে চ্যাংড়ামিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। এদের একটি বড় কাজ, যেটি সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য পাঠক সমাজের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন, তা হল প্রবীণ কার্টুনিষ্ট রেবতীভূষণ ঘোষকে নিয়ে ক্রোড় পত্র প্রকাশ।

কুমারেশ ঘোষের *যষ্টিমধু*-র মত বাইরের অনিশ্চিত লেখার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজস্ব লেখকগোষ্ঠী গড়ে তুলেছেন--যারা নিয়মিত ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে গৃহস্থের সুনিদ্রার ব্যবস্থা করছেন খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে। নতুন প্রজন্মের যেসব লেখক নিয়মিত কলমচর্চা করছেন তাদের মধ্যে কমলকুমার ভঞ্জ, সুশীল ঘোষ, বিজন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ পারেখ, অভীক মৈত্র, শুভজিৎ দে চোখে পড়ার মত। পুরাতন লেখকদের মধ্যে সরিৎশেখর মজুমদার, সুব্রহ্মনিয়ম, রেবতীভূষণ, বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায় নিয়মিত লেখেন।

গৌরকিশোর ঘোষ পরিণত বয়সে মারা যাবার পর অনেক পত্রিকাই তাঁকে নিয়ে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছেন। *রঙ্গ-ব্যঙ্গ রসিকেষু* কর্তৃক উপস্থাপিত ক্রোড়পত্রটি ভবিষ্যৎ পাঠকদের কাছে আকরগ্রন্থ রূপে বিবেচিত হবে। *রঙ্গ ব্যঙ্গ রসিকেষু* প্রকাশনার প্রধান গৌরব তার বিশেষ সংখ্যাগুলি। রূপদর্শীর রঙ্গব্যঙ্গের কথা আগেই বলেছি। তারও আগে শতবর্ষে কাফি খাঁ, অহিভূষণ মালিক, সরিৎশেখর সম্মাননা, উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক সংখ্যা ইত্যাদি এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে প্রায় সব সংখ্যাই নিঃশেষিত।

সরস কার্টুন ১৯৯০-৯৪

সুকুমার রায়চৌধুরী সেলিমপুর রোড থেকে প্রকাশিত। দাম ৫ মাথায় লেখা থাকত--বিরস বঙ্গের একমাত্র হাসির পত্রিকা।

বাংলা রঙ্গ-ব্যঙ্গের ইতিহাসে সুকুমার রায়চৌধুরী সেই বিরল উদ্যোগীদের একজন যিনি কার্টুনিস্ট থেকে সম্পাদক হয়েছেন। পেশায় জনসংযোগ অফিসার, শ্রী রায়চৌধুরী সখ করে কার্টুন আঁকতেন। ব্যাপকভাবে কার্টুন চর্চার পর তিনি নিজেই কার্টুন নিয়ে কাগজ করবেন ঠিক করেন। সম্ভবত রঙ্গ-ব্যঙ্গের পত্রিকাগুলি একে একে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কার্টুন প্রকাশের সুযোগগুলিও ক্রমেই বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় কার্টুন-চর্চাকে বাঁচাতে সুকুমার নিজেই উদ্যোগী হয়ে কার্টুন-প্রধান একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। শুরু থেকেই সহায় ছিলেন তাঁর চিকিৎসক স্ত্রী শ্রীমতী অপরাজিতা।

প্রথমে নাম ছিল কার্টুন। পাঠকেরা আনন্দের সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছিল এই উদ্যোগকে। কিন্তু সরকারি রেজিস্ট্রেশন না পাওয়ায় সেটি বন্ধ করে দিতে হয়। এবার নতুন নাম দেওয়া হয় *সরস কার্টুন*। কার্টুন তো সর্বদাই সরস হয়, বিরস হলে সেটা কার্টুন হয় না। তবু সরস কার্টুন নামটি নিয়ে সরকারি মহলের আপত্তি ছিল না। এই পত্রিকা প্রকাশ করতে গিয়ে সুকুমার প্রচুর টাকার ঝুঁকি নিয়েছিলেন। কার্টুন পত্রিকার পাঠক কখনও ব্যাপক হয় না। এক

ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকেই। বিজ্ঞাপনদাতারাও বিজ্ঞাপন দিয়ে সাহায্য করতে কুণ্ঠা দেখান। ফলে কাগজের অচিরে নাভিশ্বাস ওঠে।

অল্পস্থায়ী হলেও *সরস কার্টুন* একালের পাঠকমহলে খুবই সাড়া ফেলেছিল। একালের সঙ্গে পুরনো আমলের বহু কার্টুন পুনর্মুদ্রিত হত। লেখার ক্ষেত্রে অতীতকালের বহু বিস্মৃত অথচ মূল্যবান লেখা নতুন করে ছেপে একালের পাঠকদের অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করেছেন। এই যে পুরাতনের স্তূপ থেকে উজ্জ্বল উদ্ধার এর সবগুলির ঔজ্জ্বল্য তেমন চোখে ধরা পড়েনি। সুকুমার পত্রিকা নির্মাণে কোনো নির্ভরযোগ্য সহযোগী পাননি। নিদারুণ অর্থাভাবে কোনো সহযোগী পাওয়া সজনীকান্ত দাসের কালে (সে সময় সাহিত্যপ্রেমে অনেকেই এগিয়ে আসতেন) সম্ভব হলে সুকুমার পাননি। বিজ্ঞাপনদাতাদের সাহায্য এতই সামান্য যে সে অর্থ দিয়ে বিপুল ব্যয়ের সামান্য অংশও মিটত না। সুকুমারের অন্যতম কৃতিত্ব 'ডাকু' (পার্থ মিত্র) ছদ্মনামের এক প্রতিশ্রুতিবান কার্টুনিস্টকে প্রতিষ্ঠিত করা। কার্টুন অথবা *সরস কার্টুন*-এ প্রকাশিত সব রচনাই বড় বেশি লঘু। নামে রস বচনা হলেও, মনে দাগ কাটার মত কোনো লেখা বারবার পড়ার পরও খুঁজে পাইনি। প্রকাশিত কার্টুনের সিংহ-ভাগই সম্পাদকের। *সরস কার্টুন*-এ বাংলাদেশী কিছু কার্টুনিস্টের ছবি নিয়মিত ছাপা হত। সেগুলি খুবই দুর্বল এবং প্রায়শই অশ্লীল।

শেষ জীবনে সুকুমার দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হন। মৃত্যু আসন্ন জেনেও প্রিয় পত্রিকা পুনঃপ্রকাশের স্বপ্ন দেখতেন। শেষ শয্যায় আসীন হয়েও নিজ পত্রিকার জন্য কার্টুন এঁকেছেন।

অ নি ন্দি তা ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

মেয়েদের পত্রিকার জগৎ

মেয়েটির বয়স বছর বারো—খেলা করার বয়স, ধুলোমাটি মাখার বয়স।

কিন্তু না--তার অভিভাবক আর সমাজের কাছে তার খেলার বয়স পার হয়ে গেছে--কৈশোরের আলোময় উজ্জ্বল দিনগুলি পিছনে ফেলে, আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে। শ্বশুরবাড়ি নামে কারাগার-সম একটি অপরিচিত গণ্ডির ভিতরে বাঁধা পড়বে তার অনিশ্চিত ভবিষ্যত। কেননা সময়টা একুশ শতক নয়—উনিশ শতকের বিশের দশক। বছর বারোর এই মেয়েটিই বড় হয়ে আত্মজীবনীতে এঁকে রাখলেন কৈশোরের অসহনীয় সেই দুঃখের ছবি, যেদিন মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে তাকে জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে শ্বশুরবাড়িতে 'আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিল।...আমি মার কোলে গিয়া মাকে আঁটিয়া ধরিয়া থাকিলাম, আর মাকে বলিলাম, মা তুমি আমাকে দিও না। আমার ঐ কথা শুনিয়া ও এইপ্রকার ব্যবহার দেখিয়া ঐ স্থানের সকল লোক কাঁদিতে লাগিলেন...তখন অনেক কষ্টে সকলে আমার মায়ের কোল হইতে আমাকে আনিলেন। ঐ সময় আমার কি ভয়ানক কষ্ট হইল।...যখন দুর্গোৎসবে কি শ্যামাপূজায় পাঁঠা বলি দিতে লইয়া যায়, সে সময়ে সেই পাঁঠা যেমন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া হতজ্ঞান হইয়া মা মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে আমার মনের ভাবও তখন ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল।'

নবীন বালিকা—আপনজন ছেড়ে, তার থেকেও দামি--স্বাধীন জীবনটুকু ছেড়ে চিরদিনের জন্য পরাধীন এক জগতের বাসিন্দা হতে চলেছে--যেখানে 'ক্ষুধা হইলে বলিতে পারিবে না, কোনো ইচ্ছা হইলে প্রকাশ করিতে পারিবে না--তিরস্কার করিলে কাঁদিতে পারিবে না...পীড়া হইলে বলিতে পাইবে না।...এমনি বঙ্গসমাজের, নিয়ম।'

শুধু বারো বছর নয়, তারও কম বয়সের মেয়েদের এই জগতে পাঠিয়ে দেওয়া হত—শৈশব পেরোনোর আগেই যখন বয়স তাদের পাঁচ বছরও হয়নি। দ্বিতীয় যন্ত্রণা আরও অসহনীয়, আরও বেদনাদায়ক, এই যে শিশুকন্যাটির বা সবে শৈশব পেরোনো বালিকাটির বিয়ে হল--তার স্বামী কুলীন পাত্র বলে তাকে কিছুকাল পরেই ফিরে আসতে হত পিতৃগৃহে। কেননা স্বামীটি বহু বহু বিবাহ করে বাংলার দরিদ্র পিতাদের নাকি কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করতেন। বিয়ের সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রেই পঞ্চাশ কেন একশোও ছাড়িয়ে যেত। ফলে বিয়ে হওয়ার পর মেয়ে শৈশব বা কৈশোরের নির্মলতা আর স্বাধীনতাটুকু হারিয়ে ফিরে আসত বাপের বোঝা হয়ে।

বাল্যবিবাহের যূপকাষ্ঠে বলি হত যে সব মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে তাদের বয়সের ফারাক স্বাভাবিকভাবেই থাকত অনেকখানি। কুল রক্ষা করতে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ কুলীনের সঙ্গে বিবাহও বিরল ছিল না। ফলে বাল্যবৈধব্য সঙ্গে করে মেয়ে ফিরত বাপের বাড়ি। তীব্র যন্ত্রণাময় এক জীবন শুরু হত তার। সমাজের সকলের চোখে সে অপয়া। পরিবার ও

সমাজের সমস্ত শুভ কাজ থেকে তাকে নির্মমভাবে দূরে সরিয়ে রেখে অপমান করা হত--কেননা তার সংস্পর্শে নাকি অকল্যাণ হবে। সব আনন্দ উৎসব থেকেই কেবল দূরে রাখা নয়, তার ব্যক্তিগত জীবনকে বাঁধা হত কঠোর অযৌক্তিক অবাস্তব সব নিষেধ আর নিয়ম দিয়ে, আর এসবই নির্দিষ্ট হত পুরুষশাসিত সমাজের কর্তাব্যক্তিদের দ্বারা। বৈধব্য জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণার ভার বইতে না পেরে অনেকেই সতীদাহের মত নিষ্ঠুর প্রথাকে বরণ করত। অনেকে মনে করত--এটি পুণ্যের পথ। কেননা এইটেই বোঝানো হয়ে এসেছিল--এটি স্বর্গলাভের সিঁড়ি, অমরত্ব লাভের একমাত্র পথ। শুধু সেই নারীই নয়, তার পরবর্তী প্রজন্মও সেই পুণ্যের ফল বহন করে চলবে। অথচ আশ্চর্য! পুণ্যলাভের এই স্বর্গীয় সম্ভাবনায় কোনো পুরুষকে বলি দেওয়ার কথা কখনও স্বপ্নেও ভাবেননি সমাজের কর্তাব্যক্তিরা।

এই যখন সমাজের ছবি--তখন কোনো পরিবারেই কন্যা জন্ম যে আদৃত হতে পারে না-- তা বোঝাই যায়। আর হতওও তাই--কিন্তু এখানেও কী ভীষণ অবিচার! কন্যা জন্মের জন্য দায়ী করা হত তার জন্মদাত্রী মা-কে এবং তার কপালে জুটত অকারণ লাঞ্ছনা। সমাজের অবস্থাটা যখন এই রকম, তখন মেয়েদের শিক্ষা দেবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। শিক্ষার অধিকার পুরুষের একচেটিয়া। আর এ-সব বিধান যুগ যুগ ধরে নির্মাণ করেছেন পুরুষরাই।

তবু প্রতিবাদ হল--এবং সৌভাগ্যবশত প্রথম প্রতিবাদ উঠে এলো পুরুষদের কাছ থেকেই। উপনিবেশবাদ আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক কাঠামোটি ভেঙে দিয়ে, দেশের সাধারণ মানুষের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে নিজেরা লুঠপাট করছিল ঠিকই, কিন্তু তাদের রাজ্যপাট চালানোর প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষার প্রসার ঘটছিল। উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবী কিছু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষ ইংরেজি ভাষা শিখে পাশ্চাত্যের নতুন অনেক আলোকিত ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হতে লাগলেন। যুক্তিবাদ আর মানবতাবাদ এই দুটি ভাবনা তার মধ্যে অন্যতম। ফলে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কুৎসিত প্রথাগুলি সম্পর্কে তাঁরাই প্রথম প্রশ্ন তুললেন, যদিও সংখ্যায় তাঁরা নগণ্য। এ বিষয়ে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে কিছুটা সমর্থনও পেলেন তাঁরা।

নারীকেন্দ্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত উদার মানুষগুলি অন্যায় প্রথার বিরুদ্ধে শুধু যে প্রতিবাদ গড়ে তুললেন তা-ই নয়, আগ্রহী হলেন নারীদের এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে। কেননা যাঁদের নিয়ে এত হৈচৈ, ভিতর থেকে প্রতিবাদ না উঠলে, তাঁদের সহযোগিতা না পেলে এ আন্দোলন সার্থকতা পাবে না, লক্ষ্যে পৌঁছবে না। কিন্তু তার জন্য নারীর মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। দীর্ঘদিনের বদ্ধ জমাটবাঁধা অন্ধকার থেকে মুক্ত আলোয় নিয়ে এসে তাদের পথ দেখানো সোজা কথা নয়। তাদের মনের অন্ধকার দূর করতে প্রথম যা চাই --তা হল শিক্ষার আলো। তাই এসব আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা জোর দিলেন স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের দিকে। এগিয়ে এলেন বেথুন সাহেব। ১৮৪৯-এ কলকাতায় তৈরি হল প্রথম প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয়। ব্রাহ্মসমাজের মানুষজন মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী হলেন--স্কুলে সকলকে নিয়ে আসা প্রথমেই সম্ভব নয় বলে অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষার ওপরও জোর দিলেন তাঁরা। অনেক মেয়েই দ্রুত আয়ত্ত করতে লাগলেন পড়াশোনা।

মেয়েদের আলোকিত করার উদ্দেশ্যে তাদের মন থেকে কুসংস্কার দূর করতে, তাদের সপ্রতিভ করার লক্ষ্য নিয়ে প্রগতিশীল মানুষগুলি আর এক পা এগিয়ে এলেন এবার।

কেবলমাত্র মেয়েদেরই নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও তা প্রতিকারের পথ নির্ণয়ের জন্য, মেয়েদের নানা খবর দেওয়া-নেওয়া, মেয়েদের স্বাধীন বক্তব্য প্রকাশ ও সাহসের সঙ্গে তাদের মনের কথা বলার সুযোগ করে দিতে তাঁরা পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিলেন।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১০৭ সংখ্যা | আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১২৭৯ | ৮ম ভাগ

ভারত আশ্রম।

অনেকে বোধ করি শুনিয়াছেন যে কলিকাতায় এক আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। গত মাঘ মাসে বেলঘরিয়া গ্রামে ইহার সূত্রপাত হয়। দুই মাস পরে উহা স্থানান্তরিত হইয়া, কাঁকুড়গাছীর রাণী [illegible]র উদ্যান বাটীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তথা হইতে এক মাস হইল উহা কলিকাতায় উঠিয়া আসিয়াছে। এই আশ্রমের নাম "ভারতাশ্রম"। [illegible] কি, ইহাতে কি হয়, ইহা দ্বারা দেশের বিশেষ কি উপকারের সম্ভাবনা তাহা জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে। [illegible] পাঠিকাগণের গোচরার্থ আমরা ভারতাশ্রমের সম্বন্ধে দুই পাঁচটা কথা বলিতে উদ্যত হইলাম।

বঙ্গদেশের যে রূপ হীনাবস্থা, স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ যেরূপ বিকৃত ভাব এবং [illegible] সতত পরিবার মধ্যে যে রূপ অশান্তি, তাহাতে সম্পূর্ণ গৃহসংস্কার [illegible] গৃহশুদ্ধি ভিন্ন মঙ্গলের আশা নাই। যেখানে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের [illegible] প্রণয় নহে এবং জ্ঞান ধর্ম্মে বিপরীত ভাব ধারণ পূর্ব্বক পরস্পরের [illegible] কলহ বিবাদে তৎপর, সেখানে [illegible] উন্নতি ও শান্তি স্থান পায় না। যখন প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু [illegible] [illegible] নর নারীর একই ভাব ও এক রীতি ছিল। সুতরাং [illegible] [illegible] সদ্ভাবে ও কুশলে থাকিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

বামাবোধিনী বহু বছর ধরে মেয়েদের কথাই বলেছে

এগিয়ে এলেন প্যারীচাঁদ মিত্র আর রাধানাথ শিকদার। ১৮৫৪-র অগস্ট মাসের ১৬ তারিখ ডিরোজিও-র দুই ছাত্র-শিষ্য প্রকাশ করলেন মেয়েদের জন্য প্রথম কাগজ *মাসিক পত্রিকা*। এই পত্রিকা সাধারণের 'বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা'—একথা তাঁরা প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই ঘোষণা করলেন। বছরের পর বছর ধরে সমাজপতিরা নিজেদের সুবিধার্থে মেয়েদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছেন—স্ত্রী-শিক্ষার কি অসম্ভব কুফল। নিজেদের মনগড়া অবাস্তব, অযৌক্তিক এবং অবিশ্বাস্য কতকগুলি বিধান তাঁরা তৈরি করে দিয়েছেন। অজ্ঞানের

অন্ধকারে ডুবে থেকে মেয়েরা তা বিশ্বাসও করেছেন। সে সমস্ত কুসংস্কারগুলি যে কতদূর মিথ্যা সে কথা বার বার বলার চেষ্টা করেছে এই পত্রিকাটি। বোঝাতে চেয়েছে কেন অজ্ঞানতা কাটিয়ে মেয়েদের শিক্ষার আলো গ্রহণ করা জরুরি, বিধবাবিবাহ যে শত শত মেয়ের জীবনকে দুর্বিষহ যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচাতে পারে--সে কথাও এই পত্রিকায় বারবার উচ্চারিত।

এর পরের পত্রিকা *বামাবোধিনী*-র আবির্ভাব ঘটেছিল প্রায় বছর নয়েক পরে--১৮৬৩-র অগস্ট মাসে--উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায়। ব্রাহ্মদের পক্ষ থেকে মেয়েদের আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ। মেয়েদের নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে বক্তব্য, প্রতিবাদ আর আত্মসমীক্ষার জন্য প্রতি সংখ্যাতেই কিছু জায়গা রাখা হত এই কাগজের পাতায়। জড়তা কাটিয়ে, আগল ভেঙে কিছু মেয়ে আসতে থাকলেন নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে। তবে মেয়েদের উদ্দেশ্য করে, তাদের কি করা উচিত অথবা উচিত নয়--কতটা স্বাধীনতা থাকা উচিত কতটা নয় সেসব উপদেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষরাই দিতেন। অনেক সময় মেয়েদের নাম করে পুরুষরা লেখা পাঠাতেন। তাই *বামাবোধিনী পত্রিকা* প্রমাণ ছাড়া মেয়েদের লেখা নিত না। স্ত্রী-শিক্ষাকে সমর্থন এবং কু-প্রথাগুলির বিরোধিতা করলেও *বামাবোধিনী* স্ত্রী-স্বাধীনতাকে তেমন পছন্দ করত না। এ বিষয়ে তাদের মনোভাব ছিল যথেষ্ট রক্ষণশীল। মেয়েদের শিক্ষিত হওয়া উচিত সন্তানকে উপযুক্ত মানুষ করে তোলার জন্য, গৃহ কর্তব্য সুসম্পন্ন করার জন্য--অতি মাত্রায় স্বামীর প্রতি একপ্রাণা হওয়ার জন্য এবং সবচেয়ে হাস্যকর, স্বামীটিকে যথাযথভাবে ধরে-বেঁধে রাখার জন্য যাতে তার 'কুঅভ্যাস' না গড়ে ওঠে--এগুলি ছিল মোটামুটি তাদের নিয়মিত বক্তব্য। 'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ব্যবহার', 'গার্হস্থ্য দর্পণ', 'পতিসেবা', 'আদর্শ সতী স্ত্রী' ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে কখনও ধারাবাহিকভাবে কখনও বা একক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। তাতে স্ত্রী জাতির প্রতি প্রচুর উপদেশ বর্ষিত হত। আর এগুলি শুধু পুরুষ নয়, মেয়েরাও লিখতেন। 'নারী জীবনের উদ্দেশ্য' নামে 'বামাগণের রচনা'-তে এমন কথাও বলা হয়েছে--

> স্বামী কুরূপ, নির্গুণ দরিদ্র যে প্রকার হউন না কেন স্ত্রীলোকের পূজনীয়। চিরকাল তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া আন্তরিক প্রীতিপূর্ব্বক সেবা করতঃ কালাতিপাত করাই প্রধান ধর্ম্ম ও একান্ত প্রার্থনীয়। পতি-সেবাই গৃহ ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ।

নারীর প্রতি এইসব উপদেশ সত্ত্বেও কিন্তু নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা ও শিক্ষার উদ্দেশ্য কী সে বিষয়ে অনেকেই প্রবন্ধ বা চিঠি পাঠাতেন। সেগুলিরও কিছু কিছু পত্রিকাটি ছাপত। কু-প্রথা, কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার প্রস্তাব নিয়ে যেসব লেখা আসত, তারও কিছু নিদর্শন পত্রিকাটির পাতায় দেখা যেত। ১২৮০-র আশ্বিন সংখ্যায় 'সতীত্ব ও পাতিব্রত্যধর্ম্ম' নামের প্রবন্ধটির লেখক লিখছেন--

> ...আমাদিগের এমনি সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা যে, স্ত্রীকে স্বামী যত অবজ্ঞা করুন ক্ষতি নাই, কিন্তু স্বামীর কথা ভার্য্যাকে অবশ্য শুনিতে ও মানিতে হইবে।...পুরুষজাতি প্রভুত্ব ছাড়িতে রাজি নহে। যাহার কোনখানে প্রভুত্ব নাই, গৃহে আসিয়া ক্ষণকালের জন্যও তিনি প্রভু হইয়া মনের ইচ্ছা পরিতুষ্ট করেন, মনের ক্ষোভ নিবারণ করেন। এমন বিনা মূল্যের একাধিপত্য কে পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইবে?...সংসার রূপ কারাগারে আবদ্ধ করিয়া আমরা স্ত্রী জাতির উপর নিপীড়ন করিব, ইহা কোন ধর্ম্মে ও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে? স্ত্রী জাতিকে আমরা অজ্ঞ করিয়া রাখিয়াছি, তাহাদিগের জ্ঞানচক্ষু অন্ধ করিয়া দিয়েছি।..স্ত্রীজাতির জ্ঞাননেত্র যত উন্মীলিত হইতে থাকিবে, তাহারা আপনাদিগের স্বত্ব ও অধিকার আপনারাই ৩৩ বুঝিয়া লইতে পারিবে। তখন তাহারা অবশ্য বুঝিতে পারিবে, পাতিব্রত্য

ও সতীত্ব ধর্ম্ম হইতে অবৈধ পরাধীনতা এবং দাসীত্ব কোথা হইতে উৎপন্ন হয়। তাহারা বুঝিতে পারিবে, স্বামী জাতিরাই পাতিব্রত্য ধর্ম্মের সহিত দাসত্বের শিক্ষা ও বিধান দিয়াছেন। ...স্ত্রী জাতিকে বলে এবং কৌশলে এই শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে হইবে দাসী হইয়া জীবিত থাকা আর না থাকা সমান কথা।

স্ত্রী-শিক্ষা দানের সঙ্গে তাদের স্বাধীনতা দানও যে জরুরি, উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব গঠনে মেয়েদের বাল্যবিবাহ যে কতদূর ক্ষতিকর সে আলোচনা সুরেশচন্দ্র সরকার ১২৯৬-এব বৈশাখে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে করেন। এক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিতে যথেষ্ট আধুনিক ছোঁয়া রয়েছে। প্রবন্ধটিতে বলা হচ্ছে—

স্ত্রী-শিক্ষা যদি একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে স্ত্রী স্বাধীনতাও সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয়, স্বাধীনতা না থাকিলে শিক্ষালাভ কিরূপে হইবে? জগতের বিবিধ পদার্থ এবং দৃশ্যসমূহ না দেখিয়া বেড়াইলে মন প্রশস্ত হইবে কিরূপে? শরীরের বিবিধ ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলে জ্ঞান অন্তরে প্রবেশ করে না, শুধু পুস্তকের জ্ঞান যথেষ্ট নহে। আদর্শ রমণী অন্তঃপুরের কারাগারে চিরবদ্ধ থাকিবেন না ...তিনি মুক্তশৃঙ্খল বিহঙ্গিণীর ন্যায় সংসারে ও সমাজে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করিয়া শিক্ষাগ্রহণ এবং জ্ঞান ও প্রেম বিস্তার করিবেন। যখন বিদ্যাশিক্ষায় একান্তভাবে নিযুক্ত থাকিয়া বুদ্ধি মার্জিত হইবে, তখন তাঁহার আত্মজীবনের মূল্য এবং উদ্দেশ্য তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে।

মহিলাদের প্রতি অধিকাংশ মানুষের মনোভাব কেমন সে সম্পর্কেও মতামত প্রকাশিত হয়েছে *বামাবোধিনী পত্রিকা*-য়। জুলাই ১৮৬৭-তে 'স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহার' প্রবন্ধে বলা হচ্ছে--

এদেশের প্রায় অধিকাংশ লোকের এরূপ সংস্কার আছে, যে স্ত্রীলোকেরা কেবল ক্রীতদাসীর ন্যায় গৃহকার্য্য করিবে, তাহারা গৃহের সামান্য কার্য্য ব্যতীত, পুরুষদিগের ন্যায় কোন প্রকার মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার উপযুক্ত পাত্র নহে।...স্বামী পীড়াগ্রস্ত হইলে স্ত্রী প্রাণ মন শক্তিতে তাঁহার সেবা করেন, যদি সেবার কিছু মাত্র ত্রুটী হয়, স্বামীর আর ক্রোধের সীমা থাকে না, স্ত্রীর পীড়া হইলে স্বামী তাঁহার সেবা করা দূরে থাকুক, পীড়ার অবস্থাও একবার ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করেন না ;...স্ত্রী বিধবা হইলে তিনি আর বিবাহ করিতে পারেন না কিন্তু পুরুষের স্ত্রী বিয়োগ হইলে তিনি অনায়াসে বিবাহ করিতে পারিবেন। স্ত্রীলোক কুপথগামিনী হইলে তাঁহার আর কলঙ্কের সীমা থাকে না, ইহকালে সকলের ঘৃণাস্পদ হইয়া জীবিত থাকিতে হয়, কিন্তু পুরুষ দুষ্কৃয়াশক্ত হইলে লোকে তাহার কোন নিন্দা না করিয়া বরং কখন কখন পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন।. .

সন্তান সন্ততি হইলে পুরুষেরা মনে করেন কেবল মাত্র স্ত্রীলোকদিগের উপরই তাহাদিগের লালন পালন ও সেবা-সুস্থতার ভার। পুরুষেরা সন্তানগণের লালন-পালনের অংশভার গ্রহণ করিতে আপনাদিগকে অবমানিত ও নীচ মনে করেন।...এখন পুরুষ মহাশয়দের প্রতি আমাদের বক্তব্য যে তাঁহারা নিজের গর্ব্বিত ভাব ও স্বার্থপরতা এককালে পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে যথাযোগ্য মান্য ও ভক্তি করিতে শিক্ষা করুন এবং স্ত্রীলোকেরাও আপনাদিগের নীচ সংস্কার সকল পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন জীবের ন্যায় জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া পুরুষদিগের সাহায্যে অল্পে অল্পে আপনাদিগের অবস্থা উন্নত করিতে যত্নবতী হউন।

হিন্দু-বিধবাদের প্রতি সমাজের যে নিষ্ঠুর বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি যা এই অসহায় নারীগুলির জীবনকে শুধু অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করতে উদ্‌গ্রীব তার তীব্র প্রতিবাদও *বামাবোধিনী*-র পাতায় ছাপা হয়েছে, অগস্ট ১৮৭০-এ 'হিন্দু বিধবা' শিরোনামের প্রবন্ধটিতে। এই পত্রিকাতে শুধু পুরুষদের নয়, কখনও কখনও মহিলাদের পাঠানো লেখাতেও প্রগতিমনস্কতা লক্ষিত হয়েছে।

ক্রমশ তাঁরা জড়তা কাটিয়ে উঠছেন একথা বোঝা যাচ্ছে। হুগলি নিবাসী নগেন্দ্রবালা মুস্তাফীর লেখা ১৩০১-এর বৈশাখ সংখ্যা *বামাবোধিনী*-তে প্রকাশিত, 'অবরোধে হীনাবস্থা'-য়। তার প্রথমাংশের বক্তব্য এইরকম--

> আমাদের দেশে আমাদের সমাজে স্ত্রীজাতির জন্য যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে আমরা এ প্রথা ভালো বিবেচনা করি না। এই অবরোধ প্রথাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল, এই অবরোধ প্রথাই আমাদের হীনাবস্থার কারণ। আমরা পিঞ্জরের পাখীর ন্যায় নিয়ত অবরোধরূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ রহিয়াছি, কাজেই আমাদের মনোবৃত্তি সকল ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রস্ফুটিত হইতে পারিতেছে না।

এই ধরনের লেখা ছাড়া মেয়েদের সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে কিছু প্রবন্ধও *বামাবোধিনী*-র পাতায় ছাপা হয়েছে।

এছাড়া মেয়েদের সমস্যা নিয়ে মহিলাদের লেখা বই-এর সমালোচনা প্রকাশিত হতে দেখি পত্রিকাটির পাতায়। নভেম্বর, ১৮৬৩-র *বামাবোধিনী*-তে কৈলাসবাসিনী দেবীর লেখা 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' প্রসঙ্গে একটি বড় প্রশংসামূলক সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তার দু-একটি লাইন এইরকম--

> এই পুস্তকখানি হিন্দু স্ত্রী লোকগণের হীনাবস্থার একটি চিত্রস্বরূপ হইয়াছে। ইহা বঙ্গ বামা হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক ব্যক্তির এক একবার অধ্যয়ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।...গ্রন্থ রচয়িত্রী স্বজাতির দুরবস্থা বর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ হিতৈষী মহাত্মাগণের নিকট বারম্বার কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যেন অরণ্যে রোদন না হয়।...আমরা এ দেশীয় ভগিনীগণকে বলিতেছি যে তাঁহারা এই মান্য মহিলার অনুগামিনী হইয়া বিদ্যাভ্যাসে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন, ত্বরায় কৃতকার্য্য হইবেন, আপনাদের দুরবস্থা বুঝিতে পারিবেন,... বিদ্যা শিক্ষা ব্যতীত তাঁহাদের কল্যাণের আর দ্বিতীয় পথ নাই।

বামাবোধিনী 'বামাবোধিনী সভা'র মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হত বলে কখনও কখনও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও পত্রিকাটি ষাট বছরের দীর্ঘ জীবন পায়--আর কোনো মেয়েদের কাগজের আয়ু এতদিন স্থায়ী হয়নি।

অবলাবান্ধব মেয়েদের জন্য প্রকাশিত আর একটি পাক্ষিক পত্রিকা। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৬৯-এর ২২ মে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়, ষষ্ঠ বর্ষ থেকে মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রচারিত হয়। ২৫ মে ১৮৬৯-এর *অমৃতবাজার পত্রিকা*-র 'পত্রিকা সংবাদ' অংশে *অবলাবান্ধব*-এর দীর্ঘায়ু কামনা করে বলা হয়-

> আমরা অবলাবান্ধব নামক একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া লোনসিংহ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। এরূপ পত্রিকা দ্বারা দেশের বিস্তর মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা।

অমৃতবাজার পত্রিকা অবলাবান্ধব উদ্ধৃত করে, পত্রিকাটির উদ্দেশ্য পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে--

> স্ত্রীজাতির প্রকৃত মঙ্গল কামনা করেন এমন লোকের সংখ্যা বঙ্গদেশে অতি অল্প আছে। কুলকামিনীদিগকে অবজ্ঞা করা অধিকাংশ লোকেরই প্রকৃতি,...এক্ষণে যে যে বিষয়ে প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া অবলাবান্ধব প্রচারিত হইল তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। যাহাতে বঙ্গীয় স্ত্রী সমাজের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হয়, তাহাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, আত্মকর্ত্তব্যাবধারণের ক্ষমতা জন্মে, সামাজিক ও পারিবারিক সুখের বৃদ্ধি হয়,...আত্মার প্রকৃত উন্নতি হয় এবং বিদ্যা বিষয়ে সবিশেষ অনুরাগ জন্মে, তাহার নিয়ত চেষ্টাই আলোচনা করিবার জন্যই অবলাবান্ধবের জন্ম হইল।...অবলাবলীর রচনাবলী প্রকাশ করাও অবলাবান্ধবের এক কর্ত্তব্য পরিগণিত হইবে।

মেয়েদের জন্য প্রকাশিত, প্রথম মহিলা সম্পাদিত কাগজ হল *বঙ্গমহিলা*--প্রকাশকাল ১২৭৭-এর ১ বৈশাখ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন--'খিদিরপুর-নিবাসিনী জনৈক

মহিলার সম্পাদনায়' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়--'শুনিয়াছি, ইনি ডবলিউ সি. বোনার্জ্জীর ভগিনী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়'।

পত্রিকাটির সাধু উদ্যোগ প্রশংসিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১৭৯২ শকের *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-তে।

নারীশিক্ষা পত্রিকা ১২৭৭-এর কার্তিক মাসে প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে, সম্পাদকের পরিচয় অজ্ঞাত। ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলে কাগজটির আত্মপ্রকাশ--সে কারণেই সম্ভবত কাগজটি বেশিদিন চলেনি। হরিশ্চন্দ্র মিত্রের *মিত্রপ্রকাশ* কাগজটি সম্পর্কে লেখে--

> পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য নিতান্ত গুরু। এই গুরুতর বিষয়ে সহজে কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এ নগরে স্ত্রীশিক্ষা বন্ধুর সংখ্যা সমধিক নহে; শিক্ষানুরাগিনী স্ত্রীলোক এই নগরে নাই বলিলেও অসঙ্গত হয় না, এমতাবস্থায় ইহার জীবনের আশা কি?

বৈশাখ, ১২৮০-তে সৈয়দ আবদুল রহিম-এর সম্পাদনায় *বালারঞ্জিকা* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'স্ত্রীলোকের উন্নতির জন্য' প্রকাশিত হয়, বরিশালের গোপালপুর থেকে। এই প্রয়াসকে অভিনন্দন জানিয়ে *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* লেখে 'ইহা স্ত্রীলোকদিগের পড়িবার নিমিত্ত সংকলিত হইয়াছে। ভাষাটা আরো একটু সহজ করিলে ভাল হয়। কারণ স্ত্রীলোক পাঠ করিবে, পত্রিকাখানির এই উদ্দেশ্য।'

'বঙ্গবাসিনীগণের হস্তে সময়ে সময়ে নীতিগর্ভ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সকল উপহার' দেওয়ার জন্যে ১৮৭৫-এ ভুবনমোহন সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *বঙ্গমহিলা*। স্ত্রীশিক্ষা সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতেও সচেষ্ট হয় পত্রিকাটি। মেয়েদের লিখতে উৎসাহ যোগাত পত্রিকাটি, ছাপতও তাঁদের লেখা। ব্রিটিশ রাজত্বের প্রশংসার পাশাপাশি বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের মতো কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতেও আগ্রহী ছিল এই পত্রিকাটি। ১২৮২-র শ্রাবণ সংখ্যায় মায়াসুন্দরীর 'নারীজন্ম কি অধর্ম্ম!' নামে একটি অসাধারণ লেখা পত্রিকাটি প্রকাশ করে। 'আমরা কি কুক্ষণেই নারী হইয়া এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি'--মায়াসুন্দরীর এই বেদনা আজও অনেক বাঙালি মেয়ে বহন করে চলছেন।

এই সময়ে প্রকাশিত মেয়েদের আরও কয়েকটি পত্রিকা হল--*হেমলতা* [পাক্ষিক, প্রকাশ কার্তিক, ১২৮০ সম্পাদক-মহেন্দ্রনাথ ঘোষ], *অবলা হিতৈষিণী* [১২৮১, সম্পাদক অজ্ঞাত], *বিনোদিনী* [মাসিক, বৈশাখ ১২৮২, সম্পাদক--নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভুবনমোহিনী দেবী ছদ্মনামে], *অনাথিনী* [মাসিক, শ্রাবণ ১২৮২, থাকমণি দেবী সম্পাদক], *হিন্দু ললনা* [পাক্ষিক, মাঘ, ১২৮৪, সম্পাদক--'জনৈক হিন্দু ললনা'], *বঙ্গমহিলা* [মাসিক, বৈশাখ ১২৯০, সম্পাদক--নগেন্দ্রনাথ ঘোষাল], *বালিকা* [মাসিক, ভাদ্র ১২৯০ অক্ষয়কুমার গুপ্ত সম্পাদক], *বঙ্গবাসিনী* [সাপ্তাহিক--আশ্বিন ১২৯০, পৌষ ১২৯০ থেকে মাসিক, 'স্ত্রীলোক কর্তৃক বঙ্গ কামিনীগণের হিতোদ্দেশে সম্পাদিত'], *বঙ্গবালা* [মাসিক, কার্তিক ১২৯২, সম্পাদক--কালীচরণ বসু], *মহিলা* [মাসিক, শ্রাবণ ১৩০২, সম্পাদক--গিরিশচন্দ্র সেন], *সাবিত্রী* [মাসিক, মাঘ, ১৩০৩, সম্পাদক--রামযাদব বাগচী], *অন্তঃপুর* [মাসিক, মাঘ, ১৩০৪, সম্পাদক--বনলতা দেবী--অগ্রহায়ণ ১৩০৭ থেকে হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী]। এই পত্রিকাগুলির অধিকাংশই বেশিদিন চলেনি। এইসব পত্রিকার পাঠকসংখ্যা ছিল কম। ফলে আর্থিক দায়ভার সম্পাদক বা প্রকাশক বেশিদিন বহন করতে পারতেন না।

বামাবোধিনী-র মতো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে প্রকাশিত *পরিচারিকা* পত্রিকাটির আয়ু ২৮ বছর স্থায়ী হয়েছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-এর পক্ষ থেকে পত্রিকাটি প্রকশিত হত। এর প্রথম

মহিলা সম্পাদকের নাম মোহিনী দেবী। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পর ১৮৮৭-তে ইনি সম্পাদনার ভার নেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৯৪-তে সুচারু দেবীর সম্পাদনায় কিছুদিন পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এই সময়ের অন্যান্য অনেক পত্রিকার মতো এরাও মনে করত গৃহকর্তব্য, সন্তান পালন নিষ্ঠার সঙ্গে করার জন্যই নারীর শিক্ষা প্রয়োজন। নারীর শিক্ষা হবে ধর্ম ও নীতিপ্রধান। এদের জন্য শিক্ষা যে পুরুষদের শিক্ষার মতো হবে না—সে দাবিও পত্রিকাটি করত। তবে সমাজে মেয়েদের জন্য প্রচলিত কুপ্রথাগুলির বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে বা বহু বিবাহের বিরুদ্ধে মেয়েদের সব কাগজগুলিই ছিল সোচ্চার। কলকাতার মেটকাপ হল পুস্তকাগারে এক মহিলাকে চাকরি না দেওয়ায় ভাদ্র ১২৯৭-এর *পরিচারিকা* ব্যঙ্গ করে লেখে—

> কলিকাতা মেটকাপ হল নামক পুস্তকাগারে প্রধান কর্ম্মচারী পদ খালি হওয়ায় কয়েকটী ইংরাজ সভ্য তৎ পদে বি. এ উপাধিধারিণী কোন কোন শ্রীমতীকে নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতির প্রতিবাদে তাহা রহিত হইয়াছে। একেই তো বাবুদের এখন চাকরী জোটে না, তার উপর যদি মেয়েরা ইহাতে ভাগ বসান, তা হইলে ঘরে ঘরে বিবাদ লাগিবে।

খ্রীষ্টীয় মহিলা পত্রিকাটি মাঘ ১২৮৭-তে কামিনী শীল-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে মেয়েরাই লিখতেন। খ্রিস্টান মহিলাদের আলোকিত করার জন্য মূলত পত্রিকাটি প্রকাশিত। মেয়েদের লেখা অনেক কবিতা এর পাতায় ছাপা হত। ইংরেজি কবিতার অনুবাদও *খ্রীষ্টীয় মহিলা*-তে দেখি আমরা। সবসময় মেয়েরা নাম প্রকাশ করতেন না। 'স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি'-র চেষ্টায় সম্পাদক সচেতন ছিলেন। এই শিরোনামেই তাঁর লেখা মাঘ ১২৮৭-তে ছাপা হয়। বয়স্ক মহিলাদের বিদ্যাচর্চার ব্যাপারে পত্রিকাটির উৎসাহ ছিল। 'সততা' বিষয়ক ও যিশুর জয়গান গেয়ে নানা কাহিনি পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যাতেই থাকত। 'সংবাদ সাজী' অংশে পত্রিকাটি বাঙালি মেয়েদের তো বটেই, অন্যান্য ভারতীয় নারীদের ডিগ্রি লাভ ও লেখাপড়ায় কৃতিত্বের কথা তুলে ধরত, এমন-কি বিদেশি মহিলাদের কৃতিত্বের কথাও থাকত। এই অংশটিতে বিধবা বিবাহের সংবাদও পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮-র *খ্রীষ্টীয় মহিলা* লিখছে—

> সম্প্রতি বোম্বাই নগরে দুইটি বিধবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই দুটি বিধবাই ব্রাহ্মণ জাতীয় ছিলেন। বিবাহ স্থলে অনেক শিক্ষিত লোক উপস্থিত ছিলেন।

পৌষ ১২৮৮-তে ইংরেজ মহিলা মিস এস. এল. মূলবনি, মুসলমান অন্তঃপুরবাসিনীদের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁদের শিক্ষা দানের চেষ্টা করছেন—সে সংবাদও জানানো হয়েছে—

> তিনি এক বৎসর কার্য্য করিয়া লিখিয়াছেন যে ভদ্র মোসলমান পরিবারে শিক্ষার প্রবর্ত্তনা করা সহজ নহে। মোসলমান সমাজ অতিশয় কুসংস্কারাপন্ন। এই বাধা সত্ত্বেও মিস্ মূলবনি এক বৎসরের মধ্যেই ২০টি পরিবারে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন এবং ২৭টি বিবি সাহেবের শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

ফাল্গুন ১২৮৭-তে সুরেন্দ্রমোহিনী বসুর লেখা 'বঙ্গবিধবা' কবিতাটি বিধবার দুঃখ এবং পুরুষের স্বার্থপরতার বিষয়ে লিখিত, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা দিয়ে কবিতা শেষ, প্রতিবাদী ভাষা নেই। পত্রিকাটিতে ব্রিটিশ বন্দনা ও ঈশ্বর বন্দনা দুই-এরই প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়।

মহিলা পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল নববিধান ব্রাহ্মসমাজের পৃষ্ঠপোষকতায়। প্রথম প্রকাশের সময় শ্রাবণ ১৩০২-তে পত্রিকাটি লেখে—

> মহিলাগণ আপনাদের প্রাপ্য সম্ভ্রম যাহাতে লাভ করেন, তজ্জন্য কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিতে

কৃতসঙ্কল্প হইয়া 'মহিলা' অদ্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিল।...মহিলাগণের শিক্ষার জন্য স্থাপিত বিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষার্থে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি উহাতে রীতিমত প্রকাশিত হইবে।

অন্তঃপুর উনিশ শতকের মেয়েদের আর একটি পত্রিকা--যেটিতে মেয়েরাই শুধু লেখার সুযোগ পেতেন। শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বনলতার সম্পাদনায় প্রকাশিত এই পত্রিকাটি নিজস্বভাবে মেয়েদের নিয়ে চিন্তাভাবনা করে গেছে।--প্রস্তাবনায় পত্রিকাটি বলে--'আজকাল মাসিক পত্রিকার অভাব নাই, রমণীদিগের উপযোগী পত্রিকাও কয়েকখানা সুন্দররূপে পরিচালিত হইয়া রমণীদিগের উন্নতির সহায়তা করিতেছে। আমরাও আজ ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া রমণীদিগের ও তাহাদের সুকুমারমতি বালক বালিকাদিগের জন্য একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ করিতেছি। অন্যান্য খ্যাতনামা পত্রিকার সহিত প্রতিযোগীতা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়,...কেবল বঙ্গ রমণীদিগের উন্নতিকল্পে আপনাদের যৎসামান্য শক্তি নিয়োগ করিয়া ধন্য হইব এই আশা।'

উপরে যে পত্রিকাগুলির কথা আমরা বললাম, তার মধ্যে বেশ কিছু পত্রিকা বিশ শতকে পা রেখেছিল। কোনো কোনোটি বিশ শতকে কিছুদিন চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। উনিশ শতকে মেয়েদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে *বামাবোধিনী-ই* একমাত্র বিশ শতকের প্রথম দুই দশক বেঁচে ছিল।

উনিশ শতকের মেয়েদের পত্রিকা আলোচনার সূত্রে দু-একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। এইকালে মেয়েদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকার অধিকাংশই ছিল স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে--কিন্তু সে শিক্ষা কেমন হবে--পুরুষদের মত শিক্ষা নারীর জন্য হবে কিনা তাই নিয়ে বিতর্ক ছিলই। এ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ ছাপা হত। তার পরেও দু-একটি পত্রিকা ছাড়া অন্যগুলির মূল কথাই ছিল ধর্মনীতি সম্বলিত স্ত্রীশিক্ষা এমন হওয়া উচিত, যাতে তাঁরা পতিসেবা, সন্তানপালন--সন্তানকে সুশিক্ষা দান ও অন্যান্য গৃহকর্ম নিপুণভাবে করতে পারেন।

মেয়েদের পক্ষে ক্ষতিকারক যেসব নিষ্ঠুর প্রথা সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রবহমান ছিল, তার ফলে শুধু মেয়েদের জীবনই অন্ধকার জেলখানার মত ছিল তা নয়, সংসারের সব ক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী পচন ধরেছিল। এই সব প্রথার বিরুদ্ধে সব কটি পত্রিকাই কথা বলত--মেয়েদের সচেতন করারও চেষ্টা করত। ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে মেয়েদের ভাবনাকে যুক্তির দিকে নিয়ে যাওয়ার কথাও কোনো কোনো পত্রিকা ভাবত।

স্ত্রী স্বাধীনতার ব্যাপারে কিন্তু *অবলাবান্ধব-*এর মতো দু-একটি ছাড়া অন্য সব পত্রিকাই ছিল রক্ষণশীল। পুরুষের মত বাইরের জগৎ মেয়েদের কাছে খুলে যাবে--এতদূর তারা কেউই ভাবতে পারত না। প্রতিবাদী লেখা কিছু কিছু ছাপা হত ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশ পত্রিকার মূল সুর তখনও উদারতা থেকে অনেক যোজন দূরে।

উনিশ শতকের আড়ষ্টতা ভেঙে অনেক মেয়েই মনে মনে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছিলেন। ক্রমশ বেশি সংখ্যক মহিলা ভিতর থেকে তাগিদ অনুভব করছিলেন ঘুরে দাঁড়াবার। তাঁরা যে শিক্ষার আলো পেয়েছেন অন্য নারীর মধ্যে তাকে ছড়িয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছিলেন অনেকেই। তাই বিশ শতকের অনেক কাগজেই সম্পাদকের পদে দেখা গেল মহিলার নাম।

তবে মহিলা সম্পাদিত সব পত্রিকাই যে মেয়েদের কথা বলত বা মেয়েদের উন্নতিকল্পে প্রকাশিত হত তা নয়। *বালক-*এর মতো পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন মহিলা। কিন্তু

পত্রিকাটিতে নানা ধরনের লেখা প্রকাশিত হত। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত অপর পত্রিকা *ভারতী* স্বর্ণকুমারী দেবী ও পরে তাঁর দুই মেয়ের সম্পাদনায় সাফল্যের সঙ্গে চললেও, মেয়েদের বিশেষ কোনো ভাবনা এতে প্রকাশ পায়নি। প্রজ্ঞাসুন্দরীর *পুণ্য* সম্পর্কেও সেই একই কথা।

মেয়েদের উন্নতিকল্পে ১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে *ভারত-মহিলা* মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এটি সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন হেমেন্দ্রনাথ দত্তের সহধর্মিণী সরযূবালা দত্ত। 'এদেশের নারী জাতির কল্যাণ'-ই ছিল সরযূবালার লক্ষ্য।

তেজস্বিনী বঙ্গমহিলাদের নানা কাহিনি এঁরা পত্রিকায় প্রকাশ করতেন নারীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য। সম্পাদকের অনুরোধে মীর মশাররফ হোসেন তাঁর প্যারীসুন্দরীর সত্য কাহিনি পাঠান প্রকাশের জন্য। সেটি ছাপা হয় ১৩১৪-র বৈশাখ সংখ্যায়। প্যারীসুন্দরীর সঙ্গে নীলকর সাহেবদের সংঘর্ষে তাঁর যে তেজস্বিনী মূর্তি উদ্ভাসিত সেটি দেখানো ছিল পত্রিকাটির উদ্দেশ্য। বারবারই ভারতের মহীয়সী স্বাধীন নারীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে, বীর নারীদের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছে পত্রিকাটি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাংলা যখন উত্তাল, তখন এই পত্রিকাটিও মুখ বন্ধ করে থাকেনি। পত্রিকার পাতায় দেশাত্মবোধক আন্দোলনের কথা, রাজনৈতিক নানা প্রসঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে বারবার। পত্রিকাটির পাতা ওলটালে বোঝা যায় শুধু স্ত্রী শিক্ষা নয়, স্ত্রী স্বাধীনতার ব্যাপারেও এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিষয়ে পত্রিকাটি তার আপত্তির কথা জানিয়েছে।

১৯২১ সালে চট্টগ্রাম থেকে সফিয়া খাতুন-এর সম্পাদনায় *আন্নেসা* প্রকাশিত মুসলমান নারী সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা। এই হিসেবে এর একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। মুসলমান মেয়েদের অবস্থার উন্নতির জন্য, মৌলবাদী নানা বিধিনিষেধ থেকে মেয়েদের মুক্ত করার জন্য পত্রিকাটি সংগ্রাম করেছে। মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সিদ্দিকী চট্টগ্রাম থেকে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। ছাপা হয়েছিল চন্দ্রকুমার মজুমদার কর্তৃক সরস্বতী প্রেস থেকে। ১২ পৃষ্ঠার এই পত্রিকাটি ৫০০ কপি ছাপা হয়। সম্পাদক সফিয়া খাতুনের আরবী উর্দু ভাষায় দখল ছিল। স্ত্রী-স্বাধীনতা, পর্দাপ্রথা প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে পত্রিকাটিতে বাদ-প্রতিবাদ ও নানা মত প্রকাশিত হত। পত্রিকাটিতে বিভিন্ন দেশের কৃতী নারীদের কথা উল্লিখিত থাকত প্রশংসার সঙ্গে। পত্রিকাটি সম্পর্কে আমরা যে দুটি তথ্য পাই তা হল—

সফিয়া খাতুনের নাম সম্পাদকের স্থানে থাকলেও, অনেকে মনে করেন এটির মূল পরিচালক ছিলেন আবদুর রশীদ সিদ্দিকী।

নারীদের প্রগতির চিন্তা এর প্রধান লক্ষ্য সম্ভবত ছিল না—নারীদের নানা বিষয় সম্পর্কে মত প্রকাশ ও বিতর্কের সুযোগ করে দিয়েছিল পত্রিকাটি।

উনিশ শতকে যার প্রথম প্রকাশ বিশ শতকে এসে সেই *মহিলা* পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি আরও প্রগতিশীল হয়। ১৯১২-র মে মাসে সম্পাদক 'মেয়েদের রাজনৈতিক অধিকার'—নামে একটি লেখায় জানাচ্ছেন—'ইংলণ্ডে সাফ্রাজেট অর্থাৎ রাজনৈতিক অধিকারপ্রার্থিনী রমণীদিগের মধ্যে খুব আন্দোলন চলিতেছে'। এ বিষয়ে তিনি বাংলার পাঠিকাগণের মতামত চিঠি লিখে জানাতে অনুরোধ করছেন।

সুপ্রভাত পত্রিকাটি ১৩১৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। মেয়েদের এই পত্রিকাটি স্বদেশি আন্দোলনের সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। কৃষ্ণকুমার মিত্রের মেয়ে কুমুদিনী মিত্রের সম্পাদনায় পত্রিকাটি পরিচালিত হত। উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পত্রিকাটির। নানা বিপ্লবীর লেখা তাঁরা ছাপতেন। অরবিন্দ ঘোষ-এর 'কারাকাহিনী' ও কালীমোহন ঘোষ-এর 'বয়কট উৎসব' এর মধ্যে অন্যতম।

সুপ্রভাত

"যদিও মা তোর দিব্য আলোকে,
ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর।
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর।"

দ্বিতীয় বর্ষ।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ সাল।	১১শ সংখ্যা।

স্বাধীন।

—

কে আমারে হায়, বাঁধিবারে চায়
শিকলে,
জননী, আমি যে তনয় তোমারি!
কোন্ সে মানব বহে সেই বল
কত রে,
জননী, সাধ যার আজি নেহারি!

২

তরুণ রবিটী সোনার ছবিটী
আহা রে,
জননী, আসে যার দিতি ভুবনে ;—
কে রাখে শকতি তার গতি
বিহারে,
জননী, রোধিতে নয়ন-মেলনে!

কুমুদিনী মিত্রের বিখ্যাত পত্রিকা *সুপ্রভাত*

নারী-শক্তি-র (১৯২২) সম্পাদক লুৎফর রহমান সর্বস্তরের মেয়েদের কল্যাণের জন্য পত্রিকাটিকে নিবেদন করেছিলেন। *শ্রেয়সী* পত্রিকাটি ১৩২৯-এর বৈশাখে প্রথম প্রকাশিত হয় ক্ষিতিমোহন সেনের স্ত্রী কিরণবালা সেনের সম্পাদনায়, শান্তিনিকেতন থেকে। প্রধানত শান্তিনিকেতন আশ্রমের মহিলাদের লেখা এই পত্রিকায় স্থান পেত। রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখাও পত্রিকাটি ছেপেছিল। এক বছর চলার পর পত্রিকাটি *শান্তিনিকেতন* পত্রের সঙ্গে মিলিত হয়, এর আয়ু মাত্র দু-বছর। উল্লেখ করা যেতে পারে, অনেক পরে *শ্রেয়সী* পত্রিকাটির নবপর্যায় প্রকাশ হয়েছিল, সেটি এখনও জীবিত আছে।

বঙ্গনারী নামে একটি পত্রিকা ১৩৩০-এর আশ্বিনে ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় চিন্ময়ী দেবীর সম্পাদনায়।

বঙ্গলক্ষ্মী

১ম বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৩২ সাল। [৪র্থ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

বিশ্বের নারী-জাগরণের যে বিভিন্ন কর্মোদ্যম আরম্ভ [illegible] বঙ্গদেশে নারীজাতির কল্যাণের জন্য এই আন্দোলন তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জাগরণের উদার [illegible] আমাদের দেশে কর্মীরা সরোজনলিনীর পবিত্র [illegible] একটি হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। প্রাচ্য ও [illegible] সমস্ত বিশিষ্টতার পূর্ণ সামঞ্জস্য প্রায়শ: [illegible] নারীচরিত্রে লক্ষিত হয় না, ঘর ও বাহিরকে [illegible] সমানে বাঁধিয়া ব্যাবহারিক জীবনে তাহা [illegible] তুলিতে আমরা বড় বেশী দেখিতে পাই না।

সরোজনলিনীর কর্ম-প্রচেষ্টা বঙ্গীয় নারী-জড়-শরীরে ক্রমে ক্রমে একটা সঞ্জীবন-[illegible] আনিয়া দিতেছে। দিন দিন যে ভাবে বাংলার [illegible] নারী-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহা দ্বারা আমরা [illegible] জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আশান্বিত [illegible]। মনে হয় এইরূপে বঙ্গের নারী-শক্তি জাগরিত [illegible] দেশ, সমাজ এবং পরিবারকে নূতন সঞ্জীবন-মন্ত্র [illegible] করিয়া জাতীয় জীবনে নবপ্রাণের সঞ্চার করিয়া দিবে।

* * * *

আমাদের কলিকাতায় কেন্দ্র-সমিতি প্রতিষ্ঠার পর [illegible] বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে মহিলা-সমিতির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া অসংখ্য পত্র পাইতেছি। অনেকে নিজেদের কর্ম-প্রণালী নির্দ্ধারণের জন্য উপদেশাদি প্রার্থনা করিয়াছেন। কেহ কেহ কি ভাবে দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। সকল সফলতার মূলেই সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি। যদি প্রতি গ্রামে নারী-সমাজ সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিজেদের কল্যাণ-কার্য্যে ব্রতী হন, তাহা হইলেই তাঁহারা বিশিষ্টরূপে দেশসেবা করিতে পারিবেন। পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান, দুঃখ-বিপদে সাহায্য, নারী-সমাজের নানা অভাব দূর করিবার জন্য সম্মিলিত চেষ্টা, প্রতি গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় ও নারী-সমিতি প্রতিষ্ঠান, নানাপ্রকার ব্যাবহারিক শিল্প-শিক্ষা গ্রহণের আয়োজন এবং তৎসঙ্গে পল্লী-সংগঠনে পুরুষদিগকে নানাভাবে প্রণোদিত করা ইহাই প্রত্যেক মহিলার কর্তব্য হওয়া উচিত। বাংলার প্রতি পল্লীতে যদি একজন নারীও অগ্রণী হইয়া কর্তব্য কর্মে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ মহিলা-সমিতিতে ছাইয়া যাইবে। একজন একজনের অনুপ্রেরণায় যদি সমস্ত দেশে এইরূপ বিরাট আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে একটী পল্লীতে একের আত্মোৎসর্গ এবং মহত্ত্বটাকে সকলই সম্ভব হইতে পারে।

সরোজনলিনী দত্তের *বঙ্গলক্ষ্মী*

বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে ১৩৩২-এর অগ্রহায়ণ মাসে। সরোজনলিনী দত্ত ছিলেন এর সম্পাদক। তাঁর 'নারীমঙ্গল সমিতি'র মুখপত্র ছিল পত্রিকাটি। নারী জাগরণকে সাধুবাদ জানিয়ে পত্রিকাটি একে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার আহ্বান জানায় বাংলার নারীসমাজকে। নানা স্থানের মহিলা সমিতির খবর এতে প্রকাশিত হত। মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিষয়ে পত্রিকাটি নানা পরামর্শ দিত, এ ব্যাপারে পত্রিকাটির উদ্যোগ ছিল প্রশংসনীয়। মেয়েদের বহু লেখাও প্রকাশিত হত পত্রিকাটিতে।

১৩৩২, পৌষ সংখ্যার 'সম্পাদকীয়'তে পত্রিকাটি বলে—

> 'বঙ্গলক্ষ্মী' যেন বাংলার নারীসমাজের মধ্যে শক্তির উন্মেষ করিয়া দিতে পারে, শান্তিধারা বর্ষণ করিতে পারে, নবজাগরণের উন্মাদনায় তাহাকে উদ্দীপিত করিতে পারে।

পত্রিকার ২য় সংখ্যায় 'হিরণ্ময়ী বিধবা শিল্পাশ্রমের' খবর দিয়ে বলা হয়—

পরলোকগতা হিরণ্ময়ী দেবী বহুবৎসর ধরিয়া অশেষ পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া বাংলাদেশের দুঃস্থ বিধবাদের আশ্রয়দান ও অর্থকরী—শিল্প শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার জন্য এই আশ্রমটি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এখানে পঁচিশটি দুঃস্থ বিধবাকে বিনাব্যয়ে ভরণপোষণ ও শিক্ষাদান করিবার ব্যবস্থা আছে।

জয়শ্রী

প্রথম বর্ষ	বৈশাখ, ১৩৩৮	প্রথম সংখ্যা

মেয়েদের কাগজ

প্রথম সংখ্যা *জয়শ্রী*তে প্রকাশিত হয়েছিল 'মেয়েদের কাগজ' নিয়ে লেখা

মিশনারি মহিলা দ্বারা প্রকাশিত একটি বিশ শতকের পত্রিকা হল *মহিলাবান্ধব*। মিসেস এস. কে. মণ্ডল-এর সম্পাদনায় *মহিলাবান্ধব* কিছুদিন প্রকাশিত হয়েছিল। নারীদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে, বিজ্ঞানমনস্ক মনোভাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পত্রিকাটি উৎসাহী ছিল।

১৩৩৮-এর বৈশাখে *জয়শ্রী* পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়—এই পত্রিকাটিও নারীর ব্যক্তিত্ব গঠনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। লীলাবতী নাগ (পরে রায়) পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। ছ-

বছর চলার পর পত্রিকাটি বছর দেড়েক বন্ধ থাকে, পরে আবার প্রকাশিত হয়। 'মেয়েদের কাগজ' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা পত্রিকাটি প্রকাশ করে। পত্রিকাটির অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ও রাজনীতি সচেতনতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গৃহলক্ষ্মী ১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসে আত্মপ্রকাশ করেছিল—এটি যে মেয়েদের গৃহকর্তব্যের ওপরে জোর দিত তা এর নামকরণ দেখে বোঝা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে এঁরা প্রগতিশীল নারী আন্দোলনের মুখপত্র রূপে এটিকে গড়ে তুলতে চান। ১৩৪৫-এর ভাদ্র থেকে সেভাবেই এটি নতুন রূপে প্রকাশিত হয়।

বিজয়িনী অপর একটি পত্রিকা যা ১৩৪৭-এর আশ্বিনে শিলচর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ওই অঞ্চলে সে সময়ে এই পত্রিকাটি গুরুত্ব সহকারে তার দায়িত্ব পালন করেছিল।

বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মেয়েদের জন্য প্রকাশিত এই পত্রিকাগুলির আলোচনা থেকে আমরা লক্ষ করতে পারি উনিশ শতকের পত্রিকাগুলির বৈশিষ্ট্যের পর নতুন যে বিষয়গুলি পত্রিকার জগতে যুক্ত হয়েছে তা হল—

১) মেয়েদের স্বাধীনতা সম্পর্কে অনেক আড়ষ্টতা দূর হওয়া ;

২) মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার কথার উল্লেখ ও এ বিষয়ে তাদের সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি ;

৩) মেয়েদের রাজনৈতিক অধিকার ও সচেতনতা সম্পর্কে উৎসাহ দান এবং নিজেদের স্পষ্ট বক্তব্য প্রকাশ ;

৪) মুসলমান মেয়েদের আরও সচেতনতা, লেখালিখির ক্ষেত্রেই শুধু নয়, পত্রিকার জগতে তাঁদের আত্মপ্রকাশ ও একের পর এক কাগজ সাফল্যের সঙ্গে প্রকাশ।

স্বাধীনতার পর মেয়েদের যেসব কাগজ বেরিয়েছিল, সেগুলি কোন পথে এগিয়েছিল—সে আলোচনা অন্য কোথাও করা যাবে।

তথ্যসূত্র :

অবলাবান্ধব
বামাবোধিনী পত্রিকা
বঙ্গমহিলা
মহিলা
পরিচারিকা
খ্রীষ্টীয় মহিলা
অন্তঃপুর
সুপ্রভাত
বঙ্গলক্ষ্মী
শ্রেয়সী
জয়শ্রী

এছাড়াও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বাংলা সাময়িক পত্র (২ খণ্ড), *সাময়িক পত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী*, স্বপন বসু-র *সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ* (দ্বিতীয় খণ্ড), ভারতী রায়-এর *সেকালের নারীশিক্ষা : বামাবোধিনী পত্রিকা*—বইগুলি থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। *আন্নেসা* সম্পর্কে খবরাখবর মালেকা বেগম-এর 'মহিলা সম্পাদিত মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্রিকা' নামক প্রবন্ধ থেকে গ্রহণ করেছি।

সু বি ম ল মি শ্র

শিশু-কিশোর সাময়িকপত্র

ক. উনিশ শতক

উনিশ শতকের প্রথমে বাংলা তথা ভারতে শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে নবজাগরণের জোয়ার আসে, তাতে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রীরামপুর মিশনের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মিশনারিরা এদেশে ধর্মপ্রচার করতে এসে শিক্ষা বিস্তারের দিকে নজর দিলেন এই ধারণায়, ভারতীয়দের কুসংস্কার দূর করতে পারলেই তারা খ্রিস্টান হবে। ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি বাংলায় খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কেরিকে বাংলাদেশে পাঠান। ১৭৯৯-তে আরও কয়েকজন মিশনারিকে পাঠানো হয়। এই দলে ছিলেন ডাঃ জশুয়া মার্শম্যান এবং রেভারেন্ড উইলিয়াম ওয়ার্ড। তাঁদের অনুরোধে কেরিও শ্রীরামপুরে এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন। কেরি ছিলেন সংগঠক ও প্রচার বিশারদ, ওয়ার্ড মুদ্রণশিল্পী ও মার্শম্যান অভিজ্ঞ স্কুল শিক্ষক।

তাঁরা অনুভব করলেন, সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনটি জিনিস বিশেষভাবে আবশ্যক—(১) পাঠ্যপুস্তক (২) অর্থ (৩) তত্ত্বাবধান। তাই তাঁরা বিবিধ বিষয়ের ওপর বই লেখা, ছাপা ও প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব মেটাবার জন্য তাঁদেরই উদ্যোগে নর্মাল স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে রেভারেন্ড মে চুঁচুড়াতে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খোলেন। ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি, লেডিস সোসাইটি ও লেডিস অ্যাসোসিয়েশন কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েদের জন্য প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। ১৮১৭-তে হিন্দু কলেজ, ১৮১৮-র ১৫ জুলাই শ্রীরামপুর কলেজ এবং অনেক আগেই শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছে। ছোটো ছোটো শিক্ষার্থীদের কম দামে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের উদ্দেশ্যে ৪.৭.১৮১৭-তে কলকাতায় স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হল--যার প্রাণপুরুষ ছিলেন উইলিয়ম কেরি। মিশনের উদ্যোগে স্কুল, কলেজ, প্রেস সবই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে--এখন প্রয়োজন একটি সাময়িক পত্রের। ১৮১৮-এর এপ্রিলে প্রকাশিত হল মাসিকপত্র *দিগদর্শন*। বাংলা সাময়িক পত্রিকার যাত্রা শুরু হল।

জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও এটির নাম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত থাকত 'যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ'--তবে বিষয়বস্তুতে বোঝা যায় যে শুধু যুবলোকের জন্য নয়, কিশোরদের বিশেষত ছাত্রদের নানা বিষয়ে অবহিত করানো ও উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যই ছিল মুখ্য। ভূগোল, ইতিহাস, কৃষিকথা, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, পাঠশালা বিষয়ক নানা খবর ছাড়াও, নানা স্বাদের রচনা ছোটোদের জন্য ছাপা হত। নীতিশিক্ষার নানা নীরস উপাদানে ভরিয়ে না তুলে সেকালের উপযোগী

নানা বিষয়ের প্রতি ছাত্রদের কৌতূহলী করে তোলার প্রয়াস ছিল। জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে যাতে তরুণ শিক্ষার্থীরা পাঠের আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়, সেদিকে সম্পাদকের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। দুর্বোধ্য দুরূহ শব্দ যাতে কোনোভাবেই ব্যবহৃত না হয় সে ব্যাপারে সম্পাদক সজাগ থাকতেন এবং ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় পত্রিকাটির শেষে ১০ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি শব্দাভিধান ছাপা হয়েছে যাতে পত্রিকার নিবন্ধগুলিতে ব্যবহৃত কঠিন শব্দগুলির অর্থ করে দেওয়া হয়েছে।

আর একটা ব্যাপার, এটি শুধু বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হত না--একটি ইংরেজি সংস্করণ ও আর একটি ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষী সংস্করণ প্রকাশিত হত। প্রথম সংখ্যার বাংলা সংস্করণের সূচি ছিল এইরকম--আমেরিকার দর্শন বিষয়, হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ, হিন্দুস্থানের বাণিজ্য, বলুন দ্বারা সাদলর সাহেবের আকাশ গমন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিবরণ, শঙ্কর তরঙ্গের কথা। (প্রথম ভাগ, পৃ. ১--১৬)

দিগ্‌দর্শন প্রকাশের চার বছর পর 'স্কুল বুক সোসাইটি' প্রকাশ করল *পশ্বাবলী*। এটির প্রকাশ ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। এটিই প্রথম সচিত্র বাংলা সাময়িক পত্র। এর প্রতিটি সংখ্যায় একটি করে জন্তুর বৃত্তান্ত আর প্রথম পৃষ্ঠায় বা মলাটে থাকত সেই জন্তুর একটি ছবি। *পশ্বাবলীর* সংখ্যাগুলি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে কয়েকটি ইংরেজি রচনা, সঙ্গে থাকত বাংলা অনুবাদ আর দ্বিতীয় পর্যায়ে জন্তু পরিচিতি। কখনও বাঘ, কখনও হাতি-গণ্ডারের বিস্তৃত বিবরণ। এই সব জন্তুর বিবরণ থাকত ছড়ার আকারে। প্রথম ছটি সংখ্যায় ছবি সহ ছ'টি জন্তুর বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি যথাক্রমে--সিংহ, ভালুক, হস্তী, গণ্ডার, নদ্যশ্ব (হিপ্‌পোপটেমাস), ব্যাঘ্র ও বিড়াল।

পশ্বাবলীর ভাষা সহজ, প্রাঞ্জল ও আড়ষ্টভাববর্জিত। তবে ছেদচিহ্নের পরিবর্তে ইংরেজির অনুসরণে ফুলস্টপ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে প্রকাশিত ইংরেজি অংশের সংগ্রহ ও সংকলন করতেন লসন এবং সেগুলি বাংলায় অনুবাদ করতেন ডব্লু. এইচ. পিয়ার্স। লসনের মৃত্যুর পর পত্রিকাটির দ্বিতীয় পর্যায়ে পরিচালনা করতেন রামচন্দ্র মিত্র। তিনি ১৬টি সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন।

পশ্বাবলী-র পর ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর কৃষ্ণধন মিত্রের সম্পাদনায় *জ্ঞানোদয়*-এর প্রকাশ। শিশুপাঠ্য এই পত্রিকাটি দীর্ঘজীবী হয়নি। সব মিলিয়ে মাত্র ২০টি সংখ্যা বেরিয়েছিল। পত্রিকাটির ভাষা ঈষৎ সংস্কৃত ঘেঁষা, যদিও বিষয়বস্তু ছিল সবই মৌলিক। উপদেশ, নীতিকথা, ইতিহাস ও ভূগোলের নানা কথা এতে পরিবেশিত হত। এটি বাঙালি প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা। *জ্ঞানোদয়* বন্ধ হয়ে যাবার পর দীর্ঘ ১৩ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে রামচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় *পক্ষীর বৃত্তান্ত-অরিন্থোলজি নং--১'* নামে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক স্বল্পজীবী কিশোর পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। এরপর পঞ্চাশ-ষাটের দশকে বেশ কয়েকটি কিশোর-উপযোগী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিলেতি পেনি ম্যাগাজিনের আদর্শে *বিবিধার্থ সংগ্রহ* (১৮৫১), প্রিয়মাধব বসু ও যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের *বিদ্যাদর্পণ* (১৮৫৩), খ্রিস্টান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটির *সত্যপ্রদীপ* (১৮৬০), রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও প্রাণধন দত্তের *রহস্য সন্দর্ভ* (১৮৬৩) যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের *অবোধবন্ধু* (১৮৬৬) ও ব্রজমাধব বসুর সম্পাদনায় *জ্যোতিরিঙ্গণ* (১৮৬৯) প্রকাশিত হয়।

সত্যপ্রদীপ বছর পাঁচেক চলেছিল। *অবোধবন্ধু*-র প্রথম সম্পাদক ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, পরে সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস বিষয়ক রচনার পাশাপাশি গল্প কবিতাও ছাপা হত। পত্রিকাটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল—গ্রন্থ সমালোচনা। এর আগে কোনো ছোটোদের পত্রিকায় গ্রন্থ সমালোচনা ছাপা হয়নি। 'বামাদিগের রচনা' নামে একটি বিভাগও ছিল। *অবোধবন্ধুতে* কিশোরোপযোগী কিছু রচনা প্রকাশিত হলেও এটিকে কিশোর-পাঠ্য মাসিক পত্রিকা বলা সঙ্গত নয়। এমন বহু গদ্য, পদ্য এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত যা আদৌ শিশু-কিশোরদের উপযোগী নয়। বিহারীলালের 'বঙ্গ সুন্দরী কাব্য', নিসর্গ 'সন্দর্শন'-এর অধিকাংশ রচনা, 'সুরবালা' কাব্যের কিছু অংশ এতে প্রকাশিত হয়েছিল। 'বামাদিগের রচনা' অংশে কৈলাসবাসিনী দেবী ও বামাসুন্দরী দেবীর রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি শুধুমাত্র 'বালকপাঠ্য' হয়ে থাকুক—এমন ইচ্ছাও সম্পাদকের ছিল না—এমন কথা প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় (নবপর্যায়) উল্লিখিত আছে। *জ্যোতিরিঙ্গণ*-এ ১৮৬৯ জুলাই সংখ্যায় ঈগল, সিংহকে নিয়ে রচনা, সর্পের প্রতি (কবিতা), আগস্ট সংখ্যায় 'জীবনালোক' (কাহিনি) 'প্রজাপতি' (প্র.) ও সেপ্টেম্বর সংখ্যায় হস্তী (প্রবন্ধ) ছাড়াও সন্তানের প্রতি মাতার কর্তব্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ছিল। এই পত্রিকাটির নামপৃষ্ঠায় লেখা থাকত 'স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের নিমিত্ত মাসিকপত্র'।

উনিশ শতকের সত্তরের দশকে আমরা দুটি পাক্ষিক সাময়িকপত্রের সন্ধান পাচ্ছি। একটি মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ সম্পাদিত *বিশ্বদর্পণ* (১৮৭২-এর জানুয়ারি) ও অপরটি ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত *বালকবন্ধু* (২০ বৈশাখ ১৮০০ শক)। প্রথমটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে : বালক বালিকাগণের শিক্ষোপযোগী বিজ্ঞান সাহিত্যাদি বিষয়ক প্রস্তাব এবং রাজনীতি, ধর্মনীতি, সামাজিক রীতিনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করা প্রচারকদিগের অভিপ্রেত। প্রথমে পাক্ষিক থাকলেও তিনমাস পরে এটি মাসিকে রূপান্তরিত হয়।

বাংলার বালকপাঠ্য দ্বিতীয় পাক্ষিক হিসেবে *বালকবন্ধুর* স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করার মতো। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় যাতে ছোটোরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে সেদিকে সম্পাদকের বিশেষ নজর ছিল। ছবি দিয়ে, ছড়া দিয়ে, দেশবিদেশের বিচিত্র সংবাদ পরিবেশন করে পাক্ষিকটিকে তিনি মনোরম করে তুলেছিলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন টাইপে ছাপা, প্রতি সংখ্যায় বক্স করে একটি সংস্কৃত নীতিশ্লোক, তার বাংলা অর্থ, উপদেশ, হেঁয়ালি, ছড়ার মাধ্যমে ব্যাকরণ ও গণিতের জটিল সূত্র, বালকদের নিজের লেখা সবকিছু দিয়ে আটপৃষ্ঠার মধ্যে বেশ গুছিয়ে সম্পাদক এটি প্রকাশ করতেন। বালকদের রচনার শেষে কবিতা লেখকের নাম ও বয়সের উল্লেখ না থাকলেও স্কুলের নাম থাকত সংক্ষেপে। প্রতিটি সংখ্যায় কাঠখোদাই এক রঙা ছবিও থাকত। বিষয়বস্তু নির্বাচন, বিন্যাস রীতি, ভাষার সৌকর্য, অলঙ্করণ প্রভৃতির সাহায্যে *বালকবন্ধু* সেকালের এক উল্লেখযোগ্য শিশু পত্রিকারূপে যথেষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছিল। তবে এটাও স্বীকার করা দবকার, ব্রাহ্মনেতার শিশুপাঠ্য কাগজেও ধর্ম নিরপেক্ষতা বজায় থাকেনি। মনে রাখা দরকার *বালকবন্ধু*-র প্রকাশের কাল বাংলাদেশে নানা ধর্মীয় সংঘর্ষ ও আন্দোলনের কাল। ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম, সনাতন হিন্দুধর্মের সঙ্গে প্রাচীন ইসলাম ধর্মের সংঘাত অনেকটাই গা-সহা হয়ে গেছে। তাই পত্রিকায় সরাসরি ব্রাহ্মধর্মের প্রচার না উঠে এলেও 'ব্রহ্মাস্তুতি' স্থান পেয়েছে কোনো কোনো কবিতায়। আবার ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতদের মাথায় 'অন্ধ টিকটিকি' ঝুলিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করে হিন্দুধর্মের গোঁড়ামিকেই বিদ্রূপ করা হয়েছে ও *বালকবন্ধু*-র শিশুচরিত্রে দোষদুষ্টি ঘটেছে। তবে *বালকবন্ধু*-র সামনে কোনো আদর্শ ছিল না। এই ত্রুটিগুলি স্বীকার করে নিয়েও শিশুদের মনের মতো রচনা প্রকাশ করে *বালকবন্ধু*, শিশু-সাময়িকের পথিকৃতের সম্মান দাবি করতে পারে।

সম্পাদক এই পত্রিকার মাধ্যমে কিশোর বয়স থেকে যাতে কুসংস্কার দূর করা যায়—সেজন্য কিশোরদের উদ্দেশ্যে লিখলেন, "কুসংস্কার ত্যাগ করিতে হইবে। ভূত-পেতনী নাই, অন্ধকারে ভূত-পেত্নীর ভয়ে কেঁচর মতো জড়সড় হইবে না। দক্ষিণ অঙ্গ নাচিলেও আশায় ভুলিয়া উঠিবে না। হাঁচিকেও দোষের মনে করিও না (২৪ শ্রাবণ ১৮০০ শক—৯ম সংখ্যা) প্রভৃতি।

এরপর আশির দশকে এ জাতীয় বেশ কয়েকটি সাময়িকপত্রের প্রকাশ ঘটেছিল। সেগুলি হল জানকীপ্রসাদ দে'র পরিচালনায় *বালক হিতৈষী* (মা) কার্তিকে, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের *আর্যকাহিনী* (সাপ্তাহিক) (৮ নভেম্বর ১৮৮১)। এটিই প্রথম সাপ্তাহিক বালক-বালিকাপাঠ্য পত্রিকা। প্রমদাচরণ সেনের *সখা* মাসিক জানুয়ারি ১৮৮৩) ঢাকা থেকে অক্ষয়কুমার গুপ্তের সম্পাদনায় *বালিকা* (বালিকাপাঠ্য পত্রিকা) ভাদ্র ১২৯০তে, বারাণসী থেকে ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের পাক্ষিক *সুনীতি* কার্তিক ১২৯০তে—এটি আবার তিনবছর পরে *সুনীতি ও সংবাদ* নামে প্রকাশিত হয়। জি. এইচ. রুজের সম্পাদনায় মাসিক *বাল্যবন্ধু* কার্তিক ১২৯০তে, অমৃতলাল বসুর *ভোজবাজী* (মা) কার্তিক ১২৯০তে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় *বালক* (মা.) বৈশাখ ১২৯২তে, যশোহর থেকে নীতি বিষয়ক বালকপাঠ্য মাসিক পত্রিকা *সুখীপাখী* শ্রাবণ, ১২৯৫তে সারদাপ্রসাদ বসুর সম্পাদনায়, বনগ্রাম (যশোহর) ছাত্র সমিতি থেকে প্রিয়নাথ বসুর সম্পাদনায় *শিক্ষা* (মা.) পৌষ ১২৯৫ যশোহর জিলা স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী কাব্যতীর্থের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক *শুক-সারি* (মার্চ ১৮৮৯)। প্রকাশিত এতগুলি পত্রিকার মধ্যে *সখা* ও *বালক* কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিল।

বালকবন্ধুর আদর্শকে আত্মস্থ করেই *সখার* প্রকাশ ঘটেছিল। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক প্রমদাচরণের বিশেষ যত্নে ও আন্তরিকতায় *সখার* উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। *সখা* প্রমদাচরণের দুঃখের ধন। নির্মম কৃচ্ছ্রসাধনা, আত্মত্যাগের ফলে *সখা* জন্ম নিল বটে, প্রমদাচরণ কিন্তু রাজরোগে আক্রান্ত হলেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুন মাত্র ২৬ বছর বয়সে প্রমদাচরণ অকালপ্রয়াত হলেন। প্রমদাচরণ দেড়বছর *সখার* সম্পাদনা করেছিলেন (১৮৮৩—১৮৮৪) এরপর প্রমদাচরণের শিক্ষক শিবনাথ শাস্ত্রী (জুলাই ১৮৮৪ থেকে ডিসেম্বর ১৮৮৬), অন্নদাচরণ সেন (১৮৮৭-১৮৯২) এবং নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৮৯৩-৯৪) পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে *সখা* ভুবনমোহন রায় পরিচালিত *সাথীর* সঙ্গে মিলিত হয়ে *সখা ও সাথী* নামে প্রকাশিত হতে থাকে। *সখার* প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লিখেছিলেন, 'আমাদের হতভাগ্য দেশে বালক-বালিকাদিগের জ্ঞানের ও চরিত্রের উন্নতির জন্য অধিক লোক চিন্তা করে না। *সখা* পিতামাতার উপদেশ এবং শিক্ষকের শিক্ষা দুই-ই প্রদান করবে।" এ জাতীয় অন্যান্য পত্রিকার মতো এতে যেমন গল্প, কবিতা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, মনীষীজীবনী থাকত, তেমনি থাকত খেলাধুলার কথা, স্বাস্থ্য পরিচর্যার কথা,

এমনকি মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীর কথাও। লিখতেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, শিবনাথ শাস্ত্রী, জলধর সেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায়, রাজনারায়ণ বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রমুখ লেখক-লেখিকাবৃন্দ। বিপিনচন্দ্র পালের রাজনৈতিক প্রবন্ধ 'সুরেন্দ্রবাবুর কারাবাস' ১ম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়। শিবনাথ-কন্যা হেমলতা দেবীর (পরে সরকার) ও কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়। সম্পাদক প্রমদাচরণের 'ভীমের কপাল' নামে একটি কিশোর উপন্যাস 'সখা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। *সখায়* রবীন্দ্রনাথ না লিখলেও *সখা ও সাথীতে* ১৩০২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় কবির 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৯৫-এর আগস্ট সংখ্যায় কবির জীবনালেখ্যও প্রকাশিত হয়েছিল—সেপ্টেম্বর বা ভাদ্র সংখ্যায় কবি নিজেই সে লেখার দোষত্রুটি সংশোধন করে দেন। এটিই কবির প্রথম মুদ্রিত জীবনী।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় মাসিক *বালক* পত্রিকার প্রকাশ। ঠাকুরবাড়ির বালক-বালিকাদের প্রতিভা বিকাশের কথা ভেবেই এই পত্রিকার পরিকল্পনা। রবীন্দ্রনাথের 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান'—প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়। অজস্র গল্প, নাটক, প্রবন্ধ লিখেছেন কবি এই পত্রিকায়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোম্বাই প্রবাসের মনোরম অভিজ্ঞতা, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা শর্টহ্যান্ড নিয়ে মজাদার একটি ছড়া, জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর একটি বিলিতি রোমাঞ্চ কাহিনির অনুবাদ 'আশ্চর্য পলায়ন' নামে, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বাধীনতা' (বালকের রচনা), হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বারো আনা ষোলো আনা', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুখচেনা', নরেন্দ্রবালা দেবীর 'সূর্যের কথা', সত্যপ্রসাদ গঙ্গো াপাধ্যায়ের 'দার্জিলিং-যাত্রা' প্রভৃতি কয়েকটি রচনা প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি স্বল্পজীবী হলেও সাময়িকপত্রের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিল। সমালোচক নবেন্দু সেন বলছেন : 'শিশু পত্রিকার অনন্য সম্ভাবনায় ভরা, ঠাকুর পরিবারের রুচি ও প্রভাবপুষ্ট 'বালক' পত্রিকাটি স্থায়ী হয়েছিল মাত্র এক বৎসর। তারপর বিখ্যাত বয়স্ক-পত্রিকা 'ভারতী'র সঙ্গে পত্রিকাখানি সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল।'

বালক বালিকাদিগের মধ্যে 'আর্যরীতিনীতির প্রবর্তনা ও আর্যভাবের উদ্দীপনা' সৃষ্টির জন্য ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বারাণসীর ধর্মামৃত যন্ত্রালয় থেকে প্রকাশিত হোল *সুনীতি*। আর 'এতদ্দেশীয় বালক বালিকাদের মধ্যে খ্রিস্টতত্ত্ব প্রচারের জন্য' রেভা. জে. ই. পেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল *বালাবন্ধু*। *ভোজবাজী* পত্রিকায় ইন্দ্রজাল, রসায়ন সংক্রান্ত ছোটদের উপযোগী রচনা প্রকাশিত হত।

এরপর বাংলাসাহিত্যে *মুকুল*-এর আত্মপ্রকাশ। ১৩০২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে (জুন-জুলাই ১৮৮৫) এটি প্রকাশিত হয়। স্মরণ করা যেতে পারে গুরুচরণ মহলানবিশের কন্যা সরলা, ভগবানচন্দ্র বসুর কন্যা অর্থাৎ জগদীশচন্দ্র বসুর বোন লাবণ্যপ্রভা, চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা কামিনী রায়, শিবনাথের কন্যা হেমলতা দেবী প্রমুখের উদ্যোগে একটি নীতি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী ওই বিদ্যালয়ের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁরাই উদ্যোগী হয়ে একটি কিশোরপাঠ্য পত্রিকার কথা ভাবেন। *প্রবাসী* সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর আত্যন্তিক আগ্রহে শিবনাথকে সম্পাদক করে *মুকুল* প্রকাশ করা হয়। অনধিক ২০ পৃষ্ঠায় এই সচিত্র পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ছিল মাত্র পাঁচ সিকা। প্রথম বছর *মুকুলে* (আষাঢ়-চৈত্র) দশ মাস বেরিয়েছে, তারপর প্রতি বছর ঠিক ঠিক

বেরিয়েছে। তবে ১৩০৪ অর্থাৎ ৩য় ভাগে আশ্বিন ও কার্তিক (৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা) যুগ্মসংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩০২ থেকে ১৩০৭ এর চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদনা করেন আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী। ১৩০৮ থেকে অন্তত ১৩২১ পর্যন্ত হেমচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় *মুকুল* প্রকাশিত হয়েছে। এত দীর্ঘকাল সুনামের সঙ্গে *সন্দেশ* ছাড়া অন্য কোনো শিশুপত্রিকা চলেনি। নানা দিক দিয়ে এই পত্রিকাটির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। 'শিশু' কাদের বলা হবে, 'শিশুপত্রিকা' কাকে বলে, শিশুপত্রিকা কাদের জন্য—এ সবই তিনি *মুকুল*-এ জানিয়েছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত *মুকুল*-এ তখনকার অনেক নামিদামি লেখক লিখেছেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমেশচন্দ্র দত্ত, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রমুখ ঐতিহাসিক, জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামব্রহ্ম সান্যাল প্রমুখ বিজ্ঞানী, সাহিত্যরথীদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও উপেন্দ্রকিশোর, কামিনী রায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, প্রিয়ংবদা দেবী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, হেমলতা সরকার, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ। শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত *মুকুল*-এ লেখকের সংখ্যা ছিল ১০৭ জন।

এরপর ১৮৯৬-তে গুরুপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সম্পাদনায় *শৈশবসখা* ও উইলিয়াম কেরির সম্পাদনায় *স্নেহময়ী* নামক একটি বালকপাঠ্য মাসিক পত্রিকার সন্ধান পাওয়া যায়। কোনোটিই দীর্ঘজীবী হয়নি। ১৮৯৮-তে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় রাজ্যেশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত *অঞ্জলি*। ১ম সংখ্যায় তিনি এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, "এই শিক্ষা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, বালক বালিকাদিগকে সুশিক্ষিত করা ইহার প্রাণ।" কয়েক বছর পর এর শুধু নাম পরিবর্তিত হয়নি, এটি বালকপাঠ্যও থাকেনি। একই বছরে 'কয়েকজন ছাত্র কর্তৃক সম্পাদিত *কুসুম* প্রকাশিত হয়। এরপর বৈকুণ্ঠনাথ দাসের সম্পাদনায় *সখীর* আত্মপ্রকাশ ১৩০৭ বঙ্গাব্দে। ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় (মাঘ ১৩০৭) সখারাম গণেশ দেউস্করের প্রবন্ধ, সুরমাসুন্দরী ঘোষের কবিতা, দীনেন্দ্রকুমারের গল্প ও আরও কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। উনিশ শতকের আলোচনায় একেবারে শেষ পত্রিকা বসন্তকুমার বসুর সম্পাদনায় বালকপাঠ্য মাসিক *প্রকৃতি* (চৈ. ১৩০৭) এটির নামপৃষ্ঠায় মুদ্রিত থাকত 'Under the supervision of students'। পত্রিকায় চারটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে—'ইহার প্রথম উদ্দেশ্য ছাত্রগণের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার চর্চা করা, অধিকাংশ ছাত্ররা বাংলাভাষায় লিখিতে পারে না।...' দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (পরে দার্শনিক), কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া মোজাম্মেল হক, আবদুল করিমেরও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮১৮ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ৩৮টি 'পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। এদের মধ্যে কয়েকটি মাত্র দীর্ঘজীবী হয়। অধিকাংশ পত্রিকাই তিনবছরের কম চলেছে। মুদ্রণ যন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাগুলির অলংকরণের মান ছাড়াও মুদ্রণে স্পষ্টতা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। চাহিদা বাড়ার ফলে বেশি সংখ্যায় ছাপাও হতে শুরু করে। এভাবে উনিশ শতকের পত্রপত্রিকা সামনে রেখেই বিশ শতকের শিশু কিশোর বিষয়ক পত্রপত্রিকার যাত্রা শুরু হল।

খ. বিশ শতক

বিশ শতকের প্রথম দশকেই পাচ্ছি বেশ কয়েকটি পত্রিকা। কলকাতা থেকে এ. কে. ফজলুল হকের সাপ্তাহিক *বালক* (১৯০১), হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের *আশা* (১৯০২), এবং নোয়াখালি থেকে মহিমচন্দ্র চক্রবর্তীর *আশা,* কলকাতা থেকে প্রমথনাথ রায়ের *অতিথি* (১৯০২), ১৯০৪-এ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় মাসিকপত্র *ঊষা* ও নববিধান ব্রাহ্মসমাজ (১৯০৭) *প্রকৃতি* নামে সচিত্র পত্রিকা প্রকাশ করেন। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় ও মাইকেলচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লেখকবৃন্দের মধ্যে ছিলেন। যোগেশচন্দ্র 'চীনী', 'ডাইল-ভাত', 'ঝড়-বাদল', ভূমিকম্প, 'বেলীফুল' নামে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখেন। অন্যান্য বিভাগগুলি ছাড়া এখানে 'আমাদের দেশের কথা' ও 'স্বাস্থ্যরক্ষা' নামে দুটি বিশেষ বিভাগ ছিল। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাড়াও জীবেন্দ্রকুমার দত্তের কয়েকটি কবিতা; সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও দীনেশরঞ্জন দাসের গদ্য ও পদ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ঠিক তার পরের বছর *বাল্যসখা* (১৯০৮) বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় ও শশিভূষণ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। প্রথমে বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় (১ম--৫ম) ভাগ সম্পাদনা করেন ও ৬ষ্ঠ--৭ম থেকে সম্পাদক হন শশিভূষণ। এই *বাল্যসখার* ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় অর্থাৎ ফাল্গুন ১৩১৪-তে পাঠানুরাগ (প্র.), প্রকৃত স্বদেশ (প্র.), জানোয়ারের বুদ্ধি (প্র.) প্রভৃতি নামবিহীন রচনা আছে। ১৩১৫-১৩১৬ এই দু'বছর কোনো শিশু-সাময়িক প্রকাশিত হয়নি। ১৩১৭-তে চারটি পত্রিকার প্রকাশ--ঢাকা থেকে অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রীর *তোষিণী* (মা.), তারাপ্রসন্ন ঘোষের *বাল্যাশ্রম* (মা.) হেমেন্দ্রনাথ ঘোষের *সোপান* (মা) ও অবিনাশচন্দ্র বসুর *শিশুজীবন* (মা) (৭.২.১৯১১)। *তোষিণীর* প্রচ্ছদে চার চরণের এই পদ্যটি মুদ্রিত থাকত--

> তুষিতে শিশুর মন আমি গো তোষিণী
> বাঙ্গালার ঘরে ঘরে মাসে মাসে আসি
> কহিব বিচিত্র কত কবিতা কাহিনী,
> উপহার দিব আর ছবি রাশি রাশি।।

তোষিণীতে জীবজন্তুর বিবরণ ও রবিনসন ক্রুশোর অনুবাদ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এছাড়া লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন কবিশেখর কালিদাস রায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রমুখ। *সোপান* মাসিকে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি প্রভৃতি প্রকাশিত হত। এই পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় জলধর সেনের অনূদিত রাইডার হ্যাগাড়ের 'অ্যালেন কোয়ার্টারমেন' প্রকাশিত হয়। 'আত্মত্যাগ' শিরোনামে সেকালেব পণপ্রথার বলি স্নেহলতার আত্মহত্যার বিবরণ ১৩২০ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ইতিহাসের গল্প', অজিতকুমার চক্রবর্তীর কবিতা প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায়।

১৩১৭ থেকে ১৩২৭ কালপর্বে আমরা প্রায় ১৫টি শিশু-কিশোর সাময়িকপত্রের সন্ধান পাচ্ছি। এর মধ্যে আন্দুল-মৌড়ি থেকে ১টি, ময়মনসিংহ থেকে ১টি, কুচবিহার থেকে ১টি এবং বাকি ১২টি কলকাতা থেকে। ২টি বার্ষিক ও ১৩টি মাসিক। অবিনাশচন্দ্র বসুর

সম্পাদনায় *শিশুজীবন* (মা), (১৩১৭), জে. এম. বি ডানকান ও প্যাটারসনের সম্পাদনায় *বালক* (মা), (জানু, ১৯১২) প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি আট বছর জীবিত ছিল। ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যার সূচিটা নিম্নরূপ (আংশিক)—'আমাদের রাজা ও রানী', 'বোলিং' প্রবন্ধে ক্রিকেট খেলার নিয়মনীতি শেখানো হয়েছে। 'সাপে কি করিয়া খায়' নামে একটি বিজ্ঞান প্রবন্ধ, 'ভদ্রতা' নামে একটি প্রবন্ধ, 'হারানিধি' নামে একটি ছোটো গল্প প্রকাশ পায়। পত্রিকাটি আকারে বেশ বড়ো। তবে বাঙালি শিশুদের মনোরঞ্জনের কোনো প্রয়াস নেই। ডানকান, প্যাটারসন সহ আরও দুজন ইংরেজ সম্পাদক ও শেষপর্বে এক বাঙালি সম্পাদকের সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হত।

৮.৪.১৯১২তে প্রকাশিত হয় বীরেন্দ্রনাথ ঘোষের সম্পাদনায় *ধ্রুব*। মাসিকপত্রটির আখ্যাপত্রে মুদ্রিত ছিল 'বঙ্গীয় শিশুবিভাগের অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত' এবং ছেলে-মেয়েদের জন্য সচিত্র মাসিক পত্র। ১৩১৯ এর বৈশাখে এর ১ম প্রকাশ। ১৩১৯ এর বার্ষিক সূচিপত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিজয়রত্ন মজুমদার, অমূল্যচরণ সেন, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ লেখক ও লেখিকাদের মধ্যে নিরুপমা বসু ও হৈমবতী দেবীর নাম পাচ্ছি। ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় মঙ্গলাচরণ করেছেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। পরের বছরের আষাঢ় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের একটি গান মুদ্রিত হয়েছে। পত্রিকাটি খুব বেশিদিন চলেনি।

৩০.৪.১৯১২তে প্রকাশিত হল বরদাকান্ত মজুমদারের সম্পাদনায় *শিশু* (মা)। পত্রিকার পরিচালক ও সম্পাদক ছিলেন বরদাকান্ত মজুমদার এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। *শিশুতে* গল্প কবিতা ছাড়াও নানা জীবনী, বিজ্ঞান প্রবন্ধও প্রকাশিত হত। 'নানা সঞ্চয়' অংশে সত্যচরণ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের লেখা পাচ্ছি। দ্বিতীয় বছরে ৬,০০০ কপি ছাপিয়েও কম পড়ে যাওয়ায় তৃতীয় বছরে দশ হাজার ছাপাবার কথা জানা যায়।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর হিমাদ্রিচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় মাসিক *অরুণ* প্রকাশিত হয়। ছাত্ররাই লেখক। এতে কবিতা, গল্প, ভ্রমণকাহিনি ছাড়াও হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ধারাবাহিক রচনার সংখ্যা বেশি। লেখক তালিকায় ছিলেন চারুচন্দ্র নন্দী, মহেন্দ্রলাল সরকার, শকুন্তলা চন্দ্র, পশুপতি ভট্টাচার্য প্রমুখ। পত্রিকা ও গ্রন্থ সমালোচনা বিভাগ আছে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যানুরাগীদের লেখায় পুষ্ট এই পত্রিকা। প্রারম্ভিক পৃষ্ঠার উপরের দিকে 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং'...এই নীতি শ্লোকটি মুদ্রিত ছিল।

এরপর আমরা সমকালীন একটি বিশিষ্ট পত্রিকা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় *সন্দেশ* (মা) পেলাম। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল *সন্দেশ* এর প্রথম সংখ্যার প্রকাশ। *সন্দেশ* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'সন্দেশের কথা' শীর্ষক রচনায় পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপেন্দ্রকিশোর এভাবে আলোকপাত করেছেন— "আমরা যে সন্দেশ খাই, তাহার দু'টি গুণ আছে, ইহা খাইতে ভালো লাগে, আর উহাতে শরীরে বল হয়। আমাদের এই যে পত্রিকাখানি 'সন্দেশ' নাম লইয়া সকলের নিকট উপস্থিত হইতেছে, ইহাতেও যদি এই দুটি গুণ থাকে,—অর্থাৎ ইহা পড়িয়া যদি সকলের ভালো লাগে আর কিছু উপকার হয়, তবেই ইহার 'সন্দেশ' নাম সার্থক হইবে।"

উপেন্দ্রকিশোরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লীলা মজুমদারের বয়স যখন পাঁচ, তখন *সন্দেশের* প্রকাশ। ছোটোবেলার মধুর স্মৃতির কথা তিনি তাঁর আত্মস্মৃতি 'পাকদণ্ডী'তে প্রকাশ করেছেন এভাবে--'সন্দেশের প্রকাশন শিশুসাহিত্যের জগতে একটা নূতন দিনের উদ্বোধন করে দিয়েছিল। হঠাৎ যেন একদিনের মধ্যে বাংলার শিশুসাহিত্যের সমস্ত দৈন্য ঘুচে গিয়ে সে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল।'

সন্দেশে ভালো লেখা, ভালো ইলাস্ট্রেশন, ভালো-প্রচ্ছদ, ভালো ছাপা--সব ভালো পেয়ে ছোটোরা সত্যই মুগ্ধ হয়েছিল। গল্প, কবিতা, রসরচনা ছাড়াও এতে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, জীবনী, ভ্রমণ, রূপকথা, প্রবন্ধ প্রভৃতি নানা স্বাদের রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় লেখা। অধিকাংশ প্রবন্ধ লিখতেন সম্পাদক নিজেই। সুকুমার রায়ও লিখতেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সূর্যিমামার ঘরে' শীর্ষক রচনায় (অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২০) সৌরমণ্ডলের পরিচয় দিয়েছিলেন। স্বরলিপিসহ গান, খেলাধুলা সংক্রান্ত রচনা, নানা জাতীয় সংবাদ পরিবেশন, ধাঁধা প্রভৃতির নিয়মিত প্রকাশ *সন্দেশ*-কে দীর্ঘজীবী করে তুলতে সাহায্য করেছিল। মাত্র দু'বছর সাতমাস সম্পাদনা করে উপেন্দ্রকিশোর *সন্দেশ*-কে যে গতি দিয়েছিলেন--তা বহুদিন অব্যাহত ছিল। উপেন্দ্রকিশোরের কালে 'সন্দেশ' ছাপা হত বত্রিশ পৃষ্ঠার পাইকা টাইপে। উপেন্দ্রকিশোরের পরে সুকুমার যখন সম্পাদক হলেন তখন নানাভাবে *সন্দেশের* পরিবর্তন ঘটে গেল। সুকুমার পুত্র সত্যজিতের অনুভবে--"বাবার সন্দেশের চেহারাটা ঠাকুর্দার সন্দেশের থেকে আলাদা হয়ে গেল। শিশুদের পত্রিকা হঠাৎই কিশোরদের পত্রিকা হয়ে উঠলো।" মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে সুকুমার চলে গেলে ভাই সুবিনয়ের সম্পাদনায় আরও দু'বছর *সন্দেশ* বের হয়। পরে আবার *সন্দেশ* বেরিয়েছে, বন্ধও হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়েও *সন্দেশ* সম্পাদনা করেছেন সুবিনয়। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের *সন্দেশ* বন্ধ হবার পঁচিশ বছর পর এটি আবার নব কলেবরে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬১ সালের মে মাসে অর্থাৎ বৈশাখ ১৩৬৮তে *সন্দেশ* এর পুনরুজ্জীবন ঘটল। এবারে দু'জন সম্পাদক সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। দু'জনই বরণীয় ও খ্যাতিমান।

সন্দেশ এর রমরমার যুগে *বসুমতীর* সম্পাদক শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল *ছাত্র* (মা) ১৯১৪-এর জানুয়ারি মাসে। বঙ্গীয় ছাত্র সম্মিলনীর মুখপত্র রূপে এটির প্রকাশ। প্রচ্ছদে অলঙ্করণ ও বিজ্ঞাপনের সঙ্গে থাকত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের চরণ 'আজিকে তোমার চরণে জননি...'। কবিতা, গল্প থাকলেও প্রবন্ধের ভাগই বেশি। প্রথম সংখ্যায় নিবেদন সহ ত্রিগুণানন্দ রায়ের কবিতা 'জগদ্ধাত্রী', সত্যকিঙ্কর সেনের লেখা বিজ্ঞান প্রবন্ধ 'প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ' 'সূর্যসিদ্ধান্ত'--বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ও নৃপেন্দ্রকুমার রায়ের 'নিষ্কৃতি' গল্প আছে। উল্লেখ্য প্রতিটি সংখ্যায় বঙ্গ সাহিত্যের বরেণ্য সেবকদের ছবি আছে। বৈশাখ ১৩২১-এ 'কাঙাল হরিনাথের' জীবনীও প্রকাশিত হয়েছে।

এরপর ১৯১৫তে ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত *সন্তোষ* মাসিকের নাম পাচ্ছি। কুচবিহার জেনকিন্স স্কুল থেকে *অঞ্জলি* মাসিক প্রকাশিত হয়েছে ১৯১৭তে। এরপর ১৯১৮-তে ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত হল প্রথম পূজাবার্ষিকী *পার্বণী* নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

সম্পাদনায়। লেখকগোষ্ঠীতে ঠাকুরবাড়ির বহু সদস্য থাকলেও, এই পরিবারের সঙ্গে যাঁদের মধুর সম্পর্ক ছিল তাঁরাও লিখেছেন। লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ছাড়া দ্বিজেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী। এছাড়াও লিখেছেন জগদানন্দ রায়, জীবনময় রায় ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। ১৩২৫ বঙ্গাব্দে এটি প্রকাশের পর নগেন্দ্রনাথের প্রবল প্রয়াস থাকলেও ১৩২৬-এ *পার্বণী* তিনি বের করতে পারেননি, ১৩২৭-তে *পার্বণী* প্রকাশ পায়। আর বেরোয়নি। দ্বিতীয় খণ্ড *পার্বণীতে* বেশ কিছু নতুন লেখকও লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্ত জয় করেছিল এই *পার্বণী*। তাই সম্পাদককে জানিয়েছিলেন, "আমি ইহার বৈচিত্র্য, সৌষ্ঠব ও সরসতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি—অথচ ইহার মধ্যে পাঠকদের জানিবার ভাবিবার বুঝিবার কথাও অনেক আছে। তোমার এই সংগ্রহটি কেবলমাত্র ছুটির সময় পড়িয়া তাহার পরে পাতা ছিঁড়িয়া ছবি কাটিয়া, কালি ও ধূলার ছাপ মারিয়া জঞ্জালের সামিল করিবার সামগ্রী নহে—ইহা আমাদের শিশু সাহিত্যের ভাণ্ডারে নিত্য ব্যবহারের জন্যই রাখা হইবে।" *পার্বণীর* ১ম সংখ্যাটি সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেছিলেন 'স্নেহের মঞ্জুরাণীকে'—যিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী, সুরেন্দ্রনাথের কন্যা। এই মঞ্জুরাণী ছোটবেলা থেকে গান ও অভিনয়ে সমান দক্ষ ছিলেন। আর দ্বিতীয় সংখ্যাটি সম্পাদক উৎসর্গ করেছিলেন তার ন'বছরের পুত্র 'নীতু' অর্থাৎ নীতিন্দ্রনাথকে, যিনি মাত্র কুড়ি বছর বয়সে জার্মানিতে যক্ষ্মায় মারা যান।

১৯২১ থেকে ১৯৩০ কালপর্বে আমরা বেশ কয়েকটা শিশু-কিশোর সাময়িক পত্রের সন্ধান পাচ্ছি। এই দশ বছরে প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা প্রায় ৩৭টি। উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলি আলোচনা করছি। মাঘ ১৩২৭-এ নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শিশিরকুমার মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক *আমার দেশ*। ১ম বর্ষের ৩য় সংখ্যার মুখবন্ধে লেখা হয়েছিল, "ছবি দিয়া মন ভুলাইবার জন্য 'আমার দেশ' বাহির করা হয় নাই। যাহাতে তোমাদের (ছেলেমেয়েদের) সঙ্গে দেশের যথার্থ পরিচয় ঘটে, এই আশা লইয়াই এই পত্রিকা তোমাদের (ছেলেমেয়েদের) হাতে দিতে ইচ্ছা করি।" ১ম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে 'পত্রিকাটি আট থেকে ষোল বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য।" গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনি, ছাড়াও বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিভাগে নানা বিষয়ের আলোচনা প্রকাশিত হত। 'আমার দেশ' অংশে দেশের ভৌগোলিক পরিচয় সহ দেশবিদেশের খবর, 'সময়-কাটান' অংশে শিশুসুলভ প্রশ্ন-উত্তর, দাদাঠাকুরের গল্প বিভাগে—নানা উপদেশমূলক রূপক গল্প ও 'দেশের কথা' অংশে দেশভক্তি জাগানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আলোচনা ও রচনা থাকত। লেখক-লেখিকা তালিকায় ছিলেন—কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বিজয়রত্ন মজুমদার, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, দীনেশচন্দ্র সেন, যতীন্দ্রনাথ পাল, শিশিরকুমার মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, প্রিয়ংবদা দেবী, তেজেশচন্দ্র সেন প্রমুখ।

জুলাই ১৯২১ প্রকাশিত হল জে. এম. বি. ডানকানের সম্পাদনায় *কিশোর*। এটি সচিত্র ইংরেজি বাংলা দ্বিভাষিক মাসিক পত্রিকা। এতে থাকত ছোটোদের উপযোগী গল্প, কবিতা, বিজ্ঞান কথা, নাটক, নকসা, খেলাধুলা প্রভৃতি। প্রায় সমস্ত রচনাই চিত্রিত। অধিকাংশ রচনাই স্বাক্ষরহীন।

১.৪.১৯২২-এ প্রকাশিত হল চুঁচুড়া থেকে অজয়চন্দ্র সরকারের মাসিক পত্রিকা *মিতা*।

একই বছরে ১৪.৫.১৯২২-এ আশুতোষ ধরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল *মাসিক শিশুসাথী।* প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকের নাম ছিল না। কিন্তু প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনায় খানিক আত্মকথার ভঙ্গিতে লেখা হয়, "তোমরা অনেকদিন হইতে আমার প্রতীক্ষায় আছ, তাহা আমি জানি। আমারও আসিবার কম আগ্রহ ছিল না তবু আসিতে পারি নাই। সময় না হইলে গাছে ফল ধরে না, ফুলের গাছে পাপড়ি খোলে না। তোমাদের পায়ের নীচে ঐ যে ঘাসগুলি, তাদের গায়েও নূতন পাতার শ্যামল শোভার বিকাশ হয় না।" দক্ষিণারঞ্জন, শিবরতন মিত্র, হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ শিশুসাহিত্যিকদের অবলম্বন করে পত্রিকাটি গড়ে ওঠে। এতে প্রচুর রূপকথা প্রকাশিত হত। এর চারবছর পর অর্থাৎ ১৯২৬ থেকে শারদোৎসবের প্রাক্কালে দীর্ঘদিন শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হতে থাকে। *বার্ষিক শিশুসাথীর* প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৩৩৩-এ আশুতোষ লাইব্রেরি থেকেই। সম্পাদনা করেছিলেন ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার। বিস্ময়কর মনে হলেও এটি সত্য। বেরিয়েছে টানা আটচল্লিশ বছর অর্থাৎ ১৩৮১ পর্যন্ত। বিভিন্ন সময়ে সম্পাদনা করেছেন জগদানন্দ রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

১৯১৯-এ *পার্বণী* প্রকাশিত হয়নি ঠিকই, তবে *সাহিত্য* পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সম্পাদনায় বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় পূজাবার্ষিকী *আগমনী* প্রকাশিত হল বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে। এই বার্ষিক সংখ্যাটির সূচি ছিল এরকম--ত্রিবেণীমঙ্গল (ক) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আগমনী (প্র) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গল্প 'বামুনের দুর্গোৎসব', লীলাদেবীর কবিতা 'বাবার আনন্দ', নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের গল্প 'কণ্ঠীবদল', স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্প 'শারদীয় উপহার', সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের গল্প 'জ্ঞান', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ছবি'। এছাড়া লিখেছেন--সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'মাতৃবন্দনা' দিয়ে শেষ। নামকরণও রবীন্দ্রনাথের। আর্ট পেপারে ছাপা রঙিন ছবির সংখ্যা কুড়িটি।

পরের বছর ১৯২০তে সুধীরচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় *মৌচাক* মাসিক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। বৈশাখ ১৩২৭তে অর্থাৎ প্রথম বর্ষের ১ম সংখ্যায় ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি সুন্দর কবিতা স্থান পেয়েছে। অবন ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা' শিশুপাঠ্য উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে ১ম সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। বহু বিখ্যাত কিশোর উপন্যাস ও গল্প এতে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'যকের ধন', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়', যাযাবরের 'ঝিলম নদীর তীরে' প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কুহকের দেশে', সুবিমল রায়ের 'প্রেতসিদ্ধের কাহিনী'। সন্তোষকুমার ঘোষ, গিরিজাকুমার বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, দীনেন্দ্রকুমার রায়, বুদ্ধদেব বসু, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুনির্মল বসু, জসিমুদ্দিন, রাধারানী দেবী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এমনকি জলধর সেনেরও দু'একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল।

বৈশাখ ১৩২৭-এ মহম্মদ শহীদুল্লাহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ছোটোদের পত্রিকা *আঙুর*। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় ছাড়া সরোজেন্দ্র দাশের লেখা 'হিন্দু-মুসলমান' নামে একটি কবিতা আছে। সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর 'আঙুর' নামে একটি নাট্যগীতি ও 'তসরের

গুটিপোকা ও তাহার প্রজাপতি' নামে একটি বিজ্ঞান প্রবন্ধ আছে। রবীন্দ্রনাথের 'রথযাত্রা' নিয়ে একটি গল্প আছে। ১ম সংখ্যায় সম্পাদকের লেখা ছিল ৪টি। আষাঢ় সংখ্যায় নজরুলের 'হোঁদল কুতকুতের বিজ্ঞাপন' নামে কবিতা, ভাদ্র সংখ্যায় 'রেলগাড়ির জন্মকাল' নিয়ে সম্পাদকের একটি প্রবন্ধ আছে। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি আনার জন্য কোরান হাদিসের সঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনির প্রসঙ্গও আনা হয়েছে। তবে পত্রিকাটি মাত্র এক বছর চলেছিল।

শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার মহোদয় কর্ত্তৃক সমগ্র বাংলার
এল-পি, ইউ-পি, এম-ই, এইচ-ই সকল রকম
স্কুলেরই ছাত্রদের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট

খোকা-খুকু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্র

প্রথম বর্ষ

১৩৩০

সম্পাদক

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী

ও

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম, এ,

কর্ম্মকর্ত্তা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১০৮নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড—কলিকাতা

শিশুদের একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা

একই বছরের শ্রাবণে (২২.৭.১৯২০)-বিধুভূষণ বসুর সম্পাদনায় মাসিক *অঞ্জলির* প্রকাশ। এটি ছিল সচিত্র। গল্প, কবিতা ছাড়াও জীবনী, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল, প্রাণিজগতের কথা, রসরচনা সবই প্রকাশিত হত। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, নন্দরাণী দেবী, মন্মথনাথ ঘোষ প্রমুখের লেখা ছাপা হয়েছিল। প্রত্যেকটি সংখ্যায় কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী চিত্রসহ ছাপা হয়েছে।

১৩২৯-এ হেমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী ও ভুবনচন্দ্র দাসের সম্পাদনায় বার্ষিক *মাধুকরীর* প্রকাশ। মুদ্রিত হত রঙিন কাগজে। মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, নিরুপমা দেবী, শিবরাম চক্রবর্তী, অখিল নিয়োগী প্রমুখ লেখক তালিকায় ছিলেন। এরপর জ্যৈষ্ঠ ১৪.৫.১৯২০-এ প্রকাশিত হোল সত্যচরণ চক্রবর্তী ও কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সম্পাদনায় বিশিষ্ট পত্রিকা *খোকাখুকু*। 'ঘরের খোকাখুকুদের আদর্শ মানুষ করে গড়ে তোলা এবং দেশের সকল ঘরে ছোটরা যাতে সকলের সঙ্গে ভাইবোনের মত মিলেমিশে খেলতে পারে তার চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে *খোকাখুকুর* প্রকাশ। ১৩৩০-১৩৩১ এর সংখ্যায় সূচি ছিল এরূপ—কুমুদরঞ্জন মল্লিকের অলীকরাম (ক.) সত্যচরণ চক্রবর্তীর 'রূপকথা' 'আবোল তাবোল', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গল্প 'ওমরার উপস্থিত বুদ্ধি', কালিদাস রায়ের কবিতা 'ঠাকুর দাদা', জলধর সেনের গল্প--'দীনুদাদার দৈ', বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের--'পরেশনাথ পাহাড়' ভ্রমণকথা, প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি বেশ জনপ্রিয় ছিল। প্রারম্ভিক পৃষ্ঠার শিরোদেশে মায়ের কাছে পাঠরত শিশুদের রেখাচিত্র ছিল।

এরপর মানিকতলা থেকে প্রভাংশুকুমার গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল *মুকুল*। এটির প্রকাশ ৮.৮.১৯২৫-এ। নিবেদন অংশে বলা হয়েছে 'ছোটছোট ছেলেমেয়েরা দেশের একমাত্র আশা ভরসাস্থল, দেশের সুখদুঃখ তাদেরই উপরেই নির্ভর করে'—তাদের উদ্দেশ্যে *মুকুল* প্রকাশিত হল। পত্রিকা প্রকাশের মাস দুয়েক আগে (১৬.৬.১৯২৫) দেশবন্ধুর প্রয়াণ ঘটেছে। তাই সেই পুরুষ সিংহের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে পত্রিকার শুরু--'তোমারি চরণ করিয়া স্মরণ চলিব তোমারি পথে।' প্রথমেই 'দেশবন্ধু' সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সম্পাদক 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' প্রবন্ধে। এই *মুকুল* প্রকাশের পর 'একটি চিঠি' লিখেছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। তিনি এই পত্রে শিবনাথ প্রকাশিত *মুকুল*-এর 'নীতিশিক্ষা'র বাড়াবাড়ির কথা বলেছেন। শেষে সম্পাদককে জানিয়েছেন, 'কিন্তু দোহাই, তোমাদের নীতির তাপে তোমরা 'মুকুল'কে শুকিয়ে মেরো না। মুকুল জীবনের অগ্রদূত, কিন্তু মনে রেখো ধরায় সে নূতন অতিথি, তার প্রাণ অতি কোমল কোনো রকমের চাপ সহ্য সহ্য করতে সে নারাজ। *মুকুল* প্রকাশের আগেই অবশ্য সত্যেন্দ্রশঙ্কর দাশগুপ্ত, সুধাংশু সেনের গুপ্তের সম্পাদনায় *রাজভোগ* প্রকাশিত হয়েছে উয়ারী, ঢাকা থেকে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর (২৫.৫.১৯২৪) অব্যবহিত পরেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে বলেই দ্বিতীয় সংখ্যায় অর্থাৎ আষাঢ় ১৩৩১-এ 'পরলোকে আশুতোষ' ও 'জীবনকথা' নামে দুটি রচনা আছে। বোধহয় দুটিই সম্পাদকের রচনা। এছাড়া অন্যতম সম্পাদক সুধাংশুশেখর গুপ্তের গল্প 'বাল্যবন্ধু', শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষের কবিতা 'পল্লীসন্ধ্যা' ও বুদ্ধদেব বসুর 'পকেট অনাবশ্যক' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ধাঁধা ও অন্যান্য 'খবরাখবর' প্রকাশিত হত।

এর আগে অবশ্য ফাল্গুন ১৩৩১-এ ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক *বিশ্ববার্তা* প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞাপনে কয়েকজন লেখকের নাম পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা হলেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজয়রত্ন মজুমদার, কালিদাস রায়, শোকহরণ রায় প্রমুখ। প্রধান কার্যালয় ছিল 'বেহালা স্টুডেন্টস লাইব্রেরী' কলিকাতা।

প্রভাংশুকুমার গুপ্তের সম্পাদনায় যে *মুকুল* প্রকাশিত হয়েছিল তারই একটি বার্ষিক সংখ্যা *মুকুল বর্ষস্মৃতি বা বার্ষিক মুকুল* নামে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, মোহিতলাল মজুমদার, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। এটি গিরিজাকুমার বসু ও নরেন্দ্র দেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল।

অগ্রহায়ণ ১৩৩২-এ (১৯২৫) *প্রহ্লাদের* প্রকাশ। বর্ধমানে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মণ সম্মিলনীতে 'এদেশের হিন্দু বালক-বালিকাগণের সুশিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিবার জন্য কয়েকটি সারবান প্রস্তাব ছিল। প্রস্তাব দুটি ছিল এই (১) বর্ণাশ্রম ধর্ম সমর্থক পাঠ্যগ্রন্থ সকল প্রণয়ন ও প্রকাশের ব্যবস্থা। (২) শাস্ত্রানুমোদিত সদাচার মূলক পাঠশালা সকল সংস্থাপনের ব্যবস্থা।' এছাড়া বালক বালিকাগণের অবসর সময়ে তাহাদের পাঠের উপযোগী একখানি সচিত্র স্কুলপাঠ্য সুলভ মূল্যের মাসিকপত্র প্রকাশের ইচ্ছা থেকে *প্রহ্লাদের* জন্ম। ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'আলো ও ফড়িং', 'কেন', 'শান্তি ও সুধা' 'বিড়াল ও ইঁদুর' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা ছাড়াও 'আলিপুরে পেঁচাদের সভা' নামে একটি গল্প ও 'রেলগাড়ির কথা' নামে লেখকের দুটি নামবিহীন রচনা প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদক ছিলেন 'শ্রীশচন্দ্র শর্মা।

১৩৩৩ আশ্বিন অর্থাৎ ১৯২৬-এ *ফুলের রেণু* মাসিক পত্রিকার প্রকাশ প্রভাতকুমার বসু, গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শিশিরচন্দ্র বসু এই ত্রয়ী সম্পাদকের সম্পাদনায়। ছোটোছোটো ছেলেমেয়েদের কচি প্রাণ আনন্দ দিয়ে গড়ে তোলাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। নরেন্দ্রদেব, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনির্মল বসু, প্রভাতকুমার বসু, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, শিশিরকুমার বসু প্রমুখের লেখা এতে স্থান পেয়েছে। 'চয়নিকা' বিভাগে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে ছোটোদের রচনা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। 'সঞ্চয়' পর্বে রয়েছে বিজ্ঞানের টুকিটাকি, 'পরিচয়' অংশে বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক বিবরণ সহ অন্যান্য পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ১৩৩৪-এর বৈশাখে তিনটি পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। ঢাকা থেকে বিভাবতী সেনের *পাপিয়া,* কলকাতা থেকে বীরেন্দ্রকুমার রায় ও মোহিনীকুমার মুখোপাধ্যায়ের *পাততাড়ি,* বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের *বেণু*। *পাততাড়ির* উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে সম্পাদক জানিয়েছিলেন, পড়ার মধ্য দিয়ে যাতে 'আমোদ ও শিক্ষা দুই-ই হয়, সেটাই জানিয়ে দেওয়াই *পাততাড়ির* কাজ। ১ম সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন শোকহরণ রায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, গল্প লিখেছেন দেবী মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য সংখ্যাগুলিতে এগুলি ছাড়াও দেশবিদেশের চমকপ্রদ বিজ্ঞানের খবর, ধাঁধা পরিবেশিত হয়েছে। বেণু প্রকাশকালে শরৎচন্দ্র আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন। *বেণু-র* সূচনায় নলিনীকিশোর গুহ জানিয়েছিলেন "বেণু আজ কিশোর কিশোরীদের হৃদয়ে আপনার ধ্বনি জাগাইয়া তুলুক।... বেণু ধ্বনি আজ মর্মে প্রবেশ করিয়া কিশোর তরুণকে মর্মের প্রেরণা দিক।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বেণু' কবিতা, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় 'জাড়েয়ারতলার দেশ',

প্যারীমোহন সেনগুপ্তের কবিতা 'বিজয়গীতি' প্রভৃতি ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। একসময় পত্রিকাটি বেশ জনপ্রিয় ছিল।

এরপর সুনির্মল বসুর *আলপনা* (আষাঢ় ১৩৩৪)-এ বেরিয়েছে। *শিশুমহল* (১৯২৭) বেরিয়েছে। শ্রাবণ ১৩৩৪-এ গিরিজাকুমার বসু ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মাসিক পত্রিকা *যাদুঘর* বেরিয়েছে। ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে "তোমাদের জন্য আমরা যাদুঘরের দরজা খুলে দিলুম। এ ঘরকে তোমরা মরা জিনিস রাখবার গুদাম ঘর মনে করো না। এখানে নতুন পুরানো যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর তাই সংগ্রহ করা হবে।" ভাদ্র সংখ্যায় সুনির্মল বসুর কবিতা, রাধারানি দত্তের গল্প 'অদ্রিকর্ণি' ও সুষমা সরকারের গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। যতীন্দ্রকিশোর চৌধুরীর সম্পাদনায় এর একটি বার্ষিক সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছিল। মাঘ ১৩৩৪-এ প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় *রামধনু*। মুখবন্ধে সম্পাদক লিখেছিলেন--"আকাশে রামধনু দেখায় সূর্যের কিরণ, আমাদের রামধনু দেখাইবে জ্ঞানের কিরণ। জ্ঞান রামধনুর মতই বিচিত্র, রামধনুর মতই মনোরম।" ১ম সংখ্যায় প্রভাতকুমারের গল্প 'কাজীর বিচার', বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের 'রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প' প্রকাশিত হয়। লেখকগোষ্ঠীতে ছিলেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সতীশচন্দ্র ঘটক, কালিদাস রায়, প্রিয়রঞ্জন সেন প্রমুখ। এটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শিশুসাহিত্যিক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর পিতার সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হত। তাঁর অকাল প্রয়াণের পর ছোটো ভাই ক্ষিতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা এটি পরিচালিত হয়। 'সন্দেশ' বিভাগে জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা খবর ও ধাঁধা পরিবেশিত হত। সম্পাদকের পরিবর্তন ঘটেছে বার বার।

১৩৩৫-এর বৈশাখ (১৯২৮-এর এপ্রিল)-এ ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অখিল নিয়োগীর সম্পাদনায় *মাসপয়লা* প্রকাশিত হয়। *মাসপয়লার* সম্পাদক জানিয়েছেন, 'তোমাদের মনের আশা আনন্দের খোরাক আমরা জোগাব অনেকটাই এই রকম ইচ্ছে নিয়েই প্রতিমাসের পয়লায় গালভরা হাসি, বুকভরা ছবি, আর মন ভরা গল্প নিয়ে তোমাদের দোরে হাজিরা দেবো।' ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় হেমেন্দ্রনাথ রায় লিখেছিলেন 'মাস পহেলি' কবিতা, জলধর সেনের গল্প 'চোর', সুনির্মল বসুর কবিতা 'ঠনঠনিয়ায়' যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'শিবিরাজা' (পুরাণের গল্প), অখিল নিয়োগীর 'পরীদেশের ফেরিওয়ালা' আর ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'মাছির জাগরণ' স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ। পত্রিকাটি বেশ জনপ্রিয় ছিল।

একই মাসে শকুন্তলা দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হল *মুকুল* (নবপর্যায়)। ছোটোদের উপযোগী জীবনী ও প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হত। ১ম সংখ্যায় কামিনী রায়ের কবিতা 'একটি ছোটমেয়ের কথা', বসুধারঞ্জন চক্রবর্তীর 'আশুতোষ মুখোপাধ্যায়েব জীবনী' লেখকের নামহীন রচনা 'জীবজন্তুর কথা' প্রকাশিত। দ্বিতীয় বছরের বৈশাখে অমৃতলাল গুপ্তের 'প্রার্থনা', কুমুদিনী বসুর 'বিজ্ঞানের কথা', জগদীশচন্দ্র বসুর 'গাছের কথা' আছে। ভ্রমণ কাহিনি ছাড়াও আছে ধাঁধা, অঙ্ক কৌতুক ও বালক বালিকাদের রচনা। ১৩৩৭ থেকে বাসন্তী চক্রবর্তী সম্পাদনার দায়িত্ব নেন।

এই বছরের শেষ মাসে প্রকাশিত হল বিভূতিভূষণ চৌধুরীর *চৈতালি*। প্রচ্ছদে রবি ঠাকুরের আশীর্বাণী সহ লেখনরত অবস্থায় পূর্ণাবয়ব উপবিষ্ট অবস্থার চিত্র। আশীর্বাণীটি ছিল এরূপ

বসন্ত যে লেখা লেখে বনে বনান্তরে
নামুক তাহারি মন্ত্র লেখনীর পরে।।

১ম সংখ্যায় বিভূতিভূষণ চৌধুরীর লেখা কবিতা 'চৈতালি', সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'অপরাধী' ও সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি ভৌতিক গল্প আছে।

এই পর্বে মাসিক *রংমশাল* (মাঘ ১৩৩৫) মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বিশিষ্ট কিশোর পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সূচনায় রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'রংমশাল' কবিতা ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আলোকশিখা' নিবন্ধ। গল্প লিখেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রিয়ংবদা দেবী, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, কুলদারঞ্জন রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ শিশুসাহিত্যিকবৃন্দ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা সংবাদ, ধাঁধা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে। প্রচ্ছদে বংমশাল সহ বালিকা। নানা সময়ে সম্পাদকের পরিবর্তন ঘটেছে। এই পর্বে সি. এম. প্যাটারসনের *ছাত্র সখা* (১৩৩৫) ধীরানন্দ রায়ের *ব্রতী বালক*, ললিতকুমার ঘোষের *গল্পগাথা* (১৩৩৬), পূর্ণচন্দ্র দাসের *নবআলোক* (মা. ১৩৩৬), নদীয়া থেকে রোহিনীকুমার মণ্ডলের *ছোটদের লেখা* (ফা. ১৩৩৬), সাখওয়াত হোসেনের *মকতব* (বৈ. ১৩৩৭), সত্যপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের *উষা* (আষাঢ় ১৩৩৭) প্রকাশিত হয়েছে। *উষার* প্রথম সংখ্যায় বিমল ঘোষের কবিতা 'বীরুর বারমাসী', পূর্ণেন্দু সেনের বিজ্ঞান প্রবন্ধ 'টেলিগ্রাফের জন্মকথা' প্রকাশিত। 'বিচিত্রা' অংশে নানা ধরনের সংবাদ পরিবেশিত। এরপর ফণীন্দ্রনাথ পালের *গল্পারতি* আষাঢ় ১৩৩৭, আশ্বিন ১৩৩৭-এ সীতেশচন্দ্র খাঁ-র সম্পাদনায় বাংলার কিশোর-কিশোরীদের জন্য সচিত্র মাসিকপত্র *অরুণ* প্রকাশিত। সত্যেন্দ্রনাথ মৌলিকের কবিতা 'অরুণ' সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতা 'অক্ষমতা', নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের গল্প 'ভট্টাচার্য প্রভৃতি' প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩০-এ প্রকাশিত হয়েছে মঈনুদ্দিন হোসেন এর *জমজম* এবং যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ছোটদের *বার্ষিকী*।

১৯৩১ আমরা সুধা সেনের *কিশোরী* এবং হৃষীকেশ ভৌমিকের *আদর্শ* (পা.) এবং ১৯৩৯-এ জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত ও উপেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়ের *ফানুস* (পা.) এর সন্ধান পাচ্ছি। আবার ১৩৪০--১৯৩৩ এ কোনো শিশু সাময়িকপত্র প্রকাশের খবর পাই না। ১৯৩৪ এ শিশুসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ সেনের *মোহনবেণুর* প্রকাশ দেখি। ১৩৪২-এ কোনো পত্রিকার প্রকাশ নেই। ১৩৪৩-এর বৈশাখ থেকে চৈত্র এই একটি বছরেই ৭টি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। বৈশাখে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের *কিশলয়*, আষাঢ়ে সদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মৌ-মঞ্জরী*, বসুমতী সম্পাদক সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের আশ্বিনে *শুকতারা*, সৌমেন্দ্রনাথ সিংহের *কৈশোরিকা*, প্রেমেন্দ্র মিত্রের *রংমশাল* (বার্ষিক) ও কার্তিক মাসে নীলমণি চট্টোপাধ্যায়ের *পরিকথা* (পৌষ) এবং চৈত্রে হীরেন্দ্রনাথ ও কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় *কিশোর* প্রকাশিত হয়েছে। *কিশলয়* পত্রিকাটি নিখিলবঙ্গ তরুণ সাহিত্য সংঘের মুখপত্ররূপে প্রচারিত। কিশোরদের পত্রিকা হলেও 'ছায়ামায়া' বিভাগে ছায়াচিত্র ও নাট্যজগতের সমালোচনা দেওয়া হয়েছে। তবে এগুলির মধ্যে একমাত্র দীর্ঘজীবী পত্রিকা ছিল *রংমশাল*। বারো বছরের জীবনে চারবার *রংমশাল*-এর সম্পাদক বদল হয়েছে। খগেন্দ্রনাথ সেন প্রতিষ্ঠিত *রংমশাল*-এর প্রথম সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের পর হেমেন্দ্রকুমার রায় ও সতীকান্ত গুহ। সতীকান্তের পর আবার সম্পাদনায় ফিরে আসেন হেমেন্দ্রকুমার। শেষ

চারবছর *রং মশাল* সম্পাদনা করেছেন কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। সেকালের অন্যান্য পত্রিকার মতোই প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনা রবীন্দ্রনাথের। কবিগুরুর একাধিক কবিতা প্রকাশ পেয়েছে *রংমশাল*-এ। *রংমশাল* বাংলা শিশু-সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

১৯৪৭-এ শিশু-সাময়িকের প্রকাশ ঘটেছে ৯টি। খগেন্দ্রনাথ গুপ্তের *কৈশোরক* বৈশাখে প্রকাশিত হয়েছে। এতে রবীন্দ্রনাথের 'জয়যাত্রা' কবিতা ছাড়াও মোহিতলাল মজুমদার, অখিল নিয়োগী, যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখের কবিতা ও বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পত্রিকাটির গৌরব বৃদ্ধি করেছে। সুহৃৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ছেলেখেলা*, প্রভাতকিরণ বসুর *জলছবি*, দেবব্রত চক্রবর্তী ও অরুণেন্দ্র নিয়োগীর *বিকাশ*, অনিলকুমার চক্রবর্তীর *কচিকথা*, আবদুল ওহাব সিদ্দিকীর *গুলবাগিচা*, মো. নাসিরুদ্দিনের *শিশু সওগাত*, মইনুদ্দিন হোসেনের *জমজম*। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নারায়ণ ভট্টাচার্য ও সতীন্দ্রনাথ লাহার সম্পাদনায় *পাঠশালার* (আশ্বিন, ১৩৪৪) প্রকাশ। কিছু পরে নরেন্দ্র দেব এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও একটি জনপ্রিয় সাময়িকপত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'বাসাবাড়ি' দিয়ে পত্রিকাটির সূচনা। আর গল্পলেখকদের তালিকায় ছিলেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জলধর সেন প্রমুখ। বিশেষ কয়েকটি বিভাগে কিশোরদের নানা ব্যাপারের আলোচনা থাকত।



ভাই বোন একসময় শিশুকিশোরদের মন জয় করে নিয়েছিল

১৩৪৫-এ দুটি পত্রিকার প্রকাশ। প্রভাতকিরণ বসুর *ভাইবোন* ও মহম্মদ আতিকুল্লাহের *ফুলঝুরি*। *ভাইবোন*-এর লেখক ছিলেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র, হেমেন্দ্রকুমার রায়, গিরিজাকুমার বসু প্রমুখ।

১৩৪৬ (১৯৩৯)-এ প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা ১০। কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *তরুণবাণী*, সুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্যের *আলো*, রণবীর দাশগুপ্তের *আবাহনী*, জগদীশচন্দ্র ঘোষ ও অনিলচন্দ্র ঘোষের *নবভারতী*, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের *চিত্রদীপ*, ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের *রবিবার* দেবব্রত চক্রবর্তী ও অরুণেন্দ্র নিয়োগীর *বিকাশ*, রমাপ্রসাদ মিত্র ও কুমুদ দাসের *আলোক*. বাণীদেব ও মিনতি ঘোষের *ছেলেখেলা* ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের *আমার কাগজ* প্রকাশিত হয়েছিল। কোনো পত্রিকাই দীর্ঘজীবী হয়নি।

১৩৪৭ (১৯৪০)-এ ৭টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল--তার মধ্যে ৫টি মাসিক অপর দুটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক। 'ছোটদের পাতা' *দৈনিক বসুমতীর* সঙ্গে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হত। প্রথমে এর দায়িত্বে ছিলেন রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরে প্রভাত কিরণ বসু, তারও পরে বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন। অন্যটি *দৈনিক আনন্দবাজারের* সঙ্গে প্রত্যেক সোমবার প্রকাশিত 'মণিমেলা'। সেটি পরে 'আনন্দমেলা'য় রূপান্তরিত হয়। এই পর্বে সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *কিশোর বাংলা*। এই পত্রিকার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল--'বাঙালীর বাংলা শেখা' শিরোনামে শব্দার্থ, চলতি বাংলা কথা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে। সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ ও নৃপেন্দ্র সান্যালের *অঞ্জলিতে* ছেলেমেয়েদের নিজের দেশ ও ভাষাকে চেনাবার চেষ্টা করা হয়েছে। রবিরঞ্জন মিত্রের সম্পাদনায় *রূপকথা* রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও দক্ষিণারঞ্জনের আশীর্বাদ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, কামাক্ষীপ্রসাদ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের *মায়ামুকুর* রবীন্দ্র আশিসবাণী নিয়ে প্রকাশিত। সম্পাদক ছাড়াও কামাক্ষীপ্রসাদ, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, হুমায়ুন কবীরের লেখাও প্রকাশিত। ১৯৪২-এ *দৈনিক যুগান্তরের* সঙ্গে প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত ১৯৪৫-এর মে মাস থেকে যে 'সব পেয়েছির আসর' প্রকাশিত হত, তারই সাপ্তাহিক 'ছোটদের পাততাড়ি', নন্দগোপাল সেনগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

১৩৫৩-তে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের *অঞ্জলি*, অশোক গুহর *দেশ বিদেশের লেখা* ও কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর *কিশোর এশিয়ার* প্রকাশ ঘটেছে। ১৩৫৪-তে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের *ছোটদের মহল*, মধুসূদন মজুমদারের পাক্ষিক *শুকতারা*, নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'জয় যাত্রা' ও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বার্ষিক 'দেশের মাটি' প্রকাশিত। 'শুকতারা' প্রকাশের সময় সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল, "এমন একটা নতুন মাসিক বার করবার জন্য বাংলার গোলাপ শিশুরাও আমাদের কাছে অবিরত দাবী জানিয়ে আসছিল,....আমরা তা উপেক্ষা করতে

পারলাম না।" স্বাধীন ভারতে জন্ম নিল *শুকতারা* ১৩৫৪-এর ফাল্গুনী শ্রীপঞ্চমীর পুণ্যলগ্নে। প্রথমেই কালিদাস রায়ের কবিতা 'শুকতারা'। পরে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'প্রশান্তের আগ্নেয়দ্বীপ' উপন্যাস, সুনির্মল বসুর কবিতা 'লঙ্কাদহন' শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প 'সেবক', সদ্যপ্রয়াত মহাত্মা গান্ধী' সম্পর্কে লিখলেন শ্রীদীপক। এ ছাড়া ধাঁধা প্রভৃতি ছিল। *শুকতারা* দীর্ঘজীবী ও এখনও বেরোচ্ছে। ১৯৪৮-এ খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল প্রথম কিশোরপাঠ্য দৈনিক *কিশোর।* শিশু-সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে এ এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। স্বাধীন ভারতে এটির প্রকাশ। একই সময়ে শচীন ভৌমিকের *ইস্পাত* ও শান্তিনিকেতন প্রাক্তন ছাত্র সমিতির ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক *আমাদের লেখার* আত্মপ্রকাশ।



ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিকপত্র

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
১৩৫৪ সন, ফাল্গুন

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা

প্রতি সংখ্যা—।৵০ ; সডাক বার্ষিক মূল্য ৫

একটি জনপ্রিয় ছোটদের পত্রিকা

কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। প্রকাশিত হল বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র *জ্ঞান ও বিজ্ঞান*। ১৯৪৮-এর জানুয়ারিতে এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, বিনয়কুমার সরকার, বীরেশচন্দ্র গুহ, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও সম্পাদক প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র এই

সংখ্যার লেখক ছিলেন। সুবোধনাথ বাগচী 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'আমরা সর্বদাই মনে রাখব যে, শিশু চিরকাল শিশু থাকবে না, এবং আজকের শিশু কাল দেশের নেতা হবে—দেশকে গড়ে তুলতে হবে--' তাই তাদের মাঝেও বিজ্ঞান চেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে।

১৩৫৬-তে মধুসূদন রায়ের *সাধনা* ও রবীন্দ্র গুপ্ত ও তারাপদ সাঁতরার সম্পাদনায় *পথের আলোক*-এর প্রকাশ। *পথের আলো* হাওড়ার বাগনান থেকে প্রকাশিত। এতে বেশ কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও স্থায়ী হয়নি। বৈশাখ ১৩৫৮-এ প্রকাশিত হল বার্ষিক সংকলন *সাতসমুদ্দুর।*

ছুটির সানাই (১৩৫৮ বৈ.) প্রকাশের পর মিহির সেন ও প্রসূন বসুব সম্পাদনায় প্রকাশিত হল *নতুন কথা* (ভাদ্র ১৩৫৮)। এতে তারাশঙ্করের 'আমি যখন কিশোর ছিলাম' রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এ সময় *ছাত্র অভিযান* ও *শিবির* নামে দুটি কিশোর পত্রিকা প্রকাশিত হলেও সেগুলির ব্যাপারে কোনো বিস্তৃত তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। ১৯৫২-তে প্রকাশিত হয় প্রসূন বসুর সম্পাদনায় বার্ষিক *আগামী*। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিভূষণ চাকী, মিহির সেন, বিমলচন্দ্র ঘোষ (মৌমাছি), খগেন্দ্রনাথ মিত্র—এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। জলপাইগুড়ির *ডানপিটেদের আসর* থেকে প্রকাশিত হত তাদের মাসিক কাগজ *ডানপিটেদের আসর*। (১৯৫৪/১৩৬২)। জলপাইগুড়ি থেকেই রত্নাকর বা সরোজিৎ বাগচীর সম্পাদনায় *ডানপিটেদের সমাচার* প্রকাশিত হয়। ১৩৬৩-তে দীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় *হিমাচল* (মাসিক), আশ্বিন ১৩৬৩-তে ননীগোপাল দত্তের সম্পাদনায় বার্ষিক *শ্রীচরণেষু।* ১৩৬৫ তে স্বল্পজীবী *ফুলকি* এবং শ্রীরামপুর বড়বাগান লেন থেকে দিলীপকুমার বাগের সম্পাদনায় *অভিনব অগ্রণী* প্রকাশিত হয়।

অগ্রহায়ণ ১৩৬৬-তে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত রণেন্দ্রনাথ সান্যাল সম্পাদিত *ছোটদের কাগজ* পাই। ১৩৬৭-তে বেরিয়েছে গোটা পাঁচেক শিশু সাময়িকী! রমেন দাসের সম্পাদনায় *রোশনাই* (ভাদ্র ১৩৬৭), গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর *জয়রথ*, দমদম থেকে প্রকাশিত সুবর্ণা ঘোষের *ত্রয়ী,* অনিরুদ্ধ সরকারের সম্পাদনায় পণ্ডিচেরি থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক *পুরোধা,* শারদীয়া *পূজারিণী* (বার্ষিক)। অরুণদেব চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ পালের সম্পাদনায় ষাণ্মাসিক *শিশুমেলা।* এগুলির বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়নি। ১৩৭১-তে উৎপল হোমরায়ের সম্পাদনায় *সবুজকলি,* ১৩৭২-এ চিত্তজিৎ রায়ের সম্পাদনায় *ঝিলিমিলি* ও ধীরেন্দ্রলাল ঠাকুরের *আনন্দ* বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশ পায়।

১৩৭৫-এ প্রকাশিত হল দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় *শারদীয় কিশোর ভারতী।* লেখক তালিকায় ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ, হাসির গল্প লিখেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সমকালীন বহু বিশিষ্টজন। সেই থেকে শারদীয়া সংখ্যাসহ প্রতি মাসেই এটি প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৭২-তে বর্ধমানের ময়ূরমহল থেকে *ছোটদের কথার* শারদীয় সংখ্যা, পুরুলিয়ার আদ্রা থেকে অমল ত্রিবেদীর ত্রৈমাসিক *টুকলু,* বর্ধমান থেকে *ছোটদের কথার* শারদীয় সংখ্যা,

১৩৮১-তে মেদিনীপুরের মাধবপুর থেকে ত্রৈমাসিক *উষার আলো,* নির্মলেন্দু গৌতমের সম্পাদনায় মাসিক *তেপান্তর* প্রকাশিত হয়। এর প্রথম সংখ্যায় লিখেছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কার্তিক ঘোষ, সরল দে ও সম্পাদক নিজেই। ১৯৮৩-তে কলকাতা- ৬০ থেকে বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ত্রৈমাসিক *মুক্ত আলো,* হাওড়া দেবেন্দ্র গাঙ্গুলি রোড থেকে নীলমণি মুখোপাধ্যায়ের ত্রৈমাসিক *মণিমুক্তা,* (১৯৭৭), ১৩৮৫-এ শিলিগুড়ি থেকে গৌতম রায়ের *বৈতানিক,* হরিদেবপুর, নোনামাঠ থেকে দিলীপ চক্রবর্তী ও অমিত বসুর দ্বৈমাসিক *সাহিত্য তারুণ্য* ১৩৮৬, ১৩৮৭-তে মনোজিৎ শীলের *কুসুম,* পাঁচুগোপাল দাসেব *কুঁড়িকোরক,* শ্রাবণ ১৩৮৮-তে দুলাল চক্রবর্তীর মাসিক *আলোকদূত,* রাসবিহারী দত্তের মাসিক *আলোক ফুলকি,* ১৩৮৮-র আশ্বিনে বর্ধমান থেকে *কিশোর জগৎ,* রায়নগর মেদিনীপুর থেকে শারদীয় *ছায়াতরু,* সুধাংশু শেখর ভট্টাচার্যের *ঝলমল,* বিষ্ণু বসুর সম্পাদনায় *ঝালাপালা,* হিমালয়নির্ঝর সিংহের *সবুজের অভিযান* প্রকাশিত হয়। আর এই বছরেই অর্থাৎ ১৯৮১-এর এপ্রিলে রবিন বলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল *কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান*। ১৩৮৯-এ *শিশুসঙ্গী* (১৩৯০)-তে পারুই কাঁচা রোড, কলকাতা ৬১ থেকে বিজন মুখোপাধ্যায়ের ত্রৈমাসিক *মান্দাস* হাওড়ার অবিনাশ ব্যানার্জি রোড থেকে অরূপ দাসের ষাণ্মাসিক *শরৎশশী,* (১৯৮৪), যাদবপুর, সন্তোষপুর থেকে ত্রৈমাসিক *কচিপাতা,* ১৯৮৬-তে শিবানী সোমের বার্ষিক *বৈশাখী উদ্যম,* ১৯৮৮-তে বহরমপুর মুর্শিদাবাদ থেকে ত্রৈমাসিক *সূর্যসেনা,* কলকাতা ১৪ থেকে তুলসী বসাকের দ্বিমাসিক *ছোটদের সোনার খনি* (১৯৮৯), শ্রীরামপুর, খাসবাগান থেকে অসিত দত্ত ও দেবেন বিশ্বাসের সম্পাদনায় ষাণ্মাসিক *অভিজ্ঞান*।

১৯৯২-তে বড়িশা থেকে শঙ্কর চক্রবর্তীর মাসিক *শিশু-বিতান,* বর্ধমান থেকে শম্ভু চট্টোপাধ্যায়ের ত্রৈমাসিক *সূর্যসোনা,* বারুইপুর স্টেশন রোড থেকে মনোরঞ্জন পুরকাইতের চতুর্মাসিক *ছোটদের সোনার কেল্লা* (১৯৯৩)-তে, একই বছরে তাপসময় পালের ষাণ্মাসিক *শৈশব,* ১৯৯৪-তে জজবাগান, হরিদেবপুর থেকে বিমল মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় *কচিকাঁচা সবুজসাথী,* দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বহড়ু থেকে সজলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রৈমাসিক *চিলড্রেনস রসগোল্লা* (১৯৯৪), ১৪০২তে একই জেলা থেকে স্বপনকুমার রায়ের সম্পাদনায় চতুর্মাসিক *এলোমেলো,* উত্তর চব্বিশ পরগণার রুইয়া পাতুলিয়া থেকে ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ও দেবাশিস বসুর ষাণ্মাসিক *ইকির মিকির* (১৯৯৬), পূর্ব কোদালিয়া নবব্যারাকপুর থেকে অসিত সেনের চতুর্মাসিক *কলকাকলি* ও একই বছরে প্রকাশিত হয়।

১৯৯৭-তে বর্ধমান দুর্গাপুর থেকে সতীশ বিশ্বাসের ষাণ্মাসিক *ছোটদের শিক্ষা ও সাহিত্য,* ১৯৯৮-এ কলকাতা ৯ থেকে তাপস মুখোপাধ্যায়ের ত্রৈমাসিক *রঙ-বেরঙ,* রানাঘাট থেকে অরুণ মণ্ডলের ত্রৈমাসিক *খোলা আকাশ,* ১৯৯৯-এ আদর্শপল্লি, কলকাতা - ৯২ থেকে শিবব্রত ঘোষদস্তিদারের চতুর্মাসিক *তালপাতার ভেঁপু,* বৈঠকখানা ফার্স্ট লেন, কলকাতা ৯ থেকে ভুবন চট্টোপাধ্যায়ের চতুর্মাসিক *মামলি,* বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া থেকে ২০০০-এ ষাণ্মাসিক *আলোর শিশু,* ২০০০-এ সুকান্তপল্লি, বাগুইআটি থেকে দ্বিমাসিক *কাটুমকুটুম*-এর প্রকাশ।

দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত *ছোটদের পাতা* সম্পর্কে আগেই কিছুটা আলোচনা করেছি— আরও কিছু জানাই। *সত্যযুগ* পত্রিকায় প্রকাশিত হত ছোটদের মজলিস, *দৈনিক বসুমতীতে* 'আমাদের পাতা' *লোকসেবক*-এ সবুজপাতা, *স্বাধীনতায়* 'কিশোর সভা', *জনসেবক*-এ প্রতি শনিবার 'সপ্তডিঙা' ও বর্তমানে দৈনিক *গণশক্তি*-তে 'নূতন পাতা' হিসেবে প্রকাশিত হয়। তবে কয়েকবছর আগে ছোটদের জন্য *সকাল* নামে একটি পত্রিকা বেরিয়েছিল ও কিছুদিন চলার পর সেটি বন্ধ হয়েছে। নানা বিশিষ্ট জনের লেখা পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হত।

শেষ হল প্রায় ১৮২ বছরের শিশু-কিশোর পত্রিকার পরিক্রমণ। যা বলা হল—বলা হল না তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। ছোটোবড়ো বহু পত্রিকা আলোচনার বাইরে রয়ে গেল। সুদীর্ঘ গবেষণা ও অনুসন্ধানে এর পূর্ণতা পাওয়া সম্ভব।

তথ্যসূত্র :

১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা সাময়িক পত্র* (১ম + ২য়) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২. *শ্রদ্ধালেখমালা—স্বপন* বসুর প্রবন্ধ—'উনিশ শতকের বাংলা পত্রিকা—সামাজিক দায়বদ্ধতা'।
৩. গীতা চট্টোপাধ্যায় : *বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী* (১ম, ২য় ও ৩য়) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।
৪. *ইতিহাস অনুসন্ধান*—১০
৫. *বাংলা লিটল ম্যাগাজিন : তথ্যপঞ্জী,* প ব. বাংলা আকাদেমি - ১৯৯৯
৬. *এক্ষণ* শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৯।

শ্যামল চক্রবর্তী

উনিশ-বিশ শতকের বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকা

বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাস শুরু হয়েছে উনিশ শতকে। বিশ শতক জুড়ে বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশের সাড়ম্বর ও অনাড়ম্বর উভয় উদ্যোগ দেখা গিয়েছে। একুশ শতকে পা রেখেছি আমরা, মাত্র বছর কয় হল। এই শতকে তাই বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকা কেমন দীপ্ত ও ম্লান ভঙ্গিমায় ঘোরাফেরা করছে তার সালতামামি রচনার অবকাশ এখনও আসেনি।

সমাজ ও সভ্যতা নির্মাণে বিজ্ঞানের অবদান যা-ই থাকুক, বিজ্ঞান এখনও আমজনতার কাছে স্পর্শের অতীত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ষোড়শ উপচারের সবচেয়ে উপেক্ষিত উপচার। বিজ্ঞান পত্রিকার ইতিহাস লিখতে গিয়ে একাধিক সাহিত্য সাময়িকীর কথা দিয়েই শুরু করতে হয়। সংবাদপত্র প্রসঙ্গ আমরা এই লেখায় আনব না। বিজ্ঞান পত্রিকা নয়, বাংলায় লেখা প্রথম বিজ্ঞানের বই 'অঙ্কপুস্তকম' এক ঐতিহাসিক বছরে প্রকাশিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক, কেননা ওই বছর কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। আমরা ১৮১৭ সালের কথা বলছি। তার এক বছর পর ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র *দিগ্‌দর্শন* প্রকাশিত হয়। *দিগ্‌দর্শন* মাসিক পত্রিকা ছিল। নির্ভুল বিচারে *দিগ্‌দর্শন* বিজ্ঞান পত্রিকা নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের নানা শাখা নিয়ে তাতে লেখা প্রকাশিত হত। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, ভূবিদ্যা বিষয়ক রচনা একাধিক প্রকাশিত হয়েছে। এই সাময়িকপত্রের বিজ্ঞান রচনার প্রকৃতি বিষয়ে গবেষক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অভিমত প্রকাশ করেছেন, '*দিগ্‌দর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনাগুলো উচ্চাঙ্গের নয়। এমনকী এদের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও বলা যায় না। কিন্তু বাংলায় মুদ্রিত এই প্রথম সাময়িকপত্রেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে *দিগ্‌দর্শন*-এর সবচেয়ে বড়ো অবদান এখানেই।'[১] আনন্দের কথা, প্রথম সাময়িকপত্র থেকেই বিজ্ঞান অচ্ছুত থাকেনি।

বিজ্ঞান পত্রিকা না হলেও *দিগ্‌দর্শন* বিজ্ঞানের রচনাকে গুরুত্ব দিয়েছে যথেষ্ট। তার প্রথম সংখ্যায় (এপ্রিল ১৮১৮) 'চুম্বক' বিষয়ে একটি সাবলীল রচনা প্রকাশিত হয়। নবম সংখ্যায় (ডিসেম্বর ১৮১৮) চুম্বক নিয়ে নতুন লেখা বেরোয়। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও যেমন অনেকদিন আগে কথোপকথনের মাধ্যমে লেখা তাঁর বিখ্যাত বই 'ডায়ালগ' প্রকাশ করেছিলেন, *দিগ্‌দর্শন*-এ আমরা তেমনি কথোপকথনের ভঙ্গিতে লেখা কিছু রচনা দেখতে পাচ্ছি। রচনাগুলো পদার্থবিদ্যার। কয়েকটি উদাহরণ আমরা নিচে পেশ করতে পারি।

রচনার শিরোনাম	সংখ্যা
পৃথিবীর আকর্ষণের বিবরণ	জুলাই ১৮১৮
পদার্থের অসংখ্যভাগ বিষয়ে	সেপ্টেম্বর ১৮১৮
প্রতিধ্বনি বিষয়ে	অক্টোবর ১৮১৮

প্রথম উদাহরণ থেকে আমরা খানিকটা অংশ উল্লেখ করছি। খুবই সহজ সরল উপস্থাপনা। বুঝতে কারও অসুবিধা হবার কথা নয়।

> কালিদাস। পৃথিবী ছাড়া যে বস্তু আছে তাহারা যদি আপনি চলিতে না পারে তবে পৃথিবীর উপরে পতনের কারণ এই পৃথিবী তাহাকে টানিয়া লয়।
>
> গোপাল। কিন্তু পৃথিবী তো অজীবন সে কিরূপে টানিতে পারে।
>
> কালিদাস। নিউটন অনেকক্ষণ ভাবিয়া এই স্থির করিলেন সকল পদার্থের এই স্বভাব স্থির আছে যে সকল বস্তু ছোট বড় অনুসারে পরস্পর আকর্ষিত হয়। এই পৃথিবী অতিশয় বড় এক বস্তু তাহার নিকটে এমত বড় আর কোন বস্তু নাই অতএব পৃথিবী চতুর্দিকস্থ ছোট ২ বস্তুকে আপন অভিমুখে আকর্ষণ করে। যখন পৃথিবী হইতে কোন বস্তু উঠান যায় তাহাতে আকর্ষণের বিপরীতে উঠাইতে হয় এই কারণ উঠাইতে ভারি বোধ হয়। সে বস্তু যদি অতি বৃহৎ হয় তবে পৃথিবীর আকর্ষণে অধিকত্ব প্রযুক্ত অধিক ভার বোধ হয়।

দিগ্‌দর্শন-এ পদার্থবিদ্যার রচনা তুলনায় বেশি ছিল। তথ্যপ্রধান রচনার আধিক্য স্বাভাবিক। তবে চিন্তাধর্মী রচনা স্বল্প হলেও দেখা গিয়েছে। তেমন একটি রচনার শিরোনাম 'বেলুনে-সাদ্‌লার সাহেবের আকাশ গমন' (এপ্রিল ১৮১৮)। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই রচনাটি ছিল। এই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য রচনার তালিকা আমরা নিচে দিলাম।

রচনার শিরোনাম	সংখ্যা
বাষ্পের দ্বারা নৌকা চালানর বিষয়ে	মে ১৮১৮
বিদ্যুৎ ও বজ্র বিষয়ে	সেপ্টেম্বর ১৮১৮
পৃথিবীর বিভাগের কথা	এপ্রিল ১৮১৮
বিসুবিয়স পর্বত বিষয়ে	এপ্রিল ১৮১৮
ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বৃক্ষ	মে ১৮১৮
ইংলণ্ডে কয়লার আকর	ডিসেম্বর ১৮১৮
পোলণ্ডে লবণের আকর	ডিসেম্বর ১৮১৮
হস্তির বিবরণ	জুন ১৮১৮
বীবর পশুর বিষয়ে	অক্টোবর ১৮১৮
মকর মৎস্যের বিবরণ	জানুয়ারি ১৮১৯

রসায়ন বিজ্ঞানের রচনা *দিগ্‌দর্শন*-এ শুধুমাত্র একটিই প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাটি ধাতু বিষয়ক।

বাংলার প্রথম সাময়িকপত্রে বিজ্ঞান রচনা বিষয়ে আলোচনার ইতি টানার আগে খানিকটা তার প্রেক্ষাপট বললে ভাল হয়। *দিগ্‌দর্শন*-এর প্রকাশক জন ক্লার্ক মার্শম্যান। মাত্র পাঁচবছর বয়সে তিনি বাবা মায়ের সঙ্গে এদেশে আসেন। শ্রীরামপুর মিশনে কাজ করেন। বাবা জশুয়া মার্শম্যানের নামও খুবই পরিচিত। মিশনের কাজে ও শিক্ষা প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জন মার্শম্যান খানিকটা বড় হয়ে যখন শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব লাভ করেন, তাঁর শিক্ষার পরিক্রম ভাবনায় আধুনিকতা ও বিজ্ঞানচিন্তার স্পর্শ দেখা যায়। নিজের ভাবনা প্রচলন করতে চাইলে শাসকবর্গের পক্ষ থেকে যে আপত্তি উঠতে পারে একথা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হত না। জন চেয়েছিলেন, শ্রীরামপুর থেকে বাংলায় একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করবেন। এমন কিছু সংবাদ তিনি পরিবেশন করতে চান যা সরকার পছন্দ করবে না।

পরিকল্পনা নিলেন অভিনব। প্রথমে একটি সাময়িকপত্র বের করবেন। সেখানে তাঁর পছন্দমত কিছু সংবাদ প্রকাশ করবেন। সরকারের ভূমিকার দিকে নজর রাখবেন। জোর আপত্তি না দেখা গেলে তারপর সংবাদপত্র মুদ্রণে হাত দেবেন। সেই ভাবনার ফলশ্রুতি *দিগ্‌দর্শন*। তারপর তিনি *সমাচার দর্পণ* প্রকাশ করেন।

চারের দশকে বিজ্ঞান বিষয়ে লেখা থাকত এমন বেশ কয়েকটি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। যেমন *জ্ঞানান্বেষণ* (১৮৩১), *জ্ঞানোদয়* (১৮৩১), *বিজ্ঞানসেবধি* (১৮৩২), *বিজ্ঞানসারসংগ্রহ* (১৮৩৩)। *বিজ্ঞানসেবধি*-র কথা আমরা ১৮৩২ সালের ৫ মে তারিখের *সমাচার দর্পণ* পড়ে জানতে পারি। এই মাসিক পত্রিকার নানা সংখ্যায় যে সকল বিজ্ঞান রচনা প্রকাশিত হয়েছে তা জানতে গেলে *সমাচার দর্পণ*-এর বিভিন্ন সংখ্যার (২৩ মে ১৮৩২, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩২, ৩ অক্টোবর ১৮৩২) দিকে নজর রাখতে হয়। *বিজ্ঞানসেবধি* প্রথম বিজ্ঞান পত্রিকা। তার কথা আমরা আবার পরে বলব।

উৎকর্ষের বিচারে *বিদ্যাদর্শন*-এর বিজ্ঞানরচনাগুলি *দিগ্‌দর্শন*-কে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। পাঁচের দশকে, ১৮৪২ সালের জুন মাসে *বিদ্যাদর্শন*-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। গবেষকদের অনুমান, এই পত্রিকার অধিকাংশ বিজ্ঞান রচনা যিনি লিখেছেন তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং অক্ষয়কুমার দত্ত। ফলে উৎকর্ষ স্বাভাবিক। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন, 'একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধকে ধীরে ধীরে উপসংহারের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই পত্রিকাতেই প্রথম দেখা যায়।' *বিদ্যাদর্শন*-এ 'প্রাণীবর্গের বৃত্তান্ত' নামে একটি ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। খুবই ভালো মানের রচনা। মানুষের শৈশবকাল বিষয়ক আলোচনা আকর্ষণীয়। রসায়ন ও ভূবিদ্যার লেখাও এই পত্রিকায় বেরিয়েছে। যে প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছিল এই সাময়িকপত্র, মাত্র ছ মাস স্থায়ী হওয়ার ফলে কোন সুস্থিত অবদান রাখতে পারেনি। টাকির প্রসন্নকুমার ঘোষ এই পত্রিকা প্রকাশে সহায়তা করেছিলেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত স্বপ্ন বিসর্জন দেননি। *বিদ্যাদর্শন* বিসর্জিত হল যদিও, আবির্ভূত হল *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*। তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র এই পত্রিকা। তিনজন বড় মাপের মানুষের নাম এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত। এই পত্রিকার রচনা নির্বাচনে সময় দিতেন আরও দুজন মানুষ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রাজনারায়ণ বসু। পঞ্চরত্নের তত্ত্বাবধানে এই পত্রিকা সমাজজীবনের চিন্তন মনন ও বিজ্ঞান ভাবনায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের যোগ্যতা যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ধর্মসম্পর্কিত নানা প্রশ্নে দুজনের মতপার্থক্য ছিল। তবু যোগ্যতার সমাদর দেখিয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, 'আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ ; আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ ; আকাশ-পাতাল প্রভেদ।'[২]

সমাজতত্ত্ববিদ বিনয় ঘোষ লিখেছেন,

> তত্ত্ববোধিনী সভা ও তার মুখপত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন সভ্য...আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রচারে খুব বেশি উৎসাহিত হচ্ছিলেন না। এই কয়েকজন সভ্যের মধ্যে প্রধানতম হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত। দু'জনেই সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজসংস্কারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তত্ত্ববোধিনীর সংস্পর্শে এসেছিলেন...অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম হলেও ঘোর বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তো 'ঈশ্বর' নিয়ে চিন্তা করারই অবকাশ পেতেন না।[৩]

১৮৪৩ সালের ১৬ আগস্ট *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমারের বয়স তখন তেইশ। দীর্ঘ বারো বছর অক্ষয়কুমার এই পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। শুধু সম্পাদনা নয়, জীবনের যাবতীয় সেরা বিজ্ঞান নিবন্ধ তিনি এই পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা গবেষক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের রচনাংশ উল্লেখ করতে পারি--

> তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র প্রথম ২৫টি সংখ্যায় অবশ্য কোনো বিজ্ঞানালোচনা নেই। ২৫ থেকে ৪৬ সংখ্যার মধ্যেও প্রাণীবিজ্ঞান-বিষয়ক কয়েকটি প্রাথমিক প্রকৃতির আলোচনা ছাড়া উচ্চাঙ্গের কোনো রচনা নেই। ৪৭ সংখ্যা (আষাঢ়, ১৭৬৯ শক) থেকেই তত্ত্ববোধিনী-তে প্রথম শ্রেণির বৈজ্ঞানিক রচনাদি প্রকাশিত হতে লাগল। বস্তুত, এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত। আর এই নবযুগের উদ্‌গাতা হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কুমারের বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, পদার্থবিদ্যা, চারুপাঠ প্রভৃতি গ্রন্থের অধিকাংশই এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।[৪]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমারের প্রথম রচনা 'সিন্ধুঘোটক'। এই রচনা *চারুপাঠ* প্রথম ভাগে সংকলিত হয়েছে। রচনাটি ১ আশ্বিন, ১৭৬৭ শকাব্দ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ওই বছরেরই মাঘ সংখ্যায় বেরোয় 'বনমানুষ' রচনা। তারপর সাতবছর তিনি প্রাণীবিজ্ঞান নিয়ে কিছু লেখেননি। ১৭৭৪ শকাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় লিখলেন 'বীবর'। তারপর অবশ্য তিনি পর পর অনেকগুলি রচনা প্রকাশ করেন। রচনাগুলি এরকম 'দীপমক্ষিকা' (চৈত্র, ১৭৭৪ শকাব্দ), 'বল্মীক' (পৌষ, ১৭৭৫ শকাব্দ), 'প্রবালকীট' (জ্যৈষ্ঠ, ১৭৭৬ শকাব্দ), 'কীটাণু' (ভাদ্র, ১৭৭৬ শকাব্দ), 'বিহঙ্গম-দেহ' (আশ্বিন, ১৭৭৭ শকাব্দ)। সকল রচনাই *চারুপাঠ*-এ দেখতে পাওয়া যায়। রচনাগুলি সহজ, সরল। পড়তে ভালো লাগে। প্রাণীবিজ্ঞানের এমন সরস রচনা আগে চোখে পড়েনি। উদ্ভিদবিদ্যা নিয়েও অক্ষয়কুমার সার্থক রচনা প্রকাশ করেন। তাঁর লেখা 'বৃক্ষলতাদির উৎপত্তির নিয়ম' *চারুপাঠ*-এর পাঠকেরা পড়েছেন। জ্যোতির্বিদ্যার উপর *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* যতগুলি লেখা বেরিয়েছে তার সব কটির লেখকও স্বয়ং সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত। ৪৭-তম সংখ্যায় এই বিষয়ে তাঁর প্রথম রচনটি প্রকাশিত হয়। বিস্তৃত রচনা। প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিদ্যায় অবদান কী ছিল, আলোচনা করেছেন লেখক। বলা যেতে পারে, বিজ্ঞানের ইতিহাস বিষয়ক একটি পরিণত রচনা। এর বাইরে অক্ষয়কুমার জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর যে রচনা প্রকাশ করেছেন তার কয়েকটির শিরোনাম 'গ্রহণ', 'ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড ব্যাপার' ইত্যাদি। শেষের রচনাটি আকারে বেশ বড়ো ছিল। বহু তথ্য এই রচনায় জায়গা পেয়েছে।

১৭৭৩ শকাব্দের আষাঢ় সংখ্যা থেকে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* অক্ষয়কুমার 'পদার্থবিদ্যা' শিরোনামে ধারাবাহিক রচনা লিখতে শুরু করেন। এই রচনাগুলি সংশোধিত হয়ে পরে তাঁর *পদার্থবিদ্যা* বইটি বেরোয়।

ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ে ভালো মানের লেখা *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* দেখা যায়নি। কয়েকটি সাধারণ রচনা প্রকাশিত হয়েছে। 'বিজ্ঞান সংবাদ' এই পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ ছিল। সংবাদের সূত্র হিসাবে তিনি *লিটারারি গেজেট, মিউজিয়াম অফ সায়েন্স অ্যান্ড আর্ট, চেম্বারস জার্নাল, আমেরিকান জার্নাল অফ সায়েন্স অ্যান্ড আর্টস* কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর বিজ্ঞান রচনার একটা দুর্বলতার কথা বলতেই হয়। 'ঈশ্বরের মহিমা' শিরোনামে তিনি বিজ্ঞানের একাধিক বিষয় আলোচনা করেছেন। স্বভাবতই তা বিজ্ঞান রচনার প্রাথমিক শর্ত

পূরণ করেনি। বিজ্ঞানের আঙিনায় ঈশ্বরের প্রবেশ অনভিপ্রেত। বেদের অভ্রান্ততায় অক্ষয়কুমারের আপত্তি ছিল। কিন্তু তিনি নাস্তিক ছিলেন না। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন, 'তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল।'[৫] তবু শেষ রক্ষা হল না। মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে রাজনারায়ণ বসু একবার বক্তৃতা করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ চাইলেও অক্ষয়কুমার সেই বক্তৃতা প্রকাশ করেননি। এতোটাই ক্ষুব্ধ হন দেবেন্দ্রনাথ, পত্রে তিনি লেখেন, 'কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহাদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।'

১৮৫৫ সালে অক্ষয়কুমার *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* সম্পাদনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন। তারপরেও কিছু কাল লিখেছিলেন। অসুস্থ হয়ে পড়ায় লেখা বন্ধ করে দিতে হয়। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* অনেকদিন প্রকাশিত হয়েছে। অক্ষয়কুমারের অনুপস্থিতিতে খ্যাতি স্বভাবতই ম্লান হয়েছিল। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের আগ্রহও তখন অনেকটাই কমে যায়।

এই নতুন অধ্যায়ে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-য় শারীরবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব বিষয়ক নিবন্ধ সংযোজিত হয়। বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কিত কিছু রচনা দেখা যায়। 'ভূতত্ত্ব-বিদ্যা' বিষয়ে উঁচুমানের প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ধারাবাহিকভাবে সীতানাথ ঘোষ 'রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস' রচনা করেছিলেন। ১৮০৫ শকাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় আমরা 'বুধের গতি-ব্যতিক্রম' নামে একটি রচনা দেখতে পাচ্ছি। ভিনগ্রহে জীবের অস্তিত্ব বিষয়েও লেখা প্রকাশিত হয়েছে। পিথাগোরাসের জীবনী, ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা মুদ্রিত হয়েছে।

প্রাচীন দেশীয় সভ্যতায় যে বিজ্ঞানচর্চা হয়েছে তার ঘেরাটোপেই শুধুমাত্র *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* আবদ্ধ থাকেনি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব ও তথ্যেও তার পরিপুষ্টি ঘটেছে। 'সবই ব্যাদে আছে' গোছের ধারণা সে সচেতনভাবেই পরিত্যাগ করেছে। ধর্ম ও বিজ্ঞানের সহাবস্থান কখনও কখনও অস্বস্তিকর হয়ে উঠলেও, সমকালীন সামাজিক পরিমণ্ডলের আলোকে তাকে বিবেচনা করতে হবে। উনিশ ও বিশ শতক জুড়ে যে সব পত্রিকা নিয়মিত বেরিয়েছে তার প্রভাব বিজ্ঞান রচনার বিষয় ও শৈলীকে যে ক্রমোন্নত করবে, এ নিয়ে আর সন্দেহ কি! *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* ও অক্ষয়কুমারের লেখনীর মাধ্যমে বিজ্ঞানসাহিত্য একটা স্থায়ী জায়গা খুঁজে নিতে সক্ষম হয়েছিল। প্রসঙ্গত জানাই, রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা ছিল একটি বিজ্ঞান রচনা যা এই পত্রিকায় 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি' শিরোনামে ১৭৯৬ শকাব্দের পৌষ সংখ্যায় বেরোয়। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র পাশাপাশি তখন আরও বেশ কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এদের মধ্যে *বিবিধার্থ-সংগ্রহ* (অক্টোবর ১৮৫১), *রহস্য-সন্দর্ভ* (মার্চ ১৮৬৩), *বঙ্গদর্শন* (বৈশাখ, ১২৭৯), *আর্য্যদর্শন* (বৈশাখ, ১২৮১) ও *ভারতী* (শ্রাবণ, ১২৮৪)-র কথা অবশ্যই বলতে হয়। এরা কেউই একশোভাগ বিজ্ঞান পত্রিকা নয়। তবে নানা উচ্চমানের বিজ্ঞান নিবন্ধ প্রকাশ করে বিজ্ঞান সাহিত্যের ইতিহাসে পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছে।

বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। এই মাসিক পত্রটি প্রকাশের সময় ঘোষণা করা হয় 'পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণীবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদিদ্যোতক' মাসিক পত্র। এই সাময়িকপত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য প্রথম সংখ্যাতেই রাজেন্দ্রলাল ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর বর্ণনা নিম্নরূপ।

আমাদের লিখিবার প্রণালী বিষয়ে পণ্ডিত মহাশয়দিগের অসন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে ; কিন্তু ভরসা করি তদ্বিষয়ে তাঁহারা এতৎপত্রের লক্ষ্য স্মরণ করত আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। যাহাতে সাধারণ জনগণ অনায়াসে বিদ্যালাভ করে, যাহাতে বণিক এবং মোদক আপন আপন কর্ম্ম হইতে অবকাশ মতো জগতের বৃত্তান্ত জানিতে পারে, যাহাতে বালক ও বালিকাগণ গল্পবোধে ক্রীড়াচ্ছলে এই পত্র পাঠ করিয়া আপনাপন জ্ঞানের বিস্তার করে,...এমত উপায় প্রদান করা এই পত্রের লক্ষ্য এবং ঐ মানস সিদ্ধান্তে যাহাতে এই পত্র সকলেই অনায়াসে পাঠ করিতে পারেন ইহা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।[৬]

বিবিধার্থ সংগ্রহ সুন্দর লাইন এনগ্রেভিং ছবিসহ প্রকাশিত হত। 'বাংলার প্রথম সচিত্র শিক্ষাদায়িক মাসিক পত্র'। রবীন্দ্রনাথ এই প্রকাশনাকে 'ছবিওয়ালা মাসিকপত্র' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। বিজ্ঞানের পরিভাষা ও অনুবাদ বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল একাধিক মৌলিক অভিমত পেশ করেছিলেন। আক্ষরিক অনুবাদ তিনি কখনও যথার্থ মনে করেননি। ভাবতে অবাক লাগে, কতকাল আগে কী পরিমাণ আধুনিক ভাবনা পেশ করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল। তাঁর অভিমত, 'ভারতীয় ভাষাগুলি যে অবস্থায় আছে তাতে পাঠ্যপুস্তকের জন্য ইংরেজি বৈজ্ঞানিক প্রতিশব্দ ব্যবহার না করে উপায় নেই।'[৭] কিন্তু তিনি একথাও বলেছিলেন যে এর ফলে 'সাধারণ মানুষের অপরিচিত এক ভাষা সৃষ্টি হবে, যাতে প্রবেশাধিকার থাকবে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের, ফলে বিজ্ঞানের শিক্ষকের সঙ্গে গুপ্তসমিতির পাণ্ডা বা রহস্যবাদীর কোনও তফাৎ থাকবে না।'[৮] তাঁর পরিভাষা ভাবনা বিস্তৃতভাবে উপলব্ধির জন্য আমরা একটি মূল্যবান বইয়ের[৯] শরণাপন্ন হতে পারি।

রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় *বিবিধার্থ-সংগ্রহ* পত্রিকার প্রথম ছয়টি পর্ব (১৭৭৩-১৭৮১ শক) প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমারের মতো তিনিও নিজের সম্পাদিত পত্রিকায় প্রচুর লিখেছেন। এই সাময়িকীতে নিয়মিত বিজ্ঞান নিবন্ধ প্রকাশিত হত। প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ে প্রথমদিকের সংখ্যাগুলিতে দুটি করে লেখা বেরোত। আধিক্য অনুমান করেই হয়তো রাজেন্দ্রলাল সাফাই গেয়েছিলেন, 'আমরা যে কেবল জ্যোতির্বিদ্যায় ও জীবসংস্থার বর্ণনায় নিযুক্ত থাকিব এমত নহে। পদার্থবিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা, পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, সাহিত্যালঙ্কারাদি সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম আমাদিগের সমরূপে উদ্দেশ্য।' 'হোমা', 'গণ্ডার', 'দুর্গন্ধ-নকুল', 'প্রজাপতি', 'শিশুক', 'হার্পিবাজ', 'বাইসন', 'বিড়ালাদি পশুর বিবরণ', 'সর্পের বিবরণ', 'কাঠবিড়াল' ইত্যাদি রচনা *বিবিধার্থ-সংগ্রহের* নানা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তুলনায় উদ্ভিদবিদ্যার রচনা বেশি প্রকশিত হয়নি। ভূগোল বিষয়ে খুবই উঁচু মানের রচনা বেরিয়েছে। রচনাকার রাজেন্দ্রলাল মিত্র। গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের রচনা বেশি ছিল না।

বিবিধার্থ-সংগ্রহের পর রাজেন্দ্রলাল *রহস্য-সন্দর্ভ* সম্পাদনা করেন। ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাতেও প্রাণীবিজ্ঞান রচনার ছড়াছড়ি। সব মিলিয়ে বলা যায়, তার স্থান *বিবিধার্থ-সংগ্রহের* উপরে উঠতে পারেনি। তার ভাষা সত্যিই ছিল সহজ সরল। পদার্থবিদ্যার রচনাগুলি *বিবিধার্থ-সংগ্রহের* রচনার চেয়ে উৎকর্ষ দাবি করতে পারে। 'প্রতিধ্বনি', 'বিদ্যুৎ' খুবই উল্লেখযোগ্য রচনা। রচনা দুটি যথাক্রমে ২য় পর্বের ২২ খণ্ডে ও ৩য় পর্বের ৩৪ খণ্ডে বেরোয়। *রহস্য-সন্দর্ভের* অবদান কি? উঁচু মানের রচনা নয়। বিজ্ঞান রচনায় সরসতা দানই তার প্রধান অবদান।

সাহিত্য রচনার নিপুণ কারিগর যদি বিজ্ঞান রচনায় আগ্রহী হন, আমরা নিঃসন্দেহে ভালো

মানের রচনা প্রত্যাশা করতে পারি। এমন কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের মতো অনেক বিজ্ঞান প্রেমিকের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁর সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় (১২৭৯-১২৮২) তিনি প্রচুর সার্থক উদাহরণ রেখেছেন। ১২৭৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বিজ্ঞানকৌতুক' রচনা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানলেখনী শুরু হয়। *বঙ্গদর্শন*-এ বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞান রচনা বিষয়ে আমরা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অভিমত পেশ করতে পারি--

'শুধুমাত্র লালিত্যই নয়, ভাষার যে বলিষ্ঠতা ও বাঁধুনি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক, তা এই পত্রিকায় পাওয়া গেল। এই বলিষ্ঠ ও পরিচ্ছন্ন ভাষা বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে নতুন শক্তি সঞ্চারিত করল। এই পত্রিকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির অপর বৈশিষ্ট্য রচনাভঙ্গির পারিপাট্যে ও বিষয়বস্তু নির্বাচনের অভিনবত্বে।'

বর্ণনামূলক বিজ্ঞানের নিবন্ধ না লিখে জিজ্ঞাসামূলক নিবন্ধ রচনাতেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন 'সর উইলিয়ম টমসনকৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা' (জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯), 'জৈবনিক' (কার্তিক ১২৮০)। বংশগতি নিয়ে তাঁর কৌতূহলোদ্দীপক রচনা 'বৈজিক তত্ত্ব'। ১২৮৪ সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও চৈত্র সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে এই লেখাটি বেরোয়। গবেষকদলের সিংহভাগ নিশ্চিত, উল্লেখ না থাকলেও এসব রচনার স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র।

জ্যোতির্বিদ্যার উপর একগুচ্ছ উৎকৃষ্ট নিবন্ধ রচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ বিজ্ঞান নিবন্ধই জ্যোতির্বিদ্যার বিষয় নিয়ে লেখা। কয়েকটি শিরোনাম যেমন 'আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত' (জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯), 'আকাশে কত তারা আছে'? (অগ্রহায়ণ ১২৭৯), 'গগন পর্য্যটন' (পৌষ ১২৮০), 'পরিমাণ রহস্য' (চৈত্র ১২৮০ ও আষাঢ় ১২৮১) ইত্যাদি। গণিত ও রসায়নবিদ্যার নিবন্ধ *বঙ্গদর্শন*-এ বেশি দেখা যায়নি। পাঠকদের অনেকেই জানেন, বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞান রচনাগুলি পরে *বিজ্ঞানরহস্য* নামে সংকলিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদক পদ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পরেও পত্রিকায় জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক রচনার আধিক্য ছিল। কী অসামান্য তাঁর লেখার ভঙ্গিমা, একটি উদাহরণ দেব। 'পরিমাণ-রহস্য' নিবন্ধে সূর্যের দূরত্ব বিষয়ে লিখছেন বঙ্কিমচন্দ্র--

অস্মদাদির দেশে রেলওয়ে ট্রেন ঘণ্টায় ২০ মাইল যায়। যদি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্যন্ত রেলওয়ে হইত, তবে কত কালে সূর্য্যালোকে যাইতে পারিতাম? উত্তর--যদি দিন রাত্রি, ট্রেন অবিরত ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, তবে ৫২০ বৎসব ৬ মাস ১৬ দিনে সূর্য্যালোকে পৌঁছান যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ট্রেনে চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ ঐ ট্রেনেই গত হইবে।

সাময়িকপত্রে বাংলা বিজ্ঞান রচনার কথা বলতে গেলে *আর্য্যদর্শন*-এর নামোল্লেখ করতে হয়। পদার্থবিদ্যার একাধিক পূর্ণাঙ্গ রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটির প্রকাশ কাল বৈশাখ ১২৮১। *বঙ্গদর্শন*-এর সমসাময়িক এই পত্রিকা তুলনায় কম প্রভাবশালী ছিল। শুধু তথ্যধর্মী লেখা নয়, ভাবনাপ্রধান লেখাও ছিল। কার্তিক ১২৮৫ সংখ্যায় 'বিজ্ঞান ও ঈশ্বর' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

একদিকে *বঙ্গদর্শন* অন্যদিকে *ভারতী*--এই ছিল সে সময়ে সাহিত্যের কাল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে *ভারতী* প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞান রচনা সম্পর্কে বলতে গেলে *ভারতী*-তে প্রকাশিত গণিত বিষয়ক নিবন্ধের কথা অবশ্যই বলতে হয়। গণিত বিষয়ক জনপ্রিয় বিজ্ঞাননিবন্ধ রচনা সহজসাধ্য নয়। সুনিপুণভাবে এই দায়িত্ব পালন করেছেন স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর গণিত নৈপুণ্যের কথা নিশ্চয়ই অনেকে জানেন।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বিজ্ঞান রচনা ('গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি'-র চার বছর পরে), 'সামুদ্রিক জীব' শিরোনামে ১২৮৫-র বৈশাখ সংখ্যা *ভারতী*-তে বেরোয়। প্রাবন্ধিক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'রচনা হিসেবে এটি তাঁর প্রথম প্রবন্ধের তুলনায় অনেকটা পূর্ণাঙ্গ ও পরিণত। এর মধ্যে একটি কথা আছে যা আধুনিক প্রাণতত্ত্বের চিন্তাভাবনার সঙ্গে বিশেষভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।[১০] লেখক (রবীন্দ্রনাথ) বলেছেন, 'কোনখানে উদ্ভিদ-শ্রেণী শেষ হইল ও জীব-শ্রেণীর আরম্ভ হইল, তাহা ঠিক নিরূপণ করা অতিশয় কঠিন।' ভাইরাস তখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

১২৯৩ সালে *ভারতী* ও *বালক* পত্রিকা জুড়ে গিয়ে *ভারতী ও বালক* নামে বেরোতে থাকে। ১২৯৯ সাল পর্যন্ত বেরিয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের পর এই পত্রিকায় গণিতের আকর্ষণীয় নিবন্ধ খুবই কম প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২) *ভারতী* পত্রিকা ১২৯১ থেকে ১৩০২ পর্যন্ত সম্পাদনা করেন। নিজের লেখনীর মাধ্যমে বিজ্ঞান সাহিত্যকার হিসাবে স্থায়ী আসন দখল করেন। রচনার বিষয়ে নতুনত্ব ছিল। *ভারতী*-তে তাঁর অন্যতম আকর্ষণীয় রচনা 'প্রলয়' (আশ্বিন ১২৮৯), 'অন্যান্য গ্রহগণ জীবের নিবাসভূমি কিনা' (জ্যৈষ্ঠ ১২৯১), 'মঙ্গলে জীব থাকিতে পারে কিনা' (বৈশাখ ১২৯২)। ১২৯২ সালে ছোটোদের কথা ভেবে *বালক* পত্রিকা বেরোল। সম্পাদক জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকায় একাধিক বিজ্ঞান রচনা প্রকাশ করেছেন। ১২৯৮ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ *সাধনা* পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিন বছর পর রবীন্দ্রনাথ দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এই পত্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথের একাধিক বিজ্ঞান রচনা দেখা যায়। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির একাধিক মানুষের বিজ্ঞানসাহিত্য প্রতিভা এই পত্রিকায় দীপ্যমান হয়েছে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিজ্ঞান রচনা প্রকাশে *বামাবোধিনী পত্রিকার* অবদান স্মরণযোগ্য। ১৮৬৩ সালে পত্রিকাটি প্রথম বেরোয়। মুখ্যত মেয়েদের 'ভ্রম ও কুসংস্কার সকল দূর' করার অভিপ্রায়ে এই পত্রিকার প্রকাশ। বিজ্ঞানের একাধিক শাখায় নানা বিষয়ে এই সাময়িকপত্রে রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তবে একটা দুর্বলতা ছিল। সব কিছুর বেলাতেই ঈশ্বরের অবদান ঘোষণা করা হয়েছে। ভূগোল ও শারীরবিদ্যা বিষয়ক রচনাগুলি আলাদা আলোচনার দাবি রাখে। 'পরিপাক' বিষয়ে একটি কবিতার কয়েক লাইন যোগ করার লোভ সামলাতে পারছি না।

> চর্ব্বণ লেহন করি গিলিলে আহার,
> কোথা গেল বলিতে কি পার সমাচার?
> উদর শীতল হল জানিল উদর,
> আপন কার্য্যেতে আছে সতত তৎপর।

কবিতাটি বেশ দীর্ঘ। পরিপাকের নানা ধাপে কী হয় সব ছন্দোবদ্ধভাবে লিখিত রয়েছে। সবশেষ দুটি লাইন,

> 'ধন্য জগদীশ ধন্য তোমার করুণা,
> এত যত্নে পালিতেছ কিছুই জানি না।'

কথোপকথনের আকারেও একাধিক বিজ্ঞান রচনা এই পত্রিকায় বেরিয়েছে।

বামাবোধিনী পত্রিকা ভিন্ন আমরা বাকি যে ক'টি সমধর্মী সাময়িকপত্রের নাম করতে পারি, সেগুলি হল *বঙ্গমহিলা, পরিচারিকা, অবোধবন্ধু, জ্যোতিরিঙ্গণ।* প্রথম দুটি মহিলাদের কথা ভেবে বের করা হয়েছে। *বঙ্গমহিলা* ডাক্তার ভুবনমোহন সরকারের সম্পাদনায় ১২৮২ সালের বৈশাখে বেরোয়। এই পত্রিকায় স্বাস্থ্য বিষয়ক রচনা বেশি থাকত। বলার মত কথা, ১২৮৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় 'স্বাভাবিক সংস্কার' শিরোনামে মনস্তত্ত্ব বিষয়ে একটি প্রশংসনীয় নিবন্ধ বেরোয়। *পরিচারিকা*-র কথা আলাদা করে বলা দরকার এই জন্যে যে, এই পত্রিকায় লেখিকারা অগ্রাধিকার পেতেন। প্রথম বছরে যে ক'টি বিজ্ঞান রচনা প্রকাশিত হয়েছে সব ক'টিই মহিলারা লিখেছেন। একে আমরা সাধারণ তথ্য মনে করছি না। পাশাপাশি একটা ভিন্ন সুরের কথা বলতে হয়। *অবোধবন্ধু* ও *জ্যোতিরিঙ্গণ* 'বালক ও স্ত্রীপাঠ্য' পত্রিকা হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল। এমনটা বাঞ্ছনীয় ছিল না। কেন বালক বালিকাদের সঙ্গে স্ত্রীজাতি পাঠগ্রহণের বেলায় সমগোত্রীয় হবেন? অথচ এ কথা সত্যি, এই দুই সাময়িকপত্র সমাজে যথেষ্ট পরিচিতি অর্জন করেছে। *জ্যোতিরিঙ্গণ*-এ 'বৈজ্ঞানিক কথা' নামে একটি নিয়মিত বিভাগ ছিল।

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ছোটোদের প্রথম সার্থক মাসিক পত্রিকার নাম ছিল *সখা*। এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে। সম্পাদক ছিলেন প্রমদাচরণ সেন। তাঁর শৈশব খুবই দুঃসহ অবস্থায় কেটেছে। মাইনে পেতেন তিনি মাত্র ২৬ টাকা। তা থেকে পয়সা বাঁচিয়ে তিনি *সখা* প্রকাশ করেছিলেন। পত্রিকার প্রস্তাবনায় প্রমদাচরণ লিখেছিলেন, 'আমাদিগের হতভাগ্য দেশে বালক বালিকাদিগের জ্ঞানের ও চরিত্রের উন্নতির জন্য অধিক লোক চিন্তা করেন না ; অথবা করিবার অবকাশ হয় না, এই জন্যই 'সখা'র জন্ম হইল।'[১১] *সখার* আগে ১৮৭৮ সালে স্বনামখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় *বালকবন্ধু* ও ১৮৮১ সালে *আর্যকাহিনী* প্রকাশিত হয়। ভাষা নবীন পাঠকদের উপযোগী ছিল না। সেই কারণেই *সখার* গুরুত্ব এমন বেশি। *সখা* প্রায় বারো বছর প্রকাশিত হয়েছে। অকালে চলে যান প্রমদাচরণ। *সখা*-র সপ্তম সংখ্যা থেকে সম্পাদক হলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। বেশিদিন থাকেননি। ১৮৮৭ সালে অন্নদাচরণ সেন সম্পাদক হলেন। সবশেষে সম্পাদক হয়েছেন কবি ও লেখক নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা থেকে *সখা* প্রকাশিত হত। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ছিল একটাকা। *সখা* বিজ্ঞানপত্রিকা ছিল না, কিন্তু এক অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিল। উপেন্দ্রকিশোরের কলমে একগুচ্ছ বিজ্ঞান রচনা *সখা*-য় প্রকাশিত হয়েছে। ঈর্ষণীয় রচনা। ভাষা ও পরিবেশনায় আজও আধুনিক। শিশুসাহিত্যের একচ্ছত্র অধিকারী উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম লেখা ছিল একটি বিজ্ঞানের রচনা। রচনার নাম 'মাছি'। *সখা*-র দ্বিতীয় সংখ্যায় এই লেখা প্রকাশিত হয়েছে। জীবজন্তুদের নিয়ে তিনি *সখা*-য় প্রচুর লিখেছেন। বিজ্ঞান যে নিছক তথ্যের বর্ণনা নয়, গল্পের ছলেও বিজ্ঞানের কথা বলা যায়, উপেন্দ্রকিশোর আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। নীচে আমরা *সখা*-র নানা সংখ্যা থেকে উপেন্দ্রকিশোরের কিছু বিজ্ঞান রচনার তালিকা দেব—

মাছি (ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩), মাকড়সা (মে, আগস্ট ১৮৮৩), বানর (অক্টোবর ১৮৮৩), একটি অন্ধ সীলের কথা (নভেম্বর ১৮৮৩), মূল বর্ণ (আগস্ট ১৮৮৫), ভোঁদড় (এপ্রিল ১৮৮৬), বেলুন (ফেব্রুয়ারি, মার্চ, মে ১৮৮৬), নানাপ্রসঙ্গ (মে ১৮৮৬), গরিলা (মে, জুন ১৮৮৬), মশা (অক্টোবর ১৮৮৬), মুদ্রাযন্ত্র (নভেম্বর, ১৮৮৬), গ্লটন (ডিসেম্বর ১৮৮৬),

দীপশিখা (ডিসেম্বর ১৮৮৬, জানুয়ারি ১৮৮৭), জলকণার গল্প (ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮), বিড়াল (ফেব্রুয়ারি ১৮৮৯), টিয়াপাখি (মার্চ ১৮৮৯), পুরাতন কথা (আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ১৮৯০)

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এই পত্রিকায় *ঠাকুরদাদা* ছদ্মনামে বিজ্ঞান ও ভূগোল লিখতেন। নবীনবাবু নামে এক চরিত্র ছিলেন। কথোপকথনের ভঙ্গিতে বেশির ভাগ লেখা রচিত। এছাড়াও *সখা*-য় বিজ্ঞান রচনা লিখেছেন ভুবনমোহন রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, যোগেশচন্দ্র রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী।

১২৭৯ সালে প্রকাশিত হয় *জ্ঞানাঙ্কুর* পত্রিকা। এই পত্রিকা ভূগোল বিষয়ক রচনাকে প্রাধান্য দিয়েছে। সেখানে জ্যোতির্বিদ্যার রচনাগুলিও উঁচু মানের ছিল।

শিবনাথ শাস্ত্রীর সুসম্পাদনায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র *তত্ত্বকৌমুদী* প্রকাশিত হত। তার বিভিন্ন সংখ্যায় ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে নিবন্ধ দেখা যেত। বৈপরীত্য নয়, সমন্বয়ের ভাবনা থেকেই রচনাগুলি লেখা হত।

১২৮৫ বাংলায় প্রকাশিত হয় *কল্পদ্রুম* পত্রিকা। সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। বিজ্ঞান রচনাকে এঁরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তার বড় প্রমাণ, পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য নিবেদন করতে গিয়ে লেখা হয়েছে--

> বিজ্ঞান প্রভাবে জগতের যে কত অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্তনীয় মহোপকার লাভ হইয়াছে, গণনা করিয়া তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমরা রেল, তার, অর্ণবযান, কামান, বারুদ প্রভৃতি অদ্ভুত পদার্থ সকল অনুক্ষণ অবলোকন করিতেছি, সে সমুদয়ই বিজ্ঞানচর্চার ফল। সেই বিজ্ঞান কল্পদ্রুমের একটী প্রধান আলোচনীয় বিষয়। কল্পদ্রুম পাঠকেরা বিজ্ঞান বিষয়ে অভিমত হইয়া কোন কোন নূতন বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়ায় সমর্থ হন, এই আমাদিগের মনের বাঞ্ছা।'

এই পত্রিকার প্রধান বিজ্ঞান লেখক ছিলেন রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

১২৮৭ বাংলায় প্রকাশিত পত্রিকা *কল্পনা*। বিজ্ঞান বিষয়ে লিখতেন হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। দামোদর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *প্রবাহ* (প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১২৮৯) পত্রিকা বলেছিল, 'বিজ্ঞান মানবোন্নতির প্রধান মূল বোধে প্রবাহ বিজ্ঞানশাস্ত্রকে সর্ব্বজনরঞ্জন করিয়া প্রকাশিত করিতে নিয়ত চেষ্টাশীল থাকিবে।' আরও যে সকল সাময়িকপত্রে বিজ্ঞান রচনা সমাদরের সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে তাদের নাম বলতে গিয়ে আমরা *অবকাশবন্ধু* (১৮৬৭), *ভারত পরিদর্শক* (১২৭৮), *প্রকৃতি* (১২৮৭), *বঙ্গবাসী* (১২৮৮), *সুখসরোজ* (১২৮৯), *নব্যভারত* (জ্যৈষ্ঠ ১২৯০) প্রভৃতির নাম বলতে পারি। বলা যেতে পারে, এই হল মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের সাময়িকপত্রে বিজ্ঞান লেখালেখির স্বল্পপরিসর ইতিহাস।

সরাসরি আমরা এবার বিজ্ঞান পত্রিকার আলোচনায় চলে যাব। প্রথমে উনিশ শতকের বিজ্ঞান পত্রিকার কথা বলব। ১৮৩২ সালে প্রকাশিত *বিজ্ঞান সেবধি*-কেই প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞানের প্রথম সাময়িকপত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

পশ্বাবলী-কে (১৮২২) কেউ কেউ বিজ্ঞান পত্রিকা বলতে চাইলেও, যথার্থ বিচারে সঠিক নয়। *বিজ্ঞান সেবধি* পত্রিকার একটি গ্রাহক তালিকা[১২] আমাদের গোচরে এসেছে। তালিকাটি আকর্ষণীয়। প্রথম কথা, শীর্ষস্থানীয় ইংরেজ প্রশাসকদের অনেকে ও ধর্মীয় যাজকদের কেউ কেউ এই পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিলেন। গ্রাহকদের মধ্যে ছিলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক,

আলেকজান্ডার ডাফ, ডেভিড হেয়ার ও আরও অনেকে। জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন-এর কাছে একশো কপি পত্রিকা যেত। বাঙালি বাবুদের বাইশজনের নাম এই তালিকায় দেখা যায়। কয়েকটি পরিচিত নাম, যেমন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কানাইলাল ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ মিত্র।

উনিশ শতকের সাত, আট ও নয়ের দশকে বেশ কয়েকটি বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে *বিজ্ঞানকৌমুদী* (১৮৬০), *বিজ্ঞানরহস্য* (১২৭৮), *বিজ্ঞান-বিকাশ* (১২৮০), *বিজ্ঞান-দর্পণ* (১২৮৩) ও *সচিত্র বিজ্ঞান দর্পণ* (১২৮৯)-এর কথা বলতেই হয়।

বিজ্ঞানদর্পণ বিষয়ে খানিকটা বিস্তারিতভাবে বলার মতো তথ্য পাওয়া যায়। এই পত্রিকার সেকালে পরিচিতি ছিল। দামোদর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *প্রবাহ* (যার কথা আগে বলেছি) এর সমালোচনা করতে গিয়ে তির্যক মন্তব্য করেছিল, 'বিজ্ঞানদর্পণ সম্পাদক যেন মনে না করেন যে, তাঁহার পাঠকগণ সকলেই বিদ্যালয়ের ছাত্র। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় চলিত কথা সকল লিখিয়া কাগজ পূরাইবার কোনই প্রয়োজন নাই। আমরা বাসনা করি, ইহাতে বিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চ উচ্চ বিষয় সকল অবতারিত হইবে।'

কী ধরনের লেখা এই পত্রিকায় বেরোত, তার ধারণা অর্জনের জন্যে আমরা ১২৯০ সালের কয়েকটি সংখ্যার রচনাসূচি নীচে উল্লেখ করছি।

সংখ্যা	বিষয় ও লেখক
আষাঢ় ১২৯০	সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ (প্যারীমোহন সেনগুপ্ত) অসভ্য জাতির ঐশিক জ্ঞান (যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) মরুৎতত্ত্ব (অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়)
শ্রাবণ ১২৯০	মধুমক্ষিকা (কালীকৃষ্ণ বসাক), অসভ্য জাতির ঐশিক জ্ঞান (যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) স্যামুআল হ্যানিমান (প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়)
ভাদ্র ১২৯০	তাপমান যন্ত্র (অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যামুআল হ্যানিমান (প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়), মধুমক্ষিকা (কালীকৃষ্ণ বসাক)
আশ্বিন ১২৯০	ভেষজ (বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়), আয়ুর্বেদ সংক্রামক জ্বর....., মধুমক্ষিকা (কালীকৃষ্ণ বসাক), উদ্ভিদ-জীবন প্রক্রিয়া (হরিমোহন মুখোপাধ্যায়), সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ (প্যারীমোহন কবিভূষণ)
কার্তিক ১২৯০	স্যামুআল হ্যানিমান (প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়), সূর্য্যই সর্ব্ববিধ শক্তির মূলীভূত কারণ (শ্রীনাথ শিকদার), ভেষজ (বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়), ভাবপ্রকাশ আয়ুর্ব্বেদ (রসিকলাল গুপ্ত)

অগ্রহায়ণ ১২৯০	মানবতত্ত্ব (বীরেশ্বর পাঁড়ে), মধুমক্ষিকা (কালীকৃষ্ণ বসাক), উদ্ভিদ-জীবন প্রক্রিয়া (হরিমোহন মুখোপাধ্যায়), জড়জগতের নিয়ম (রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়)
পৌষ ১২৯০	আলোক বিজ্ঞান (শ্রীনাথ শিকদার), স্যামুয়েল হ্যানিমান (প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়), প্রাচীন বার্তা বা জীবিকাশাস্ত্র (কালীবর বেদান্তবাগীশ)

বিজ্ঞান দর্পণ-ই প্রথম বিজ্ঞান ভিত্তিক বাংলা গল্প প্রকাশ করেছে। সেই গল্পের নাম 'রহস্য'। লেখক হেমলাল দত্ত। প্রকাশকাল ১৮৮২। *সচিত্র বিজ্ঞান দর্পণ* সম্পর্কে একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলব। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পাশাপাশি সে প্রাচ্য বিজ্ঞানের নানা লেখা প্রকাশ করেছে। এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পত্রিকা সম্পাদনার বেলায় কাজ করেনি। পত্রিকার ভূমিকায় বলা হয়েছিল, '...পুরাকালে হিন্দুদিগের মধ্যে কতকগুলি বিজ্ঞানশাস্ত্র ছিল্ ; সেই সকল শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তন্মধ্যে যাহা কিছু আমাদিগের প্রশস্ত বলিয়া বোধ হইবে, আমরা সেই সকল বিষয়ও ইহাতে সন্নিবেশিত করি।' তবে এই বিষয়ক লেখার আধিক্য চোখে পড়েনি।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানলেখক জয়ন্ত বসুর অভিমত, 'সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গীতে বোধহয় বলা যায়, উৎকর্ষের দিক থেকে উনিশ শতকে প্রকাশিত সাধারণ বিজ্ঞানের কোন পত্রিকাই তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। তবে এই শতকের শেষের দিকে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে দু' তিনটি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা প্রকাশ লাভ করে।'[১৩]

বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, চিকিৎসা সংক্রান্ত বিজ্ঞান পুরাকাল থেকেই পৃথিবীর নানা সভ্যতায় বিকশিত হয়েছে। তার কারণ খুব স্পষ্ট। এই বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে জন্ম মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক পত্রিকা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান পত্রিকা। তেমনি কৃষিবিষয়ক পত্রিকাও বিজ্ঞান পত্রিকা।

উনিশ শতকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পত্রপত্রিকার সংখ্যা যথেষ্ট। বিনয়ভূষণ রায় লিখিত বইয়েব সহায়তা নিয়ে আমরা একটা নির্বাচিত তালিকা রচনা করতে পারি। ১২৭৩ থেকে ১৩০৬ সালের মধ্যে প্রকাশিত কিছু পত্রিকার নাম নিচে দেওয়া হল।

প্রকাশকাল	পত্রিকার নাম	সম্পাদক
১২৭৩	*চিকিৎসক*	কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ (প্রকাশক)
"	*চিকিৎসা দর্পণ*	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়
"	*গৃহস্থ চিকিৎসা*	উমাচরণ দে
১২৮১	*চিকিৎসা তত্ত্ব*	অম্বিকাচরণ রক্ষিত
১২৮৫	*চিকিৎসা কল্পদ্রুম*	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়
১২৯১	*চিকিৎসা সম্মিলনী*	অন্নদাচরণ খাস্তগীর / অবিনাশ কবিরত্ন

১২৯৪	*চিকিৎসা দর্পণ*	রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়
১২৯৬	*চিকিৎসক*	বিনোদবিহারী রায়
১২৯৭	*চিকিৎসা লহরী*	অবিনাশচন্দ্র কবিরাজ
	ভিষক দর্পণ	ডা. জহিরুদ্দিন আহম্মদ
১৩০০	*চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান এবং সমীরণ*	বিনোদবিহারী রায়
১৩০১	*চিকিৎসক ও সমালোচক*	সত্যকৃষ্ণ রায়
১৩০২	*মেডিক্যাল ইন্টেলিজেন্সার*	--
১৩০৪	*স্বাস্থ্য*	দুর্গাদাস গুপ্ত
১৩০৬	*মেডিক্যাল জার্নাল*	কেনারাম মুখার্জি

ওই তালিকা থেকে কয়েকটি পত্রিকা বিষয়ে দু'এক কথা বলব। *চিকিৎসা সম্মিলনী* (১২৯১) প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল, অ্যালোপ্যাথিক, কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সমন্বয় সাধন। পত্রিকা পরিচালনমণ্ডলীর অভিমত ছিল, বিশেষ-বিশেষ পদ্ধতির চিকিৎসার দ্বারা বিশেষ-বিশেষ রোগের নিরাময় হয়। ভিন্ন-ভিন্ন চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধিও এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই পত্রিকায় যাঁরা লিখতেন তাঁদের মধ্যে জগবন্ধু বসু, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, ভগবানচন্দ্র রুদ্র, রাজেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও হীরালাল দাসের নাম বলতেই হয়। ওঁরা সবাই ছিলেন চিকিৎসক।

১২৯৪ সালে নদীয়া জেলার মোল্লাবেলিয়া গ্রাম থেকে রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করতেন *চিকিৎসা দর্শন*। আলোচনা, অনুশীলন ও গবেষণার মাধ্যমে চিকিৎসার উন্নয়ন সাধন ছিল এই পত্রিকার প্রধান আবেদন।

ভিষক দর্পণ ছিল উঁচু মানের পত্রিকা। ১৮৯১ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত ডা. জহিরুদ্দিন আহম্মদ তার সম্পাদক ছিলেন। ১৯০০ সাল থেকে ডা. কালীমোহন সেন ও ডা. গিরীশচন্দ্র বাগচি এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। এই পত্রিকায় চিকিৎসা বিষয়ক বইয়ের সমালোচনা খুবই যত্ন নিয়ে করা হত।

ভিষক দর্পণ শুরুতে ঘোষণা করেছিল--

> 'আজকাল আমাদের দেশে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা যেরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহাতে ইহার উন্নতি বিষয়ে মনোনিবেশ করা চিকিৎসক মাত্রেরই যে কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সেই কর্ত্তব্য পালনানুরোধে আজ 'ভিষকদর্পণ' নামে এই চিকিৎসা বিষযক মাসিকপত্র চিকিৎসক সমাজে প্রকাশিত হইতেছে।'

যাঁরা বাংলা বিভাগে পাশ করে চিকিৎসক হয়েছেন তাঁদের কাছে এই পত্রিকা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। ডা. নীলরতন সরকার, ডা. কেদারনাথ দাস, ডা. রাধাগোবিন্দ কর প্রমুখ খ্যাতনামা চিকিৎসকেরা এই পত্রিকায় লিখতেন।

চিকিৎসক পত্রিকা আয়ুর্বেদের প্রসারে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় শিক্ষিত ডাক্তারদের সহায়তা চেয়েছে। শুরুতে তার ভূমিকায় এমন আবেদনই করা হয়েছিল--

> ...আদি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র আজ বড়ই হীনাবস্থায় পতিত--অন্য দেশের লোকের কথা দূরে থাক, স্বদেশীয় লোকের নিকটই ঘৃণিত, অবৈজ্ঞানিক বলিয়া অবমানিত। এইজন্য যাহাতে দেশ মধ্যে আয়ুর্ব্বেদের বিশেষরূপ আলোচনা হয়, যাহাতে সকলে উহাকে চিনিতে পারে.....।

উপরের তালিকায় *অনুবীক্ষণ* পত্রিকাটিকে আমরা যোগ করিনি। ১২৮২ বাংলায় হরিশচন্দ্র

শর্মার সম্পাদনায় এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। খুব বেশিদিন এই পত্রিকা বেরোয়নি। প্রকাশের উদ্দেশ্য স্পষ্ট, '...স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসা শাস্ত্র ও তৎসহযোগী অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্র, ভারত সন্তানদিগের অবনতির সময় পড়িয়াছে তাহাতে আরো পত্রিকা প্রচার হওয়া আবশ্যক।'

১৩০১ সালে (১৮৯৫ ইং) ১৯/২ নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিট থেকে *চিকিৎসক ও সমালোচক* পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। পত্রিকাটি মাসিক ছিল। মনে হয় বছর দুই পত্রিকাটি বেরিয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্র ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রবন্ধ ছাড়া গল্প, কবিতা, জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ে এই পত্রিকায় লেখা বেরোত।

স্বাস্থ্য পত্রিকার প্রকাশস্থান ২৩ মদন মিত্র লেন। সম্পাদক দুর্গাদাস গুপ্ত। ১৩০৪ থেকে ১৩০৮ পর্যন্ত এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। অনেক চিকিৎসক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী এই পত্রিকায় লিখতেন। খুবই মননসমৃদ্ধ রচনা বেরোত। কলকাতা ও বোম্বাই শহরের প্লেগের ছবি এই কাগজ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রকাশ করেছে। সরকারি ব্যবস্থার দুর্বলতা নিয়ে এই কাগজ প্রতিবাদে মুখর হয়েছে। স্বাস্থ্য ও সমাজ প্রসঙ্গ এই কাগজেই প্রথম গুরুত্ব পেয়েছে।

কৃষি বিষয়ক বিজ্ঞান পত্রিকার কথা বলতে গেলে ১৮৬১ সালে প্রকাশিত *কৃষিপাঠ*-এর কথা বলতে হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র। প্রকাশক এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি। এই পত্রিকায় আলু, ফুলকপি, তরমুজ, আখ ইত্যাদি ছত্রিশটি বিষয়ের উপর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকার সামাজিক চাহিদা ছিল না। তার বড় প্রমাণ, ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ সালের মধ্যে পত্রিকাটির মাত্র ৮১ কপি বিক্রি হয়েছে।[১৪]

বিশিষ্ট উদ্ভিদবিজ্ঞানী গিরীশচন্দ্র বসুর সম্পাদনায় ১৮৮৫ সালে *কৃষি গেজেট* প্রকাশিত হয়। তারও চাহিদা সীমাবদ্ধ। আজকাল আমরা দেখতে পাই, বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রগুলি কৃষি বিষয়ক প্রতিবেদন, সাপ্তাহিক কৃষি সমাচার ইত্যাদি প্রকাশ করছে। বাংলায় শুধু কৃষি বিষয়ক রচনায় সমৃদ্ধ বিজ্ঞান পত্রিকা আমাদের অল্প কয়েকটি চোখে পড়েছে। এর কারণও রয়েছে। যাঁরা মাঠে ঘাটে কাজ করেন, জমিতে ফসল ফলান, তাঁরা সরাসরি অভিজ্ঞতা থেকে অনেক বেশি জিনিস শেখেন। কৃষির নতুন খবরাখবর কৃষিবিজ্ঞানীরা চাষীদের কাছে পৌঁছে দেন। ফলে কৃষিতে গবেষণাধর্মী পত্রিকাই বেশি কাজের হয়ে ওঠে। তবু উনিশ শতকের শেষ দিকে প্রকাশিত কৃষি বিষয়ক কয়েকটি সাময়িক পত্রের নাম বলতেই হবে। তিনটি পত্রিকার নাম করব। ১২৯০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হয়েছে *কৃষিপদ্ধতি* (সম্পাদক—উমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত)। ঢাকা থেকে কালীকুমার মুন্সীর সম্পাদনায় ১২৯৪ বাংলার ভাদ্র মাসে বেরিয়েছে *সচিত্র কৃষি শিক্ষা*। ১৩০৬ সালের মাঘ মাসে নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে *কৃষিতত্ত্ব* (নবপর্যায়)।

কারিগরি বিদ্যার পত্রিকা পুরো উনিশ শতক জুড়ে মাত্র একটির কথা জানা যায়। ১২৯৩ সালের আশ্বিন মাসে বিহারীলাল ঘোষের সম্পাদনায় *কারিগর দর্পণ* প্রকাশিত হয়।

এবার আমরা বিশ শতকের সাময়িকপত্র তথা বিজ্ঞান পত্রিকার আলোচনায় যেতে চাই। বিশ শতকে উৎকৃষ্ট সাময়িকপত্রের শুধু তালিকা তৈরি করাই এক দীর্ঘ গবেষণার বিষয়। হয়তো কিছু সাময়িকপত্র ক্ষীণজীবী ও কিছু সাময়িকপত্র দীর্ঘজীবী হয়েছে। একুশ শতকেও এদের কেউ কেউ উজ্জ্বলতা ও ব্যতিক্রমী চরিত্র নিয়ে বেঁচে রয়েছে। তবে অনেক কথা বলার মতো পরিসর এই নিবন্ধে নেই।

ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে বিজ্ঞানের যে নিজস্ব দর্শন রয়েছে সে সম্পর্কিত আলোচনা আমরা বিশ শতকের কয়েকটি সাময়িকপত্রের বিজ্ঞান রচনায় দেখতে পাই। এমন সাময়িকপত্রের নাম বলতে গেলে আমাদের *সাহিত্য, নবজীবন, নব্যভারত* ইত্যাদি পত্রিকার কথা বলতে হয়।

উনিশ শতক *নব্যভারত*-এর জন্মকাল। কিন্তু উচ্চমানের সিংহভাগ রচনা তার বিশ শতকের ফসল। এই পত্রিকায় লিখতেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শশধর রায়, মেঘনাদ সাহা, প্রিয়দারঞ্জন রায় ও আরও অনেকে। পদার্থবিদ্যার নিবন্ধ ও বিজ্ঞানীদের জীবনভিত্তিক রচনা বেশি প্রকাশিত হত। নিছক জীবনী রচনা নয়। জীবন ও কাজের দর্শন আলোচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার লেখা 'অ্যাস্টন্' (ফাল্গুন ১৩২৯) এবং 'আইনস্টাইন ও বর্' (পৌষ ১৩২৯) রচনা দুটির কথা উল্লেখ করতে পারি। অ্যাস্টন্ পড়াশুনায় ভাল ছাত্র ছিলেন না। কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি বিজ্ঞানের এমন মৌলিক গবেষণা করেন, যা তাঁকে নোবেল পুরস্কার এনে দেয়। ওই রচনায় তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে লিখলেন মেঘনাদ, 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সম্ভবতঃ অনেক ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই একটি অদ্ভুত নিয়ম আছে।...যে সমস্ত বিদ্যার্থীগণ দুর্ভাগ্যক্রমে এম-এ পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীতে স্থান প্রাপ্ত হন তাঁহারা তখন হইতেই মার্কামারা হইয়া যান। তাঁহাদের পক্ষে 'ডাক্তার' উপাধির জন্য প্রস্তুত হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাঁহারা স্থান লাভ করেন তাঁহারা শুধু মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ দাখিল করিলেই এবং গবেষণা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেই 'ডাক্তার' উপাধি পাইতে পারেন। ...নাম করার দরকার নাই, এইরকম দুই একজন তৃতীয় শ্রেণীর এম-এ পরে এত অধ্যয়ন ও গবেষণা করিয়াছেন যে অনেক প্রথম শ্রেণীর এম-এ তাঁহাদের পেন্সিল কাটিয়া দিবারও যোগ্য নন'।[১৫] রচনাটি তরুণ মনে অসম্ভব উন্মাদনা ও অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলে। একথা সবাই জানেন, মেঘনাদ ছাত্র হিসেবে অসম্ভব ভালো ছিলেন।

সাহিত্য পত্রিকা ১২৯৭ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক সুপরিচিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। এই সাময়িকপত্রের লেখক তালিকা ছিল অত্যুজ্জ্বল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শশধর রায়, যোগেশচন্দ্র রায় সবাই এই পত্রিকায় লিখেছেন। বিজ্ঞান রচনার বেলায় এই পত্রিকার ভূমিকা অসামান্য। উনিশ শতকের এক দশক ও বিশ শতকের অনেকটা সময় জুড়ে *সাহিত্য* তার সৌরভ ছড়িয়েছে। জগদানন্দের অপরূপ রচনা 'নাক্ষত্রিক সংঘর্ষণ' (আশ্বিন ১৩০৪) এই পত্রিকায় বেরিয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর ধারাবাহিকভাবে লিখেছেন 'জগৎ-কথা'।

বিশ শতকের স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকাগুলির মধ্যে আমরা আলাদা করে *ভারত-মহিলা* (প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩১২) ও *পরিচারিকা* (নবপর্যায়, অগ্রহায়ণ ১৩২৩)-র নাম করতে পারি। সরযূবালা দত্ত সম্পাদিত *ভারত-মহিলা* পত্রিকায় জগদানন্দ রায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখেরা লিখতেন।

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুর কয়েকটি দশককে ছোটোদের পত্রিকার সুবর্ণযুগ বলা যায়। প্রতিটি পত্রিকা এমন, তাদের নিয়ে আলাদা আলাদা গবেষণাগ্রন্থ রচনা করা যায়। *বালক*-এর কথা আগে বলেছি। এছাড়া রয়েছে *সাথী* (সম্পাদক--ভুবনমোহন রায়, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩০০), *সখা ও সাথী* (সম্পাদক--ভুবনমোহন রায়, প্রথম প্রকাশ :

বৈশাখ ১৩০১), *মুকুল* (সম্পাদক—শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩০২), *শিশু* (সম্পাঁদক—বরদাকান্ত মজুমদার, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩১৯), *সন্দেশ* (সম্পাদক—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩২০), *শিশুসাথী* (সম্পাদক—আশুতোষ ধর, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩২৯), *রামধনু* (সম্পাদক—বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৩৪) ইত্যাদি।

সখা এবং *সখা ও সাথী* পত্রিকায় ছোটোদের বিজ্ঞান রচনার জন্য কলম ধরতেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, জগদানন্দ রায়, ভুবনমোহন রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ লেখকেরা। এই লেখককুল *মুকুল* পত্রিকারও সম্পদ ছিলেন। এছাড়াও *মুকুল*-এ লিখেছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও জগদীশচন্দ্র বসু। চমৎকার জীববিজ্ঞানের সরস রচনা লিখেছেন ছোটোদের প্রিয় যোগীন্দ্রনাথ সরকার। *মুকুল*-এ লেখা জগদীশচন্দ্রের কয়েকটি রচনা, যেমন, 'গাছের কথা-এক' (আষাঢ় ১৩০২), 'গাছের কথা-দুই' (ভাদ্র ১৩০২), 'মন্ত্রের সাধন' (১৩০৫)। রামেন্দ্রসুন্দরের কয়েকটি রচনা যেমন 'আমরা কি খাই?' (ভাদ্র ১৩০২), 'মেরুপ্রদেশ' (আশ্বিন ১৩০২), 'নিউটনের কীর্তি' (ফাল্গুন ১৩০২), 'গাছের আহার' (আশ্বিন ১৩০৫), 'জ্যোতিষের কথা' (আষাঢ় ১৩০৬)।

সন্দেশ পত্রিকায় বিজ্ঞান রচনার বেলায় প্রথমে উপেন্দ্রকিশোর 'একাই একশো' ছিলেন। পরে কাগজের সম্পাদনার ভার যখন পুত্র সুকুমারের হাতে যায়, তখন সুকুমার রায় 'একাই একশো' হয়ে উঠেন। ছোটোদের জন্য পিতা-পুত্র দুজনেই প্রচুর সরস ও জীবনীমূলক বিজ্ঞান রচনা লিখেছেন। দুজনের রচনাসংগ্রহ এখন সহজলভ্য। 'সেরা সন্দেশ'ও পাওয়া যায়। কাজেই তাঁদের অবদান পরখ করে দেখতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না।

রামধনু পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান নিবন্ধ প্রকাশিত হত। প্রথমে এই কাগজ সম্পাদনা করেছেন বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য। পরে তাঁর পুত্র মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রয়াণের পর অনুজ ও সুপরিচিত বিজ্ঞান সাহিত্যিক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য এই পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণের প্রচুর লেখা এই কাগজে বেরিয়েছে। বিশ শতকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রের সংখ্যা নগণ্য নয়। এদের মধ্যে বিজ্ঞানসাহিত্যকে সচেতন ভাবে জায়গা করে দিয়েছে গোটাকয় পত্রিকা। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই আমাদের *বঙ্গদর্শন* (নবপর্যায়), *ভারতবর্ষ, মানসী* ও *মর্ম্মবাণী, মাসিক বসুমতী* ও *প্রবাসী*-র নাম উচ্চারণ করতে হয়।

১৩০৮ বাংলায় *বঙ্গদর্শন* (নবপর্যায়) প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার লেখক ছিলেন জগদানন্দ রায়, শশধর রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেশচন্দ্র রায় প্রমুখ। *ভারতবর্ষ* প্রকাশিত হয় ১৩২০ সালের আষাঢ় মাসে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই সাময়িকপত্র স্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছে। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান লেখকেরা *ভারতবর্ষ*-এ লিখতেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য নিয়মিত লিখেছেন।

মানসী ও মর্ম্মবাণী-র প্রকাশ কাল ফাল্গুন ১৩২২। আপেক্ষিকতাবাদের মত জটিল বিষয়ে বাংলা বিজ্ঞান রচনা প্রথম এই কাগজেই প্রকাশিত হয়।

মাসিক বসুমতী (প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩২৯) পত্রিকার অন্যতম সম্পদ ছিল সত্যচরণ লাহার পাখি বিষয়ক রচনা ও বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্রের রসায়নের ইতিহাস নিয়ে রচনা।

প্রবাসী-র অবদান না বললে আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না। ১৩০৮ সালের বৈশাখ থেকে এই

পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। প্রথম সংখ্যা থেকেই *প্রবাসী*-তে বিজ্ঞান রচনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম সংখ্যার রচনা 'জীববিদ্যা'। লেখক যোগেশচন্দ্র রায়। *প্রবাসীর* লেখক তালিকা অতুলনীয়। লেখার ঐশ্বর্য অভাবনীয়। সম্প্রতি আমরা *প্রবাসী*-র সম্মিলিত সূচি (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়েছে।[১৬] লেখসূচি নির্মাতারা বিষয় অনুসারে বিজ্ঞান রচনাগুলির পৃথক পৃথক শিরোনাম করেছেন। তার ব্যাপ্তি আমাদের বিস্মিত করে। কারা ছিলেন 'প্রবাসী'-র বিজ্ঞান লেখক? অতিপরিচিতদের একটি তালিকা সাজাই--

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, জগদানন্দ রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়দারঞ্জন রায়, যোগেশচন্দ্র রায়, রাধাগোবিন্দ চন্দ্র, শিশিরকুমার মিত্র, অমলচন্দ্র হোম, বিনয়কুমার সরকার, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যচরণ লাহা, চুনীলাল বসু, পরশুরাম, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীলরতন সরকার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, জীবনতারা হালদার, সুন্দরীমোহন দাস, অন্নদাশঙ্কর রায়, রসিকলাল দত্ত, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

বিশ শতকের বিজ্ঞান পত্রিকার জগতে চোখ রাখি এবার। প্রথমে আমরা বলব *বিজ্ঞান* পত্রিকার কথা। ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারের পুত্র ডা. অমৃতলালের সম্পাদনায় ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাসে এই পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। জয়ন্ত বসু লিখেছেন, 'সাধারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মোটামুটি উচ্চমানের বলে চিহ্নিত করা যায়' এই পত্রিকাকে। পত্রিকার সম্পাদক দুঃখ করে বলেছিলেন, বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-পত্রিকা দীর্ঘকাল চালানোর মত আবহ এখনও এদেশে তৈরি হয়নি।

সত্যিকারের উঁচু মানের প্রথম বিজ্ঞানপত্রিকা বলতে অনেকেই পক্ষীবিশারদ সত্যচরণ লাহা সম্পাদিত *প্রকৃতি*-র কথা উল্লেখ করেন। গবেষক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্পষ্টভাবে বললেন, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানপত্রিকা হল সত্যচরণ লাহা সম্পাদিত 'প্রকৃতি' (দ্বৈমাসিক)।' ১৩৩১ বাংলার বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। এই পত্রিকার সিংহভাগ রচনা মৌলিক। নিজেদের গবেষণার উপর ভিত্তি করে রচনাগুলো লেখা হত। যাঁরা এই পত্রিকায় লিখতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, হিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায়, সহায়রাম বসু, মেঘনাদ সাহা, স্নেহময় দত্ত প্রমুখ। প্রথমদিকে প্রাণীবিদ্যার রচনা বেশি প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় বছর থেকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের রচনার সংখ্যা বেড়েছে। পরিভাষা বিষয়ে একাধিক দামি আলোচনা এই পত্রিকায় বেরিয়েছে।

যে বিজ্ঞানপত্রিকা বিষয়ে আমাদের একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ অনুচ্ছেদ রচনা করতে হবে তার নাম *জ্ঞান* ও *বিজ্ঞান*। স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছর থেকে এই পত্রিকা সম্পর্কিত ভাবনার গোড়া-পত্তন হয়েছে। রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও আরও তেইশজন বিজ্ঞানানুরাগী মানুষের উপস্থিতিতে ১৯৪৭ সালের ১৮ অক্টোবর একটি সভা হয়। সভায় ঠিক হয়, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের জন্যে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হবে। ১৯৪৮ সালের ২৫ জানুয়ারি এই সংগঠনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

যাঁরা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জীবনকথা পড়েছেন তাঁরা জানেন, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি জীবন শুরু করলেও, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকদিন ছিলেন। ঢাকা থেকে শেষ

চাকরি জীবনে আবার কলকাতায় আসেন। ঢাকায় থাকার সময়ে মুখ্যত তাঁরই আগ্রহে ১৯৪১ সালে *বিজ্ঞান পরিচয়* নামে একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঢাকা থেকে চলে এলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভায় ঠিক হল, পরিষদ থেকে একটি নতুন দ্বিমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা হবে।। পরে সিদ্ধান্ত বদল করে মাসিক পত্রিকা প্রকাশের কথা ঘোষণা করা হয়। আরও বলা হয় যে ১৯৪৮ সালের ২৫ জানুয়ারি উদ্বোধন দিবসে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা বেরোবে। প্রথম পত্রিকা প্রকাশ সমিতিতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, পরিমল গোস্বামী, দ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সুনীলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক হিসাবে প্রফুল্লচন্দ্র মিত্রের নাম সাব্যস্ত হয়। পত্রিকা প্রকাশ সমিতি প্রথমে ভেবেছিল, কাগজের নাম হবে *বিজ্ঞান জগৎ*। পরে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে পরামর্শ করে নাম বদলে *জ্ঞান ও বিজ্ঞান* রাখা হয়। সিদ্ধান্ত মত ১৯৪৮ সালের ২৫ জানুয়ারি পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করে। এই সংখ্যায় লিখেছিলেন যোগেশচন্দ্র রায়, বিনয়কুমার সরকার, প্রিয়দারঞ্জন রায়, বীরেশচন্দ্র গুহ, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ গুপ্ত, জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, সুবোধনাথ বাগচী, ফণীন্দ্রনাথ শেঠ, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ও পরিমল গোস্বামী। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল বারো আনা। ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হলেন। ১৯৪৯ সালে প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হন। ১৯৫০ সালের জানুয়ারি থেকে গোপালচন্দ্র পুরোপুরি সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পত্রিকাটি বিজ্ঞান ভাবনা প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এক অসামান্য ভূমিকা পালন করতে থাকে। প্রথম সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথের লেখা না থাকলেও, ১৯৪৮ সালের মার্চ সংখ্যায় তাঁর 'শক্তির সন্ধানে মানুষ' রচনাটি প্রকাশিত হয়। জুন মাস থেকে 'ছোটদের পাতা' নামে আলাদা বিভাগ তৈরি হয়। এক সময় বিভাগের নাম হয় 'কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর'। ১৯৫৫ সাল থেকে 'করে দেখ' শিরোনামে কিশোরোপযোগী নানা রচনা বেরোতে থাকে। বেশির ভাগ লেখাই লিখতেন গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। কিশোরদের নানা বিভাগ ছাড়া বড়োদের জন্য একাধিক নিবন্ধ বেরোত। ১৯৫২ সালে প্রথম ধারাবাহিক রচনা 'বিজ্ঞানচর্চার প্রথম জাতীয় প্রতিষ্ঠান' প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের 'নক্ষত্র' বিষয়ক আটটি লেখা *জ্ঞান ও বিজ্ঞান* পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছে। এই পত্রিকায় 'বিজ্ঞান সংবাদ' নামেও একটি আলাদা বিভাগ রয়েছে। মাঝে মাঝে পুস্তক সমালোচনা প্রকাশিত হয়। প্রথম দশ বছর পত্রিকাটির মুদ্রণ সংখ্যা ছিল এক হাজার থেকে দেড় হাজারের মধ্যে।

১৯৬৬ সালে প্রথম *জ্ঞান ও বিজ্ঞান*-এর শারদ সংখ্যা বেরোয়। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন সত্যজিৎ রায়। সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রিয়দারঞ্জন রায়, নির্মলকুমার বসু ও আরও অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি এই সংখ্যায় লিখেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পত্রিকার চৌদ্দশ কপি কিনে নিয়ে নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিয়েছিলেন। নিয়মিতভাবে মাসিক সংখ্যা প্রকাশ ছাড়াও, এই পত্রিকা একাধিক সংগ্রহযোগ্য বিশেষ সংখ্যা বের করেছে। কয়েকটির কথা বলছি। ১৯৫৮ সালে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে 'আচার্য জগদীশ সংখ্যা' (নভেম্বর ১৯৫৮) বেরোয়।

লেখকসূচিতে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রমোহন বসু, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শিশিরকুমার মিত্র, প্রিয়দারঞ্জন রায়, পরিমল গোস্বামী প্রমুখ। ১৯৬০ সালে 'রাজশেখর বসু সংখ্যা' বেরোয়। রাজশেখর বসুর প্রয়াণে এই সংখ্যাটি বেরিয়েছে। সংখ্যাটির বড় বিশেষত্ব এই, বিজ্ঞানীদের লেখা এগারোটি উচ্চ মানের মৌলিক গবেষণাপত্র এতে প্রকাশিত। এছাড়া যে যে বিশেষ সংখ্যা বেরোয়, রবীন্দ্র শতবর্ষ সংখ্যা (মে ১৯৬১), প্রফুল্লচন্দ্র জন্মশতবর্ষ সংখ্যা (আগস্ট ১৯৬১), অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র স্মৃতি সংখ্যা (নভেম্বর ১৯৬৩), আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বর্ষ-পূর্তি স্মারক সংখ্যা (জানুয়ারি ১৯৬৪), আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর সংখ্যা (আগস্ট ১৯৬৪), আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ সংখ্যা (অক্টোবর ১৯৬৪), আচার্য সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ সংখ্যা (মার্চ ১৯৬৭)। এসব সংখ্যায় লিখেছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নিখিলরঞ্জন সেন, বীরেশচন্দ্র গুহ, সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

সম্পাদক ঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র

এই সংখ্যার লেখকগণ

প্রথম বর্ষ ঃ প্রথম সংখ্যা ঃ জানুয়ারী ১৯৪৮ ঃ মূল্য বারো আনা

জ্ঞান ও বিজ্ঞান-এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ

নিয়ম মেনে মাসের একই সময়ে কাগজের প্রতিটি সংখ্যা বেরোত এক সময়। মাঝে খানিকটা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। এখন আবার নিয়মিত হয়েছে। এই পত্রিকা প্রকাশে সর্বাধিক কৃতিত্ব নিশ্চয়ই গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রাপ্য। ১৯৫০ থেকে ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য *জ্ঞান ও বিজ্ঞান* পত্রিকার সম্পাদক ও পরে আমৃত্যু প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন।

২০০২ সালে পত্রিকার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে *সেরা জ্ঞান ও বিজ্ঞান* প্রকাশিত হয়েছে। তার লেখক তালিকা আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে। কয়েকজন লেখকের নাম বললেই পাঠক তার ব্যাপ্তি অনুমান করতে পারবেন। সংকলনের লেখকসূচিতে রয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নির্মলকুমার বসু, সজনীকান্ত দাস, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিমলেন্দু মিত্র, রতনলাল ব্রহ্মচারী, পূর্ণেন্দুকুমার বসু, রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ, সমরেন্দ্রনাথ সেন, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিমল সেন, রণতোষ চক্রবর্তী, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, রাজশেখর বসু, দিলীপকুমার রায়, সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মণীন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, লীলা মজুমদার, জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ি, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, বিনয়কুমার সরকার, পরিমল গোস্বামী, সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার মিত্র, পূর্ণিমা সিংহ, জয়ন্ত বসু, আবদুল্লাহ আল-মুতী, তারকমোহন দাস, বীরেশচন্দ্র গুহ, নীলরতন ধর, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, রাধাকান্ত মণ্ডল, নারায়ণ সান্যাল, অসীমা চট্টোপাধ্যায়, অমিয়কুমার হাটি, রাধাগোবিন্দ চন্দ্র, শঙ্কর চক্রবর্তী, নারায়ণচন্দ্র রাণা, অরূপরতন ভট্টাচার্য, রমাতোষ সরকার, জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিকাশচন্দ্র সিংহ, প্রিয়দারঞ্জন রায়, অভিজিৎ লাহিড়ি, নিখিলরঞ্জন সেন, বিশ্বরঞ্জন নাগ, অনাদিনাথ দাঁ, অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও অনেকে। সংকলনে মোট ১০৮টি প্রবন্ধ রয়েছে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা আজও নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলিতে সমাজ ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত নানা লেখা নিয়মিত বেরোয়।

অন্যান্য বিজ্ঞানপত্রিকার কথা বলতে গেলে নাম হয়তো বেশ কিছু উচ্চারণ করা যায়। যথার্থ প্রভাব বিস্তারে এদের অল্প কয়টিই সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে। যারা ভূমিকা পালন করতে পারেনি তার জন্যে প্রকাশক বা সম্পাদকেরা দায়ী নন। এই প্রশ্নে নানা আর্থ-সামাজিক প্রসঙ্গ এসে যায়। বহরমপুর থেকে প্রকশিত *বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা*-র কথা মনে পড়ে। *পরিসংখ্যান ও গবেষণা* পত্রিকার কথা আলাদা করে বলতে হয়। আশিস সিংহ সম্পাদিত *গবেষণা*-র কয়েকটি সংখ্যা দেখেছি। আন্তর্জাতিক মানের মৌলিক গবেষণাপত্র বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। কাগজটি অত্যন্ত সুসম্পাদিত হয়ে বেরোত। কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হল না। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞান পত্রিকার কথা বলব। ১৯৭১ সাল। বাংলাদেশ সবে স্বাধীনতা পেয়েছে। মহম্মদ ইব্রাহিমের সম্পাদনায় ১৯৭১ সাল থেকেই *বিজ্ঞান সাময়িকী* ঢাকা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। সুন্দর আকার। যত্ন নিয়ে ছাপা। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের লেখা সবশেষ চিঠিটি মুদ্রণের সুযোগ পেয়ে এই কাগজ বাড়তি স্মরণযোগ্যতা অর্জন করেছে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পাঠাগারে আজও নিয়মিতভাবে *বিজ্ঞান সাময়িকী* পৌঁছয়।

'আশির দশকের গোড়ার দিকে নিছক বিজ্ঞানের পত্রিকার সংখ্যাও কম ছিল না, *জ্ঞান ও*

বিজ্ঞান ছাড়াও প্রায় ১৪-১৫টি বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হত, তবে দুঃখের বিষয় সেগুলির অধিকাংশই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।'

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান, বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান জগৎ, অন্বেষা, বিজ্ঞান মনীষা, জ্ঞানবিচিত্রা, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, উৎস মানুষ, লোকবিজ্ঞান ইত্যাদি পত্রিকার নাম করতে হয়। *কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান* ও *জ্ঞান বিচিত্রা* আজও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। শুরুতে *কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান* পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন সমরজিৎ কর। পরে দীর্ঘকাল রবীন বল মশাই সম্পাদনা করেন। এখন সোমনাথ বলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে। আগামী বছর এই শিশুকিশোর উপযোগী শিক্ষামূলক বিজ্ঞান পত্রিকার পঁচিশ বছর পূর্তি হবে। সুদূর ত্রিপুরা থেকে দেবানন্দ দামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *জ্ঞান বিচিত্রা*। ১৯৭৬ সালে *বিচিত্রা* নামে পত্রিকাটি বেরিয়েছিল। ১৯৭৮ সালে নাম বদলে *বিজ্ঞান বিচিত্রা* রাখা হয়। অনিবার্য কারণে ১৯৮১ সাল থেকে *জ্ঞান বিচিত্রা* নামে বেরোয়। খুবই সুসজ্জিত চেহারায় নিয়মিত এই পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। তথ্যনির্ভর বিজ্ঞান নিবন্ধের পাশাপাশি বিজ্ঞান সমাজ প্রযুক্তি ও দর্শন সম্পর্কিত রচনাও প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার একটি সুচিন্তিত উপদেষ্টামণ্ডলীও রয়েছে।



কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান-এর প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ

বিজ্ঞান মেলা অনিয়মিত হলেও শুভব্রত রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় আজও প্রকাশিত হয়। *অন্বেষা*-র কথা আলাদা করে মনে পড়ে। বিজ্ঞানের প্রকৃত একটি সিরিয়াস পত্রিকা *অন্বেষা*। ওই পত্রিকাতেই আশীষ লাহিড়ী জে. ডি. বার্নালের 'সায়েন্স ইন হিস্ট্রি' ধারাবাহিক অনুবাদ করেছিলেন। এই পত্রিকাও বেঁচে থাকল না।

মানবমন প্রকাশ করেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পাভলভ ইনস্টিটিউটের মুখপত্র। উঁচু মানের এই কাগজ মাঝে বন্ধ হয়ে যায়। এখন আবার প্রকাশিত হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকার প্রকাশকাল ১৯৭৭। দ্বিমাসিক পত্রিকা ছিল। প্রধান সম্পাদক ছিলেন অভিজিৎ লাহিড়ি। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত নিয়মিত বেরিয়েছে। তারপর ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসেবে ২০০১ সাল পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে। এখন বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করছেন রবীন মজুমদার। অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিতর্ক উত্থাপন করেছে এই বিজ্ঞান পত্রিকা। বিশেষত পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত নানা সমস্যার কথা তুলে এনেছিল এই কাগজ। বিদ্যালয় স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার বইপত্র বিষয়েও সমীক্ষামূলক নিবন্ধ বেরোয় এই কাগজে। এক সময়ের আলোচিত পত্রিকা আজ আগ্রহীদের কাছে আর পৌঁছবার সুযোগ নেই। বার্ষিক সংখ্যায় আর কতটা ক্ষুধা মেটে?

সুবীর পোদ্দার সম্পাদিত *আগ্নন্য* কাগজটির কথা আজকাল কাউকে বলতে বিশেষ শোনা যায় না। অথচ এই কাগজে এক সময় বিজ্ঞানের অত্যন্ত মৌলিক ও চিন্তা উদ্রেককারী রচনা বেরিয়েছে।

১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে *মানুষ* নামে যে পত্রিকা বেরিয়েছিল, নিবন্ধীকরণ সম্পর্কিত কারণে পরের বছর থেকে *উৎস মানুষ* নামে প্রকাশিত হয়। প্রায় দুই দশক এই কাগজ নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। নানা সময়ে সমাজে আলোড়ন তুলতেও সমর্থ হয়েছে। এমন কাগজ ২০০২ সালে উপযুক্ত সহযোগিতার অভাবে দ্বিমাসিক হয়ে যায়। ২০০৩ সালে বন্ধ হয়ে যায়। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনী শাণিত করেছে এই পত্রিকা। যুক্তি বুদ্ধি ও ন্যায়ের অস্ত্র সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করেছে।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন *গণদর্পণ* একই নামে একটি মুখপত্র প্রকাশ করে। মরণোত্তর দেহদানের কর্মসূচি জনপ্রিয় করার বাইরে অন্যান্য বিজ্ঞানের নিবন্ধও এই স্বল্পায়তন কাগজে প্রকাশিত হয়। নিয়মিত না হলেও ঝাড়গ্রাম থেকে *টপকোয়ার্ক* নামে একটি পত্রিকা বেরোয়।

১৯৮৬ সালে আমাদের রাজ্যে 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ' নামে একটি বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের সংগঠন জন্মলাভ করে। সেই সংগঠন দু-দশক অতিক্রম করে রাজ্যের এমন কি দেশের সবচেয়ে বড় জনবিজ্ঞান সংগঠনে পরিণত হয়েছে। এই সংগঠন তাঁর জন্মলগ্নের কিছুদিন পরেই দুটি বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একটি পত্রিকার নাম *জনবিজ্ঞানের ইস্তাহার*। অন্যটি শিশুকিশোরদের বিজ্ঞানপত্রিকা। নাম *এ যুগের কিশোর বিজ্ঞানী*। প্রথম পত্রিকাটি বড়দের ও বিজ্ঞানকর্মীদের। ত্রৈমাসিক হিসেবে শুরু হলেও বর্তমানে দুই মাস অন্তর বেরোয়। সম্পাদক হিসেবে শুরু থেকেই অপরাজিত বসু রয়েছেন। *এ যুগের কিশোর বিজ্ঞানী* ১৯৮৯ সালে প্রথম শারদ সংকলন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ত্রৈমাসিক হিসেবে নিয়মিত বেরোয়। এক দশক এই কাগজটি সম্পাদনা করেন শ্যামল চক্রবর্তী। এখন অরুণাভ মিশ্রের সম্পাদনায় দ্বিমাসিক হিসেবে প্রকাশিত হয়।

সমাজে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কী, যে কোনো শিক্ষিত মানুষই জানেন। নানা প্রযুক্তির চেহারায় বিজ্ঞানের রূপ সাধারণ মানুষের কাছে ধরা পড়ে। আগামী প্রজন্মকে বিজ্ঞানমুখী করে তোলার কাজে বিজ্ঞানপত্রিকার ভূমিকা অপরিসীম। বিনা বাধায় পৃথিবীতে বিজ্ঞান জন্মলাভ করেনি। এ সকল লড়াইয়ের কথা মানুষের কাছে তুলে ধরা জরুরি। উত্থান পতনের ভেতর দিয়ে, আবাহন বিসর্জনের মধ্য দিয়ে অন্যান্য মুখপত্রের মতই বিজ্ঞান পত্রিকা বেঁচে থাকবে, এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ইতিহাসের পদচারণা থেকে আমরা এই বিশ্বাস সংগ্রহ করেছি।

তথ্যসূত্র

১. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, *বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান* : (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ফেব্রুয়ারি ২০০৪) পৃ. ৩২

২. সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত *শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী* : (৩য় সংস্করণ, ১৯২৭), সপ্তম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৭৫-৭৬

৩. বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ* : (ওরিয়েন্ট লংম্যান সংস্করণ, ১৯৯৩) পৃ. ১৩৫

৪. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, *বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান* : (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ফেব্রুয়ারি ২০০৪) পৃ. ৫২

৫. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* : (৩য় সংস্করণ), পৃ. ১৯৯-২০০

৬. *বিবিধার্থ সংগ্রহ,* ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৭৭৩ শকাব্দ

৭. সম্পাদনা—প্রদীপ বসু, *সাময়িকী* : (আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, মে ১৯৯৮) পৃ. ১৯

৮. ঐ

৯. বিনয়ভূষণ রায়, *উনিশ শতকে দেশীয় ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞানচর্চা* : (আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৯৫)

১০. দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান* : (আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ২০০০)

১১. অরুণা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *সখা, সখা ও সাথী* : (কল্লোল, ফেব্রুয়ারি ২০০২)

১২. বিনয়ভূষণ রায়, *উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা,* (নয়া উদ্যোগ, এপ্রিল ২০০২)

১৩. জয়ন্ত বসু, *বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ : পঞ্চাশ বছর পরিক্রমা,* (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ. ডিসেম্বর ২০০০)

১৪. 'Agricultural Education', *Journal of the Agricultural and Horticultural Society of India,* 1887, V. XIV pt-II, p.5.

১৫. শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *মেঘনাদ রচনা সংকলন* : (ওরিয়েন্ট লংম্যান, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৯০৮ শকাব্দ)

১৬. গীতা চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতি মিত্র, *প্রবাসীর সম্মিলিত সূচি (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)* : (পরিবেশক—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, অক্টোবর ২০০৪)

স ন্দী প ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

বিশ শতকের কলকাতায় বাঙালির দৈনিকপত্র

উনিশ শতকের শেষ পর্বে উদীয়মান জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গিয়েছিল বাঙালির যে-দুটি দৈনিকপত্র--সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯২৫) *বেঙ্গলী* আর শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১) প্রতিষ্ঠিত *অমৃতবাজার পত্রিকা*--দুটিই প্রকাশিত হত ইংরেজিতে। অমৃতবাজার অবশ্য প্রথমে বাংলা সাপ্তাহিক হিসেবেই যশোহর থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিল, পরে দ্বিভাষিক এবং ১৮৭৮ সালে দেশীয় সংবাদপত্র আইন প্রবর্তিত হবার পর ২১ মার্চ থেকে ইংরেজি সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়ে অমৃতবাজার কীভাবে ওই কুখ্যাত আইনটির মুদ্রিত প্রতিবাদ হয়ে উঠল--সে-কাহিনি অনেকেরই জানা। শিশিরকুমারের ভাই মতিলাল ঘোষের (১৮৪৭-১৯২২) সম্পাদনাকালে ১৮৯১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে *অমৃতবাজার* একটি ইংরেজি দৈনিক হয়ে ওঠে। প্রায় একশো বছর জীবিত ছিল এই পত্রিকাটি। মতিলালের পর সম্পাদক হয়েছিলেন তুষারকান্তি ঘোষ (১৮৯৮-১৯৯৪)।

উনিশ শতকের বাংলায় প্রধান দুটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকার প্রকাশমাধ্যম যে ইংরেজি ছিল, তার কারণটি আমরা সহজেই বুঝতে পারি; দৈনিকপত্রের প্রধান লক্ষ্য তখন বিদেশি সরকারের স্বৈরাচারী নীতির সমালোচনা এবং ভারতবাসীর বিভিন্ন দাবি আর অধিকারের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। দ্বিতীয়ত, জাতীয়তাবাদ বলে তখন যা প্রতিভাত হচ্ছে, তার প্রভাবও শিক্ষিত সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই আবদ্ধ। তাই বাঙালির পরিচালনা বা সম্পাদনায় দৈনিকপত্রগুলি যে তখন ইংরেজিতেই প্রকাশিত হচ্ছিল, তা এক রকম স্বাভাবিকই বলা যায়।

বিশ শতকের শুরুতে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের অনুভাবে এই অবস্থাটা কিন্তু কিছুটা বদলে যায়। বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী হিসাবে বাঙালির ভেতর তখন যে স্বাজাত্যবোধ গড়ে উঠেছে--সেই সীমিত চেতনা প্রকাশেরই একটা বাহন হয়ে ওঠে বাংলা পত্রপত্রিকা। ১৯০৪ সাল থেকে তাই আমরা ইংরেজির পাশাপাশি কয়েকটি বাংলা দৈনিকপত্রের আবির্ভাবও লক্ষ করি। দুঃখের বিষয়, সেই পত্রিকাগুলির একটাও আমরা হাতে নিয়ে দেখার সুযোগ পাইনি। ১৯৪৮ সালের আগের কোনো বাংলা দৈনিকপত্র জাতীয় গ্রন্থাগারে নেই। ফলে পত্রিকার প্রকাশকাল, সম্পাদকের নাম-পরিচিতি এবং রচনারীতির নমুনা আমাদের সংগ্রহ করতে হয়েছে পরোক্ষ সূত্র থেকে; পুলিশি নথিতে পাওয়া ইংরেজি অনুবাদকে বাংলায় পুনরনুবাদ করে নিয়ে। এই রচনার শেষে সেই উৎসগ্রন্থগুলির নাম আমরা বর্ণানুক্রমে সাজিয়ে দিয়েছি; আর রচনার মধ্যে বন্ধনীর ভেতর উল্লেখ করেছি তাদের প্রাসঙ্গিক পৃষ্ঠাসংখ্যা; অর্থাৎ বন্ধনীতে ৩ : ৪৩ থাকলে ধরে নিতে হবে তিন নম্বর উৎসগ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠা। এছাড়া যাঁরা মৌখিক আলাপ বা অন্য কোনোভাবে আমাদের তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন তাঁদের নাম উল্লেখ করেছি *কৃতজ্ঞতা স্বীকার* শিরোনামে।

প্রধানত কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি নিয়েই এই রচনা। কিন্তু সব সংবাদপত্রের নাম আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। কিছু দৈনিকপত্রের নাম পেয়েছি, কিন্তু তার বেশি কিছুই পাইনি। এই অক্ষমতা এবং অসম্পূর্ণতা আমরা প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছি। পরোক্ষ সূত্র হিসাবে আমরা যে-গ্রন্থগুলির ওপর নির্ভর করেছি, সেখানেও বেশ কিছু ভুল তথ্য আছে। আমরা অন্যান্য সূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে, বিচার-বিবেচনা করে, তা সাধ্যমতো সংশোধন করে নেবার চেষ্টা করেছি। এরপরও কিছু ভুলভ্রান্তি নিশ্চয়ই রয়ে গেল। তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

এক : ১৯০৪-১০

১৯০৪ সালের নভেম্বর (মতান্তরে ডিসেম্বর) মাসে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের (১৮৬১-১৯০৭) *সন্ধ্যা* নামের সান্ধ্য দৈনিকটি যখন আত্মপ্রকাশ করল, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী প্রতিবাদ-প্রতিক্রিয়ায় বাংলা, বিশেষত তার কয়েকটি বিশিষ্ট অঞ্চল, তখন উত্তাল হয়ে উঠেছে। অঞ্চলে-অঞ্চলে সভাসমিতি হচ্ছে, সরকারি প্রস্তাবের বিরোধিতা ব্যক্ত হচ্ছে সাময়িক পত্র-পত্রিকায়। এই পরিস্থিতিতে *সন্ধ্যা* এল চড়া সুরে, ইমনের বদলে দীপক রাগ আশ্রয় করে। তীব্র শ্লেষব্যঙ্গমিশ্রিত তার ভাষা—কখনও সাধু বাংলা, কখনও সাধু-চলিত মেশানো, কখনও বা একেবারেই হেটো ভাষা। উত্তর কলকাতার শিবনারায়ণ দাস লেন থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির সংবাদ- শিরোনাম হতো এ-রকম : 'লাঠি খটাখট বোম ফটাফট', 'ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে'। ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে *বন্দে মাতরম* পত্রিকা নিয়ে যখন মামলা চলছে, সেই ধ্বনি উচ্চারণ করতে গিয়ে সুশীল সেন নামে এক যুবক বাধা পেয়ে এক পুলিশ সার্জেন্টকে চড় মারে। এই অপরাধের জন্য তাকে ১৫ ঘা বেত মারা হয়। *সন্ধ্যা* লিখেছিল : 'সুশীলের তুড়ি লাফ, ফিরিঙ্গী বলে বাপ রে বাপ!' ব্রহ্মবান্ধব ইংরেজ বা ব্রিটিশের বদলে 'ফিরিঙ্গী' শব্দটিই বেশি ব্যবহার করতেন।

এক পয়সা দামের *সন্ধ্যা* পত্রিকা বেশ জনপ্রিয় ছিল। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, হকাররা হাঁক দিয়ে সন্ধ্যাবেলা পত্রিকা বিক্রি করত এবং সাধারণ কারিগর শ্রেণির লোকজনও তা কিনত (২৭ : ২২৪)। সম্পাদনার কাজে ব্রহ্মবান্ধবকে সাহায্য করতেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। *সন্ধ্যা* কীভাবে যুবসমাজকে চরমপন্থায় উদ্বুদ্ধ করতে চাইত, তার নমুনা হিসাবে দু-একটি রচনার অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ২৯ অক্টোবর, ১৯০৬ *সন্ধ্যা* লেখে : 'এখন প্রতি শহরে-গ্রামে একদল করে লাঠিয়াল চাই। লাঠির বদলে লাঠি ধরবে তারা।' (৩২ খ) ২৪ মে, ১৯০৭ সন্ধ্যার আহ্বান : 'প্রত্যেক গ্রামাঞ্চল হাটবাট আবাস দুর্গে পরিণত করতে হবে।...তীরধনুক এবং কালীমায়ীর বোমা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করতে হবে।' (২৯ : ১৯৩) ২৮ ফেব্রুয়াবি, ১৯০৬ ব্রহ্মবান্ধবের একটি রচনার শিরোনাম ছিল : 'দে কালীবাড়ী একশো পাঁঠা'। ওই বছরই ২৩ নভেম্বর 'বয়কটের মর্ম্ম' রচনায় তিনি স্পষ্ট বলে দেন : 'যদি কেহ তোমাকে *ঠেঙ্গাইতে* আসে...তাহাকে *ঠেঙ্গার* বদলে *ঠেঙ্গা* দেখাইবে। ইহা বিধাতার নিয়মের চেয়ে বড়।' (২০ : ৯৭-১০২) কলকাতার ঝাড়ুদাররা ১৯০৬ সালে বেতনবৃদ্ধির দাবিতে একবার ধর্মঘট করেছিল। ২১ অগাস্ট, ১৯০৬ *সন্ধ্যা* তা সমর্থন করে। (৩২ খ)

১৯০৭ সালের অগস্ট মাসে *সন্ধ্যা* পত্রিকায় প্রকাশিত তিনটি রচনা 'এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে' (১২ অগস্ট), 'ছিদিশনের হুড়ুম দুড়ুম ফিরিঙ্গীর আক্কেলগুড়ুম' (২০ অগস্ট) এবং 'বাছাসকল নিয়ে যাচ্ছেন শ্রীবৃন্দাবন' (২৩ অগস্ট)—রাজদ্রোহী বলে অভিযুক্ত হয় এবং ২ সেপ্টেম্বর ব্রহ্মবান্ধব গ্রেপ্তার হন। আদালতে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মবান্ধব বলেছিলেন, স্বরাজ তাঁর কাছে ঈশ্বর-আদিষ্ট ব্রত ('গড অ্যাপয়েন্টেড মিশন')—বিদেশির আদালতে তিনি জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। এর মাসখানেক পরেই ২৭ অক্টোবর, ১৯০৭ এই তেজস্বী মানুষটির জীবনাবসান হয়। (৪৪ : ১০৬, ১৩৬-৩৯)

১৯০৪ সালে আমরা আর-একটি দৈনিক *ডেইলি হিতবাদী*-র নাম পাচ্ছি। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠিত (১৮৯১) *হিতবাদী* সাপ্তাহিক এইসময় সম্পাদনা করতেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭)। তাঁর উদ্যোগেই হিতবাদীর একটি দৈনিক সংস্করণ কিছুকাল প্রকাশিত হয়েছিল—এই তথ্যটি পাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত সাহিত্যসাধক চরিতমালায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের জীবনীতে (ষষ্ঠ / ৬৮ নং : ৭৬)। গোয়েন্দা পুলিশের নথিতে দেখছি, ১২ নভেম্বর, ১৯০৪ এই পত্রিকায় লেখা হচ্ছে : আমরা কিছুতেই (বঙ্গভঙ্গের মতো) এই 'অনিষ্টকর' নীতিকে বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হতে দেব না। (৩২ ক) ১৯০৫-র ডিসেম্বরে *ডেইলি হিতবাদী* যুবসমাজের কাছে আবেদন করে, তারা যেন কোন অত্যাচারী পুলিশের মেয়েকে বিয়ে না করে। (৪২ : ৩২০) ১৯০৭ সালে কাব্যবিশারদের মৃত্যুর পরই সম্ভবত এই দৈনিক পত্রিকাটি লুপ্ত হয়ে যায়।

আমরা সকলেই জানি, স্বদেশি আন্দোলনের যুগে বয়কট-পিকেটিং ইত্যাদির পাশাপাশি বিপ্লবপন্থারও উদ্‌বোধন হয়েছিল বাংলায়। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে তাঁদেরই মুখপত্র হিসাবে আবির্ভূত হল *যুগান্তর* সাপ্তাহিক ; অন্যদিকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের রাজনীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) প্রকাশ করলেন ইংরেজি দৈনিক *বন্দে-মাতরম*। সুবোধচন্দ্র মল্লিকের অর্থানুকূল্য তো ছিলই, এছাড়া চিত্তরঞ্জন দাশ, হরিদাস হালদার প্রমুখ কয়েকজন সাহায্য করেছিলেন বলে জানা যায়। বরোদা থেকে কলকাতায় চলে আসার পর অরবিন্দ ঘোষও (১৮৭২-১৯৫০) যেমন একদিকে *যুগান্তর* সাপ্তাহিকে লিখতে শুরু করলেন, অন্যদিকে যুক্ত হয়ে পড়লেন *বন্দে মাতরম* দৈনিকের সঙ্গেও। সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে একটি বৈঠকে স্থির হল, বিপিনচন্দ্র এবং অরবিন্দ যুগ্মভাবে পত্রিকাটি সম্পাদনা করবেন। *বন্দে-মাতরম্* প্রথমে করপোরেশন স্ট্রিট, তারপর কর্নওয়ালিস স্ট্রিট (বিধান সরণি) হয়ে ২/১ ক্রিক রো থেকে প্রকাশিত হত। (১৫ : ১৫২-৫৩)

কিন্তু কয়েক মাস পরেই বিপিনচন্দ্র পাল মনে করতে থাকেন, অরবিন্দ পত্রিকাটিকে সশস্ত্র বিপ্লববাদী করে তুলতে চাইছেন এবং ১৯০৬-র শেষ দিকে তিনি পত্রিকাটির সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেন। (৪৩ খ : ৬২-৬৩) বিপিনচন্দ্রের ধারণা একেবারে অমূলক ছিল না। অরবিন্দের একার সম্পাদনায় *বন্দে মাতরম* আরও উগ্র রাজবিরোধী হয়ে ওঠে।

১৬ জুন, ১৯০৭ যুগান্তর-এ প্রকাশিত 'ভয় নাই' আর 'লাঠ্যৌষধি' রচনার জন্য ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রেপ্তার হওয়ার পর অরবিন্দ ২৫ জুলাই 'ওয়ান মোর ফর দি অলটার' নামে একটি প্রতিবাদী সম্পাদকীয় লেখেন। পত্রিকাটির কিছু রচনা এর আগেই সরকারের উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। ওই সম্পাদকীয়র জন্য এবার *বন্দে মাতরম* পত্রিকার বিরুদ্ধে

মামলা শুরু হয়। (৮ : ২৫-২৬)

Bande Mataram

Weekly Edition.

PUBLISHED EVERY SUNDAY.

But we have been agitating for a quarter of a century and what has been the result? Indeed past experiences have led the people to lose faith in political agitation on the "present crisis"

অরবিন্দ ঘোষের বিখ্যাত *বন্দেমাতরম* পত্রিকার প্রতিলিপি

বিপিনচন্দ্র পালকে সেই মামলায় সাক্ষ্যদানের জন্য ডাকা হয়েছিল। যদিও তিনি তখন *বন্দেমাতরম*-এর সঙ্গে যুক্ত নন, তবু তাঁরই প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে তিনি অস্বীকার করেন এবং এর জন্য তাঁর ছ মাস কারাদণ্ড হয়। অরবিন্দ অবশ্য জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন এবং বন্দে মাতরমের পৃষ্ঠায় বিপ্লবপন্থার সমর্থনে লিখে চলেছিলেন। ১৭ এপ্রিল, ১৯০৮ তিনি লেখেন, কোন-কোন রোগের উপশমের জন্য তীব্র বিষের প্রয়োজন হয় ; ভারতেরও বোধহয় তাই হয়েছে। (৪৩ গ : ৩৪৬) ৩০ এপ্রিল, ১৯০৮ মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বসু-প্রফুল্ল চাকীর বোমা ছোঁড়ার আগের দিনই তিনি লিখেছিলেন : 'রিভলিউশন, বেয়ার অ্যান্ড গ্রিম, ইজ প্রিপেয়ারিং হার ব্যাট্‌লফিল্ড'। (৪৩ ক : ২৯)

মজঃফরপুরের ঘটনার পর অরবিন্দ এবং যুগান্তরগোষ্ঠীর সকলেই ধরা পড়ে যান। বিপিনচন্দ্র পাল তখন আবার *বন্দে মাতরম* পত্রিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং প্রথমেই স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, তাঁর পত্রিকার রাজনীতিতে 'বোমা এবং গুপ্তহত্যার কোন স্থান ছিল না'। ওই পন্থাকে তিনি বিজাতীয় ('আউটল্যান্ডিশ') বলে নিন্দাও করেন। (৪৩ খ : ১০৭) বিপিনচন্দ্রের ওই উক্তি সর্বাংশে সত্য নয়। *বন্দে মাতরম* নিষ্ক্রিয় রাজনীতির প্রবক্তা হলেও বিপিনচন্দ্র তাঁর ভাষণে যুবকদের সহিংস রাজনীতিতেই উদ্বুদ্ধ করতে চাইতেন। (৩৪ : ১৪৭) দ্বিতীয়ত, আমরা আগেই দেখেছি, অরবিন্দর সম্পাদনায় *বন্দে মাতরম* বিপ্লববাদেরই সমর্থক হয়ে উঠেছিল। আলিপুর বোমা মামলায় অরবিন্দর পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে যেভাবে বিপ্লববাদের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এক কবি-দার্শনিক বলে বর্ণনা করেন, তা-ও ঠিক নয়। *যুগান্তর* সাপ্তাহিকে ওজস্বী ভাষায় বিপ্লবের কথাই লিখতেন অরবিন্দ। ওই পত্রিকার অন্যতম সংগঠক ছিলেন তাঁর ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। যাই হোক, এই পর্বে *বন্দে মাতরম* দৈনিক খুব বেশিদিন চলেনি। ১৯০৮-এ বিশেষ সংবাদপত্র আইন [দ্য নিউজ পেপার (ইনসাইটমেন্ট টু অফেন্সস) অ্যাক্ট, ৭] জারি হবার পরই সম্ভবত পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আবুল কাশেম, কার্যত মুজিবর রহমানের সম্পাদনায়

মুসলমান নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিকের সূচনা করেন ; অন্যদিকে সম্ভবত ১৯০৫-এ যোগেন্দ্রনাথ বসুর *বঙ্গবাসী* সাপ্তাহিকের তরফ থেকে *টেলিগ্রাফ* নামে একটি ইংরেজি দৈনিকপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করে। (৪২ : ৪৩৬, ২৬৫) পত্রিকাটি স্বদেশিভাবাপন্নই ছিল বলে মনে হয়। ১৬ অক্টোবর, ১৯০৫ ফেডারেশন হল প্রতিষ্ঠার দিনে যে-সব পত্রিকার প্রদর্শনী করা হয়েছিল, তার মধ্যে *টেলিগ্রাফ*-ও ছিল। (১৯ : ২৬৯)। পরবর্তী কালের দুই খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী (১৮৬৯—১৯৩২) এবং হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (১৮৭৬-১৯৬২) *বন্দে মাতরম* পত্রিকার সঙ্গে কিছুদিন যুক্ত হয়েছিলেন। শ্যামসুন্দর তাঁর 'ক্রাইম অ্যান্ড ন্যাশনালিজম' প্রবন্ধের জন্য দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। (২৪/৫ম)

স্বদেশি যুগের আর-একটি বাংলা দৈনিক *নায়ক* পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৬৬-১৯২৩) সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে। *নায়ক* ছিল ইংরেজি *বেঙ্গলী*-রই সহযোগী পত্রিকা—সম্পাদনায় সাহায্য করতেন বঙ্কিমচন্দ্র সেন, যিনি পরে (১৯৩৩) *দেশ* সাপ্তাহিকের সম্পাদক হন। (২১ : ৩৪) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন ; কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান বারবার বদলেছে ; সুমিত সরকার এমনকী তাঁকে পুলিশের চর বলেও সন্দেহ করেছেন। (৪২ : ২৬৫) পুলিশি নথিতে দেখছি, বুড়ি বালামের যুদ্ধের (১৯১৫) পর *নায়ক* ১৭ সেপ্টেম্বর লিখেছিল : পুলিশ তার শক্তির পরিচয় দিয়েছে। (৩২ গ) *নায়ক* যেন পুলিশের প্রশংসাই করেছিল, এরকম ধারণা হয়।

গোয়েন্দা পুলিশের নথিতে আমরা ১৯৩০-৩১ সালে *দৈনিক নায়ক* নামে একটি পত্রিকার সন্ধান পাই। সেটি ওই পত্রিকারই দ্বিতীয় পর্যায় নয় ; একই নামের একটি অন্য পত্রিকা। গীতা চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থে পত্রিকাটিকে মাসিক বলা হয়েছে। আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না ; তবে এই পত্রিকাটি দেখছি, বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সম্পাদক : প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়। (৩৩ ক-খ) স্বদেশি যুগের পত্রিকা-প্রসঙ্গ আমরা শেষ করব আর-একটি পত্রিকার নাম উল্লেখ করে। বরিশালের প্রখ্যাত স্বদেশি নেতা মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার *নবশক্তি* সাপ্তাহিক ১৯০৭-৮ সালে কলকাতা থেকে একটি দৈনিক সংস্করণ প্রকাশ করেছিল। (১৬ : ১৫৫) এর বেশি কোন তথ্য আমরা পাইনি। সুমিত সরকারের গ্রন্থেও এই দৈনিকটির কোনো উল্লেখ নেই। এই পর্বের আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, একদা *বেঙ্গলী* পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত কালীনাথ রায় পরে লাহোর থেকে *পাঞ্জাবী* এবং *ট্রিবিউন* নামে দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। ১৮৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত *ট্রিবিউন* পত্রিকার অন্যতম পরিচালকও ছিলেন একজন বাঙালি : শীতলাকান্ত চ্যাটার্জি। (১০ : ১৩১)

দুই : ১৯১১-২০

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে *দৈনিক বসুমতী* ছাড়া আর কোনো বড়ো সংবাদপত্রের আবির্ভাব যে আমরা দেখতে পাই না, তার প্রধান কারণ নিঃসন্দেহে ১৯১০ সালের কঠোর প্রেস আইন। এই সময়ের একটি বড়ো ঘটনা বুড়ি বালামের যুদ্ধে বাঘা যতীন এবং তাঁর এক সহযোদ্ধার আত্মদান (৯-১০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫) বাংলা সাময়িকপত্রে প্রকাশিতই হয়নি বলা যায়। ১৮ সেপ্টেম্বর সাহেবদের কাগজ *এম্পায়ারকে* উদ্ধৃত করে *বেঙ্গলী* এবং

অমৃতবাজার পত্রিকা যে-সংবাদ প্রকাশ করে, সেখানে ওই দুই শহিদকে বর্ণনা করা হয় 'ডাকাত' এবং 'নটরিয়স মেন' বলে। এই সময়কার পত্রিকাগুলি আমরা দেখেছি। বেশ বোঝা যায়, সরকারের দেওয়া বিকৃত তথ্যই পরিবেশন করতে হয়েছে স্বদেশি সংবাদপত্রকে।

১৯১০-র আইন শুধু সংবাদপ্রকাশকেই নিয়ন্ত্রণ করেনি। পত্রিকা সম্পাদক এবং প্রেস মালিককে আগাম টাকা (জামানত) জমা রাখতে বলা হয়েছিল। আপত্তিকর কিছু প্রকাশিত হলে ওই টাকা বাজেয়াপ্ত হবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা যাবে—এই ছিল আইনের নির্দেশ। (৪৫ : ৬৬-৭১) বেশ কয়েকটি পত্রিকা আগাম টাকা জমা দিতে না পেরে বন্ধ হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯) সংবাদ *অমৃতবাজার* যদিও খুবই সংযতভাবে প্রকাশ করেছিল, তার দুটি সম্পাদকীয় 'গ্রেভ সিটুয়েশন' (২২ এপ্রিল) এবং 'দ্য রেবেলিয়ন ইন দ্য পাঞ্জাব' (২৬ এপ্রিল) রাজদ্রোহী বলে বিবেচিত হওয়ায় পত্রিকার ৫০০০ টাকা জামানত জব্দ হয়ে যায় এবং নতুন করে ১০,০০০ টাকা জমা রাখতে বলা হয়। [অমৃতবাজার ক্রোড়পত্র : ২ জানুয়ারি, ১৯৭৭]

ইতিমধ্যে ১৯১৩ সালের *বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল* (অ্যামেন্ডমেন্ট) আইন এবং ১৯১৪ সালের ভারতরক্ষা আইন সংবাদপত্রকে আরও শাসন-নিয়ন্ত্রিত করে তুলেছিল। এই ঘোরতর দুর্দশার কালেই ৬ অগস্ট, ১৯১৪ *দৈনিক বসুমতী*-র জন্ম হয়। একজন সাধারণ বই-ব্যবসায়ী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯১৯) *সাপ্তাহিক বসুমতী* শুরু করেছিলেন ১৮৯৬ সালে ; এবার তাঁর পুত্র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮৮৯-১৯৪৪) পরিচালনায় তার একটি দৈনিক রূপও প্রকাশিত হল। (১৩ : ২১৭-১৮) প্রথমে সম্পাদক হিসাবে বোধহয় সতীশচন্দ্রেরই নাম ছিল—পরে দায়িত্ব নিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। ১৯২২ সালের এপ্রিল থেকে প্রকাশিত হতে লাগল *মাসিক বসুমতী*-ও। এই মাসিকটি এক সময় বাঙালির পারিবারিক পত্রিকা হয়ে উঠেছিল। ১৯৬০-র দশকের যে *মাসিক বসুমতী* আমরা দেখেছি, তার প্রতি সংখ্যায় সূচিপত্রের ওপরে ছাপা থাকত সতীশচন্দ্রের ছবি।

১৯২১-২২ সালে শিবরাম চক্রবর্তী যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাগজ বিক্রি করতেন, *দৈনিক বসুমতীর* কাটতি তখন বেশ ভালোই ছিল। ১৬৬, বউবাজার (বিপিনবিহারি গাঙ্গুলি) স্ট্রিটের বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। সন্ধ্যাবেলা টেলিগ্রাম বেরোত ; দাম এক পয়সা। (৩৫ : ১৯১-৯২, ১৯৭) ১৯৪০-র দশকে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫০-র দশকে প্রাক্তন বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৮০-১৯৫৯) এবং তারপর আবার হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। এই সময় থেকেই পত্রিকাটি অর্থাভাবে বিপন্ন হয় এবং তার প্রচারসংখ্যা কমতে থাকে। তবে ১৯৬০-র দশকে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০৪-৯৩) সম্পাদনায় তীব্র সরকার-বিরোধী পত্রিকা হিসাবে *বসুমতী* খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের সময় তার প্রচার ছিল এক লক্ষেরও বেশি। (২২ : ১৬) এই দশকেই প্রাণতোষ ঘটকের (১৯২৩-৭০) উদ্যোগে *সাপ্তাহিক বসুমতী*-কে আবার পুনরুজ্জীবিত করা হয়।

বাংলা সংবাদপত্র জগতে *দৈনিক বসুমতীর* একটি গৌরবজনক ভূমিকা আছে। বৈদ্যুতিক রোটারি মুদ্রণযন্ত্রের প্রবর্তনও তার একটি বড়ো কীর্তি। তবে ১৯৭০-র দশক থেকে বসুমতী ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। পত্রিকার স্বত্বাধিকারী তখন অশোক সেন, কংগ্রেস নেতা। ১৯৭৪-

এ রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করার পরও পত্রিকার হৃত গৌরব আর ফিরে আসেনি। ক্রমশ অনিয়মিত, তারপর ১৯৯২-এ পুজোর সপ্তমীর দিন থেকে হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায় *বসুমতী।* শেষের দিকে সম্পাদক ছিলেন প্রশান্ত সরকার এবং কৃষ্ণ ধর।

১৯২০ সালে গান্ধিবাদের প্রভাবে বাংলার রাজনীতিতে যখন একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে, সেই সময়ই (২ সেপ্টেম্বর, ১৯২০) শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রকাশ করলেন ইংরেজি দৈনিক *সার্ভেন্ট*। একদা *বন্দে মাতরম* পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত শ্যামসুন্দর ততদিনে গান্ধিবাদে সম্পূর্ণ আসক্ত হয়ে পড়েছেন—সেই তত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হয় *সার্ভেন্ট*। প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং পরে ইউনাইটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া-র (১৯৩৩) প্রতিষ্ঠাতা বিধুভূষণ সেনগুপ্ত (১৮৮৯-১৯৬৭) প্রথম জীবনে এই পত্রিকায় কাজ করতেন। তাঁর স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারি, প্রথম দিকে *সার্ভেন্ট* বেশ জনপ্রিয় ছিল, পরে *ফরোয়ার্ড* প্রকাশিত হবার পর তার জনাদর কিছুটা কমে যায়। (২১ : ৫১-৫৯) শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর শেষ জীবন কেটেছিল খুবই দুর্দশায়। কর্মীরা অনেকেই *সার্ভেন্ট* ছেড়ে *ফরোয়ার্ড*-এ চলে যান।

তিন : ১৯২১-৩০

১৯১০ সালের প্রেস আইন ১৯২২ সালের মার্চ মাসে শিথিল হবার পর বাংলা সাময়িকপত্র এবং সংবাদপত্রের জগতে যেন একটা জোয়ার এল। বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক জগতেও তখন একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। একদিকে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারের (১৯১৯) সুবাদে বাংলায় দ্বৈত শাসন জারি হয়েছে ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হবার পর দ্বীপান্তরিত বন্দিরা ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন ; অন্যদিকে গান্ধিজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১) আবেগে-উত্তেজনায় প্লাবিত করে দিয়েছে দেশকে। অসহযোগের সঙ্গে খিলাফতের দাবিটিকেও যুক্ত করে নেওয়ায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই সময় একটা প্রীতির সম্পর্ক তৈরি হয় সাময়িকভাবে। এই বহুমুখী রাজনৈতিক পরিস্থিতির আবর্ত থেকেই জন্ম নিচ্ছে একটির পর একটি পত্রিকা। ১৯২২ সালেই স্থাপিত হয় ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট্‌স অ্যাসোসিয়েশন।

১৯২১ সালে *সার্ভেন্ট*-এর পাশাপাশি অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনের প্রচারক হয়ে ওঠে মওলনা আকরম খান (১৮৬৮-১৯৬৮) সম্পাদিত *সেবক*। আকরম খান এর আগে ১৯০৩ সালে *মোহম্মদী* পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। *সেবক* পত্রিকায় তিনি পুরোপুরি জাতীয়তাবাদী এবং গান্ধিবাদের সমর্থক। ১৯২২ সালে কাজী নজরুল ইসলাম কিছুদিন এই পত্রিকায় কাজ করেন। ২৫ জুন, ১৯২২ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুর পর এক গভীর শোকাভিভূত সম্পাদকীয় লিখেছিলেন নজরুল (২৫ : ২৯৬-৯৭)। এর কয়েক মাস পরেই অবশ্য তিনি ওই পত্রিকা ত্যাগ করেন এবং ১২ অগস্ট আবির্ভূত হয় *ধূমকেতু* অর্ধসাপ্তাহিক। *সেবক* পত্রিকা ১৯২৩ সাল পর্যন্ত চলেছিল। চার বছর পরে (১৯২৭) আকরম খান প্রকাশ করেন *মাসিক মোহম্মদী* পত্রিকা। সেখানে তিনি নিজের নামের আগে লিখতেন : 'মোহাম্মদ'।

বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁরা গান্ধিবাদকে সমর্থন করেননি তাঁরা এই পর্বে *বিজলী, শঙ্খ, আত্মশক্তি, লাঙ্গল* (গণবাণী) ইত্যাদি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন ; অন্যদিকে

১৯২২ (মতান্তরে ১৯২১) সালে চিত্তরঞ্জন দাশ হেমন্তকুমার সরকারের সহায়তায় প্রকাশ করলেন *বাঙ্গলার কথা*। অফিস ছিল বলরাম দে স্ট্রিটে। পত্রিকাটি প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে কিছুদিনের জন্য ১৯২২-র ডিসেম্বর থেকে দৈনিক হয়েছিল। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সাপ্তাহিক পত্রিকাটির প্রকাশকাল বলেছেন : ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯২১ ; সম্পাদক সুভাষচন্দ্র বসু, পরে সম্ভবত বাসন্তী দেবী। (২৩ : ১১৯-২৩) অন্যদিকে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে সত্যরঞ্জন বক্সীর স্মারকস্তম্ভে লেখা আছে : তিনিও ওই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন। দৈনিকটি সম্ভবত সান্ধ্য ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনীকার হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অবশ্য এই পত্রিকাকে সাপ্তাহিক বলেই বর্ণনা করেছেন। (৪৪গ : ১৩১) কোনো-কোনো গ্রন্থে পত্রিকাটির নাম বলা হয়েছে : 'বাংলার কথা'।

বাঙ্গলার কথা

বাঙ্গলার কথা দৈনিকের শিরোলেখ

চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) সাহিত্যপ্রেমী ছিলেন ; ১৯১৪ সালে *নারায়ণ* নামে একটি *মাসিক* সাহিত্য পত্রিকাও তিনি বের করেছিলেন ; তারপর এল *বাঙ্গালার কথা*। তবে সংবাদপত্র-জগতে যে-পত্রিকাটির জন্য তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন, তা হল ইংরেজি দৈনিক *ফরোয়ার্ড*। ১৯২২-এর ডিসেম্বরে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে--আইন পরিষদে কংগ্রেস যোগ দেবে কি দেবে না--তাই নিয়ে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে গান্ধি নেতৃত্বের মতান্তর হয় এবং চিত্তরঞ্জন আর মতিলাল নেহরু মিলে গড়ে তোলেন কংগ্রেস অসহযোগ-খিলাফত স্বরাজ দল ; পরে স্বরাজ বা স্বরাজ্য দল বলেই তা পরিচিত হয়। *ফরোয়ার্ড* (১৯২৩) ছিল এই দলেরই মুখপত্র। তবে রাজনীতি ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও লেখা থাকত। চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৩ সালে শরৎচন্দ্র বসু, নলিনীরঞ্জন সরকার, তুলসী গোস্বামী প্রমুখের সঙ্গে মিলে ফরোয়ার্ড পাবলিশিং নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন--পত্রিকাটি সেখান থেকেই প্রকাশিত হত। প্রথমে অল্প কিছুদিনের জন্য সম্পাদক ছিলেন পি. কে. চক্রবর্তী, তারপর এলেন সত্যরঞ্জন বক্সী। সুভাষচন্দ্র বসুও এই পত্রিকার দেখাশোনা করতেন ; 'ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থে তিনি সে-কথা উল্লেখও করেছেন। তবে এই সুযোগ তিনি বেশিদিন

পাননি, কারণ ১৯২৪-এর অক্টোবরে সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হয়ে যান। ফরোয়ার্ড পাবলিশিং-এর অন্যতম পরিচালক শরৎচন্দ্র বসুর দায়িত্বই ছিল বেশি। এছাড়া ছিলেন আন্দামান-ফেরত বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৯-১৯৫০)। তাঁর *আত্মশক্তি* সাপ্তাহিক প্রথমে বউবাজারের চেরি প্রেস এবং পরে ফরোয়ার্ড প্রেস থেকেই প্রকাশিত হতো।

১৯২৮ সালের মার্চ মাসের *ফরোয়ার্ড* পত্রিকা আমরা কিছু দেখেছি। কলকাতায় ঝাড়ুদার ধর্মঘট এবং হাওড়ায় রেলশ্রমিকদের ধর্মঘট এই পত্রিকা সমর্থন করেছিল। *ফরোয়ার্ড* ছিল *সার্ভেন্ট*-এর প্রতিদ্বন্দ্বী। তবে চিত্তরঞ্জনের প্রতি শ্যামসুন্দরের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৬ জুন, ১৯২৫ চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে অশ্রুপাত করতে করতে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী যে-সম্পাদকীয়টি লেখেন তার একটি লাইন ছিল : 'বেঙ্গল, ইফ ইউ হ্যাভ টিয়ারস, প্রিপেয়ার টু শেড দেম নাউ'। চিত্তরঞ্জনের শ্রাদ্ধের দিন *সার্ভেন্ট* একটি বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করেছিল। (২১ : ৫৭-৫৯)

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরও *ফরোয়ার্ড*-এর প্রকাশ অব্যাহত ছিল। ১৯২৯ সালে ডানকুনিতে এক রেল দুর্ঘটনায় যতজন মারা গেছেন বলে প্রচারিত হয়, *ফরোয়ার্ড* দাবি করে, মৃতের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি। রেল কর্তৃপক্ষ (ই. আই. আর) সাক্ষ্যপ্রমাণ চাইলে *ফরোয়ার্ড* তা দাখিল করতে পারেনি। ফলে পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মামলা হয়। এবং পুলিশ ফরোয়ার্ড প্রেস ক্রোক করতে আসে। চিত্তরঞ্জন *ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ* পত্রিকার প্রেসটি কিনে তা ফরোয়ার্ড পাবলিশিং-এ কাজে লাগাতেন। ওই প্রতিষ্ঠানের দুই স্বত্বাধিকারী নলিনীরঞ্জন সরকার এবং তুলসী গোস্বামী এই সময় দাবি করেন, প্রেস তাঁদের সম্পত্তি। পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা হলেও তাঁদের প্রেসটি পুলিশ ক্রোক করতে পারে না। (১৭ : ১৩৪, ১৫০)

প্রেসটি এইভাবে বেঁচে যায় এবং *ফরোয়ার্ড* ওই প্রেস থেকেই *লিবার্টি* নামে আত্মপ্রকাশ করে। উপেন্দ্রনাথের আত্মশক্তিরও নতুন নাম হয় : *নবশক্তি*। অদ্বৈত মল্লবর্মণ এই *নবশক্তি*-তে কাজ করেছেন। (১৭ : ১৫০) ফরোয়ার্ড পাবলিশিং-এর অফিস ছিল ১৯, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট। *ফরোয়ার্ড লিবার্টি*-তে রূপান্তরিত হবার পর তার প্রধান পরিচালক (মানেজিং ডিরেক্টর) হন শরৎচন্দ্র বসু ; সম্পাদক থেকে যান সত্যরঞ্জন বক্সী-ই।

১৯৩০-এর *লিবার্টি* পত্রিকার কিছু সংখ্যা আমরা দেখেছি। পত্রিকার নামের নিচে বড়ো বড়ো করে লেখা থাকত : 'ইন মেমরি অফ চিত্তরঞ্জন দাশ'। বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স বিলডিংস অভিযানের সংবাদ খুব গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছিল। ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৩০ বিনয় বসুর মৃত্যু এবং শেষযাত্রার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় এই পত্রিকায়। নানা মামলায় জড়িয়ে পড়ে *লিবার্টি* পত্রিকা অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। (১০ : ১২৮)

বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের বিরোধ সুবিদিত। ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে জে. সি. গুপ্তর অর্থসাহায্য নিয়ে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (১৮৮৫-১৯৩৩) *লিবার্টি*-র প্রতিপক্ষে প্রকাশ করলেন *অ্যাডভান্স* পত্রিকা। প্রথমে অফিস ছিল হেয়ার স্ট্রিটে। নির্বাহী সম্পাদক *ফরোয়ার্ড* ছেড়ে-আসা প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী। সহকারী সম্পাদক ছিলেন শচীন চৌধুরী এবং ধীরেন সেন। (৪০ : ২১৯-২০ ; ১৭ : ১৫২, ৫৭) বর্তমান ৭৪ লেনিন সরণির তালতলায় এখন যেখানে *দৈনিক বিশ্বমিত্র*-র অফিস সেখান থেকেই পরে *অ্যাডভান্স* প্রকাশিত হত।

যতীন্দ্রমোহন সশস্ত্র পন্থা সমর্থন না করলেও, ধৃত বিপ্লবী যুবকদের জামিনে মুক্ত করার জন্য বারবার এগিয়ে এসেছেন। তাঁর পত্রিকাতেও বিপ্লবীদের প্রতি কখনও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়নি। *বিনয়-বাদল-দীনেশ* প্রসঙ্গে ১১ ডিসেম্বর, ১৯৩০ লেখা হয়েছিল : যুবসমাজ প্রতিশ্রুতি শুনে শুনে ক্লান্ত ; অন্যদিকে 'দ্য পুলিশম্যানস লাঠি হ্যাজ বিকাম অ্যান অ্যাডজাংট অফ ল অ্যান্ড অর্ডার'। (৩৩ক) ১৯৩৩ সালে লেখা হয়, সরকারের দমননীতিই যুবকদের অসন্তোষ এবং তিক্ততা বাড়িয়ে তুলছে।। (৭ : ৩৮) নেলী সেনগুপ্ত কলকাতা করপোরেশনের অলড্যারমান নির্বাচিত হলে ২৪ এপ্রিল, ১৯৩৩ *অ্যাডভান্স* একটি 'এক্সট্রা অর্ডিনারি' সংখ্যা প্রকাশ করে।

যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পরও *অ্যাডভান্স* বন্ধ হয়ে যায়নি। ১৯৪৫ সালের *অ্যাডভান্স* পত্রিকা আমরা দেখেছি। ২৪ অগস্ট সুভাষচন্দ্রের কথিত মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হবার পর *অ্যাডভান্স* সম্পাদকীয়তে লিখেছিল : 'উই ডীপলি রিগ্রেট টু রেকর্ড দ্য ডেথ অফ এস. সি. বোস'। আরও বলা হয় : সুভাষচন্দ্র কুইসলিং না একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক তা বিচার করবেন 'স্বাধীন ভারতের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ।' প্রসঙ্গত, সুভাষচন্দ্রের 'মৃত্যু' নিয়ে কোনো সংশয়ের কথা কিন্তু সংবাদটি প্রচারিত হবার পর প্রথম কয়েকদিন শোনা যায়নি। কলকাতা করপোরেশনে সুভাষচন্দ্র স্মরণে শোকসভাও হয়েছিল।

সার্ভেন্ট থেকে *ফরোয়ার্ড-লিবার্টি* এবং সেই অনুষঙ্গে *অ্যাডভান্স*—আমরা ১৯৩০ পর্যন্ত পৌঁছে গেছি ; কিন্তু এরই মাঝে ১৩ মার্চ, ১৯২২ দোল পূর্ণিমার দিন জন্ম নিয়েছে বাংলা দৈনিক : *আনন্দবাজার পত্রিকা*। সুরেশচন্দ্র মজুমদার, প্রফুল্লকুমার সরকার আর মৃণালকান্তি ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এই পত্রিকাটি এখন ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক বলে খ্যাত। পত্রিকার দপ্তর প্রথমে ছিল মেছুয়াবাজারে, বর্মন স্ট্রিটে ; ছাপা হত হ্যারিসন (মহাত্মা গান্ধি) রোডে সুরেশচন্দ্রর গৌরাঙ্গ প্রেস থেকে। শিবরাম চক্রবর্তী জানিয়েছেন, আনন্দবাজার প্রথম থেকেই জনপ্রিয় ছিল ; প্রেসের দেয়ালে একটি পত্রিকা সেঁটে দেওয়া হত—লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত। (৩৫ : ২০৫-৭) শিবরাম নিজে এক সময় *আনন্দবাজার* ফেরি করেছেন। প্রথম এক বছর আনন্দবাজার ছিল সান্ধ্য দৈনিক, প্রভাতী রূপে প্রকাশিত হয় ১৯২৩-র জুন মাস থেকে।

'আনন্দবাজার' নামটি অবশ্য নতুন নয়। উনিশ শতকে অমৃতবাজার যখন ইংরেজি হল, সেই সময় ওই নামে বাংলায় একটি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে *শ্রী শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা* নামে একটি সাপ্তাহিক কিছুদিন প্রকাশিত হয়। (১৫ : ১২২; ১০ : ৩৮২)।

১৯২২ সালে প্রকাশিত *আনন্দবাজার* দৈনিক প্রথম থেকেই জনচিত্ত আকর্ষণ করেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের অকাল পরিসমাপ্তি ঘটলেও, গান্ধিবাদের প্রভাব তখনও অম্লান। *আনন্দবাজার*-কে গান্ধিবাদী মনে করা হত। কারণ সেখানে চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সুভাষচন্দ্র বসুকে ব্যঙ্গ করে লেখা প্রকাশিত থাকত (১৭ : ৬৭) কিন্তু বিপ্লবী যুবকদের প্রতিও *আনন্দবাজার*-এর শ্রদ্ধা ছিল। সুরেশচন্দ্র ছিলেন বাঘাযতীনের শিষ্য। প্রফুল্লকুমারের মা সরলাবালা সরকারও যতীন্দ্রনাথকে বিশেষ স্নেহ করতেন। সুরেশচন্দ্র একাধিকবার কারাবরণ

করেছেন। প্রফুল্লকুমার ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাঘা যতীনের ওপর একটি সম্পাদকীয় লিখে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন বলে কোনো-কোনো গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। (৩৬) একটি গোপন পুলিশ ফাইলে অবশ্য দেখছি, রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৩ সালে এবং মামলা হলেও *আনন্দবাজার* শেষ পর্যন্ত মুক্তি পায়। (৩১)

আনন্দ বাজার পত্রিকা

আনন্দবাজার পত্রিকা-র প্রথম সংখ্যার শিরোনাম

শেষোক্ত তথ্যটিকেই আমরা বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করি, কারণ ১৯২৩ সালেই বাংলা পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠা শহিদ যতীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিতে আপ্লুত হয়ে ওঠে। *সার্ভেন্ট*-এর মতো গান্ধিবাদী পত্রিকাও লেখে : বালেশ্বরের যে-প্রান্তরে তাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তার প্রতিটি ঘাসে রয়ে গেছে ওই যুবকদের বীরত্বের চিহ্ন। (৩২ ঘ) ১৯১৫ সালে প্রেস আইনের কারণে যা প্রকাশ করা যায়নি, সেই শ্রদ্ধার্ঘ্যই এবার নিবেদিত হতে থাকে *বিজলী, আত্মশক্তি, সারথী, ধূমকেতুর* মতো সাময়িকপত্রে। বিষয়টি সরকারের উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে। (৩২ ঘ) ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ *আনন্দবাজার* বীর শহিদ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি ছবি প্রকাশ করে লিখেছিল : মৃত্যুভয়ে ভীত জাতির যে-মানুষটি মৃত্যুকে জয় করতে পেরেছিলেন, তাঁর প্রয়াণের দিনে বাঙালি কি আজ তাঁকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করবে না? (৩২ ঘ) ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের পর ২২ এপ্রিল *আনন্দবাজার* লেখে : পুলিশের নির্যাতন এবং নিপীড়ন জনচিত্তকে এতই ক্ষুব্ধ করেছে যে, তারা পরিণতির কথা চিন্তা না করেই বিবেচনাহীন কাজের দিকে প্ররোচিত হয়েছে। (৩৩ ক) এইসব মন্তব্যকে ঠিক কংগ্রেসের ভাষ্য বলা যায় না।

আনন্দবাজার-এর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নানা পর্ব লক্ষ করা যায়। এই পত্রিকার সম্পাদকও বারবার বদলেছে। এ-বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন রকম তথ্য পাওয়া যায়। আমরা *আনন্দবাজার* গ্রন্থাগারের নিজস্ব প্রকাশনা সুনীল দাশের সংকলন থেকে সম্পাদকের নাম এবং কার্যকালের মেয়াদ কালানুক্রমে সাজিয়ে দিচ্ছি।

প্রথম কয়েকমাস পত্রিকায় সম্পাদকের কোন নাম থাকত না। ১৯২২-র জুন থেকে সম্পাদক হিসেবে মুদ্রিত হয় পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রফুল্লকুমার সরকারের (১৮৮৪-১৯৪৪) নাম। আগেই বলেছি, ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রফুল্লকুমার রাজবিরোধী রচনা প্রকাশের জন্য গ্রেপ্তার হন। ওই বছরেরই ৭ অক্টোবর থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রুতকীর্তি সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯১-১৯৫৪)। ১৯৩০ সালে কিছুদিনের জন্য সম্পাদক হন মাখনলাল সেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র সেন। ১৯৩১-৪১ আবার সম্পাদনা করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি *আনন্দবাজার* ত্যাগ করার পর প্রফুল্ল সরকার

(১৯৪১-৪৪) এবং চপলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৯৪৪-১৯৫৪) সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালের জুন থেকে অক্টোবর সম্পাদক হিসাবে প্রাক্তন বিপ্লবী নলিনীকিশোর গুহর নাম পাচ্ছি। ইতিমধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারও আবার ফিরে এসেছেন। ১৯৫৪-র ৪ অক্টোবর থেকে টানা পাঁচ বছর চপলাকান্ত ভট্টাচার্যই আবার সম্পাদক থাকেন এবং তিনি *আনন্দবাজার*-এর সঙ্গ ছিন্ন করার পর ১৯৫৯-র ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আমৃত্যু পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন প্রফুল্লকুমারের পুত্র অশোককুমার সরকার (১৯১২-৮৩)।। তাঁর মৃত্যুর পর সম্পাদক হয়েছেন অভীক সরকার। পত্রিকা-দপ্তরের বর্তমান ঠিকানা : ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট (পূর্বতন সুতারকিন স্ট্রিট)।

আগেই বলেছি, আনন্দবাজার কংগ্রেসপন্থী হলেও তার রাজনৈতিক অবস্থান কেবল একটা লেবেল দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। ১৯৩৮ সালে মেদিনীপুরে জেলবন্দিদের দাবির সমর্থনে প্রকাশিত একটি রচনার জন্য *আনন্দবাজার*-এর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা উঠেছিল। আবার ১৯৪১ সালে সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের জন্যও *আনন্দবাজার* অভিযুক্ত হয়। (২ : ২২০-২৪, ২৫২-৫৯) সরোজ আচার্যর মতো মার্কসবাদী তাত্ত্বিক আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে চাকরি করেছেন ; আবার মার্কসবাদী না হলেও সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতো বামপন্থী মেজাজের মানুষও দীর্ঘদিন এই পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। কংগ্রেসপন্থী হলেও স্বাধীনতার পর এই পত্রিকায় জওহরলাল নেহরু এবং বিধানচন্দ্র রায়ের কিছু কাজকর্মের সমালোচনা করা হয়েছে। *আনন্দবাজার*-এ প্রকাশিত রচনার কিছু নমুনা পাঠক পেয়ে যাবেন আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত 'সাত দশক' (১৯৯৯) সংকলনে। স্বাধীনতার দিন *আনন্দবাজার পত্রিকার* প্রথম পৃষ্ঠায় সবুজ রঙে ছাপা শিরোনাম ছিল : 'নূতন-যুগ-যুগ সূর্য উঠিল, ছুটিল তিমিররাত্রি'।

১৯৩৫ সালে সুরেশচন্দ্র মজুমদারের পরিকল্পনামতো লাইনো টাইপ চালু করে, হরফের ছাঁদ বদলে এই পত্রিকাটি মুদ্রণরীতিতে এক নতুন যুগের সূচনা করে। *আনন্দবাজার* বানানরীতি নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে বারবার। ১৯৬০-৭০-র দশকে দেখেছি, লেখা হচ্ছে : আরট্‌ (আর্ট)। প্রেসিডেনট, মারকিন (মার্কিন) ইত্যাদি। বর্তমানে *আনন্দবাজার* পত্রিকা মিরাটের বদলে 'মেরঠ', গান্ধির জায়গায় 'গাঁধি' ইত্যাদি লিখে তার নিজস্ব, কিন্তু বিতর্কিত বানানরীতি অনুসরণ করে থাকে।

১৯২৩ সালে মনিরুজ্জামান এসলামবাদী সম্পাদিত *ছোলতান* বা *সোলতান* পত্রিকায় (২৮ বৈশাখ ১৩৩০ ব) হিসেব দিয়ে দেখানো হয়েছিল কলকাতা থেকে যে ১৭টি দৈনিকপত্র প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে ৯টি বাংলা এবং সবগুলি পত্রিকারই মালিক হিন্দু। বাঙালি মুসলমানের কোনো বাংলা দৈনিকপত্র নেই ; তবে দুটি উর্দু পত্রিকা প্রকাশিত হয়। (২৬ : ৩৯৯) এর তিন বছর পর ১৯২৬ সালের কলকাতা দাঙ্গার পরবর্তী কালে মুসলমান ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষণায় আলী আহমদ উলী সাপ্তাহিক *সোলতান*-এর একটি দৈনিক সংস্করণ প্রকাশ করেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। (২৫ : ৩৬৬)। এ-অভিযোগ অবশ্য তখন কৃষ্ণকুমার মিত্রের *সঞ্জীবনী,* সজনীকান্ত দাসের *শনিবারের চিঠি* এবং দৈনিক *আনন্দবাজার* সম্পর্কেও কিছুটা প্রযুক্ত হতে পারত।

১৯২০-র দশকে নারী অপহরণ এবং নির্যাতন বাংলায় একটা নিত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়

এবং *সঞ্জীবনী*-র মতো পত্রিকা প্রচার করতে থাকে, অপরাধীরা মুখ্যত মুসলমান। বিষয়টি নিয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং আকরম খান তীব্র ভাষায় এই জাতীয় প্রচারের নিন্দা করেন। শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রীর *বাঙ্গালায় নারী নির্যাতন* গ্রন্থে (১৩৪৩ ব) অবশ্য পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছিল, অপহরণকারীদের কোনো-একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক পরিচয়ে চিহ্নিত করা যায় না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের *প্রবাসী*-ও (আশ্বিন, ১৩৩৬) লিখেছিল, এই দুষ্কৃতীদের কোনো 'জাত' নেই। যাই হোক, এই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার আবহ থেকে দৈনিকপত্রগুলিও মুক্ত ছিল না। হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত সাময়িকপত্রে তখন মুসলমানদের বলা হচ্ছে ব্রিটিশের এজেন্ট এবং হাঙ্গামাবাজ। অন্যদিকে *মাসিক মোহাম্মদী*-র মতো পত্রিকা হিন্দু দাঙ্গাকারীদের বলছে 'ভদ্র ডাকাত' এবং 'গ্র্যাজুয়েট হিন্দু গুণ্ডা'। মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত পত্রপত্রিকায় এই সময় 'এছলাম' (ইসলাম) 'মোছলমান' (মুসলমান) ইত্যাদি 'মুসলমানি' বাংলা প্রয়োগের প্রবণতাও দেখা যায়।

চার : ১৯৩১-৪০

১৯৩০-এর দশকে সংবাদপত্রে একদিকে যেমন টেলিপ্রিন্টার ব্যবস্থা চালু হল, অন্যদিকে ১৯৩৩ সালে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের সাহায্যে বিধুভূষণ সেনগুপ্ত গঠন করলেন স্বদেশি সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া (ইউ পি আই)। তার আগে দেশি পত্রিকাগুলিকে নির্ভর করতে হত নিজস্ব প্রতিনিধি এবং প্রধানত রয়টারের ওপর। অন্য দিকে ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজের সাংবাদিক কে. এস. রায় প্রতিষ্ঠিত অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী হলেও তার পরিচালনভার প্রথম দিকে ভারতীয়দের হাতে ছিল না ; সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রেও তা নির্ভর করত রয়টারের ওপর। ইউ পি আই প্রতিষ্ঠার ফলে দেশি সংবাদপত্রের জগতে একটা বিরাট শূন্যতা পূরণ হল বলা যায়।

The Hindusthan
Standard

CALCUTTA THURSDAY 12 JUNE 1975 20 PAISE

হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড-এর সান্ধ্য সংস্করণের শিরোলেখ

১৯৩০-র দশকে প্রথম যে-নতুন সংবাদপত্রটির সন্ধান পাই, তার নাম : *স্টার অফ ইন্ডিয়া*। কয়েকজন মুসলিম ব্যবসায়ী লুপ্তপ্রায় *বেঙ্গলী* পত্রিকার স্বত্ব কিনে নিয়ে ১৯৩২ সালে এই পত্রিকাটির সূচনা করেন। (৩ : ৪২৩) আবু জাফর সামসুদ্দীন এই পত্রিকাটিকে ইস্পাহানি, নাজিমুদ্দীন প্রমুখ ব্যবসায়ীদের মুখপত্র বলেই উল্লেখ করেছেন। (৪ : ১৫৮-৫৯)

১৯৪০-এর দশকে *স্টার অফ ইন্ডিয়া* মুসলিম লিগ রাজনীতির প্রচারবাহন হয়ে ওঠে। ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর স্বার্থও এর সঙ্গে জড়িত ছিল। পত্রিকাটি বাংলাভাগ সমর্থন করে এবং শরৎচন্দ্র বসু-আবুল হাশিম পরিকল্পিত 'স্বাধীন বঙ্গ' প্রস্তাব (এপ্রিল-মে, ১৯৪৭)-কে 'মুসলমানদের দাসত্বে নিক্ষেপের ষড়যন্ত্র' বলে বর্ণনা করে (১৩ মে, ১৯৪৭)।

১৯৩৭ সালে আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী যেমন *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড* নামে একটি ইংরেজি দৈনিক প্রকাশ করে, অমৃতবাজার গোষ্ঠী থেকে প্রকাশিত হয় *যুগান্তর* দৈনিক। ১৯৩৮ সালে আন্দামানে রাজবন্দি ফণীন্দ্র নন্দী বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন বলে অভিযোগ করে একটি রচনা প্রকাশিত হলে *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড*-এর সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ সেন তিন মাসের জন্য কারাদণ্ডিত হন। (২ : ২০৯-১০) তখন সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন হেমচন্দ্র নাগ। ১৯৪০-এর দশকে আমরা এই পত্রিকায় সম্পাদক হিসাবে তাঁর নামই পেয়েছি। তারপর সম্পাদক হন সুধাংশুকুমার বসু।

আনন্দবাজার গোষ্ঠীর সুভাষ-বিরোধী মনোভাব পরে বদলে গিয়েছিল। ২৪ অগস্ট, ১৯৪৫ *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড*-এ দেখছি, প্রথম পৃষ্ঠার ওপরে বড়ো বড়ো করে ছাপা হয়েছে : 'মি. সুভাষচন্দ্র বোস ডেড' আর সারা পৃষ্ঠা জুড়ে গায়ে চাদর-জড়ানো সুভাষচন্দ্রের সেই সুপরিচিত ছবিটি। ১৯৪৬-এর দাঙ্গার সময় ২০ অগস্ট লেখা হয় : 'তিনদিন ধরে যে-হারে লুঠ, অগ্নিসংযোগ এবং হত্যা ঘটেছে, কলকাতার ইতিহাসে তা নজিরবিহীন'। এই পত্রিকার সাংবাদিক অতুল বন্দ্যোপাধ্যায় টেলিপ্রিন্টারে খবর পাওয়ার একটি অভিজ্ঞতা লিখেছেন এইভাবে : ৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮ প্রথমে ফুটে উঠল—ফ্ল্যাশ! ফ্ল্যাশ। তারপরই—গান্ধি শট! গান্ধি ডেড! (১ : ৬৯)

সরোজ আচার্য এবং সমর সেনের মতো মার্কসবাদী লেখক এই পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেছেন। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় পত্রিকায় অতিরঞ্জিত এবং প্ররোচনাপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে বলে অভিযোগ করে সমর সেন চাকরি ছেড়ে দেন।

১৯৭৫ সালের মার্চ মাস থেকে *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড* সান্ধ্য দৈনিক হয়ে যায় এবং ১৯৮২ সালে তার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় ; এর দু-বছর পর ওই গোষ্ঠী থেকেই বের হয় একটি ইংরেজি দৈনিক : *দ্য টেলিগ্রাফ*। পত্রিকাটি এখনও প্রকাশিত হচ্ছে।

বাংলা দৈনিক *যুগান্তর* প্রকাশিত হয়েছিল *অমৃতবাজার*-এর সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ এবং একদা *নবশক্তি* পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ক্যাপটেন নরেন্দ্রনাথ দত্তর উদ্যোগে। প্রথমে তুষারকান্তিই সম্পাদক ছিলেন, পরে সেই দায়িত্ব নেন *আনন্দবাজার* ছেড়ে আসা বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। (১৫ : ১৮৭)

যুগান্তর নামটির একটি ইতিহাস আছে। ১৯০৬ সালে বিপ্লববাদী যুবকদের মুখপত্ররূপে *যুগান্তর* নামে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়েছিল, আমরা শুনেছি। ১৯২৩ সালে শিবরাম চক্রবর্তী নিজেই প্রকাশক এবং সম্পাদক হয়ে সাপ্তাহিক আকারে পত্রিকাটি আবার পুনঃপ্রকাশ করতে থাকেন এবং সরকার-বিরোধী রচনা প্রকাশের জন্য একবার গ্রেপ্তারও হন। পরে তুষারকান্তি ঘোষ ১০০০ টাকা দিয়ে তাঁর কাছ থেকে পত্রিকাটির স্বত্ব কিনে নিয়ে দৈনিক আকারে প্রকাশ করেন ১৯৩৭ সালে। (৩৫ : ৩৫২, ৩৫৯) *অমৃতবাজার*-এর মতো যুগান্তরও ছিল গান্ধিবাদী এবং সুভাষ-বিরোধী। তুষারকান্তির পুত্র তরুণকান্তি ঘোষ প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেস

রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। এই কারণে লোকে যুগান্তরকে 'কংগ্রেসের কাগজ' হিসেবেই দেখত বলে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন। (১৮ : ১৯৮)

বিনয় ঘোষ এবং সরোজ দত্তর মতো মার্কসবাদী লেখকও অবশ্য *যুগান্তর-অমৃতবাজার*-এ চাকরি করেছেন। ১৯৬০-এর দশকে এই পত্রিকার সম্পাদক হন সুকোমল ঘোষ। ১৯৮০-র দশকে আবার ফিরে আসেন তুষারকান্তি। প্রথমে বাগবাজার স্ট্রিট, পরে আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে অমৃতবাজারের অফিস থেকেই *যুগান্তর* প্রকাশিত হত। আরও পরে দপ্তর স্থানান্তরিত হয় মধ্য কলকাতার নোনাপুকুরে।

৪২ বর্ষ ১২ সংখ্যা শনিবার ১৩ আশ্বিন ১৩৮৫
30 SEPTEMBER, 1978 ৩০ পয়সা

যুগান্তর

এককালের বিখ্যাত *দৈনিক যুগান্তর*

১৯৯০-এর দশকে দুটি পত্রিকাই শ্রমিক অসন্তোষ এবং আরও নানা সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে। এই দশকে প্রথমে *অমৃতবাজার* এবং ১৯৯৬ সালে *যুগান্তর* পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৩৬ সালে মওলানা আকরম খানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দৈনিক *আজাদ*। কার্যালয় : ৮৬এ, আপার সার্কুলার রোড। বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী এবং একদা জাতীয়তাবাদী আকরম খান ততদিনে কট্টর লিগপন্থী হয়ে গেছেন। তবে ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর বাংলায় ফজলুল হকের কৃষক প্রজাপার্টি আর মুসলিম লিগের জোট সরকার গঠিত হলে *আজাদ* ফজলুল হককেও সমর্থন করে এবং তাঁর সরকার একবার ওই পত্রিকাকে ৩০,০০০ টাকা অনুদান দিয়েছিল বলেও জানা যায়। (২ : ৬৭-৬৮ : ৪ : ১৬০) ফজলুল হকের দলের মুখপত্র হিসাবে *কৃষক* নামের একটি দৈনিকও ১৯৩৮ অথবা ১৯৩৯ থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল। সম্পাদক ছিলেন মোজাম্মেল হক। (১৫ : ১৮৮ ; ৪ : ১৫৯) পত্রিকাটি ১৯৪৮ পর্যন্ত চলেছিল—শেষের দিকে স্বত্ব ছিল সমাজবাণী লিমিটেডের।

এই সময়েরই একটি স্বল্প-প্রচারিত দৈনিক *প্রত্যহ* প্রকাশিত হত অজিতশঙ্কর দে এবং আসরাফুদ্দীন চৌধুরীর যুগ্ম সম্পাদনায় ; অফিস ছিল উত্তর কলকাতার হেদুয়া অঞ্চলে। জাতীয়তাবাদী এই পত্রিকাটি ছিল সুভাষপন্থী। পুরো পত্রিকাটিই প্রকাশ করা হত চলিত বাংলায়। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত হয় এই পত্রিকাটিতেই। (১৮ : ১৯৬) এই দশকের আর-একটি পত্রিকা *দৈনিক নায়ক*-এর কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

পাঁচ : ১৯৪১-৫১

যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-দেশভাগ--এইসব নিয়ে ১৯৪০-এর দশক বাঙালির জীবনে এক গভীর সংকটের কাল। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এই সময় সংবাদপত্রগুলিকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। *স্টার অফ ইন্ডিয়া, আজাদ* এবং মুসলিম ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর পত্রিকা *মর্নিং নিউজ* (১৯৪২) স্পষ্ট ভাষায় মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করতে থাকে ; অন্যদিকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের বাহন হয়ে ওঠে ১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত মাখনলাল সেনের (১৮৮১-১৯৬৫) *দৈনিক ভারত* এবং ভবতোষ রায়-সম্পাদিত সাপ্তাহিক *হিন্দু*। দৈনিক *অমৃতবাজার-আনন্দবাজার* এবং মাসিক *শনিবারের চিঠি*-ও এই সংক্রাম থেকে একেবারে মুক্ত ছিল না। এই সময়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য--ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর সঙ্গে সংবাদপত্রের প্রত্যক্ষ সংযোগ। মুসলিম লিগপন্থী পত্রিকাগুলির পিছনে ছিলেন মুসলিম ব্যবসায়ীরা ; নিজেদের স্বার্থেই তাঁরা বাংলা ভাগ সমর্থন করেছিলেন। অন্যদিকে *ভারত* প্রকাশিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার অর্থসাহায্য নিয়ে। একদা স্বাধীনতা সংগ্রামী মাখনলাল সেন ততদিনে হিন্দু মহাসভাপন্থী হয়ে পড়েছিলেন। (২ : ২২৮, ২৩৮ ; ১২ : ১১২) *ভারত* পত্রিকার দপ্তর ছিল মৌলালি এলাকার সুরি লেনে। *আজাদ* পত্রিকার অফিস ছিল এন্টালি বাজারের উলটো দিকে, বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে। আবুল কালাম শামসুদ্দিন কিছুদিন এই পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। (৪ : ১৬০, ২৪২) আকরম খান সম্ভবত তখন *মর্নিং নিউজ*-এ চলে গেছেন।

১৯৪৬-৪৭ সালের *মর্নিং নিউজ* আমরা অনেকটাই দেখেছি। সম্পাদক : সৈয়দ জিলানি। ১৯৪৬-র ১৬ অগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে লিগ কীভাবে একটা গণহত্যার ষড়যন্ত্র করছে, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই পত্রিকা থেকে। (৩৮ক : ২৬-২৭)। নোয়াখালি হত্যাকাণ্ডের সাত দিন পরে ১৭ অক্টোবর, ১৯৪৬ *মর্নিং নিউজ* ঘটনাটা বর্ণনা করেছিল 'স্থানীয় হাঙ্গামা' এবং 'হিন্দুদের অতিরঞ্জিত প্রচার' বলে। ১৫ অগস্ট, ১৯৪৭ সংবাদ-শিরোনামে ভারতের আগে ছিল পাকিস্তানের নাম : 'শোভেরিন পাকিস্তান অ্যান্ড ইন্ডিয়া বর্ন'। স্বাধীনতার পরও এই পত্রিকাটি কিছুদিন কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশক হিসাবে নাম থাকত : মইনুল ইসলাম।

কলকাতার প্রবীণেরা বলেন, সাম্প্রদায়িকতা প্রচারে *আজাদ* এবং *ভারত* তখন পাল্লা দিয়ে চলছিল। ১৯৪২ সালে মাখনলাল সেন গ্রেপ্তার হয়ে কিছুদিন অন্তরীণ ছিলেন। ১৯৪৫ সাল থেকে আবার যখন *ভারত* প্রকাশিত হতে লাগল, তার দাবি তখন : ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হতে হবে। এটা আসলে হিন্দু মহাসভা এবং ডালমিয়ার মতো হিন্দু ব্যবসায়ীদের দাবি (১২ : ১১২) *অমৃতবাজার*-ও কিছু কম সক্রিয় ছিল না। ১৯৪৭-র মে মাসে অঞ্চলে-অঞ্চলে বঙ্গ ভঙ্গের সমর্থনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন মাখনলাল সেন আব তুষারকান্তি ঘোষ। ৩১ মে, ১৯৪৭ গ্যালপ পোলের আয়োজন করে *অমৃতবাজার* প্রমাণ করে দিয়েছিল, বাংলার হিন্দুদের ৯৮ শতাংশই বাংলা ভাগ চায়। *অমৃতবাজার* এই সময় 'বেঙ্গল পার্টিশন ফান্ড' নামে একটা তহবিলও গঠন করে ফেলে (৩৮ক : ৭৯, ৮৩) অন্যদিকে *মর্নিং নিউজ* (১১ অগস্ট ১৯৪৬) মুসলমানদের বোঝাচ্ছিল : কাফেরদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করার সময় এসে গেছে। আর স্বাধীনতার দিন *আজাদ* ঘোষণা করেছিল : 'আজ মুছলমান উন্নতমস্তকে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে...আমি স্বাধীন, আমি কাহারও গোলাম নহি।' (৪১ : ১০০-১০৪)

১৯৪০-এর দশকে সাম্প্রদায়িক মানসতা যখন বাংলার রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে আর সংবাদপত্রেও তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে, সেই সময় কিছুটা ব্যতিক্রমী পত্রিকা ছিল *নবযুগ*। মওলনা আহমদ আলী সম্পাদিত এই পত্রিকাটির প্রকাশকাল ১৯৪০ (মতান্তরে ১৯৪১) : তবে ১৯২০ সালে কাজী নজরুল ইসলাম এবং মুজঃফর আহমদের সম্পাদনায় সান্ধ্য দৈনিক আকারে এই পত্রিকাটি কিছুকাল প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ায় কয়েক মাস পরেই পত্রিকাটির অকালমৃত্যু ঘটে। পরে আবার মুজঃফর আহমদের নামে এবং তিনি সম্পর্ক ত্যাগ করলে আবুল কাশিমের পরিচালনায় ১৯২১ সালে পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে। (২৫ : ৭৮-৯৬, ১০১-১১৬) ; কিন্তু বেশিদিন চলেনি।

দ্বিতীয় পর্বে ফজলুল হকের পৃষ্ঠপোষণায় এবং কাজী নজরুলের সম্পাদনায় পত্রিকাটিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করা হয়। অফিস ছিল বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে, নীলরতন সরকার হাসপাতালের উলটো দিকে। ১৯৪২ সালের ৯ জুলাই কঠিন রোগে বাক্‌শক্তি হারানোর আগে পর্যন্ত নজরুল পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন, তারপর আসেন আহমেদ আলী। মুক্তমনা বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক রেজাউল করিম এই পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বাংলায় তখন ফজলুল হকের সরকার। তিনি নিজে *কৃষক* পত্রিকা (১৯৩৮) প্রকাশ করছেন ; আবার একদিকে *আজাদ*, অন্যদিকে *নবযুগ*কেও সাহায্য করছেন। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সাহিত্যপ্রেমী এবং কৃষকদরদী এই নেতা বারবার মত পরিবর্তন করেছেন, মুসলিম লিগেও যোগ দিয়েছেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে *আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, অ্যাডভান্স, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, দৈনিক বসুমতী* প্রভৃতি পত্রিকা রাজ্য সরকারের বিরাগভাজন হয়। ১৯৩১ সালের দ্য প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ারস) আইনের সুযোগ নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের অভিযোগে ৩৭টি পত্রিকার বিরুদ্ধে আগাম জামানত জমা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়—তার মধ্যে ৩১টি পত্রিকা ছিল হিন্দু-মালিকানাধীন। (২ : ৭৫-৭৬) অভিযোগগুলি হয়তো অমূলক ছিল না। তবে ওই একই দোষে *স্টার অফ ইন্ডিয়া* আর *আজাদ*-ও অভিযুক্ত হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি ; আজাদ বরং হকসাহেবের অর্থানুকূল্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। ১৯৪৩ সালে খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে বাংলায় মুসলিম লিগ সরকার গঠিত হবার পর ওই দুটি পত্রিকা এবং *মর্নিং নিউজ* আরও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করতে থাকে। কলকাতার প্রবীণেরা মনে করতে পারেন, কলকাতা ফুটবল লিগে মহামেডান স্পোর্টিং মোহনবাগানকে হারিয়ে দিলে *আজাদ* যে-ভাষায় সেই সংবাদ প্রকাশ করত, তা-তে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর উপাদান আর গোপন থাকত না।

মুসলিম লিগের মধ্যে নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে সোহরাবর্দির বিরোধ ছিল। সোহরাবর্দির-গোষ্ঠীর মুখপত্র হিসাবে ১৯৪৭ সালে *ইত্তেহাদ* নামে একটি দৈনিক প্রকাশিত হয়। (১০ : ১০২-৩) সোহরাবর্দি অবশ্য নিজে ভালো বাংলা জানতেন না, পত্রিকাটি পরিচালনা করতেন আবুল মনসুর আহমদ। স্বাধীনতার পরও কিছুদিন এই পত্রিকাটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৪৬-র দাঙ্গার পর শুধু হিন্দু নয়, মুসলমানদের একাংশও সোহরাবর্দির ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। সুতরাং পত্রিকাটির প্রচার খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না।

১৯৪০-এর দশকে বাংলা সংবাদপত্র জগতের আর-একটি বড়ো ঘটনা কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *স্বাধীনতা*-র আত্মপ্রকাশ (ডিসেম্বর, ১৯৪৫)। প্রথম দিকে পত্রিকাটি ছিল

সাপ্তাহিক, মাত্র চারপৃষ্ঠার। ছাপা হত ধর্মতলার পশ্চিমে ডেকার্স লেনে পার্টির ছাপাখানা মণ্ডল প্রেস থেকে; সম্পাদনা করতেন সোমনাথ লাহিড়ী। (৩৯ : ৩৪৩) এই পত্রিকার কিশোর-বিভাগটির সূচনা করেছিলেন অকালপ্রয়াত কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। সাহিত্যিক ননী ভৌমিক এবং কবি গোলাম কুদ্দুস এই পত্রিকায় কাজ করেছেন। ফিচার লিখতেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ১৯৪৭ সালে *স্বাধীনতা* বাংলাভাগের বিরোধিতা করে 'ঐক্যবদ্ধ ভারতে স্বাধীন বাংলার' দাবি তুলেছিল।

১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ায় *স্বাধীনতা* বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫১ সালে সেই নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে *স্বাধীনতা* সরোজ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় আবার আত্মপ্রকাশ করে। প্রসঙ্গত 'স্বাধীনতা' নামটি নতুন নয়। ১৯৩০-এর দশকের মধ্যভাগে বিপ্লবীদের মধ্যে যারা মার্কসবাদে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁদের একটি গোষ্ঠী *স্বাধীনতা* নামে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করত। দ্বিতীয় পর্বে স্বাধীনতার অফিস ছিল প্রথমে নিউ পার্ক স্ট্রিট, পরে পার্ক লেন। (৯ : ১১৪) এছাড়া আলিমুদ্দীন স্ট্রিট এবং বৃন্দাবন মল্লিক লেন থেকেও কিছুদিন প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের সময় সরকারের চোখে *স্বাধীনতা* ছিল সন্দেহভাজন পত্রিকা। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হবার কিছু আগেই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র

বাংলা দৈনিক

স্বাধীনতা

মূল্য প্রতি সংখ্যা দুই পয়সা

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতারা নিম্ন ঠিকানায় পত্রালাপ করুন

ম্যানেজার—স্বাধীনতা, ১২১, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

কমিউনিস্ট পার্টির *স্বাধীনতা*-র বিজ্ঞাপন

১৯৪৬-৪৭ সালের আরও দু-একটি সংবাদপত্রের সন্ধান আমরা পেয়েছি। আনন্দবাজার ত্যাগ করে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বিনয় ঘোষ এবং সরোজ দত্তর সহায়তায় ১৯৪১-এর অগস্ট থেকে *অরণি* নামে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করতেন। প্রগতিশীল এবং উচ্চমানের এই পত্রিকাটি অবশ্য বেশিদিন চলেনি। সম্ভবত ১৯৪৬-এ সত্যেন্দ্রনাথ *স্বরাজ* নামে একটি দৈনিকপত্র সম্পাদনা করেন। (২৩ : ১৩৯) জীবনানন্দ দাশ এই পত্রিকায় চাকরি করতেন। বাংলাভাগের পর *স্বরাজ* লিখেছিল : 'এই স্বাধীনতা নির্মল সূর্য্যোদয় নহে, মেঘাচ্ছন্ন প্রভাত।' (৪১ : ১০০-৪) ১৯৪৭ সালের শারদীয় *স্বরাজ* পত্রিকাটি আমরা দেখেছি। শৈল চক্রবর্তীর

ব্যঙ্গচিত্রে ক্ষুধার্ত মানুষ খাদ্য চাইছে, আর ব্যালকনি থেকে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ গাইছেন : একবার তোরা মা বলিয়া ডাক। ওই সংখ্যায় 'স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন নীহাররঞ্জন রায়। *স্বদেশ, মাতৃভূমি* ইত্যাদি এই সময়কার আরও দু-একটি সংবাদপত্রের নাম আমরা পেয়েছি ; শুনেছি শৈলেন চক্রবর্তী সম্পাদিত *ভোটরঙ্গ* নামে একটি পত্রিকার কথা—সেখানে সব রাজনৈতিক দলকেই ব্যঙ্গ করে ছবি এবং লেখা থাকত ; তবে পত্রিকাটি দৈনিক ছিল কিনা জানি না। *দৈনিক মাতৃভূমি* পত্রিকাটি প্রকাশিত হত তালতলা অঞ্চলে *অ্যাডভান্স* অফিস থেকেই ; ১৯৪০-এর দশকে তা প্রচলিত ছিল--এইটুকুই কেবল জানি। ১৯৪৭-এর পর *পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা* নামে একটি স্বল্পায়ু দৈনিক প্রকাশ করেছিলেন হেমন্ত সরকার।






১৫ অগস্ট ১৯৪৭ : *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য় পিসিএল-এর ব্যঙ্গচিত্র

স্বাধীনতার পরপরই তিনটি দৈনিক পত্রিকা ভূমিষ্ঠ হচ্ছে, দেখতে পাই। ১৯৪৮ সালে একদিকে শরৎচন্দ্র বসুর *দ্য নেশন* ; অন্যদিকে *লোকসেবক* প্রকাশিত হয় শ্রমিক ট্রাস্ট সোসাইটির পক্ষ থেকে ; উদ্যোক্তা ছিলেন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ--তাঁরা পরে কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি (১৯৫০) নামে একটি দল গঠন করেন। *লোকসেবক* প্রকাশিত হত এন্টালিতে আজাদ পত্রিকার অফিসবাড়ি থেকে (আজাদ ততদিনে পাকিস্তানে চলে গেছে)। সম্পাদক হিসাবে প্রথমে ছিলেন পঞ্চানন ভট্টাচার্য ; ১৯৫০-এর দশকে সুখলাল চট্টোপাধ্যায়। ১০ পয়সা দামের একটু ছোট আকারের এই পত্রিকাটি ক্রমে প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির (পি এস পি) মুখপত্র হয়ে ওঠে। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সমর গুহ প্রমুখ নেতাদের বিবৃতি নিয়মিত ছাপা হত এবং কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা থাকত। *দ্য নেশন* মাত্র দু বছর, ১৯৫০-এর ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চালু ছিল। সম্প্রতি অঞ্জন বেরা-র সম্পাদনায় এই পত্রিকার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

ওই ১৯৪৮ সালেই খগেন্দ্রনাথ মিত্রর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *কিশোর* নামের দৈনিকপত্রটি। *কিশোর*-কিশোরীদের জন্য প্রকাশিত এই প্রথম একটি দৈনিক সংবাদপত্র। স্বল্পজীবী হলেও তার গুরুত্ব তাই কম নয়। ১৯৪৯ সালে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হলো *সত্যযুগ*। রামকৃষ্ণ ডালমিয়া ততদিনে *টাইমস অফ ইন্ডিয়ার* স্বত্ব

কিনে নিয়েছেন ; তাঁরই অর্থে এবার বেরোল একটি বাংলা দৈনিক। তবে এই পর্বে *সত্যযুগ* বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথ আবার আনন্দবাজারে ফিরে যান এবং তাঁর জায়গায় সম্পাদক হয়ে আসেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ; কিন্তু তিনিও কিছুদিন পরে *যুগান্তর*-এ যোগদান করেন।

সত্যযুগ পত্রিকার দপ্তর ছিল কনভেন্ট রোডে। প্রধান পরিচালক : প্রতাপকুমার রায়। মাঝখানে কিছুকাল বন্ধ থাকার পর বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৯৬০-এর দশকের শেষে *সত্যযুগ* আবার আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৯৭০-র দশকে, বিশেষত জরুরি অবস্থার সময় (১৯৭৫-৭৭) নির্ভীক সংবাদপত্র হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে। সম্পাদক তখন জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মীরা অনেকেই এসেছিলেন *দৈনিক বসুমতী* ছেড়ে।

কিন্তু পরের দশকে শ্রমিক অসন্তোষ, দুর্নীতি এবং আরও নানা সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে ১৯৮৭ সালে *সত্যযুগ* পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। শেষের দিকে কর্মীরা নিয়মিত বেতন পেতেন না। বেকার হয়ে পড়ার পর তাঁরা একটি সমবায় গঠন করে ২০০১ সালের মার্চ মাস থেকে পত্রিকাটির একটি সান্ধ্য সংস্করণ বের করে আসছেন। শ্রমিক সমবায়-পরিচালিত এই পত্রিকাটি সে-হিসাবে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বর্তমান ঠিকানা : ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট।

১৯৪৯ সালে অতুল্য ঘোষের (১৯০৪-৮৬) সম্পাদনায় *জনসেবক* নামে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়েছিল, পরে (১৯৫১) তা দৈনিকে রূপান্তরিত হয় (৩৬) এবং ১৯৫০-এর দশকের শেষে *আনন্দবাজার* ছেড়ে আসা চপলাকান্ত ভট্টাচার্য হন তার পৃষ্ঠপোষক। *জনসেবক* ছিল একেবারেই ছাপা-মারা কংগ্রেসের কাগজ। আশ্চর্যের বিষয়, অতুল্য ঘোষ তাঁর 'কষ্টকল্পিত' গ্রন্থে এই পত্রিকাটি সম্পর্কে কিছুই প্রায় লেখেননি। *জনসেবক*-এর অফিস ছিল প্রথমে ১৮এ হরিতকী বাগান লেনে, পরে ১০৫/৭/এ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে, লোটাস সিনেমার কাছে। প্রথম দিকে পত্রিকাটির নাম ছিল *দৈনিক জনসেবক* এবং তার নিচে লেখা থাকত 'কংগ্রেস কর্মিগণের মুখপত্র'। ১৯৬০-এর দশকে শুধু *জনসেবক* নামটিই পাচ্ছি।

নানা সংকট এবং তাৎপর্যময় ঘটনায় আকীর্ণ ১৯৪০-এর দশক শেষ করে ১৯৫১ সালে এসে আমরা আর-একটি স্বল্পজীবী দৈনিকপত্রের দেখা পাই। আর এস. পি রাজনৈতিক দলের মুখপত্র : *দৈনিক গণবার্তা*। অরবিন্দ পোদ্দার, নীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রয়াত অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রমুখ লেখক-বুদ্ধিজীবীরা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পত্রিকাটি বেশিদিন চলেনি। তবে ১৯৫০-এর দশকে সরকারবিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় সান্ধ্য বুলেটিন প্রকাশিত হত।

ছয় : স্বাধীনতা-উত্তর পর্ব

বিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের প্রায় ৩০টি পত্রিকার কথা আমরা শুনলাম। সামাজিক-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ববিরোধ, দল-উপদলের বিবাদ-বিভাজন, ব্যক্তিক এবং ব্যবসায়িক স্বার্থ—এই সব কিছু নিয়েই সংবাদপত্রের ইতিহাস। ব্যক্তি সম্পাদকের রাজনৈতিক আদর্শ সম্পূর্ণ বদলে গেছে; যেমন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মাখনলাল সেন বা আকরম খান। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বা বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতো সম্পাদক বারবার

পত্রিকা বদল করেছেন। দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে নতুন পত্রিকার জন্ম হয়েছে ; যেমন *ফরোয়ার্ড* এবং *অ্যাডভান্স*। ব্যবসায়ীরা টাকা লগ্নি করার জন্য পত্রিকা প্রকাশ করেছেন ; যেমন স্টার অফ *ইন্ডিয়া* বা *ভারত* ; *মর্নিং নিউজ* বা *সত্যযুগ*।

স্বাধীনতা উত্তরকালেও আমরা এই ধারাটা দেখতে পাই। কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলে *স্বাধীনতা* ভেঙে *কালান্তর* আর *গণশক্তি*—এই দুটি পত্রিকার জন্ম হয়। ১৯৬৬-র অক্টোবর মাসে চিন্মোহন সেহানবীশের উদ্যোগে *কালান্তর* প্রথমে কলেজ স্ট্রিট পাড়ার নবীন কুণ্ডু লেন থেকে সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। দৈনিক হয় ১৯৬৭-র ৭ অক্টোবর। সেদিনের কাগজে প্রথম সংবাদ ছিল : 'ভিয়েতনামের প্রশ্নে আমেরিকার উপর তীব্র চাপ সৃষ্টির দাবি।' প্রধান সম্পাদক হিসাবে ভবানী সেনের নাম থাকলেও কার্যত সম্পাদনা করতেন জ্যোতি দাশগুপ্ত ; পরে প্রভাত দাশগুপ্ত, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, সুনীল মুন্সী প্রমুখ সম্পাদনা করেছেন। *দৈনিক কালান্তর* মাঝখানে কিছুকাল বন্ধ থাকার পর ১৯৯৫ থেকে আবার প্রকাশিত হচ্ছে ; সম্পাদক : চন্দন চক্রবর্তী ; কার্যালয় : ঝাউতলা লেন। *গণশক্তি* ১৯৬৪-র মার্চ মাসে মুজঃফর আহমদের উদ্যোগে সাপ্তাহিক হিসাবে শুরু হয়েছিল (৯ : ১১৫)। তারপর ১৯৬৬ সালে সান্ধ্য দৈনিক এবং ১৯৮৭ সালের পয়লা মে থেকে প্রভাতী দৈনিক রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম সম্পাদক : সরোজ মুখোপাধ্যায় ; বর্তমানে অনিল বিশ্বাস।

১৯৬০-এর দশকে এইভাবে দুটি নতুন দৈনিকপত্রের যেমন জন্ম হল, তেমনি এই দশকেই লুপ্ত হয়ে গেল *লোকসেবক* আর *জনসেবক*। সম্পাদক বা কোনো প্রধান সাংবাদিক একটি পত্রিকা ছেড়ে এসে নতুন একটি দৈনিক প্রকাশ করছেন--এমন ঘটনাও দেখা গেছে। *আনন্দবাজার* ত্যাগ করে গৌরকিশোর ঘোষ এবং বরুণ সেনগুপ্ত যথাক্রমে *আজকাল* (১৯৮১) এবং *বর্তমান* (১৯৮৪) প্রকাশ করেন। এম. জে আকবর *দ্য টেলিগ্রাফ* ছেড়ে এসে স্থাপন করেন *এশিয়ান এজ* (১৯৯৫) ; এর আগে ১৯৯২ সালে *সংবাদ প্রতিদিন* নামে একটি পত্রিকার জন্ম হয়। *ভারতকথা*, *বঙ্গলোক*, এবং আরও দু-একটি স্বল্পায়ু পত্রিকা ১৯৮০-৯০-এর দশকে দেখা গেছে। সেগুলি এতই সাম্প্রতিক ঘটনা যে, তা নিয়ে বিশদ করে কিছু লেখার সময় এখনও আসেনি। আমরা শুধু লক্ষ করি, রাজনৈতিক ওঠাপড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই সংবাদপত্রেরও কালে-কালে দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে।

স্বাধীনতার পর প্রথম কয়েক বছরে দেখা যাবে, সরকারি দুর্নীতি, কালোবাজারি, রাজনৈতিক নেতাদের কেচ্ছাকেলেঙ্কারি নিয়েই সংবাদপত্রের পাতা ভরে উঠেছে। কংগ্রেসপন্থী পত্রিকাগুলিও কংগ্রেস সরকারকে সমালোচনা করেছে, ব্যঙ্গ করেছে। খাদ্য সংকট এবং উদ্বাস্তু-সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার জন্য সরকারকে দায়ী করেছে। গণ আন্দোলনের ওপর পুলিশি নির্যাতনের সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে বারবার।

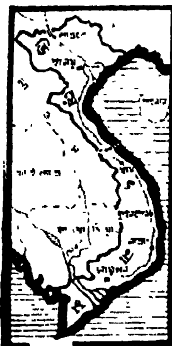
১৯৫৩-র জুলাই মাসে ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনের সময় সাংবাদিকরা দুঃসাহসিকভাবে পুলিশের অত্যাচার এবং গুলিচালনার সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। ২২ জুলাই কলকাতা ময়দানে পুলিশ তাই সাংবাদিকদেরই আক্রমণ করে। *স্বাধীনতা*-র সুনীল সেনগুপ্তকে পুলিশ ধরতে এলে অন্য পত্রিকার সাংবাদিকরা প্রতিবাদ করেন এবং *যুগান্তর*-এর অনিল ভট্টাচার্য, পান্না সেন আর তারক দাস, *আনন্দবাজার*-এর অজিত সোম এবং গৌরকিশোর ঘোষ, দ্য *স্টেট্সম্যান*-এর সুদীন রায় এবং *ব্লিৎস* পত্রিকার বিদ্যা মুন্সী প্রহৃত বা

নিগৃহীত হন। এর প্রতিবাদে ২৩ জুলাই *অমৃতবাজার* অফিসে যে-বৈঠক হয়, সেখানে সব পত্রিকার সম্পাদকরাই উপস্থিত ছিলেন এবং ২৮ জুলাই পত্রিকাগুলি একযোগে ধর্মঘট করে। ২৬ জুলাই *আনন্দবাজার*-এ প্রকাশিত হয় সত্যেন্দ্রনাথের সেই প্রবাদপ্রতিম সম্পাদকীয় : 'পশুর যুক্তি'—যেখানে পুলিশ সম্পর্কে বলা হয়েছিল : 'ইহারা জননীর গর্ভের লজ্জা, ইহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যনীতির ঔরসের অপজাত সন্তান'। সর্বভারতীয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি চেলাপতি রাও ঘটনাটিকে 'ফ্যাসিজম অফ ট্রু টাইপ' বলে ধিক্কার দেন। লোকসভায় জওহরলাল নেহরু দুঃখপ্রকাশ করেন। রাজ্য সরকারকেও একটি তদন্ত কমিশন বসাতে হয়। (৩৮ খ : ৮৯-৯৬)



আনন্দবাজার

সায়গন সরকারের আত্মসমর্পণ,
গুলিগোলা বন্ধ, প্রেসিডেন্ট গ্রেপ্তার



৩০ বছরের

অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার
ভারতের স্বীকৃতি পেল

ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধের বিজয়-সংবাদ : *আনন্দবাজার পত্রিকা*

পরবর্তী কালের বিভিন্ন আন্দোলনের সময়ও সাংবাদিকরা নির্ভীক ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের সময় *দৈনিক বসুমতী*-তে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের তীব্র জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় ছিল ঘরে ঘরে পাঠের বিষয়। দিনের পর দিন পাতা জুড়ে গুলিবিদ্ধ যুবকদের ছবি প্রকাশ করে গেছে বসুমতী। ৬ মার্চ, ১৯৬৬ আনন্দবাজারের এক সাংবাদিক কৃষ্ণনগর ঘুরে এসে লেখেন, 'মানুষের রুদ্ররোষ...যে কী উগ্রমূর্তি ধারণ করতে

পারে'--তা কৃষ্ণনগর-শান্তিপুর না দেখলে বোঝা যাবে না। ১০ মার্চ সাধারণ ধর্মঘটের পরের দিন ওই পত্রিকায় লেখা হয়, এই হরতাল 'বিক্ষোভের বিপুলতায় ঐতিহাসিক'। ১৯৭৭ সালের পর পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন গণসমাবেশের ওপর পুলিশ লাঠিগুলি চালিয়েছে, সাংবাদিকরাও লাঞ্ছিত হয়েছেন। কিন্তু শাসক দলের মুখপত্র *গণশক্তি*-র এ-রকম কোনো ভূমিকা দেখা যায়নি।

সাত : পাঠের অভিজ্ঞতা

বিভিন্ন সংবাদপত্র পাঠ করতে গিয়ে যে-অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার সবটা এই রচনার পরিসরে লিখে রাখা যাবে না। দু-চারটি কেবল উল্লেখ করছি।

সশস্ত্র বিপ্লবপন্থা এবং হত্যাকাণ্ডগুলিকে দেশি সংবাদপত্রগুলিতে নিন্দা করা হয়েছে, কিন্তু বিপ্লবী শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাও প্রকাশ করা হয়েছে একই সঙ্গে। যতীন দাসের অবধারিত মৃত্যুর বিবরণ দিনের পর দিন প্রকাশ করেছে *অমৃতবাজার*। ভগৎ সিং-শুকদেব-রাজগুরুর ফাঁসির পর করাচি কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেসী যুবকরাও যে গান্ধিজীকে কালো পতাকা দেখিয়েছিল--সে-সংবাদ প্রকাশ করেছে *দৈনিক নায়ক*, ২৪ মার্চ, ১৯৩১ (৩৩খ)। দীনেশ গুপ্তর ফাঁসির পর গণ উত্তেজনা আর শোকসভার বিশদ বিবরণ ছাপা হয়েছে *অমৃতবাজার* আর *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য়। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামে পুলিশ-হত্যাকারী কিশোর হরিপদ ভট্টাচার্যকে দ্বীপান্তরের আদেশ দেওয়া হলে তার নিন্দা করে *দৈনিক বসুমতী* এবং *আনন্দবাজার*। (৩৩খ) ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৩২ চট্টগ্রামে ব্যাপক ধরপাকড়ের নিন্দা করে *অমৃতবাজার* (৩৩গ) সংবাদপত্রের এই শহিদবন্দনা সরকারের উদ্বেগের কারণ হয়েছিল এবং ১৯৩০-এর দশকে প্রেস আইনকে তাই আরও কঠোর করা হয়। ১৯৩০ সালে গান্ধিজীর লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় একটি বিশেষ প্রেস অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছিল এবং ২১টি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। পরের বছর অভিযুক্ত ১৫টি পত্রিকার মধ্যে ১৩টি পত্রিকা দণ্ডিত হয়। ওই বছরই আবার বিশেষ আইন জারি করা হয় এবং পরের বছর তাকে অপরাধমূলক আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয়। বাংলা সরকারের ১৯৩১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল : রাজদ্রোহের বিষ ('ভাইরাস অফ সিডিশন') সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। (৩০ : ১৭২)

কঠোর প্রেস আইনের চাপে সূর্য সেন, ভবানী ভট্টাচার্য এবং উধম সিং-এর ফাঁসির খবর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা যায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সংবাদ প্রকাশের ওপর সেনসরশিপ চালু হয় (১০ : ১৪৭) ১৯৪২ সালের অক্টোবরে মেদিনীপুরের বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের খবর তাই প্রথম দিকে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৪৩-র মহামন্বন্তরকেও সরকার প্রথমে লঘু করে দেখাবার চেষ্টা করেছিল। তবে জুলাই-অগস্ট মাসের পর থেকে দেখছি, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা কঙ্কালসার শরীর আর রাস্তায় পড়ে থাকা মৃতদেহের ছবিতে ভরে উঠেছে। একদিকে শহরে টন-টন চাল আসছে : অন্যদিকে ১৯ সেপ্টেম্বর *অমৃতবাজার*-এর খবর : শ্মশানঘাটে চিতা নিভছে না। রোজ ৭০/৮০টা করে মড়া আসছে। সেই সময়ই অবশ্য কলকাতায় সাড়ম্বরে দুর্গাপুজো হয়েছে এবং হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড-এ পাতাজোড়া দুর্গাপ্রতিমার ছবিও দেখতে পাচ্ছি। ২৩ অগস্ট *অমৃতবাজার*-এ একটি ছবির নিচে ক্যাপশন :

'হোয়েন মেন অ্যান্ড বীস্ট ফাইট ফর ফুড'। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের ছবিগুলোর কথা আর না লেখাই ভালো।

১৯৪৬ সালের দাঙ্গার দিনগুলোর কাগজ দেখে বিস্মিত হতে হয়, কারফিউয়ের মধ্যে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সাংবাদিকরা কী-করে এত খবর সংগ্রহ করেছিলেন! ১৭ অগস্ট *অমৃতবাজার*-এর সংবাদ-শিরোনাম ছিল : 'ক্যালকাটা আন্ডার মব রুল'। ২৩ অগস্ট দ্য স্টেট্সম্যান হিসেব দেয়, মৃতের সংখ্যা ৪০০০। কলকাতার ওই মহাহত্যাকাণ্ডকে 'গ্রেট ক্যালকাটা কীলিং' নাম দিয়েছিল *স্টেট্সম্যান*-ই।

নোয়াখালির খবর বাংলার লিগ সরকার প্রথম কয়েকদিন গোপন রেখে দিয়েছিল। তাই ১০ অক্টোবর, ১৯৪৬ যে-হিংসাকাণ্ডের সূচনা হয়, তার প্রথম সংবাদ পাওয়া যায় ১৫ অক্টোবর। ওই দিনের *অমৃতবাজার* থেকে জানা যায়, ব্যাপকহারে খুনজখম, লুঠপাঠ আর অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। শুনেছি, গান্ধিজী যখন নোয়াখালিতে শান্তি অভিযানে রত, *আনন্দবাজার* আলপনায় আঁকা লক্ষ্মীর পায়ের চিহ্ন দিয়ে মহাত্মার যাত্রাপথটি নির্দেশ করে দিত। স্বাধীনতার দিন বেলেঘাটায় অনশনরত গান্ধিজীকে দেখতে বিপুল জনসমাগম হয়। প্রায় দশ হাজার। ১৬ অগস্ট ১৯৪৭ কাগজ বেরোয়নি ; ১৭ তারিখে *অমৃতবাজার* লেখে : 'সিটি গোজ গান্ধি ম্যাড'।

দুর্ভিক্ষের দিনে কলকাতার প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হচ্ছিল 'পাপের পথে', 'জীবনসঙ্গিনী', 'কিসমৎ' 'আঁখ কী শরম', 'কাশীনাথ' ইত্যাদি চলচ্চিত্র। ১৯৪৭-এর জুন-জুলাই মাসে দেখছি শহিদ ক্ষুদিরাম, আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বকাহিনী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চলচ্চিত্রের 'মুক্তি আসন্ন' বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। ১৯৩০-এর দশক পর্যন্ত সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার পুরোটাই বিজ্ঞাপন-চিত্রিত হয়ে থাকত। ভেতরের পৃষ্ঠাতেও সাহেবদের ছবি দিয়ে সিগারেট, পাউডার ইত্যাদির বিজ্ঞাপন দেখা যেত। স্বদেশি কোম্পানির বিজ্ঞাপন বলতে দেখেছি মার্গো সাবান, কুমারেশ ওষুধ, সাধনা ঔষধালয়, শ্রীঘৃত ইত্যাদি। এছাড়া গ্রামাফোন কোম্পানির রেকর্ডের বিজ্ঞাপন : দুর্ভিক্ষের বছরে সাহানা দেবীর গাওয়া : 'ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী'।

১৯৪৫-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরই ব্রিটিশ মনে মনে ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল। সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ তাই কিছুটা শিথিল হয়েছিল মনে হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস (নভেম্বর, ১৯৪৫) আর রসীদ আলী দিবসের (ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬) গণবিক্ষোভের বিবরণ তাই সংবাদপত্রগুলি সবিস্তারে প্রকাশ করতে পেরেছিল।

স্বাধীনতার পর খাদ্য সংকট, দুর্নীতি আর পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে আসা হিন্দু উদ্বাস্তুদের শোচনীয় অবস্থার বিবরণ বিশদভাবে পাওয়া যায় সংবাদপত্রে। ১৯৪১ সালের ৮ অগস্ট (২৩ শ্রাবণ ১৩৪৮ব) *আনন্দবাজার* লিখেছিল : 'রবি অস্তমিত'। আর ১৯৫১ সালে প্রকাশ করতে হচ্ছে শরণার্থীদের *মনুষ্যেতর* জীবনাযাপনের বিবরণ ; তাদের সংখ্যা তখন প্রায় ৩৫ লক্ষ। ১৯৫০-র এপ্রিলে *আনন্দবাজার* হিসেব দিয়েছিল, প্রতিদিন গড়ে তিন-চার হাজার মানুষ চলে আসছেন ভিটেমাটি ছেড়ে। ৩ এপ্রিল, ১৯৫০ প্রকাশিত হয় বেনাপোল সীমান্তে কয়েকজন নারীর শ্লীলতাহানির সংবাদ। ওই দশকেরই শেষে খাদ্য আন্দোলনের দিনে (১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯) *স্বাধীনতা*-র সংবাদ : 'খাদ্য মিছিলের ওপর পাশবিক আক্রমণ'। খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে *স্বাধীনতা* নাম দিয়েছিল : 'দুর্ভিক্ষমন্ত্রী'।

আট : কিছু স্মৃতি

১৯৬০-এর দশকে প্রচলিত প্রায় সব কটি দৈনিকপত্রই দেখার সুযোগ পেয়েছি আমার পিতার জীবিকার সৌজন্যে। সেইসব পত্রিকার অনেকগুলিই আজ লুপ্ত। প্রায় ৪৫ বছরের পুরনো সেই স্মৃতি আজ অনেকটাই ইতিহাস ; তারই দু-একটি খণ্ডচিত্র ধরা রইল এই অধ্যায়ে।

দৈনিক বসুমতীর পাতা ছিল একটু বেশি লালচে ; *স্বাধীনতা* ধবধবে ফরসা আর একটু ছোটো আকারের। *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড*-কেও বেশ সাদা দেখাত। *জনসেবকের* রঙ ছিল হলদেটে। শৈশবের প্রধান আকর্ষণ ছিল স্বভাবতই শিশুবিভাগটি। *আনন্দবাজার*-এর আনন্দমেলা (সোমবার), *যুগান্তর*-এর ছোটদের পাততাড়ি (মঙ্গলবার) *জনসেবক*-এর সপ্তডিঙা (শুক্রবার) *স্বাধীনতা*-র কিশোর সভা (শনিবার), *লোকসেবক*-এর সবুজ পাতা (রবিবার)। *দৈনিক বসুমতী* প্রতি বৃহস্পতিবার নারীদের জন্য নির্দিষ্ট রাখত একটি পৃষ্ঠা : 'বৌঠাকুরানীর হাট'। আর-কোনো পত্রিকায় এ-রকম থাকত বলে মনে পড়ে না।

অমৃতবাজার-এ প্রতি রবিবার লাল রঙে পাওয়া যেত শৈল চক্রবর্তীর 'লিট্‌ল ডাক্' ; শিল্পী নিজের নামটি লিখতেন উলটো করে : alias। *আনন্দবাজার*-এ ধারাবাহিক সচিত্র ডিটেকটিভ কাহিনি : গোয়েন্দা রিপ। চণ্ডী লাহিড়ীর 'তির্যক' ব্যঙ্গচিত্র ছিল অনবদ্য। সে-তুলনায় *যুগান্তর*-এর 'অব্যর্থ'-কে মনে হতো কিছুটা স্থূল।

কোনো মনীষী বা স্বাধীনতা সংগ্রামীর জন্মদিনে তখন নিয়ম করে তাঁদের ছবি ছাপা হত। *আনন্দবাজার*-এ প্রফুল্ল সরকার-সুরেশ মজুমদার আর *যুগান্তর*-এ শিশিরকুমার ঘোষকেও স্মরণ করা হত তাঁদের জন্মদিনে। বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল স্বাধীনতা দিবসের রঙিন ক্রোড়পত্র। *জনসেবক*-এ জাতীয় পতাকার নীল চক্রটি অনেক সময় ছাপা হত রিলিফ আকারে। স্বাধীনতার আনন্দগরিমা আর দেশপ্রেমের আদর্শ তখনও কিছু অবশিষ্ট ছিল। দেশনেতাদের ছবি আর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা পাওয়া যেত শিশুবিভাগে। তখন প্রায়ই পুজোর আগে বন্যা হত। আনন্দমেলায় মৌমাছি (বিমল ঘোষ) আর ছোটোদের পাততাড়ি-তে স্বপনবুড়ো (অখিল নিয়োগী) তাঁদের চিঠিতে স্মরণ করিয়ে দিতেন বন্যাদুর্গত 'ভাইবোনেদের' কথা।

রাজনৈতিক নেতাদের ব্যঙ্গ করে ছবি আর লেখাও থাকত। জওহরলাল নেহরু বেরুবাড়ি ছিটমহল পাকিস্তানকে দিয়ে দিলেন--বিধানচন্দ্রের আবেদন শুনলেন না। *আনন্দবাজার*-এ ব্যঙ্গ চিত্র ছিল তাই নিয়ে। ১৯৬২ সালে কমিউনিস্ট নিন্দায় সোচ্চার হয়ে ওঠে *স্বাধীনতা* ছাড়া আর সব পত্রিকাগুলিই। তখন দূরদর্শন ছিল না। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় সংবাদ জানার উপায় ছিল না। তাই বিশেষ তাৎপর্যময় দিনে বিকেলবেলা টেলিগ্রাম বের হত। ১৯৬৫-র ভারত-পাক যুদ্ধের সময় যেদিন মেদিনীপুরের কলাইকুণ্ডায় বোমা পড়ল, টেলিগ্রাম বেরিয়েছিল, মনে আছে। স্মৃতি থেকে, কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে বলছি, বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর দিন (১ জুলাই, ১৯৬২) *আনন্দবাজার*-এর টেলিগ্রামে মাঝখানে কালো বর্ডার দিয়ে উদ্ধৃত করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের '*জন্মদিন*' কবিতার 'আজ আসিয়াছে কাছে জন্মদিন-মৃত্যুদিন'...ইত্যাদি কয়েকটি পংক্তি।

কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হলে 'পরলোকে' লেখাই ছিল সে-আমলের রীতি। ১৯৬০-র দশকেও *দৈনিক বসুমতী* সাধু বাংলা ব্যবহার করত। *আনন্দবাজারে*-এর ভাষা ছিল সরস এবং সহজবোধ্য। *স্বাধীনতা*-র ভাষায় থাকত তীব্র ঝাঁঝ। তবে ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের দিনে *বসুমতী*-র সম্পাদকীয় আর পাতাজোড়া ছবিগুলির কথা আজও ভুলতে পারি না। নকশাল

আন্দোলনের সময় কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর আর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মূর্তির যেদিন শিরশ্ছেদ করা হয়, তার পরের দিন অসামান্য একটি ধিক্কার-রচনা প্রকাশিত হয়েছিল *আনন্দবাজার*-এর প্রথম পৃষ্ঠায়।

সে তো আর প্রযুক্তিবিপ্লবের যুগ নয়। ত্রিনিদাদে ভারতের সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলা হলে শেষ সংবাদ পাওয়া যেত পরের পরের দিনে--ততক্ষণে অবশ্য বেতারসূত্রে খবরটা জানা হয়ে গেছে। খেলার খবর সংবাদপত্রের প্রথম শিরোনাম হল বোধহয় ১৯৬২-র সেই দিনে, যেদিন ইডেন উদ্যানে ক্রিকেটে ভারত হারিয়ে দিল টেড ডেক্সটারের ইংল্যান্ড দলকে। সপ্তাহের অন্যান্য দিনে সংক্ষিপ্ত এবং শুক্রবার পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন থাকত সিনেমার। ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপনে তখন এসেছেন খেলোয়াড় আর চিত্রতারকারা। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কেও বিজ্ঞাপনে টেনেছিল একটি নস্যির কোম্পানি। আর মনে পড়ছে পানামা সিগারেট, বেবী তালমিছরি।

১৯৬০-৭০ দশকে সংবাদপত্রের প্রধান বিষয় তো খাদ্য সংকট আর একের পর এক রাজনৈতিক আন্দোলন ; ১৯৬৭ আর ১৯৬৯-এ অকংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সরকার আর তার স্থায়িত্ব নিয়ে জল্পনাকল্পনা। সত্তরের দশকের প্রথমে সকালবেলা কাগজ খুলতে ভয় করত। প্রতিদিনই হত্যার সংবাদ। প্রকাশ্য রাজপথে বা থানার লক আপে গুলিবিদ্ধ যুবক ; অন্যদিকে 'উগ্রপন্থীদের' হাতে পুলিশ খুন। শ্রদ্ধেয় জননেতা হেমন্ত বসু, অধ্যাপক গোপাল সেন নিহত। ১৯৭১ সালের জুলাই মাস থেকে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বকাহিনি আর খানসেনাদের নির্মম অত্যাচারের বিবরণে ভরে ওঠে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা। ১৯৮০-র দশক থেকে নিয়মিত সংবাদ হয়ে ওঠে বধূহত্যা বা বধূনির্যাতন।

এই সময় থেকেই সংবাদ-শিরোনামে একটা ভাষার পরিবর্তন লক্ষ করি। শিরোনাম সংক্ষিপ্ত হচ্ছে আর তার ভেতর একটা কেমন চটুলতাও এসে যাচ্ছে ; যেমন : 'বাস ছাই, মৃত দুই' ; 'আবার বউ পোড়ানো', 'ডিভিসি ঢেলে দিয়েছে' (বিদ্যুৎ), 'ভাসছে বাউলের একতারা' ইত্যাদি। এই রীতি প্রথমে শুরু করে *আনন্দবাজার*, পরে তা অনুকরণ করে *যুগান্তরও*। ধীরে ধীরে সংবাদ ক্রমশ গল্প হয়ে ওঠে। ১৯৯০ সালে বানতলা হত্যাকাণ্ডের মতো বীভৎস ঘটনা নিয়ে প্রায় একটা ধারাবাহিক উপন্যাসই লিখে ফেলে *আনন্দবাজার*। ১৯৬০-৭০-এর দশকে রাজনৈতিক, বিশেষত বামপন্থী, নেতাদের নিয়ে ধারালো লেখা পাওয়া যেত রূপদর্শীর (গৌরকিশোর ঘোষ) কলমে। কাউকেই রেয়াত করত না শিবরাম চক্রবর্তীব 'অল্পবিস্তর', রেবতীভূষণ আর চণ্ডী লাহিড়ীর কার্টুন। *যুগান্তর*-এ 'শ্রীনিরপেক্ষ' ছদ্মনামে লিখতেন অমিতাভ চৌধুরী। রাজনৈতিক দলের মুখপত্র হলেও খেলা বা সিনেমার মতো বিষয়কে গুরুত্ব দিত *স্বাধীনতা* বা *জনসেবক*। শারদীয় *স্বাধীনতা* ১৯৫০-র দশকে ছিল একটি উচ্চমানের সাহিত্যপত্রিকা।

সংবাদপত্রে আজ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় বা রবিবারের ক্রোড়পত্রে মাঝে মাঝে বেশ গভীর বিশ্লেষণধর্মী রচনা পাওয়া যায়--পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে হয়তো এটা বিরল ছিল। কিন্তু সব মিলিয়ে সংবাদ-পরিবেশনে আজ যেমন একটা চটুলতা এসেছে ; সংবাদের গুরুত্বও যেন ক্রমশ কমে আসছে। রাজনেতিক দলের দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি আর অন্তর্কলহ আজ চায়ের দোকানে আড্ডার বিষয় ; তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বরং ক্রিকেট। প্রতিদিন খুন-জখম-

ধর্ষণ আর নির্যাতনের খবরে ক্ষতলাঞ্ছিত প্রভাতের সংবাদপত্র আজ প্রাতরাশের বিষপাত্র হয়ে উঠেছে। সংবাদপত্র আজ শুধু জনমতকে প্রভাবিত করে না। তার সংবাদ পরিবেশনের ভঙ্গি, বিজ্ঞাপন আর আনুষঙ্গিক ছবি জনসাধারণের রুচিকে বিকৃত করে দিচ্ছে। আগামী দিনে সংবাদপত্রের চেহারা কী দাঁড়াবে, ভেবে শিহরিত বোধ করি।

সব শেষে বলার আছে আর একটি কথা। ১৯৭২ সালে আমি একদিন সাহস করে মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে শিবরাম চক্রবর্তীর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি একদা রাস্তায় দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ ফেরি করেছেন। আর পরে, সংবাদপত্রে 'লেখা বেচে' সেই পয়সায় আশ মিটিয়ে রাবড়ি খেয়েছেন। তাঁর সদ্যসমাপ্ত জন্মশতবর্ষ স্মরণে রেখে এই রচনাটি তাঁর স্মৃতিতে নিবেদন করছি।

তথ্যসূত্র :

১. অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাংবাদিকের চোখে : স্বাধীনতার আগে-পরে' ; বেস্ট বুক্‌স ২০০০।
২. অনুপম মজুমদার, 'ইন্ডিয়ান প্রেস অ্যান্ড ফ্রিডম স্ট্রাগল' ; ওরিয়েন্ট লংম্যান ১৯৯৩।
৩. অমলেন্দু দাশগুপ্ত সংকলিত 'দ্য স্টেট্‌সম্যান অ্যানথলজি', ১৯৭৫
৪. আবু জাফর শামসুদ্দীন, 'আত্মস্মৃতি' ১ম খণ্ড, ঢাকা ১৯৮৯।
৫. আবুল মনসুর আহমদ, 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', ঢাকা ১৯৭৫।
৬. আর. সি. এস সরকার, 'দ্য প্রেস ইন ইন্ডিয়া', এস চাঁদ ১৯৪৮
৭. 'অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন ইন্ডিয়ান পেপাবস প্রিন্টেড অ্যান্ড পাবলিশড্ ইন বেঙ্গল প্রেসিডেনসি', ১৯৩৩ ; গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল ১৯৩৪।
৮. উমা মুখোপাধ্যায়, 'স্বাধীনতা আন্দোলনে যুগান্তর পত্রিকার দান' ; ফার্মা কে এল এম ১৯৭২।
৯. কৃষ্ণ ধর সম্পাদিত 'বাংলার ক'জন সেরা সাংবাদিক' ; গণমাধ্যম কেন্দ্র, প. ব. সরকার ১৯৯৩।
১০. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদিত 'দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন' আনন্দ ১৯৮১।
১১. চেলাপতি রাও, 'দ্য প্রেস' ; ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৭৪।
১২. 'জাতীয় চরিতাভিধান' ; সম্পাদনা : নিশীথরঞ্জন রায়। ১ম খন্ড ১৯৮৯ ; ২য় খণ্ড ১৯৯৩। প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
১৩. জি এন. এস. রাঘবন, 'দ্য প্রেস ইন ইন্ডিয়া : আ নিউ হিস্টরি' ; জ্ঞান পাবলিশিং ১৯৯৪।
১৪. জে. নটরাজন, 'হিস্টরি অফ ইন্ডিয়ান জার্নালিজম' ; গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ১৯৯৫।
১৫. 'জেনাবেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট' ক. ১৯২৩-২৪, খ. ১৯২৯-৩০ ; গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গ ল।
১৬. তারাপদ পাল, 'ভারতের সংবাদপত্র' ; সাহিত্য সদন, ১৯৭২।
১৭. নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিপ্লবের সন্ধানে' ; ডি এন বি এ, ১৯৬৭।
১৮. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'বাংলা সংবাদপত্র : সাংবাদিকের চোখে' [স্বপন বসু এবং হর্ষ দত্ত সম্পাদিত 'বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি' সংকলনে। পুস্তক বিপণি, ২০০০]
১৯. প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী' ৫ম খণ্ড ; আনন্দ, ১৩৯৭ ব।
২০. বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের রচনাসংগ্রহ' ; কলেজ স্ট্রীট পাবলিকেশন্‌স, ১৯৮৭।

২১. বিধুভূষণ সেনগুপ্ত, 'সাংবাদিকের স্মৃতিকথা' ; ডি. এম লাইব্রেরি ১৩৬২ ব
২২. বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, 'যখন সম্পাদক ছিলাম' ; শশধর প্রকাশন, ১৯৯১।
২৩. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পত্রপত্রিকা' ; প্রজ্ঞাভারতী ১৩৯৪ ব।
২৪. 'ভারতকোষ' (পাঁচ খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
২৫. মুজঃফর আহমদ 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা' ; ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৬৯।
২৬. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সংকলিত 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত' ; ঢাকা ১৯৭৭।
২৭. যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' ; ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড, ১৩৬৩ ব।
২৮. যোগেশচন্দ্র বাগল, 'ভারতের মুক্তিসন্ধানী', ১৯৫৮।
২৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস', ৪র্থ খণ্ড ; জেনারেল, ১৩৭৩ ব।
৩০. 'রিপোর্ট অন দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ বেঙ্গল' ১৯৩০-৩১ · গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, ১৯৩২।
৩১. 'রিভলিউশনারি প্রেস প্রোপাগান্ডা ইন বেঙ্গল' ; হোম (পল) কনফিডেনসিয়াল ২৫৭ / ১৯২৫।
৩২. 'রিপোর্ট অন দ্য নেটিভ পেপারস অফ বেঙ্গল', ক. ১৯০৪ খ. ১৯০৬ গ. ১৯১৫ ঘ. ১৯২৩; গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল।
৩৩. 'রিপোর্ট অন দ্য নিউজপেপারস অ্যান্ড পিরিওডিক্যালস্ অফ বেঙ্গল', ক. ১৯৩০ খ. ১৯৩১ গ. ১৯৩২। প্রাগুক্ত।
৩৪. শিবদাস চক্রবর্তী, 'বিপিনচন্দ্র পাল : জীবন ও সাধনা' ; চলন্তিকা ১৩৮০ ব।
৩৫. শিবরাম চক্রবর্তী, 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা' ; নবপত্র সং, ১৪০১ ব।
৩৬. 'সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান' ; সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬ ; ২য় খণ্ড, ১৯৯৬।
৩৭. 'সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার : নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ' ; সত্যেন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা কমিটি, ১৯৮৪।
৩৮. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক. ইতিহাসের দিকে ফিরে : ছেচল্লিশের দাঙ্গা ; উৎস মানুষ ২য় সং, ১৯৯৩ ; খ. 'রণক্ষেত্র-রাজপথ' ; প্রগেসিভ পাবলিশিং ২০০২।
৩৯. সরোজ মুখোপাধ্যায় 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা', ২য় খণ্ড ; ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৮৬।
৪০. সুখেন্দুবিকাশ সেনগুপ্ত, 'দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত' ; কলকাতা ১৯৮৫।
৪১. সুধীরকুমার মিত্র, 'নয়া বাঙ্গলা', ১৯৪৮।
৪২. সুমিত সরকার, 'স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল' ; পিপিএইচ ১৯৭৭।
৪৩. হরিদাস মুখার্জি অ্যান্ড উমা মুখার্জি, ক. 'বন্দে মাতরম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশনাজিম' ; ফার্মা কে এল এম ১৯৫৭ খ. 'বিপিনচন্দ্র পাল অ্যান্ড ইন্ডিয়ান স্টাগল ফর স্বরাজ', ঐ ১৯৫৮ ; গ. 'শ্রী অরবিন্দ অ্যান্ড দ্য নিউ থট', ১৯৫৮।
৪৪. হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' ; ফার্মা কে এল এম ১৯৬১।
৪৫. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ক. 'দেশবন্ধু স্মৃতি' ; শ্রীগুরু লাইব্রেরি (২য় সং) ১৩৬৬ ব ; খ. 'ভারতের বিপ্লবকাহিনী', জ্যোতি প্রকাশনালয় ১৩৬৫ ব ; গ. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ', ভাবত সরকার, ১৯৭০।
৪৬. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (এইচ. পি. ঘোষ), 'প্রেস অ্যান্ড প্রেস লজ ইন ইন্ডিয়া', কলকাতা ১৯৩০।

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ বা রচনা :

১. নন্দলাল ভট্টাচার্য, 'সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত' ; লিপিকা, ১৪০৫ ব।

২. হেমেন বসু, 'সাংবাদিকতার কথা' ; পত্রভারতী ১৪০৫ ব।

৩. অচিন্ত্য চক্রবর্তী, 'সাংবাদিকতা যুগসন্ধিক্ষণে' ; সত্যযুগ ২০০২।

৪. উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য. 'আমার এলোমেলো জীবনের কয়েকটি অধ্যায়' ; মডার্ন বুক এজেন্সি. ১৩৬৯ ব।

৫. সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, 'ভাঙা পথের রাঙা ধূলায়' ; চতুরঙ্গ (পত্রিকা) বৈশাখ-আশ্বিন ১৪১১ ব।

৬. গীতা চট্টোপাধ্যায়. 'বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী' ২য় খণ্ড. ১৯৯৪।

যেসব পত্রিকা জাতীয় গ্রন্থাগারে দেখেছি (১৯০০-১৯৬০) :

অমৃতবাজার পত্রিকা ১৯০৮, ১৯১৪, ১৯১৫, ১৯২৩-২৪, ১৯২৮-২৯, ১৯৩০-৩৪, ১৯৪৩, ১৯৪৫-১৯৪৮, ১৯৫৩

আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯৪৯-৫০, ১৯৫৩-৫৪, ১৯৫৯

অ্যাডভান্স ১৯৩৩, ১৯৪৫ ; *জনসেবক* ১৯৫৫

ফরোয়ার্ড, ১৯২৮ ; *বেঙ্গলি*, ১৯০২-৩

মর্নিং নিউজ ১৯৪৬-৪৭

যুগান্তর ১৯৪৯-৫০, ১৯৫৩

লিবার্টি ১৯৩০

লোকসেবক ১৯৫০-৫১

স্বাধীনতা ১৯৫৪, ১৯৫৯

হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড ১৯৪০, ১৯৪৩, ১৯৪৫, ১৯৪৬-৪৭

(দ্য) স্টেট্‌সম্যান, ১৯৪৫-৪৭, ১৯৫০, ১৯৫৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

যাঁরা তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন : অরুণ ঘোষ, প্রবীণ গ্রন্থাগারিক এবং গবেষক ; ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, সাংবাদিক ও গবেষক ; গিরীশ মাইতি, গবেষক ; চণ্ডী লাহিড়ী, ব্যঙ্গচিত্র-শিল্পী ; জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংবাদিক ; নিরঞ্জন হালদার, প্রবীণ সাংবাদিক ; প্রীতি গুহমজুমদার, সাংবাদিক ; মলয়েন্দু দিন্দা, অধ্যাপক ; যতীশ সাহা, সাংবাাদিক, স্বপন বসু, অধ্যাপক এবং গবেষক ; রমাপ্রসাদ দত্ত, প্রাক্তন সাংবাদিক।

যে-সব প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি : জাতীয় গ্রন্থাগার ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ; রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ; রাজ্য মহাফেজখানা, রাইটার্স বিলডিংস (১৯৮৯ সালে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর আমাকে এখানে পুলিশি নথিপত্র দেখার অনুমতি দিয়েছিলেন ; তার জন্য তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই) ; আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রন্থাগার ; বসুমতী, সাহিত্য মন্দির ; সত্যযুগ এবং সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকা দপ্তর।

টীকা এবং সংযোজন

পত্রিকার প্রকাশকাল ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন রকম দেওয়া আছে ; ফলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের কখনও 'মতান্তরে', কখনও 'অথবা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে। *কৃষক* পত্রিকার প্রকাশকাল কেউ লিখেছেন : ১৯৩৮ ; কেউ : ১৯৩৯। বেশির ভাগ গ্রন্থেই *স্বাধীনতা* পত্রিকার প্রকাশকাল বলা হয়েছে : ১৯৪৬। কিন্তু আমরা সরোজ মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া সালটিই (১৯৪৫) প্রামাণ্য মনে করেছি। সবটা যাচাই করে নেওয়ার মতো কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র আমরা পাইনি। হেমেন বসুর গ্রন্থে যে-তালিকা দেওয়া আছে, তা লেখক নিজেই বলেছেন, সম্পূর্ণ নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গণমাধ্যম কেন্দ্র-প্রকাশিত বইটিতেও অনেক অসম্পূর্ণতা আছে। আমরা তা সাধ্যমতো পূরণ করার চেষ্টা করেছি। এরপরেও কিছু ভুলভ্রান্তি নিশ্চয়ই রয়ে গেল। তার জন্য পাঠকদের কাছে আর-একবার মার্জনা চাইছি।

দৈনিক বসুমতী এবং *সত্যযুগ* (প্রভাতী) পত্রিকার শেষ পর্ব বিষয়ে আরও বিশদ করে লেখা উচিত ছিল। আমরা তা করে উঠতে পারিনি। তবে প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তর উল্লিখিত রচনাটি থেকে জানতে পারি : ১৯৫৩ নাগাদ বসুমতী পত্রিকাটির প্রচারসংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে সম্পাদক-পদ থেকে অপসারিত করে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে আবার নিয়ে আসা হয় এবং এর ফলে একটি অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে। মালিকপক্ষের সঙ্গে সম্পাদকের মতান্তর, সম্পাদকের অপসারণ বা পদত্যাগ অবশ্য সংবাদপত্র-জগতে কোনো বিরল ঘটনা নয়। এক সময় *সার্ভেন্ট* পত্রিকার বেশ কয়েকজন কর্মী *ফরোয়ার্ড* পত্রিকায় চলে গিয়েছিলেন ; আবার *ফরোয়ার্ড* থেকে অপসারিত সম্পাদক পি. কে. চক্রবর্তী যোগ দিয়েছিলেন *অ্যাডভান্স*-এ।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কেন একসময় *আনন্দবাজার পত্রিকা* থেকে সরে আসেন, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় কেন *যুগান্তর* থেকে অপসারিত হন, *দৈনিক বসুমতী* এবং *সত্যযুগ* কেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়—তা নিয়ে কিছু কাহিনি আমরা শুনেছি : কিন্তু এই রচনায় সেইসব বিতর্কে আমরা প্রবেশ করতে চাইনি। সুখরঞ্জন সেনগুপ্তর লেখাটি থেকে আরও দু-একটি তথ্য পাই। *জনসেবক* পত্রিকার দপ্তর হরিতকী বাগান লেন থেকে স্থানান্তরিত হয়েছিল ২৭বি বিডন স্ট্রিটে। সেখান থেকে পরে অফিস উঠে যায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে। *ভারত* পত্রিকা কিছুদিনের জন্য সম্পাদনা করেছিলেন প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ভূমেন্দ্র গুহ-র 'জীবনানন্দ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং' (২০০১) গ্রন্থ থেকে জানতে পারি, *স্বরাজ* পত্রিকাটি ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল হুমায়ুন কবীরের উদ্যোগে, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে ; কার্যনির্বাহক সমিতিতে ছিলেন *পূর্বাশা* সাহিত্য-পত্রিকার অন্যতম পরিচালক সত্যপ্রসন্ন দত্ত। অফিস ছিল ক্রিক রো-তে। জীবনানন্দ দাশ ছিলেন রবিবারের পাতার সম্পাদক (পৃ. ৩১-৩২)।

আরও দু-একটি সংযোজন : উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যর উল্লিখিত গ্রন্থটি থেকে জানা যাচ্ছে *সার্ভেন্ট* প্রথম দিকে ২০০০ পর্যন্ত বিক্রি হত। ১৯২২ সালে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হওয়ার পর ওই পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (পৃ. ২৮৭, ২৯৯-৩০০)। *দৈনিক মাতৃভূমি* সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা সবই অচিন্ত্যকুমার

চক্রবর্তীর গ্রন্থ থেকে পাওয়া। তিনি ১৯৪৩ সালে ওই পত্রিকায় সাংবাদিক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। *দৈনিক বসুমতী* সম্পর্কে এইটুকু যোগ করার আছে--কলকাতা সংস্করণ বন্ধ হয়ে যাবার পর শিলিগুড়ি থেকে তা কিছুদিন প্রকাশিত হয়েছিল।

আনন্দগোপাল সেনগুপ্তর একটি রচনা ('চতুরঙ্গ', বৈশাখ-আশ্বিন, ১৪১১ ব) থেকে জানতে পারি, ফজলুল হকের *কৃষক* পত্রিকার স্বত্ব পরে কিনেছিলেন ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের হেমেন দত্ত। ১৯৪৬ সালে সমাজবাণী লিমিটেড নামে সমাজতন্ত্রীদের একটি সংগঠন ওই পত্রিকাটির পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। মুদ্রণযন্ত্রটি বাঁধা রাখা ছিল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের কাছে। ১৯৪৮ সালে ব্যাঙ্ক ফেল করায় পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

রচনাটি শেষ হয়ে যাবার পর একটি গ্রন্থের সন্ধান এল : বংশী মান্না লিখিত 'ভারতে সংবাদপত্রের ইতিহাস' (১৯৯৮) ; কিন্তু বইটি সংগ্রহ করতে না পারায় আমাদের প্রদত্ত তথ্যগুলি তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা সম্ভব হল না। অঞ্জন বেরা সম্পাদিত *দ্য নেশন* পত্রিকার যে-সংকলনটির কথা উল্লেখ করেছি, তা প্রকাশিত হয়েছে নেতাজী ইন্সটিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজ (২০০১) গবেষণা-প্রতিষ্ঠান থেকে। স্বল্পায়ু হলেও পত্রিকাটির গুরুত্ব ছিল। সম্পাদক শরৎচন্দ্র বসু এই সময় কংগ্রেস-বিরোধী অবস্থানে ছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তরকালের বাংলা দৈনিকপত্র এবং তার গতিপ্রকৃতি বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনা পাওয়া যাবে এই সংকলনেরই অন্য একটি রচনায়।

বি শ্ব ব ন্ধু ভ ট্টা চা র্য

বামপন্থী পত্রপত্রিকা : আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা

বামপন্থী পত্রপত্রিকা কথাটির তাৎপর্য একাধিক। যেদিন থেকে শ্রমজীবী মানুষের সুখদুঃখের কথা পত্রপত্রিকার পাতায় তুলে ধরা হতে লাগল সেদিন থেকেই এই ধারার সূচনা--এটাই প্রচলিত ধারণা। কিন্তু এই সিদ্ধান্তও মনে হয় আংশিক। এটা বলাই বোধ হয় যুক্তিসংগত হবে যে, যেসব পত্রিকা রুশবিপ্লব ও সাম্যবাদ-চর্চাকেই মূল বিষয় করেছিল সেগুলিই যথার্থ বামপন্থী পত্রিকা। সেখানে শ্রমজীবী মানুষের ওপর শোষণের চিত্র আঁকার পাশাপাশি সেই শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আহ্বানও জানানো হয়েছে, শ্রেণিসংগ্রাম এবং সমাজপরিবর্তনের ডাক দেওয়া হয়েছে তাদেব পাতায় পাতায়। তাই ১৯১৭-এর রুশবিপ্লবের আগে তাত্ত্বিক বিচারে উত্তীর্ণ বামপন্থী পত্রপত্রিকার সাক্ষাৎ পাওয়ার কথা নয়।

পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার কথাও আসে। ১৯২০-তে তাসখন্দে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রচেষ্টায় কয়েকজন প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীকে নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নামে একটি ক্ষুদ্র সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। তবে এটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই। ১৯২৫-এ কানপুরে মুজফফর আহমেদ, ঘাটে, ডাঙ্গে প্রভৃতির নেতৃত্বে যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা--সেটিই ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল ধারা হয়ে ওঠে। সৃষ্টিলগ্নে কমিউনিস্ট পার্টি তেমন শক্তিশালী ছিল না। কিন্তু ক্রমশ শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে তাদের প্রবল উপস্থিতি অনুভূত হতে থাকে। বিশের দশকের শেষদিকে রেল ও চটকলে কয়েকটি বড় বড় শ্রমিক ধর্মঘট হয়, বেশ কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতা বা নেত্রীকে এই ধরনের ধর্মঘটের পুরোভাগে দেখা যায়। জাতীয় স্তরে ট্রেড ইউনিযন আন্দোলনের পাশাপাশি কমিউনিস্টরা কৃষক আন্দোলন থেকে শুরু করে ছাত্রফ্রণ্ট এবং লেখক ও শিল্পী ফ্রন্ট গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা নেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও জার্মানিতে হিটলারের ক্ষমতা দখল এবং স্পেনে ফ্যাসিস্ট জেনারেল ফ্রাঙ্কোর গণতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান ও গৃহযুদ্ধ এদেশের বামপন্থীদেরও ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্যোগী করে। এই ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ফ্রন্টে বামপন্থীদের নেতৃত্বে এক ব্যাপকতর মঞ্চ তৈরি হয়। আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনাপর্বে কমিউনিস্টদের কাছে যা ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, ফ্যাসিস্ট জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার পর তাই জনযুদ্ধ হিসেবে ঘোষিত হল। ১৯৪৮-এ কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হবার আগে পর্যন্ত বামপন্থী পত্রপত্রিকাগুলিও এই ধরনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

সুতরাং বামপন্থী পত্রপত্রিকা হিসেবে সেগুলিকেই চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত যেগুলি প্রধানত এই ধরনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী ভাবধারা ও আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত।

১৮৭৪-এর মে মাসে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় *ভারত শ্রমজীবী* নামে যে পত্রিকা বের করেন তাতে এই জাতীয় বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, 'প্রিয়তম শ্রমজীবীগণ। বহুকাল হইতে তোমাদের দুঃখ আরম্ভ হইয়াছে, আজও তাহার শেষ হইল না! তোমাদের যে দুঃখ তাহা আর দূর হইল না' ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে আসল প্রতিকারের কোনো কথা নেই। কেবল বলা হয়েছে যে, 'তোমরা যদি লেখাপড়া শিখ, সহজেই তোমাদের দুঃখ ঘুচিবে, দেশের মঙ্গল হইবে।' আসলে তখন লেখকদের সামনে রুশ বিপ্লবের মতো কোনো উদাহরণ ছিল না, শ্রমিকশ্রেণি যে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে পারে তেমন বিশ্বাসও কারও ছিল না।

অবশ্য পটভূমিকা ক্রমশই তৈরি হচ্ছিল। বিশেষ করে চা-বাগান এবং চটকলের শ্রমিকদের ওপর বিদেশি মালিকদের অকথ্য অত্যাচার নিজেদের চোখে দেখে এসে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সে কাহিনি তুলে ধরছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রামকুমার বিদ্যারত্ন বা শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো প্রগতিশীল ব্রাহ্ম সংস্কারকেরা। এরা একদিকে যেমন শ্রমিকশ্রেণির প্রতি মালিকের নির্মম অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেন, অন্যদিকে তেমনি সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তাকেও স্বীকৃতি দেন। এঁদের মতামত যেসব পত্রিকায় প্রকাশিত হত তা প্রচলিত অর্থে বামপন্থী পত্রিকা নয়। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় আসাম থেকে বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে যে *সঞ্জীবনী* পত্রিকায় আসামের চা-কুলিদের বেদনার কাহিনি পাঠাতেন কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত সেই পত্রিকাটি ছিল জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক। প্রচণ্ড বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যে দ্বারকানাথ সংবাদ পাঠাতেন তা এই উদাহরণেই স্পষ্ট, 'আসামের কুলিঅত্যাচার লিখিতে গিয়া আপনার উপায়হীন সংবাদদাতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাদজালে জড়িত, চতুর্দিকে শত্রুবেষ্টিত। কেবল যে সাহেবরাই শত্রু এমন নয়, কোম্পানীর হাকিম, উকিল, মোক্তার, সরকার, কেরানী, গোমস্তা, সকলেই আমার উচ্ছেদ সাধনে তৎপর।' (*সঞ্জীবনী*, ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২) শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শুধু বিদেশি শাসকই নয়, স্বদেশিরাও যে জোট বেঁধেছিল সংবাদদাতার এই বক্তব্যেই সেই ঐতিহাসিক সত্যটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনে শ্রমজীবী মানুষের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের কথাও সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল। ১৯০৫-এর ২ সেপ্টেম্বর হাওড়ার বার্ন কোম্পানির ৩০০ কর্মচারী বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বিখ্যাত *প্রবাসী* পত্রিকায় বার্ন-এর ধর্মঘটী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর এক লেখায় আবেদন জানানো হয় (কথা বনাম কাজ, *প্রবাসী* আশ্বিন ১৩১২) *অমৃতবাজার পত্রিকা* (১৭ অক্টোবর ১৯০৫) আরও জানাচ্ছেন যে ১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর জাতীয় প্রতিবাদ দিবসে ১২টি চটকল, একটি চিনিকল সমেত সর্বমোট ৭০টি কারখানা শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে বন্ধ ছিল। তাছাড়া কলকাতার ১১ হাজার গাড়োয়ান সেদিন গোরু বা মোষের গাড়ি বের করেনি, ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলপথে সেদিন সফল ধর্মঘট হয়েছিল। লক্ষণীয়, যে আন্দোলন উপলক্ষে এই ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট, তা সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে এর তেমন সম্পর্ক নেই। তবে *প্রবাসী* পত্রিকায় বিবিধ প্রসঙ্গের অন্তর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'রাশিয়ায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আমাদের আনন্দ' শীর্ষক রচনাটি

বোধহয় রুশ বিপ্লবের উল্লেখ সম্বলিত প্রথম বাংলা প্রবন্ধ। অবশ্য অধ্যাপিকা শিপ্রা সরকার লক্ষ করেছেন যে, রামানন্দ যে বিপ্লবের কথা লিখেছেন তা বলশেভিক বিপ্লব নয়, তার আগের ধাপ অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি বিপ্লব। তবে রামানন্দ রুশ বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্যকে উপেক্ষা করেননি, 'পৃথিবীর কোথাও কোনও মানুষ মানুষ হইবার সুযোগ পাইলে আমাদের আনন্দ আপনা-আপনিই উথলিয়া উঠে।' বলা যেতে পারে, এই বক্তব্যে *প্রবাসী* বামপন্থী পত্রিকা হিসেবে চিহ্নিত হয়নি ঠিকই কিন্তু প্রকৃত বামপন্থী মতাদর্শ পত্রিকার পাতায় এই প্রথম ধরা পড়তে থাকে।

এরপর থেকে পত্রিকাগুলির প্রবন্ধের শিরোনাম পালটাতে থাকে, বিষয়বস্তুও পালটায়। বারেবারেই রুশবিপ্লব, সাম্যবাদ বা লেনিন প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হয়। কয়েকটি উদাহরণই এক্ষেত্রে যথেষ্ট ; বলশেভিজম্ ; রাশিয়ার বিপ্লব, লেনিন ও কমিউনিজ্ম, বাংলার বলশি' প্রভৃতি। এগুলির কোনোটিই প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু এই পটভূমিকাই প্রকৃত বামপন্থী পত্রপত্রিকার জন্ম দিতে থাকে। এর সঙ্গে যোগ হয় আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথমত, প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তী চরম অর্থনৈতিক মন্দা, মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারি এবং এরই প্রতিক্রিয়ায় ১৯১৮ ও ১৯১৯-এর সংঘবদ্ধ শ্রমিক ধর্মঘট। দ্বিতীয়ত, ১৯২০-এর ৩১ অক্টোবর বোম্বাইয়ে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রায় ১০৭টি ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। রেল, খনি, বন্দর, সুতাকল, চটকল, পরিবহন প্রভৃতি সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা তো বটেই, প্রেস-কর্মচারীদের মতো অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরাও অধিকার-আদায়ের লড়াইয়ে ট্রেড ইউনিয়নের ছাতার নিচে এসে একসঙ্গে দাঁড়ায়। তাই একদিকে শ্রমিক-আন্দোলন যেমন তীব্রতর হয় তেমনি তাদের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা। এরাই বামপন্থী পত্রিকার যথার্থ পূর্বসূরি।

এই পর্বের কোনো পত্রিকাই দীর্ঘায়ু হয়নি। বেশ কিছু পত্রিকা দুষ্প্রাপ্য ; 'ওইরকম সময়ে, কিছু আগেও, কয়েকটি স্বল্পস্থায়ী, এখন দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা বেরিয়েছিল ; সর্বহারা, দিনমজুর, চাষীমজুর, মার্কসবাদী (এটি ১৯৪৮-এর মার্কসবাদী নয়), মার্কসপন্থী, নয়া মজদুর ইত্যাদি।' (শিপ্রা সরকার, ভূমিকা, বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা) এগুলি সঙ্গত কারণেই আমাদেরও আলোচ্য নয়। তাছাড়া এই আলোচনায় ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার তুলনায় প্রতিনিধিস্থানীয় পত্রিকাগুলিকেই গুরুত্ব দিতে চাওয়া হয়েছে। আরও একটি জিনিস লক্ষণীয়। এদেশে বামপন্থী রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে তাল রেখেই বামপন্থী পত্রিকাগুলির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে, এমন কি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিতর্কের সূচনাও হয়েছে এই জাতীয় পত্রপত্রিকাতেই। এদের মধ্য দিয়েই বোধহয় রাজনীতি ও সাহিত্য একসূত্রে গ্রথিত হওয়া শুরু হয়।

সংহতি দিয়েই যাত্রা শুরু করা যাক। ঐতিহাসিকদেরও সেটাই মত ; 'শ্রমিকদের জীবন ও আন্দোলন নিয়ে বোম্বাইয়ে 'দি সোস্যালিস্ট' বা তখনকার মাদ্রাজে 'লেবার-কিশান-গেজেট' এবং বাংলাদেশে প্রথমে *সংহতি* তারপর *লাঙ্গল* ও শেষে *গণবাণী*।' (গৌতম চট্টোপাধ্যায়, মুখবন্ধ, সংহতি-লাঙ্গল-গণবাণী) *সংহতি* (১৯২৩) সম্পূর্ণরূপে শ্রমজীবী মানুষ পরিচালিত শ্রমজীবীদের পত্রিকা। তদানীন্তন কলকাতার বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক ও কম্পোজিটরদের

নিজেদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্যই এই পত্রিকার অবতারণা। এর মূল উদ্যোক্তা জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত নিজেই ছিলেন একজন কম্পোজিটার এবং প্রখ্যাত বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র জ্ঞানাঞ্জন পাল তাঁকে এ ব্যাপারে সহায়তা করেছিলেন।

পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার লেখাগুলির শিরোনাম এইরকম. 'শ্রমিক সংবাদ'; 'জামশেদপুর টাটা কোম্পানির কর্মচারীগণের মুখ বন্ধ', দ্বিতীয় সংখ্যার প্রথমেই রয়েছে 'আমরা কি চাই' শ্রমিক-সংবাদ-এ রয়েছে 'প্রতিবাদ', সংহতির জীবন. বাংলার চটকল, পঞ্চম সংখ্যায় সোসিয়ালিজ্‌ম, প্রিন্টার্সদের কথা. মেসিনম্যানের কথা প্রভৃতি। শ্রমজীবী সংক্রান্ত পূর্বের পত্রিকাগুলির তুলনায় এই প্রবন্ধগুলি অনেক বেশি যুক্তি ও তথ্যভিত্তিক, আবেগবর্জিত। প্রথম সংখ্যার 'নিবেদন'-অংশেই জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত কঠোর বাস্তবের দিকটি সম্পর্কে শ্রমিকদের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'আমরা যদি এক হই. উন্নত হই, দ্বেষশূন্য হইয়া ধনীর অবিচারকে অন্যায় বলিয়াই তাহার প্রতিকার করিতে বদ্ধপরিকর হই তাহা হইলেই একদিন ভগবানের কৃপায়-এ সমস্যার মীমাংসা হইবে।' কেউ যদি 'দ্বেষশূন্য' এবং 'ভগবানের কৃপায়' কথা দুটির মধ্যে গান্ধিবাদের প্রভাব লক্ষ করেন তবে তাঁকে দোষ দেওয়া যাবে না। অন্তত যথার্থ শ্রমজীবী জিতেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'নিবেদন' অংশে শ্রেণিসংগ্রামের কোনো আহ্বান নেই।

সংহতির একটি বড়ো প্রাপ্তি বোধহয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে থেকে পাওয়া 'সংহতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি (১৯২৩, জুন)। মনে হয় বিপিনচন্দ্র পালের অনুরোধেই প্রবন্ধটি লেখা। তিনিই পত্রিকাটির নামকরণ করেছিলেন। রাশিয়া যাত্রার প্রায় সাত বছর আগে লেখা এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজোড়া শ্রমিক আন্দোলন, অথবা শ্রমিক শ্রেণির ক্ষমতা দখলের ঐতিহাসিক পটভূমিটি বর্ণনা করে ভারতবর্ষেও ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিকরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখেছেন, 'পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষের ইতিহাসের যে চেষ্টা আজ দেখতে পাচ্ছি, ভারত তার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকলে বঞ্চিত হবে। নূতন শক্তির যে বিশ্বব্যাপী মন্দির তৈরি হচ্ছে, তার একটা সিংহদ্বার রচনার ভার ভারতকে নিতে হবে। সেই রচনার কাজ যে আরম্ভ হয়েছে সংহতি পত্রিকাখানি তারই চিহ্ন। প্রবন্ধের সূচনাতেই এই কারণে কবি বলে নিয়েছিলেন, '*সংহতি* পত্রিকার নাম সার্থক হোক এই আমি কামনা করি।'

আবার লেখকের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেই তাঁর প্রবন্ধ গতানুগতিক পথ ধরে চলে না. তাঁকে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার ভূমিকাতেও দেখা গেছে, 'ধনের রথযাত্রায় যে দড়িটা ধরে টান দিতে হচ্ছে সে দড়িটা সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে চলে গেছে। যারা টানছে তারা সকল দেশেরই মানুষ। এই দড়িটির ঐক্যেই তারা এক। তাই এই ঐক্যটাকে অবলম্বন করেই তারা সম্পূর্ণ আঁট বাঁধতে পারবে। যদি এই আঁট বাঁধা সম্পূর্ণ হয় তাহলে পৃথিবীতে একদিন একটা অতি প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হবে। এই দুঃসহ শক্তির প্রলোভনই সোভিয়েত সম্প্রদায়কে বিচলিত করেছিল। তারা তাড়াতাড়ি এইটাকে জাগ্রত এবং অধিকার করতে লোলুপ হয়ে উঠেছিল। এবং সকল লোলুপতারই যে লক্ষণ নিষ্ঠুরতা ও জবরদস্তি—তা সেখানেও দেখা দিয়েছিল।' রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশ থেকে এইসব উদ্ধৃতি দেওয়াটা অপ্রাসঙ্গিক নয়। এই একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি রবীন্দ্র রচনায় একাধিকবার শোনা গেছে। উদ্ধৃতির শেষাংশে তাঁর যে মতামত তা পরবর্তী কালে 'রাশিয়ার চিঠি'-তে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। আর যে প্রতীকী

রথযাত্রার দড়ির কথা এখানে বলা হল, প্রায় একই অর্থে তারও উল্লেখ 'রথের রশি' নাটকে আছে।

দেখা যাচ্ছে যে, এই সময়কার বামপন্থী পত্রপত্রিকাগুলির অনেকেই রবীন্দ্রনাথেব সস্নেহ প্রশ্রয় পেয়েছে। *সংহতি*-র প্রবন্ধের কথা আগেই বলা হল। *ধূমকেতু* বা *লাঙ্গল*-এর মতো পত্রিকায় পাঠানো তাঁর কবিতার স্তবকগুলিও নিছক আশীর্বাণী নয়। এদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য আছে। দুটি পত্রিকার সঙ্গেই নজরুলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রবীন্দ্রনাথের আনুকূল্যের একটা বড়ো কারণ হতে পারে। কিন্তু *ধূমকেতু*-তে পাঠানো কবিতার মধ্যে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার যে 'স্পষ্ট রাজনীতি', 'প্রত্যক্ষ গণজাগরণের সংকেত' খুঁজে পেয়েছিলেন তাও তো ভুল নয়। 'জাগিয়ে দে রে ডঙ্কা মেরে / আছে যারা অর্ধচেতন'—এই আহ্বান কিন্তু পূর্ববর্তী 'বলাকা'র যৌবন-বন্দনার থেকে আলাদা। ওটা ছিল ভাবগত আহ্বান, এটা প্রত্যক্ষ রাজনীতির। এই প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার, এই পত্রিকাতে প্রকাশিত কয়েকটি রাজদ্রোহমূলক কবিতা লেখার জন্য নজরুলকে জেল খাটতে হয়। এখানে প্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার থেকে সাম্যবাদী মনোভাবেরই প্রাধান্য দেখা গেছে। এই প্রসঙ্গেই *লাঙ্গল* পত্রিকার জন্য পাঠানো তাঁর দু-পংক্তি কবিতাটির কথাও স্মরণ করা যেতে পারে: 'ধর হাল বলরাম হান তব মরু ভাঙ্গা হল / জল দাও ফল দাও স্তব্ধ হোক ব্যর্থ কোলাহল।' *ধূমকেতু* বা *লাঙল*-এর পরিচালকেরা যে কবির রচনা দুটিকে নিয়মিত শিরোভূষণ করে রেখেছিলেন তাও তাৎপর্যহীন নয়। তাঁদের মনোভাবের প্রতিফলন তাঁরা এদের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ উঠে আসায় *সংহতি* থেকে একটু সরে আসতে হয়েছিল। এখানে তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কিত এমন কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল যা বামপন্থী মতাদর্শের পরিপূরক। এদের মধ্যে তখনকার অত্যন্ত পরিচিত শ্রমিক নেত্রী সন্তোষকুমারী গুপ্তার কয়েকটি রচনার উল্লেখ করতেই হয়। এই শ্রমিক-নেত্রী দেশবন্ধুর সহকর্মী ছিলেন। তিনি নিজে *শ্রমিক* নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনাও করতেন। এঁর লেখায় বিশেষ করে চটকল শ্রমিকদের দুর্দশার যে চিত্র ফুটে উঠছে তা আগে পাওয়া যায়নি। কেবল শোষণ ও অত্যাচারের কথা বলেই তিনি থামেন না, তিনি ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামেরও আহ্বান জানান; 'তাই বলিতেছি ভিক্ষা বা ক্রন্দনের দ্বারা ধনীর সহিত কোন সম্মানজনক ও স্থায়ী রফা হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং চাই বিরাট শক্তির সমাবেশ। শক্তিমানের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে হইলে নিজেদেরও শক্তিমান হইতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও আশা আছে—বিপদ ও দুর্দশা যখন কোন ব্যক্তিবিশেষের নহে, সমগ্র শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের, তখন দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অবস্থিত চটকল সমূহের সকল শ্রেণীর কর্মীবাই আমাদের আহ্বানে অবশ্যই সাড়া দিবেন।" (*সংহতি*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৩০)।

প্রধানত প্রেস কর্মচারীদের উদ্যোগেই *সংহতি* প্রকাশিত হয়েছিল বলে তাদের জীবন ও জীবিকার কথা এখানে কিছুটা প্রাধান্য পেয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেশজোড়া শ্রমিক-নিপীড়ন বা তাদের প্রতিরোধের বিষয়টিও পত্রিকার দৃষ্টি এড়ায়নি। চটকলের শ্রমিকদের দুর্দশা নিয়ে যেমন বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ আছে, তেমনি জামসেদপুরের টাটা কোম্পানির শ্রমিকদের ওপর কোম্পানির নানা বিধিনিষেধের কাহিনি আছে। একটি

প্রতিবেদনে জানা যায় যে, ১৯২৩-এর ১৩ এপ্রিল ওই ইস্পাত কারখানার মালিকেরা জামসেদপুর শহরের মাঠে ঘাটে এই ধরনের একটি নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছিল, 'এই মাঠ টাটা কোম্পানির। জামসেদপুর স্পোর্টিং এসোসিয়েশন বা ক্রীড়াসমিতির সম্পাদকের হুকুম ভিন্ন এখানে কোন খেলা হইতে পারিবে না। খেলা ছাড়া, অন্য কোনো কাজে শহর-কোতালের হুকুম না নিয়া জমি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।' এই ধরনের নোটিশ দেওয়ার পিছনের আসল উদ্দেশ্যটি পত্রিকায় চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল, 'জামসেদপুর সহরে প্রায় লক্ষাধিক লোক বাস করেন, টাটা কোম্পানির এই হুকুমের ফলে এক লক্ষ লোক, সকল সভ্য দেশের লোকের ইচ্ছামত সভাসমিতি করিবার যে অধিকার আছে, তাহা হইতে একেবারে বঞ্চিত হইবে।' যারা আজ টাটা কোম্পানির প্রশস্তিতে মুখর তাদের এই অতীত ইতিহাসটি জেনে রাখা ভালো। বর্তমান আলোকোজ্জ্বল জামসেদপুরের পিছনে অনেক অন্ধকার লুকিয়ে আছে।

সংহতি-র আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা বলে এই আলোচনা শেষ করব। যাকে যথার্থ গবেষণামূলক তথ্যভিত্তিক প্রবন্ধ বলে *সংহতি*-তে তারও নিয়মিত প্রকাশ ঘটেছে। ভারতবর্ষে রেলওয়ে বিস্তার, ভারতে ধর্মঘট, বাংলার শ্রমিকসংঘ-প্রভৃতি আধুনিক কালের গবেষকদের কাছেও মহা মূল্যবান উপাদান বলে গণ্য হবে। ডাঃ রমেশচন্দ্র রায়ের 'ভারতবর্ষে রেলওয়ে বিস্তার' প্রবন্ধটিতে সরকার ও দেশবাসীর উপকার ও অপকারের তুলনামূলক আলোচনা করে তথ্য সহকারে দেখানো হয়েছে যে, বেশিরভাগ লাভই বিদেশি শাসকদের, দেশবাসীর নয়। যারা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করেন তাঁরা জেনে খুশি হবেন যে, ১৯২৩ সালেই অবিভক্ত বাংলায় শ্রমিকদের অন্তত ৫০টি নিজস্ব সমিতি ছিল। ১৩৩০-এর ১ম বর্ষের সপ্তম সংখ্যার *সংহতি*-তে শ্রমজীবীদের অন্যতম মুখপত্র *মর্মবাণী*-তে প্রকাশিত একটি তালিকা পুনর্মুদ্রিত হয়। এতে 'বঙ্গীয় শিক্ষক সমিতি' থেকে শুরু করে 'জমাদার ও খানসামা সঙ্ঘ'-প্রভৃতির নাম আছে। বোঝাই যায় যে, জীবন ও জীবিকার সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবীদের জোট বাঁধার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হচ্ছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, এই জাতীয় পত্রিকার প্রায় কোনোটিই বেশিদিন টেকেনি, টেকার কথাও নয়। নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের পর যেন তারা ইতিহাসের পাতায় স্থান নিয়ে নেয়। *সংহতি*-র ক্ষেত্রেও একই কথা। পরবর্তী *লাঙল* ও *গণবাণী*-রও একই ইতিহাস। *লাঙল*-এর আয়ু ছিল কয়েক মাস, *গণবাণী*-র দু বছর। এর একটা কারণ বোধহয় এই যে, এদের কোনোটিই একটি বৃহৎ ও সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের মুখপত্র ছিল না। তা ছিল বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী কিছু নিষ্ঠাবান ও আত্মত্যাগী মানুষের প্রচেষ্টার ফসল। তাছাড়া অর্থাভাব, সরকারি নিপীড়ন তো ছিলই।

সম্ভবত সাপ্তাহিক *লাঙ্গল* (১৯২৬) প্রকাশের মাধ্যমেই বাংলাদেশে প্রকৃত অর্থে বামপন্থী মতাদর্শের পত্রিকার সূচনা হল। পত্রিকার সঙ্গে নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ যোগাযোগও বোধ হয় এখান থেকেই। এর আগেই ১৯২৫-এ কানপুরে প্রথম যুগের কমিউনিস্ট ও সমাজবাদীরা একত্র হয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পত্তন করেন। ওই সম্মেলন থেকেই মুজফ্ফর আহমদকে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়বার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের শ্রমিক ও কৃষক নেতারা মিলে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেই কাজ চালিয়ে যাবার জন্য শ্রমিক-কৃষক-স্বরাজ দল গড়ে তুলেছিলেন। তাদের মুখপত্র হল *সাপ্তাহিক লাঙ্গল* পত্রিকা। পত্রিকাটি প্রথম সংখ্যা থেকেই তার মনোভাব গোপন করেনি। এখানে কানপুরে অনুষ্ঠিত ভারতের

প্রথম কমিউনিস্ট কনফারেন্সের গঠননীতিটি সম্পূর্ণ ছাপিয়ে দেওয়া হয়। ৩৭ নং হ্যারিসন রোড থেকে মুজফ্ফর আহমদ স্বাক্ষরিত 'কমিউনিস্ট পার্টি গঠন' সম্পর্কিত এক আবেদনে বলা হয়, 'বাংলায় যাঁরা কমিউনিস্ট আছেন, তাঁরা সমবেত হয়ে পার্টি গঠন করুন, এই সর্নির্বন্ধ অনুরোধ আমি তাঁদেরকে জানাচ্ছি। কমিউনিস্ট হতে বলা এদেশের আইন অনুসারে অপরাধ নয়। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন সম্বন্ধে কতদূর কি করতে রাজী আছেন, তা আমায় জানালে আমি বড় বাধিত হব।'

অন্তত আর দুটি প্রবন্ধের উল্লেখ না করলে *লাঙ্গল*-এর সঙ্গে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য স্পষ্ট হবে না। একটি হল 'কার্ল মার্কসের শিক্ষা' (কুতুবউদ্দিন আহমদ) ও অপরটি 'শ্রেণী সংগ্রাম' (মুজফ্ফর আহমদ)। কুতুবুদ্দিনের প্রবন্ধ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিশ্লেষণ, আর মুজফ্ফর শ্রেণি-সংগ্রামের তত্ত্বটিকে এইভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন সহজ ভাষায়, 'শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম--স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত, সোস্যালিস্ট বা কমিউনিস্টদের দ্বারা সৃষ্টি হয় নি। সমাজের অসম গঠনের জন্য এ যুদ্ধ আপনা হতেই বেধে বসে আছে।' স্পষ্ট ভাষায় বলিষ্ঠ রাজনৈতিক বক্তব্য প্রবন্ধে প্রকাশই ছিল তাঁর কাম্য। তাই তাঁর একান্ত সুহৃদ নজরুল ইসলামকেও *ধূমকেতু*-তে আবেগবহুল লেখার জন্য কটাক্ষ করতে তিনি ছাড়েননি। 'দ্বৈপায়ন' ছদ্মনামে *ধূমকেতু*-র (১৯২২) সম্পাদককে (চিঠিতে তাকে 'সারথী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে কারণ, 'ধূমকেতু'-তে সম্পাদকের নাম থাকত না। থাকত 'সারথী' শব্দটি।) তিনি সরাসরি প্রশ্ন করেন, 'কৃষক ও শ্রমিকের কথা কখনও ভেবেছ কি? একটা কথা সোজা তোমায় বলে দিচ্ছি। যদি ওদের কথা ভাবতে না শেখ তাহলে তোমাকে দিয়ে দেশের কোনও সেবাই হবে না, প্রাণ দিলেও না।' এই শ্লেষের মধ্যেই পরিষ্কার কেন *ধূমকেতু*-কে বামপন্থী পত্রিকা বলা হয়নি, কেনই বা *সংহতি* বা *লাঙ্গল*-এর মাধ্যমেই তার প্রকৃত সূচনা। এদের আর একটি অবদানের কথাও স্বীকার করা উচিত। *সংহতি*-*লাঙ্গল* বা *গণবাণী*-র মতো পত্রিকার মাধ্যমেই বাংলা সাংবাদিকতার ভাষা অনেক সহজ ও সরল হয়ে যায়। এই কারণেই তাদের গদ্য পাঠকদের আকৃষ্ট করত।

কেবল বিদেশি শাসক বা মালিক পক্ষই নয়, সাম্যবাদীদের এই সময়ে আর এক শত্রুর মোকাবিলা করতে হচ্ছিল। শত্রুটি হল সাম্প্রদায়িকতা। মুজফ্ফর আহ্মদ-এর 'কোথায় প্রতিকার'? (*লাঙ্গল*, ২৮ জানুয়ারি ১৯২৬) প্রবন্ধটি পড়লেই বোঝা যায় যে, সমস্যাটি কতটা তীব্র হয়ে উঠেছিল। তিনি লক্ষ করেছিলেন, 'ভয়ানক ঝড় আরম্ভ হওয়ার পূর্বক্ষণে আকাশ যেরূপ ভাব ধারণ করে থাকে, আজ সমগ্র ভারতবর্ষ ঠিক সেইরূপ ভাবই ধারণ করে আছে।' এব প্রতিকার সম্পর্কেও তাঁর মতামত সুস্পষ্ট, 'একটি মাত্র জিনিস--কম্যুনিজম্--আজ ভারতবর্ষকে ধ্বংস হতে রক্ষা করতে পারে। কম্যুনিস্টরা মনুষ্যত্বটাকে বড় বলে মানে, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় তারা একেবারেই দেয় না।' এই বলিষ্ঠ আশাবাদ কতটা সফল হয়েছিল, কমিউনিজম-এর প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে ভেঙে যাওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য বা পূর্ব ইউরোপের কোথাও কোথাও সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধান আদপেই হয়েছিল কি না এখানে সে আলোচনার অবকাশ নেই। কিন্তু একথাও ঠিক এই বিশ্বাসটুকুকেই বামপন্থীরা চিরকাল আঁকড়ে ধরে থেকেছেন। *লাঙ্গল*-এর বদলে 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের' নতুন মুখপত্র হিসেবে *গণবাণী* (১৯২৬) যখন প্রকাশিত হতে লাগল তখন তার পৃষ্ঠাতেও সাম্প্রদায়িক বিভেদ সম্পর্কে সতর্কবাণী।

গণবাণী-র ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় (২৬ আগস্ট ১৯২৬) নজরুল ইসলামের বিখ্যাত লেখা 'মন্দির ও মসজিদ' প্রকাশিত হল। এটি গতানুগতিক প্রবন্ধ নয়, নজরুলের অসাধারণ আবেগধর্মী গদ্যে রচিত এই রচনাটি যেন তাঁর হৃদয়ের মর্মভেদী উচ্চারণ। তাঁর 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'মানুষ' কবিতটির সঙ্গে এর কেবল বক্তব্যেরই নয়, ভাষারও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিল। 'মন্দির-মসজিদ' অবশ্যই এখানে দুই ধর্মের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত। দুই ধর্মের মানুষের মারামারি প্রকৃতপক্ষে ধর্মের নামে অধর্মচারী মানুষের স্বার্থরক্ষার সংগ্রাম। 'মানুষ' কবিতায় কবিকণ্ঠে একই আক্ষেপ শোনা গিয়েছিল, 'হায়রে ভজনালয়, তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়'। আলোচ্য প্রবন্ধেরও এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'মানুষের কল্যাণের জন্য ঐ সব ভজনালয়ের সৃষ্টি, ভজনালয়ের মঙ্গলের জন্য মানুষ সৃষ্ট হয় নাই।' প্রতিকারের পথ খুঁজতে গিয়ে মুজফ্‌ফর আহমদ রাজনীতিকের ভাষা ব্যবহার করেছিলেন আর নজরুল ব্যবহার করলেন কবির ভাষা, 'সেই রুদ্র আসিতেছেন, যিনি ধর্ম-মাতালদের আড্ডা ঐ মন্দির মসজিদ গির্জা ভাঙিয়া সকল মানুষকে এক আকাশের তলে লইয়া আসিবেন।' একই বিষয় নিয়ে *গণবাণী*-তে (২ সেপ্টেম্বর ১৯২৬) নজরুলের আর একটি প্রবন্ধ 'হিন্দু-মুসলমান'; বোঝা-ই যায় যে, *লাঙল-গণবাণী* পর্বে বামপন্থী আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলার কথাও গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হচ্ছিল।

এই ভাবনাটি অকারণ ছিল না। প্রধানত গোটা ১৯২৬ সালটি জুড়েই বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা হয়। ঐতিহাসিক জানাচ্ছেন, '১৯২৫-এ সবশুদ্ধ ষোল ও ১৯২৬-এ ২৫টি দাঙ্গা হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ দাঙ্গা বাধে কলকাতায়। মসজিদের সামনে আর্যসমাজী শোভাযাত্রা কালে বাদ্যভাণ্ড ২ থেকে ১৫ এপ্রিলের দাঙ্গার তাৎক্ষণিক কারণ। *মোহাম্মদী*-র মাধ্যমে ফজলুল হকের সাম্প্রদায়িকতা প্রচার যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী দারোয়ান ও জমাদারদের ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে মালব্যের ডাক। সুরাবর্দির পাঠানো গুণ্ডা আল্লাবক্স পেশওয়ারি ১৫ জুলাই-এর দাঙ্গা বাধায়। কলকাতা ডকে আবার দাঙ্গা হয় সেপ্টেম্বরে। দাঙ্গা পরে মফঃস্বলে ছড়িয়ে পড়ে।' (অমলেশ ত্রিপাঠী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস*, পৃ. ১৩২-৩৩) শ্রেণিসংগ্রাম যাঁদের আদর্শ তাঁদের চোখের সামনে যদি ধর্মের নামে রক্তাক্ত হানাহানি ঘটতে থাকে তবে তাঁদের বিচলিত বোধ করা স্বাভাবিক। *লাঙ্গল-গণবাণী*-র গোটা ১৯২৬ সাল জুড়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার এটাই ঐতিহাসিক তাৎপর্য। এছাড়া *গণবাণী*-র আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। এখানে একদিকে যেমন তাত্ত্বিক রচনার প্রাধান্য অপরদিকে তত্ত্ব প্রয়োগের নানা নির্দেশও আছে। পাশাপাশি *গণবাণী*-র অনেক লেখায় সাহিত্যও উঁকি মারে। নজরুলের কথা আগেই বলা হয়েছে। কথাসাহিত্যিক জগদীশ গুপ্তের 'সতী কাহিনী' অথবা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গাও আলোকের জয়গান'-এ সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্যকে কবিতার মোড়কে পরিবেশন করা হয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে হেমন্তকুমার সরকারের 'দুধ ও তামাক'-এর মতো স্যাটায়ারধর্মী রচনা। 'উচিত বক্তা' ছদ্মনামে রচিত 'আড়াই জনের রাজনীতি' নামক প্রবন্ধটিও প্রথম শ্রেণির স্যাটায়ার। দুটিতেই সমকালীন কংগ্রেসী রাজনীতির বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষের উপস্থিতি। প্রথমটিতে কংগ্রেসের জমিদার-তোষণ নীতির নিন্দা করে বলা হয়েছে, 'ধামাচাপার পলিসি' চলিবে না—দুকূল বজায় রাখিয়া কাজ চালাইতে পারিলে ভাবনা ছিল না। কিন্তু এখন

প্রকৃত জাতীয় আন্দোলনের নেতাগণকে অধিকাংশের স্বার্থের দিকেই চলিতে হইবে--আপোষের পথ নাই।" এই প্রবন্ধে যেমন কৃষক-স্বার্থ অবহেলিত হবার জন্য জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বকে কটাক্ষ করা হয়েছে, 'আড়াইজনের রাজনীতি' প্রবন্ধে তেমনি তাদের শ্রমিকস্বার্থ বিরোধিতাকে শ্লেষবিদ্ধ বলা হয়েছে, 'শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন বলিয়া ভারতের বর্তমান নেতাগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা চান শতকরা আড়াই জনের তাঁবেদারী করিয়া নাবালক শ্রমজীবীরা ক্রমশ রাজনৈতিক অধিকারের যোগ্যতা অর্জন করিবে।' বস্তুত এই পর্ব থেকেই তাত্ত্বিক দিক দিয়ে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বামপন্থী পত্রপত্রিকায় আক্রান্ত হতে থাকে। সমালোচনার মূল বিষয়ই ছিল শ্রমিক ও কৃষক স্বার্থের প্রতি এদের ক্রমাগত অবহেলা। মনে হয় বামপন্থী পত্রপত্রিকায় জাতীয় নেতৃত্বের কঠোর সমালোচনাও এই পর্ব থেকে। তবে উভয়ের পথ তখনও সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়নি। কংগ্রেসের প্ল্যাটফর্মেই কমিউনিস্টরা তখনও কাজ করছিল। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখাটা বোধ হয় অবান্তর হবে না। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকাগুলিতে শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ দুর্দশা, আন্দোলন, রুশ বিপ্লব বা লেনিনের জীবনী বা আদর্শ-সম্পূর্ণ উদার ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে চিত্রিত হচ্ছিল। কোনো শ্রেণিসংগ্রাম বা রক্তাক্তবিপ্লবের কথা তাঁরা বলেননি, কারণ সেটা তাঁদের বিশ্বাসও ছিল না। তথাপি উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিতে তাঁরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করেছিলেন। কিন্তু বামপন্থী পত্রপত্রিকাগুলি থেকে ক্রমশ সেই সহনশীলতা বা উদারনৈতিকতা অদৃশ্য। কেবল শ্রেণিগত আক্রমণই নয়, রাজনৈতিক বিরোধিতা যে ব্যক্তিগত-বিরোধিতাতেও পরিণত হয়েছিল এমন নিদর্শনের অভাব নেই। উপরোক্ত 'আড়াইজনের রাজনীতি' শীর্ষক স্যাটায়ারটি এর অন্যতম নিদর্শন।

বামপন্থী পত্রিকাগুলি বামপন্থী সাহিত্য সৃষ্টিতেও অন্যতম প্রেরণাদাতা। এমনকি, যে সমস্ত পত্রিকার বামপন্থী পরিচিতি ছিল না, সেখানেও বামপন্থী মতবাদের রচনা সাগ্রহে গৃহীত হয়েছে। নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল *সওগাত* পত্রিকায় (১৯২৬-২৭)। *সওগাত* বামপন্থী ছিল না কিন্তু বোধ হয় যুগের প্রভাবেই তাঁরা নজরুলের যে উপন্যাসটি ছাপিয়েছিলেন যার নায়ক আনসার শ্রমজীবী মানুষের অবিসম্বাদী নেতা, যাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবার মুহূর্তে সে সমবেত জনতাকে সম্বোধন করে যে বক্তৃতা দেয়, তাতেই তার অর্থাৎ স্বয়ং লেখকের রাজনৈতিক মতামত স্পষ্ট। আনসার সেখানে শ্রমিক-কৃষকের মিলিত প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছে। এই লেখা যে কোনো পরিচিত বামপন্থী পত্রিকাতেই প্রকাশিত হবার কথা। মনে হয় নজরুল তখন কৃষ্ণনগরের অধিবাসী বলেই বোধ হয় যোগাযোগ হয়নি। উপন্যাসের নায়ক আনসারের রাজনৈতিক কার্যকলাপও কিন্তু কৃষ্ণনগরকে কেন্দ্র করেই। বামপন্থী কবিতা তো আগেই এসে গিয়েছিল বোধ হয় 'মৃত্যুক্ষুধা' এই মতাদর্শের কথাসাহিত্যেরও সূচনা করল।

এই প্রসঙ্গে প্রথম পর্যায়ের *অগ্রণী* পত্রিকাটির কথা বলে নেওয়া দরকার। ১৯৩৯-এর জানুয়ারিতে প্রথম প্রকাশিত এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন প্রফুল্ল রায়। *অগ্রণী*-ই প্রথম নিজেকে 'বামপন্থী মাসিক পত্রিকা' হিসেবে ঘোষণা করে। মনে রাখা প্রয়োজন *পরিচয়* কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে এসেছিল ১৯৪৩-এর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। তাই ১৯৩৯-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৪০-এর জুন--এই দেড় বছর বামপন্থী চিন্তাধারার বিকাশে *অগ্রণী*-র

ভূমিকা রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা সরোজ মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীতে *অগ্রণী*-র ভূমিকার ঐতিহাসিক স্বীকৃতি আছে, '১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ১৯৪০ সালের জুন মাস পর্যন্ত প্রগতি সাহিত্যের ক্ষেত্রে *অগ্রণী* পত্রিকার ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়।' (*ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা*)। শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার সংঘাতের চিত্র *অগ্রণী*-র পৃষ্ঠাতে যেভাবে ফুটে উঠেছিল এর আগে তা দেখা গেছে বলে মনে হয় না। সেই বিবরণী দেবার আগে *অগ্রণী*-র আর একটি অবদানের কথাও জানানো দরকার। বিশ্ব বিশ্বাস-এর 'মজদুর' নামক এক উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে (১৯৩৯-৪০) এখানে প্রকাশিত হয়েছিল। এর বিষয় চটকলের শ্রমিকদের দাবি আদায়ের জন্য লাগাতার ধর্মঘট আর সমস্ত চক্রান্তকে উপেক্ষা করে মজুর-ফৌজ-এর বস্তিতে বস্তিতে উপবাসী শ্রমিকদের রিলিফের আয়োজন। শিল্পমূল্যের বিচারে এই উপন্যাস মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু নিছক শ্রমিক ধর্মঘটকে বিষয় করে রচিত এই উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশ পত্রিকাটির স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। *সংহতি* পর্বে সন্তোষকুমারী গুপ্তারা চটকলের শ্রমিকদের নিদারুণ দুর্দশার কাহিনিকে প্রচারপুস্তিকা বা প্রবন্ধের বিষয় করেছিলেন। *অগ্রণী* পর্বে তা উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠল। বোঝা যায়, সময় দ্রুত পালটাচ্ছিল।

সময় কতটা পালটে গিয়েছিল তা *অগ্রণী*-র কয়েকটি সংখ্যার কয়েকটি বিশেষ রচনার দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট নেতা এবং বুদ্ধিজীবীরা *অগ্রণী*-র নিয়মিত লেখক। কিন্তু লেখাগুলি একতরফা নয়। বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য লক্ষ করবার মতো। চিন্মোহন সেহানবীশ-এর 'মজুরি ও মুনাফা', সরোজ মুখোপাধ্যায়ের 'ইউনিয়ন জিনিসটা কি', সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর 'ফ্যাসিজম্ ও বুদ্ধিদ্রোহ', বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ছাত্র আন্দোলনের ভবিষ্যৎ' বা ভবানী সেনের 'বিকৃত মার্কসবাদ'—প্রভৃতি রচনা দার্শনিক ও তাত্ত্বিক রচনার উজ্জ্বল উদাহরণ। আবার এরই পাশাপাশি সরোজ দত্তের 'ছিন্ন করো ছদ্মবেশ', 'মধ্যবিত্তের বিপ্লব-বিলাস', অথবা 'অতি আধুনিক বাংলা কবিতা'র উপর দু সংখ্যা জুড়ে (এপ্রিল-১৯৪০-মে ১৯৪০) সরোজ দত্ত ও সমর সেনের তীব্র বাদ প্রতিবাদ এসব কিছুই *অগ্রণী*-কে যেন আলাদা মাত্রা দেয়।

১৯৩৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতার প্রগতিলেখকসংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে বুদ্ধদেব বসু 'Bengali Literature To-day : Position of Modern Writers' নামে যে প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন সেটি সরোজকুমার দত্তের আক্রমণের লক্ষ্য (ছিন্ন করো ছদ্মবেশ) হয়েছিল, কারণ সেখানে তিনি বুদ্ধদেবের 'ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব' লক্ষ করেছেন। আর ওই একই অধিবেশনে সমর সেনের 'In defence of decadents' নামক পঠিত প্রবন্ধ সম্পর্কে সরোজকুমার দত্তের শ্লেষাত্মক মন্তব্য বিখ্যাত হয়ে আছে, 'ইন্টেলেক্টুয়ালী কুসংসর্গ হইতে সাম্যবাদের সাবধান হইবার দিন আসিয়াছে।' আর এর জবাবে সমর সেনও ছেড়ে কথা বলেন নি, তিনি তাঁর আলোচনা শেষ করেছিলেন এইভাবে, 'বর্তমানে ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং নিষ্ফল আক্রোশ Marxist সমালোচনার নামে যদি চলে তাহলে বিস্মিত হওয়াটা মানসিক বিলাস, কারণ বাংলাদেশের আজ যে অবস্থা তাতে অগ্রগামী ব্লক রাতারাতি গুণ্ডা ব্লকে পরিণত হলেও বাহবা পায়। যে গালিগালাজ, যে উগ্র বামপন্থা আজ সাম্যবাদের নামে সমালোচনা-সাহিত্যে আস্ফালনরত সেটা পূর্বতন বাঙালী সন্ত্রাসবাদের দায়ভাগ।' *অগ্রণী*-র পৃষ্ঠায় এই বিতর্কের মাধ্যমেই যে মার্কসীয় সাহিত্য-বিতর্কের যথার্থ সূচনা ধনঞ্জয়

দাশের এই সিদ্ধান্ত (ভূমিকা, *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক*) হয়তো উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। তবে একটা কথা অবশ্যই সত্যি। প্রথম পর্বের বামপন্থী পাত্রিকাগুলির মূল আক্রমণের লক্ষ্য ছিল বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি, *অগ্রণী*-তে তার সঙ্গে যোগ হল শিল্পসাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একই শিবিরের মতাদর্শগত বিরোধ। বলা যেতে পারে যে এটি পরবর্তীকালের অন্তর্বিরোধেরও সূচনা। প্রথম পর্যায়ে মাত্র দেড় বছরের আয়ুতে (জানুয়ারি ১৯৩৯ থেকে জুন ১৯৪০) *অগ্রণী* কেবল মার্কসীয় তত্ত্বের আলোচনাতেই জোর দেয়নি, সে শিল্প সাহিত্য সৃষ্টির বিকাশও ঘটিয়ে চলেছিল। তাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বেশ কিছু কবিতার পাশাপাশি সুবোধ ঘোষের 'ফসিল'-এর মতো গল্প ছেপে *অগ্রণী* তার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেয়। দীর্ঘকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবার পর ১৯৪৮-এর প্রথমার্ধে প্রফুল্ল রায় ও স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় *অগ্রণী* আবার প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এই *অগ্রণী* যতটা সাহিত্য পত্রিকা ততটা তাত্ত্বিক মুখপত্র ছিল না। তবে কেবল বলা চলে সমসাময়িক প্রগতি শিবিরের তরুণ সাহিত্যিকেরা এই *অগ্রণী*-তেও ভিড় জমিয়েছিলেন।

অগ্রণী বন্ধ হয়ে যাবার পর প্রগতি সাহিত্য শিবিরের এই ধারাটি অব্যাহত রাখার দায়িত্ব যেন কিছুটা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত *অরণি* পত্রিকার ওপর এসে যায় (২২ আগস্ট ১৯৪১) *অরণি* রাজনীতি ও সংস্কৃতিমূলক 'সাপ্তাহিক' বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিল। পাঠকরা লক্ষ করবেন যে, *অগ্রণী* থেকেই বামপন্থী পত্রপত্রিকাগুলির সঙ্গে 'সংস্কৃতি' শব্দটি যুক্ত হচ্ছে। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে পত্রিকাগুলি প্রথম শ্রেণির সৃজনধর্মী সাহিত্যের প্রতিনিধিও হয়ে উঠছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ সংকটলগ্নে *অরণি*-র আবির্ভাব। ফ্যাসিস্ট হিটলারবাহিনী অতর্কিতে ১৯৪১-এর ২২ জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে। সভ্যতার এই চরম দুর্দিনে ফ্যাসিস্টবিরোধী শক্তি একতাবদ্ধ হবার প্রয়াস পায়। শুধু রাজনীতিবিদদেরই নয় শিল্পী সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি-কর্মীরাও ফ্যাসিবাদের ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে পড়েন, আন্তর্জাতিক স্তরে ১৯৩৫-এর ২১ জুন প্যারিসে শিল্পী-সাহিত্যিক ও বিবেকবান মানুষের এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষেও ১৯৩৬-এর ১০ এপ্রিল গঠিত হয় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ। গোর্কির মৃত্যুর পর কলকাতায় অ্যালবার্ট হলে (১৯৩৬, ১১ জুলাই) যে শোকসভা হয় তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘেরও অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার পর সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারেরই সভাপতিত্বে কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক সভা থেকে গঠিত হয় সোভিয়েত সুহৃৎ সমিতি। *অরণি* পত্রিকা সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে তার আবির্ভাবকাল ও সম্পাদকের এই রাজনৈতিক ভূমিকাকে যথোচিত গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ পত্রিকাটি প্রকাশের পিছনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও ছিল।

প্রথম সংখ্যা-র প্রথম সম্পাদকীয়তে রবীন্দ্রনাথের সদ্য মহাপ্রয়াণের কথা স্মরণ করে *প্রান্তিক*-এর বিখ্যাত কবিতাটি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, '...ডাক দিয়ে যাই / দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তারে / প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে। হে কবিগুরু, তোমার এই সর্ব্বশেষ আশ্বাস সম্বল করিয়া আমরা পূর্ব্ব দিগন্তের পানে চাহিয়া আছি।' এখানে 'দানব' ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে পূর্বরণাঙ্গনে সংগ্রামরত সোভিয়েত বাহিনীর বিজয় বাসনাই প্রতিধ্বনিত। *অরণি*-র শিল্প সাহিত্য ভাবনার মধ্যেও এই সম্পাদকীয় যে প্রভাব ফেলবে তা স্বাভাবিক।

তাই 'সাময়িকী'-তেও স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হল, *'অরণি* কোন সম্প্রদায়, শ্রেণী বা দলের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া চলিবে না। যদি সে কখনও কোনও পক্ষপাত প্রদর্শন করে, তবে করিবে দরিদ্র, তৎপীড়িত অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি।' বোঝা যায়, ফ্যাসিবিরোধী লেখক ফ্রন্টের ব্যাপক ঐক্যের কথা রচয়িতার মাথায় রয়েছে। এই ধরনের কমিটমেন্ট যেখানে, সেখানে কমিটেড লেখকদেরই প্রয়োজন। *অরণি*-কে ঘিরে তাই একদল কমিটেড লেখকই তৈরি হয়েছিলেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকমাত্রেরই চোখে পড়বে, *অগ্রণী* বা *অরণি*-তে মোটামুটি একই গোষ্ঠীর লেখকের সমাবেশ। একই কারণে তারা ছিলেন *পরিচয়*-এরও প্রধান লেখক। বস্তুত তখন জাতীয়তাবাদী এবং বামপন্থী--এই দুভাগে বাংলার সাহিত্য শিবির বিভক্ত। তারাশঙ্কর, সুবোধ ঘোষ, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র বা সজনীকান্ত দাসেরা অবশ্যই বামপন্থী ছিলেন না। কিন্তু ইতিহাসের তাগিদে এরা সবাই ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের কার্যকলাপে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন, আর তারাশঙ্কর তো ছিলেন এর অবিসম্বাদী নেতা। পরবর্তীকালে কাদের অসহিষ্ণুতায় শিবির বিভাজন সম্পূর্ণ হল তা এই প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। যেটা বলবার কথা সেটা হল, জাতীয়তাবাদী শিবিরে প্রতিষ্ঠিত প্রবীণদের প্রাধান্য থাকলেও সেখানে তারুণ্যের অনুপ্রবেশ নেই। এখান থেকেই সাহিত্যের মূলধারা অন্তত বেশ কিছুদিনের জন্য বামপন্থী ধারা হয়ে উঠল। বামপন্থী পত্র-পত্রিকাই হয়ে উঠল নবীন প্রজন্মের বার্তাবহ। এখানে যারা হাত পাকালেন স্বাধীনতা-পরবর্তী বেশ কয়েক বৎসর সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁরাই রাজত্ব করেছিলেন।

অরণি সংক্রান্ত আলোচনা শেষ করার আগে তার আর একটি বৈশিষ্ট্যর কথা বলা দরকার। শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতির ক্ষেত্রে বামমার্গী হলেও *অরণি* কিছুটা সমন্বয়পন্থী ছিল। তাই 'কংগ্রেস সাহিত্য-সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাকে স্বাগত জানিয়ে *অরণি* লিখেছিল, বাঙলা দেশে সম্প্রতি যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের' জন্মলাভ। ...'সাহিত্য' শব্দকে যাঁরা 'প্রগতি' বা ফ্যাসিস্ত বিরোধী' বিশেষণে চিহ্নিত দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন, আজ তাদের অনেকেই 'কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘে' যোগ দিয়ে দেরী হলেও বিপক্ষেরই অভিমত প্রতিষ্ঠিত করলেন।' প্রগতি সাহিত্য সঙ্ঘ বা ফ্যাসিস্ট বিরোধী শিল্পী সংঘকে কেন্দ্র করে শিল্পী-সাহিত্যিকদের একটি ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট তৈরি হয়েছিল—এটা যেমন ঠিক, তেমনি এটাও ঠিক যে অনেকেই এর সমস্ত মতামত সমর্থন করেননি। *অরণি*-র এই বক্তব্যে ওই বিরোধিতারও স্বীকৃতি আছে। তাছাড়া *অরণি*-র পাতায় আরও একটি জিনিস ঘটছিল। কমিউনিস্ট পার্টির সমকালীন রাজনীতির সমর্থনে কিছু কিছু তাত্ত্বিক প্রবন্ধ নেতাদের কলমে প্রকাশিত হচ্ছিল অপরদিকে সৃজনশীল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কিছু নিদর্শনও এখানে পাওয়া যাচ্ছিল। তাই জনযুদ্ধের মতো চরম বিতর্কিত বিষয় নিয়ে জ্যোতি বসুকে লিখতে দেখা যায়, 'জনযুদ্ধ ও ভারতের স্বাধীনতা' (১/২৮) বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় লেখেন 'জনযুদ্ধের সমস্যা' (১/২৪, ১/২৫, ১/২৬), আর স্পেনের ফ্যাসি-বিরোধী বীর যোদ্ধাদের স্মরণ করেন স্নেহাংশুকান্ত আচার্য তাঁর 'স্পেনের যোদ্ধা' নামক প্রবন্ধে (৫/৯)। বিশেষ করে এই তিনজনের নাম উল্লেখ করা হল এই জন্য, এঁরা রাজনৈতিক প্রয়োজন ছাড়া সাধারণত কলম ধরতেন না। এরই পাশাপাশি নতুন নতুন গল্প-কবিতা-নাটকের ভিড়। এক্ষেত্রেও *অরণি* কিছুটা সমন্বয়পন্থী। তাই এখানে অন্নদাশঙ্কর রায়,

আশাপূর্ণা দেবী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মনোজ বসু এবং সন্তোষকুমার ঘোষের গল্প যেমন ছাপা হয় তেমনি ছাপা হয়, বামপন্থী ননী ভৌমিক, গোলাম কুদ্দুস, সমরেশ বসু, সুশীল জানা বা সোমেন চন্দের গল্প। সৈয়দ ওয়ালিউল্লা হক-এর দুটি গল্পের (নীলাকাশ, খেয়াঘাট) প্রকাশও এখানেই। নাটকের ব্যাপারে *অরণি* ছিল রীতিমতো সমৃদ্ধ। বিজন ভট্টাচার্যের আগুন, জবানবন্দী, নবান্ন, বিনয় ঘোষের ল্যাবোরেটরি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের হোমিওপ্যাথি এখানেই ছাপা হয়। অপরদিকে 'অনামী' ছদ্মনামে স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য 'কথাপ্রসঙ্গে' নামে নিয়মিত যে ফিচারের সূচনা করেছিলেন তার মধ্য দিয়ে প্রগতি-বিরোধী চিন্তাধারাকে তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করা হত। এই ধরনের ফিচার সেই সময় পর্যন্ত বামপন্থী পত্রিকায় নতুন। এছাড়া সরোজ আচার্যের বিখ্যাত মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কিত আলোচনার অন্যতম সূত্রপাতও *অরণি*-র পৃষ্ঠায় (মার্কসীয় দর্শন ও ভারতীয় পাণ্ডিত্য)।

প্রকাশকালের বিচারে অবশ্যই *অগ্রণী* বা *অরণি*-র অনেক আগেই *পরিচয়*-এর আলোচনা কাম্য ছিল। কারণ, এর প্রথম প্রকাশ ১৩৩৮ (১৯৩১) সালের শ্রাবণ মাস। কিন্তু তখন তার বিশেষণ ছিল 'অভিজাত'। *পরিচয়*-এর দ্বিতীয় পর্বের সূচনা ১৯৪৩-এর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। প্রধানত কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের হাতে তখন এর পরিচালনার ভার আসে। সম্পাদনার দায়িত্ব নেন গোপাল হালদার ও হিরণকুমার সান্যাল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা মঙ্গলাচরণের মতো প্রগতিশিবিরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা তখন সম্পাদকীয় দপ্তরের কর্মী। এই পর্বের পরিচয়-ই আমাদের প্রধান আলোচ্য। কিন্তু দ্বিতীয় পর্ব প্রথম পর্ব থেকে ঐতিহাসিক কারণেই বিচ্ছিন্ন ছিল না। আসলে সুধীন্দ্রনাথের আমলেই *পরিচয়*-কে ঘিরে সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কসবাদে অনুরাগী একদল বুদ্ধিজীবীর সমাবেশ ঘটেছিল। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের *পরিচয়-এর আড্ডা* গ্রন্থের ভূমিকায় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তো স্বীকারই করেছেন যে, তিনি এই আড্ডায় যেতেন প্রধানত পার্টি কর্তৃক ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য, আড্ডাধারী হবার মত স্বভাবও ছিল না। আর তখন (এখনও ভিন্নভাবে) যা আমাকে মাতিয়ে রেখেছিল সেই কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নানা কাজের মধ্যে একটা কাজ হিসাবে লেখক-শিল্পীদের নিয়ে প্রগতি প্রয়াসে লিপ্ত ছিলাম বলে পরিচয়-এর মতো একটা পত্রিকার সঙ্গে সহযোগ ছিল কর্তব্যেরই মধ্যে। *পরিচয়*-এ তাঁদের কাজ যে ছিল প্রধানত পার্টি-নির্ধারিত কাজ শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের 'পরিচয়'-এর আড্ডা' গ্রন্থে তার উদাহরণ আছে, 'গিয়ে দেখি হীরেন মুখার্জী একখানি ফ্যাসিস্ট বিরোধী ইস্তাহার পড়ে শোনাচ্ছেন। একটু দেরিতে এসে যতটুকু শুনলাম তাতে মনে হলো এটা হচ্ছে সারা বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর ফ্যাসিস্টদের পরিকল্পিত হামলার প্রতিবাদ।' (ডায়েরি ৮ মে, ১৯৩৬)

ত্রৈমাসিক *পরিচয়*-এর অভিজাত আড্ডায় যাঁরা মিলিত হতেন তাঁদের রাজনৈতিক, সামাজিক বা সাহিত্যভাবনা এক ছিল না। কিন্তু তাঁরা ছিলেন মুক্তমনের অধিকারী ও মানবতাবাদী। তাই যে কোনো মতাদর্শের আলোচনা বা প্রকাশে কোনো বাধা কোথাও ছিল না। ঐতিহাসিক কারণেই ধীরে ধীরে সেখানে মার্কসবাদেরও প্রবেশ ঘটে। হিরণকুমার সান্যাল ত্রৈমাসিক *পরিচয়*-এর পৃষ্ঠায় মার্কসবাদ-চর্চার সূচনা পর্বের বিবরণ দিয়েছেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অথ কাব্যজিজ্ঞাসা' (বৈশাখ ১৩৪১) প্রবন্ধেই বোধ হয় সর্বপ্রথম সাহিত্য সমালোচনায় মার্কসবাদী-সূত্রের প্রয়োগ ঘটে। ধূর্জটিপ্রসাদ লিখেছিলেন, 'এদেশে আমরা সকলে সমাজসত্তাকে পাশ কাটিয়ে আসছি, তাই আমাদের সাহিত্য আমাদের সমশ্রেণীর

প্রাণেই কেবল সাড়া দেয়. জনসাধারণের কাছে তার কোনও আবেদন ও মূল্য নেই।...এখন চোখ খুলে দাঁড়াতে হবে. সমাজ ভাঙার ও গড়ার শক্তিকে, তাকে বিকাশই বলুন আর শ্রেণী বিরোধই বলুন—কি দুই-ই বলুন, আমার তাতে আপত্তি নেই, ব্যবহার করতে হবে।' হিরণকুমার সান্যাল তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় এই পরিবর্তনটিকে তুলে ধরেছিলেন এইভাবে, 'তখনকার দিনে ও-সব কথা নতুন ছিল। ভাবগঙ্গার ঘোলাটে জলে ফুটল লালের আভা। ঐ-সময়ে একটির পর একটি প্রবন্ধে সুশোভন সরকার বর্ণনা করেছিলেন তখনকার ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা। অত্যন্ত সরল ভাষায় সমসাময়িক ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্যে এগুলি উল্লেখযোগ্য। ...এর কিছুকাল পরে সদ্য বিলেত ফেরত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এসে যোগ দিলেন পরিচয়-এর আড্ডায় ও লেখকগোষ্ঠীতে। পরিচয়-এর পাতায় লালের আভা আর একটু গাঢ় হল। কিন্তু এই রঙ প্রথম ফুটিয়েছিলেন ধূর্জটিবাবু তা ভুললে অন্যায় হবে।" (পরিচয়-এর কুড়ি বছর পৃ. ৮৭-৮৮)

পরিচয়

প্রতি সংখ্যা ১৲
বার্ষিক ৪৲

ত্রৈমাসিক
পত্রিকা

প্রথম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৩৮

বিষয় সূচী

পুস্তক পরিচয়

[illegible]

পরিচয় এর প্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্র

কিন্তু হিরণকুমার সান্যাল বা শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষদের বিবরণে এটাও স্পষ্ট যে, এটা নিতান্তই ব্যতিক্রম। মার্কসবাদ সংক্রান্ত আলোচনা এই পর্যায়ের *পরিচয়*-এর কেন্দ্রীয় বিষয় নয়, নানা ধরনের আলোচনার অন্যতম। মার্কসবাদ বা কমিউনিস্ট বিরোধী দার্শনিক বা বুদ্ধিজীবীরাও এই আসরে অনায়াসে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারতেন। সুধীন্দ্রনাথের বিদায় গ্রহণের পর দ্বিতীয় পর্যায়ের *পরিচয়*-এর যুগ্ম সম্পাদক হয়েছিলেন গোপাল হালদার ও হিরণকুমার সান্যাল। গোপাল হালদারের রাজনৈতিক মতামত তখনই সর্বজনজ্ঞাত। কিন্তু হিরণকুমারের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক পরিচয় ছিল না। তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধব সুশোভন সরকার অবশ্য জানিয়েছেন যে 'তাঁর রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসের আর একটি প্রমাণ ঘোর দুর্দিনেও পার্টি ও পরিচয়-এর পাশাপাশি থাকা। আর একটা নিদর্শন হল সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর পরিচয়-এর সম্পাদকীয়। যেটির সম্বন্ধে বন্ধুবর নীরেন্দ্রনাথ রায় বলেছিলেন এবার সত্যিই পরিচয়-এর মোড় ফিরল।' (ভূমিকাব বদলে, *পরিচয়-এর কুড়ি বছর*) বুঝতে অসুবিধে নেই, নব পর্যায়ের *পরিচয়*-এর যুগ্ম সম্পাদক অনেক ভেবে চিন্তেই বাছাই করা হয়েছিল। গোপাল হালদার এই নতুন *পরিচয়*-এর দৃষ্টিভঙ্গির কথা পরবর্তীকালে একটি প্রবন্ধে জানিয়েছিলেন, 'কমিউনিস্ট পার্টি (বাংলায়) *পরিচয়*-কে নিজেদের 'পলিসি' প্রচারের জন্য হাতে নেয়নি, তাদের যুদ্ধকালীন মতামত সুবিদিত, সুস্পষ্টভাবে তা প্রচারের জন্য দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা ও নানা প্রচারপত্র ছিল। ...সেজন্য পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল না। পরিচয়ের পাঠক সুশিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী শ্রেণি। জিজ্ঞাসায়, মননশীলতায় ও রূপরসের সৃষ্টিতে ও আলোচনায় তাঁদের রুচি। একটু উন্নাসিক বলেও তার খ্যাতি। তার বুদ্ধিজীবী ঐতিহ্যকে মেনে নিয়ে তাকে ব্যাপকতর বুদ্ধিজীবী সমাজের মুখপত্র করা প্রয়োজন ; নতুন জীবননিষ্ঠ ভাবাদর্শে (ইডিয়োলজিতে) প্রবুদ্ধ করা, প্রগতির পথে সক্রিয় করা, অন্য প্রয়োজন।' (পরিচয়-এর রূপান্তরের হেরফের, *পরিচয়*, শারদীয় ১৩৮৮) এর কিছু পরেই গোপাল হালদারের একটি মহামূল্যবান মন্তব্য, 'কমিউনিজম নয়, প্রগতি—এই তখনকার মত যথেষ্ট--এটাই ছিল পার্টি কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ও নির্দেশ।' এই উক্তির তাৎপর্য বোঝা যাবে যদি এটা মনে রাখা যায় যে, এর পরিচালনা ভার পার্টি থেকে তখনকার মত দেওয়া হয়েছিল প্রগতি লেখক সংঘের হাতে। অর্থাৎ *পরিচয়* এই পর্যায়ে প্রগতি সাহিত্য ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রামের একটি বৃহত্তর প্ল্যাটফর্ম।

কিন্তু প্ল্যাটফর্ম এবং দল এক বস্তু নয়। *পরিচয়* যতদিন প্রগতি লেখক সংঘের অথবা ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী ছিল তখন সেখানে প্রায় সমস্ত রকম মতামতেরই স্বীকৃতি। কিন্তু যে মুহূর্তে পার্টি-নির্দেশ প্রাধান্য পেতে লাগল সেই মুহূর্ত থেকেই লেখক এবং লেখা উভয়েরই পরিবর্তন ঘটল। ফলে *পরিচয়*-কে কীভাবে ক্রমাগত আঘাত সংঘাতের মাঝে এসে দাঁড়াতে হচ্ছিল, গোপাল হালদারের নিরপেক্ষ মূল্যায়নে তা স্পষ্ট; 'দুরকমের বাধা দেখা দিয়েছিল, (ক) পার্টির মধ্যে গোঁড়ামির প্রবণতা (খ) পার্টির বন্ধু স্থানীয়দের মধ্যে পরিচয়-এর ভূমিকা সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অসহিষ্ণুতা।' (পরিচয়-এর ৪৫ বছরে. *পরিচয়* কার্তিক ১৩৮৩) এই অসহিষ্ণুতা ও 'গোঁড়ামি' যে সমসাময়িক বামপন্থী মতাদর্শের বিভিন্ন সংঘাতের প্রতিফলন তা এখন সকলেরই জানা।

এই 'অসহিষ্ণুতার' সঙ্গে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট রাজনীতির নানা টানাপোড়েনের যোগ

আছে। কমিউনিস্ট লেখক বা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে শিল্প-সাহিত্য নিয়ে নানা বিতর্ক ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। পার্টি সাহিত্য বলে আদপেই কিছু হয় কি না তা নিয়েই মতভেদ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পরে পরেই ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রজার গারোদি, মিশেলর এরভে এবং খ্যাতিমান কবি লুই আরাগঁ প্রভৃতি যে বিতর্কের সূচনা করেছিলেন তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এর আগে *অরণি* পত্রিকায় এদের সংক্ষিপ্ত মতামত প্রকাশিত হচ্ছিল। ১৯৪৭-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় বিষ্ণু দে 'উর্দিহীন শিল্প' নামে গারোদির একটি রচনার অনুবাদ প্রকাশ করেন। ফরাসি কমিউনিস্ট শিল্পী-সাহিত্যিকেরা গারোদি ও আরাগঁপন্থী-- এই দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম দল উদারপন্থী, দ্বিতীয় দল গোঁড়া। তবে আসল ইন্ধন যুগিয়েছিল ১৯৪৬-এর ২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সোভিয়েত পার্টি লেখকদের বিচারসভায় জ্‌দানভের ঐতিহাসিক বক্তৃতা। অভিযুক্ত দুই সোভিয়েত লেখক হলেন মহিলা-কবি আনা আখমাতোভা এবং জশ্‌চেঙ্কো। তাঁরা তাঁদের রচনায় সোভিয়েতের মানুষের অবক্ষয়ী মানসিকতাকেই কেবল তুলে ধরেছেন--এই অভিযোগে লেখক-সংঘ থেকে তাঁদের বহিষ্কৃত করা হয়। এই প্রসঙ্গেই জ্‌দানভ যে বক্তৃতা দেন আরাগঁ বা এরভের বক্তব্য তারই অনুগামী, গারোদির উদারপন্থী লাইন অগ্রাহ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ শিল্পসাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে পার্টি লাইন মেনে চলাই শেষ কথা। যথারীতি এদেশের বামপন্থী মহলে এই বিতর্কের তীব্র রেশ ছড়িয়ে পড়ে, মতান্তর অনেকক্ষেত্রেই মনান্তরে পৌঁছোয়। তাত্ত্বিক লড়াই কেবল নিজেদের শিবিরেই ভাঙন আনে না, সহযাত্রীদেরও দূরে সরিয়ে দেয়।

আজকের দিনে একটা কথা ভেবে মনে কিছুটা বিস্ময়ই জাগে। তখনকার দিনের সেরা বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই বামপন্থী শিবিরে। কিন্তু শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁরা প্রায় কেউই স্বতন্ত্র কোনো মতবাদ উপস্থাপিত করেননি। জ্‌দানভ্‌--আরাগঁ,-গারোদিদের নিয়েই মাথা ঘামিয়েছেন। যে বিশেষ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বা সামাজিক পরিকাঠামোয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ফ্রান্সকে শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হয়, ইউরোপের অবক্ষয়ী সংস্কৃতিকে ঠেকানোর কথা চিন্তা করতে হয়, এদেশে ঠিক সে পরিস্থিতি ছিল না। তাই এখানে বিতর্ক মানে ছিল নিছক বিদেশি তত্ত্বের অনুকরণ, এই তত্ত্বকে সামনে রেখে দেশকালোপযোগী কোনো নতুনতর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কথা কেউ ভাবেননি। ফলে একটা সময়ে বিতর্ক চরম তিক্ততায় পৌঁছেছে, আর পরে দেখা গেছে সমবেত ভুল স্বীকারের পালা।

অবশ্য স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে বামপন্থী পত্রিকাগুলির মনোভাব পরিবর্তনের একটা সম্পর্ক আছে। ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোশী-লাইন বর্জিত হয়ে রনদিভে-লাইন গৃহীত হয়। এ আজাদী ঝুটা হ্যায়—এর শ্লোগান সামনে রেখে কমিউনিস্ট পার্টি তখন সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন গ্রহণ করে। এরই প্রতিক্রিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। *পরিচয়* সহ অন্যান্য বামপন্থী পত্রপত্রিকার ওপরও আক্রমণ নেমে আসে। ১৯৪৯-এ চীনের গণফৌজের চূড়ান্ত বিজয় ও কমিউনিস্টদের ক্ষমতা দখল শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতির মেলবন্ধনকে দৃঢ়তর করে। ১৯৪৯-এর ২২-২৪ এপ্রিলে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রগতিলেখক ও শিল্পী সংঘের চতুর্থ সম্মেলনে চিন্মোহন সেহানবীশ যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন তা *পরিচয়*-এ প্রকাশিত হয়েছিল

১৩৫৬-এর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায়। তাতে 'চীনের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে'—এজাতীয় বক্তব্যের পর প্রগতিলেখকদের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ, 'যেটা প্রথমে করবার সেটি হল প্রত্যেক শিল্পীকে সাহিত্যিককে যুক্ত হতে হবে মজুর কিষাণ আন্দোলনের সৈনিক হিসাবে। সৈনিক হওয়ার শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার পর কথা উঠবে কাজ ভাগাভাগির, বিচার হবে নতুন ফসল ভালো না মন্দ, খতিয়ে দেখা যাবে লাভক্ষতি।' এটা ছিল পার্টিরই নির্দেশ, কারণ সেহানবীশ তখন পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের অন্যতর 'মুখপাত্র। ১৩৫৭-৫৮-এর চৈত্র-বৈশাখ সংখ্যার *পরিচয়*-এ চিন্মোহন সেহানবীশের যে প্রবন্ধটি ছাপা হল তার শিরোনামটি লক্ষ করবার মতো, 'শিল্প-সাহিত্যের সমস্যা : চীনের পথ'। এতে ১৯৪২-এ ইয়েনান শহরে চীনের শিল্পী-সাহিত্যিকদের সম্মেলনে মাও-সে-তুং-এর দুটি বক্তৃতার উল্লেখ করা হয় এবং ১৯৪৯-এর জুলাইয়ে পিকিং শহরে ডাকা সমগ্র চীনের লেখক ও শিল্পীদের সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তেরও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়। উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়।

সমগ্র বামপন্থী চিন্তাধারাতেই এই সময়ে শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতিকে পরিবর্তিত জঙ্গি রাজনৈতিক আবহাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হচ্ছিল। অনেক রথী-মহারথী ভূপতিত হচ্ছিলেন। স্বয়ং প্রগতি লেখক সংঘের সভাপতি তারাশঙ্করের *হাঁসুলীবাকের উপকথা* সমালোচনায় হিরণকুমার সান্যাল লিখে বসলেন, 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা একেবারে ভানুমতির ভেলকি' (*পরিচয়* পৌষ ১৩৫৪, পুস্তক পরিচয়)। বিষ্ণু দে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটোগল্পর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করায় তাঁকে আক্রান্ত হতে তো হয়ই, স্বয়ং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমালোচনায় বিষ্ণুবাবুর 'মার্কসিস্ট দৃষ্টি বিকৃত' বলতে দ্বিধা করেননি। আলোচনার শেষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি তাই সমসাময়িক বামপন্থীদের অধিকাংশের মতাদর্শের প্রতিধ্বনি হয়ে দাঁড়ায়, 'দুটো দল হয়ে গেছে, উপায় কি। ব্যক্তিগতদের ব্যক্তিপ্রীতির দল এবং জনসাধারণের নৈর্ব্যক্তিক স্বজাতিপ্রীতির দল। দ্বিতীয় দলে গত না হলে প্রগতি হয় না।' (*পরিচয়*, পাঠকগোষ্ঠী, ফাল্গুন ১৩৫৪)।

ক্রমশই দেখা যাচ্ছিল যে, মার্কসবাদীদের নিজেদের মধ্যে বিতর্কই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা অভিন্ন কর্মসূচি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল বলে সাংস্কৃতিক জগতে বৃহত্তর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। তাই সেখানে বামপন্থী-অবামপন্থীদের মিলিত অবস্থান। কিন্তু ক্রমশ বামপন্থী পত্রপত্রিকায় ত্রিমুখী লড়াই শুরু হল। প্রথম লড়াই মার্ক্সবাদ-বিরোধীদের সঙ্গে, দ্বিতীয় লড়াই নিজেদের মধ্যে। এই দ্বিতীয় লড়াইটির ভাষা কী জাতীয় হচ্ছিল তার দু-একটি উদাহরণই যথেষ্ট। সমর সেন-কে আক্রমণ করতে গিয়ে *অগ্রণী* (এপ্রিল ১৯৪০) পত্রিকায় সরোজ দত্ত অনায়াসে লিখতে পারেন, 'বর্তমান decadent মধ্যবিত্ত সমাজে বুদ্ধিহীন যুক্তিজীবীর ভীড়ের মধ্যে 'Text Book Marxism'-এর যে সহজ সিদ্ধির পথ শ্রীযুক্ত সেন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বৈষয়িক ধূর্ততার প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না।' বিতর্কের মূল সূত্রপাতও সমধর্মী কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি নিয়েই। *অগ্রণী, অরণি, নতুন সাহিত্য,* হস্তান্তরিত *পরিচয়* এবং *সাহিত্যপত্র* পত্রিকাকে ঘিরেই এই সব বাদ-প্রতিবাদের সূচনা। এদের মধ্যে পরিচয়-এর অবস্থান যে পুরোভাগে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তখনও পর্যন্ত 'মার্কসবাদী' সংকলনের আবির্ভাব ঘটেনি। মজা এই যে, যে লেখকের বিরুদ্ধে মার্কসবাদ-বিরোধিতার অভিযোগ আসছে কৈফিয়ৎ

দেবার সময় তিনিও মার্কসবাদেরই আশ্রয় নিচ্ছেন। 'বিষ্ণু দে-র গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা' প্রবন্ধে (*পরিচয়*, শারদীয় ১৩৫৪) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুবাবুর 'মার্কসিস্ট জ্ঞান যে কত অপরিণত' (*পরিচয়* পৌষ ১৩৫৪) তা খুঁজে পান। আর বিষ্ণুবাবু আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য 'রাজায় রাজায়' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন (*সাহিত্যপত্র*; পুস্তক পরিচয় বিভাগ ১৩৫৫, শ্রাবণ) তাতে মার্কস—এঙ্গেলস বা লেনিন থেকে অনবরত উদ্ধৃতি থাকে।

আর এই সব বাদ-প্রতিবাদের অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় *পরিচয়*-এর পরিচালকমণ্ডলী থেকে (১৩৫৪, ফাল্গুন) বিষ্ণু বাবু সরে যান। *সাহিত্যপত্র* পত্রিকার প্রকাশে (১৩৫৫ শ্রাবণ) তাঁর উদ্যোগের প্রধান কারণও এই মতভেদ। চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় ও নবযুগ আচার্যের নাম থাকলেও এর প্রধান উদ্যোক্তা বিষ্ণু দে, এবং প্রথম সংখ্যাতেই বেরিয়েছিল বিষ্ণু দে-র বিখ্যাত 'রাজায় রাজায়' প্রবন্ধ। সেখানে বুদ্ধদেব বসুর An Acre of green grass-এর সমালোচনা উপলক্ষে হঠাৎই যেন তাঁর পুরোনো আঘাতের কথা মনে পড়ে যায়, তাই কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই যেন লিখে বসেন, 'সেইরকম কয়েক বছর ধরে 'পরিচয়' ও কয়েকজন প্রগতি লেখকদের মধ্যে মাঝে মাঝে যে অসহিষ্ণু দলীয়তা দেখে এসেছি, তার যতোই দার্শনিক সমর্থন তাঁরা করে থাকুন সেও একটা 'লাসালী ভ্রম'। তাঁরাই নাকি জনসাধারণ তারাই প্রগতি, আর সবাই এক প্রতিক্রিয়াশীল পিণ্ড।' (টীকা : ফার্ডিনাণ্ড লাসালীর উগ্র এবং সঙ্কীর্ণ বামপন্থাকে এঙ্গেলস তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন)। বোঝা যায়, তাঁর আঘাত কতটা গভীর ছিল। তবে এটাও মানতে হবে শিল্পসাহিত্য বিচারে *সাহিত্যপত্র* ছিল অনেকটা সমন্বয়বাদী। বুদ্ধদেব বসুর বামপন্থী বিরোধিতা বা বামপন্থীদের একাংশের গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গি- দুই-ই তার কাছে উগ্র মতবাদ, আর দুই-ই 'সাহিত্যের স্বাধীনতার প্রতিকূল।' বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলও ১৯৪৭-৪৮ সাল নাগাদ *ক্রান্তি* নামে মার্কসবাদ-সংক্রান্ত একটি মূল্যবান তাত্ত্বিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ও ত্রিদিব চৌধুরী ছিলেন এর যুগ্ম সম্পাদক। এছাড়া অরবিন্দ পোদ্দারের মতো বিশিষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবী এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক পার্টির রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্যের প্রতিফলন *ক্রান্তি*-তে তো ঘটতই, এছাড়া শিল্পসাহিত্যের মার্কসবাদী বিচারের ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য ছিল প্রকট। তবে *পরিচয়* বা *সাহিত্যপত্রে*-র যে সব প্রবন্ধে মার্কসবাদের নামে পার্টি-সাহিত্য প্রচারের বিরোধিতা করা হত, *ক্রান্তি* ছিল তাদের সমর্থক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ত্রিদিব চৌধুরীর 'সাহিত্যবিচারে মার্কসবাদ' (*ক্রান্তি*, প্রথমবর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, ১৩৫৫) প্রবন্ধটির উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রায় একই সময়ে *পরিচয়* ও *সাহিত্যপত্র* পত্রিকায় এ বিষয়ে যে প্রবল বাদ-প্রতিবাদের সূচনা হয়ে ছিল ত্রিদিব চৌধুরীর প্রবন্ধে তার প্রায় সব কটিরই উল্লেখ আছে। তাঁর সমর্থন কাদের প্রতি প্রবন্ধে তাও গোপন করা হয়নি।

পরিচয়-পর্বের আলোচনা শেষ করার আগে একটি কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। ছক বাঁধা যান্ত্রিক রচনা টিকে থাকে না, এক্ষেত্রেও টেকেনি। কিন্তু এই সময়ে মাঝে মাঝে পত্রিকাগুলিতে এমন কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে যা বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। সব কটিই *পরিচয়*-এ প্রকাশিত। আবু সয়ীদ আইয়ুবের 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য' (পৌষ ১৩৫৪), এবং 'বিশুদ্ধ ও ফলিত সাহিত্য' (চৈত্র ১৩৫৪), অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্রের 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য' (মাঘ ১৩৫৪) নীরেন্দ্রনাথ রায়ের

'সাহিত্য বিচারে মার্কসবাদ' (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৫)--সব কটি রচনাই অসাধারণ উচ্চমানের, এদের মধ্যে আইয়ুবের তো তুলনাই নেই। বস্তুত তিনি একাই বিরোধীপক্ষ, একাই সমন্বয়সাধক। সেযুগে *পরিচয়*-এর পৃষ্ঠায় পাশাপাশি এই জাতীয় রচনার অবস্থান বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের সহনশীলতার *পরিচয়* দেয়, 'মানবধর্মী কোনো শিল্পীর রচনায় সমাজগত ও শিল্পগত মূল্যের সাযুজ্য ঘটতে পারে। যদি ঘটে তবে তেমন রচনা আমাদের কাছে অত্যধিক সমাদরের বস্তু হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাই বলে আমি মানতে প্রস্তুত নই যে রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক মূল্যবিচার একই জিনিস'। (বিশুদ্ধ ও ফলিত সাহিত্য) আইয়ুবের এই কথা না মানলেও অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্রের মতো বিদগ্ধ মার্কসবাদী কিন্তু আইয়ুবের বক্তব্যকে একেবারে উড়িয়ে দেননি। তাঁর মতে এটি মার্কসবাদীদের প্রতি যথাযথ সতর্কবাণীও বটে, 'আইয়ুব সাহেবের বক্তব্য মেনে নিতে না পারলেও এটা ভেবে দেখা দরকার , কেন তাঁর মতো সাহিত্যরসিক মার্কসিস্ট সাহিত্যকে গ্রহণ করতে পারেন নি। বহু মার্কসিস্ট সাহিত্যিকের একাগ্র শিল্পসাধনার অভাব আছে। অনেকেই সস্তায় কিস্তিমাত করতে চান। টেকনিক ও কলাকৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টা অনেকেই করেন না। বস্তুজগৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও প্রগতিশীল অভিজ্ঞতাও অনেকের নেই। অপরের চৈতন্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা তাঁরা অনেকেই অর্জন করেন নি। সুতরাং আইয়ুব সাহেবের প্রবন্ধটিকে একটা হুঁশিয়ারি হিসাবেও নিতে হবে।' (সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য)

কিন্তু এই আত্মসমালোচনা ও সহনশীলতার সম্পূর্ণ অবসান ঘটে ১৯৪৮-এর অক্টোবর মাসে নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক মুখপত্র *মার্কসবাদী*-র প্রথম সংকলন প্রকাশের পর থেকেই। এর সম্পাদক ছিলেন তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য ভবানী সেন, তবে কোনো সংখ্যাতেই সম্পাদকের নাম ছাপা হত না। ১৯৪৮-এর অক্টোবর থেকে ১৯৫০-এর অক্টোবর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল এর ৮টি সংখ্যা। পার্টি নিষিদ্ধ বলে সব লেখকই ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। মার্কসবাদী দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিচার বিষয়ে এতে প্রবন্ধ বেব হয় পাঁচটি। এগুলিতে প্রধানত একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র-স্বামী বিবেকানন্দ সহ গোটা ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়ক এবং তাঁদের সৃষ্টি ও অবদানের পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা হয়েছে, অপরদিকে সমসাময়িক প্রতিষ্ঠিত শিল্পসাহিত্যিকদেরও অনেকে আক্রান্ত হয়েছেন। রেনেসাঁসের--সুশোভন সরকার 'মডেল' এইসব আলোচনায় সম্পূর্ণ বর্জিত হল। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তেই এর উদ্দেশ্যটি অত্যন্ত কঠোর প্রচারধর্মী ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে, 'রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, সাহিত্য ও অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রেই বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা মিথ্যার মিনারের ওপর দাঁড়িয়ে জমিনের ওপরকার নির্যাতিত নরনারীর মাথার ওপর থুথু ফেলছেন· আর তাদের আহ্বান করছেন অস্ত্রসংবরণ করতে। এদের এই দুষ্কর্মকেই তাঁরা দাবী করছেন সত্য, শিব এবং সুন্দরের প্রতি অর্ঘ নিবেদন বলে। মার্কসবাদীর কাজ হল তাঁদের ঘৃণিত স্বরূপ নগ্ন করে ধরা। প্রথম সংখ্যা সামান্যভাবে তার যৎকিঞ্চিৎ আরম্ভমাত্র।'

আরম্ভটি মোটেই 'সামান্য' ছিল না, বক্তব্যটিও 'যৎকিঞ্চিৎ' নয়। রণদিভে-পর্বে কমিউনিস্ট পার্টির সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের ইঙ্গিত রয়েছে 'অস্ত্রসংবরণ' কথাটির মধ্যে। এছাড়া ওই সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয়তে প্রায় পদে পদেই জদানভ্-তত্ত্বের উল্লেখ থাকাতে আলোচনার বিষয় এবং গতি কোনদিকে যাবে তা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। এই সম্পাদকীয়তেই রয়েছে

সেইসব চাঞ্চল্যকর উক্তি, 'বর্বর স্বেচ্ছাতন্ত্রের উত্তরাধিকারী নেহেরু-প্যাটেলের ভাড়াটিয়া পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অতীত ভারতের কোন অধ্যায়েরই সত্য অর্থ বোঝা যায় না,' অথবা 'শ্রমিকের সন্ধানীদৃষ্টিতে ছানি পড়াবার জন্য কোমর বেধে লেগেছেন কবি এবং সাহিত্যিকেরা।' আসলে *মার্কসবাদী* ছিল প্রধানত রাজনীতির কাগজ, শিল্পসাহিত্যের নয়। তৎকালীন নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি অবলম্বিত রাজনৈতিক থিসিস-এর এখানে গুরুত্ব পাওয়ার কথা। তা পেয়েও ছিল। আবার পরবর্তীকালে 'ভ্রান্ত' দৃষ্টিভঙ্গির অজুহাতে মোট ১২টি রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রত্যাহারও করে নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে রণদিভে-পর্বের উগ্র বামপন্থা বর্জিত হয়েছে তাই প্রবন্ধগুলিও যথারীতি প্রত্যাহৃত। কিন্তু এগুলি ততটা চঞ্চল্য ফেলেনি, চাঞ্চল্য ফেলেছিল শিল্পসাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি। এখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতার নিদর্শন পাওয়া গেছে তার দেখা আগে মেলেনি বলাই ভালো। তবে একথাও ঠিক যে, *মার্কসবাদী*-ই বোধহয় প্রথম বামপন্থী পত্রিকা যেখানে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি আলোচনায় কোনো বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর ব্যক্তিগত মতামত গুরুত্ব পায়নি. গুরুত্ব পেয়েছিল পার্টি-অনুসৃত সমসাময়িক রাজনৈতিক থিসিস। এই থিসিস গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য ছিল তেমনি ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতির আন্দোলনের ক্ষেত্রেও। তাই বিভিন্ন সংকলনে 'কৃষক সমস্যার নূতন ধারা (দ্বিতীয়), দেশব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতা ও গণসংগ্রামের জোয়াব (তৃতীয়), যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কৌশল (৫ম), আটলাণ্টিক চুক্তি ও ব্রিটিশ কমনওয়েলথ (চতুর্থ), ভারতের ছাত্রআন্দোলন (৬ষ্ঠ), 'স্বাধীন ভারতে বিদেশী পুঁজি' (৭ম) প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক প্রবন্ধের পাশাপাশি যখন বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা (১ম), সাহিত্যবিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি (১ম), বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা (৫ম) বা বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা (৬ষ্ঠ) প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তখন বোঝা যায়, দুশ্রেণির প্রবন্ধই একসূত্রে গাঁথা। সপ্তম সংকলনে 'স্বাধীন ভারতে বিদেশী পুঁজি' প্রবন্ধটিতে উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে স্বাধীন শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। এটি 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' শ্লোগানের প্রভাব।

আগেই বলা হয়েছে যে, 'মার্কসবাদী'র রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলির তুলনায় সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলি গুরুত্ব পেয়েছিল। তাদেরই প্রভাব হয়েছিল দীর্ঘস্থায়ী। তার কারণ দুটি। প্রথমত, পার্টি-লাইন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। অষ্টম বা শেষ সংকলনে 'প্রকাশকের বক্তব্য'তে বারোটি রাজনৈতিক প্রবন্ধের নাম করে বলা হয়েছিল 'পূর্বোক্ত সংকলনগুলিতে প্রকাশিত নিম্নোক্ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী প্রবন্ধগুলি আমরা বিনাশর্তে প্রত্যাহার করছি।' এদের মধ্যে উপরোল্লিখিত প্রবন্ধগুলিও আছে। কিন্তু তারপরেই বলা হয়েছে যে, 'সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে বিভিন্ন সংকলনে যে সমস্ত প্রবন্ধ বেরিয়েছে সে সম্পর্কে এখনো আলোচনা ও বিতর্কের অবকাশ আছে। তাই এই অবস্থায় সেগুলির ওপর কোন সুস্পষ্ট মতামত দেওয়া সম্ভব নয়।' প্রধানত দুটি লেখাই তখন প্রবল বিতর্ক ও আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। প্রথম সংখ্যার (অক্টোবর ১৯৪৮) বীরেন পাল ছদ্মনামে ভবানী সেনের 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা', দ্বিতীয়টির লেখকও ভবানী সেন। রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে লিখিত এই প্রবন্ধটি 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' প্রকাশিত হয় অষ্টম সংকলনে (সেপ্টেম্বর ১৯৪৯)। ভবানী সেন তাঁর রচনায় নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির

দার্শনিক ও সাহিত্যিক থিসিসই উপস্থাপিত করেছিলেন। বাকি লেখাগুলি এদেরই পরিপূরক। ভবানী সেনের প্রবন্ধেও উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের প্রচলিত মূল্যায়ন অগ্রাহ্য হয়, উনিশ শতকের চিন্তানায়ক ও সাহিত্যস্রষ্টাদের অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের বলা হয় Collaborationist। রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথ কেউই মার্কসবাদী নিরিখে প্রগতিশিবিরে গ্রহণযোগ্য নন। রবীন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধের সমাপ্তি এইরকম. 'মার্কসবাদের চুম্বকটুকু বাদ দিয়ে তার খোলসটা নিয়ে ঘোষণা করা হয় যে. বাঙলার ইতিহাসে রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ সৃষ্টি করে গেছেন প্রগতিশীল ঐতিহ্য। অথচ এই ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করে এবং তার সমস্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে আজ এগোতে হচ্ছে, কারণ ভারতে বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের ভিত্তিই হল রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দের রাজনৈতিক এবং দার্শনিক মতাদর্শ। মার্কসবাদী শিবির ঊনবিংশ শতাব্দীর যাদের ঐতিহ্য বহন করছে, তাদের সংস্কৃতিতে পাওয়া যাবে সংস্কৃতিক্ষেত্রে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী, শ্রেণীসংগ্রামে জনতার পক্ষাবলম্বন এবং বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধাচরণ।'

শেষ সংখ্যার *মার্কসবাদী*-র প্রকাশক ঠিকই লিখেছিলেন যে, এ বিতর্ক শেষ হবার নয়, তা হয়ওনি। *মার্কসবাদী* যে তাত্ত্বিক বিতর্কের সূচনা করেছিল সত্তরের দশকে তাই যেন আবার নতুন করে ঝলসে উঠল। দেখা গেছে যে, বামপন্থী রাজনীতি যখন নতুন দিকে মোড় নেয়, যখন বহুদিনের স্তিমিত আন্দোলন আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে তখনই নতুন মতাদর্শ প্রচারের জন্য নতুন নতুন পত্রিকার প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ 'পুরোনো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা কেনা' বেশিদিন চলে না। এই কারণেই *মার্কসবাদী* সংকলন প্রকাশের (১৯৪৮-১৯৫০) পর দীর্ঘদিন সম্পূর্ণ নতুন মতাদর্শের বামপন্থী পত্রপত্রিকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। কারণ, ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়েছে এবং ১৯৫২-এর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পার্টি সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ অনুসরণ করেছে। আবার এই সংসদ-সর্বস্ব রাজনীতির পথ অনুসরণের ফলেই পরবর্তী বিভাজনগুলির প্রেক্ষাপট রচিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে সংসদীয় রাজনীতি অথবা চীনা মডেলে সশস্ত্র কৃষিবিপ্লব এই মতাদর্শগত বিরোধপ্রকাশে বেশ কিছু পত্রপত্রিকাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা যায়। ১৯৬৭-র প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অংশগ্রহণ নিয়েই প্রাথমিক বিতর্কের সূচনা। ১৯৬৪-তে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম বিভাজনের পরবর্তী ধাপ হিসেবেই ১৯৬৯-এর ১মে কলকাতার জনসভায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) প্রতিষ্ঠা হয়। এখানে মতাদর্শগত বিরোধের ভিত্তিতে পার্টির একাধিকবার বিভাজন বা তার ভালোমন্দ নিয়ে আলোচনার সুযোগ বা প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকু বলা যায় যে, সংশোধনবাদের অভিযোগ এনে যাঁরা একদা নতুন পার্টি গড়েছিলেন, তাঁরা নয়া-সংশোধনবাদী হিসেবে চিহ্নিত হতে লাগলেন। চিহ্নিতকারীরা উগ্রপন্থী-সংকীর্ণতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত হলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত-লাইন বর্জিত হয়ে শেষ পর্যন্ত চীনের বিশেষ করে মাও-জে-দং-এর মতাদর্শই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হতে লাগল। তাই সি. পি. আই (এম. এল) গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই চীনা পার্টি তাকে স্বীকৃতি দেয় এবং পিপলস ডেইলি পত্রিকায় পার্টির প্রস্তাবও ছাপা হয়। অবশ্য এর অনেক আগেই নকশালবাড়ির কৃষকসংগ্রাম শুরু হয়ে যাবার পর (৮মে ১৯৬৭)-এর ৫ জুলাই 'পিপলস ডেইলি' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা করা হয়েছিল,

'Spring Thunder Breaks over India' ।

তথাকথিত নয়া সংশোধনবাদ এবং চীনা মডেলের বিপ্লবী মতাদর্শ এই উভয়ের সংঘাতের প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই কিছু কিছু পত্রিকার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানত *দেশহিতৈষী, কালপুরুষ, কমিউন, চিন্তা, দক্ষিণদেশ, নন্দন, অনীক* এবং *দেশব্রতী* প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। বস্তুত এই পর্বে পত্রিকার সংখ্যা ছিল অজস্র, বিভিন্ন অঞ্চল বা বিভিন্ন সংগঠন একই বক্তব্য প্রকাশের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে পত্রিকা বের করেছে। অনেকগুলিই বিলুপ্ত হয়ে গেছে, মস্তান বা পুলিসী হামলার মুখে অনেক পত্রিকাই নষ্ট হয়েছে। তাই এখানে পত্রিকাগুলিই নামের উল্লেখ প্রতীকী হিসেবে ধরে নেওয়াই ভালো। কারণ সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল অল্পবিস্তর এক। সি. পি. এম-এর দলীয় মুখপত্র *দেশহিতৈষী*-র দীর্ঘকালের সম্পাদক সুধাংশু দাশগুপ্ত এই বিরোধের পটভূমিকাটি বিশ্লেষণ করেছিলেন এইভাবে, '১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর্বে পার্টিতে সঙ্কীর্ণতাবাদের ঝোঁকের প্রাবল্য তেমন দেখা যায়নি। কিন্তু নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরাট পবাজয় এবং সেইসঙ্গে আমাদের পার্টির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির হস্তক্ষেপ কিছু কিছু পার্টি সদস্যের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করলো দেশে বিপ্লবী পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে।' (আন্দামান জেল থেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে, পৃ. ১৪১-৪২) আর এই মনোভাবেরই বিপরীত কণ্ঠস্বর যেন শোনা গেল আন্তঃপার্টি সংগ্রামের আর একটি মুখপত্র *কালপুরুষ*-এর দ্বিতীয় সংখ্যার (৫ মার্চ, ১৯৬৭) সম্পাদকীয়তে, 'মুহূর্তের জন্যও তোমাকে একথা ভুললে চলবে না যে, শ্রেণী-সংগ্রামেরই একটি বিশেষস্তরে তুমি বুর্জোয়া সংবিধানে মন্ত্রীত্ব লাভ করেছ, এই মন্ত্রীত্বকে তোমার শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার করে তুলতে হবে। তা যদি না করো ও না পারো, তবে সর্বনাশের যোলকলা পূর্ণ হতে বেশী দেরী হবে না।' বোঝা যায়, মূল বিরোধ কোন জায়গায় এবং আক্রমণের লক্ষ্য কারা। *কালপুরুষ* পত্রিকায় সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন অধ্যক্ষ অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী, প্রমোদবরণ সেনগুপ্তের মতো বামপন্থী বুদ্ধিজীবী এবং এর নামকরণটি করেছিলেন স্বয়ং সরোজ দত্ত--একথাগুলি মনে রাখলেই সংসদীয় গণতন্ত্রের এই জোরালো বিরোধিতার কারণটি বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়।

এই আলোচনা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে পারে, কিন্তু আমরা নিছক বামপন্থী পত্রপত্রিকার তালিকা প্রস্তুত করতে বসিনি। বামপন্থী আন্দোলনের ওঠানামা বা তাত্ত্বিক ঘাতপ্রতিঘাতের সঙ্গে তাল রেখেই যে সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলির আবির্ভাব বা বিলুপ্তি ঘটেছে, নিছক ব্যক্তিগত খেয়াল, বক্তব্য প্রকাশ বা সাহিত্যসৃষ্টির বাসনা চরিতার্থ করার জন্য নয় ইতিহাস তারই পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তথাপি মাঝে মাঝে মনে হয় অন্তত শিল্পসাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে অতি বামপন্থী মতবাদ কোথায় যেন এক অদৃশ্য যোগসূত্রে গাঁথা হয়ে থাকে। ১৩৫৪-এর ফাল্গুন সংখ্যা *পরিচয়*-এ প্রতিপক্ষকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখক এই বলে সতর্ক করেছিলেন, 'দুটো দল হয়ে গেছে, উপায় কি? ব্যক্তিগতদের ব্যক্তিপ্রীতির দল এবং জনসাধারণের নৈর্ব্যক্তিক স্বজাতিপ্রীতির দল। দ্বিতীয় দলে গত না হলে প্রগতি হয় না।' প্রায় একই দৃষ্টিতে রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ এবং বাঙালি মনীষীদের সম্পর্কে প্রচলিত সমস্ত ব্যাখ্যাকে 'সংস্কারবাদী' আখ্যা দিয়ে যে সমস্ত বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন (*মার্কসবাদী* পঞ্চম সংকলন ১৯৪৯) তার সঙ্গে সত্তরের দশকের বিপ্লবী

যুবছাত্রদের দেশবরেণ্য মনীষীদের মূর্তিভাঙার সপক্ষে শশাঙ্ক ছদ্মনামে সরোজ দত্তের এই উক্তির কোথায় যেন অন্তর্নিহিত মিল থেকেই যায়. 'মূর্তিভাঙার লড়াই হচ্ছে আসলে দুই রাজনীতির লড়াই, দুই শ্রেণীর লড়াই।' (মূর্তিভাঙা প্রসঙ্গে)। বিভিন্ন বামপন্থী মতবাদের মুখপত্র হিসেবে এখনও বেশ কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু বেশিরভাগই ঐতিহ্যকে রক্ষা করে চলেছে মাত্র। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্মৃতিচারণা বা আত্মসমালোচনাও চোখে পড়বে। ভাঙনের পর্বের তুলনায় গঠনপর্বে কোলাহল স্বাভাবিক কারণেই স্তিমিত হয়ে আসে। তাই এখন আর বামপন্থী পত্রপত্রিকা মহলে তেমন কোনো কোলাহল নেই। আপাতত সবকিছুই শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে।

তথ্যসূত্র

এই প্রবন্ধে এযাবৎকাল অনালোচিত কোনো বামপন্থী পত্রপত্রিকার সন্ধান দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন গবেষক ও আলোচকদের রচনা থেকেই প্রায় সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ আমার নিজের। রচনার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রসঙ্গর উল্লেখ অসুবিধাজনক বলে নিচে সহায়ক গ্রন্থ ও রচনাগুলির নাম উল্লেখ করা হল। লেখক এঁদের সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ।

১. গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *সংহতি-লাঙ্গল-গণবাণী* (কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি)।
২. সুস্নাত দাশ, *প্রগতি-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কয়েকটি* সাময়িকপত্রের ভূমিকা (*বাংলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার* ধারা, ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত, অনুষ্টুপ প্রকাশনী।)
৩. হিরণকুমার সান্যাল, *পরিচয়-এর কুড়ি বছর*।
৪. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, *পরিচয়-এর আড্ডা*।
৫. চিন্মোহন সেহানবীশ, *৪৬নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন* প্রসঙ্গে।
৬. কার্তিক লাহিড়ী, *অরণি : একটি আন্দোলন ও একটি পত্রিকা* (*এক্ষণ*, শারদীয় ১৩৮৮)।
৭. ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক* (করুণা প্রকাশনী)।
৮. প্রদীপ বসু, *নকশালবাড়ীর পূর্বক্ষণ : কিছু পোস্ট মডার্ন ভাবনা* (প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স)।
৯. নির্মল ঘোষ, *নকশালবাড়ী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য* (করুণা প্রকাশনী)।

সু র জি ৎ ব সু

জনপ্রিয় চারটি পত্রিকা

প্রবাসী--ভারতবর্ষ--মাসিক বসুমতী--বিচিত্রা

আধুনিক বাংলা সাহিত্য সাময়িকপত্রের হাত ধরেই ক্রমশ পুষ্পিত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যে সাময়িকপত্রের ঐতিহাসিক সার্থকতা নির্দেশ করে ড. সুকুমার সেন বলেছেন--

> ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় আজ অবধি দেখিতেছি যে বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য (এবং বাঙ্গালা আধুনিক সাহিত্য) প্রধানত সাময়িক পত্রিকার আশ্রয়েই বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালা গদ্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের বাহন হইয়াই সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাসিক পত্রিকা, সোমপ্রকাশ, বঙ্গদর্শন, ভারতী, জ্ঞানাঙ্কুর, আর্যদর্শন, বান্ধব, নবজীবন, সাধনা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ ও সবুজপত্র ইত্যাদির নাম বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়াছে।[১]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধাত্রীর ভূমিকায় সাময়িকপত্রের মূল পরিচয় এখানেই সুপরিস্ফুট। উনিশ শতকে *সংবাদ-প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাধনা* প্রভৃতি পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের রূপরেখায় এক একটি দিকচিহ্ন স্বরূপ। বিশ শতকের প্রথমার্ধে *প্রবাসী* আধুনিক বাঙালির মনন-চিন্তনের অন্যতম প্রধান বাহন হয়ে উঠেছিল। *প্রবাসী*-র সম্পাদক প্রবাদ-প্রতিম ব্যক্তিত্ব রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে বলা হয়--

'রামানন্দ ছিলেন লোকশিক্ষক। সাধারণের মধ্যে স্বল্প পরিসরে ও সুলভে জ্ঞান বিতরণ তাঁহার উদ্দেশ্য'[২]। স্বয়ং রামানন্দও এ প্রসঙ্গে *প্রদীপ* পত্রিকায় বলেছেন--

> একখানি আদর্শ কাগজ চালাইতে হইলে যদি আয়ের অতিরিক্ত কিছু টাকা ব্যয় হয় তাহা নির্বাহ করিবার উপায় করা উচিত। বস্তুতঃ লোকশিক্ষার জন্য যেমন বিদ্যালয়ের প্রয়োজন, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদিরও তদ্রূপ প্রয়োজন। যেমন স্কুল কলেজ চালাইবার জন্য বড়লোকেরা টাকা দেন তেমনি ভাল কাগজ চালাইবার জন্যও দান করা উচিত।... আমি সম্পাদকের কার্যকে শিক্ষক বা অধ্যাপকের কার্য অপেক্ষা কম পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ মনে করি না।[৩]

এহেন রামানন্দ এলাহাবাদ থেকে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রথম পত্রিকাটির সূচনা করেন। প্রবাস থেকে প্রকাশিত বলে পত্রিকার নামকরণ হল *প্রবাসী*। যদিও 'প্রবাসী' শব্দটির অর্থব্যাপ্তি ঘটে গেল অচিরেই। 'আমরা যে স্বাধীনতা হারিয়ে নিজের ঘরে পরাশ্রিতের মতো বাস করে প্রবাসী হয়ে আছি এই অর্থটাই প্রধান হল। প্রবাসীর শিরোভূষণ হল এই বাণী 'নিজবাসভূমে পরবাসী হলে'।[৪]

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ--

> প্রবাসী নামটির মধ্যে বাংলাদেশকে প্রাণ দিয়া ভালোবাসে এমন বাঙালির মনের ভিতরকার

আকৃতি যেন প্রকাশ পাইতেছে। মনে হয় এই নামের পত্রিকা প্রয়াগ হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 'প্রবাসী বাঙ্গালী' এই শব্দটি বাঙালীর মনের মধ্যে গাঁথিয়া গেল।[৫]

প্রবাসী

প্রথম ভাগ। বৈশাখ, ১৩০৮। ১ম সংখ্যা

সূচনা

আবাহন

প্রবাসী-র প্রথম সংখ্যার প্রতিলিপি

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রথম সংখ্যার 'প্রবাসী' নামক কবিতায় লিখলেন-

'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া

দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া'।

সুতরাং--

'প্রবাস কোথাও নাহি-রে নাহি-রে জনমে জনমে মরণে'।

রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্বাদ ললাটে নিয়ে *প্রবাসী*-র দীর্ঘ যাত্রাপথ শুরু হল। পত্রিকার মুখবন্ধে প্রবাস থেকে পত্রিকা প্রকাশ করা যে কত কঠিন সেই কথা উল্লেখ করে সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন--

> সর্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নাম লইয়া আমরা প্রবাসী প্রকাশিত করিতেছি। বঙ্গদেশের বাহিরে এরূপ মাসিক পত্র বাহির করিবার ইহাই প্রথম উদ্যম। বঙ্গদেশ হইতে দূরে থাকায় কি লেখা, কি ছবি, কি ছাপা, সকল বিষয়েই আমাদিগকে অনেক বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় যদি লেখক এবং পাঠকবর্গের সহানুভূতি ও সাহায্য পাই তাহা হইলে নিশ্চয় আমাদের চেষ্টা ফলবতী হইবে। প্রারম্ভের আড়ম্বর অপেক্ষা ফল দ্বারাই কার্যের বিচার হওয়া ভালো। এইজন্য আমরা আপাততঃ আমাদের আশা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নীরব রহিলাম।[৬]

প্রবাসী-র মুখবাণীর মধ্যেই পরিস্ফুট হয়েছে পত্রিকার আদর্শ। যে মুখবাণী পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যার প্রারম্ভের প্রথম পাতায় মুদ্রিত থাকত। প্রথমে মুখবাণী ছিল কবি টেনিসনের কবিতার পংক্তি—

Beauty, Good and knowledge are three Sisters
to look on the noble forms
Makes noble thro' the sensous – organism
that which is higher.

পরবর্তীকালে ১৩১৪ বঙ্গাব্দ থেকে এর সঙ্গে যোগ হয় সংস্কৃতে দুটি নীতি--

'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'
'ন্যায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'।

১৩২২ বঙ্গাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *প্রবাসী*-র মুখবাণীতে ধ্বনিত হল পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ এক জাতির মর্মবেদনা গোবিন্দচন্দ্র রায়ের কবিতায়--

নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে
পর-দাস-খতে সমুদায় দিলে।
পর দীপমালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে সে তিমিরে।

ইতিপূর্বে রামানন্দের *দাসী, প্রদীপ* প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনার অভিজ্ঞতা, সামাজিক জনহিতকর কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকায় প্রখর সমাজ মনস্কতা, প্রবাসবাসের দরুন এক উদার সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর পত্রিকাকে করে তুলেছিল সমকালীন বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের মধ্যে এক স্বতন্ত্র পত্রিকা। যদিও রামানন্দ চেয়েছিলেন ঔপনিবেশিক শাসনে শৃঙ্খলিত, সামাজিক, অর্থনৈতিক বৈষম্যে জর্জরিত, শিক্ষায় অনগ্রসর, কুসংস্কারে আবদ্ধ বাঙালি জাতির মুক্তির উদার প্রাঙ্গণ হয়ে উঠুক *প্রবাসী*। *প্রবাসী*-র বিচিত্র বিষয়ের অজস্র রচনা এবং সমসাময়িক ঘটনার উপর যুক্তিপূর্ণ সম্পাদকীয় মন্তব্য--সম্পাদকের উদ্দেশ্যকেই রূপায়িত করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক চেতনার এমন কোনো বিষয় ছিল না যা *প্রবাসী*তে অনুশীলিত বা প্রতিফলিত হয়নি, যে বিষয়গুলি সাধারণ মানুষের চিত্তের বিকাশ ও

মানসমুক্তি ঘটায়নি। দক্ষ সম্পাদক রামানন্দ তাঁর পত্রিকাতেই প্রথম প্রত্যেক লেখককে যথাসাধ্য পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাস্তববাদী রামানন্দ বাণিজ্য-সফল পত্রিকার স্বপ্ন ইতিপূর্বে *দাসী* পত্রিকাতেই প্রকাশ করেছিলেন। বুঝেছিলেন আর্থিক বন্দোবস্ত থাকলে ভালো লেখা ও ভালো পত্রিকা গড়ে তোলা সম্ভব। বাণিজ্যসফল পত্রিকা *প্রবাসী* গোড়া থেকেই। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের অল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেল। রামানন্দ দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করলেন। এই ঘটনা একবার নয়, পরেও বহুবার ঘটেছে। *প্রবাসী*-র জনপ্রিয়তার এটাও এক বড় প্রমাণ। এইভাবে বাণিজ্যসফল জনপ্রিয় এই পত্রিকা রামানন্দের সম্পাদনায় নিরবচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘ চল্লিশ বছর প্রকাশিত হয়েছে। এই তথ্য বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নানা বিষয়ের মধ্যে যে বিষয়ে *প্রবাসী* যথার্থই অদ্বিতীয়, তা হল নব্য ভারতীয়-চিত্রকলার পুনর্জাগরণে অক্লান্ত সহযোগিতা। রামানন্দই প্রথম এদেশের সাময়িক পত্রিকার জগতে বহুবর্ণচিত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন। নব্য-ভারতীয় চিত্রকলার প্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রপ্রকাশের প্রথম গৌরব রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের। পত্রিকায় চিত্রপ্রকাশের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদার। স্বদেশি, বিদেশি সকল উৎকৃষ্ট ছবি প্রকাশেই তাঁর আগ্রহ ছিল। বিদেশি চিত্রকরদের মধ্যে র‍্যাফায়েল, বিদোঁ, হফম্যান প্রভৃতি চিত্রকরদের অঙ্কিত চিত্র যেমন সমাদৃত হয়েছিল, ঠিক তেমনি দেশি চিত্রকরদের মধ্যে রাজা রবিবর্মা, রামবর্মা, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর, কাশীনাথ ক্ষাত্রে, বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অবনীন্দ্রনাথের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবিবর্মার অঙ্কিত চিত্র সম্পর্কে তাঁর মৃত্যুর পর রামানন্দ লিখেছিলেন--'তাঁহার চিত্রাঙ্কনরীতি পাশ্চাত্য কিন্তু চিত্রের বিষয়, সমস্ত দেশীয়। দক্ষিণ ভারতের নরনারীর সৌন্দর্যের আদর্শ তাঁহার চিত্রাবলীতে পরিস্ফুট হইয়াছে।'[৭] বলা যেতে পারে, রবি বর্মার অজস্র ছবি ছেপে, তাঁর বিষয়ে লিখে, তাঁকে বাংলার মনোজগতে রামানন্দই স্থাপন করেছেন। *প্রবাসী*-র প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদে চিত্রিত হয়েছে স্বদেশের সংস্কৃতি ও ধর্মের সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল চিত্র। সেখানে রয়েছে মঠ, মন্দির, চৈত্য-বিহার, স্বর্ণমন্দির, তাজমহল, মিনার, প্যাগোডা। এই প্রচ্ছদ চিত্রেই *প্রবাসী*-র আদর্শ প্রতিফলিত। অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ওরিয়েন্টাল আর্ট তখন বাঙালিসমাজে যথেষ্ট ব্যঙ্গবিদ্রূপের বিষয়। এই সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *পিতৃস্মৃতি* গ্রন্থে বলছেন : 'চিত্রিত মানুষদের লম্বা হাত, পা, ক্ষীণ কটি, লতানো আঙুল ইত্যাদি তখন অত্যন্ত হাসির জিনিস ছিল। প্রবাসীতে বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতী, বিরহী যক্ষ, দীপান্বিতা, সুজাতা ও বুদ্ধ ইত্যাদি দেখিয়া নানা জায়গায় মজলিসে, হাসিতামাশা হইত, কাগজেও বিরুদ্ধ সমালোচনা চলিত।' সাধারণ মানুষের শিল্প সম্পর্কে এই বিরূপ মনোভাবকে পরিবর্তন করলেন রামানন্দ। বাঙালির মধ্যে সুকুমার শিল্পকলার জ্ঞান এবং সমাদর সাধারণের মধ্যে বৃদ্ধি করবার সব কৃতিত্বই *প্রবাসী*-র। *প্রবাসী*-তে ছবি ছাপা প্রসঙ্গে সকৃতজ্ঞ চিত্তে অবনীন্দ্রনাথ লিখছেন--

> রামানন্দবাবু যখন নিঃসংশয়ে ছবি ছাপানোর প্রস্তাবটা আমার কাছে পাড়লেন, তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েতে পরিপূর্ণ তাঁর সংসারটির দিকে চেয়ে আমি বলেছিলেম, কাগজটা চালাতে গিয়ে শেষে না বিপদে পড়েন। সেই প্রবাসী আর আজকের প্রবাসী সমানভাবে চলে এল, নতুন নতুন আর্টিস্ট এল ছবি দিতে 'প্রবাসী'তে। এ যে হল তার জন্য দায়ী আমি নয়, রামানন্দবাবু। নতুন বাংলার আর্টিস্টদের ছবি প্রবাসীতে এবং তাঁর আল্‌বমে, তাঁর রামায়ণে ছাপিয়ে বারে

বারে সমালোচকের হাতে তাঁকে তিরস্কৃত হতে হয়েছে : আমরা আর্টিস্টরা শুধু যে তাঁর দৌলতে বিনি পয়সায় দেশজোড়া বিজ্ঞাপন পেয়ে গেছি তা নয়, নিয়মিত দক্ষিণা কাঞ্চনমূল্য তাও পাচ্ছি এখনো। কে ছাপ্‌তো ঘরের কড়ি দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের হাতের ছেলেখেলার ছবি সমস্ত, যদি না প্রবাসী বার করতেন রামানন্দবাবু।...এখনকার আর্টিস্ট তাঁরা কেউ সত্যি আমার ছাত্র--কেউ ছাত্র না হয়েও ঐ নামে চলে যায়, সবাইকে 'প্রবাসী' বিনাখরচে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, সুতরাং তাদের সবার হয়ে আজ আমি প্রবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আর আমার নিজের দিক থেকে বলছি, শোভন কীর্তি তোমার হউক।[৮]

নন্দলাল বসুও সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে বলছেন--

'আমাদের বর্তমান ভারতীয় চিত্রকলার নবজাগরণের মূলে তাঁর উৎসাহ ও সাহায্য যে কতখানি শক্তি সঞ্চার করেছিল তা আজ বিশেষ করে উপলব্ধি করতে পারি। মডার্ন রিভিয়ু, প্রবাসী ও চ্যাটার্জীর পিকচার অ্যালবাম্‌সের মাধ্যমে সেই যুগে আমাদের চিত্রকলার সর্বাপেক্ষা প্রচার সম্ভব হয়েছিল। আজকের এই ভারতীয় চিত্রকলার উচ্চমান ও প্রতিষ্ঠার মূলে শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু একজন প্রধান দরদী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিশেষ করে ব্যক্তিগতভাবে আমার চিত্রের প্রতি তাঁর একটি অকৃত্রিম আগ্রহ ও ভালবাসা ছিল যা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।[৯]

সুতরাং *প্রবাসী* একদিকে যেমন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ রূপকারদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ বাঙালির রূপকলা সম্বন্ধে উন্নত মনোভাব গঠন করতেও প্রয়াসী হয়েছিল। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখে *প্রবাসী*-র জন্মের পরের বৎসরই ১৩০৯ থেকে 'চিত্রপরিচয়' নামে একটি বিভাগ প্রকাশিত হতে থাকে। দেশি ও বিদেশি চিত্রকরদের আঁকা বিখ্যাত তিনটি করে চিত্রে *প্রবাসী*-র প্রতিটি সংখ্যা চিত্রিত হয়েছে। এছাড়াও শিল্পীর পরিচয় এবং শিল্পের বিষয়বস্তু ও তার পশ্চাৎপটের বিবরণও দেওয়া হত। নব্য শিল্পীদের অজস্র রঙিন ছবি ছেপে, তার জন্য প্রচুর সমালোচনাও সহ্য করেছেন *প্রবাসী*-সম্পাদক।

প্রবাসী নানা দিক থেকেই অন্যান্য পত্রিকা অপেক্ষা বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে, *প্রবাসী*-র বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বিভাগ ছিল 'বিবিধ প্রসঙ্গ'। প্রথম সংখ্যা থেকেই সাময়িক প্রসঙ্গ নামে সম্পাদকীয় বক্তব্য প্রকাশিত হয়। তাতে কোনো শিরোনাম ছিল না। পরে নাম হয় বিবিধ প্রসঙ্গ। সমসাময়িক রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক যাবতীয় ঘটনা এই বিভাগে রামানন্দবাবু পর্যালোচনা করতেন। বলা যেতে পারে, এই বিভাগটির মধ্য দিয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালির জাতীয় জীবনের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধরা আছে। সাধারণ পাঠককে সমকালীন প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সচেতন করে তোলা, সমকালীনতার উত্তেজনার মধ্যে ঘটনার সত্যমূল্য উদ্ধার করে উচিত-অনুচিতের বোধ জাগাবার চেষ্টা করেছেন সম্পাদক। সমাজের যে কোনো ক্ষেত্রেই অত্যাচার, অবিচার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেছেন অভিযুক্তদের ; আবার প্রশংসনীয় কাজের জন্য উদারভাবে সমর্থনও করেছেন। বিবিধ প্রসঙ্গ বিভাগের আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিরোনাম দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সমসাময়িক অজস্র ঘটনাকেন্দ্রিক অসংখ্য প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি হল-- 'আমেরিকা-জাপান যুদ্ধ' (আশ্বিন ১৩৩৩), 'গৃহশিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক' (আশ্বিন ১৩২৯), 'ইটালী ও ভারতবর্ষ' (পৌষ ১৩৩২), 'জমিদার ও জমির খাজনা' (আশ্বিন ১৩২৪), 'বানান ও ভাষার কথা' (ভাদ্র ১৩২৩), 'বাঙালীর আলস্য' (শ্রাবণ ১৩২৯), 'মেদিনীপুরের

বন্যা' (আশ্বিন ১৩৩৩), 'হিন্দু-মুসলমান কলহ কি অন্তর্বিদ্রোহ' (ভাদ্র ১৩৩৩) ইত্যাদি। বিবিধ প্রসঙ্গের নানা বিষয়ের মধ্যে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ বারে বারেই এসেছে। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক অজস্র প্রবন্ধ এই বিভাগে প্রকাশিত হয়েছিল যার মধ্যে 'রবিবাবু ও স্টেটসম্যান' (ভাদ্র ১৩২৪), 'রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন' (অগ্রহায়ণ ১৩৩৩), 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি সরকারি নেক্ নজর' (শ্রাবণ ১৩৩২), 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শত্রুতা' (ভাদ্র ১৩৩৩) 'রবীন্দ্রনাথ কানাডার মাটি মাড়াইবেন না' (অগ্রহায়ণ ১৩২৩) ইত্যাদি।

প্রবাসী-র 'পঞ্চশস্য' আর একটি জনপ্রিয় বিভাগ। বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানের নানান খবর এতে প্রকাশিত হত। এই বিভাগটি ১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে শুরু হয়। মূলত যে সকল ঘটনা আমাদের বিস্মিত করে সেইসব অদ্ভুত প্রাকৃতিক ও জাগতিক ঘটনার খবর সংগ্রহ করে চিত্র ও শিরোনাম সহ এই বিভাগে সংকলিত হত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের নতুন নতুন আবিষ্কার ও পরীক্ষার সংবাদও এখানে পরিবেশিত হয়েছে। 'পঞ্চশস্য' বিভাগের সংবাদ সংগ্রাহকদের মধ্যে ছিলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলচন্দ্র হোম, প্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শান্তা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। 'আদিম মানবের চিত্রকলা' (আশ্বিন ১৩২৮), 'গতিমানী আলোর রঙ' (বৈশাখ ১৩২৮), 'জিরাফের শক্তি' (শ্রাবণ ১৩৩৩), 'টেলিফোনের আবিষ্কর্তা গ্রেহাম বেল' (আশ্বিন ১৩৩৩), 'নূতন গ্রহ' (শ্রাবণ ১৩২৭), 'বায়োস্কোপের ইন্দ্রজাল' (শ্রাবণ ১৩২১), 'সাবান ব্যবহারে ময়লা দূর হয় কেন' (আশ্বিন ১৩২৭), 'স্ত্রীলোকের দীর্ঘ পরমায়ু' (শ্রাবণ ১৩২৩), 'ভূমিকম্পে গৃহ ভূমিস্যাৎ হওয়ার প্রতিকার' (মাঘ ১৩২০), 'আমাদের দক্ষিণ হস্ত ব্যবহারের কারণ' (পৌষ ১৩২১) ইত্যাদি দেখলেই বোঝা যাবে কত বিচিত্র বিষয়েই না হাজার হাজার প্রবন্ধ পঞ্চশস্য বিভাগে স্থান লাভ করেছিল। আসলে লোকশিক্ষক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আপ্রাণ চেয়েছিলেন বাঙালি পাঠককে আধুনিক বিশ্বের নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে।

বিশ্বের ও ভারতের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ঘটনার সংক্ষিপ্তসার 'দেশবিদেশের কথা' বিভাগে প্রকাশিত হত। ১৩২৬-এ 'দেশের কথা' শিরোনামে এটির সূচনা, ১৩২৮ থেকে 'দেশবিদেশের কথা' শিরোনামে প্রতিটি ঘটনার শিরোনাম দিয়ে স্থানভিত্তিক ভাগ করে ঘটনাগুলি মুদ্রিত হয়। এইসব সংবাদ বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পত্রিকা ও বিদেশের বিখ্যাত পত্রিকাগুলি থেকে সংকলিত হত। সংবাদ সংগ্রাহকদের মধ্যে ছিলেন অমলচন্দ্র হোম, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, হেমেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ হল 'অস্পৃশ্যদের সহিত ভোজন' (শ্রাবণ, ১৩২৯), 'জাপানে কুষ্ঠরোগ সমস্যা' (আশ্বিন, ১৩৩৩), 'বস্ত্রাভাব ও তার প্রতিকার' (কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩২৭), 'কলিকাতা পাস্তুর ইনস্টিটিউট' (আশ্বিন, ১৩৩১), উত্তরবঙ্গে ভীষণ জলপ্লাবন (কার্তিক, ১৩২৯), আজমীরের দাঙ্গা (ভাদ্র, ১৩৩০), 'নারী শিল্পাশ্রম' (শ্রাবণ, ১৩২৯) ইত্যাদি।

সমকালীন পত্র পত্রিকা থেকে বিভিন্ন রচনার সংক্ষিপ্তসার বা রচনার পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হত 'কষ্টিপাথর' বিভাগে। ১৩১৬ বঙ্গাব্দ থেকে এই বিভাগটির সূচনা। কষ্টিপাথরে অধিকাংশ লেখাই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত। ১৩২৮ থেকে মহিলাদের সংবাদ তাদের সমস্যা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নারীদের নানান কৃতিত্বকর্ম ইত্যাদি তথ্য নিয়ে 'মহিলা মজলিস' বিভাগটি প্রকাশিত

হয়। সম্পাদক নারীদের সামাজিক উন্নতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে সম্মান করে এই বিভাগে রচনাগুলি প্রকাশ করতেন। 'ছেলেদের পাততাড়ি' বিভাগে শিশু-কিশোরদের গল্প, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ, ধাঁধা ইত্যাদি প্রকাশিত হত। 'বেতালের বৈঠক' বিভাগে পাঠকদের বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেন কোনো এক বিশেষজ্ঞ। ১৩১৬ বঙ্গাব্দ থেকে সংগীতশিক্ষার জন্য একটি বিভাগ চালু হয়। প্রকাশিত বইয়ের সমালোচনার জন্য ১৩০৯-এর আষাঢ় মাস থেকে 'সংক্ষিপ্ত গ্রন্থসমালোচনা' বিভাগটির সূচনা হয়। কোনো কোনো গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, কখনও কখনও প্রবন্ধাকারে বিস্তৃত সমালোচনা এই বিভাগটিতে প্রকাশিত হত। পরবর্তীকালে এটির নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় 'পুস্তক-পরিচয়'। সমালোচকদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা। *প্রবাসী*-র গ্রন্থ সমালোচনা সমকালীন লেখক প্রকাশকদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান বলে গৃহীত হয়েছিল।

বিশুদ্ধ সাহিত্যপত্রিকা না হলেও বাংলা সাহিত্যের অজস্র কালজয়ী রচনা *প্রবাসী*-র পাতায় মুদ্রিত হয়েছিল। খ্যাতনামা দেশি বিদেশি স্যাহিত্যিকদের পাশাপাশি স্বল্প পরিচিত অনেক লেখকও *প্রবাসী*-র পাতায় স্থান পেয়েছিলেন। *প্রবাসী*-তেই প্রকাশিত হয়েছিল ধারাবাহিকভাবে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ও 'শেষের কবিতা', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যয়ের 'নবীন সন্ন্যাসী', মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক', 'অপরাজিত', তারাশঙ্করের 'কালিন্দী', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিয়ের ফুল', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অজস্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'রাজা', 'গৃহপ্রবেশ', *প্রবাসী*-কে সমৃদ্ধ করেছিল। *প্রবাসী*তে প্রকাশিত অজস্র ছোটোগল্পের মধ্যে আছে রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি', 'তোতাকাহিনী', 'বাঁশি, 'প্রথম চিঠি', 'পণরক্ষা', 'কর্তার ভূত' ইত্যাদি ; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁইমাচা', 'মেঘমল্লার', 'নাস্তিক', 'মৌরীফুল', 'উপেক্ষিতা' ; বনফুলের 'আত্মপর' ; 'বাড়তি মাশুল', 'অজান্তে' ; বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'অকাল বোধন', 'আমোদ', 'অবিচাব' : জগদীশ গুপ্তের 'তৃষিত আত্মা', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বলবান জামাতা', 'রসময়ীর রসিকতা', 'ফুলের মূল্য', 'উকিলের বুদ্ধি' ইত্যাদি। এছাড়াও আন্তন চেকভ, আলফাঁস দোঁদে, আনাতোল ফ্রাঁস, লিও টলস্টয়, ভিকটর হুগো, ম্যাক্সিম গোর্কি প্রমুখ বিশ্বখ্যাত লেখকদের গল্প এই পত্রিকায় একের পর এক প্রকাশিত হয়েছে। কবিদের মধ্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া যতীন্দ্রমোহন বাগচী, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম, কালিদাস রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রিয়ংবদা দেবী প্রমুখের অজস্র কবিতা এই পত্রিকায় কবিতা পিপাসু পাঠকদের তৃষ্ণা নিবারণ করেছে। প্রবন্ধের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, রসায়ন, ললিতকলা, মনোবিজ্ঞান, ধর্ম, ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ *প্রবাসী*-র পাতাকে সমকালীন সকল পত্রিকার থেকে স্বতন্ত্র ও অভিজাত করে তুলেছিল। একমাত্র জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র ব্যতীত বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল লেখকই *প্রবাসী*-র জন্য লেখনী ধারণ করেছেন।

সম্পাদনা-কার্যে বরাবর রামানন্দ নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। পক্ষপাত প্রদর্শন ছিল তাঁর আদর্শ বিরোধী। সারা ভারতে এবং ভারতের বাইরে এজন্য তাঁর খ্যাতি

বিস্তৃত ছিল। সকল সম্প্রদায়ের পাঠক আনুকূল্য তাই তিনি খুব সহজে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে দেশ যখন উত্তপ্ত রামানন্দ তখন বহু প্রবন্ধে তাঁর অসাম্প্রদায়িক বক্তব্যকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন। "ঘরের মধ্যে রাঁধিয়া খাই, ঘুমাই, কাজ করি বলিয়া আমরা চিরজীবন কেহ দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে থাকি না। যে কখনও ঘরের বাহির হয় না, সে নিশ্চয় দুর্বল ও অসুস্থ। ধর্মে, রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে, সাহিত্যে, সামাজিক ব্যবস্থায়, সম্প্রদায়ের বাহিরের হাওয়া, আলো প্রচার আবশ্যক। কোনো সম্প্রদায় বা জাতির অবনতি ও লয় ততদিন হয় না, যতদিন তাহার বাহিরের সহিত বিশ্বের সহিত আদান প্রদান থাকে। বিশ্ব আত্মার প্রকাশ, শক্তি সর্বত্র রহিয়াছে। যিনি দেশে, জাতিতে, সম্প্রদায়ে আবদ্ধ থাকেন, তিনি ভগবানের দানের অধিক অংশ হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখেন।" (*প্রবাসী,* আষাঢ় ১৩২৩, পৃঃ ২১১)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির ছাত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর পত্রিকায় শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে প্রচুর লেখা তাঁর পত্রিকায় বেরিয়েছে, শিক্ষার সর্বস্তরে তাঁর মনোযোগ ছিল, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ কখনও প্রশংসা কখনও নিন্দার বিষয় হয়েছে। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব হলে রামানন্দ লেখেন--

> ইহার দোষত্রুটি যাহা আছে তাহা আমরা ভালো করিয়াই জানি। কিন্তু ইহাও জানি যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অন্য কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের চেয়ে অপকৃষ্ট শিক্ষা পায় না! অধিকন্তু এখানে অন্য জায়গার চেয়ে উচ্চ শিক্ষা দিবার আয়োজন ও তাহা পাইবার সুযোগ বেশী, সুতরাং শিক্ষা পায়ও অধিকতর ছাত্র। ইহার জন্য শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রশংসাভাজন। গবেষণা ও নূতন জ্ঞান সঞ্চার এখানে ভারতবর্ষের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী হয়। আমরা জানি বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজদের চক্ষুশূল সম্ভবত এই সব কারণেই।
>
> (*প্রবাসী,* কার্তিক-পৌষ, ১৩২৪),

এছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সার্বিক শিক্ষা সম্পর্কে অজস্র প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভৃতির নিয়োগ' (ভাদ্র, ১৩২৭), 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আক্ষেপ' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০), 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ব্যয়' (আশ্বিন, ১৩২৯), 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার' (শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৩২), 'শিক্ষা ও উপার্জন' (শ্রাবণ, ১৩২৬), 'শিক্ষকদের শিক্ষা' (ফাল্গুন, ১৩২৯), 'শিক্ষার বাহন ও ইংরেজী শিক্ষা' (পৌষ, ১৩২৪), 'শিক্ষার উদ্দেশ্য' (কার্তিক, ১৩২৬) ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে *প্রবাসী*-র সম্পর্ক বিষয়ে এক বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করা সম্ভব। অকৃপণ বন্ধুত্বের সাহায্যে পরস্পর ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক। রামানন্দ বলতেন 'আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব লাভ।' আরও বলেছিলেন মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে 'Rabindranath forever এই আমার motto'। তবে শুধু বন্ধুত্বের আকর্ষণে নয়, রামানন্দের পত্রিকার উন্নত মানও রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে *প্রবাসী*-র 'বিবিধ প্রসঙ্গে' রামানন্দ শুধু রবীন্দ্রনাথকে প্রচার করেননি, রবীন্দ্র বিরোধিতার সমস্ত চেষ্টাকে কঠিন আঘাতে বিনষ্ট করেছেন। রবীন্দ্ররচনায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁর জীবন, আদর্শ, নীতির প্রচারে *প্রবাসী* হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের একটি কোষগ্রন্থ, যার পরিচয় বিধৃত আছে সোমেন্দ্রনাথ বসু রচিত 'সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' (*প্রবাসী*) গ্রন্থে। সকলেরই জ্ঞাত সেই

সুবিখ্যাত রামানন্দের তিনশ'টি টাকা, যেটি তিনি অগ্রিম দিয়ে রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। আর তারই টানে আড়াই বছর ধরে *প্রবাসী*-র পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের মহাকাব্যিক উপন্যাস 'গোরা'। এরপর অজস্র রচনায় *প্রবাসী*-কে আলোকিত করে রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। *প্রবাসী*- সম্পাদক নানা কৌশলে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে লেখা আদায় করে নিতে পারতেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই (১৩২৪ সালের ১১ কার্তিক) বলেছেন--

> আমি যদি প্রবাসীর সম্পাদক হতুম তাহলে রবীন্দ্রনাথকে সহজে ছাড়তুম না—ভয়, মৈত্রী, প্রলোভন প্রভৃতি নানা উপায়ে লেখা বেশি না পাই ত অল্প, অল্প না পাই ত স্বল্প আদায় করে নিতুম। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের দোষ হচ্ছে এই যে খেজুর গাছের মত উনি বিনা খোঁচায় রস দেন না। আপনি যদি আমাকে সময়মত ঘুষ না দিতেন তাহলে কোনোমতেই গোরা লেখা হত না।...যাই হোক প্রবাসীর লেখার জন্য মাঝে মাঝে তাড়া দেবেন তাতে বুঝতে পারব এখনো আপনি বিশ্বাস করেন আমি লিখতে পারি।

বাংলা ভাষায় *প্রবাসী*-র কৃতিত্ব কী, তার ভূমিকা কী এবং রামানন্দের ব্যক্তিত্ব কোথায় এই পত্রিকাকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নটি প্রণিধানযোগ্য :--

> প্রথম যখন রামানন্দের প্রদীপ ও পরে প্রবাসী বের করলেন তাঁর কৃতিত্ব ও সাহস দেখে মনে বিস্ময় লাগলো। আকারে বড়ো, ছবিতে অলংকৃত, রচনায় বিচিত্র, এমন দামী জিনিস যে বাংলাদেশে চলতে পারে তা বিশ্বাস হয়নি। তা ছাড়া এর আগে বাংলা সাময়িকপত্রে সময় রক্ষা করে চলার বাঁধাবাঁধি ছিল না। ...পাঠকদের ক্ষমাগুণের পরে নির্ভর করে এমনতর আটপৌরে ঢিলেমী করবার সুযোগ প্রবাসী-সম্পাদক স্বীকার করেননি--নিজের মানরক্ষার খাতিরেই সময়রক্ষার স্খলন হোতে দিলেন না।...
>
> প্রবাসী জাতীয় পত্রিকা দেশের একটা প্রয়োজন সিদ্ধি করেছে। জনসাধারণের চিত্তকে সাহিত্যের নানা উপকরণ দিয়ে তৃপ্ত করা এর ব্রত। এতে মনকে একেবারে জড়তায় জড়াতে দেয় না, নানা দিক থেকে মৃদু আঘাতে জাগিয়ে রাখে। (পত্রিকা পরিচয়, কার্তিক, ১৩৩৮)

১৯১৩ সালে ইংলন্ড থেকে রামানন্দকে একটি পত্রে লিখলেন--

> প্রবাসীর যে শত্রুসংখ্যা বাড়িতেছে ইহাতে আনন্দিত হইবেন। ইহাতে প্রবাসীর প্রভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শত্রু সৃষ্টি করা শক্তিরই লক্ষণ—বিশ্ববিধতারও শত্রুর অভাব নাই। আপনি বন্ধু যদি না পাইতেন তবে শত্রু দেখা দিত না। (২৯ বৈশাখ ; ১৩২০)

রঙে, রসে, ভাবনায়, মেধায় সবদিক থেকে *প্রবাসী* তার পূর্বসূরী পত্রিকাদের ম্লান করে দিয়েছিল। সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, দর্শন, সমকালীন সংবাদ এবং সুমুদ্রিত চিত্রসম্ভার বিতরণের এমন বিপুল প্রয়াস ইতিপূর্বে একত্রে আর দেখা যায়নি। ভালো পত্রিকা শুধু পাঠকদের ক্ষুধা মেটায় না, ক্ষুধা বৃদ্ধি বা সৃষ্টিও করে। *প্রবাসী* বাঙালি পাঠকের মনে ভালো ছবি, ভালো সাহিত্য, উন্নততর মননচর্চার নানা ধরনের চাহিদা সৃষ্টি করেছিল। রামানন্দের সম্পাদনায় সাধারণ বাঙালি শিক্ষিত পাঠকের মনের দিগন্ত বহুদূর প্রসারিত হয়েছিল *প্রবাসী*-তে। এখানেই *প্রবাসী*-র সার্থকতা।

দুই

'বেশ একটা নূতন ধরনের ideal (আদর্শ) মাসিক কাগজ' বের করার ইচ্ছে কিছুকাল ধরেই বিশিষ্ট সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলালের ছিল। প্রস্তাবিত পত্রিকাটির তিনি স্বয়ং সম্পাদক হবেন এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে প্রখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

পত্রিকা প্রকাশের যাবতীয় দায়দায়িত্ব বহন করতে রাজি হলেন। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ হবেন এর যুগ্ম-সম্পাদক। *ভারতবর্ষ* পত্রিকার জন্য ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ৭ চৈত্র বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের উদ্দেশে একটি প্রচারপত্র ছেপে বিলি করলেন, প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—

> বাঙ্গালা দেশে যে সর্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকার অভাব আছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে মাসিক পত্রিকার সংখ্যা যে কম তাহা আর বলিতে হইবে না। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া আমরা একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা করিয়াছি। বঙ্গসাহিত্যে জনৈক সুপ্রতিষ্ঠিত মনীষী আমাদের সংকল্পিত পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

এই জনৈক মনীষী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। প্রথম সংখ্যার পরিকল্পনা, লেখা নির্বাচন, সম্পাদকীয় লিখে প্রেসে পাঠিয়ে দেওয়ার পর অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর প্রবর্তিত আদর্শ অনুসারে পত্রিকা প্রকাশের জন্য গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠলেন। অবশেষে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সঙ্গে জলধর সেনকে সম্পাদক করে *ভারতবর্ষ* আষাঢ় ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হল।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখে ইতিপূর্বেই জলধর সেন যথেষ্ট সুপরিচিত। *ভারতবর্ষ* প্রকাশিত হবার আগে তিনি *ভারতী, সাহিত্য, মানসী, প্রদীপ, দাসী, ধ্রুব, বিজয়া* প্রভৃতি পত্রিকায় লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন। 'হিমালয়', 'প্রবাসচিত্র', 'বিশুদাদা', 'হিমাদ্রি', 'নৈবেদ্য', 'পথিক' ও বেশকিছু ছোটোগল্প লিখে তিনি তখন যথেষ্ট জনপ্রিয়। কিন্তু জলধরের লেখক-সত্তার অন্তরালে এক সম্পাদক সত্তাও ছিল। *ভারতবর্ষ* সম্পাদনার আগে প্রায় তিরিশ বছর ছটি নানাধরনের পত্রিকা সম্পাদনা সূত্রে, তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। *সাপ্তাহিক গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, বঙ্গবাসী, সাপ্তাহিক বসুমতী, সন্ধ্যা, হিতবাদী, সুলভ সমাচার* পত্রিকায় ছিল, তাঁর সম্পাদনা শিক্ষানবিশ পর্বের অনুশীলন ক্ষেত্র। *ভারতবর্ষ*-এর প্রথম সংখ্যায় জলধর এবং অমূল্যচরণের কোনো প্রভাব নেই, এটি সম্পূর্ণতই দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পাদিত। প্রথম সংখ্যাতেই শিল্পী দ্বিজেন্দ্র গোস্বামী অঙ্কিত 'ভারতবর্ষ' নামে একটি চিত্র--সমুদ্রের ঢেউ থেকে ভারতমাতা উঠছেন, মাথায় মুকুট, গলায় সাতনরি হার, ডানহাতে শস্যগুচ্ছ, আকাশে একপাশে উদীয়মান চন্দ্র, অন্যদিকে বিলীয়মান সূর্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত বিখ্যাত কবিতা 'ভারতবর্ষ'—'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ' স্বরলিপিসহ মুদ্রিত হয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রদত্ত পত্রিকার নামকরণকে সার্থক করেছিল। প্রথম সংখ্যায় লেখক হিসেবে ছিলেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রিয়ংবদা দেবী, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, অনুরূপা দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী প্রভৃতি। মোট ১৫২ পৃষ্ঠার মধ্যে ৫টি পূর্ণপৃষ্ঠা রঙিন ছবি পত্রিকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল। গল্প-উপন্যাস-কবিতা-প্রবন্ধ-সমালোচনা-বিবিধ প্রসঙ্গ-পুস্তক পরিচয় সাহিত্য-সংবাদ-চিত্রসম্ভারে পূর্ণ পত্রিকাটি প্রকাশমাত্রই পাঠকসমাজের আনুকূল্য অর্জন করেছিল। ১ম সংখ্যাতে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাংলা সাহিত্যের পূর্ববর্তী খ্যাতিমান লেখকদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে লিখেছিলেন-- 'আমাদের শাসনকর্তারা যদি বঙ্গসাহিত্যের আদর জানিতেন--তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত

হইতেন।' তাঁর ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল আরও লিখেছিলেন 'আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষয় প্রদীপ হইতে এই ক্ষুদ্র দীপ জ্বালাইয়া লইয়া শঙ্খ ঘণ্টায় মাতার আরতি করিতে আসিয়াছি।' পরবর্তী সম্পাদকেরা দ্বিজেন্দ্রলালের সেই আদর্শকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রথম তিন বছর যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর, চতুর্থ বছর থেকে পত্রিকা সম্পাদনার সমস্ত দায়িত্ব জলধর সেনের ওপর এসে পড়ল। আমৃত্যু এই দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন। তাঁর আমলে সর্বস্তরের নরনারীর পাঠোপযোগী একটি রুচিসম্মত পত্রিকা হয়ে উঠেছিল *ভারতবর্ষ*। দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণির লেখকের জন্য খোলা ছিল *ভারতবর্ষ*-এর দরজা। *ভারতবর্ষে* নবীন-প্রবীণ কে না লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ছাড়াও ইন্দিরাদেবী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নিরুপমা দেবী, অমলা দেবী, প্রবোধ সান্যাল, পরশুরাম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল লেখক *ভারতবর্ষে*-র জন্য লেখনী ধরেছেন। বহু তরুণ লেখকের প্রথম লেখা *ভারতবর্ষ*-এ প্রকাশিত হয়েছে, যাঁরা ভবিষ্যতে যশস্বী লেখকের সম্মান লাভ করেছিলেন। যেমন 'পরশুরাম' খ্যাত রাজশেখর বসুর প্রথম গল্প 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' *ভারতবর্ষে* মাঘ, ১৩২৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। *কল্লোলের* বিখ্যাত লেখক প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' ধারাবাহিকভাবে *ভারতবর্ষে* প্রকাশিত হয়। সম্পাদক জলধরের নবীন লেখকদের প্রতি প্রবল ভালবাসা ছিল। সততই উৎসাহ দিয়ে, বহু লেখা সংশোধন করে তিনি প্রকাশ করতেন। লেখক সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। *ভারতবর্ষের* গল্পের ভাণ্ডারের দিকে তাকালে বিস্মিত হতে হয়। সমকালের সকল গোষ্ঠীর নবীন-প্রবীণ গল্পকারেরা গল্প লিখেছেন *ভারতবর্ষে*। *কল্লোলের* প্রধান লেখকেরা বাদ যাননি। *ভারতবর্ষে* প্রকাশিত কয়েকটি বিখ্যাত গল্প---মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মহত্যার অধিকার' (পৌষ, ১৩৪০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যাধি' (পৌষ, ১৩৪০), বনফুলের 'ভিখারীটা' (আষাঢ়, ১৩৬৯), প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শবরী' (আষাঢ়, ১৩৬১), গোকুলচন্দ্র নাগের 'ঝরা পাতা' (আশ্বিন, ১৩২৯), জগদীশ গুপ্তের 'আরোহণ ও অবরোহণ' (আশ্বিন, ১৩৪৭), বুদ্ধদেব বসুর 'প্রথম ও শেষ' (বৈশাখ, ১৩৩৬) ইত্যাদি। যদিও গল্প-কবিতার ক্ষেত্রে সমকালীন *সবুজপত্র, কল্লোল, পরিচয়* যে নব্যধারায় সূত্রপাত করতে সক্ষম হয়েছিল, *ভারতবর্ষ* তা পারেনি।

ভারতবর্ষ-র প্রবন্ধসাহিত্য একটি পৃথক গবেষণার বিষয় হতে পারে। ইতিহাস, রাজনীতি, ভ্রমণ, প্রাচীন ভারতের নানা প্রসঙ্গ, বিজ্ঞান, বিনোদন, খেলাধূলা, অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ, সমকালীন নানা বিষয়--জীবনের সমস্ত কৌতূহলকে চরিতার্থ করার এক বিপুল আয়োজন ছিল *ভারতবর্ষে*। প্রথম সংখ্যাতেই প্রায় দেড়শো পৃষ্ঠায় ত্রিশটির মতো ছোট-বড় প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। বাঙালির মানসিক উৎকর্ষ বিধানে এগুলির উপযোগিতা প্রশ্নাতীত। প্রায় চার হাজার প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল--সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'পুরাণ ও হিন্দু সংস্কৃতি' (পৌষ, ১৩৩৯) বিমলাচরণ লাহার 'বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রেত-তত্ত্ব' (মাঘ, ১৩৩০), নরেন্দ্র দেবের 'অতীতের ঐশ্বর্য' (ফাল্গুন, ১৩৪১), ভূপতি চৌধুরীর 'ভারতের স্থাপত্য শিল্প' (বৈশাখ, ১৩৩৩), বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'সাহিত্যিক ভাষা ও চলিত কথা'

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩) আশালতা দেবীর 'নারী' (বৈশাখ, ১৩৩৫), শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'আচার্য ফ্রয়েড ও আমরা' (আশ্বিন, ১৩৪৫), অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'বঙ্কিম সাহিত্যে প্রেম' (কার্তিক, ১৩৪৬), জগদানন্দ রায়ের 'উদ্ভিদের স্নায়বিক উত্তেজনা' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১) ইত্যাদি।

প্রত্যেক লেখকের নামের পাশে তাঁর সামাজিক পদমর্যাদা বা শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করে দেওয়া হত। যেমন--দীনেশচন্দ্র সরকার এম. এ., পি. আর. এস, পি. এইচ. ডি, জীবনতারা হালদার এম. এস. সি, রাসবিহারী মণ্ডল এ. এম. আই. এম. ই, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এম. এ., পি. আর. এস. মনীষীনাথ বসু সরস্বতী এম. এ, বি. এল, এম. আর. এ. এস ইত্যাদি। এই পরিচয় লিখনের মাধ্যমে পত্রিকার সম্ভ্রান্ত চেহারাই প্রকাশিত হত।

পত্রিকাকে পাঠকের গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য জলধর পত্রিকায় বিষয়-বৈচিত্র্যের আয়োজন করেছিলেন। প্রথম প্রতিমাসের পয়লা তারিখে পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। এর সঙ্গে তুলনীয় ছিল একমাত্র *প্রবাসী*। পত্রিকায় 'নিখিল প্রবাহ' এবং 'বৈদেশিকী' নামক দুটি বিভাগে বিদেশি সাহিত্যের চর্চা হত। আবার প্রাদেশিক সাহিত্যচর্চাও অবহেলিত ছিল না। যেমন রসিকলাল রায় মাঘ ১৩২২ এবং বৈশাখ ১৩২৩ সংখ্যায় দুটি সুদীর্ঘ সচিত্র প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন—যথাক্রমে 'হিন্দি-সাহিত্য ও তাহার সেবকগণ' এবং 'গুজরাতী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' নামে। অন্যান্য বিভাগের মধ্যে 'সাময়িকী' ছিল সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন ঘটনার সংবাদ—যেগুলি তৎকালীন ইতিহাস রচনার অন্যতম দলিল। 'সাহিত্য-সংবাদ'-এ থাকত সম্প্রতি প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের মূল্যসহ প্রকাশ-সংবাদ। 'পুস্তক-পরিচয়'-এ বিভিন্ন গ্রন্থের সমালোচনা। 'শোক-সংবাদ' শিরোনামে বিখ্যাত মানুষদের সচিত্র জীবনী প্রকাশ করা হত। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বিভাগে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করতেন। যেমন—চণ্ডীদাস-প্রসঙ্গ, ব্যাক্টেরিয়া, নিরক্ষর কবি ঈশান ফকিব, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ (মীরাট শাখা), চীন দেশে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ব্যোমপথ-পরিদর্শন, শ্যাক্‌লটনের অ্যান্টার্কটিক মহাসাগর যাত্রা—এগুলি সবই একটি সংখ্যায় (আষাঢ়, ১৩২৩) প্রকাশিত। এর থেকেই অনুমান হয় কত বিচিত্র বিষয়ই না জলধর আয়োজন করেছিলেন শিক্ষিত বাঙালির মানসিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য। এছাড়াও *ভারতবর্ষে* অজস্র চিত্রও প্রকাশিত হত। অঙ্কিত চিত্র ও আলোকচিত্র উভয়ই ছিল *ভারতবর্ষের* চিত্রশালায়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জলধরের মধুর সম্পর্ক ছিল। যদিও রবীন্দ্রনাথ *ভারতবর্ষ*-এ খুব বেশি লেখেননি। তাঁর 'বাঁশরী' নাটকটি মুদ্রিত হয়েছিল, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩৪০ সংখ্যায়। তবে *ভারতবর্ষ*-এ রবীন্দ্রনাথ প্রথম সংখ্যা থেকেই উপস্থিত। প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর চিত্র মুদ্রিত হয়েছিল। এছাড়াও রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে প্রচুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে *ভারতবর্ষে*। যেমন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'ভারতবর্ষের কালচার ও রবীন্দ্রনাথ' (বৈশাখ, ১৩২৯), নীহাররঞ্জন রায়ের 'রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যের ভূমিকা' (শ্রাবণ, ১৩৩৬), দিলীপকুমার রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও কাব্যসঙ্গীত' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫), রাধারাণী দত্তের 'অন্তঃপুরে রবীন্দ্রনাথ' (শ্রাবণ, ১৩৩৫), নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের 'রজনীকান্ত ও রবীন্দ্রনাথ' (কার্তিক, ১৩২৮) ইত্যাদি। এর মধ্যে অনেক প্রবন্ধই পরবর্তীকালের রবীন্দ্র গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্যবান।

তবে *ভারতবর্ষ* মাতিয়ে রেখেছিলেন শরৎচন্দ্র। ১৩২০-এর পৌষ-মাঘে 'বিরাজ-বৌ' নিয়ে *ভারতবর্ষে* শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। এবপর প্রতিমাসেই প্রকাশিত হতে থাকে

'পণ্ডিতমশাই', 'মেজদিদি', 'দর্পচূর্ণ', 'আঁধারে আলো', 'পল্লীসমাজ', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'অরক্ষণীয়া', 'শ্রীকান্ত', 'দেবদাস', 'নিষ্কৃতি', 'একাদশী বৈরাগী', 'দত্তা', 'গৃহদাহ', 'দেনাপাওনা', 'নববিধান', 'শেষ প্রশ্ন', 'অনুরাধা', 'শেষের পরিচয়' (অসমাপ্ত)। শরৎচন্দ্রকে দিয়ে এই ব্যাপক লিখিয়ে নেওয়ার জন্য সম্পাদক জলধরের কাছে বাংলা সাহিত্য চিরকাল ঋণী হয়ে থাকবে। কারণ তাঁর ক্রমাগত তাগিদেই স্বভাব-অলস শরৎচন্দ্রের লেখনী সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। কোনো কোনো সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের দুটি লেখাও প্রকাশিত হয়েছে। বলা যেতে পারে, *প্রবাসী* যেমন রবীন্দ্রনাথকে, ঠিক সেরকমই *ভারতবর্ষ* শরৎচন্দ্রকে ক্রমাগত পরিপোষণ করে গেছে। শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হলে ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৪৪ সংখ্যায় 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র' নামে জলধর এক বিশেষ মূল্যবান ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেন, যেখানে শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সমকালের প্রায় সকল বিশিষ্ট লেখক ও চিন্তাবিদেরা শ্রদ্ধার্ঘ জ্ঞাপন করেছিলেন।

ভারতবর্ষে নারীদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। লেখিকাদের অনায়াস লেখনীতে মুখর ছিল *ভারতবর্ষের* প্রায় প্রতিটি সংখ্যা। মেয়েদের সমস্যা, সংকট, শিক্ষা, সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জলধর মেয়েদের দিয়েই লিখিয়ে নিতেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় কার্তিক, ১৩২২ সংখ্যাটি 'মহিলা সংখ্যা' রূপে তিনি প্রকাশ করেন। এই সংখ্যায় জ্যোতির্ময়ী দেবী, সুনীতি দেবী, উর্মিলা দেবী, সুশীলা সেন, অমলা দেবী, মৃণালিনী সেন প্রমুখ লেখিকাদের রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

বলা যেতে পারে, সুরুচিপূর্ণ মনোগ্রাহী একটি পত্রিকা গড়ে তুলেছিলেন জলধর। অচিন্ত্যকুমার লিখছেন--

'ওদিকে সব চেয়ে, জনপ্রিয় ছিল "ভারতবর্ষ"---কাটতির জনশ্রুতি পরিস্ফীত'।[১০]

শিক্ষিত বাঙালির কাছে *ভারতবর্ষ* ছিল জনপ্রিয়তম পত্রিকা। জলধরের সম্পাদনায় বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালির দুষ্প্রাপ্য অ্যালবাম হয়ে উঠেছিল *ভারতবর্ষ*। সেই সময়ের বাঙালি জীবনের যাবতীয় সংবাদ আমরা *ভারতবর্ষের* পাতায় পেয়ে যাব। *ভারতবর্ষ* কোনো নতুন বার্তা বাংলা সাহিত্যে সূচিত করতে না পারলেও, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির সুস্থ শিল্প-সাহিত্য ও সমকাল সচেতনতাকে সর্বদা জাগ্রত রাখতে এবং তাকে পরিপুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল। এখানেই *ভারতবর্ষের* সার্থকতা।

তিন

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে *প্রবাসী, সবুজ পত্র, ভারতবর্ষ, কল্লোল*-এর পাশাপাশি আরও একটি পত্রিকা প্রচলিত ছিল, সেটি *মাসিক বসুমতী*। কিন্তু অন্যান্য পত্রিকাগুলির সম্পাদনা বা সাহিত্যকর্মে যে বৈদগ্ধ্য বা আভিজাত্যের স্বাক্ষর ছিল, *মাসিক বসুমতী*-র তেমন কোনো চিহ্ন নেই। তথাপি ১৩২৯ সালের বৈশাখে আত্মপ্রকাশ করে প্রায় ৪৮ বছর এই পত্রিকা আপন নিজস্বতায় প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটি ছিল 'বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের' মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে সম্পাদক করে বসুমতীর সত্ত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করলেন *মাসিক বসুমতী*। সমকালের শ্রেষ্ঠ পত্রিকাগুলি থাকা সত্ত্বেও এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম সংখ্যার 'পত্রসূচনায়' হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঠিক ৫০ বছর আগে

১ বৈশাখ, ১২৭৯, *বঙ্গদর্শন* প্রকাশ মুহূর্তে বঙ্কিমের অভিমতকে স্মরণ করেছিলেন যে যতদিন না শিক্ষিত বাঙালি তাঁদের জ্ঞান ও চিন্তা বাংলা ভাষায় প্রকাশ করবেন ততদিন বাঙালির উন্নতির সম্ভাবনা নেই। পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, বাংলা সাহিত্যও বিশেষ সমৃদ্ধ হয়েছে। তথাপি হেমেন্দ্রপ্রসাদ লিখেছিলেন--

> ভাবের প্রচার যত অধিক হয়, উন্নতির পথ ততই জাতির পক্ষে সুগম হয়। সেইজন্য আমরা যথাসাধ্য সাহিত্যের সহায়তায় দেশের সেবা করিবার জন্য এই পত্রিকার প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মা'র আশীর্বাদ ও বঙ্গীয় পাঠকদিগের প্রীতি লাভ করিতে পারিলে আমরা শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।
>
> কোন কোন সাময়িকপত্রে রাজনীতিক কথার আলোচনা বর্জিত হয়। আমরা তাহা করিব না। আজকাল রাজনীতিক সমস্যাই দেশের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা--দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতি রাজনীতিক উন্নতিসাপেক্ষ। সেইজন্য আমরা রাজনীতিক বিষয়ের আলোচনা করিব। বিজ্ঞানের কথা, শিল্পবাণিজ্যের কথা--ঐতিহাসিক কথা, কৃষি প্রভৃতির উন্নতির আলোচনা, সামাজিক সমস্যার আলোচনা--এই পত্রিকায় থাকিবে। আর পাঠকদিগের চিত্ত বিনোদন করিবার উদ্দেশ্যে গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি ইহাতে প্রকাশিত হইবে। যাহাতে ইহার চিত্রসম্পদ প্রবন্ধ গৌরবের উপযোগী হয়, সেদিকেও আমরা দৃষ্টি রাখিব।

মাসিক বসুমতী-র উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার মধ্যে ছিল এই প্রত্যয়। পরাধীন ভারতবর্ষ ও ঔপনিবেশিক শাসনের যন্ত্রণা তৎকালীন শিক্ষিত মানুষকে খুব স্বাভাবিকভাবে স্বদেশ, স্বদেশিসমাজ, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের পরিচালকদের মধ্যেও এই মানসিকতা সক্রিয় ছিল। তাই অভিজ্ঞ সাংবাদিক, কথাসাহিত্যিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সম্পাদনায় *মাসিক বসুমতী* গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-কবিতা-আন্তর্জাতিক সংবাদ সাম্প্রতিক বিষয় সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ প্রকাশিত হল।

বসুমতীর সত্ত্বাধিকারীরা রামকৃষ্ণ-ভক্ত হওয়ার দরুণ প্রথম সংখ্যার শুরুতে রামকৃষ্ণের একটি ত্রিবর্ণ চিত্র ছিল। প্রথম সংখ্যা ৫ হাজার ছাপা হয় এবং এক সপ্তাহের মধ্যে তা নিঃশেষিত হয়। তাই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা *মাসিক বসুমতী*-র সঙ্গে বৈশাখ সংখ্যা আবার ছাপা হয়েছিল এবং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ১০ হাজার মুদ্রিত হয়েছিল। প্রকাশ সংখ্যাই প্রমাণ করে *বসুমতী*-র জনপ্রিয়তা। ১৩৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩২৯) কবিতা, প্রবন্ধ, ধারাবাহিক উপন্যাস, রসরচনা এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ ছাড়াও ভবানীচরণ লাহার দুটি চিত্র 'পানকৌড়ির প্রেমালাপ' ও 'দিনের বেসাতি' সহ পত্রিকাটি আবির্ভাবমাত্রই ব্যাপক পাঠক-চাহিদা তৈরি করতে পেরেছিল। হেমেন্দ্রপ্রসাদের আন্তরিক আহ্বানে তখন *বসুমতীতে* লিখছেন--স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কালিদাস রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনবিহারী গুপ্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ সেকালের শ্রেষ্ঠ লেখকবৃন্দ। কিন্তু *দৈনিক বসুমতী*-র অত্যধিক কাজের দায়িত্বের কারণে ১৩৩০-এর অগ্রহায়ণের পর হেমেন্দ্রপ্রসাদ আর পত্রিকা সম্পাদনা করেননি।

এবারে সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন স্বয়ং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৩৩১-এর কার্তিক পর্যন্ত তিনি এককভাবে সম্পাদনা করেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদের মতো মেধা বা উদার দৃষ্টিভঙ্গি

সতীশচন্দ্রের ছিল না। তিনি ছিলেন রক্ষণশীল স্বভাবের মানুষ। গোঁড়া হিন্দুধর্ম বিশ্বাসী, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নির্দেশিত পথের অনুসারী, সতীশচন্দ্র 'মাসিক বসুমতী'কে 'ফ্যামিলি ম্যাগাজিন' বা পারিবারিক পত্রিকা করে তুলতে চাইলেন যা বাড়ির সকলে পড়তে পারে। মাস চারেক পর পত্রিকার নাম ঈষৎ পরিবর্তন করে রাখলেন *সচিত্র মাসিক বসুমতী*। প্রথম সংখ্যা থেকে পত্রিকার প্রথম পাতার উপরে শোভা পেত বিশ্বগোলকের ছবি। সতীশচন্দ্র তার জায়গায় চিত্রশিল্পী হেমেন মজুমদারকে দিয়ে আঁকালেন স্তন্যদানরত মাতৃমূর্তির ছবি। চিত্রের এই পরিবর্তনেই সতীশচন্দ্রের আদর্শ প্রতিফলিত হল। কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর ১৩৩১-এর অগ্রহায়ণ থেকে সতীশচন্দ্রের সহযোগী হলেন সত্যেন্দ্রকুমার বসু। এঁদের যৌথ সম্পাদনাকালে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল পত্রিকার লেখক তালিকায় রবীন্দ্রনাথের অন্তর্ভুক্তি। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ, আষাঢ়, পৌষ ও চৈত্র মাসে রবীন্দ্রনাথের ৩টি নাটক 'নটীর পূজা', 'শেষ রক্ষা' ও 'ঋতুরঙ্গ' প্রকাশিত হয়। এছাড়া 'শিবের ভিক্ষা' এবং অনেকগুলি গানও প্রকাশিত হয়। ১৩৩৫-এর বৈশাখ থেকে ১৩৩৬-এর শ্রাবণ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'বিলাতের স্মৃতি'। এছাড়াও বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ 'সৃষ্টির মিলন' (চৈত্র ১৩৩২), 'তরুণের সাধনা' (বৈশাখ, ১৩৩৩), 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র' (আষাঢ়, ১৩৫১) ইত্যাদি *বসুমতীর* পৃষ্ঠাকে অলংকৃত করে। কিন্তু অচিরেই রবীন্দ্রনাথের উদার বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সহমত পোষণ করতে পারলেন না *বসুমতীর* কর্ণধারেরা। রবীন্দ্রনাথের অস্পৃশ্যতা বা হিন্দু সমাজের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধতা বিষয়ক ভাবনা, কিংবা গান্ধীর আদর্শের প্রতি তাঁর সহমত পোষণ না করার বিষয়ে রক্ষণশীলেরা তাঁর বিরূপ সমালোচনা শুরু করেন। ১৩৩৯-এর গোড়া থেকে যতীন্দ্রমোহন সিংহ 'বিশ্বকবির অনধিকারচর্চা' (ফাল্গুন, ১৩৩৯), 'বিশ্বকবির কারুণ্যোচ্ছাস' (অগ্রহায়ণ, ১৩৪২), প্রবন্ধে, রমাপ্রসাদ চন্দ 'রবীন্দ্র বিদূষণ' (কার্তিক, ১৩৩৯), 'গোড়ার কথা ও শেষের কবিতা' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯), 'বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বকবি' (ভাদ্র, ১৩৩৯) প্রভৃতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে বিরোধিতা করে শাণিত লেখনী চালনা করলেন।

১৩৪০-এর চৈত্র সংখ্যার পর সত্যেন্দ্রকুমারকে সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। সতীশচন্দ্র এককভাবে সম্পাদনা করে যেতে লাগলেন ১৩৫০-এর চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত। রামকৃষ্ণভক্ত, গোঁড়া হিন্দু সতীশচন্দ্র হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের জাগরণ সম্ভব বলে মনে করতেন। তাঁর উৎসাহে হিন্দুধর্ম ও তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা *মাসিক বসুমতী*-তে সেই সময় প্রচুর প্রকাশিত হয়েছে। এইসকল রচনার মধ্যে অনিলবরণ রায়ের 'বেদান্ত দর্শন ও গীতা' (কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫), অশোকনাথ শাস্ত্রীর 'পূর্বমীমাংসাদর্শনে ঈশ্বর' (পৌষ, ১৩৪৭—মাঘ, ১৩৪৮), 'রস' (কার্তিক, ১৩৪৯—শ্রাবণ, ১৩৫০), আশুতোষ শাস্ত্রীর 'উপনিষদের ব্রহ্মবাদ' (কার্তিক, ১৩৪৮—বৈশাখ, ১৩৪৯), দেবেন্দ্রমোহন চক্রবর্তীর 'আত্মা ও আত্মানুভূতি' (কার্তিক, ১৩৪৪), নলিনীকান্ত ভট্টশালীর 'হিন্দুর পূজা' (আশ্বিন, ১৩৪৯), সাধনচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ভারতে অধ্যাত্মদর্শন' (আষাঢ়, ১৩৪৫), রামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রীর 'গীতা ও অধ্যাত্মবাদ' (পৌষ, মাঘ, ১৩৪০), নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদের 'ন্যায়দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ' (ভাদ্র, ১৩৪২), সতীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'মনুসংহিতায় অহিংসাধর্ম' (ফাল্গুন, ১৩৩৩) ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। সাহিত্যাদর্শেও তিনি ছিলেন পুরাতনপন্থী। সাহিত্যে চলিতভাষার ব্যবহার তিনি সমর্থন করতেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি নিজে চলিত ভাষার

লেখাগুলিকে সাধু ভাষায় রূপান্তরিত করে প্রকাশ করতেন। এর পাশাপাশি আবার আদিরসাত্মক ছবিও প্রকাশিত হত, সতীশচন্দ্রের সম্পাদনাকালেই। ইংরেজ শিল্পী টমাস এবং ঠাকুর সিং-এর আঁকা বেশকিছু অর্ধনগ্ন নারীচিত্র : বিশেষ করে 'সিক্তা' (বৈশাখ, ১৩৪৬-এ প্রকাশিত) ছবিটিকে কেন্দ্র করে সেকালে যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। *শনিবারের চিঠি*-র সম্পাদক সজনীকান্ত এই ছবিগুলি সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করে এই পত্রিকার রুচিবিকার নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন। তবে টমাস বা ঠাকুর সিং ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন মজুমদার, গোপাল ঘোষ, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র সিংহ, অতুল বসু, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীদের চিত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

১৩৫১-এর বৈশাখে সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর সম্পাদক হলেন যামিনীমোহন কর। যামিনীমোহন সহযোগী হিসেবে পেলেন সতীশচন্দ্রের জামাতা প্রাণতোষ ঘটককে। *মাসিক বসুমতী*-র প্রকৃতির পরিবর্তন হতে শুরু করল। ১৩৫২ থেকে *মাসিক বসুমতী*-তে কবিতা লিখতে শুরু করলেন অতি আধুনিক কবিরা—প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে প্রমুখ। গল্পকাররূপে এলেন নতুন যুগের লেখকেরা--অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ। উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'স্বর্গাদপি গরীয়সী', তারাশঙ্করের 'ঝড় ও ঝরাপাতা', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'মিনাকুমারী', 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নগরবাসী' ও 'মাটি', রমাপদ চৌধুরীর 'লালবাঈ', রঞ্জনের 'শীতে উপেক্ষিতা' ও 'অন্তরা', সুলেখা দাশগুপ্তের 'মিত্রা', 'বর্ণালী', 'হৃদয় পাতো', বিক্রমাদিত্যের 'দেশে দেশে', আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'নার্স মিত্র', 'পঞ্চতপা' ইত্যাদি। ১৩৫২-র শ্রাবণ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে লাগল যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত'; যা অচিরেই সারা বাংলাদেশের পাঠকহৃদয়কে জয় করে নিয়েছিল। প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও আমরা পেয়েছি সৈয়দ মুজতবা আলী, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, মেঘনাদ সাহা, সুশীলকুমার দে, বিনয় ঘোষ প্রমুখ প্রাবন্ধিকের রচনা। ছবির ক্ষেত্রেও প্রকাশিত হল টমাস বা ঠাকুর সিং-এর বদলে গোপাল ঘোষ, জয়নুল আবেদিন, অবনী সেন, শৈল চক্রবর্তী, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রমুখের ছবি এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ছবিও। যামিনীমোহনের আমলে কয়েকটি নতুন বিভাগও শুরু হল--যেমন 'অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ'--এখানে প্রধানত নারীরা তাঁদের সৃজনসত্তাকে উন্মোচিত করতেন। 'পত্রগুচ্ছ' বিভাগে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পত্রাবলী প্রকাশিত হত। এছাড়া 'রঙ্গ পট' 'জলস্থল অন্তরীক্ষ' প্রভৃতি বিভাগও ছিল। গ্রাহক সংখ্যাও দ্রুত বাড়তে লাগল।

মাসিক বসুমতী-র এই পরিবর্তন প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চিঠি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে--'এমন আন্তরিকতার সঙ্গে কেউ কোনদিন আমাকে লিখতে আহ্বান জানায়নি। বসুমতীতে লিখব বৈকি, নিশ্চয় লিখব।...আমি লোকমুখে শুনেছি ও স্বচক্ষে দেখেছি মাসিক বসুমতীর উন্নতির জন্য আপনি কি অপরিসীম পরিশ্রম করছেন।' (১০/৮/৪৬ তারিখের পত্র)। কিছুদিন পরে ১৭/১/৪৭-এ আরেকটি পত্রে লিখছেন--'মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাচ্ছি জানবেন। এমন অদ্ভুত সমন্বয় অন্য কোন পত্রিকায় দেখিনি। সাহিত্যের সঙ্গে শিল্পের মিলন করেছেন আপনি, তাই এত সুন্দর হয়েছে কাগজ। তাছাড়া আপনি তো দেখছি সকল দলের সাহিত্যিককে একত্র করেছেন।' ১৩৫৭-এর আশ্বিন সংখ্যা থেকে পুরোপুরি সম্পাদক হলেন প্রাণতোষ ঘটক। দীর্ঘ ২০ বছর তিনি যোগ্যতার সঙ্গে

সম্পাদনা করে গেছেন *মাসিক বসুমতী*।

প্রাণতোষের সম্পাদনায় *মাসিক বসুমতী* আরও লোকপ্রিয় হয়ে উঠল। বেশ কয়েকটি ধারাবাহিক রচনা এইকালে ব্যাপক পাঠক-জনপ্রিয়তা অর্জন করল। যার মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ', 'পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি', 'অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ' ; সজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি', মনোজ বসুর 'চীন দেখে এলাম', 'সোবিয়েতের দেশে দেশে', রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'ভলগা থেকে গঙ্গা' (অনুবাদ), পরিমল গোস্বামীর 'স্মৃতিচিত্র', প্রাণতোষ ঘটকের 'আকাশপাতাল' ইত্যাদি। এছাড়াও পার্ল বাকের 'দি গুড আর্থ', এডগার অ্যালান পো-এর 'রুমর্গের হত্যাকাণ্ড' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত। ১৩৬০-এর ভাদ্র সংখ্যা থেকে 'চারজন' নামে একটি বিভাগ শুরু হল, যেখানে চারজন বাঙালির সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হত যাঁরা সচরাচর পরিচিত নন, কিন্তু অবশ্যই স্মরণীয়। এছাড়া 'বিজ্ঞান-জগৎ' বিভাগে বিজ্ঞান বিষয়ক ছোটো ছোটো নিবন্ধ প্রকাশিত হত। 'ছোটদের আসর' বিভাগে তৎকালীন সকল শিশুসাহিত্যিক--প্রভাতকিরণ বসু, হেমেন্দ্রকুমার রায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শৈল চক্রবর্তী, ইন্দিরা দেবী, যাদুকর পি. সি. সরকার প্রমুখ ছোটদের জন্য গল্প, কবিতা, ছোট ছোট ফিচার প্রভৃতি লিখতেন। বিভাগটি ছোটোদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

মাসিক বসুমতী-র চরিত্রের বিস্তৃতি বোঝা যায় তার 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি' বিভাগটির দিকে তাকালে। কোনো একটি সংখ্যার 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি'র বিষয়গুলির দিকে তাকালে বোঝা যাবে, *মাসিক বসুমতী* সাধারণ বাঙালি পাঠকদের কতখানি সমকালীন বিশ্ব-পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে চাইত। যেমন--বৈশাখ, ১৩৫২ সংখ্যাটির 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি' বিভাগে আলোচিত হয়েছে--'য়ুরোপে যুদ্ধ শেষ', 'হিটলার কোথায়?', 'মুসোলিনীর মৃত্যু', 'পদানত ও অধিকৃত জার্ম্মানী', 'বিজয়ের মূল্য', 'যুদ্ধ থামে নাই', 'আগামী যুদ্ধ', 'সানফ্রান্সিস্কো বৈঠক', 'সি' ক্লাশ হইতে 'এ' ক্লাশ', 'রুশিয়া বনাম নির্জ্জিত জাতি', 'নাবালক জাতিদের আর্ত্তনাদ', 'অর্থনীতিক দাসত্ব'। 'সাময়িক প্রসঙ্গ' বিভাগটিতেও থাকত সমকালীন নানান বিষয়ের আলোচনা। যেমন--বৈশাখ, ১৩৫২ সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে--নূতন অর্থ-সচিবের দায়িত্ব, যুদ্ধ ও ভারত সরকারের অর্থনীতি, ব্রিটেনের যুদ্ধোত্তর বহির্বাণিজ্য, ভারতীয় শ্রমশিল্পের ভবিষ্যৎ, খাদ্য-শিল্প, দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব, আমেরিকায় শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী, বাঙ্গালার বস্ত্র-সঙ্কট, বিশ্বশান্তির স্বরূপ, করুণার আবেদন, অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি, কলিকাতার নূতন মেয়র, অধ্যাপক দাশগুপ্তের দান, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভাবা যায়, এ তো প্রায় সম্পূর্ণ একটি সংবাদপত্র! 'অশ্রু-অর্ঘ্য' বিভাগটিতে থাকত সদ্যপ্রয়াত বিশিষ্ট মানুষদের সংবাদ। এছাড়াও ছিল 'স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য', 'খেলাধূলা'। সম্পূর্ণই একটি মনোরম ঘরোয়া পত্রিকা বলা যেতে পারে *মাসিক বসুমতী*-কে। জনপ্রিয়তা ও বিক্রিতে ছিল সর্বাধিক।

প্রাণতোষের সম্পাদনাকালেই রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসাহিত্য কেন্দ্রিক মূল্যবান প্রচুর প্রবন্ধ মননশীল সব প্রাবন্ধিকেরা *মাসিক বসুমতী*-র পাতায় লিখেছেন। যে রবীন্দ্রনাথকে এককালে *মাসিক বসুমতী* বিরোধিতা করেছিল, সেখানেই রবীন্দ্র-চর্চা শুরু হল। *মাসিক বসুমতী*-র প্রকৃতি পরিবর্তনের এটিও অন্যতম দিক। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল--জয়দেব রায়ের

'রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত' (চৈত্র, ১৩৫৭), তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যের বাস্তবতা' (ভাদ্র, ১৩৬০), ডা. নরেশচন্দ্র ঘোষের 'রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা' (কার্তিক, ১৩৬৮), শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'টলস্টয়, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ' (আষাঢ়, শ্রাবণ, ১৩৬৮), ক্ষিতিমোহন সেনের 'মানবতাধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ' (বৈশাখ, ১৩৫৪), কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'রবীন্দ্র-উপন্যাস চরিত্র চিত্রণ : বিনোদিনী' (পৌষ, ১৩৬৮), চিত্তরঞ্জন দেবের 'য়েটস ও রবীন্দ্রনাথ' (মাঘ, ১৩৭২), সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও অসমীয়া সাহিত্য' (চৈত্র, ১৩৬৭) ইত্যাদি। এই প্রবন্ধগুলি পরবর্তীকালে রবীন্দ্রচর্চায় অত্যন্ত মূল্যবান বলে গৃহীত হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ ভক্ত সতীশচন্দ্রের আগ্রহেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা প্রচারে *বসুমতী* যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। প্রাণতোষের সম্পাদনাকালে বেশ কিছু মননসমৃদ্ধ রামকৃষ্ণ বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। যার মধ্যে উমাপদ মুখোপাধ্যায়ের 'শ্রীরামকৃষ্ণে লীলায় নারীর স্থান' (অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭), বিনয়কুমার সরকারের 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ দর্শন' (কার্তিক, ১৩৬১), স্বামী জগদীশ্বরানন্দের 'ব্রাহ্মসমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫), সৈয়দ মুজতবা আলীর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব' (আশ্বিন, ১৩৬১) প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য।

প্রাণতোষের সম্পাদনায় *মাসিক বসুমতী*-র সর্বাঙ্গীণ উন্নত মান কিন্তু ধীরে ধীরে অবনত হতে লাগত। বিশেষ করে ১৩৬৯-৭০ থেকে পত্রিকাটি তার পূর্বের সুনাম আর বজায় রাখতে পারল না। কাগজ ও ছাপার মান ক্রমশই খারাপ হতে লাগল। গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের মানও যথেষ্ট অধোমুখী। এদিকে ব্যবসায়িক লাভালাভ ও জনপ্রিয়তাকে রক্ষা করার জন্য ১৩৭২ থেকে 'মাসিক রাশিফল', 'সচিত্র বোম্বাই সমাচার', 'জবাবদিহি', এমনকি 'যৌনবিজ্ঞান বিভাগ' খোলা হল। শস্তা বাজারচলতি পত্রিকা হয়ে উঠল *মাসিক বসুমতী*। ১৩৭৬-এ প্রাণতোষ চেষ্টা করলেন *মাসিক বসুমতী*-কে পুনরায় পরিমার্জিত করবার। ১৩৭৬-এর বৈশাখ থেকে পরপর প্রচ্ছদচিত্রে এলেন কার্ল মার্কস, নীটসে, হেগেল, কান্ট প্রমুখ বিশ্বখ্যাত চিন্তানায়কেরা। নতুন করে কবিতা লিখতে শুরু করলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রমুখ আধুনিক কবিকুল। কিন্তু ১৩৭৭-এর শ্রাবণ মাসে প্রাণতোষের মৃত্যু হল। ভাদ্র সংখ্যা থেকে অস্থায়ী সম্পাদক হলেন বিজনকুমার সেন। কিন্তু তিনি আর ধারাবাহিকভাবে *মাসিক বসুমতী*-কে প্রকাশ করতে পারেননি। আস্তে আস্তে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেল।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবীন-প্রবীণ, প্রাচীন-আধুনিক প্রায় সব লেখকেরাই *মাসিক বসুমতী*-তে লিখেছেন। কিন্তু উপন্যাস বা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে *মাসিক বসুমতী* কোনো নতুন পর্ব সূচিত করতে পারেনি। *মাসিক বসুমতী*-র পাতায় হয়নি উপন্যাস বা ছোটোগল্পের কোনো নব নিরীক্ষা। তবে বেশকিছু স্মরণীয় ছোটোগল্প *মাসিক বসুমতীতে* প্রকাশিত হয়েছে। যেমন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জ্যোতিষী মহাশয়', 'বি. এ. পাস কয়েদি', 'জামাতা বাবাজী', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠি', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আজ কাল পরশুর গল্প', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চুয়া-চন্দন', 'মৃৎপ্রদীপ', 'রক্তসন্ধ্যা', 'সীমান্ত হীরা', অমৃতলাল বসুর 'থিয়েটারে পিনু', শিবরাম চক্রবর্তীর 'আমার শিকারোক্তি', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'ফেরিওয়ালা', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গোঁসাই-দাস', বনফুলের 'ধনী-দরিদ্র' ইত্যাদি কালজয়ী সব গল্প। বিশ শতকের নামি-অনামি সকল ঔপন্যাসিকের লেখাই *মাসিক বসুমতী*-তে বেরিয়েছে। তবে

মূল্যবান অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (বৈশাখ--শ্রাবণ, ১৩৩৯), 'বাংলা সাময়িকপত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' (বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৫৮) ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৩৫৩-এর ফাল্গুন থেকে ধারাবাহিকভাবে বেরোয় বিনয় ঘোষের 'বাংলার জাগৃতি', 'যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর' (বৈশাখ, ১৩৬২—কার্তিক, ১৩৬৩)। এছাড়াও যদুনাথ সরকার, গোপাল হালদার, সুশীলকুমার দে, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিনয় ঘোষ, ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখের ইতিহাস, সাহিত্য, রাজনীতি, শিল্পকলা, সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক অজস্র প্রবন্ধে *মাসিক বসুমতী*-র প্রবন্ধের ভাণ্ডার বর্ণময় ও সম্পদশালী। আবার এর পাশাপাশি মনোগ্রাহী রোমাঞ্চকর কাহিনিও প্রকাশিত হত। দীনেন্দ্রকুমার রায়, পঞ্চানন ঘোষাল, নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রমুখ ধারাবাহিকভাবে পাঠকদের রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনি পরিবেশন করতেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করেই বলা যেতে পারে *মাসিক বসুমতী* ছিল এক 'অদ্ভুত সমন্বয়ের' পত্রিকা। প্রাচীন-নবীন, রক্ষণশীলতা-উদারতা, ধর্ম-রাজনীতির এমন সহাবস্থান সচরাচর চোখে পড়ে না। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'সাহিত্যের সহায়তায় দেশের সেবা করিবার' ব্রত সম্পাদকেরা রক্ষা করতে পারেননি। বরং এক বাণিজ্যসফল পাঠকচিত্ত-বিনোদনকারী ঘরোয়া পত্রিকা বা ফ্যামিলি ম্যাগাজিন হিসেবেই সাধারণ পাঠকদের কাছে অত্যন্ত আদৃত হয়েছিল। সমকালীন *কল্লোল* বা *পরিচয়*-এর আন্দোলনের দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হননি *মাসিক বসুমতী*-র কর্ণধারেরা। বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পত্রিকা হওয়ার দরুণ অচিরেই তাঁরা অধিক মনোযোগী হয়েছিলেন সরস্বতীর তুলনায় লক্ষ্মীর আরাধনায়। সেই আরাধনা তাঁদের অবশ্যই সফল হয়েছিল।

চার

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা সাময়িকপত্রের জগতে *বিচিত্রা*-র আবির্ভাব যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। সেই মুহূর্তে বাংলায় সাময়িকপত্রের অভাব ছিল না। *সবুজপত্র* ও *কল্লোল* তো বাংলা সাহিত্যের ধারা পরিবর্তনে দুটি মাইলস্টোন। এছাড়াও ছিল বাঙালির মন জয় করা *প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, যমুনা, শনিবারের চিঠি* ইত্যাদি। কিন্তু এই সমারোহের মাঝেই *বিচিত্রা*-র আবির্ভাব প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাস 'আত্মস্মৃতি'-তে লিখছেন--

> সুসময় আসিতে বিলম্ব হয় নাই ; ১৩৩৪ সনের আষাঢ় মাসে বাংলা সাহিত্য সরোবর তোলপাড় করিয়া মহাসমারোহে ষড়ঋতুর কানামাছি খেলার নৃত্য ছন্দে বিচিত্রা আবির্ভূত হইল। কান্তিচন্দ্র ঘোষ তবলা ও অমল হোম বাঁয়া সঙ্গত করিয়া এবং সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সানাইয়ের পোঁ ধরিয়া এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করিলেন যে, মনে হইল দীনবন্ধুর 'দীনাহীনা-পিঁচুটি-নয়না' বঙ্গবাণী অকস্মাৎ পাটরাণী পদে বৃতা হইলেন এবং রবীন্দ্রনাথ পাকাপাকি রকমে এই কানামাছি খেলার বুড়ি হইয়া বসিলেন। কলিকাতার পথঘাট, প্রাচীন ও প্রান্তর 'বিচিত্রা'র বিচিত্র, বিজ্ঞাপনী কলরবে মুখর হইয়া উঠিল। সাহিত্যে 'অভিজাত' কথাটা সেই প্রথম শুনিলাম। বস্তুত বাংলা মাসিক পত্রের এক বিচিত্র সম্ভাবনার ইঙ্গিত 'বিচিত্রা' আনিয়া দিল।[১১]

লক্ষণীয়, *বিচিত্রা*-র আগমন চোখে পড়বার মত বিজ্ঞাপনী প্রচার ঘটিয়ে অচিন্ত্যকুমার লিখছেন—

> তারপর 'বিচিত্রা'র মত উঁচু কপালে পত্রিকা--যার শুনেছি বিজ্ঞাপনের পোস্টার শহরের দেয়ালে ঠিক-ঠিক লাগানো হয়েছে কিনা দেখবার জন্যেই ট্যাক্সি-ভাড়া লেগেছিল একটা স্ফীতকায় অঙ্ক।[১২]

এর থেকেই বোঝা যায় *বিচিত্রা*-র আগমন বেশ সমারোহপূর্বক হয়েছিল যা সমসাময়িক সাহিত্য পত্রিকাজগতে বেশ অভিনব। ১৩৩৪ সালের ১ আষাঢ় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় *বিচিত্রা* প্রকাশিত হল। *বিচিত্রার* আবির্ভাবের পিছনে সম্পাদকের উদ্দেশ্য সংগ্রহ করা যায় তাঁর স্মৃতিকথা থেকে। কর্মজীবনে ভাগলপুরে ব্যবহারজীবী হলেও 'মাসিকপত্র সম্পাদনার একটা উগ্র অভিলাষ চিরদিনই আমার মনে-মনে, অন্তত নিশ্চেতন মনে, নিশ্চয়ই ছিল।'[১৩] সেই অভিলাষ বাস্তবায়িত হল তাঁর বৈবাহিক কোলিয়ারির ব্যবসায় সফল যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে। যার ফলশ্রুতি *বিচিত্রা* প্রকাশের আয়োজন। সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ লিখছেন--

> মাসিকপত্র প্রকাশ করা স্থির হওয়ামাত্র আমার নিরবসর ধ্যান-জ্ঞান-চিন্তা হ'ল, কি করে সে পত্রকে অনন্যসাধারণ করে তোলা যাবে?...আমার কল্পনার কাগজকে একান্তই যদি বাংলা দেশের প্রথম কাগজ না করতে পারি, অন্তত প্রথম শ্রেণীর করতেই হবে।[১৪]

বিচিত্রা

প্রথম বর্ষ, ১ম খণ্ড	আষাঢ়, ১৩৩৪	প্রথম সংখ্যা

বিচিত্রা

ছিলাম যবে মায়ের কোলে,
বাঁশি-বাজানো শিখাবে বলে
চোরাই করে এনেছ মোরে তুমি,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
যেখানে তব রঙের রঙ্গভূমি।
আকাশতলে এলায়ে কেশ
বাজালে বাঁশি চুপে,
সে মায়াসুরে স্বপ্নছবি
জাগিল কত রূপে,
লালপরীরা মিলিল তারা
কনকপুর ঘাটে,
পারায়ে গেল তুলির সীমা
তেপান্তরী মাঠে॥

বিচিত্রা-র প্রথম সংখ্যার প্রথম লেখাটি রবীন্দ্রনাথের

প্রথমে মাসিকপত্রের নাম স্থির হয়েছিল 'সবিতা' কিংবা 'হিমালয়'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা ক্লাবের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখলে হয়তো কবির সহানুভূতি একটু বেশি পাওয়া যেতে পারে, এই অনুমান বাস্তব ক্ষেত্রে সার্থক হয়ে উঠেছিল। প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল ছয়পৃষ্ঠার ব্লকের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপিতে মুদ্রিত 'বিচিত্রা' নামক কবিতা। এরপর থেকে বারো বছরের জীবনে *বিচিত্রা* রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে বঞ্চিত হয়নি।

অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার থেকে *বিচিত্রার* ইতিহাস একটু স্বতন্ত্র। হয়তো তেমনভাবে কোনো সাহিত্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের চিন্তাভাবনার সুষ্ঠু প্রকাশের মাধ্যমে আত্ম অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার কোনো সংকল্প এখানে ছিল না। কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য সুপরিকল্পিত ও সুরুচিপূর্ণ একটা পত্রিকার প্রকাশ, *বিচিত্রা*-র প্রথম সংখ্যার প্রথম লেখাটি রবীন্দ্রনাথের যার মধ্যে ব্যবসায়িক দিকটিও পরিকল্পিতভাবে সুরক্ষিত--একথা বোধহয় *বিচিত্রা*-ই প্রথম মনে করেছিল। প্রথম সংখ্যায় (আষাঢ়, ১৩৩৪) 'আমাদের কথা' নামক সম্পাদকীয়তে অমল হোম লিখেছিলেন--

> কল্পনা এবং বাস্তবের উভয়লোকে বিচিত্রা কাঁচ-কলমের কাজ করলে তার অস্তিত্ব সার্থক হবে।...'বিচিত্রা'র যাত্রারম্ভ হল আজ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে--মন্দাক্রান্তা ছন্দে। অ-সঙ্কল্পিত সহজ-সৌভাগ্যে এর গতি অভিসূচিত হয়েছে ঋতুরঙ্গশালায় নটরাজের বিচিত্র নৃত্য-লীলায়। আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি, গ্রীষ্মের অগ্নিকণা, বর্ষার জলবিন্দু, শরতের নির্মলতা, হেমন্তের কুজ্ঝটিকা, শীতের নিবিড়তা এবং বসন্তের পুষ্পোৎসব 'বিচিত্রা'কে বর্ষে বর্ষে বিচিত্র করুক।

বিচিত্রা-কে অনন্যসাধারণ এবং সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্য প্রধানত সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ এবং কান্তিচন্দ্র ঘোষ, অমল হোম, যতীনাথ ঘোষ এবং সতীশচন্দ্র ঘটকের চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। এঁদের প্রচেষ্টায় বিচিত্রা মুদ্রণে পারিপাট্যে শুধু নয়, সর্বগোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের একটিমাত্র পত্রিকায় একত্রে সম্মিলিত করার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে। এছাড়া বাংলার দুই দিকপাল সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনা প্রকাশ করে *বিচিত্রা* অসামান্য নজির স্থাপন করেছিল। পুরনো বা নতুন কোনো বিশেষ সাহিত্যধারাকে *বিচিত্রা* আঁকড়ে ধরে থাকেনি। সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন উদার হৃদয় সার্থক ঔপন্যাসিক। একটি সুচারু শোভন পরিচ্ছন্ন পত্রিকা প্রকাশই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

বিচিত্রা-র অপর একটি বিশিষ্টতা ছিল লেখকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান। সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ে লেখকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। বিশেষ করে বিখ্যাত লেখকদের লেখা সংগ্রহ এক্ষেত্রে কঠিন হয়ে ওঠে। *বিচিত্রা* প্রথম থেকে এ ব্যাপারে সতর্ক হয়ে কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করত। রবীন্দ্রনাথের কথাই সর্বাগ্রে বলা যেতে পারে, কারণ তিনিই ছিলেন 'ধারে এবং ভারে উভয়তই বিচিত্রার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক'। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত কবির 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' নামে প্রায় ষাট পৃষ্ঠার কাব্যটির জন্য কবি দক্ষিণা পেয়েছিলেন। এই কাব্যের সঙ্গে ছিল নন্দলাল বসুর সুচারু অলংকরণ, যেটি *বিচিত্রা*-র অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। অলংকৃত, চিত্রশোভিত রচনা প্রকাশ ছিল, *বিচিত্রা*-র শোভনতারও পরিচায়ক। এছাড়াও 'যোগাযোগ' উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হয়েছিল তিন হাজার টাকা। এই আর্থিক উদারতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন 'তোমাদের দেওয়া দক্ষিণা আমাদের দেশের পক্ষে সুষ্ঠু (decent)'।[১৫]

শরৎচন্দ্রও লেখার জন্য মাসে ৫০ টাকা হারে দক্ষিণা পেতেন। নবীন লেখকরাও অবহেলা পাননি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম গল্প 'অতসীমামী'র জন্য সম্মান দক্ষিণা পেয়েছিলেন। জরাসন্ধ ওরফে চারুচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর প্রথম গল্প 'স্ত্রী' লিখে ১০ টাকার মানিঅর্ডার পেয়েছিলেন। বলা যেতে পারে লেখকদের স্বার্থ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রাখত *বিচিত্রা*।

বিচিত্রা-র লেখকসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো সাময়িকপত্রের প্রধান কাজ নতুন প্রতিভার আবিষ্কার। *বিচিত্রা* অত্যন্ত সার্থকভাবে এই কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছিল। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ছাড়াও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশংকর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, মৈত্রেয়ী দেবী, জগদীশ গুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ নবীন-প্রবীণের লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে *বিচিত্রা*। *বিচিত্রা*য় কবিতা লিখছেন রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও, অমিয় চক্রবর্তী, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, হুমায়ুন কবীর, মোহিতলাল মজুমদার, জ্যোতির্ময়ী দেবী, নীলিমা দাস, রাধারানি দেবী ইত্যাদি। বলা যেতে পারে সেই সময় তরুণতম লেখকদের জন্য *বিচিত্রা*-র মত প্রথম শ্রেণির পত্রিকার দরজা উন্মুক্ত থাকত। এই পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় বাংলা সাহিত্যের সুবিখ্যাত উপন্যাস বিভূতিভূষণের প্রথম রচনা 'পথের পাঁচালী' (আষাঢ়, ১৩৩৫--আশ্বিন, ১৩৩৬)। শরৎচন্দ্রের দুটি বিখ্যাত উপন্যাস *বিচিত্রায়* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়--'শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব' (মাঘ, ১৩৩৮--মাঘ, ১৩৩৯) এবং 'বিপ্রদাস' (ফাল্গুন, ১৩৩৯—মাঘ, ১৩৪১)।

বিচিত্রার সম্পাদক লেখকদের নামের পাশে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা অথবা সমাজে প্রতিষ্ঠার মান উল্লেখ করতে পারলে স্বস্তি বোধ করতেন। সম্পাদক বোধহয় পত্রিকাটিকে তৎকালীন সমাজের শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার অভিপ্রায়েই এই কাজ করেছিলেন। লেখকদের নাম থাকত--ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম. এ, ডি. এল ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক এম. এ., বি. এল, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম. এ. ; বার য়্যাট-ল ; শিল্পী অসিতকুমার হালদার প্রিন্সিপ্যাল. লক্ষ্ণৌ স্কুল অফ আর্টস য়্যাণ্ড ক্রাফটস্ ; শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় এম. এ, আই. সি. এস. ; শ্রীনবগোপাল দাশ আই. সি. এস. ইত্যাদি। এই তালিকা দীর্ঘতর করা যেতে পারে, কিন্তু এই লেখকসূচির দিকে তাকালেই *বিচিত্রা*-র সম্ভ্রান্ত ঘরানার পরিচয় পাওয়া সম্ভব।

মূলত সাহিত্য পত্রিকা হলেও *বিচিত্রা*-য় প্রকাশিত গল্প, কবিতা, উপন্যাসে নির্দিষ্ট কোনো চরিত্র লক্ষণ ধরা পড়ে না। সমকালে *কল্লোল* বা *প্রগতি* যেভাবে গল্প কবিতার ক্ষেত্রে এক ভিন্ন ধারার আন্দোলন সংগঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল এবং যার হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে একটি নির্দিষ্ট যুগলক্ষণ চিহ্নিত হয়ে আছে, *বিচিত্রা*-র সে ধরনের কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। যদিও গল্প-উপন্যাস-কবিতার ক্ষেত্রে *বিচিত্রা*-র লেখক তালিকা দীর্ঘ। আশ্বিন ১৩৩৫-এর *বিচিত্রা*-য় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর ও শ্রীমতী নিরুপমাদেবীর গ্রন্থ আলোচনায় 'ইন্দ্রধনু ও গোধূলি'-তে দিলীপকুমার রায় সমকালীন বাংলা কাব্যচর্চার ধারা আলোচনা করেছেন-- 'সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে নিরুপমা দেবীর কবিতার একটি প্রধান প্রভেদ এই সুরেশচন্দ্রের কবিতা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে অনেক পরিমাণে কাটিয়ে উঠেছে। নিরুপমা দেবীর কবিতার উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এখনও বেশী'। উদাহরণসহ সুস্পষ্টভাবে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্র অনুসারী এবং

স্বতন্ত্র দুই ধারার কাব্যচর্চা আলোচনা করেছেন। গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রেও *বিচিত্রা* সমকালীন *কল্লোল* বা *কালিকলমের* শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিষয়ক কোনো উত্তেজনায় বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত না হয়ে, যাবতীয় সমকালীন বিতর্কিত বিষয়ের বাইরে থেকে এক রম্য, স্নিগ্ধ, শোভন কথাসাহিত্য চর্চায় মনোযোগী ছিলেন। *বিচিত্রা*-য় সমকালীন সকল নবীন-প্রবীণ লেখক গল্প-উপন্যাস লিখলেও, বাংলা সাহিত্যে *বিচিত্রা*-র বড়ো অবদান বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবিষ্কার ও বাঙালি পাঠকের সঙ্গে তাদের পরিচিত করানো।

বিচিত্রা-র অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তার চিত্র এবং অলংকরণ। অচিন্ত্যকুমার 'কল্লোল যুগ'-এ লিখছেন,

> সজ্জা শোভা ও কারুকার্যের দিকে 'বিচিত্রা'র বিশেষ ঝোঁক ছিল। একেক সময় ছবির জমকে লেখা কুণ্ঠিত হয়ে থাকত, মনে হত লেখার চেয়ে ছবিরই বেশি মর্যাদা--অন্তশ্চক্ষুর চাইতে চর্মচক্ষুর।[১৬]

সমকালীন আর কোনো সাময়িক পত্রিকায় চিত্রাঙ্কনের এই ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায় না। প্রথম সংখ্যার রঙিন প্রচ্ছদ সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী চারু রায় এঁকেছিলেন। নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তিনি তাতে বিচিত্র রঙের সমাহার ঘটিয়েছিলেন। পরবর্তী প্রচ্ছদের ভার দেওয়া হয় অপর খ্যাতনামা চিত্রকর যতীন্দ্রকুমার সেনকে। সম্পাদক উপেন্দ্রনাথের মতে *বিচিত্রা*-র সেই অপরূপ প্রচ্ছদটি বাংলা মাসিক পত্রিকার প্রচ্ছদের ইতিহাসে একটি 'আদর্শ' (classic) হয়ে আছে। প্রথম সংখ্যাতে ছিল গগনেন্দ্রনাথ অঙ্কিত 'ভোরের আলো', নন্দলাল বসু অঙ্কিত 'বসন্ত', রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' সত্তর পৃষ্ঠাব্যাপী নন্দলাল বসুর চিত্রশোভিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯-এ দেখা যাচ্ছে গগনেন্দ্রনাথের সাতটি ছবি মুদ্রিত হয়েছে। গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণায় ছবি আঁকা শুরু করেন নলিনীকান্ত মজুমদার। তাঁর সাতটি ছবি প্রকাশিত হয়েছিল ফাল্গুন ১৩৩৮-এ। প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই প্রকাশিত হত 'বিচিত্রা চিত্রশালা', তাতে থাকত একজন চিত্রশিল্পীর পরিচয়, চিত্ররচনার ইতিহাস এবং ছবির মুদ্রিত প্রতিলিপি। দেশি এবং বিদেশি বহু শিল্পীর অসংখ্য প্রতিলিপি বিচিত্রায় নিয়মিত প্রকাশিত হত। এছাড়াও চিত্রকলা বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ, *বিচিত্রা*-য় প্রকাশিত হয়েছে। যেমন যামিনীকান্ত সেনের 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার চিত্রকলা' (চৈত্র, ১৩৩৮), সুবিনয় ভট্টাচার্যের 'চিত্রশিল্পী রোয়েরিক' (শ্রাবণ, ১৩৪০), মণিলাল সেনশর্মার 'মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ও তাঁর চিত্রকলা' (কার্তিক, ১৩৪০), অসিতকুমার হালদারের 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর চিত্রকলা' (আশ্বিন, ১৩৩৮) ইত্যাদি। গল্প-উপন্যাসকে চিত্রসমাহারে সজ্জিত করে প্রকাশের কৃতিত্ব প্রথম *বিচিত্রা*-র।

বিচিত্রা-য় কবিতা, উপন্যাস, ছোটোগল্প ছাড়াও নাটক, চিত্রকলা, ভ্রমণকাহিনি, ইতিহাসবিষয়ক লেখা অজস্র থাকত। অষ্টম বছরে শুরু হয়েছিল নতুন বিভাগ 'মধুপর্ক'। মধুপর্কের মতই পাঁচরকম বস্তুর সংমিশ্রণে বিভাগটি প্রস্তুত হত। বিষয় ছিল 'বিচিত্র মোটরকার', 'অতিকায় বৈদ্যুতিক বাতি' ইত্যাদি। সম্পাদকের সাংবাদিকতা বৃত্তির সবচেয়ে উল্লেখ্য উদাহরণ 'নানাকথা'। এতে পত্রিকা সংক্রান্ত অনেক সংবাদ থাকত। আবার সমকালীন নানান ঘটনাও বিবৃত হত। যেমন ১৩৩৫-এর ফাল্গুনের নানা কথায় আছে 'রবীন্দ্রনাথের বিদেশ যাত্রা', 'বিরাট হিন্দু সম্মিলন', 'নিখিল ভারতের মহিলা শিক্ষা সমিতি' ইত্যাদি সংবাদ। এই বিভাগটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। আর-একটি জনপ্রিয় বিভাগ ছিল 'বিতর্কিতা'। নানা

বিষয়ে পাঠকরা এখানে তর্ক-বিতর্কে অংশ নিতেন। মেয়েদের শিক্ষা, বাঙালি মেয়েদের শালীনতাবোধ, বাঙালির জাতীয় পোষাক ইত্যাদি ছিল জনপ্রিয় তর্কের বিষয়। বিদেশি সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা থাকত 'সহযোগী সাহিত্য' শীর্ষক কলমে। এই বিভাগে প্রকাশিত হয়েছিল আশালতা দেবীর 'বার্টান্ড রাসেল ও অতীন্দ্রিয়বাদ' (ভাদ্র, ১৩৩৫), তেজেশচন্দ্র সেনের 'টলস্টয়ের জীবনের একটি দিন' (আষাঢ়, ১৩৩৫), প্রসন্নকুমার সমাদ্দারের 'ইবসেন ও বর্তমান বাঙ্গালার কথাসাহিত্য' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২) ইত্যাদি। এছাড়াও ন্যুট হ্যামসুন, টমাস ম্যান, ওয়াল্ট হুইটম্যান, আধুনিক ফরাসি সাহিত্য, টমাস হার্ডির উপন্যাস ইত্যাদি নিয়ে তরুণ সাহিত্যিকেরা *বিচিত্রা*-র পাতায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ যথার্থই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক উদার সাহিত্যব্যক্তিত্ব। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য—

> শুধু 'বিচিত্রা'র প্রাঙ্গণে প্রবেশের পথ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে একইভাবে সুগম করেছিলাম এবং একই প্রকারে উন্মুক্ত করেছিলাম। 'বিচিত্রা'কে করতে চেয়েছিলাম হিন্দু-মুসলমান লেখকের চিন্তা প্রেরণের এবং হিন্দু-মুসলমান পাঠকের চিন্তা গ্রহণের যন্ত্র, এবং সেই উপায়ে হিন্দু-মুসলমানের মননশীলতার ক্ষেত্রে একটা সাংস্কৃতিক একতার বীজ উৎপন্ন করতে কতকটা সক্ষমও হয়েছিলাম।[১৭]

যার ফলে উপেন্দ্রনাথ রচিত 'অভিজ্ঞান' নামক ধারাবাহিক উপন্যাসটি, যাতে পাঁচ-ছটি মুসলমান চরিত্র ছিল, বাংলার মুসলিম সমাজে ব্যাপক অভিনন্দন ও প্রশংসা লাভ করেছিল। এছাড়াও হুমায়ুন কবীর, জসীমউদ্দীন, মহম্মদ এনামুল হক, সুফী মোতাহার হোসেন প্রমুখ বহু মুসলিম লেখক অনায়াসে প্রচুর লিখতেন।

বিচিত্রা-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ নিবিড়। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিচিত্রা' কবিতা *বিচিত্রা*-র জন্যই রচিত হয়েছিল ৭ বৈশাখ, ১৩৩৪। আগামী সংখ্যা নিয়ে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হল প্রথম সংখ্যায়, 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথের চারটি নূতন কবিতা—হাসির পাথেয়, মধুমঞ্জরী, নীলমণি লতা, কুরুচি ইত্যাদি। সংকলন পর্বে প্রথমেই 'রবীন্দ্রনাথ', তারপর আছে 'রবিবাবুর গান'। বিজ্ঞাপনেও প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ, তাঁর ছবি দিয়ে 'কার এ্যাণ্ড মহলানবিশের' বিজ্ঞাপন, 'যাঁহার গান ও আবৃত্তি শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য অতি অল্প কয়জন লোকেরই ছিল তাহা আমাদের বহু চেষ্টার ফলে সর্বসাধারণের পরম উপভোগ্য হইয়াছে...আজ ঘরে বসিয়া সেই বিশ্ববরেণ্য কবির কণ্ঠ নিঃসৃত গান ও আবৃত্তি শ্রবণ করুন।' এমনকি বিজ্ঞাপন প্রচারেও তাঁর ছবিসহ পূর্ণাঙ্গ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন রয়েছে। আশ্বিন ১৩৩৪ থেকে 'তিনপুরুষ' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করল, যদিও অগ্রহায়ণ থেকে সেই উপন্যাসের নাম পরিবর্তিত হয়ে হল 'যোগাযোগ'। দেড় বছর পর ১৩৩৫-এর চৈত্র সংখ্যায় শেষ হল 'যোগাযোগ'। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের 'দুইবোন', 'মালঞ্চ', 'পারস্য ভ্রমণ', 'জাভাযাত্রীর পত্র', 'শিশুতীর্থ', ও আরও অজস্র রচনায় *বিচিত্রা* পরিপূর্ণ থাকত। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, ওরা আমাকে কিনে নিয়েছে'। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক রচনাই প্রকাশিত হয়েছে ১২২টি আর শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ৯০টি। 'নানাকথা' বিভাগে

বারে বারে রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে, যেগুলি রবীন্দ্র-ইতিহাস রচনায় একান্ত সহায়ক। ২৫ বৈশাখ, কবির জন্মোৎসবের সংবাদ 'নানা কথা'য় প্রায় প্রত্যেক বছরই ধরা আছে। রবীন্দ্রনাথের দেশভ্রমণের সংবাদ থাকত 'নানা কথা'য়। ভাদ্র ১৩৩৪-এ আছে 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মালয় উপদ্বীপ এবং সন্নিকটবর্তী দ্বীপসমূহে ভ্রমণে গিয়াছেন তাহা সকলেই অবগত আছেন।' বিশ্বভারতীতে যুযুৎসু শিক্ষা দানের সংবাদ আছে আশ্বিন ১৩৪৫-এ, কবির অসুস্থতার সংবাদ আছে কার্তিক ১৩৪৫-এ, তাঁর আরোগ্য লাভের সংবাদও দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে আশ্বিন ১৩৩৮, রবীন্দ্র জয়ন্তী সংখ্যা।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে *বিচিত্রায়* অজস্র প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, যার মধ্যে প্রথম লেখা অন্নদাশংকর রায়ের 'রক্তকরবীর তিনজন' (ভাদ্র, ১৩৩৪)। একই সংখ্যায় নীহাররঞ্জন রায় লেখেন এডোয়ার্ড টমসনের 'Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist' গ্রন্থের আলোচনা 'টমসনের রবীন্দ্রনাথ'। রবীন্দ্রনাথের মনোজগতের বিচার বিবেচনার এক নতুন ধারার সূচনা করলেন, সরসীলাল সরকার 'রবীন্দ্রনাথ ও ডাক্তার ফ্রয়েড' (আশ্বিন, ১৩৩৯)। লেখকের মতে—'রবীন্দ্রনাথের ভূমা এবং ফ্রয়েডের শ্রেষ্ঠ অহং (Super Ego) উভয়েই যে মূলত একইভাবে হইতে উৎপন্ন তাহার প্রমাণ এই যে--ফ্রয়েড বলিয়াছেন যে পিতামাতার ভাব লইয়াই শ্রেষ্ঠ অহং-এর উৎপত্তি আর রবীন্দ্রনাথও উপনিষদের 'পিতা নোহসি' শ্লোক তুলিয়া ভূমার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।' রবীন্দ্র সমালোচনায় এ এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন। এছাড়াও রাধারাণী দত্তের 'বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ' (আষাঢ়-আশ্বিন, ১৩৩৫), শান্তিদেব ঘোষের 'সিংহলে রবীন্দ্রনাথ' (অগ্রহায়ণ ১৩৪১), কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' (পৌষ ১৩৩৮), 'তপতী' (ফাল্গুন, ১৩৩৮), 'যোগাযোগ' (ভাদ্র, ১৩৪০), প্রমথ চৌধুরীর 'চিত্রাঙ্গদা' (চৈত্র, ১৩৩৪) অসিতকুমার হালদারের 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর চিত্রকলা' প্রভৃতি প্রবন্ধ রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান রচনা। বলা যেতে পারে, শুধু স্তুতি, নিন্দা বা ভাবালুতা নয়, রবীন্দ্রনাথকে নানা দিক থেকে নতুন করে আবিষ্কারের প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে *বিচিত্রা*'র রবীন্দ্রচর্চায়। তাঁর ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের অনুপুঙ্খ আলোচনা, তাঁর মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ *বিচিত্রা*-র রবীন্দ্রচর্চাকে আধুনিক রবীন্দ্র অনুরাগীদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান করে তুলেছে।

সকল গোষ্ঠীর বিচিত্র মেজাজের লেখকদের সমাহারে *বিচিত্রা*-র প্রকাশে উপেন্দ্রনাথের ভাষায়—'*বাংলা দেশ জুড়ে একটা সাড়া পড়ে গেছে*'। মাত্র ১২ বছরের আয়ুষ্কালেই *বিচিত্রা* তার শোভন, অভিজাত রূপের জন্য শিক্ষিত বাঙালির কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সম্ভ্রান্ত এই সাহিত্য-পত্রিকা নির্দিষ্ট কোনো আন্দোলন সংগঠিত করতে না পারলেও, সুস্থ চিত্রভূষণে সজ্জিত রমণীয় সাহিত্যচর্চার এক অসামান্য আদর্শ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. সুকুমার সেন--*বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য*, পৃ. ৩৯।
২. যোগেশচন্দ্র বাগল--*সাহিত্য সাধক চরিতমালা* ১০ম খণ্ড, পৃ. ৮৯।
৩. সোমেন্দ্রনাথ বসু--*সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ*, ভূমিকা, পৃ. ১০।
৪. প্রাগুক্ত।
৫. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় -- *প্রবাসী ষষ্ঠী বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ* : ষষ্ঠীপূর্তি পৃ. ১৩।
৬. সূচনা -- *প্রবাসী*, বৈশাখ, ১৩০৮।
৭. *প্রবাসী* — কার্তিক, ১৩১৩, পৃ. ৪১১।
৮. *প্রবাসী*, বৈশাখ, ১৩৩৩।
৯. *প্রবাসী ষষ্ঠী বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ*, ১৩৬৭।
১০ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত - *কল্লোল যুগ* পৃ. ১৪০।
১১. সজনীকান্ত দাস - *আত্মস্মৃতি*, পৃ. ১৭৫।
১২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত - *কল্লোল যুগ* পৃ. ১৮৩।
১৩. উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় - *স্মৃতিকথা*, ৪র্থ পর্ব, পৃ. ৩৩।
১৪. প্রাগুক্ত পৃ. ৩৯।
১৫. প্রাগুক্ত পৃ. ১০৩।
১৬. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত - *কল্লোল যুগ* পৃ. ১৮৪।
১৭. উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় - *স্মৃতিকথা*, ৪র্থ পর্ব, পৃ. ৭১।

ঋণ স্বীকার : *দেশ* সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৭

সু দী প ব সু

কল্লোল - কালি-কলম - প্রগতি - ধূপছায়া
সেকালের প্রেক্ষিত : একালের বিচার

১৩৩০-১৩৩৭ সময়কাল বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। এতাবৎ প্রচলিত বৃহদায়তন বাণিজ্যিক সাহিত্যপত্রিকার পাশে এই পর্বে আবির্ভূত হয়েছিল ক্ষুদ্র কয়েকটি সাহিত্যপত্র যাদের সম্পাদকেরা প্রায় সকলেই বয়সে নবীন, নতুন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় তরুণ গরুড়সম মহৎ ক্ষুধার আবেশে পীড়িত। ফলে আমরা একটি জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন--সাহিত্যপত্রিকার যথার্থ মূল্য কিসে নিরূপিত হয়--তাদের সুবৃহৎ জীবনকালের ভিত্তিতে অথবা স্বল্প আয়ুর অধিকারী পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার গুরুত্বের বিচারে। উত্তর নানা রকম হতে পারে। তার জন্য ফিরে যেতে হয় বিশ শতকের সাময়িক পত্রে বিস্তৃত ইতিহাসে। বলা বাহুল্য একটি রচনায় সে কাজ করে ওঠা সম্ভব নয়। আমরা তাই বিশ শতকের নবীন সাহিত্যিক-গোষ্ঠী সম্পাদিত চারটি সাহিত্যপত্র নির্বাচন করেছি যাদের বিষয়ে উত্তেজিত আলোচনা আজও অব্যাহত।

আমরা জানি বিশ শতকী তরুণ সাহিত্যিকদের একাংশের মনোগত ভাব ছিল পথ রুধি আছেন রবীন্দ্রঠাকুর। তাঁদের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে এই চারটি পত্রিকা *কল্লোল-কালি-কলম-প্রগতি-ধূপছায়া* খ্যাত হয়ে আছে। *কালি-কলম* (১৩৩৩ বৈশাখ--১৩৩৬ মাঘ), *প্রগতি* (১৩৩৪ আষাঢ়-১৩৩৭ বৈশাখ), *ধূপছায়া*-র (১৩৩৪ বৈশাখ-১৩৩৫ কার্তিক?) তুলনায় *কল্লোল* কিছু বেশি দীর্ঘজীবী—১৩৩০ বৈশাখ-১৩৩৬ পৌষ পর্যন্ত। ব্যক্তিগত অথবা পুস্তক প্রকাশন সংস্থার উদ্যোগে প্রকাশিত উক্ত পত্রিকাগুলি সম্পর্কে প্রারম্ভিক কিছু তথ্য উপস্থাপনার পর আমরা প্রবেশ করব পত্রিকার অন্দরমহলে--ব্যক্তিমতের সঙ্গে সাহিত্যমতের মিলন কিংবা বিরোধ যেখানে উপভোগ্য বিষয়।

এক

পত্রিকা প্রসঙ্গ

কল্লোল

কল্লোল-এর শুরুতেই চমক। ১৩২৯-এর চৈত্র সংক্রান্তি, জেলেপাড়ার সঙ দেখার জন্য ভিড় জমানো অগণ্য মানুষের মধ্যে হ্যান্ডবিল ছড়িয়ে ঘোষণা করা হলো *কল্লোল* পত্রিকা অচিরে প্রকাশিত হবে। দীনেশরঞ্জন দাশের দু'টাকা এবং গোকুলচন্দ্র নাগের দেড় টাকা মিলিয়ে সাড়ে তিন টাকায় ছাপানো হ্যান্ডবিল যেন *কল্লোল* পত্রিকার স্থায়ী আর্থিক অসঙ্গতির পরিচয়। আপাতত *কল্লোল* সম্পর্কে কয়েকটি মোটা দাগের তথ্য আমরা হাজির করছি। *কল্লোল*-এর

প্রথম অফিস ১০/২ পটুয়াটোলা লেনে, দীনেশরঞ্জনের মেজদাদা বিভুরঞ্জনের দু-কামরা বাড়ির ঠিকানায়। সেইখানে জমে ওঠা কল্লোল-এর আড্ডার কথা অনেক পরে আবেগমথিত কণ্ঠে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন :

> বেশি কিছু ক্ষমতা তো কল্লোলের নেই, তবে বিকেল বেলা এসে ওই ছোট্ট ঘরটিতে জুটতে পারলে এক কাপ করে চা পাবেই।
>
> আর তোমাদের অনেকের অবস্থাই তো জিজ্ঞেস করে জানবার দরকার নেই। কলেজের শেষ ক্লাস করে বেরিয়ে বাড়ি যাবার ট্রামের পয়সাটা বড় জোর কাছে আছে। সে পয়সা থেকে সামান্য দু-একটা পয়সাও এক ঠোঙা চিনেবাদাম কি ছোলা ভাজায় খরচ করলে হেঁটেই বাড়ি ফিরতে হবে।
>
> সকলের অবস্থাই ঠিক ওরকমটা না হলেও তেমন একটা সচ্ছলতা কারুরই বিশেষ নেই। সবাই কাছে-পিঠেরও নয়। নৃপেন চাটুজ্যের মতো কেউ কেউ অমন দু-চার মাইল হেঁটেও আসে এই ঘরটুকুর টানে।
>
> তাদের কথাও কল্লোল ভোলে না। সাধ যতই থাক, সাধ্য কিন্তু নিতান্তই সামান্য। তবু তাইতেই যেমন করে হোক বাড়ির ভেতর থেকে একটি থালায় বেশ বড় একতাড়া হাতে গড়া রুটি আর সেই সঙ্গে এক জামবাটি আলু বা তার সঙ্গে অন্য কিছুর একটা তরকারি নিত্যই আসে অফিসঘরে।
>
> সবাই মিলে সেই রুটির তাড়া ভাগ করে একটা দুটো যা ভাগে পড়ে জামবাটি থেকে তরকারি নিয়ে খাও। নিজেদের সামান্য ভাগ থেকে যার দরকার বেশি তাকে যতটা পারো দাও। তুচ্ছ রুটি তরকারিও খাওয়ার শেষে তাই অমৃত হয়ে ওঠে ওই খাবার সঙ্গে মেশানো গভীর অকৃত্রিম স্নেহেই।
>
> সে স্নেহ কার? কল্লোল-এর সম্পাদক দীনেশদার নিশ্চয়ই। কিন্তু শুধু তাঁর বললে মস্ত বড় ভুল আর অকৃতজ্ঞতার অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকতে হয়।
>
> পটুয়াটোলা লেনের ওই বাড়িটিতেই দীনেশদা থাকেন ঠিকই, কিন্তু তিনি থাকেন তাঁর দাদা বৌদির সঙ্গে তাঁদেরই সংসারে।
>
> সুতরাং কল্লোল-এর ছোট্ট ঘরটিতে জড়ো হওয়া বিচিত্র দঙ্গলের ওপর যে স্নেহ ও বাড়িতে বর্ষিত হত তার প্রধান উৎস তাঁরাই।...
>
> মৌচাকের ছোট ঘরের আড্ডা মনে রঙ লাগিয়েছে।[১]

১৩৩১ ভাদ্র মাসে ২৭ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে পত্রিকার অফিস স্থানান্তরিত হলেও ১৩৩২ মাঘে পুরনো ঠিকানায় ফিরে এসেছিল। এই স্নেহনীড় আকারে আট ফুট বাই দশ ফুট মাপের ছোট ঘর, একটি তক্তপোষ, ছোট সেক্রেটারিয়েট টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার টুল-এ বোঝাই। তবু সেখানেই কাশী ফেরত প্রেমেন্দ্র মাথা গুঁজেছিলেন, "কল্লোল অফিস ঘরটাই তখন আমার দখলে। রাত্রে সেই ঘরের তক্তপোশেই বিছানা পেতে শুয়েছি। বিকেলে অফিসের কাজ আর কল্লোলের বন্ধুদের আড্ডা আরম্ভ হবার আগে পর্যন্ত আমিই ঘরের মালিক।"[২]

ডিমাই সাইজের *কল্লোল* চতুর্থ বৎসর থেকে ডবল ক্রাউন আকার ধারণ করে। ১৩৩২ চৈত্র সংখ্যায় পত্রিকার অন্যতম বিভাগ 'ডাকঘর'-এ কারণ জানিয়ে লেখা হয়েছিল, বিজ্ঞাপন ছাপা এবং বিক্রির সুবিধার জন্য *প্রবাসী, ভারতবর্ষ* পত্রিকার আকারে ১৩৩৩ বৈশাখের *কল্লোল* প্রকাশিত হবে। "কল্লোল ছাপা হত প্রথমে আমহার্স্ট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগ বিন্দুতে এক বন্ধুর প্রেসে, পরে কোহিনূর প্রেসে, বাণী প্রেসে, রহস্য লহরী প্রেসে, ক্যালকাটা প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এ, ব্রিটানিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কসে।"[৩]

কল্লোল-এর প্রচ্ছদ বৈচিত্র্যময়। অন্তত পাঁচবার বদল হওয়া এই প্রচ্ছদের সবকটিতে 'তরুণ সমুদ্র-হৃদয়ের সংঘাত, উচ্ছ্বাস, আগ্রাসন আর সীমানাবিহীন কল্পনাভিসার।'[৪] পত্রিকার

প্রথম দুই বছরে কোনো ছবি ছাপা হয়নি। তৃতীয় বছরে তা শুরু হয়। হেতু ১৩৩২ চৈত্রের 'ডাকঘর' বিভাগে পাওয়া যাবে : 'তৃতীয় বৎসরে ছবি দিতে আরম্ভ করি। মনে হোল যাঁদের চেহারা দেখলে, যাঁদের বিষয় জানলে সাহিত্যের ও সাহিত্যানুরাগীদের কল্যাণ হবে তাঁদের ছবিই দেব। সেই থেকেই দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল প্রসিদ্ধ সাহিত্যসাধকদের আলেখ্য ও আলোচনা কল্লোলের প্রতি সংখ্যায় আমরা দিতে চেষ্টা করেছি। এটাও কল্লোলের একটা সুস্পষ্ট বিশেষত্ব।'

কল্লোল পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগ বিচিত্র স্বভাবী মানুষ। তাঁর অন্যতম পরিচয় এই হতে পারত যে তিনি বিখ্যাত কালিদাস নাগের ভাই। কিন্তু সেখানেই তিনি আবদ্ধ ছিলেন না। শারীরিক রুগ্নতা সত্ত্বেও (হয়ত সেই কারণে পড়াশোনায় অসফল) শিল্পমনস্ক মানুষ ; পার্সি ব্রাউন, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে শিল্প-শিক্ষাগ্রহণ এবং যামিনী রায়, অতুল বসু, বীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্প-সাহচর্য লাভ তাঁর মনের সম্পদ। 'প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে কাজের সূত্রে তাঁকে যেতে হয় ভারতের বহু জ্ঞাত অজ্ঞাত স্থানে, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতায় ছাড়তে হয় এ চাকরি। এরপর নিউমার্কেটে মামা বিজয় বসুর ফুলের দোকানে বৈকালী তত্ত্বাবধান, ফাঁকে ফাঁকে চলত অর্ডারী অয়েল পোর্ট্রেট আঁকার চেষ্টা—ছিলেন কৃতী ফটোগ্রাফার-ও। এই ফুলেব দোকানেই আলাপ দীনেশের সঙ্গে। সাহিত্য এবং চিত্রকলা ছাড়াও কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে ছিল তাঁর আচ্ছন্ন করে দেবার মত পারদর্শিতা। ফটো প্লে সিণ্ডিকেট অফ ইণ্ডিয়া কোম্পানির নির্বাক চিত্র 'বাঁদীর প্রাণ'-এ তিনি ধর্মপালরূপী অহীন্দ্র চৌধুরীর সহচর রাহু সেনের অভিনয়ে দক্ষতার পরিচয় দেন। এ প্রতিষ্ঠানে তাঁর চাকরি হয় ড্রাফটসম্যান আর্টিস্ট হিসেবে।'[৫] গোকুলচন্দ্র নাগের প্রাণোত্তাপময় জীবনেব পরিচয় হাজির করেছেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। ফোর আর্টস্ ক্লাবের অধিবেশনে পবিত্র তাঁকে প্রথম দেখেন : 'শীর্ণদেহে একটা চাবুকের তীব্রতা, এক মাথা রেশম গুচ্ছের মত কেশদাম ঘাড় পর্যন্ত পড়েছে। শীর্ণমুখে কালো ফ্রেমের চশমার ভিতর দিয়ে বড় বড় চোখ দুটোয় যেন অনন্ত জিজ্ঞাসার প্রকাশ।'[৬]

গোকুলচন্দ্র সাহিত্যেও ডুবে ছিলেন। তাঁর 'পথিক' উপন্যাস *কল্লোল*-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত। চারজন লেখকের গল্পসংকলন 'ঝড়ের দোলা'-র দ্বিতীয় গল্প 'মাধুরী' তাঁরই। ছোটোদের জন্য রচিত উপন্যাসের নাম 'পরীস্থান'। তাঁর উনিশটি গল্পের সংকলন 'মায়ামুকুল' ১৯২৭-এ প্রকাশিত। এছাড়াও গোকুলচন্দ্রের অন্যান্য রচনাদি আছে।

কিন্তু 'প্রদীপ নিবিয়া গেল'। সেকালের দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগে গোকুলচন্দ্র প্রয়াত হলেন। তাঁর মৃত্যুর পর *কল্লোল*-এর ১৩৩২ কার্ত্তিক সংখ্যার পৃথক একটি পৃষ্ঠায় শোকবিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল :

দীর্ঘকাল দুরারোগ্য রোগভোগের
পর, গত ৮ই আশ্বিন, ১৩৩২
সকালে বেলা দশটার সময়
কল্লোলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও
সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র নাগ
দার্জ্জিলিঙ্ সহরে ইহধাম
পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

কল্লোল-এর বয়স তখন তিন বৎসর চলছে। ১৩৩২ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় গোকুলচন্দ্রের স্মৃতিরোমন্থন করলেন দীনেশরঞ্জন দাশ, কালিদাস নাগ, প্রবোধকুমার সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিমলা দেবী, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ রায়চৌধুরী প্রমুখ। শোককবিতা লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু, নজরুল ইসলাম, জগৎবন্ধু মিত্র। ঐ সংখ্যার 'ডাকঘর'-এ লেখা হয়েছে : "গোকুল তার প্রাণের জিনিষ 'কল্লোল'কে ছেড়ে, এই ধরণীর ব্যথিত, পীড়িত, অত্যাচারিত মানুষগুলিকে ছেড়ে, কোথাও যেতে পারে না, এই কথাই আমরা বিশ্বাস করি।" 'তবু যেতে দিতে হয়'।

কল্লোল পত্রিকার আরেক সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশও দীর্ঘজীবী নন। ১৯৪১-এর ১২ মে আলসার রোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। গোকুলচন্দ্রের মতো তিনিও শিল্পী ছিলেন, শিক্ষাও অসম্পূর্ণ (স্বদেশি আন্দোলনের কারণে)। গ্রাসাচ্ছাদনের তাগিদে একাধিকবার জীবিকা পরিবর্তন, কল্লোল পাবলিশিং হাউসের স্থাপনা, শেষত চলচ্চিত্রে অভিনয়চেষ্টা। স্ত্রীভূমিকা বর্জিত নাটক 'উতঙ্ক', গল্প সংকলন 'মাটির নেশা', 'ভুঁইচাঁপা' ইত্যাদি তাঁর কলমের নিদর্শন।[৭] ফোর আর্টস্ ক্লাবের তিনি সম্পাদক। সেখানেই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীনেশরঞ্জনের প্রথম পরিচয় এবং অসঙ্কোচে পবিত্রর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন দীনেশরঞ্জন, "দোহারা মানুষটি, বয়সে ত্রিশ-বত্রিশের উপর না হলেও মাথায় টাকের আভাস দেখা দিয়েছে। গায়ের পাঞ্জাবিটা তৈরীর মধ্যে পর্যন্ত একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সহকর্মীদের মধ্যে মাঝে মাঝে মেলামেশার আনন্দের ভিতর দিয়েই হৃদয়বত্তা ও মনের আনন্দরূপ বিকশিত হয় এবং তার বাইরে প্রকাশ করার সুযোগ মেলে--এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকে তিনি 'ফোর আর্টস ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবং তারই প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা 'ঝড়ের দোলা' গল্পগ্রন্থ। আমাকে একখানা বই উপহার দিয়ে হেসে বললেন, গ্রন্থ বলা উচিত নয়, গুচ্ছও নয়, চারজনের মনের চারটি ফুল।"[৮]

১৩৩২-এর ৮ আশ্বিন গোকুলচন্দ্র নাগের মৃত্যুর পর দীনেশরঞ্জন দাশ একাই পত্রিকা-সম্পাদক, যতদিন না পত্রিকাটি পুরোপুরি বন্ধ হয়েছিল।

কালি-কলম

কালি কলম মন লেখে তিন জন--এহেন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে *কালি-কলম* পত্রিকার প্রকাশ না হলেও, পত্রিকার সূচনায় সত্যই তিন ব্যক্তি সম্পাদক ছিলেন--মুরলীধর বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। এঁরা তিনজনেই কল্লোল-গোষ্ঠীভুক্ত। তথাপি কল্লোল গোষ্ঠীর মধ্যে মত-ভিন্নতা ঘটেছিল। সে কারণ এইরকম শোনা যায়--প্রথমত দীনেশরঞ্জন সাহিত্য পত্রিকার সংগঠক হলেও লেখক হিসাবে বড়ো মাপের নন। অথচ 'তাঁর নানা নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ প্রতি মুহূর্তেই গোষ্ঠী-লেখকদের মেনে চলতে হত। এখন এ-থেকেই আত্ম-প্রতিভা-সচেতন কয়েকজন তরুণ লেখকের মনে অসন্তোষ গড়ে ওঠে, শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র যার ব্যতিক্রম ছিলেন না।' দ্বিতীয়ত নবীন লেখকদের তখন প্রবল অর্থকৃচ্ছ্রতা। 'উত্তরোত্তর [কল্লোল] পত্রিকার আয়বৃদ্ধি হলেও সংগঠন-স্বার্থেই লেখকদের প্রাপ্য দক্ষিণা মেটানো হত না।'[৯] কল্লোল-গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অবশ্য অন্যমত পোষণ করতেন।[১০] এই অবস্থায় পুস্তক প্রকাশন সংস্থা বরদা এজেন্সির মালিক শিশিরকুমার নিয়োগী কর্তৃক নতুন পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব শৈলজানন্দ এবং প্রেমেন্দ্রকে উৎসাহিত করেছিল। 'তাছাড়া প্রকাশন-

সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকলে ভবিষ্যতে নিজেদের গ্রন্থপ্রকাশের সুবিধার কথাও তাঁরা ভেবেছিলেন নিশ্চয়ই।'[১১] তৃতীয়ত মুরলীধর বসুর ধারণা হয়েছিল তাঁর লেখিকা-স্ত্রী নীলিমা বসু *কল্লোল*-সম্পাদক দীনেশরঞ্জনের অনিচ্ছার কারণে পত্রিকায় যথেষ্ট লেখার সুযোগ পাচ্ছেন না। 'ব্যাপারটি সত্যি হোক বা নাই হোক, প্রেমেন্দ্র-শৈলজানন্দের কল্লোল ছেড়ে যাওয়ার পিছনে মুরলীধর যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই নিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।'[১২]

কালি-কলম-এর প্রকাশক এবং কর্মসচিব শিশিরকুমার নিয়োগী। প্রকাশিত হত কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের বরদা এজেন্সি থেকে। আমরা জেনেছি এক বছরের মধ্যে তিনবার ছাপাখানা বদল করেও (ব্রাহ্ম মিশন প্রেস, এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, নিউ আর্টিস্টিক প্রেস) 'ছাপার মান ছিল যথেষ্ট উৎকৃষ্ট। ছাপার ভুল থাকে না বললেই চলে। সেদিক থেকে *কালি-কলমকে* অগ্রজ কল্লোলের চেয়ে সচেতন ও পরিণত বলা চলে। পত্রিকা প্রকাশেও *কল্লোলের* মতো নিয়মিত না হয়ে, প্রতি মাসে মোটামুটি একই সময়ে অর্থাৎ মাসের ৩০ তারিখে বেরুত এটি।'[১৩]

কল্লোল-এর আড্ডাঘরের যে ছবি আমরা পেয়েছি, *কালি-কলম*-এর আড্ডা তার থেকে ভিন্ন গোত্রের, অন্তত তেমনই মনে হয়েছিল কল্লোল-গোষ্ঠীর অচিন্ত্যকুমারের। কল্লোল-এর প্রাণোত্তাপে পূর্ণ তিনি নতুন আড্ডায় স্বস্তি পাননি, লিখেছেন : ''কালি-কলমে'র আড্ডাটা একটু কঠিন গম্ভীর ছিল। সেখানে কথন ছিল বেশি, উপকথন কম। মানে যিনি বক্তা তাঁরই একলার সব কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব। আর সব শ্রোতা, অর্থাৎ নিশ্চলজিহ্ব। সেখানে একাভিনয় একপত্য। বক্তার আসনে বেশির ভাগই মোহিতলাল, নয়ত সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নয়তো কখনো-কখনো সুরেন গাঙ্গুলী, নয়তো কোনো বিরল অবসরে শরৎচন্দ্র। 'কালি-কলমে'র আড্ডায় তাই মন ভরত না।'[১৪]

নতুন পত্রিকা প্রকাশের স্বপ্নে আকীর্ণ যুবকেরা, তবু ঘর ভাঙল এক বছরের মাথায়। ৭ এপ্রিল ১৯২৭-এ ১০৩/২ লেক রোড, ঢাকুরিয়া থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা চিঠি *কালি-কলম*-এর ১৩৩৪ বৈশাখ সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে :

''কালি-কলমে'র এক বছর পূর্ণ হ'ল। এই এক বছর নামে সম্পাদক থাকলেও শরীরের অসুস্থতা ও অন্য নানা-কারণে আমি কলকেতায় উপস্থিত থেকে 'কালি-কলমে'র কোন কাজ দেখতে পারিনি। তার জন্যে সত্যই আমি লজ্জিত। আমি ভেবে দেখলাম যে এ বছরও আমার কলকেতায় থাকা সম্ভব হবে না। সুতরাং কোন কাজ না করে শুধু নামে সম্পাদক থাকতে আমি ইচ্ছা করি না। আসছে বছর থেকে তাই জন্য আমি সম্পাদক হিসাবে কালি-কলমে থাকতে চাই না। তবে 'কালি-কলমে'র প্রতি আমার টান এর জন্যে কমে গেছে ভাববেন না। আমার যথা সাধ্য আমি 'কালি-কলম'কে সেবা করব। আমার মনে হয় আগের বছর নামে সম্পাদক হয়ে কাজ কিছু করতে না পারায় মনে যে সঙ্কোচের কাঁটা ছিল সেটা দূর হয়ে যাওয়ায় আরো ভালো করেই কাজ করতে পারব। আপনারা আমার এ পদ-ত্যাগের ভিন্ন অর্থ করবেন না ও অন্য কোন গুজব শুনলে বিশ্বাস করবেন না। সম্পাদকী ও অন্যান্য সমস্ত সর্ত্ত থেকে মুক্তি চাইলেও আমাকে 'কালি-কলম'কে নিজের কাগজ মনে করতে দিতে আপনাদের বোধ হয় আপত্তি নেই।'

প্রাসঙ্গিকভাবে একটি কথা বলে নেওয়া যায়--এই চিঠি লেখার পরে শেষ সংখ্যা বাদে প্রেমেন্দ্রর কোনো লেখা *কালি-কলম*-এ বেরোয়নি।

আরো এক বছর পরে ১৩৩৫ বৈশাখে *কালি-কলম*-এর কর্মসচিবকে লেখা 'সম্পাদক' শৈলজানন্দের পদত্যাগপত্র প্রকাশিত হলো : 'দ্বিতীয় বৎসরের 'কালি-কলমে' নানা অনিবার্য্য কারণে লিখিতে ত' পারিই নাই, এমন কি সম্পাদন-কার্য্য কেবলমাত্র কাগজের উপর নাম দিয়াই শেষ করিয়াছি। সম্পাদকের মূল্যহীন নামটুকু রাখিয়া *কালি-কলমের* মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে আর আমার ইচ্ছা নাই ; সেইজন্য সকলের নিকট ক্ষমা চাহিয়া আজ আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।'

পড়ে রইলেন মুরলীধর একা। কিন্তু তাঁর বাঁশির সুর তখন বেসুরো। সেই সময়ের ছবি পরবর্তীকালে 'আত্মস্মৃতি'র মধ্যে সজনীকান্ত দাস লিখেছেন : 'যে দুই জন সত্যকার সৃষ্টিধর্মী শক্তিমান সাহিত্যিক 'কল্লোল'কে প্রতিষ্ঠিত ও নূতন সাহিত্যকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন, সেই শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র সর্বপ্রথম দল ভাঙিয়া চতুর্থ বৎসরে (১৩৩৩) 'শনিবারের চিঠি'র তৎকালীন "সংবাদ-সাহিত্যে"র ভাষায় "গড দি ফাদার ও গড দি সন রূপে গড দি হোলি গোস্ট শ্রীমুরলীধর বসু"র সহিত মিলিত হইয়া উৎসাহের সঙ্গে এক বৎসর *কালি-কলম* চালনা করিয়াছিলেন, তাহারাও দ্বিতীয় বৎসরে (১৩৩৪) গড দি সন এবং তৃতীয় বৎসরে (১৩৩৫) গড দি ফাদার সরিয়া পড়িয়াছিলেন। একা মুরলীধর আরও এক বছর *কালি-কলম* লইয়া যুঝিয়াছিলেন, কিন্তু "বরদা" [বরদা এজেন্সি] বিরূপ হওয়াতে তিনিও ক্ষান্ত হইলেন।'[১৫]

কালি-কলম-এর অন্তিম লগ্নে প্রেমেন্দ্র আবার ফিরে এসেছিলেন। ১৩৩৬ মাঘে পত্রিকার শেষ সংখ্যায় তাঁর 'ভাঙা যন্ত্র মরা পাখী' রচনাটি মুমূর্ষু পত্রিকার প্রতীক হয়ে আছে--'কোথায় যেন দেখেছি ভাঙা একটি যন্ত্র / আকাশকে ব্যঙ্গ করছে, / কোথায় যেন একটি মরা পাখী দেখেছি / আমার মনে তারা আজ জড়িয়ে গেছে।' এই কবিতার সঙ্গে অনিবার্যভাবে মিশে আছে মুরলীধরের হাহাকার--'কে আছো জোয়ান হও আগুয়ান।'

কালি-কলম প্রসঙ্গে একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য আমরা উপস্থিত করব--মতান্তর কিভাবে চূড়ান্ত মনান্তরে পরিণত হয় তার নিদর্শন হিসাবে। *কালি-কলম*-এর অন্যতম লেখক মোহিতলাল মজুমদার *কালি-কলম*-এর ১৩৩৪ মাঘে 'বিদায়বাণী' কবিতা লিখে পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। মুক্তির উল্লাস নয়, কাতর দীর্ঘশ্বাস কবিতার প্রতি ছত্রে--'এতদিনের আনাগোনা, / এতদিনের জানাশোনা / আজকে গেল চুকে ; দুয়ার ধরে' থাকব না আর / নামটি ধরে' ডাক্‌ব না আর, / চাইব না আর মুখে। / ...আমি গেলাম--গেলাম সরে' / আশিস্ করে' প্রাণটি ভরে--'মনে নাহি রাখো'।' *কালি-কলম* সম্পাদক কিন্তু মোহিতলালের আশীর্বাদ মনে রাখেননি, মনে রেখেছিলেন ছেড়ে চলে যাবার কথা। সুতরাং চৈত্র ১৩৩৪-এর 'আর্টের আটচালা'য় বিরূপাক্ষ শর্মা দাঁতে দাঁত ঘষে বলেছেন : "এতদিন বাংলার রসিক-সমাজ জানত কাব্যেই মোহিতলালের অধিকার আছে, কিন্তু গণিতেও যে তাঁর এমন অক্ষুণ্ণ অধিকার, চৈত্রের [শনিবারের] 'চিঠি'তে তিনি তা' প্রমাণ করেছেন। মণিবজ্র ভাবতীর একটা কথা থেকে এক থিওরেম গড়ে তুলে তিনি তার উপর Q.E.D.-র শীলমোহর মেরে দিয়েছেন।"

শিবিরত্যাগী প্রেমেন্দ্র সম্পর্কে বিরূপাক্ষ শর্মার মন্তব্য আরো নিষ্করুণ। প্রেমেন্দ্রর কবিপ্রতিভা বিষয়ে *প্রগতি* পত্রিকার উচ্ছ্বাসময় উক্তি ১৩৩৪ ফাল্গুনের 'আর্টের আটচালা'য় কঠিন বক্রোক্তির লক্ষ্য : "প্রেমেন্দ্র-ভক্তের জয়জয়কার। [*প্রগতি* পত্রিকার বক্তব্য অনুযায়ী] ভবিষ্যৎ কবিগুরুর কলম এবং আসন তা' হ'লে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের পক্ষেই বহাল হয়ে গেল।

কিন্তু তাঁর প্রতি নিক্ষিপ্ত বিরূপাক্ষ শর্মার এই তিক্ত বাক্য প্রেমেন্দ্র মিত্র মনে রাখেননি। তাঁর স্মৃতি যেন শিশিরধোয়া জল--গভীর কৃতজ্ঞতা এবং ভালবাসায় মুরলীধরের নাম সেখানে লিখিত, যাঁর 'গভীর সাহিত্যবোধ আর জীবন দর্শনের বৈশিষ্ট্যে' প্রেমেন্দ্র বিশ্বাসী :

> মুরলীদার মতো মানুষ সর্বকালে সাহিত্যের শোভাযাত্রায় নেপথ্যে থেকে যান। তাঁর কোনও লেখার ভেতর দিয়ে তিনি যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এমনও নয়। কিন্তু দেশে দেশে যুগে যুগে তাঁর মতো বিরল মানুষের শিল্প সাহিত্যের নতুন পথ খুঁজে এগিয়ে যাওয়ার অভিযানে প্রায় নীরব যে ভূমিকাটি নিয়ে থাকেন ইতিহাসে তার মূল্য সকৃতজ্ঞভাবে স্বীকার করবার। কল্লোল কালিকলমের সময়ে সাহিত্যের সার্থক বিকাশের আন্দোলন যেখানে যতটুকু হয়েছে তার বিবরণ থেকে মুরলীদার নাম কোথাও বাদ দেবার নয়। সামনের সারির ঋত্বিকদের একজন না হয়েও তিনিই ছিলেন যে সাহিত্যের সেই পর্বের গূঢ় প্রাণমন্ত্রের প্রধান ধারক।[১৬]

প্রগতি

হাতে-লেখা পত্রিকা *প্রগতি* ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হওয়ার পিছনের কাহিনি বিবৃত করেছেন স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু--*প্রগতি*-র প্রধান সম্পাদক এবং মুখ্য সংগঠক। তাঁর আত্মজীবনী 'আমার যৌবন'-এর প্রাসঙ্গিক অংশ এইরকম : [আই এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারের ফলে বুদ্ধদেব মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি পাবার পর] "বন্ধুরা মিলে স্থির করা গেলো হস্তলিপি - পত্রিকা আর নয়, এবারে একটি মুদ্রাযন্ত্র-নিঃসৃত দস্তুরমাফিক মাসিক পত্রিকা চাই। আমরা এই সিদ্ধান্ত নেবার মাস দুয়েকের মধ্যে আষাঢ় মাসের কোনো এক দিনে আমার এবং টুনুর [কবি ও অধ্যাপক অজিতকুমার দত্ত] যৌথ সম্পাদনায়--এবং প্রধানত এই দু-জনেরই আর্থিক দায়িত্বে--*প্রগতির* প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করলো। আকার ফুলস্ক্যাপ অষ্টমাংশ, হলদে মলাটে উর্ধ্বমুখ একটি নারীমুণ্ড আঁকা--প্রথম রচনা অচিন্ত্যর একটি অষ্টাদশপদী কবিতা : 'আমার পরান মুখর হয়েছে সিন্ধুর কলরোলে।' আর ছিলো পিরানদেল্লো বিষয়ে বুদ্ধ-দার [ড. প্রভুচরণ গুহঠাকুরতা] প্রবন্ধ, সম্ভবত জীবনানন্দের একটি কবিতা (সংখ্যাটি হাতের কাছে নেই ব'লে 'সম্ভবত' বলছি), তখনকার মাসিকপত্রের পক্ষে অপরিহার্য ধারাবাহিক উপন্যাসটি আমিই কপাল ঠুকে শুরু ক'রে দিয়েছিলাম। প্রথম বছরের বারোটি সংখ্যা নিয়মিত বেরিয়েছিলো, মনে পড়ে, বেশ একটু চাঞ্চল্যও তুলেছিলো।"[১৭] পত্রিকা প্রকাশের আগে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে চিঠিতে বুদ্ধদেব জানিয়েছিলেন 'মস্ত দুঃসাহসের কাজে' তাঁরা হাত দিয়েছেন। 'হঠাৎ সব ঠিক হয়ে গেল। এখন আর ফেরা যায় না। একবার ভালো করেই চেষ্টা করে দেখি না কি হয়।'[১৮]

বুদ্ধদেব-অজিত দত্ত ছাড়াও *প্রগতি*-ঘনিষ্ঠদের মধ্যে ছিলেন পরিমল রায়, অমলেন্দু বসু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এইসব সহপাঠীরা কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের একপ্রান্তে টিনের চালওলা দর্মার ঘরে আদিত্যর চায়ের দোকানে (বুদ্ধদেবের ভাষায় 'আমাদের দ্বিতীয় রঁদেভু', প্রথমটি

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের কমনরুম), কিংবা ঘন সবুজ ঘাসের ওপর গোল হয়ে বসে (কেউ ছুটির ঘণ্টায়, কেউ ক্লাস পালিয়ে) সাহিত্য বিষয়ে প্রবল আলোচনা করতেন। আমরা ধরে নিতে পারি *প্রগতি*-র সাহিত্যিক আড্ডা ওটাই। হয়তো বুদ্ধদেবের বাড়িতেও আড্ডা বসত। দিন পনেরোর জন্য ১৩৩৩ চৈত্রে অচিন্ত্যকুমার বুদ্ধদেবের রমনার বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে সেখানের হই হই আড্ডার কথা লিখেছেন।[১৯] বলা বাহুল্য সে দলে ছিলেন যুবনাশ্ব বা মনীশ ঘটক, সুধীশ ঘটক, অনিল ভট্টাচার্য, ভৃগু গুহঠাকুরতা।

প্রগতি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমধর্মী *কল্লোল* পত্রিকা অভিনন্দন জানিয়ে ১৩৩৪ ভাদ্র সংখ্যায় লিখেছিল : 'পত্রিকাখানি ছোট হইলেও ইহার লেখা প্রভৃতি পড়িয়া মনে হয়, এই পত্রিকা পরিচালনায় যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের শক্তি ও আদর্শে বিশিষ্টতা আছে। আমরা এই পত্রিকাখানির সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি।' বলা বাহুল্য অন্যতম কল্লোলীয় অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে বুদ্ধদেবের ইতিমধ্যে যোগাযোগ ঘটে গেছে। ১৩৩২ অগ্রহায়ণের *কল্লোল*-এ গোকুলচন্দ্র নাগ সম্পর্কে বুদ্ধদেব-লিখিত 'যৌবন-পথিক' কবিতাটি বেরিয়েছে। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার পর অচিন্ত্যকুমার ঢাকায় এসেছেন বুদ্ধদেবের আমন্ত্রণে। কাজেই কল্লোলীয়দের পক্ষে প্রগতিপন্থীদের স্বাগত জানানো স্বাভাবিক।

বুদ্ধদেবের পক্ষে সাহিত্যবাসনায় উদ্বেলিত হওয়া যতটা সহজ, পত্রিকা চালানোর মতো স্থির ব্যবসায়িক বুদ্ধি তাঁর সেই বয়সে ছিল কিনা সন্দেহ। আসলে সংগঠন চালাতেই তিনি কিছুমাত্র উৎসাহী নন। বন্ধুদের আগ্রহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদের সাহিত্য-সম্পাদক হওয়া সত্ত্বেও 'কমিটি, সাব-কমিটি, কনস্টিট্যুশন, আইনের তর্ক—এ সব বিতিকিচ্ছিরি ঝামেলা আমি যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলি, মীটিং ডাকতে উৎসাহ পাই না, অন্য সদস্যেরা যা নিয়ে উৎসাহিত হয় আমাকে তা নিরতিশয় ক্লান্ত করে।'[২০] সুতরাং *প্রগতি*-র প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর দশজন বন্ধুর বেশির ভাগ 'ঘটনা-চক্রান্তে' নানা জায়গায় সরে গেল, তখন 'মোটা খরচের ভারটা যে-দুজনের উপরে পড়লো, তাদের যৎসামান্য বিত্ত মাসিক পত্রের অগ্নিসংযোগে দ্রুতবেগে পুড়ে যেতে লাগলো।'[২১] অবশ্য দু-জন বন্ধুর কাছ থেকে অনেকদিন পর্যন্ত তাঁরা আর্থিক সাহায্য পেয়েছিলেন। কিন্তু আয় বাড়িয়ে কিভাবে পত্রিকা টিকিয়ে রাখা যায় সে মন্ত্র অন্তত ঐ বয়সে তাঁদের জানা ছিল না।

যৌবনের সাহিত্যোন্মাদনায় যে-পত্রিকার জন্ম, তার শ্বাসযন্ত্রে প্রাণদায়ী অক্সিজেন ভরে দেবার জন্য বুদ্ধদেব প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন, তবু—। চিঠির পর চিঠিতে অচিন্ত্যকুমারকে লিখেছেন 'প্রগতি আগামী বছর চলবে কিনা এখনো ঠিক করিনি। সাধ তো আকাশের মতো প্রকাণ্ড, কিন্তু পুঁজিতে যে কুলোয় না। ...এখনো অবিশ্যি একেবারে হাল ছেড়ে দিইনি। গ্রীষ্মের ছুটি হওয়ামাত্র একবার বিজ্ঞাপন-সংগ্রহেব চেষ্টায় কলকাতায় যাব। যদি কিছু পাওয়া যায় তাহলে প্রগতি চলবে।' কখনও কখনও বুক ভরে বাতাস টেনে নিয়ে বলেছেন 'আশা করতে ছাড়িনে। তবু দমে যাই না।...'প্রগতি' চলবেই।' তারপর ভেঙে পড়া মর্মযন্ত্রণায় রক্তে ডোবানো কলমে লেখা চিঠি : 'প্রগতি' তুলে দিলাম।...আমার ইহকালে-পরকালে, অন্তরে-বাহিরে, বাক্যে-মনে আর আপনার বলে কিছু রইল না। কত আশা নিয়েই যে শুরু করেছিলাম, কত উচ্চাভিলাষ, স্নেহ, আনন্দ—কী প্রকাণ্ড idealism-ই যে এর পিছনে ছিল!'[২২]

এরপরেও শেষ চেষ্টা বুদ্ধদেব করেছিলেন। অচিন্ত্যকুমার ও বিষ্ণু দে-কে লেখা অন্য চিঠিতে সেকথা আছে।[২৩] তবু ১৩৩৭ বৈশাখে প্রগতির গতি রোধ হয়ে গেল। একটি স্বপ্নের মৃত্যু হবার পর রূঢ় বাস্তবের কঠিন স্পর্শ মানুষের পক্ষে কতখানি পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে তা 'পুরানা পল্টন' রচনায় বুদ্ধদেব লিখেছেন।[২৪]

ধূপছায়া

তরুণ সাহিত্যপ্রেমীদের প্রকাশিত আরেকটি পত্রিকা *ধূপছায়া*। *ধূপছায়া* সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার কল্লোল যুগ-এ লিখেছেন : '[ধূপছায়া] আধুনিক সাহিত্যেরই পতাকাবাহী পত্রিকা। সম্পাদক ডাক্তার রেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় স্কুলে আমার আর প্রেমেনের সহপাঠী ছিল। তাই আমাদের দলে টানল সহজেই।'[২৫] পত্রিকাটি দীর্ঘজীবী ছিল না (১৩৩৪ বৈশাখ - ১৩৩৫ কার্ত্তিক?)। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক রেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পরিচালক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রণবদেব মুখোপাধ্যায়। পত্রিকাটি প্রথমে প্রকাশিত হত কলকাতার ৭৯/২৩ লোয়ার সারকুলার রোডে *ধূপছায়া*-র কার্যালয় থেকে। পরিবর্তিত ঠিকানা ১৪নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। প্রকাশের এক বছর পরে ১৩৩৫ বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার প্রচ্ছদে সম্পাদক হিসাবে রেণুভূষণের নাম ছাপা হয়েছে। আষাঢ় সংখ্যা থেকে অপর সম্পাদকরূপে অরিন্দম বসু যোগদান করলেন। কেন--তার ব্যাখ্যা এই সংখ্যার 'ঘরে-বাইরে' নামক ফিচারের মধ্যে আছে। একা রেণুভূষণের পক্ষে পত্রিকার সঠিক দায়িত্ব পালন করে যথাসময়ে ১৩৩৫ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। সেজন্য ১৩৩৫ শ্রাবণ সংখ্যায় কুণ্ঠার সঙ্গে সম্পাদকেরা জানালেন 'প্রেসের সাময়িক বিশৃঙ্খলা ও অন্যান্য কারণে আমাদের এই ত্রুটি হয়েছে! এরপর এ বিষয়ে আমরা বিশেষ করে সতর্ক হ'ব।' একই সঙ্গে যাঁদের সহানুভূতিতে পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে তাঁদের 'আন্তরিক ধন্যবাদ' এবং 'কৃতজ্ঞতা' সম্পাদকেরা জানিয়েছেন। যেমন—সৌরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রণব রায়, শৈলেন ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্র দাস, সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেন ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, রাসগৌর ঘোষাল প্রমুখ। লক্ষণীয়, এঁদের অনেকে পত্রিকার নিয়মিত লেখক।

প্রসঙ্গত বলে নেওয়া দরকার, *ধূপছায়া* প্রকাশের কয়েক মাস পরেই পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষের দায়িত্ব এবং পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করে সুরেন ভট্টাচার্য পত্রিকা-সম্পাদককে একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে আশ্বিন মাস থেকে অব্যাহতি নেবার কথা বলা হলেও অগ্রহায়ণে সেটি পত্রিকায় ছাপা হয়। সম্ভবত মধ্যবর্তী সময়ে সুরেন ভট্টাচার্যকে বুঝিয়ে স্বদলে রাখার চেষ্টা হয়েছিল।

ধূপছায়া পত্রিকায় কবিতা-গল্প-উপন্যাস-দৃশ্যকাব্য-ভ্রমণ কাহিনি-অনূদিত রচনা-প্রবন্ধ-শিল্প সমালোচনা মুদ্রিত হত। নিয়মিত বিভাগের মধ্যে আছে 'সওদা', পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। এর ভাষা ঝাঁঝালো, তিক্ত, কটু। এখানে আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিক প্রসঙ্গ আলোচনার সময় মন্দভাগ্য নবীন সাহিত্যসেবীদের প্রতি 'সওদা'র কলম মমতামেদুর সহানুভূতিশীল। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের বিরোধীপক্ষীয়দের কথা বলার সময় 'সওদা'র ভাষা রূঢ় কর্কশ, যাঁদের মধ্যে আছেন *শনিবারের চিঠি*-র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস, *প্রবাসী*-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এক্ষেত্রে

নিখাদ গালিগালাজ তাঁদের প্রতি নিক্ষিপ্ত। সে প্রসঙ্গ আমরা পরে উত্থাপন কবব।

১৩৩৪ পৌষ থেকে *ধূপছায়া*-য় 'ঘরে বাইরে' নামক বিভাগ প্রকাশিত হতে শুরু করে। লেখকের নাম প্রথমদিকে না থাকলেও ১৩৩৫ শ্রাবণে রচনার নিচে 'শ্রীগ্রহাচার্য্য' নাম এবং আষাঢ় সংখ্যায় অ. ব. অর্থাৎ অরিন্দম বসু মুদ্রিত আছে। *ধূপছায়া*-য় রীতিমাফিক সম্পাদকীয় না থাকলেও পত্রিকার ঘরের এবং বাইরে-র সংবাদ এখানে দেখা যায়। যেমন ১৩৩৪ মাঘ সংখ্যায় কবি ও ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির মৃত্যুসংবাদ 'ঘরে বাইরে'তে পেয়েছি। ১৩৩৪ চৈত্রে পত্রিকার এক বছর পূর্তি উপলক্ষে লেখা হয়েছে, এই ক্ষুদ্র সাহিত্যসাধনার ভিতর দিয়ে তাঁরা অনেক বন্ধু পেয়েছেন। আগামী ১৩৩৫ বৈশাখ থেকে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ধারাবাহিক নাটক প্রকাশিত হবে। এবং গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পত্রিকার এক হাজার অতিরিক্ত সংখ্যাও মুদ্রণ করা হবে। 'ঘরে বাইরে' অবশ্য পত্রিকার সব সংখ্যায় প্রকাশিত হয়নি, যদিও ঘরের কথা বলার সময় লেখকের ভাষায় বঙ্কিম টান ছিল।

ধূপছায়া পত্রিকায় কোনো কোনো সংখ্যায় পরবর্তী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ ছাপা হয়েছে। যেমন ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ : আগামী সংখ্যায় কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা বেরোবে। সেই সঙ্গে যোগেশচন্দ্র রায়ের 'শিল্পমঞ্জরী' ('বেবি ফ্রক তৈয়ারী করার প্রণালী') প্রবন্ধ। ১৩৩৫ বৈশাখের বিজ্ঞাপন : 'আস্‌চে সংখ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প।' ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠের বিজ্ঞাপন : 'আসচে সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের প্রবন্ধ'। একই সঙ্গে ছোটোগল্পের জন্য 'প্রতিযোগিতা'ও আহ্বান করা হয়েছে। সমধর্মী পত্রিকা *প্রগতি*-র বিজ্ঞাপন *ধূপছায়া*-র একাধিক সংখ্যায় বেরিয়েছে, যেমন ১৩৩৫ শ্রাবণে।

ধূপছায়া পত্রিকার দপ্তরে সাহিত্যের আড্ডা নিয়মিত বসত কিনা তা আমাদের জানা নেই। তবে ১৩৩৪ পৌষের 'ঘরে বাইরে'তে লেখা হয়েছে, পত্রিকার পুরাতন কার্যালয়ে (৭৯/২৩ লোয়ার সারকুলার রোড) পত্রিকার পক্ষে প্রীতি-সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছিল। 'সম্মিলনীতে 'ধূপছায়া'র লেখক ও অনুগ্রাহক বর্গের ভিতর পরস্পর পরিচয় ও আদান প্রদানের যথেষ্ট সুযোগ মিলিয়াছিল। সঙ্গীত ও বাদ্যাদির দ্বারা সম্মিলনীকে আরও রমণীয় করিবার চেষ্টা করা হয়।' পত্রিকার সম্পাদক-পরিচালক-পৃষ্ঠপোষক-লেখক-গ্রাহকদের পরস্পর পরিচিত করানোর জন্য এ এক নতুন ধরনের প্রয়াস সন্দেহ নেই।

কল্লোল-কালি-কলম-প্রগতি-ধূপছায়া পত্রিকায় সাধারণভাবে কোন লেখকেরা লিখেছেন তার সালতামামি নেওয়া যেতে পারে। গল্প-উপনাস-কবিতা-প্রবন্ধের ধারা চারটি পত্রিকায় দেখা গেছে। লক্ষণীয় এই, সেকালের বিশিষ্ট খ্যাতিমান লেখকদের রচনার পাশে সদ্য তরুণ লেখকদের রচনা এখানে সাদরে পত্রস্থ করা হয়েছে। এই দুই দলের লেখকদের মধ্যে কারা কোন্ পত্রিকায় লিখেছেন তা এইরকম :

কল্লোল—রবীন্দ্রনাথ, বীরবল, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নলিনীকান্ত সরকার, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেব বসু, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুলচন্দ্র নাগ, নজরুল ইসলাম, যুবনাশ্ব, সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, সুকুমার ভাদুড়ি, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, নীলিমা বসু, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ।

কালি-কলম—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, শশাঙ্কমোহন সেন, জীবনানন্দ দাশ, জগদীশ গুপ্ত, নীলিমা বসু, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালিদাস রায়, প্রমথনাথ বিশী, মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, নলিনীকিশোর গুহ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদারনাথ রায়, হেমচন্দ্র বাগচি, অতুলপ্রসাদ সেন, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, প্রিয়ম্বদা দেবী, আনন্দসুন্দর ঠাকুর, মণিবজ্র ভারতী, মুরলীধর বসু, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, অখিল নিয়োগী প্রমুখ।

প্রগতি—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সমরেন্দ্র গুপ্ত, প্রভু গুহঠাকুরতা, মনীশ ঘটক, বুদ্ধদেব বসু, অজিতকুমার দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, জীবনানন্দ দাশ, হেমচন্দ্র বাগচি, পরিমল রায়, সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন, বিষ্ণু দে, গায়ত্রী দেবী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রিয়ম্বদা দেবী প্রমুখ।

ধূপছায়া—রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, রেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুরেন ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অরিন্দম বসু, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবির, রাসগৌর ঘোষাল, সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, গিরিজাকুমার বসু, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শিবরাম চক্রবর্তী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অজিতকুমার দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, প্রতুল লাহিড়ী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল রায়, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ।

লক্ষ করলেই দেখা যাবে চারটি পত্রিকার মধ্যে এমন একাধিক লেখক আছেন যাঁরা সবকটি পত্রিকায় লিখেছেন। আবার পত্রিকার নিজস্ব লেখকগোষ্ঠীও ছিল। তাছাড়া পত্রিকা-সম্পাদকেরা প্রত্যেকেই কলম ধরেছেন, মৌলিক রচনা কিংবা অন্যে রচিত সাহিত্য বিষয়ে মন্তব্যাদি করার জন্য। *কল্লোল-কালি-কলম-প্রগতি-ধূপছায়া*-য় মুদ্রিত প্রতিষ্ঠিত লেখকদের রচনা বিষয়ে আমরা কোনো মন্তব্য করব না। কিন্তু বিশের দশকের তরুণ সাহিত্যিকদের রচনা যে পূর্বের সাহিত্যধারা ত্যাগ করে ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। সেজন্য সমকালে তাঁরা ধিক্কৃত ও লাঞ্ছিত। কিন্তু তাঁরা প্রতিরোধেও অগ্রসর। কি এঁদের সাহিত্যআদর্শ ছিল এবং তার জন্য কোন্ লড়াই এঁরা করেছেন, সেই চমকপ্রদ ইতিহাস বর্তমান রচনার তৃতীয় অংশে আমরা পেশ করব।

কিন্তু একটি কথা এখানে বলে নেওয়া দরকার যে, এইসব নবীন সাহিত্যিকেরা আর্থিকভাবে সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন না। গোষ্ঠীর পত্রিকা অথবা সমমতের পত্রিকায় লিখে এঁরা সামান্য অর্থ পেতেন কিংবা পেতেন না। ফলে বেঁচে থাকার জন্য নির্ভর করতে হত বৃহৎ ব্যবসায়িক পত্রিকার উপর। সেখানে এঁদের কোন্ দশা ছিল তা জানা গেছে *কালি-কলম* পত্রিকার 'বিচিত্রা' অংশে। ১৩৩৩ আষাঢ়ে মুরলীধর বসু ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন তরুণ সাহিত্যিকেরা মাসিক পত্রকে রচনাসম্ভারে ভরে দেন। অথচ উপযুক্ত পারিশ্রমিক তাঁরা পান না। মুরলীধরের প্রশ্ন : 'যাহা দেওয়া হয় [পত্রিকার] লাভের তুলনায় তাহার পরিমাণ কতটুকু? তাহাও কি আবার সব সময় আপনা হইতে দেওয়া হয়? না চাহিয়া পাঠাইলে কি পাওয়া যায়? নিতান্তই কি দায়ে ঠেকিয়ে দেওয়া নয়?' দরিদ্র সাহিত্যসেবীদের কথা স্মরণ

করে মুরলীধরের দীর্ঘশ্বাস : 'সংসারের দারুণ অভাব ও অনটনের মধ্যে কতজনের সৃজনী-শক্তি ফুটিতে না ফুটিতেই নিঃশেষে ঝরিয়া গেল।...জীবনে আর্থিক অভ্যুদয়ের কামনা তাহাদের কোনওদিনই নাই, সে-সুখস্বপ্ন তাহাদের জন্য নয়, তবু—অর্থ ত চাই!' এমতাবস্থায় উপায় কি? হতভাগ্য সাহিত্যিকদের আর্থিক উন্নতির জন্য মুরলীধরের প্রস্তাব : 'বাংলার সাহিত্যসেবীরা... যদি সকলে মিলিয়া অচিরে একটি শক্তিমান প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার দিকে মন না দেন, তাহা হইলে সংসারে বাঁচিয়া থাকিয়া সাহিত্য-সাধনায় অবহিত হইবার দিন এখনও অনেক দূরে। আজিকার এই প্রাণান্তকর লাঞ্ছনা, অভাব ও অপচয়ের কবল হইতে নিঃশেষে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে লেখক ও গ্রন্থীসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আর কোনও উপায় দেখি না।' ('বিচিত্রা', *কালি-কলম*, ১৩৩৩ শ্রাবণ)।

কালি-কলম-এ মুরলীধর বসু যে কথা সংযত আবেগের সঙ্গে শালীনভাবে বলেছেন, একই কথা রাখঢাক না করে রোষে ক্ষোভে লেখা হয়েছে *কল্লোল* পত্রিকায়। ১৩৩৪ মাঘের 'বিদ্যাবণিক'-এর (নামত পরিষ্কার 'বিদ্যাবণিক' শব্দটি কেন ব্যবহৃত) রচনাকার বলেছেন : 'নবযুগের লেখকেরা নিজেদের লেখা সম্বন্ধে সম্বৃত হয়ে নিজেদের প্রকৃতিস্থ রেখে একটু ধৈর্য্য ধরে ক'দিন এ বণিক-দলকে একটু রোয়াব দেখালেই এদের [টাকার] থলির দড়ি খুলে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে লেখকদের অন্তত মানুষ ব'লে সম্মান করতে এঁরা শিখবেন।' কয়েক বছর পরেও এইসব লেখকদের আর্থিক অবস্থা যে কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয়নি তা বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ 'কবি ও তার সমাজ' (*কবিতা পত্রিকা*, বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা, ১৩৪৫ বৈশাখ) পড়লে বোঝা যায়। বুদ্ধদেবের আক্ষেপ ছিল শিল্প-সাহিত্য যে স্বাধীন পেশারূপে গণ্য হতে পারে সে ধারণা বাংলাদেশের মানুষের নেই। সুতরাং তাঁর ঘোষণা : 'আজকের দিনে...আমরা এইটুকুই বলব যে সামাজিক জীব হিসাবে কবিতা লিখেই আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি। ...মুচি যেমন জুতো তৈরি করে বাজারে বেচে, আমরাও তেমনি কবিতা তৈরি করে বাজারে বেচতে চাই।'[২৬]

দুই

পত্রিকা চতুষ্টয়ের সম্বন্ধ : প্রণয়ে এবং প্রত্যাখ্যানে

একটা প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে—এই চারটি পত্রিকার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ কেমন ছিল — প্রগাঢ় প্রীতির নাকি ভদ্র দূরত্বের অথবা চাপা বিদ্বেষের? পত্রিকার পৃষ্ঠা উল্টে এবং পত্রিকা-সম্পাদক বা পত্রিকা-সংযুক্ত মানুষদের স্মৃতিকথা পড়ে আমাদের মনে হয়েছে সবকটি কথাই অল্পবিস্তর সত্য। যেমন *কল্লোল*-এর সঙ্গে *প্রগতি*-র সম্পর্ক নিঃসন্দেহে প্রীতিময়। প্রগতি-সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর মুক্ত কণ্ঠস্বর : 'যেখানেই যাই আর যা-ই করি, আমাদের কেন্দ্রস্থল সর্বদাই 'কল্লোল'।' এও তিনি বলেছেন *প্রগতি* পত্রিকাটি *কল্লোল*-এরই 'এক টুকরো'। *কল্লোল*-এর অন্যতম প্রধান লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত *প্রগতি*-রও 'প্রধান পুরুষ'।[২৭] বুদ্ধদেবের আহ্বানে কল্লোলীয় অচিন্ত্যকুমার ঢাকায় এসে তাঁর কাছে কয়েকদিন ছিলেন, সে প্রসঙ্গ ইতিমধ্যে দেখেছি। এও জেনেছি *প্রগতি* প্রকাশের পর *কল্লোল* সহর্ষ অভিনন্দন জানিয়েছিল।

কিন্তু *কালি-কলম*-এর সঙ্গে *ধূপছায়া*-র সম্পর্ক হৃদ্য ছিল না। *কালি-কলম*-সম্পাদক মুরলীধর বসুর মনে হয়েছিল *ধূপছায়া* পত্রিকায় প্রকাশিত মোহিতলাল মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা এবং একাধিক গল্প ও কবিতায় 'বদ্‌সাহসের পরিচয়' আছে। সুবোধ রায় বিরূপাক্ষ শর্মা ছদ্মনামে 'আর্টের আটচালা'য় (১৩৩৫ আশ্বিন) *বীণা, শান্তি, কেতকী* পত্রিকার সঙ্গে *ধূপছায়া*-কে একই আসনে বসিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য *ধূপছায়া*-র পক্ষে প্রতিবাদ অবিলম্বে হয়। ১৩৩৫ কার্তিকের 'আর্টের আটচালা'য় *ধূপছায়া*-সম্পাদক রেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় ও অরিন্দম বসুর প্রতিবাদ মুদ্রিত করে বিরূপাক্ষ শর্মা এই শান্তিবাণী উচ্চারণ করেছেন : "বদ্‌সাহসী"দের পর্য্যায় থেকে "ধূপছায়া" দূরে থাকতে চান্ সে তো আনন্দেরই কথা। সমস্ত তরুণ পত্রিকাগুলি দুঃসাহসী হোক্, কিন্তু বদ্‌সাহসী যেন না হয় এই আমাদের অন্তরের কামনা।"

কালি-কলম এবং প্রগতি-র সম্বন্ধ ঠিক কি ছিল? *কল্লোল*-এর সঙ্গে *প্রগতি* যতটা ঘনিষ্ঠ, *কালি-কলম* ও *প্রগতি*-র সম্পর্ক ততটাই শিথিল। উভয় পত্রিকার মধ্যে গভীর ভাব বিনিময়ের কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি। *কালি-কলম* বরং *প্রগতি*-কে খোঁচাও দিয়েছে। ব্যাপারটি সেই সময়ে ঘটে যখন *কালি-কলম*-সম্পাদক মুরলীধর বসুর দুই শক্তিশালী ডানার (যে-ডানায় ভর করে তিনি সাহিত্যাকাশে উড়েছিলেন) একটি অচল--প্রেমেন্দ্র *কালি-কলম* ত্যাগ করে চলে গেছেন। তারপর *প্রগতি*-তে প্রেমেন্দ্রর অতি প্রশংসা *কালি-কলম*-এর সহ্য হয়নি। বিরূপাক্ষ শর্মার প্রতিক্রিয়া : 'কিছুদিন পূর্ব্বে *প্রগতি* আবিষ্কার করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের রচনাশক্তি মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে। তাঁর আজকালকার ভাষা ও ভাব আলগা এবং অসংলগ্ন ; অনেক কথা বলেও তিনি যে ভাবটি সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তুলতে পারেন না, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁর বয়স ও জীবন্ত ভাষার সাহায্যে দুচার কথাতেই তা' করে থাকেন।' ('আর্টের আটচালা', ১৩৩৪ ফাল্গুন)। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। প্রসঙ্গত আমরা *কালি-কলম*-এ প্রকাশিত জগদীশ গুপ্তের 'প্রভাতবাবুর গল্প' (১৩৩৪ পৌষ) রচনাটির উল্লেখ করতে চাই। ১৩৩৪ *কল্লোল*-এ বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'সুখপাঠ্য' হলেও 'কালের নিকষমণিতে কতদিন পর্য্যন্ত টিকিতে পারিবে তাহা অনুমান করা শক্ত।' এই মন্তব্য করার জন্য সেকালের আর এক শক্তিমান গল্পকার জগদীশ গুপ্ত. বুদ্ধদেবকে রেয়াত করেননি। বুদ্ধদেব প্রমুখের রচনা সম্পর্কে কটাক্ষ এবং প্রভাতকুমার সম্পর্কে উচ্ছ্বাস তিনি দেখিয়েছেন। বুদ্ধদেবকে সতর্ক করে তাঁর শেষ মন্তব্য : প্রভাতকুমারের রচনায় নরনারীর বিবাহ-নিরপেক্ষ যৌনসম্বন্ধ না থাকার 'অপরাধে যদি তাঁহাকে বাংলা সাহিত্য-রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবার প্রস্তাব কেহ কখনো করেন তবে সাহিত্যের প্রতিই নিদারুণ অবিচার করা হইবে।...বসু মহাশয়ের লেখনী অক্ষয় হোক্, কিন্তু প্রভাতবাবুর গল্পগুলিকে ভুলিবার কথা তিনি যেন আর না বলেন।'

কিন্তু *কল্লোল-কালি-কলম*-এর সম্পর্ক কেমন ছিল? নিঃসন্দেহে ব্যাপারটি কৌতূহলোদ্দীপক। *কল্লোল-কালি-কলম পর্ব* চুকে যাবার অনেক বছর পরে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যে স্মৃতিচারণ করেছেন, সেখানে বিরোধিতার ঝাঁঝ না থাকলেও বিরোধিতা যে ছিল তার আভাস স্পষ্ট। সেই বেদনার ক্ষতে সময় নামক ব্যথাহর প্রলেপ লাগানো সত্ত্বেও অচিন্ত্যকুমারকে লিখতে হয়েছে

ঘটনাটি 'প্রায় প্রিয়বিচ্ছেদের মতো' যেখানে 'একটু ভুল-বোঝার ভেলকিও ছিল।--কল্লোলের রীতিমতো লাভ হচ্ছে, দীনেশদা ইচ্ছে করেই মুনাফার ভাগ-বাঁটোয়ারা করছেন না।' নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের মতো মানুষ কল্লোল-গোষ্ঠীতে ছিলেন যাঁর মধ্যে 'বিক্ষোভের বোধহয় অন্ত' ছিল না *কল্লোল* ভেঙে *কালি-কলম* সৃষ্টির জন্য। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ 'ধরল গিয়ে শৈলজাকে, মুখোমুখি প্রচণ্ড ঝগড়া করলে তার সঙ্গে। এমন কি তাকে বিশ্বাসহন্তা পর্যন্ত বললে। ...নৃপেন প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হয়নি। "কালি-কলমে" লেখা তো দেয়ইনি, বোধ হয় কোনওদিন যায়ওনি তার আপিসে-আড্ডায়।'[২৮] অচিন্ত্যকুমার নিজে *কালি-কলম*-এর অফিসে গেলেও *কল্লোল*-এর সামগ্রিক বরফ তাতে গলেছিল কিনা সন্দেহ। বিচিত্র ব্যাপার এই, *কল্লোল* সম্পর্কে *কালি-কলম*-এর ধারণা কিন্তু বেশ প্রশংসার। *কল্লোল* ভেঙে *কালি-কলম* গড়া হয়েছিল। সেই দল ভেঙে প্রেমেন্দ্র-শৈলজানন্দ পুনরায় ফিরে গেছেন *কল্লোল*-এ। তবু *কালি-কলম*-এর ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠেব 'মাসিক সাহিত্য' বিভাগে *কল্লোল*-এর প্রশংসা করে বলা হল :

> কল্লোল বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। বিনা অর্থবলে নানা বিরুদ্ধতার সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করিয়াও পাঁচ বৎসরে এই মাসিক যে-কৃতিত্ব দেখাইয়াছে তাহা সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ইতিমধ্যেই কাগজখানি বাংলার মাসিক পত্রিকার আসরে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছে। 'কল্লোল' নিছক সাহিত্য-পত্রিকা, অতিকায় মাসিকের মতো জগাখিচুড়ি নহে। অদ্যাবধি একাধিক শক্তিশালী নবীন লেখকের পরিচয় আমরা এই কাগজের কল্যাণে পাইয়াছি। সুখের কথা, বর্ত্তমান বৎসরেও সে-ধারা অক্ষুণ্ণ আছে।

তিন

রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র : পত্রিকার চোখে সাহিত্যের দুই স্থির ভূমি

রবীন্দ্রনাথে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষপুট বিচ্যুত হয়ে, সাহিত্যে নতুন ধারাস্রোত সৃষ্টির আনন্দে মগ্ন ছিলেন আলোচ্য চার পত্রিকা-গোষ্ঠী। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগতের সঙ্গে তাঁদের ভুবনের বহুযোজন পার্থক্য রচিত হয়ে গিয়েছিল। তবু রবীন্দ্রনাথকে শিরোভূষণ না করে বাণীবন্দনা করা যায় কি? সেই ধারণা এঁদের ছিল বলেই *কল্লোল-কালি-কলম-ধূপছায়া* পত্রিকায় রবীন্দ্ররচনা প্রকাশিত। *কল্লোল*-এ রবীন্দ্রনাথের বারোটি কবিতা এবং তাঁর বিষয়ে অন্তত প্রমথ চৌধুরীর রচনার উল্লেখ ('রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য' বীরবল, ১৩৩২ বৈশাখ) করাই যায়। পিছিয়ে ছিল না *কালি-কলম*-ও। পত্রিকার 'চয়নিকা' অংশে অন্য পত্রিকায় মুদ্রিত রবীন্দ্র-রচনা নিয়মিতভাবে উৎকলন করা হয়েছে। এমন কি *ধূপছায়া*-ও, যে পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে *শনিবারের চিঠি*-র কণ্ঠস্বর অনুভব করে ক্রোধে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তারাও রবীন্দ্রমর্যাদার ওপর অন্য পত্রিকার আঘাত সহ্য করেনি, সবলে প্রত্যাঘাত করেছে। *ধূপছায়া*-র এই ভূমিকা বিস্ময়কর মনে হতে পারে কিন্তু প্রশংসনীয়। বলে নেওয়া দরকার, *ধূপছায়া*-র ১৩৩৪ আশ্বিনে রবীন্দ্রনাথের 'মনের বাগানবাড়ি' প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। তাছাড়া ১৩৩৪ কার্ত্তিক এবং অগ্রহায়ণে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী প্রকাশিত। আর রবীন্দ্র-সম্মান রক্ষার্থে *ধূপছায়া*-র প্রতিবাদ ১৩৩৫ আশ্বিনে বিষ্ণু দে-র 'নব সাহিত্য-তত্ত্ব' রচনা প্রকাশের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধের বিরুদ্ধে ১৩৩৫ শ্রাবণের *প্রগতি*-তে মন্মথনাথ ঘোষ অশিষ্ট ভাষায় "রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যরূপ'" লিখেছিলেন। বিষ্ণু দে সাড়ে বারো পৃষ্ঠা ধরে তাঁকে তুলোধোনা করেছেন। কিন্তু *ধূপছায়া*-সম্পাদকের কাছে এও যথেষ্ট মনে হয়নি।

একই সংখ্যায় ১৩৩৫ আশ্বিনের 'ঘরে বাইরে'র মধ্যে লেখা হয়েছিল : 'মূল প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে বিষ্ণুবাবু অনেকটা সরে গেছেন—বিশেষতঃ রচনাটি স্থানে স্থানে অপ্রাসঙ্গিক কোটেশ্যন জর্জরিত হওয়ায় তিনি যা নতুন করে বলতে চেয়েছেন তার রূপটি সহজ ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি ; তবুও মন্মথবাবুর অশ্রদ্ধার অপরাধের প্রতিবাদ প্রকাশের যথেষ্ট সার্থকতা আছে বলেই মনে করি।'

কিন্তু এইখানে একটি জিজ্ঞাসা এসে গেছে। বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধটি *ধূপছায়া*-র যে সংখ্যায় প্রকাশিত এবং 'ঘরে বাইরে'ও, সেই একই সংখ্যায় কিভাবে মন্মথনাথ ঘোষের পুনশ্চ 'অশ্রদ্ধা'মূলক প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য-সমালোচনা' প্রকাশিত হয়? 'রবীন্দ্রনাথের চেলারা' রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য-সমালোচনা' প্রবন্ধটি নিয়ে অতিশয় 'হৈ চৈ' করায় বিরক্ত মন্মথনাথ ষোল পৃষ্ঠা ধরে প্রতিবাদ করেছেন যার পংক্তির পর পংক্তিতে প্রবাহিত ব্যঙ্গস্রোত : 'গরীবিয়ানা, দরিদ্রায়ানা [সাহিত্যের] একটা ভঙ্গী বটে, কিন্তু ধনীকিয়ানা, অসীমিয়ানা, মাহাত্মিয়ানা, ঋষিয়ানাও সাহিত্যের এক একটা ঢং। যখন সাহিত্য পড়িব তখন এই বলিয়া পড়িব না যে এইবার ধনিকদের কথা পড়ি, বা যাহারা বিশ্ব বিশ্ব করে তাহাদের কথা পড়ি, বা কি করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ হইতে পারা যায় তাহার কথাই পড়ি। সাহিত্যের জন্যই যেন সাহিত্য পড়ি।'

ধূপছায়া-র এই দ্বিচারিতার উত্তর আমাদের জানা নেই।

প্রগতি-সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু অবশ্য নিজ পথে অটল ছিলেন। *প্রগতি* পত্রে কেন রবীন্দ্র-রচনা স্থান পায়নি, তার একটা উত্তর তাঁর প্রবীণ বয়সে লেখা আত্মজীবনী 'আমার যৌবন'-এর মধ্যে চোখে পড়ে। বুদ্ধদেব লিখেছিলেন : 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুখোমুখি একটা অতি আবশ্যক বোঝাপড়ার চেষ্টাও সেখানেই আমরা প্রথম করেছিলাম। বোঝাপড়া—মানে, এমন কোনো ব্যবস্থা, কিংবা বলা যাক আমাদের দিক থেকে প্রস্তুতি যাতে রবীন্দ্রনাথের বিশাল জালে আমরা আটকে না থাকি চিরকাল,...লোকেরা এর নাম দিয়েছিলো 'রবীন্দ্র-বিদ্রোহ'।'[২৯] এই যুক্তিতে *প্রগতি*-তে রবীন্দ্রনাথ খারিজ হয়ে গেলেন। কিন্তু মন্মথনাথ ঘোষের লেখা রবীন্দ্ররচনার অশিষ্ট প্রতিবাদ কেন *প্রগতি*-তে ছাপা হয়েছিল তার কোনো উত্তর আমাদের জানা নেই।

শরৎচন্দ্র বিশেষ মূল্য পেয়েছেন আমাদের আলোচ্য পত্রিকাগুলিতে অবশ্য *প্রগতি* ছাড়া। *প্রগতি* এক্ষেত্রেও তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল। *কল্লোল-কালি-কলম-ধূপছায়া* পত্রিকার পৃষ্ঠা উল্টে দেখেছি শরৎ-বিষয়ে কবিতা-প্রবন্ধ-স্মৃতিকথা ছাপা হয়েছে। *কল্লোল*-এর ১৩৩২ থেকে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'শরৎচন্দ্র' নামক ধারাবাহিক জীবনী লিখেছেন। ১৩৩৫ চৈত্রে অবনীনাথ রায় লিখেছেন 'বিরাজ বৌ' প্রবন্ধ। ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠের *কালি-কলম*-এর 'বিচিত্রা' অংশে 'পথের দাবী' প্রসঙ্গে মুরলীধর বসুর মন্তব্য, ভারতী-অপূর্বর মিলিত জীবনের আনন্দময় সার্থকতা সব্যসাচী পূরণ করেছেন। শিবপুর সাহিত্য-সংসদে শরৎচন্দ্রের আবাহন সভায় পঠিত 'শরৎ-প্রশস্তি' নামক সুবোধ রায়ের কবিতাটি ১৩৩৩ ফাল্গুনে মুদ্রিত। ১৩৩৪ ভাদ্রের *কালি-কলম*-কে শরৎ-সংখ্যা বলা যায়। সূচনায় শরৎচন্দ্রের স্বাক্ষরিত আলোকচিত্র। তারপর জগদীশ গুপ্তের প্রবন্ধ ('শরৎচন্দ্র'), হেমচন্দ্র বাগচির কবিতা ('শরৎ-প্রশস্তি'), মণিবজ্র ভারতীর পত্রপ্রবন্ধ ('সাহিত্যে শরৎচন্দ্র'), কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা ('স্মরণে') বেরিয়েছে। পরবর্তী আশ্বিন সংখ্যায় মোহিতলাল মজুমদারের কবিতা 'শরৎচন্দ্রের প্রতি' আছে। ১৩৩৫

বৈশাখ এবং আষাঢ়ে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুটি লেখা যথাক্রমে 'শরৎচন্দ্রের-উপন্যাস-লিখন-পদ্ধতি' এবং 'সাহিত্যে আত্ম-হত্যা' প্রকাশিত। *কালি-কলম*-এর ১৩৩৫ ভাদ্র সংখ্যাটি 'বিশেষ শরৎ সংখ্যা'। সূচনায় শরৎচন্দ্রের আলোকচিত্র। তারপর সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভেলি' (স্মৃতিকথা), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' (কবিতা), গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শরৎচন্দ্র' (স্মৃতিকথা), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'কথা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র' (প্রবন্ধ), অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের 'স্মরণে' (স্মৃতিকথা), কালিদাস রায়ের 'শরৎ-সাহিত্য' (প্রবন্ধ), কুমুদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শরৎ-সাহিত্যে হাস্যরস' (প্রবন্ধ), সন্ন্যাসী সাধু খাঁর 'নৈবেদ্য' (সাবিত্রী, ইন্দ্রনাথ, ভৃত্য, বাংলার চারণ, গফুর, দেবদাস, অরক্ষণীয়া, নারী-কে নিয়ে লেখা কবিতা) এবং শরৎচন্দ্রের ত্রি-পঞ্চাশৎ জন্মদিন উপলক্ষে দেশবাসী প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রটি মুদ্রিত।

পিছিয়ে ছিল না *ধূপছায়া* পত্রিকাও। সংখ্যাগত বিচারে কম হলেও গুরুত্বের বিচারে তা কম নয়। ১৩৩৫-এর ৩১ ভাদ্র শরৎচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষে দেশবাসী প্রদত্ত সম্বর্ধনার প্রাক্কালে, *ধূপছায়া*-র 'ঘরে বাইরে' অংশে অরিন্দম বসু গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করেছেন :

> ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি। আজ পর্য্যন্ত এ দেশের কোন বৃহৎ অনুষ্ঠান থেকে তাঁর জন্মতিথিতে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়নি। তাই এবার টাউন হলে তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনার আয়োজন চলছে। সাহিত্য-প্রিয় বাঙালীর বুকে শরৎচন্দ্রের স্থান যে কতখানি একথা তাঁরাই ভালো জানেন, যাঁরা অন্ততঃ তাঁর একখানা বইও এ পর্য্যন্ত পড়েছেন। আজ বাঙলা দেশের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের জন্মতিথিতে বাঙালী তার অন্তরের একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা দিয়ে তাঁকে উপযুক্ত অভিনন্দন করবে এইটুকুই শুধু আশা করি। (*ধূপছায়া*, ১৩৩৫ ভাদ্র)।

পরবর্তী আশ্বিন সংখ্যার 'ঘরে বাইরে'-তে উক্ত অনুষ্ঠানের রিপোর্টিং আছে এবং ১৩৩৫ কার্ত্তিকে সম্পাদক রেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় 'শরৎসাহিত্যে নারীর রূপ' রচনা লিখেছেন।

আমরা দেখেছি *কালি-কলম* এবং *ধূপছায়া* শরৎচন্দ্রের অভিভাষণের মুদ্রিত রূপও অঙ্গে ধারণ করেছে : 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' [(১৩৩২ সালে মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ), *কালি-কলম*, ১৩৩৪ ভাদ্র] ; 'অভিভাষণ' [(১৩৩৪ সালে ইডেন হিন্দু হোস্টেলের বাৎসরিক মিলনোৎসবে সভাপতির অভিভাষণ), *ধূপছায়া*, ১৩৩৪ কার্তিক]।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে *কল্লোল-কালি-কলম-ধূপছায়া*-র এত আগ্রহ কেন? কারণ শরৎরচনায় অগণিত নগণ্যের উপস্থিতি, সামাজিক দ্বন্দ্ব, বর্ণসংঘাত, কুৎসিত দলাদলি, তীব্র দারিদ্র্য, কুলীন কন্যার বুকচাপা কান্নার আওয়াজ শোনা গেছে। বলাই বাহুল্য কল্লোল যুগের লেখকদের মনের ভারে সে-সব লেখা উপযুক্ত স্পর্শ করেছিল—তাঁদের রচনার বিষয় শরৎরচনারই নিকটবর্তী। তাছাড়া *শনিবারের চিঠি*-র সঙ্গে নবীন সাহিত্যিকদের প্রবল মতভেদের কালে শরৎচন্দ্র তরুণদের ব্রিফ নিয়ে মসীযুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন যা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত বিচলিত করেছিল। স্বভাবতই কৃতজ্ঞতায় টলোমলো তরুণেরা শরৎচন্দ্রকে উচ্চ আসন দিয়েছিলেন।[৩০] শরৎচন্দ্রের রচনা বা তাঁর বিষয়ে লেখা ছেপেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি, শরৎচন্দ্রের অপমানকে এঁরা নিজস্ব অপমান ধরে নিয়েছিলেন। যথা, *প্রবাসী*-র মতো নামী পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের রচনা কখনও প্রকাশিত হয়নি। সুরমা-সাহিত্য-সম্মেলনে শরৎচন্দ্রেব 'পথেব দাবী' সম্বন্ধে আলোচনার অনুমতি *প্রবাসী*-সম্পাদক এবং সম্মেলন-সভাপতি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় দেননি (পরে অবশ্য *প্রবাসী*-তে এটি সংশোধন করেছিলেন) ; টাউন হলে

শরৎচন্দ্রের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানেও রামানন্দ অনুপস্থিত ছিলেন ইত্যাদি। সুতরাং রামানন্দের উদ্দেশ্যে অবশ্যম্ভাবী শরাঘাত নবীনদের পক্ষে বর্ষিত যার দু-একটি এইরকম :

প্রবাসী-তে শরৎচন্দ্রের লেখা কখনই ছাপা না হওয়ায় *কালি-কলম*-সম্পাদক মুরলীধর বসু বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর সঙ্গত মন্তব্য, পিয়ার্সন অনূদিত 'মহেশ'-এর মতো 'নিরীহ' 'সুবোধ' 'সুশীল' গল্পটিকে *প্রবাসী*-র দপ্তর থেকে ফেরত দেওয়া হয়েছিল। ('বিচিত্রা', *কালি-কলম,* ১৩৩৩ বৈশাখ)। কিন্তু *শনিবারের চিঠি* থেকে 'শরৎচন্দ্র' রচনাটি ১৩৩৫ পৌষের *প্রবাসী*-তে পুনর্মুদ্রিত করায় বিরূপাক্ষ শর্মার সবিস্ময় প্রতিক্রিয়া : শরৎচন্দ্র সম্পর্কে রামানন্দ কি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলেছেন? অথচ 'Give the devil his due'—এই নীতি অনুসরণে রামানন্দবাবুকে কি আজ পর্যান্ত কেউ হারাতে পেরেছে?" ('আর্টের আটচালা', *কালি-কলম,* ১৩৩৫ পৌষ)। শরৎচন্দ্রের সম্বর্ধনা সভায় রামানন্দের অনুপস্থিতি এবং *মডার্ন রিভিউ* ও *প্রবাসী পত্রিকায়* এ-প্রসঙ্গের অনুল্লেখ বিরূপাক্ষ শর্মার মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে ('আর্টের আটচালা', *কালি-কলম* ১৩৩৫ কার্তিক)।

বিরূপাক্ষ শর্মাকেও ছাপিয়ে গিয়েছিলেন *ধূপছায়া*-র শ্রীগ্রহাচার্য। সুরমা-সাহিত্য-সম্মেলনে রাজরোষে বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ 'পথের দাবী' আলোচিত হতে না দেওয়ার ত্রুটি *প্রবাসী*-পত্রিকায় ('বিবিধ প্রসঙ্গ', ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ) শুধরে নেওয়ার পর, শ্রীগ্রহাচার্যের হুলবিদ্ধ মন্তব্য : "শরৎবাবুর কোনও রচনা প্রবাসীতে স্থান পাবার যোগ্যতা না পাক, তাঁর কোনও পুস্তকের অথবা প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনাও প্রবাসীতে প্রকাশিত না হোক, এমন কি প্রবাসীর দলের কেহই তাঁর পথের দাবী বা অন্য কোনও লেখা কষ্ট করে পড়ে তাঁকে কৃতার্থ না করলেও রামানন্দবাবুরই কলম থেকে এই আলোচনা এবং ভ্রম সংশোধনের ফলে তাঁর [শরৎচন্দ্রের] নামটা অন্ততঃ বার চার পাঁচ ছাপা হয়ে গেল—[শরৎ] জন্মের সুফল বুঝতে হবে।—অন্ততঃ প্রবাসীর পাঠকেরা এটুকু জানলেন যে শরৎবাবু বলে একজন লেখক আছেন, তিনি বই লেখেন, এবং পথের দাবীটা তাঁরই লেখা।" ('ঘরে বাইরে', *ধূপছায়া,* ১৩৩৫ আষাঢ়)।

কমলে কণ্টক থাকে—তরুণদের অবিরল শরৎ-প্রশস্তির মধ্যেও তা ছিল। অন্নদাশংকর শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' রচনার যত প্রশংসাই করুন, 'শেষ প্রশ্নে'র তিনি ঘোর বিরোধী এবং 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রী সম্পর্কেও। *ধূপছায়া*-র ১৩৩৫ ভাদ্রের 'মনে মনে' আলোচনায় অন্নদাশংকর মনে করেছেন সাবিত্রীর যথেষ্ট বাস্তব ভিত্তি নেই। তাঁর অম্লরসাক্ত ভাষা : "শরৎবাবুর মেসের ঝি তাঁর নিজের স্তরের মেয়ে, দৈবক্রমে অস্থানে পড়েছে। নিজের আত্মীয়ের মন বুঝে শরৎবাবু তার মন কল্পনা করতে পারেন। তাই 'সাবিত্রী'কে এত জীবন্ত মনে হয়। অচিন্ত্যবাবুর [অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত] 'পুতুলি' কি এমন জীবন্ত?"

চার

সাহিত্যসাগরে উত্তাল তরঙ্গ : তবু বাঁচার সংগ্রাম

আলোচনার তৃতীয় এবং শেষ পর্বে আমরা প্রবেশ করেছি। এই অংশে আলোচ্য পত্রিকা চতুষ্টয়ের মধ্য দিয়ে কোন্ সাহিত্য-আদর্শ পত্রিকা-সম্পাদকেরা প্রচার করতে চেয়েছিলেন এবং সে কাজে অগ্রসর হবার পর কি পরিমাণ বিরোধিতার সম্মুখীন তাঁরা হয়েছিলেন—বাংলা

সাহিত্যের বহু খ্যাত সেই বিতর্কের উল্লেখ আমরা করব। সেই সঙ্গে এসে যাবে *কল্লোল-কালি-কলম-প্রগতি-ধূপছায়া*-র পক্ষে উক্ত বিতর্কে কিভাবে প্রাণপণে আত্মসমর্পণ করা হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের 'বৃহদারণ্য বনস্পতি' রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই বিসম্বাদ এড়িয়ে থাকতে পারেননি। যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র এবং আরও অনেকে।

এটি সত্য যে বিশ শতকের তরুণ লেখকেরা সাহিত্য চিন্তার দিক থেকে পূর্ববর্তী কালের থেকে অনেকাংশে ভিন্ন পথগামী। কারণ—বৈশ্বিক, নিছক দেশীয় নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় দেশীয় অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি, ক্রমাগত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, অসহনীয় বেকারত্ব, মধ্যবিত্ত-শ্রমিক-কৃষকের জীবন বিপর্যয় এবং ধর্মঘট ছিলই—এরই পাশে দেশ জুড়ে রাজনৈতিক ওঠাপড়া এক অভূতপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই দমচাপা আবহাওয়ার মধ্যে বড় হয়ে ওঠা নবীন সাহিত্যিকরা স্বস্তিতে ছিলেন না। একদিকে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল, অন্যদিকে পারিপার্শ্বিক ভাঙনধরা জীবনের চোরাস্রোত তাঁরা দেখেছেন। এই অভিজ্ঞতার পাশে ফ্রয়েড, ইয়ুং, হ্যাভলক এলিসের রচনায় মানুষের অবদমিত যৌন বাসনার পরিচয় এঁদের উদ্দীপ্ত করে লেখক-মনকে ভিন্ন ভাবে নির্মাণ করেছিল। ফলে চলিত সাহিত্যধারা থেকে সরে গিয়ে সেই সাহিত্য তাঁরা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন যার মধ্যে মূলত অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং মানসিক অস্থিরতা প্রধান। সেই সঙ্গে এঁরা প্লেটোনিক প্রেমের আদর্শকে সরিয়ে দিয়ে শরীরী প্রেমকে বড়ো করে তুলতে চাইলেন। স্বভাবতই শরীরী প্রেম সমাজসিদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর প্রেমে বদ্ধ রইল না, বিবাহিতের পক্ষে নিষিদ্ধ প্রেম, বিধবার প্রেমে পৌঁছে গেল। সে প্রেমের ছবি আঁকার সময় কামজ শব্দ নির্বাচন সেকালের পক্ষে বিপর্যয়কারী ঘটনা। এই পর্বের কোনো কোনো লেখক এমিল জোলার ন্যাচারালিজমে প্রভাবিত ছিলেন না এমন নয়। তাছাড়া নতুন বিষয় সন্ধানে এঁরা উন্মুখ ছিলেন বলে কয়লাখনি, পাটকল, ছাপাখানা, চালকল, বস্তিজীবন, গণিকালয় সহজে এঁদের কলমে ধরা দিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে আসরে আবির্ভূত হলেন *শনিবারের চিঠি*-র সুবিখ্যাত সম্পাদক সজনীকান্ত দাস। *কল্লোল-কালি-কলম-প্রগতি-ধূপছায়া*-র বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা করলেন। শনিবারের চিঠি-র 'সংবাদ সাহিত্য' এবং 'মণিমুক্তা' বিভাগে উক্ত পত্রিকার লেখকদের রচনাংশ উদ্ধার করে সটীক প্রকাশ শুরু হল যা লেখকদের গায়ে জ্বালা ধরানোর পক্ষে যথেষ্ট।

'সংবাদ সাহিত্য' বিভাগে প্রকাশিত এইসব রচনার জাতিচরিত্র নির্ণয় করে জগদীশ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন : ''সংবাদ সাহিত্য'-এর রচয়িতা যেন আরেক সজনীকান্ত। নির্মমতম নিন্দায় অপরাধীকে কলংকিত করাতেই তাঁর হিংস্র উল্লাস।"[৩১]

ব্যঙ্গগদ্য ছাড়া প্যারডি রচনাতেও সজনীকান্তের দক্ষতা যথেষ্ট। নজরুল ইসলামের সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতাকে ব্যঙ্গ করে তিনি 'কামস্কাট্‌কীয় ছন্দ' লিখেছিলেন। সেসব ইতিহাস হয়ে আছে।

সজনীকান্ত কিন্তু একক সংগ্রামে বেশিদিন আগ্রহী ছিলেন না। যুক্ত করতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রকেও। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর চিঠি, রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর এবং সামতাবেড়ে-তে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যালাপ *শনিবারের চিঠি*-র ১৩৩৪ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হল। হওয়া মাত্রই বিস্ফোরণ। সমকালীন 'আধুনিক সাহিত্য' সম্বন্ধে

রবীন্দ্রনাথের মনোভাব নেতিবাচক হওয়ায় তিনি 'সাহিত্যধর্ম' রচনায় (*বিচিত্রা*, ১৩৩৪ শ্রাবণ) খোলাখুলি নিজ মত জানালেন : "বিদেশ থেকে আমদানি করা বে-আব্রুতা বাংলা সাহিত্যের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। বিজ্ঞানের অপক্ষপাত কৌতূহল সাহিত্যিকদের শোভা পায় না, অলংকৃত বাক্য রসাত্মক বাক্য বা কাব্য।"

শরৎচন্দ্র কিন্তু সামতাবেড়-এর আলাপে সজনীকান্তর সঙ্গে সহমত পোষণ করেও সেই অবস্থান থেকে সরে এলেন। কেন, সে-বিষয় বর্তমানে আলোচ্য নয়।[৩২] এটুকু বলতে পারি অতঃপর তাঁকে আধুনিকদের পক্ষে দেখা গেল। রবীন্দ্র-সমর্থনে ব্রজদুর্লভ হাজরার প্রবন্ধ 'রস ও রুচি' (*প্রবাসী*, ১৩৩৪ আশ্বিন) প্রকাশিত হওয়ার পর নিজেকে আধুনিক সাহিত্যের কুলপতি ধরে নিয়ে শরৎচন্দ্র একই সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ও ব্রজদুর্লভকে নিদারুণ ব্যঙ্গ করে পত্রপ্রবন্ধ 'রসসেবায়েৎ' (*আত্মশক্তি*, ১৩৩৪ আশ্বিন) লিখে ফেলেছেন। তার একদিকে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের 'ঠাসবুনানি বিশ পৃষ্ঠাব্যাপী' রচনা সম্পর্কে বিদ্রূপ-বিশেষণের পরম্পরা, অন্যদিকে আধুনিক সাহিত্যের বিপক্ষ এবং প্রাক্তন 'ডেপুটি' ব্রজদুর্লভ সম্বন্ধে তীব্র বিতৃষ্ণার উদ্‌গার। *আত্মশক্তি*-র ১৩৩৪ কার্তিকে ব্রজদুর্লভ এবং শরৎচন্দ্রের পরস্পর আক্রমণাত্মক আরও দুটি রচনা বেরিয়েছিল।

উল্লেখযোগ্য এই, এই বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আত্মপক্ষে কলম ধরে 'সাহিত্যধর্মে'র পরিপূরক প্রবন্ধ 'সাহিত্যে নবত্ব' (*প্রবাসী*, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ) এবং 'সাহিত্যবিচার' (*প্রবাসী*, ১৩৩৬ কার্তিক) রচনা ছাড়াও দিলীপকুমার রায়কে পত্রে লিখেছেন : 'সাহিত্যধর্ম' এবং 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ দুটি বেশ 'আলোড়ন জাগিয়েছে'। এটাও ঠিক 'সাহিত্যলোকে চাঞ্চল্যটার খুব প্রয়োজন আছে। সিদ্ধান্তে পৌঁছনটাই খুব বেশী দরকারী নয়—দেখতেই পাচ্ছি, এক যুগের সিদ্ধান্ত আর এক যুগে উলট-পালট হয়ে যায়, কেবল মনের মধ্যে নিয়তচিন্তার চাঞ্চল্যটাই থাকে।'[৩৩]

আধুনিক সাহিত্যকেন্দ্রিক এই বিতর্কে বিশেষ ভূমিকা মোহিতলাল মজুমদারের। তিনি নিজে *কল্লোল-কালি-কলম* পত্রিকার লেখক। অথচ এই শিবির ত্যাগ করে *শনিবারের চিঠি*-তে নতুন ঘর বেঁধেছিলেন। কারণ—আধুনিক সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণায় বদল ঘটেছিল। ১৩৩৩-এর প্রথম থেকে সজনীকান্তের ভাষায় কল্লোল 'যৌন-কল্লোল' হওয়ার সাধনায় মেতে উঠলে মোহিতলালের জীবনদৃষ্টিতে পরিবর্তন দেখা গেল। সমালোচকের মতে, 'যে বলিষ্ঠ ভোগবাদ বা জীবনবাদ মোহিতলালের লেখনীতে একটি সংযম-শুভ্র শুচিতর বেষ্টনে সুন্দর হয়ে উঠেছিল—অক্ষমের হাতে তাই কদর্য যৌনবিকারে পরিণত হচ্ছে, এইরূপ একটি ধারণা তাঁকে পেয়ে বসল।'[৩৪] এবং মোহিতলাল একরোখা স্বভাবের মানুষ—একক শক্তিতে প্রতিবাদের জন্য তিনি কলম ধরলেন যা আলোচ্য কাল পেরিয়ে বহুদিন পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। যেমন, 'সাহিত্যের আদর্শ' (১৩৩৪ আশ্বিন), 'সাহিত্যে সত্যবাদ ও রবীন্দ্র-বিদ্রোহ' (১৩৩৪ ফাল্গুন), 'সমাজ ও সাহিত্য' (১৩৩৫ আষাঢ়), 'কাব্য ও জীবন' (১৩৩৫), 'অতি-আধুনিক প্রতিভা' (১৩৩৮ অগ্রহায়ণে), 'সাহিত্য ও যুগধর্ম' (১৩৩৮ ফাল্গুন), 'সাহিত্যে সুনীতি' (১৩৩৯ মাঘ), 'আধুনিক সাহিত্যের ভাষা' (১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ), 'সাহিত্যের শিরঃপীড়া' (১৩৪১ চৈত্র), 'অতি-আধুনিক বাংলা কবিতা' (১৩৪৩ কার্তিক), 'বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিক' (১৩৪৫), 'সাহিত্য বিচার' (১৩৪৭ আষাঢ়) ইত্যাদি। এ সমস্ত রচনায় আধুনিক

সাহিত্যের বিরুদ্ধে মোহিতলালের মূল কথা--১. তরুণ সাহিত্যিকদের রচনায় কেবলই কামনার ক্লিন্নতা ; ২. তাঁদের ঘোষিত বাস্তবতা নব সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতির উপর নির্ভরশীল ; ৩. বাংলা ভাষার প্রাণস্পন্দন এখানে অনুপস্থিত ; ৪. রসসৃষ্টির পরিবর্তে আধুনিক সাহিত্য এখন 'সমস্যা'য় আকীর্ণ, 'বিড়ি ও দেশলাই'-এর মর্যাদাযুক্ত গদ্যছন্দের কবিতার বাহুল্য।

আমাদের আলোচ্য চারটি পত্রিকা গোষ্ঠী এই পর্বে কোন্ ভূমিকা নিয়েছিলেন--নীরব দর্শকের নাকি রণোন্মত্ত যোদ্ধার? আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার সকলেরই থাকে। এঁদেরও ছিল। সুতরাং এঁরা সজনীকান্ত দাস (ইনিই প্রধান শত্রু), রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদারের বিরুদ্ধে শরসন্ধান শুরু করলেন। এবং সে শরে বিষ মাখানো ছিল। কিছু উদাহরণ আমরা উপস্থিত করব।

কখনও পৃথক রচনায়, কখনও 'আর্টের আটচালা' বিভাগে *কালি-কলম* নিজের রোষ মোচন করেছে। আর পৃথক রচনা ছাড়াও 'ঘরে বাইরে' এবং 'সওদা' অংশে সেই কাজ করেছে *ধূপছায়া* পত্রিকা। প্রমথ চৌধুরীর লেখা মুদ্রিত করে কৌশলের সঙ্গে নিজ মতবাদ প্রকাশের চেষ্টা *ধূপছায়া*-য় আমরা দেখেছি। *ধূপছায়া*-র ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠে প্রমথ চৌধুরীর 'সাহিত্যে আধুনিকতা' প্রকাশের কারণ সম্পাদক-কৃত নোট থেকে বোঝা যায়। রামমোহন লাইব্রেরিতে 'সাহিত্যে আধুনিকতা' নামক আলোচনা সভায় শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা অতি দীর্ঘ প্রবন্ধে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য 'কতকগুলি প্রাদেশিক শব্দের সংযোগে অসুন্দর ভাষার দৌরাত্ম্য মাত্র,--এবং এই সাহিত্যের বিষয়বস্তু অশ্লীল তো বটেই, সমাজের পক্ষেও নাকি অকল্যাণকর।' ঐদিনের সভাপতি প্রমথ চৌধুরীর লিখিত বক্তব্যে শৈলেন্দ্রকৃষ্ণের প্রতিবাদ এবং ভারসাম্য থাকায় সেটি *ধূপছায়া*-য় মুদ্রিত হয়েছে।

আধুনিক সাহিত্য সত্যই এত মন্দ? প্রবীণ সাহিত্যসেবী বিপিনবিহারী গুপ্তের 'অর্ব্বাচীন' রচনায় (*মানসী ও মর্ম্মবাণী*, ১৩৩৪ ফাল্গুন, পরে *প্রবাসী*-র কষ্টিপাথর-এ উদ্ধৃত) তার স্পষ্ট ইঙ্গিত শরৎচন্দ্র বিশ্বাসকে ক্ষুব্ধ করেছিল। সুতরাং *ধূপছায়া*-র ১৩৩৫ বৈশাখের 'অর্ব্বাচীন?' রচনায় তিনি শালীন ভাষায় কঠিন স্বরে বললেন : 'বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করিতে বসিয়া গুপ্ত মহাশয় তরুণ সাহিত্যসেবী ও সেবিকাদের লক্ষ্য করিয়া যে অশিষ্ট বিশেষণটি প্রয়োগ করিয়াছেন, নিরপেক্ষ সমালোচকের সূক্ষ্মদৃষ্টি লইয়া মনোযোগ সহকারে তাঁহার ঐ প্রবন্ধটি আগাগোড়া পাঠ করিয়া বিচারে বসিলে তাঁহাকেও কি ঐ বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না? ...দু একজনের অক্ষমতার নিদর্শন লইয়া সমস্ত তরুণ সাহিত্যিকদের বিচারে বসিলে মুড়ি মিছরির একদর করা হয়।'

আমরা আগেই বলেছি *শনিবারের চিঠি*র সজনীকান্ত দাস পত্রিকা চারটির বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন। *কালি-কলম*-এর ১৩৩৫ ফাল্গুনে 'শনিবারের চিঠি' রচনায় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কড়া মন্তব্য করে বলেছেন পত্রিকাটি 'ফেউ-জাতীয়'। পরের ছিদ্রানুসন্ধান এর পেশা।' এটি 'মুখোস-পরা ভাঁড়', এর জন্ম *প্রবাসী*-র 'আস্তাকুঁড়ে'; 'গালাগালি বিক্রি ক'রে টাকা রোজগার করা' এর উদ্দেশ্য ইত্যাদি। এই সংখ্যার 'আর্টের আটচালা'য় বিরূপাক্ষ শর্মা *শনিবারের চিঠি*-কে যথেচ্ছ খোঁচা দিয়েছেন। একই কাজ তিনি

করেছেন ১৩৩৫ শ্রাবণে। ১৩৩৪ চৈত্রে 'জুনিয়র জলধর' ছদ্মনামে জগদীশ গুপ্তর 'ভৈরব মুখুজ্জিয়া' রচনাটি একই জাতীয়। ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠে অন্নদাশঙ্কর রায় 'মনে মনে' আলোচনায় *শনিবারের চিঠি*-কেন্দ্রিক সাহিত্যবিতর্ক উত্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ ও অমল হোমকে হূলবিদ্ধ করেছেন।

কালি-কলম-এর সুরেন্দ্রনাথ, সজনীকান্ত সম্পর্কে যে-ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন, সমতুল ভাষা ব্যবহার ধূপছায়া-র 'সওদা'-তেও। সজনীকান্তকে 'সওদা-র লেখক কেবল 'গড়ের মাঠের কবি' কিংবা 'প্রবাসী-কর্ম্মচারী' বলেননি, লিখেছেন 'এসাইলাম লেনের সজনীকান্ত দাস,—তারাই সস্তায় কিস্তি মেরে নাম করবার লোভে বাংলা সাহিত্যের "আগাছা" নির্ম্মূল করবার জন্য কোমর বেঁধেছেন।' (১৩৩৪ আশ্বিন)। সজনীকান্তের দলভুক্ত অন্য লেখকদের রচনাংশ উদ্ধার করে ইনি দেখিয়েছেন, আধুনিক যৌনতাপ্রচারী সাহিত্যিকদের রচনার তুলনায় সেসব কম অশ্লীল নয়। ১৩৩৪ কার্ত্তিকের 'সওদা'য় সজনীকান্তের নাম না করে পুনর্বার আক্রমণ : 'ছিল ব্যাঙ, পেট ফুলে হতে চায় কচ্ছপ। বাংলা সাহিত্য আধুনিক লেখকদের লেখার মোহে পড়ে নষ্ট হতে বসেছে—এই ওঁর ধারণা। ওঁর ধারণা তো আরো অনেক কিছু, —ধান গাছে তক্তা গজায়! ওঁর ধারণাতেই যেন সমস্ত কিছু চলছে,--যেন উনিই রবীন্দ্রনাথকে ধারণ করে আছেন। বাহন যেন।' 'ঘরে বাইরে'র মধ্যে (১৩৩৫ আশ্বিন) তীব্র ভাষায় পাঠক সমাজকে সতর্ক করে বলা হয়েছে : 'পাঠক সমাজ সাবধান হবেন--এই সমস্ত আধুনিক কুরুচিমূলক পত্রিকার প্রচারে প্রশ্রয় না দেন--তাহলে বাংলা সাহিত্য ও সমাজ ছারেখারে যাবে। ...ঈর্ষায় কতদূর অন্ধ হলে যে মানুষ এত বড় হীনতার আশ্রয় নিতে পারে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হ'ল 'শনিবারের চিঠি' নামক 'প্রবাসী'র আস্তাকুঁড়ে বর্দ্ধিত একখানি কদর্য্য মাসিক আর তার পরিচালকগণ!'

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আধুনিক লেখকদের শ্রদ্ধাচ্যুতি ঘটেছিল তাঁর 'সাহিত্যধর্ম' পড়ে। এঁদের ধারণা ছিল রবীন্দ্রনাথ এঁদের লেখার সমর্থক। কিন্তু 'সাহিত্যধর্ম' রচনায় রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যকে কেবল 'ল্যাঙট-পরা গুলি-পাকানো আধুনিক' বলেননি (এই একটি লাইন আধুনিক সাহিত্য মহলে ঝড় তুলেছিল), বলেছেন 'ধার-করা নকল নির্লজ্জতা' এই সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। এবং 'ভারতসাগরের এ পারে যখন প্রশ্ন করি [তোমাদের সাহিত্যে এত হট্টগোল কেন?] তখন জবাব পাই, 'হাট ত্রিসীমানায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ঐটেই বাহাদুরি।' বলা বাহুল্য ক্ষিপ্ত আধুনিকের দল খোলা মুখে রবীন্দ্রনাথকে গালিগালাজ করেছিলেন যার কিছু কিছু *ধূপছায়া*-য় পেয়েছি। ১৩৩৪ আশ্বিনের 'সওদা'য় আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে রবীন্দ্র-মন্তব্যকে ('ল্যাঙট-পরা গুলি-পাকানো') বিদ্রূপ করে বলা হয়েছে 'কী উচ্চাঙ্গের উপমা!' ১৩৩৪ পৌষের 'সওদা'য় পুনশ্চ ব্যঙ্গ--প্লানসিউস জাহাজে বসে দেশের তরুণ সাহিত্যিকদের রচনায় চিত্তবিকারের সংবাদ 'পরম্পরা'য় রবীন্দ্রনাথ কিভাবে পেলেন? কিন্তু সর্বাধিক বিদ্রূপ করেছিলেন প্রতুল লাহিড়ী। তাঁর লেখা পড়লে কার্যত শিউরে উঠতে হয়। সে রচনার ভাষা কটু এবং হলাহল মিশ্রিত :

'রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যিক স্বল্পায়ুদের বিরুদ্ধে অসিচালনা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই আক্রমণ মোটেই বীরোচিত নহে। তিনি...শনিবারের চিঠি নামক একখানি ইতর ও

কুৎসিত পত্রিকাকে সম্মুখে শিখণ্ডিরূপে স্থাপন করিয়া বাণনিক্ষেপ করিতেছেন। সাহিত্যিক স্বল্পায়ুদের প্রতি তাঁহার স্নেহ প্রসিদ্ধ ছিল। অকস্মাৎ তিনি তাঁহার অটল ও অভ্রভেদী সিংহাসন ছাড়িয়া 'প্রবাসী'র আস্তাকুঁড়ে নামিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া যুগপৎ দুঃখ ও করুণার উদ্রেক হয়। ...যে সাহিত্যের আয়ু মোটে দুই কি তিন বৎসর, সেই তরুণ-সাহিত্যের অক্ষমতার উপরই তাঁহারই আক্রোশ?...পরের চরিত্র সমালোচনার ভার ও অধিকার রবীন্দ্রনাথকে কে দিল? তিনি কি সমস্ত সাহিত্যিককুলের নৈতিক অভিভাবক?... শনিবারের চিঠির রবীন্দ্রনাথ, বলাকা ও পূরবীর রবীন্দ্রনাথ এক ব্যক্তি নহেন।... শনিবারের চিঠির রবীন্দ্রনাথ পঙ্কিল ধূলায় লাঞ্ছিত,—শনিবারের চিঠির রবীন্দ্রনাথকে আমরা চাই না।' ("'শনিবারের চিঠির' রবীন্দ্রনাথ", প্রতুল লাহিড়ী, *ধূপছায়া,* ১৩৩৪ চৈত্র)।

প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় খর আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিলেন। তার বড় কারণ *শনিবারের চিঠি* ছাপা হয় *প্রবাসী*-র প্রেসে। তাছাড়া আধুনিক সাহিত্যকে তিনি সমর্থন করতেও পারেননি। আমরা দেখব *প্রবাসী* ও রামানন্দর বিরুদ্ধে আক্রমণের তার কিভাবে একটু একটু করে চড়েছে। *কালি-কলম*-এর 'বিচিত্রা' বিভাগে (১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ) মুরলীধর বসু *প্রবাসী* পত্রিকার বিস্তৃত মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিচিত্র বিকাশ এবং চিত্রকলার অপরূপ সৃষ্টির প্রকাশে *প্রবাসী*-র সদর্থক ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। এও জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের বিপুল রচনা বক্ষে ধারণের সৌভাগ্য *প্রবাসী*-র হয়েছে। কিন্তু-- 'প্রবাসী-পরিচালনায় জীর্ণতা ও সঙ্কীর্ণতার দুঃসহ প্রাদুর্ভাব মনকে পীড়া দেয়।' প্রবাসী-র প্রতি তরুণ সাহিত্যিকদের পূর্বের শ্রদ্ধা-অনুরাগ আর নেই। 'নিতান্ত বাহিরের প্রয়োজনেই প্রবাসীর সিংহ-দ্বারে তাঁহাদের গিয়া দাঁড়াইতে হয়।' এক বছর পরে ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠের 'মাসিক-সাহিত্য' বিভাগেও *প্রবাসী*-র নিন্দা যথেষ্ট।

চাঁচাছোলা ভাষায় কথা বলার অভ্যাস ছিল *ধূপছায়া* কর্তৃপক্ষের। ১৩৩৪ আশ্বিনের 'সওদা'য় সরাসরি *প্রবাসী*-সম্পাদককে প্রশ্ন : 'বহুদিন পূর্ব্বে প্রবাসীতে এক 'শ্রদ্ধাভাজন' কবিকে ব্যঙ্গ করে 'আমি ও তুমি' নামে একটা নোংরা রচনা বেরিয়েছিল। সে কবি পুঙ্গবটি কে? লেখকই বা কোন ধুরন্ধর? 'বিস্মরণী'র প্রকাশক কে? 'নারীস্তোত্র', 'পান্থ' প্রভৃতি কবিতায় ত' 'শ্লীলতা'র পরাকাষ্ঠা,--তবু প্রবাসীতে তা ছাপতে দেওয়া হল না কেন?' ১৩৩৪ চৈত্রের 'সওদা'র কিছু অংশ এইরকম : 'প্রবাসীর পাশ দিয়ে যে নোংরা নর্দ্দমাটা বয়ে' চলেছে,--তাতে রবীন্দ্রনাথের পিছে রামানন্দবাবুও নেমে এসেছেন। হালে তাঁর এই বীভৎসতা দেখে স্তম্ভিত হতে' হয়। উনি হয়ত চোখ বুজে' *উপাসনা করতে করতে* ঐ লেখাটা লিখেছেন। পবে হয়তো বলবেন—আমার নর্দ্দমায় কি ভেসে আসে, তা কি জানি? ঘুমুতে ঘুমুতে একদিন গড়িয়ে পড়েছিলাম বই ত' নয়?' ব্রাহ্ম রামানন্দর ধর্ম নিয়ে পর্যন্ত টানাটানি করা হয়েছে এখানে। কিন্তু ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠের 'সওদা'য় রামানন্দ সম্পর্কে প্রযুক্ত ভাষা যথার্থই কুৎসিত : *প্রবাসী*-সম্পাদক 'ভণ্ড'। কারণ অশ্লীলতাকে তিনি সমর্থন করেন না বললেও 'যে কাগজে 'শিশ্ন' ও 'সীৎকার' ছাপা হয় সেই কাগজকে অবলম্বন করে' তিনি লাটসাহেবকে হুম্‌কি শোনান। ভণ্ডামির এর চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়েনি।'

আধুনিকদের ত্যাগ করে *শনিবারের চিঠি*-র সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণে মোহিতলাল

মজুমদার সম্পর্কে *কালি-কলম* কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন, তা ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি। এইসঙ্গে যোগ করব *ধূপছায়া*-র ১৩৩৪ আশ্বিনের 'সওদা'-র একটি পংক্তি যেখানে বলা হয়েছে 'সজনীকান্তের শিরোমণি মোহিতলালের কবিতা'ও আধুনিকদের তুলনায় কম কিছু অশ্লীল নয়। বলা বাহুল্য মোহিতলাল এখানেই রেহাই পাননি। মোহিতলালের কাব্যে অকৃত্রিম পৌরুষ আছে, রবীন্দ্রনাথের এই প্রশংসামূলক বাক্যকে তাঁরই দিকে ফিরিয়ে দিয়ে দুঃশীলকুমার দে ছদ্মনামে জনৈক লেখক "মোহিতলালের কাব্যে 'অকৃত্রিম পৌরুষ' " এই ব্যঙ্গধর্মী রচনা লিখলেন (১৩৩৪ মাঘ)। সেখানে মোহিতলালের রচনা থেকে সাতাশটি যৌনভাবাশ্রিত পংক্তি উদ্ধার করে বলা হয়েছে, 'কবিরাজগণ তাঁহাদের পুরুষত্ববর্দ্ধক ঔষধের বিজ্ঞাপন হিসাবে এই সব দৃষ্টান্তের সাহায্য নিলে হয়ত' উপকৃত হইবেন।'

কল্লোল-কালি-কলম-প্রগতি-ধূপছায়া গোষ্ঠীর সঙ্গে *শনিবারের চিঠি* গোষ্ঠীর এই সাহিত্যিক বিরোধ মেটানোর জন্য জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক বৈঠক ডেকেছিলেন—তাতে সত্যই কিছু ফল হয়েছিল কিনা বলা মুশকিল। আমরা এটুকু যোগ করব অশ্লীল রচনা প্রকাশের দায়ে তরুণ সাহিত্যসেবীরা একাধিকবার আইনের হাতে ধরা পড়েছিলেন, যদিচ শেষরক্ষা হয়েও ছিল। প্রথম ঘটনাটি ১৩৩৪-এর *কালি-কলম*-এ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিত্রবহা' এবং নিরুপম গুপ্তের 'শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে' প্রকাশের জন্য। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত *কল্লোল যুগ* গ্রন্থে পুরো ইতিহাস বিবৃত করে জানিয়েছেন, শেষাবধি ম্যাজিস্ট্রেট 'আসামীদের benefit of doubt দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন।'[৩৫]

দ্বিতীয় ঘটনার নায়ক বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে' উপন্যাস রচনার জন্য। '১৯৩২-৩৩-এর শীতঋতুতে কলকাতার সাহিত্যমঞ্চে একটি প্রহসন অনুষ্ঠিত হ'লো'—বুদ্ধদেব লিখেছেন। তিনি অবশ্য দিলীপকুমার রায়ের মধ্যস্থতায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবীর সাহায্যে ইংরেজ নগরপালের সম্মুখে মুচলেকায় সই করেছিলেন--'আগামী পাঁচ অথবা দশ বছরের মধ্যে এ-বই আর প্রকাশ করবো না, আর তার পরেও প্রকাশ করতে পারবো শুধু পুলিশের অগ্রিম অনুমতি নিয়ে, অখণ্ড অথবা 'পরিষ্কৃত' অবস্থায়।'[৩৬]

একটা কথা প্রাসঙ্গিকভাবে বলে নিতে হয়, আধুনিকদের পক্ষ সমর্থনে যাঁরা লড়াই করেছিলেন তাঁদের কেউ কেউ, যথা শরৎচন্দ্র, পরে সে বিষয়ে হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন। উচ্চ সাহিত্যের যেসব লক্ষণ আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে আছে বলে এক সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল, অনতিবিলম্বে তার শোচনীয় বিচ্যুতি দেখলেন। তাঁর ৫৪তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রেসিডেন্সি কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতি প্রদত্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নতভাবে শরৎচন্দ্র স্বীকার করলেন, আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বলা 'কঠোর কথাটাই' সত্য। সেদিন তাকে অসত্য মনে হলেও 'এক বৎসর পরে এ আর আমি বলতে পারি নে।' (*মাসিক বসুমতী,* ১৩৩৬ ফাল্গুন)। ঐ বছরই *বেণু* পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়কে তিনি একই কথা উচ্চারণ করেছেন যা আধুনিক সাহিত্যিকদের অবলম্বিত পন্থার বিরোধী : 'তোমরা যে নর-নারীর যৌন-সমস্যাকেই সকল বেদনার পুরোভাগে স্থাপন করোনি, এইটিই আমার সবচেয়ে আনন্দের হেতু।'[৩৭] আধুনিকদের প্রতি শরৎচন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন আরও একটি কারণে—কালিদাস রায়কে তাঁর লেখা চিঠি থেকে দেখা যায়। প্রায়

হাহাকার করে তিনি বলেছেন : 'তরুণ দলের মধ্যে আজকাল একি হতে চলল? নিন্দে করার একি উদ্দাম উৎসাহ, গ্লানি প্রচারের একি নির্দয় অধ্যবসায়! কেবলি একজন আর একজনকে চোর প্রতিপন্ন করতে চায়।...ক্ষমা নেই, ধৈর্য নেই, বেদনা-বোধ নেই, হানাহানির নিষ্ঠুরতার যেন শেষ হতেই চায় না। কোথায় কার সঙ্গে কার কতটুকু মিলেচে, কার লেখা থেকে কে কতখানি নকল করেচে, রুক্ষ কটু কণ্ঠে এই খবরটা বিশ্বের দরবারে ঘোষণা ক'রে এরা যে কি সান্ত্বনা অনুভব ক'রে, আমি ভেবেই পাইনে। ঘরে বাইরে কেবলি জানাতে চায় যে বাঙলাদেশের সাহিত্যিকদের বিদেশের চুরি করা ছাড়া আর কোনো সম্বলই নেই।'[৩৮] আমাদের অনুমান, এই ঘটনার পশ্চাৎবর্তী ইতিহাস আধুনিকদের অন্যতম বুদ্ধদেব বসুর কলমে আমরা পেয়েছি। সুশীলকুমার দে-র মতো নামি অধ্যাপক এবং প্রাবন্ধিক রচিত প্রেমের কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর মোহিতলাল মজুমদার *প্রবাসী*-র তিন পৃষ্ঠা করে তার 'সফেন সুখ্যাতি' করেছিলেন। সনেটগুচ্ছটি পড়ে বুদ্ধদেবের মনে পড়েছিল 'সুশীলকুমারের প্রতিটি বা প্রায় প্রতিটি কবিতার মূল লেখক দান্তে গেব্রিয়েল রসেটি বা শ্রীমতী ব্রাউনিং ; তিনি শুধু অনুবাদ বা ভাবানুবাদ করেছেন--ছত্রেছত্রে মিলে যাচ্ছে। অথচ সারা বইয়ের মধ্যে পরোক্ষেও কোনো স্বীকৃতি নেই, মূল কবি দু-জনের নামগন্ধ নেই কোথাও। ...তখন কলকাতা থেকে সদ্য বেরিয়েছে *মহাকাল* নামে একটি ছোটো পত্রিকা, 'কল্লোল'-বৈরীদের প্রত্যাঘাত করার উদ্দেশ্য নিয়ে ; তার পরের সংখ্যায় বেরোলো ডক্টর দে-র কাব্যগ্রন্থ বিষয়ে একটি ছন্দোবদ্ধ ব্যঙ্গরচনা ; এবং একটি গদ্য প্রবন্ধ যাতে ইংরেজী আর বাংলা লাইনগুলি পাশাপাশি উদ্ধৃত আছে। লেখকেরা ছিলেন নামহীন. কিন্তু সাহিত্যিক মহলে সকলেই বুঝেছিলেন প্রবন্ধটি আমার লেখা আর পদ্যটি অচিন্ত্যর। ...প্রতিবাদে টুঁ শব্দটি কেউ করেন নি।'[৩৯]

পাঁচ

মেলেনি উত্তর

মূল ব্যাপারটি তাহলে কি দাঁড়াল? *কল্লোল-কালি-কলম-প্রগতি-ধূপছায়া*--এঁরা যে সত্যই বাংলা সাহিত্যে নবযুগ আনতে পারেননি, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আলাপচারিতায় কার্যত তিনি ক্রোধে ফেটে পড়েছিলেন : 'মানুষের দারিদ্র্যে সত্যি যদি তোমাদের মন টল্‌তো, তাহলে তোমরা তা নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কবিতা লিখতে না, ত্রৈমাসিক বার্ষিকী বের করতে না, কোমর বেঁধে লেগে যেতে কাজে।...শিল্পের ক্ষেত্র আর কর্মের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। ...কাব্যকে বিকৃত করে কি লাভ? তাতে তো কোনো মানুষের উপকার হবে না, কারো পেট ভরবে না, অথচ সাহিত্যের ও নিজেদের ক্ষতি করবে।' ('সাহিত্য, গান, ছবি', *প্রবাসী*, ১৩৪৮ আষাঢ়)। ঐ সচ্ছল মানুষগুলি যখন ভরাপেটে অন্যের ক্ষুধার কান্নাকে কবিতা-গল্প-উপন্যাসের বিষয় করেন, তখন সে কাজ করার নৈতিক অধিকার আছে কিনা সে সম্বন্ধে সচেতন থাকেন কি? এই নির্মম নিন্দার পরে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে কবি জানতে চেয়েছেন, 'নবযুগের কোনো সাহিত্যনায়ক যদি এসে থাকেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করব সাহিত্যে তিনি কোন্ নবরূপের অবতারণা করেছেন।' 'যুগান্তর' শব্দটি 'শ্লেষ'-বস্তু করে

কবি বলেছেন—বস্তুপ্রধান হওয়াই যদি এযুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে বলতেই হবে এটা 'সাহিত্যের পক্ষে যুগান্ত', যুগান্তর নয়। ইঙ্গিতে শৈলজানন্দের 'কয়লাকুটির কাহিনী'র কথা এনে বললেন, 'কয়লার খনি বা পানওয়ালীদের কথা' সাহিত্যে লেখা হলেই সেটা যুগান্তরের লক্ষণ বলে চিহ্নিত হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ যাই বলুন, কল্লোলযুগ অতিক্রান্ত হবার বহুদিন পরে সে যুগের সাহিত্যিকদের অন্যতম অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বিহ্বলভাবে তাঁর আত্মস্মৃতির মধ্যে উচ্চারণ করেছেন :

> যে যৌবন-দীপ্তিতে বাংলা সাহিত্য একদিন আলোকিত হয়েছিল তার লয়-ক্ষয়-ব্যয় নেই—সত্যের মতো তা সর্বাবস্থায়ই সত্য থাকবে।[৪০]

একই রোম্যান্টিক উচ্চারণ একালের সাহিত্য সমালোচকেরও :

> দুঃস্বপ্নেই হোক, বা সুখস্বপ্নে—যে-যুগকে ভোলা অসম্ভব। নতুন নতুন কালের বিস্মরণের ঝড় যতই উঠুক, ওই কল্লোলিত কাল অবিস্মৃত রয়েই যাবে।[৪১]

কল্লোলের কাল কেটে যাবার পর পঞ্চাশ বছরের বেশি অতিক্রান্ত। এখন স্থির দৃষ্টিতে বিচার করা প্রয়োজন—সত্যই কি কোনো সাহিত্যবিদ্রোহ সাহিত্য আন্দোলন হয়েছিল? যদি হয়ে থাকে, তবে তা পরবর্তী কালকে কি পরিমাণে প্রভাবিত করেছে? আমরা জানি জনগণের মধ্যে ব্যাপ্ত না হলে কোনো বিদ্রোহ যথার্থ আকার নিতে পারে না। আমাদের আলোচ্য পত্রিকা চতুষ্টয়ের দিকে তাকালে বোঝা যাবে অন্তত সাহিত্যিক বিদ্রোহ হয়নি--কেননা পাঠক-জনগণ লেখাগুলিকে হৃৎমধ্যে গ্রহণ করলে অর্থের সংকটে, গ্রাহকের অভাবে পত্রিকাগুলি অকালে বন্ধ হয়ে যেত না। তবে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই এসব পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাদি সেকালের পাঠকসমাজে কিছু আলোড়ন তুলেছিল। তার অন্যতম কারণ সজনীকান্ত দাস। তিনি তাঁর *শনিবারের চিঠি*-তে যতখানি না সত্য আদর্শ রক্ষার জন্য, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাবসায়িক কারণে রসালো অংশগুলিকে সংকলন করে পাঠকসমাজে উপস্থিত করতেন। এবং অনেক পাঠকই মূল লেখা না পড়ে *শনিবারের চিঠি*-র টিপ্পনি থেকে ধারণা তৈরি করে নিতেন।

তবু প্রশ্ন ওঠে এই যুগের লেখকরা পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁদের ওই কালের বিদ্রোহকে পরিস্ফীত আকারে উপস্থিত করেছিলেন কি? এই প্রশ্নের একটা উত্তর পেয়েছি একালীন সাহিত্য-সমালোচকের কলমে : 'আজ সাহিত্যে আধুনিকতার একটা বড়ো বাঁকের হিসেবনিকেশ করতে গিয়ে আমরা যে পরিণত বুদ্ধ বা জীবনানন্দের, প্রেমেন্দ্র বা জগদীশের সুদৃঢ়, সুনিশ্চিত পদক্ষেপের কথা বলি বারংবার, *কল্লোল কালি-কলম প্রগতি* [ধূপছায়া] সেই এবড়ো-খেবড়ো জমিটা করছিল তৈরি। কেমন করে স্পষ্ট অবয়ব নিচ্ছিল "পর্যাপ্ত তারুণ্যের পরিপূর্ণ মূর্তি" সেই ধারাবাহিকতার নানা পূর্ব সূত্রসন্ধানে অনিবার্যভাবেই তো আমাদের পৌঁছতে হয় কল্লোলের কোলাহলে এবং প্রগতির গতিতে।'[৪২]

এটা ঠিক কথাই যে, সাহিত্যিক প্রয়াস ওই যুগনিবিষ্ট সাহিত্যিকদের সাহিত্যজীবন গঠনকারী। তাঁদের প্রাপ্ত শিক্ষা প্রচণ্ড ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক রূপ ধারণ করেছে। ফলে পরবর্তীকালে সাহিত্যজগৎ থেকে অনেকেই হারিয়ে গেছেন। আর যাঁরা আপন শক্তিতে রয়ে গেছেন, তাঁদের রচনার মধ্যে দিকবদল চোখে পড়ে। 'একটা নতুন কিছু করো'-র অসারতা উপলব্ধি করে তাঁরা জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে অগ্রসর হয়েছিলেন।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীকালে ভক্ত জীবনীকার—রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দের জীবনী এবং প্রবন্ধ লিখেছেন। অচিন্ত্যকুমারের খ্যাতি 'বেদে'-র থেকে 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ'-র জন্যই বেশি। প্রথমটি কামের বন্দনা, অন্যটিতে ধর্মজীবনে কামকাঞ্চন ত্যাগ করার বার্তাদানকারী অধ্যাত্মপুরুষের বন্দনা। বুদ্ধদেব বসু শুরু করেছিলেন প্রধানত কবি হিসাবে। কবিতায় 'কঙ্কা কঙ্কা' বলে চিৎকার করে ঢুকে পড়েছেন গণিকালয়ের অভিজ্ঞতার চিত্রণে। একই সময়ে সমালোচনামূলক মননশীল গদ্য লেখার সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর লেখনীতে। সেই ধরনের বহুতর রচনার উপরে তাঁর আজকের প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রেমেন্দ্র মিত্রর মধ্যে বিদ্রোহের শক্তি ছিল। কিন্তু বিদ্রোহ অর্থে তিনি উত্তেজনা বুঝতেন না। সেজন্য ভিন্ন ধারায় লিখেও সামাজিক উত্তেজনার কারণ হননি এবং সার্থক শিল্পী হিসাবে গৃহীত হয়েছিলেন সর্বমহলে। এই প্রসঙ্গে আমরা বুদ্ধদেব বসুর একটি পংক্তি স্মরণ করব। অসার সাহিত্যবিতর্ক সম্বন্ধে জ্ঞানোদয়ের পরে তিনি লিখেছিলেন :

মাঝে-মাঝে আমার অনুভূতি হয় এ-সব বাকবিতণ্ডা নিষ্ফল, নিজের ধরণে নিজের কাজ ক'রে যাওয়ার মতো ভালো আর কিছু নেই।[৪৩]

শেষ পর্যন্ত তাহলে দাঁড়াল কল্লোল যুগকে যুগ বলা যায় না। যতদূর মনে হয় *কল্লোল* পত্রিকার সঙ্গে 'যুগ' শব্দটি যোগ করেছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর উপভোগ্য 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে। এই বইয়ে একটা বিশেষ সময়ের উঠতি তরুণ সাহিত্যিকদের বাস্তব জীবনের যন্ত্রণা, পাশ্চাত্য সাহিত্যের আলোকপ্রাপ্ত তরুণ সাহিত্যিকদের আত্মপ্রকাশের যন্ত্রণার কথা পাওয়া যায়। এই বই অচিন্ত্যকুমার যখন লেখেন তখন তাঁর মনোজীবন ও সাহিত্যজীবন বাঁক নেওয়ার মুখে। বিদ্রোহবাসনা স্তিমিত, পুরনো কালের দিকে তাকিয়ে অকারণ শ্লেষ বিদ্রূপের ইচ্ছাও পরিত্যক্ত। একমাত্র সজনীকান্ত দাসকে বাদ দিলে বাকি সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে প্রীতি ও শ্রদ্ধায় কোমল দৃষ্টিভঙ্গি।

কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যুগসৃষ্টি হয়েছিল এমন কথা অচিন্ত্যকুমারের পূর্বে আর কেউ বলেছেন কিনা জানি না। অচিন্ত্যকুমারই ওই কালের 'বিদ্রোহী' তরুণদের সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে যুগসৃষ্টির দাবি পেশ করার পরে পরবর্তী কালে অনেকেই কথাটার পুনরুচ্চারণ করেছেন সেকথা আগেই বলেছি। উলটোদিকে বলা যায় ওই কালে মহৎ রচনা করে গেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) প্রমুখ। সাহিত্যে রীতি নীতির পরীক্ষা করেছিলেন বনফুল। পেশায় চিকিৎসক ছিলেন, মন ছিল বিজ্ঞানমুখী। তাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মানবজীবনের নানা রূপাঙ্কন করেছেন। সত্যকার গ্রামীণ জনজীবন আমরা তারাশঙ্করের ছোটোগল্প এবং উপন্যাসে পাই। বিশেষ অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে লেখার জন্য তাঁকে 'আঞ্চলিক সাহিত্যিক' বলা হয়েছে। তিনি কিন্তু মোটেই আঞ্চলিক সাহিত্যিক নন। বড় মাপের ঔপন্যাসিকও। তাঁকে আঞ্চলিক বলে চিহ্নিত করলে কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁরাও তো আঞ্চলিক। তারাশঙ্কর প্রমুখ লেখকেরা যুগসৃষ্টির দাবিদার না হয়ে যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখক হতে পেরেছেন। এই যুগের মোহিতলাল ও কয়েকজন কবি সম্বন্ধে একই কথা বলা যায়।

এই সব তথ্য আমাদের সামনে আছে। তরুণদের কাব্যিক বিদ্রোহ পরবর্তীকালে মাঝে

মাঝেই ঘটেছে। দৃষ্টান্তরূপে *কৃত্তিবাস* পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। তাহলে কি বাংলা সাহিত্যে 'কৃত্তিবাস যুগ' বলতে হবে?

শেষ কথাটা এই—নদী বয়ে যায়, তাতে ছোটো বড়ো বুদবুদ ওঠে এবং নদীতে মিলিয়ে যায়। *কল্লোল* পত্রিকা-গোষ্ঠী বড়োজোর একটি বড়ো বুদবুদ। নদীর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তথ্যসূত্র

১. প্রেমেন্দ্র মিত্র, *নানা রঙে বোনা,* শতবার্ষিকী সংকলন, মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, পৃষ্ঠা ৩৭৫, অতঃপর 'নানা রঙে বোনা'।

২. ঐ, পৃষ্ঠা ৩৭৬।

৩. রবিন পাল, *কল্লোলিত কল্লোল, দেশ সাহিত্য সংখ্যা,* ১৩৯৭, পৃষ্ঠা ১০৯। অতঃপর 'রবিন পাল'।

৪. ঐ, পৃষ্ঠা ১১০।

৫. ঐ।

৬. পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, *চলমান জীবন,* ২য় পর্ব, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা-৭০০ ০১২, ১৩৭১ পৃষ্ঠা ২০৪। অতঃপর 'চলমান জীবন'। গোকুলচন্দ্র নাগকে প্রথম দর্শনের বিবরণ প্রেমেন্দ্র মিত্রর কলমে পেয়েছি : "গোকুল নাগকে তো দেখছি। এক মাথা রুক্ষ কোঁকড়া বন্য উদ্দাম গোছের চুল আর শীর্ণ কিছুটা রুগ্‌ণ শরীর নিয়ে স্থির গম্ভীর স্বল্পবাক্ মানুষ। ...গোকুল নাগের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলেও তাঁর সঠিক মূল্য সেদিন ঠিক বুঝিনি। তাঁর মধ্যে বরং একটু উন্নাসিক দূরত্বের আভাসই যেন পেয়েছিলাম।" (নানা রঙে বোনা, পৃষ্ঠা ৩৪৭)।

৭. রবিন পাল, দেশ, পৃষ্ঠা ১১১।

৮. *চলমান জীবন,* পৃষ্ঠা ২০৩।

৯. অবন বসু, তিন ঈশ্বরের কালি-কলম, অবন বসু, *দেশ সাহিত্য সংখ্যা,* ১৩৯৭, পৃষ্ঠা ১৪০। অতঃপর 'অবন বসু'।

১০. কল্লোল-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ পত্রিকার লাভ থেকে অন্যদের বঞ্চিত করতেন, এই ধারণার প্রতিবাদ অচিন্ত্যকুমারের মুখে শোনা গেছে। তাঁর বক্তব্য : " 'কল্লোলের' এমন অবস্থা নয় যে লেখকদের পয়সা দিতে পারে। শুধু শৈলজা আর নৃপেনকেই পাঁচ-দশ টাকা করে দেওয়া হত, ওদের অনটনটা কষ্টকর ছিল বলে। আর সবাই লবডঙ্কা।...একেক দিন দীনেশদা হঠাৎ গলা জড়িয়ে ধরে পাশে বসে পড়তেন। শূন্য বুক-পকেটে একটি টাকা কখন টুপ করে খসে পড়ত।" (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ,* এম সি সরকার অ্যাণ্ড সনস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩, শ্রাবণ ১৪০৫, পৃষ্ঠা ১১৯-১২০। অতঃপর 'কল্লোল যুগ'।

১১. অবন বসু, পৃষ্ঠা ১৪০।

১২. ঐ

১৩. ঐ

১৪. *কল্লোল যুগ,* পৃষ্ঠা ১৭৩। প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্মৃতিকথায় অবশ্য *কালি-কলম*-এর আড্ডার তৃপ্তিকর বর্ণনা আছে : "কল্লোল-এর মতো কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের ছাদে কালি-কলম-এর আড্ডাও তখন জমে উঠেছে। সেখানে যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে জাপান যাত্রীর কাহিনী লিখে বিখ্যাত সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন স্মরণীয় মানুষ। আসর জমাবার চুম্বক স্বরূপ এ রকম আরও বেশ কয়েকজন সেখানে সন্ধ্যায় জড়ো হন। আসেন শিল্পী চারু রায়। তখনও তিনি সেই আদিযুগের

বাংলা ফিল্মের রাজ্যে পা বাড়াননি। কালি-কলম-এর মলাটের ছবি তাঁরাই আঁকা। প্রমথ চৌধুরী মশাইও এক-আধদিন সে আসরে উপস্থিত হয়ে আমাদের বিস্মিত কৃতার্থ করে দেন। ...সম্পূর্ণ নগ্নপদ পরণের ধুতির উপর শুধু উত্তরীয় জড়ানো দেশসেবাব্রতী সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের দোতলার সে আসরে মাঝে মাঝে হাজিরা দেন না, দু-একটি লেখাও সেখানে ছাপাতে দেন।" (*নানা রঙে বোনা,* পৃষ্ঠা ৩৫৯)।

১৫. সজনীকান্ত দাস, *আত্মস্মৃতি,* নাথ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০ ০২৯, ১৩৮৪, পৃষ্ঠা ১৮৫। অতঃপর 'আত্মস্মৃতি'। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর এবং শৈলজানন্দের কালি-কলম-এর সম্পাদক পদত্যাগের এই কারণ দেখিয়েছেন : "আমার মতো প্রবাসী না হলেও শৈলজানন্দও কালি-কলম-এর সম্পাদনার ভার এমন কিছু নিয়েছে বলে জানি না।" (নানা রঙে বোনা, পৃষ্ঠা ৩৬৬)।

১৬. *নানা রঙে বোনা,* পৃষ্ঠা ৩৪৭, ৩৬৬।

১৭. বুদ্ধদেব বসু, *আমার যৌবন,* এম সি সরকার অ্যাণ্ড সনস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৩। অতঃপর 'আমার যৌবন'। এই গ্রন্থে প্রগতি পত্রিকার আর্থিক দায়িত্ব বুদ্ধদেব বসু এবং অজিতকুমার দত্তের উপর 'প্রধানত' ন্যস্ত, একথা বুদ্ধদেব লিখলেও 'পুরানা পল্টন'-এ তিনি লিখেছেন : "হিসেব ক'রে দেখা গেলো, মাসে একশো টাকা হ'লে টায়ে-টুয়ে একটি কাগজ চলে। এরকম নিজেদের ভিতর থেকে সহজেই দশজন লোক পাওয়া গেলো, যারা প্রতি মাসে দশ টাকা ক'রে চাঁদা দেবে। আমি দিতে পারবো কিনা, সেটাই ছিল সন্দেহ ; আমার বৃত্তি পাবার খবরে সে-দুর্ভাবনা ঘুচলো।" ('পুরানা পল্টন', বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, ৫ম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০৭৩, ৩০ শ্রাবণ ১৩৮৯। অতঃপর 'পুরানা পল্টন')। দুই স্মৃতির মধ্যে বিস্মৃতি বেশ।

১৮. *কল্লোল যুগ,* পৃষ্ঠা ১২৫।

১৯. ঐ, পৃষ্ঠা ১২৩।

২০. *আমার যৌবন.* পৃষ্ঠা ৭।

২১. পুরানা পল্টন।

২২. *কল্লোল যুগ,* পৃষ্ঠা ১২৫।

২৩. গৌতম ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত ও প্রগতি, *দেশ* সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৭, পৃষ্ঠা ১৫৯-১৬০ এবং কল্লোল যুগ, পৃষ্ঠা ১২৫।

২৪. প্রগতি বন্ধ হয়ে যাবার পর ভগ্নমন বুদ্ধদেব লিখেছেন : "'প্রগতি' উঠে গেলো, বন্ধুতার নিবিড় বন্ধনও যেন শিথিল হ'য়ে এলো। বাইরে থেকে দেখতে গেলে সবই সে-রকম আছে--আমার ঘরে তেমনি হাস্যমুখর সান্ধ্য আড্ডা—তবু কী-যেন নেই, কী-যেন নেই! শুধু যেন অভ্যাস-মতো ঠাট বজায় রেখে চলেছি ; প্রাণ গেছে চলে।" (পুরানা পল্টন)।

২৫. *কল্লোল যুগ,* পৃষ্ঠা ১৬৫।

২৬. বর্তমান লেখকের 'বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা' গ্রন্থের ২৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের আর্থিক অবস্থা যে এই সময়ে কত করুণ ছিল, তার চিহ্ন হিসাবে কল্লোল যুগ গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার এঁদের দুজনের দুটি চিঠি উদ্ধার করেছেন। সে দুটি পড়লে বোঝা যায় ওই কালের লেখকদের সাধারণ আর্থিক অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল। (*কল্লোল যুগ,* পৃষ্ঠা ৫২-৫৩)।

২৭. *আমার যৌবন,* পৃষ্ঠা ৭-৮, ৩৫।

২৮. *কল্লোল যুগ,* পৃষ্ঠা ১২১-১২২।

২৯. *আমার যৌবন,* পৃষ্ঠা ২৫।

৩০. শরৎচন্দ্র নিজেও তরুণ সাহিত্যিকদের সঙ্গে বিশেষত *কালি-কলম* গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন। *কালি-কলম*-এ 'সতী' গল্প দেবার জন্য পত্রিকা দপ্তরে তিনি স্বয়ং এসেছিলেন। কিন্তু ভ্রমবশত *কালি-কলম*-এর অফিস অর্থাৎ বরদা এজেন্সির ঘরে না গিয়ে তিনি ঢুকে পড়েছিলেন আর্য পাবলিশিং-এ। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে *বিচিত্রা*-র অফিসে। ফলে *কালি-কলম*-এ তাঁর 'সতী' গল্প আর ছাপাই হলো না। সেই ইতিহাস কল্লোল যুগ গ্রন্থের ১৭১-১৭২ পৃষ্ঠায় অচিন্ত্যকুমার বিবৃত করেছেন।

৩১. জগদীশ ভট্টাচার্য, শনিবারের চিঠি ও সজনীকান্ত দাস, *দেশ* সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৭, পৃষ্ঠা ১২১।

৩২. বর্তমান লেখকের 'উদ্‌ভাসিত শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের ১৬২-১৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩৩. ঐ, পৃষ্ঠা ১৬৬।

৩৪. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায় 'ঐতিহ্য, যুগ ও জীবন-প্ররোচনা' অধ্যায়, 'মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস' গ্রন্থ।

৩৫. *কল্লোল যুগ*, পৃষ্ঠা ১৫০-১৫৫।

৩৬. *আমার যৌবন*, পৃষ্ঠা ৯১-৯৪।

৩৭. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়কে শরৎচন্দ্রের চিঠি, গোপালচন্দ্র রায়, 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থভুক্ত (৩য় খণ্ড), সাহিত্যসদন, কলকাতা - ৭০০ ০১২, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ৪৫৫।

৩৮. কালিদাস রায়কে শরৎচন্দ্রের চিঠি, ঐ, পৃষ্ঠা ৪৬১।

৩৯. *আমার যৌবন*, পৃষ্ঠা ২৯-৩০।

৪০. *কল্লোল যুগ*, পৃষ্ঠা ১৮৮।

৪১. অবন বসু, পৃষ্ঠা ১৪৮।

৪২. রবিন পাল, পৃষ্ঠা ১১৪।

৪৩. *আমার যৌবন*, পৃষ্ঠা ২৫-২৬।

র মে ন কু মা র স র

নাটকের কাগজ

কত পত্রিকা যে উনিশ শতকে বেরিয়েছিল তার পুরো হিসেব এখনও করা হয়নি। এইসব পত্রিকার কোনোটি ধর্ম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছে, কোনোটি সমাজ-সংস্কারের বাসনায় উদ্বুদ্ধ; মেয়েদের জন্য পত্রিকা যেমন বেরিয়েছে, তেমনি বেরিয়েছে মুসলমানদের অভাব-অভিযোগের কথা তুলে ধরবার জন্য। গ্রাম-বাংলার মানুষের কথা বলার জন্য পত্রিকা বেরিয়েছে, পাশাপাশি বাঙালির মনকে বিজ্ঞানমুখী করে তোলার জন্য প্রকাশিত হয়েছে একের পর এক পত্রিকা। কবিতার পত্রিকাও কম বেরোয়নি। এত বিষয় নিয়ে পত্রিকা বেরোলেও, শুধু নাটক বা নাট্য আন্দোলন নিয়ে পত্রিকা প্রকাশের কথা উনিশ শতকে সেভাবে কেউ চিন্তা করেননি।

চিন্তা না করলেও, নাটক বা নাট্য বিষয়ক আলোচনাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করাও সম্ভব হয়নি। যে কারণে নাটক বা নাটক অভিনয়ের খবরাখবর পত্রপত্রিকাগুলি উৎসাহ নিয়ে ছেপেছে। উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি ১৮৫৩-এর *সংবাদ প্রভাকর* ছাত্রদের নাটক অভিনয়ের খবর প্রকাশ করে। শুধু তাই নয়, ওই বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি বেরোয় অভিনয় বিষয়ক সম্পাদকীয়। ১৮৫৪-য় *সংবাদ ভাস্কর* প্রকাশ করে নাটক রচনা করে রামনারায়ণ তর্করত্নের জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরীর কাছে ৫০ টাকা পারিতোষিক লাভের সংবাদ। ১৭৮০ শকাব্দের *বিবিধার্থ সংগ্রহ* প্রকাশ করে 'রত্নাবলী' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের সমালোচনা। ১৮৭৫-এর *সাধারণী*-তে প্রকাশিত হয় কলকাতার বাইরে বহরমপুরে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয়ের সংবাদ। ১২৮৫ বঙ্গাব্দের *বান্ধব* 'নবাব সিরাজদৌল্লা' নাটকের অভিনয়ের সংবাদ প্রকাশ করে। *বঙ্গদর্শন* কিংবা *আর্যদর্শন*-এ প্রচুর নাটকের সমালোচনা আমাদের চোখে পড়েছে। শুধু বাংলা পত্র পত্রিকাই নয়, উনিশ শতকে বেশ কয়েকটি ইংরেজি পত্রিকাও নাটকের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে।

উনিশ শতকের শেষের দিকে নাট্যপাগল একজন মানুষ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত নাট্য বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশের স্বপ্ন দেখলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষকে সম্পাদক করে তিনি প্রকাশ করেন *সৌরভ* নামে একটি পত্রিকা। *সৌরভ* অবশ্য ঠিক নাট্য পত্রিকা নয়। তবে অন্য পত্রিকার তুলনায় নাটক এখানে অনেক বেশি স্থান পেয়েছে। ১৩০২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ। পত্রিকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক এই যে, অভিনেত্রী বিনোদিনী ও তারাসুন্দরীর লেখা দুটি কবিতা এই পত্রিকায় স্থান পায়। তিনটি সংখ্যা বেরোনোর পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে আষাঢ় ১৩০৬ বঙ্গাব্দে *রঙ্গভূমি* নামে একটি পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, সম্পাদক ক্ষীরোদপ্রসাদ

বিদ্যাবিনোদ। সম্পাদক নাটকের জগতের লোক হওয়ায়, পত্রিকাটিতে নাট্যজগতের খবরাখবর যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হত। অনেকের মতে অমরেন্দ্রনাথ ১৯০১-এর ১ মার্চ *রঙ্গালয়* নামে যে নাট্য পত্রিকাটি প্রকাশ করলেন, *রঙ্গভূমি* তার ভূমিকা রচনা করেছিল। কিন্তু সে যাইহোক, *রঙ্গভূমি* আমাদের চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। *রঙ্গালয়*-ই আমাদের দেখা প্রথম নাট্য পত্রিকা। শুধু নাটকের বিষয় আলোচনার জন্য কিছুদিন ধরেই অমরেন্দ্রনাথ একটি পত্রিকার চিন্তাভাবনা করছিলেন। হাতে কিছু পয়সা আসতেই তিনি পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। প্রকাশের আগে এক বিজ্ঞাপনে বলা হয়—

> অনেকে সংবাদপত্রে রঙ্গভূমির অভিনয় সমালোচনা পাঠ করিয়া দোষ-গুণের সত্যাসত্য বিচার করেন। হয়তো কোনো সম্পাদক লিখিয়াছেন—"অমুক স্থানটি ভাল হয় নাই।"—কেন ভাল হইল না, মন্দ কোনখানটায় এবং সংশোধন করিয়া-ই বা কি রূপ হইবে,—সে সকল কথা কেই বা বলে, আর কেই-ই বা শোনে!! অথচ আমাদের এমন কোন উপায় নাই যাহার দ্বারা প্রতিবাদ চলে। সে অভাব দূর করিবার জন্য এবং বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চ সমূহ সর্ব্বসাধারণের উপকার কি অপকার সাধন করিতেছে তাহাও বিশিষ্টরূপে বোঝাইবার জন্য—আরো কি করিয়া অভিনয় করিতে হয়,—কি রূপে শিক্ষায় উচ্চ অঙ্গের অভিনেতা হওয়া যায়, বঙ্গালয়ের উন্নতি বা অবনতি ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় পর্যালোচনা করিবার উদ্দেশ্যে রঙ্গালয় নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিত রূপে ক্লাসিক থিয়েটার হইতে প্রকাশিত হইবে।

বিজ্ঞাপন থেকেই বোঝা যায় নিজেদের মতামত সকলের কাছে তুলে ধরার জন্য *রঙ্গালয়*-এর জন্ম। পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর জন্য প্রতি সংখ্যায় ক্লাসিকে অভিনীত বিখ্যাত সব নাটকের একটি করে 'নয়ন বিমোহন মন মুগ্ধকর নব নব চিত্র' ছাপানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। বলা হয় এই ছবি বাঁধিয়ে ঘরে টাঙালে 'গৃহের শোভা শতগুণ বর্ধিত হইবে', *রঙ্গালয়*-এর প্রতি গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বই উপহার দেবার পদ্ধতি চালু করলেন অমরেন্দ্রনাথ। *রঙ্গালয়* এর গ্রাহকদের জন্য অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ধার্য করা হল আড়াই টাকা।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে ১৯০১-এর ১ মার্চ *রঙ্গালয়*-এর আত্মপ্রকাশ। শিরোভাগে ধ্যানমগ্ন মহাদেব, তার তলায় বড় হরফে *রঙ্গালয়*—এব তলায় লেখা 'সাপ্তাহিক সংবাদপত্র'। প্রথম সংখ্যা থেকে পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। প্রথম দুটি এবং শেষ দুটি পাতায় শুধুই বিজ্ঞাপন। প্রথম সংখ্যায় ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত নাটক, গীতিনাট্য ও সামাজিক নকশার ছবি, মঞ্চে অভিনীত নাটকের ছবি, কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অধিবেশনের বিস্তারিত বিবরণ, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি 'নানাকথা', 'সমাজ দর্পণ', 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' প্রভৃতি বিভাগ। প্রথম সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিক ভাবে 'রামকৃষ্ণ-কথামৃত'-র প্রকাশ শুরু হয়। প্রথম সংখ্যায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের চারটি লেখা প্রকাশিত হয়। এগুলি হলো 'আত্মকথা', 'রঙ্গালয়', 'ইংরাজ রাজত্বে বাঙ্গালী' ও 'নাটকের আবেদন'। এছাড়া 'সেয়ান ঠক্‌লে বাপকে বলে না' এই নামে একটি গল্পও প্রকাশিত হয়।

প্রথম সংখ্যায় পত্রিকাটি সব দিক দিয়ে যাতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন অমরেন্দ্রনাথ। পত্রিকাটিকে সুন্দর শোভন রুচিসম্মত করে তোলার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয়নি। ভালো কাগজে ছেপে সচিত্র এই পত্রিকাটি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া হল। ফলে পত্রিকাটির প্রকাশ ব্যয় গেল অনেক বেড়ে। হিসাব করে দেখা গেল ভালো আইভরি কাগজে ছেপে তার উপর আর্ট পেপারে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবিসহ প্রকাশ

করতে খরচ পড়ে যাচ্ছে ছ' পয়সা। অথচ পত্রিকাটির দাম ধার্য করা হয় দু' পয়সা। ক্ষতির পরিমাণ কমাতে বিজ্ঞাপনের দিকে মন দেওয়া হল। লোকসান কমাবার জন্য প্রথম বর্ষের ১৭ সংখ্যায় সম্পাদক ঘোষণা করেন, এখন থেকে *রঙ্গালয়*-এর দাম বাড়িয়ে চার পয়সা করা হল। যাঁরা শুধু কাগজ নেবেন তাঁদের দু পয়সা দিলেই চলবে, যাঁরা কাগজ এবং ছবি দু-ই নেবেন, তাঁদেরই দিতে হবে চার পয়সা। এর ফলে ক্ষতি কিছুটা কমলেও, লাভ কিন্তু হল না। পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েই পত্রিকাটি চালাতে লাগলেন অমরেন্দ্রনাথ।

রঙ্গালয় সংবাদপত্র হলেও, নাট্যজগতের লোকজন এটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে থিয়েটারের খবরাখবর এখানে যথেষ্ট গুরুত্ব পেত। থিয়েটারের খবরাখবর ছাড়াও এতে আরও কী কী থাকবে বিজ্ঞাপনে তা জানিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি অমরেন্দ্রনাথ--'রঙ্গরসের কথা, সাহিত্য শিল্পের কথা, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের কথা--রাজার কথা--প্রজার কথা--আমোদ-আহ্লাদের কথা--দেশের কথা--দশের কথা--সমাজের কথা--কুটিরের কথা ইত্যাদি সকল প্রকার কথা বিশদরূপে থাকিবে।'

রঙ্গালয়-এ প্রকাশিত অধিকাংশ লেখাই হালকা চালের। রাজভক্ত পত্রিকা *রঙ্গালয়*। যে কারণে সম্রাটের জন্মদিনে তাঁর ছবি প্রকাশ করতে পত্রিকাটির কোনও কুণ্ঠা ছিল না। অমরেন্দ্রনাথ ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া প্রথম বর্ষের ৩২ সংখ্যা থেকে *রঙ্গালয়*-এ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। সেকালের আর একজন বিখ্যাত লেখক অম্বিকাচরণ গুপ্তের লেখা পত্রিকাটিতে বেরোত। মফস্‌সলের খবরাখবর ঠিকমত সংগ্রহের জন্য অমরেন্দ্রনাথ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকজন সংবাদদাতা নিযুক্ত করেন। প্রথম বর্ষ থেকে পত্রিকাটিতে ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। এই পত্রিকায় দু-একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদও প্রকাশিত হয়। যেমন ১৯০১-এ রবীন্দ্রনাথ যখন *বঙ্গদর্শন* পুনঃপ্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সহধর্মিণীর কাছে অনুমতি না নেওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে উকিলের চিঠি দেবার সিদ্ধান্ত নেন।

শুরু থেকেই *রঙ্গালয়* অন্য পত্রিকার সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদে জড়িয়ে পড়ে। *রঙ্গালয়*-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় একটি গাধার ছবি প্রকাশিত হয়। এই গাধাটি নাকি *বসুমতী*-র মালিক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লক্ষ করে আঁকা। ছবির নিচে উপেন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করে গদ্যে পদ্যে কিছু পরিহাস বাক্যও ছাপা হয়। এই ছবি প্রকাশের জন্য *বসুমতী*-র সত্ত্বাধিকারী *রঙ্গালয়*-এর মালিক অমরেন্দ্রনাথ, সম্পাদক পাঁচকড়ি ও প্রকাশক নিমাইচরণ বসুর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেন। বেশ কিছুদিন মামলা চলার পর ব্যাপারটি মিটমাট হয়ে যায়।

শুধু *বসুমতী*-র সঙ্গেই নয়, সমকালীন আর একটি পত্রিকা *নবযুগ*-এর সঙ্গেও *রঙ্গালয়*-এর সম্পর্ক হয়ে ওঠে অত্যন্ত তিক্ত। *নবযুগ*-এর সম্পাদক ছিলেন পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর ইচ্ছা ছিল অমরেন্দ্রনাথ যেন তাঁকেই *রঙ্গালয়*-এর সম্পাদক নিযুক্ত করেন, কিন্তু তাঁর অনুরোধ না রেখে অমরেন্দ্রনাথ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে *রঙ্গালয়*-এর সম্পাদক নিযুক্ত করায় পূর্ণচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। এই ক্ষোভের জন্যই পূর্ণচন্দ্র তাঁর পত্রিকায় *রঙ্গালয়* ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালিগালাজ করে নানা রকম লেখা প্রকাশ করতে থাকেন। অমরেন্দ্রনাথ ব্যাপারটি দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হন। এবং পাঁচকড়িকে দিয়ে পূর্ণচন্দ্র গুপ্তের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের

করেন। আদালতের বিচারে পূর্ণচন্দ্র দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। রায়ের বিরুদ্ধে পূর্ণচন্দ্র হাইকোর্টে আপিল করেন। হাইকোর্ট মামলাটি পুনর্বিচারের আদেশ দেন। দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলতে থাকায় পূর্ণচন্দ্র ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। শেষপর্যন্ত অমরেন্দ্রনাথের কাছে নতি স্বীকার করলে তিনি মামলা তুলে নেন। শুধু তাই নয়, পরম শত্রুর দুরবস্থায় ব্যথিত হয়ে অমরেন্দ্রনাথ তাঁকে বেশ কিছু অর্থ সাহায্যও করেন।

রঙ্গালয় পত্রিকার অনেকটা অংশ জুড়ে থাকত ক্লাসিক থিয়েটারের খবরাখবর। প্রায় প্রতি সংখ্যায় এই পত্রিকার মাধ্যমে অমরেন্দ্রনাথ নতুন নাটকের খবর পৌঁছে দিতেন পাঠকদের কাছে।

বিভিন্ন নাটকের অভিনয় দেখে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া এই পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হত। কেবল অভিনয় সংক্রান্ত চিঠিপত্র নয়, অন্য নানা ধরনের চিঠিও এই পত্রিকায় স্থান পেত। পত্রিকায় প্রকাশিত ভুল সংবাদের প্রতিবাদ করে কেউ চিঠি লিখলে তাও গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হত।

চিঠিপত্রের পাশাপাশি *রঙ্গালয়*-এ প্রকাশিত হত নানা ধরনের টুকরো খবর। 'কলিকাতা' এই শিরোনামে বিভিন্ন রকমের ছোটখাটো খবর পত্রিকাটিতে স্থান পেত। 'সর্পদংশনে মৃত্যু', 'কারাবাস', 'প্লেগ', 'চোরের দণ্ড', 'বিশ্বাসঘাতকতা', 'কুষ্ঠাশ্রম', 'শোকসভা', 'হত্যা', 'দান' ইত্যাদি নানা রকমের খবর এখানে ছাপা হত। সাহিত্য সংক্রান্ত খবরাখবর প্রকাশেও কুণ্ঠা ছিল না পত্রিকাটির। ১৯০১-এর জুন মাসে 'সাহিত্যসভা' শিরোনামে *রঙ্গালয়*-এ যে খবরটি বেরোয়, সেটি এই রকম--

> গত রবিবার রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবনে সাহিত্যসভার মাসিক অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের এক অপূর্ব্ব প্রবন্ধ পাঠ হয়। সভাপতি ছিলেন বঙ্গসাহিত্যের মহারথী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু। সভাস্থলে প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়, বাবু শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী প্রভৃতি শতাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রের নানাস্থানের কথা সংগ্রহ করে প্রবন্ধ লেখেন। এখানে তিনি অরজস্কা বিধবাদের বিবাহের কথা বলেন।

অমরেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক চেষ্টায় পত্রিকার জনপ্রিয়তা দিনদিন বাড়তে থাকে। জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে লোকসানের মাত্রাও। পত্রিকাটিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গ্রাহক সংখ্যা এক লাখে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করলেন তিনি। গ্রাহক সংখ্যা বাড়ানোর জন্য অমরেন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন--'যিনি এই সময় হইতে রঙ্গালয়ের গ্রাহক হইবেন তিনি একরাত্রি বিনামূল্যে ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয় দেখিতে পাইবেন।'

পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা যখন ক্রমবর্ধমান, এমন সময় অমরেন্দ্রনাথ পত্রিকাটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। অনেক আশা নিয়ে *রঙ্গালয়* প্রকাশ করেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। নামি-দামি লেখক জোগাড় করেছিলেন, গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নানারকমের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু সব মিলিয়ে আশানুরূপ ফল ফলল না। লোকসানের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলল। পত্রিকার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খোরাক হল। অন্যদিকে তাঁর উপর তখন দুটি থিয়েটারের দায়িত্ব। পত্রিকা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় বিশেষ ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই পত্রিকার প্রকাশ, বিতরণ এবং গ্রাহকদের উপহার না পাওয়া নিয়ে গোলযোগ দেখা দিল। অভিযোগের পর অভিযোগ আসতে লাগল। বাধ্য হয়ে কিছুদিনের জন্য তাঁর প্রিয় পত্রিকা বন্ধ করে দিলেন তিনি।

কিন্তু *রঙ্গালয়* ছিল অমরেন্দ্রনাথের আদরের ধন। তাই পত্রিকাটি পুরোপুরি উঠে যাক তা তিনি চাননি। কাগজটিকে বাঁচাতে নতুন পরিকল্পনা করলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে একদিন নতুন পরিকল্পনার কথা শোনালেন। বললেন, কাগজটির জন্য মাসে তিনি তিনশো করে টাকা দেবেন, বিজ্ঞাপনের টাকার কোনো দাবি করবেন না। এভাবে কাগজ বার করে লাভ-লোকসান যাই হোক--তা বুঝতে হবে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অমরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে রাজি হলেন পাঁচকড়ি। সাময়িক বিরতির পর আবার প্রকাশিত হল *রঙ্গালয়*। পত্রিকাটির সমস্ত দায়িত্ব হাতে পেয়ে সম্পাদকীয়তে তিনি লিখলেন--

> আমার অনুজ সদৃশ শ্রীমান অমরেন্দ্রনাথ দত্ত আমাকে 'রঙ্গালয়' পত্রের সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেন। প্রায় এক বৎসর কাল আমি তাঁর অধীনে কার্য্য করি, পরে 'রঙ্গালয়' পত্রের প্রকাশ বিষয়ে নানা গোলযোগ হওয়ায় শ্রীমান অমরেন্দ্রনাথ 'রঙ্গালয়' পত্রের স্বত্ব ও স্বামিত্ব আমাদেরই হস্তে অর্পণ করেন। আমি এখন একমাত্র অধিকারী।

পত্রিকাটির পুরো দায়িত্ব হাতে আসার পর এটিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর সাধ্যমতো চেষ্টা করেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতা, গান, গল্পের পাশাপাশি পত্রিকায় উন্নতমানের প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। নাট্য আলোচনার পাশাপাশি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য আলোচনাও প্রকাশিত হতে লাগল। সেকালের নামি-দামি লেখকদের *রঙ্গালয়*-এ লেখানোর ব্যবস্থা করলেন। রঙ্গালয়-এর বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাব্য লেখকদের এক তালিকা সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ করলেন। সেটি এই রকম--

রঙ্গালয়

সাপ্তাহিক পত্র 'ক্লাসিক থিয়েটারে' হইতে প্রকাশিত। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে 'রঙ্গালয়' এখন বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র। সাহিত্যের ও সুকুমার কলার চর্চা ইহাতে যত অধিক হয়, এ সকল বিষয়ের এত অধিক আলোচনা আর কোনো সাপ্তাহিক পত্রেই হয় না। বিলাতি থিয়েটার বা স্কেচ প্রভৃতির আদর্শে 'রঙ্গালয়' পত্র সম্পাদিত হইতেছে। অথচ সংবাদপত্রের আলোচ্য বিষয় সমূহেও রঙ্গালয়ের ঔদাসীন্য নাই। রঙ্গালয় সুতরাং নূতন প্রকৃতির সাপ্তাহিক পত্র। যাহাতে কাগজ ভাল হয়, ছাপা ভাল হয়, লেখা ভাল হয়, সে ব্যাপারে চেষ্টার ত্রুটি কিছুই হইতেছে না। যাঁহারা রঙ্গালয়ের নিয়মিত পাঠক তাঁহারা আমাদের একথার পরিপোষণ করিবেন। এই পত্রের সম্পাদক ও সহকারী লেখকগণের পরিচয়ে বুঝিতে পারিবেন যে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ লেখকগণ এই পত্রে নিয়মিত রূপে লিখিয়াছেন বা লিখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ সম্পাদক।
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন সহযোগী সম্পাদক।

লেখকগণ

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ
শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম. এ. এফ. আর. এ. এস
" অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ. বি. এল.

কবি নবীনচন্দ্র সেন
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ
" " বলাইচন্দ্র গোস্বামী
" " অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
" " যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" " ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
" " শরচ্চন্দ্র সরকার
" " দুর্গাদাস লাহিড়ী
" " ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী
" " হরেন্দ্রলাল রায়
" " হরিসাধন মুখোপাধ্যায়
" " মন্মথনাথ বসু
" " মনমোহন গোস্বামী
" " মনোমোহন বসু
" " বিহারীলাল চক্রবর্তী
" " দীনেশচন্দ্র সেন।

প্রভৃতি লেখকগণই রঙ্গালয়ের লেখক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। সুতরাং রঙ্গালয়ের লেখা যে ভাল হইয়াছে এবং আরো ভাল হইবে সে পক্ষে আর সন্দেহ নাই।'

নতুন ব্যবস্থায় *রঙ্গালয়* ভালোই চলতে লাগল। পাঠক মহলে এর চাহিদাও দিনদিন বাড়তে লাগল। এইভাবে আরও কয়েক বছর চলার পর *রঙ্গালয়* বন্ধ হয়ে গেল।

রঙ্গালয় বন্ধ হয়ে গেলেও, বাংলা পত্রিকা জগতে রেখে গেল চিরস্থায়ী এক চিহ্ন। বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে *রঙ্গালয়*-এর বিশেষ ভূমিকাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। নানা ধরনের খবর প্রকাশিত হলেও, পত্রিকাটির মূল ঝোঁক যে ছিল নাটক ও নাট্যচর্চা সম্পর্কিত লেখার দিকে তা স্বীকার করতেই হবে। অভিনেতা, অভিনেত্রী, নাটক ও নাট্যাভিনয়কে মূল ভিত্তি করে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে তাকে যে রীতিমত জনপ্রিয় করে তোলা যায়—এই দৃষ্টান্ত অমরেন্দ্রনাথই প্রথম স্থাপন করেন। সেই কারণে নাট্য বিষয়ক প্রথম বাংলা পত্রিকার দাবি করতে না পারলেও, এটি যে নাটক বিষয়ক প্রথম উল্লেখযোগ্য পত্রিকা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

রঙ্গালয় বন্ধ হয়ে যাবার কিছুদিন পরে আবার নাট্যপত্রিকা প্রকাশের কথা শুধু চিন্তাই করলেন না অমরেন্দ্রনাথ, তা বাস্তবে রূপও দিলেন। ১৯১০-এর জুলাই মাসে তাঁর সম্পাদনায় নাট্য বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হল—নাম *নাট্যমন্দির*। প্রকাশের কারণ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র ঘোষ *নাট্যমন্দির*-এর প্রথম সংখ্যায় লিখলেন,

> আমরা অপক্ষপাতী সমালোচকের পদধূলি গ্রহণ করি। কিন্তু ওরূপ সমালোচকের অনিষ্টকর কার্য্যে বড়ই দুঃখিত! তাঁহাদের কলুষবাক্যে অপরের মন কলুষিত করিতে পারেন, সেই নিমিত্ত এই মাসিক নাট্যমন্দির সাধারণকে উপহার দিবার জন্য আমরা যত্ন করিতেছি, 'নাট্যমন্দিরের' স্বরূপ অবস্থা, কুটীর হইতে অট্টালিকা পর্য্যন্ত জ্ঞাপন করিতে আমরা উৎসুখ। 'নাট্যমন্দিরের' স্তম্ভে সাধারণ রঙ্গালয়ের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণিত থাকিবে। সকল সম্প্রদায়ের মুখপত্র স্বরূপ সংবাদপত্র আছে, কিন্তু রঙ্গালয়ের

কিছুই নাই। টিকিট না পাইয়া বিরক্ত হইয়া যাহা লেখেন, তাহাও শুনিতে হয়। কিন্তু অনেকদিন শুনিয়া আসিতেছি, আর শুনিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা আপনাদের আপনি সমালোচক হইয়া নাট্যমন্দির প্রকাশ করিব। সাহিত্যও আমাদের প্রধান আলোচনার সামগ্রী। কায়মনোবাক্যে তাহার আলোচনা করিব। কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারি, পারিব, তাহা সাধারণের উৎসাহের উপর নির্ভর করে। আমরা দ্বারে দ্বারে সেই উৎসাহের প্রার্থী।

নাট্যমন্দির-এর প্রথম সংখ্যায় গিরিশচন্দ্রের পূর্বোক্ত লেখাটি ছাড়াও 'নাট্যকার' নামে আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া প্রথম সংখ্যায় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'রঙ্গালয়ের উন্নতি ও অবনতি', অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'অভিনেত্রীর রূপ', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ' মনোমোহন গোস্বামীর 'রঙ্গভূমি ভালোবাসিলাম কেন?' অমৃতলাল বসু অনূদিত 'রত্নাবলী' নাটকের অংশবিশেষ, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রহসন 'গুরুঠাকুর' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় অমৃতলাল বসু ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা কয়েকটি কবিতাও স্থান পায়। প্রথম সংখ্যায় বিনোদিনীর একটি ছবি প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটি অভূতপূর্ব সমাদর লাভ করে। চাহিদা মেটাতে পত্রিকার প্রথম দুটি সংখ্যা আবার নতুন করে ছাপতে হয়।

সেকালের মানুষজন পত্রিকাটি দেখে কতখানি পুলকিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়, সমকালীন অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠি থেকে--'তুমি যাহা অনেকদিন হইতে কল্পনা করিতে, তাহা গত মাসে হঠাৎ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। থিয়েটারগুলির দোষগুণ সমালোচনায় বর্তমান সংবাদপত্রগুলিকে উদাসীন দেখিয়া তুমি স্বর্গীয় মুস্তাফী মহাশয়ের কথা তুলিয়া বলিতে যে, তিনি সর্ব্বদা তোমাদের বলিতেন--থিয়েটারে নিজেদের কথা কহিবার একখানা, আর একখানা থিয়েটার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সাধারণের একখানা 'পত্র' হয়, তবেই থিয়েটারের উন্নতি হবে নতুবা নহে। সেই ভবিষ্যদর্শী নটবৃন্দের কল্পনা হঠাৎ গত শ্রাবণ মাসে আকার পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিয়াছে। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সম্পাদক হইয়া 'নাট্যমন্দির' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতেছেন। স্টার থিয়েটারে তার কার্য্যালয় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি নট অথচ নাট্যকারেরা তাহাতে লিখিতেছেন রচনাকুশলা অভিনেত্রীরাও লিখিবেন এবং ইহাদের বন্ধু সংবাদপত্রের সম্পাদকেরাও কেহ কেহ লিখিবেন বলিয়াছেন। ইহার মুখবন্ধে গিরিশবাবু বলিয়া গিয়াছেন--'বঙ্গীয় নাট্যশালার মুখপত্র নাই, তাই এখানি প্রকাশিত হইল।'

প্রথম থেকেই পত্রিকাটি উৎসাহী মানুষেব মনে আশার সঞ্চার করে। সেকালের বিখ্যাত পত্রিকা *সাহিত্য* পত্রিকাটির প্রশংসায় হয়ে ওঠে পঞ্চমুখ। নাট্যজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিখ্যাত সব মানুষরা এই পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাট্যসমালোচনা, আত্মজীবনী, নাট্যজগতের টুকিটাকি সংবাদের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের নাটকও *নাট্যমন্দির*-এ প্রকাশিত হত। উনিশ শতকের প্রখ্যাত নাটাকার মনোমোহন বসুর 'সতীর অভিমান' এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে বিনোদিনীর 'আত্মকথা' বেরোতে শুরু করে। 'আত্মকথা'র ভূমিকা লেখেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। দ্বিতীয় বর্ষের *নাট্যমন্দির*-এ 'বিশেষজ্ঞের লিখিত' বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এই বিশেষজ্ঞ হলেন কিরণচন্দ্র দত্ত। *নাট্যমন্দির*-এর বিশেষ আকর্ষণ ছিল আর্ট পেপারে ছাপা ছবিগুলি। বিনোদিনী, তারাসুন্দরী, নরীসুন্দরী ইত্যাদি অভিনেত্রীর পাশাপাশি

ধর্মদাস সুর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নাট্যব্যক্তিত্বের ছবি ছাপতেও অমরেন্দ্রনাথ কুণ্ঠিত হননি।

প্রথম সংখ্যা থেকেই পত্রিকার জন্য কলম ধরেন অমরেন্দ্রনাথ। 'অভিনেত্রীর রূপ' নামে তাঁর একটি উপন্যাস *নাট্যমন্দির*-এর প্রথম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। বেশ কিছু কবিতাও তিনি এই পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তাঁর লেখা 'নাট্যসাহিত্যে নবীনচন্দ্র', 'গিরিশপ্রতিভা' প্রভৃতি প্রবন্ধ *নাট্যমন্দির*-এ প্রকাশিত হয়।

অমরেন্দ্রনাথ ব্যস্ত মানুষ, থিয়েটার নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে করতেই কেটে যেত তাঁর দিন। পত্রিকার কাজ ভালোভাবে চালানোর জন্য বাধ্য হয়ে একজন সহকারী সম্পাদক নিয়োগ করতে হল তাঁকে। এই সংবাদ দিয়ে *নাট্যমন্দির*-এর ষষ্ঠ সংখ্যায় জানানো হল--

> নাট্যমন্দিরের সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বঙ্গমঞ্চের সম্পাদন ভার সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া অদ্য হইতে আমি নাট্যমন্দিরে যোগদান করিলাম। আশাকরি শুভ সংযোগের ফল নাট্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠা গৌরবকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিবে। নাট্যমন্দিরের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, নাট্যবন্ধু ও সাধারণ পাঠকগণের তৃপ্তি ও আনন্দ বর্ধিত করিবে।...ইতি ১লা জানুয়ারি ১৯১১...শ্রী মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

নানা ধরনের লেখার পাশাপাশি মজার মজার চিঠিও বেরোত এই পত্রিকায়। দ্বিতীয় বর্ষের শ্রাবণ সংখ্যায় কলকাতার কাজের মেয়েদের লেখা একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিতে তারা জানায়, মুখ নেড়ে ঝগড়া করতে তারা জানে না। তাদের মাথা ভর্তি উকুনও নেই। চিঠিতে বাবু ভায়েদের তাদের 'মাগী' বলে সম্বোধন করার বিরুদ্ধেও তারা প্রতিবাদ জানায়। দ্বিতীয় বর্ষের কার্তিক সংখ্যায় বাসুদেব বলে এক ব্যক্তির লেখা 'মশকচরিত্র' নামে একটি মজার চিঠি বেরোয়।

নাট্যমন্দির পত্রিকায় কেবলমাত্র গুরুগম্ভীর আলোচনাই নয়, হালকা চালের লেখাও স্থান পেত। আসলে পত্রিকাটিকে অমরেন্দ্রনাথ সর্বজনের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। দু-একটি চটুল লেখা প্রকাশিত হলেও, অমরেন্দ্রনাথ কিন্তু কোনোদিনই পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হননি। পত্রিকার 'নাট্যপ্রসঙ্গ' বিভাগটিতে থিয়েটারের খবরাখবর নিয়মিত প্রকাশিত হত। শুধু স্টার বা মিনার্ভা নয়, গ্রেট ন্যাশনাল, গ্র্যান্ড প্রভৃতি থিয়েটারের খবর প্রকাশেও অমরেন্দ্রনাথের কুণ্ঠা ছিল না।

এই সব ছাড়াও *নাট্যমন্দির*-এ বিভিন্ন নাটকের সমালোচনা প্রকাশিত হত। এ সম্পর্কে লেখা চিঠিপত্র ছাপতেও দ্বিধা করতেন না সম্পাদক। অবশ্য ব্যক্তিগত কটাক্ষ আছে এমন কোনো চিঠি *নাট্যমন্দির*-এ সচরাচর প্রকাশিত হত না। এই ধরনের একটি চিঠি *নাট্যমন্দির*-এ প্রকাশিত না হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে জনৈক পত্রপ্রেরক সম্পাদকের কাছে অভিযোগ করে লেখেন--

> আপনি সুপ্রতিষ্ঠিত অভিনেতা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার ও প্রসিদ্ধ স্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ বলিয়া আমি আপনার দ্বারস্থ নহি, আপনি বঙ্গের রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় একমাত্র পত্রিকা নাট্যমন্দিরের সম্পাদক--সেই জন্যই আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।...আপনার নাট্যমন্দির বঙ্গের রঙ্গালয় সমূহের মুখপত্র। দেশবিদেশের নাট্যশালা সমূহের ইতিহাস, এবং অভিনেতা অভিনেত্রীর জীবনবৃত্ত প্রকাশিত করাই নাট্যমন্দিরের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। যাহাতে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের সংস্কার সাধিত হয়, অভিনয়ের সমালোচনা হয়, অভিনেতা অভিনেত্রীগণের ত্রুটি সমূহ নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা নাট্যমন্দিরের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত।

পত্রপ্রেরকের চিঠিটি কেন ছাপা যায়নি তার কারণ ব্যাখ্যা করে মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'আপনার তীব্র সমালোচনা আমরা পত্রস্থ করিতে পারিলাম না। কারণ নাট্যমন্দিরের সম্পাদক স্বতন্ত্র রঙ্গালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংসৃষ্ট, সুতরাং যদি তাঁহার সম্পাদিত পত্রে অপর রঙ্গালয়ের জনৈক প্রসিদ্ধ অভিনেতার উদ্দামতা সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সাধারণের নিকট নিন্দাভাজন হইতে হইবে। বিশেষতঃ নাট্যমন্দির এ পর্য্যন্ত অভিনয় সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। কাজেই সহসা একেবারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত করা এ অবস্থায় নাট্যমন্দির-এর পক্ষে সংগত কিনা আপনিই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।'

তিন বছরেরও বেশি সময় *নাট্যমন্দির*-এর সঙ্গে যুক্ত থাকার পর অমরেন্দ্রনাথ পত্রিকার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। থিয়েটারের কাজের চাপ, ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা ও স্বাস্থ্যহীনতা তাঁকে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। *নাট্যমন্দির* পরিত্যাগ কালে অমরেন্দ্রনাথ পাঠকদের অবনতির জন্য যে নিবেদন পত্রটি প্রকাশ করেন সেটি এইরকম--

হে নাট্যামোদী সদাশয় সাহিত্য গ্রাহক,

যাহারা দশের অনুগ্রহপ্রার্থী, তাহাদের কষ্টের কথা বোধহয় আমাকে আর বিশদরূপে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। জনসাধারণের মনতুষ্টির জন্য আমাকে সমস্ত রজনী জাগরণ করিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে বহু পরিমাণে অর্থব্যয়ও আছে, ব্যয়াধিক্য প্রযুক্ত এই নিদ্রানিমীলিতপ্রায় আঁখি দিবাভাগেও আবার স্বভাবতঃ সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই, মুক্তি নাই, এতদ্বিধায়, এবং আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শনের বলবতী ইচ্ছাবেগ, যে সকল কর্ম্মচারীর হস্তে নাট্যমন্দির-এর কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল, আমার আত্মার স্বরূপ গ্রাহক মণ্ডলীর পত্রমর্ম্মত, তাহাদের সেই প্রমাণিত কার্য্যকরী শক্তির প্রভাবে প্রত্যাহৃত হওয়ায়, ১৩২০ সালের আশ্বিনের ও কার্ত্তিকের সংখ্যা প্রকাশিত করিয়া আমি সম্পাদকীয় দায়িত্বভার, পরিত্যাগ করিয়াছি, তবে এ বৎসরের 'নাট্যমন্দির' অনুজ সমান আমার স্নেহভাজন শ্রীমান মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছি ; অতঃপর তিনি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া আপনাদের মনোরঞ্জন করিবেন, তাহাও জানিবেন। অগ্রহায়ণের সংখ্যায় ভ্রমক্রমে আমার নাম উল্লিখিত হইয়াছে দেখিয়া সহৃদয় গ্রাহক মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য আদ্য ইহা বিজ্ঞাপিত হইল।

যদি সময় পাই রঙ্গালয়ের উন্নতিকল্পে মনোমন্দিরে যে চির আশা পোষণ করিয়া আসিতেছি, নিত্য নব্যশিক্ষা লাভের বহুদর্শিতা ফলে যাহাতে তাহা ফলবতী হয়, কালে যদি সেই শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি, শৃঙ্খলা সংরক্ষণে সমর্থ হই, আবার এইরূপে, সম্পাদক স্বরূপে, নবপ্রীতি উপহার হস্তে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব, বিদায় বিদায়!

অমরেন্দ্রনাথ *নাট্যমন্দির*-এর সম্পাদকের দায়িত্ব ত্যাগ করার পর পত্রিকাটির গৌরবের দিন শেষ হয়। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে পত্রিকার দায়িত্ব আসার পর তিনিও এটি ঠিকমত প্রকাশে ব্যর্থ হন। *নাট্যমন্দির*-এর দুরবস্থা দেখে অমরেন্দ্রনাথ আবার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। পত্রিকাটিব প্রকাশ নিয়মিত করার জন্য নিজে রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস নামক ছাপাখানাটি মণিলালকে দান করে দেন। তা সত্ত্বেও পত্রিকাটিকে পূর্ব্বের মর্যাদার আসনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে মণিলাল ব্যর্থ হলেন। কোনো রকমে পত্রিকার অস্তিত্ব বজায় থাকলেও, অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর পত্রিকা প্রকাশ হয়ে পড়ে ভীষণ অনিয়মিত। কয়েকমাস এইভাবে চালানোর পর পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

রচনা পারিপাট্যে, অঙ্গসজ্জায়, বিস্মৃতপ্রায় নট-নটীর পরিচয় প্রদানে, অসাধারণ কিছু লেখা প্রকাশ করে নাট্যপত্রিকার যে আদর্শ অমরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করে গেলেন--তাকে অতিক্রম করতে বহু সময় লেগেছিল পরবর্তী প্রজন্মের। সমকালে পত্রিকাটিকে কেউ কেউ সমালোচনা করেন। অমরেন্দ্রনাথ রায়ের *প্রবাহিনী* এটিকে 'বটতলার পত্রিকা' আখ্যা দেয়। আসলে তখনকার শিক্ষিতসমাজ নট-নটীদের ভালো চোখে দেখতেন না। সেই মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে অমরেন্দ্রনাথ রায়ের মন্তব্যে। আজকের দিনেও আমরা যখন এই পত্রিকার পাতা ওলটাই, তখন মুগ্ধ হই এর অঙ্গসৌষ্ঠব দেখে। এর অনেক লেখা আজও আমাদের মনোহরণ করে। এই পত্রিকার পাতায় হারিয়ে যাওয়া নট-নটীদের প্রতিকৃতি দেখে বিস্মিত, পুলকিত এবং শিহরিত হই। অগ্রজ নাট্যকর্মী (গিরিশচন্দ্রের) প্রয়াণে পত্রিকার শোকোচ্ছ্বাস দেখে স্তব্ধ হই। অমরেন্দ্রনাথের *নাট্যমন্দির* শুধু একটি পত্রিকার নাম নয়, বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের বাংলা নাট্য আন্দোলনের অমূল্য এক দলিলও।

নাট্যমন্দির-এর সমকালেই ১৩১৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে* *রঙ্গমঞ্চ* নামে একটি নাট্যপত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৬২ বউবাজার স্ট্রিট থেকে বেরোত পত্রিকাটি। *রঙ্গমঞ্চ* সচিত্র পত্রিকা। নট-ও নাট্যকারদের ছবি এখানে মুদ্রিত হত।

প্রচলিত প্রথা মেনেই এই পত্রিকার লেখাগুলি সাজানো হত। প্রথম লেখার নাম 'নটনাথ'। লেখার সঙ্গে নটনাথের ছবি। মঞ্চদেবতা নটনাথের চরণে প্রণাম নিবেদন করে প্রথম লেখাতেই জানানো হয়েছে--'নটনাথের চরণে কোটী কোটী প্রণাম করিয়া এই 'রঙ্গমঞ্চ'-এর শুভারম্ভ করিতেছি নট-নাটক-নাট্যশালার আলোচনায় নটনাথের মঙ্গলময় নাম উচ্চারণ করিয়া সংসার নাট্যশালায় সঙ্কল্পিত অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি।' পরের দুটি লেখা পূর্ণচন্দ্র ঘোষের। প্রথমটি 'নাট্যবেদ'। এখানে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কে কিছু কথা আলোচিত। পরেরটি 'সংসার নাট্যশালা' নামে একটি কবিতা। 'সূচনা' শীর্ষক লেখায় সম্পাদক *রঙ্গমঞ্চ* প্রকাশের উদ্দেশ্য বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেছেন--

> অনেক আশা ও ভরসা হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভগবানের মঙ্গলময় নাম স্মরণপূর্বক রঙ্গমঞ্চ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। ইহার নামেই ইহা, উদ্দেশ্য কতকটা বুঝা যায়। নট-নাট্যশালা লইয়া অপক্ষপাতে আলোচনা করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কবি, চারণ বা মিনিস্ট্রেলের গীতে সকল জনসমাজেই বিকাশোন্মুখ জাতির মনোভাবের প্রকাশ ও প্রচার হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই। এখনও থিয়েটার ও যাত্রা দ্বারা অনেক ভাব মানব-সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে। ইহা ভিন্ন অভিনয় বা অভিনয়ের অনুরূপ বিলাস সংবলিত ছন্দোবন্ধে গ্রথিত ভাবময় ভাষা হইতেই সকল জাতির সাহিত্য উদ্ভূত হইয়াছে। এখন সাধারণতঃ মানবসমাজ উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে;-- সেই জন্য সেই আদিমকালের নৃত্যগীত উন্নত হইয়া যাত্রা ও থিয়েটারে পরিণত হইয়াছে। কোনও জাতির চিত্তবিনোদনের উপায়-দর্শনে সেই জাতি সভ্যতার পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা অনেকটা উপলব্ধি করা যায়।...
>
> রঙ্গমঞ্চ-এর কার্য্য অত্যন্ত কঠিন। ইতিপূর্বে এই উদ্দেশ্যে এদেশে কোনও সাময়িক পত্র প্রতিষ্ঠা হয়

*গীতা চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী' (১৯০০-১৯১৪) গ্রন্থে (পৃ. ৮৯) এই পত্রিকাটির প্রকাশকাল 'শ্রাবণ ১৩১৪' বলে উল্লেখ করেছেন। যা যথার্থ নয়।

নাই। 'রঙ্গভূমি' ও 'রঙ্গালয়' নামে দুইখানি সাপ্তাহিক পত্র কিছুদিনের জন্য কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল সত্য; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে উহা জলবিম্ববৎ জলেই মিলাইয়া গিয়াছে। উঁহাদের লেখকেরা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন; তথাপি উক্ত পত্রদ্বয় স্থায়িত্ব লাভ করে নাই, সেই জন্য এইরূপ বিষয়ে আলোচনার্থ কোন সাময়িক পত্র প্রকাশে অনেকে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। যাহা হউক, কতকগুলি সমাজ হিতৈষী নট-নাটক নাট্যশালার উন্নতিকামী, নাট্যতত্ত্বে অভিজ্ঞ, প্রতিষ্ঠাবান লেখকের উৎসাহে আমরা অদ্য এই *রঙ্গমঞ্চ* লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

রঙ্গমঞ্চ

নটনাথ।

রঙ্গমঞ্চ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রতিলিপি

অতঃপর উদ্দেশ্যসাধনের জন্য রঙ্গমঞ্চ প্রাণপণ যত্ন করিবে। সমালোচনার নামে ব্যক্তিগত গ্লানি বা কুৎসা করিবে না। নাট্যবন্ধুগণ ইহাকে বন্ধুভাবে আদর করেন, এই প্রার্থনা। ইহার উপদেশ বা

সমালোচনাকে কেহ স্বার্থমণ্ডিত বা হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা হইতে উদ্ভূত মনে করিয়া বিরক্ত না হন, এই মিনতি। রাজনীতি বা রাজনীতি-সম্পর্কিত কোন কথারই আলোচনা রঙ্গমঞ্চ-এ কখনো হইবে না।



মতিবিবির ভূমিকায়—অভিনেত্রী সুকুমারী

স্বনামধন্য বেশ কিছু মানুষ এই পত্রিকায় লিখেছিলেন। এঁদের মধ্যে ব্যোমকেশ মুস্তাফী, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্ণচন্দ্র ঘোষ এখানে একাধিক লেখা লেখেন। লেখাগুলির নামকরণ থেকেই বোঝা যায় প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা থেকে শুরু করে ভারতীয় নাট্যশালা, বিদেশি নাটকের অভিনয় এবং ছদ্মনামে অভিনেতার অভিনয় সমালোচনা—সবই পত্রিকার পাতায় স্থান পেত। 'নাট্য ও নাট্যকার', 'নাটক ও নাট্যশালা', 'প্রাচীনভারতের নাট্যকলা', 'প্রাচীন যুগে রঙ্গমঞ্চ', 'প্রতীচ্য রঙ্গমঞ্চ', 'বিলাতে সখের থিয়েটার', 'বাঙ্গালার আদি নাট্যকার', 'নাট্য সাহিত্যে নেপোলিয়ান' থেকে শুরু করে 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' সবকিছুই আসত আলোচনার সূত্রে।

লেখার পাশাপাশি নানা ধরনের ছবি দিয়ে পত্রিকাটিকে সম্পাদক আকর্ষণীয় করে

তোলেন। প্রথম সংখ্যায় ধর্মদাস, রামনারায়ণ তর্করত্ন, অর্ধেন্দুশেখর-এর মতো নাট্যব্যক্তিত্বের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে তারাসুন্দরী ও সুকুমারীর নানা ধরনের ছবি। এছাড়াও চিত্রসূচিতে স্থান পেয়েছে লালবাজারে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন নাট্যশালার চিত্র।

১৩১৭-র ভাদ্র মাসে পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ঘটেছে এই সংখ্যায়। 'কলিকাতার চিঠি' শীর্ষক লেখাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ লেখক তৃষিতকুমার তলাপাত্র তাঁর ভাই ললিতের উদ্দেশে যে বিস্তৃত চিঠিটি লিখেছেন, তাতে এই সময়ের বিভিন্ন থিয়েটার হল যেমন মিনার্ভা, স্টার, কোহিনূর প্রভৃতির অবস্থা এবং ঐ সব হলে অভিনয় সংবাদ পাওয়া যায়। তা ছাড়াও সমকালের দুই বিখ্যাত নাট্যপত্রিকা *নাট্যমন্দির* ও *রঙ্গালয়* সম্পর্কেও অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া গায়ক রজনীকান্ত সেনের অবস্থা, বিভিন্ন থিয়েটারে 'বেনিফিট নাইট'-এর সংবাদও পাওয়া যায়। এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছে ধর্মদাসের শেষ কীর্তির বিষয় নিয়ে 'নাট্যপীঠ' শীর্ষক লেখা। ব্যোমকেশ মুস্তাফী তুলে এনেছেন 'একখানি বিস্মৃত নাটক'—নাটকের নাম 'স্বর্ণশৃঙ্খল' প্রকাশকাল ১২৭০ বঙ্গাব্দ। লেখকের অনুমান এই নাটকের লেখক দীনবন্ধুর বন্ধু দুর্গাদাস কর। অতুলকৃষ্ণ মিত্র 'প্রবীণা ও নবীনা' শীর্ষক লেখায় তুলে ধরেছেন গোলাপ ও তারাসুন্দরীর কথা। এই সংখ্যায় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'অভিনেতা' প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা দ্বিগুণ করেও সব লেখা প্রকাশ না করতে পারার ক্ষোভ ফুটে উঠেছে 'কার্য্যাধ্যক্ষের নিবেদন' অংশে—

> রঙ্গমঞ্চের পাঠকগণকে একটা কথা নিবেদন করিবার আছে। পত্র সংখ্যা বাড়াইয়াও 'রঙ্গমঞ্চ'-এর বর্ত্তমান সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত 'হিন্দুনাট্যের উৎপত্তি', সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী মহাশয়ের রচিত 'সঙ্গীতের শক্তি' 'প্রবীণা ও নবীনা' প্রবন্ধের নবীনার অংশ, 'নটরাজের চরিত্র কথা', 'বঙ্গীয় নাট্যশালার আর একজন জনক' 'নাট্যাচার্য্য শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ', "মুখোশধারী পয়গম্বর" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এবং 'ইষ্টসিদ্ধ' উপন্যাসের কোন অংশ এবার প্রকাশ করা গেল না। এগুলি এবং ইহার সঙ্গে আরও সরস নানাবিধ রচনা এবং বহসাময় পূজার গল্প, পূজার হাস্যকৌতুক ইত্যাদি বহু বিষয়ে পরিপূর্ণ ও বহু ছবি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া আশ্বিনের সংখ্যায় প্রকাশ করিবার আয়োজন করা যাইতেছে। পাঠক ও অনুগ্রাহক বর্গ এজন্য আমাদের ত্রুটি না লইলে বাধিত হইব।

রঙ্গমঞ্চ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা একত্রিত ভাবে 'আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩১৭' প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যার আয়তন পূর্বের সংখ্যা দুটির তুলনায় বেশ বড়ো। এই সংখ্যায় কার্যাধ্যক্ষ তাঁর কথা রেখেছেন। বেশ কয়েকজন নতুন লেখকের নাম আমাদের চোখে পড়েছে--সরোজনাথ ঠাকুর, দেবকণ্ঠ বাগচী, রাধামাধব কর, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। লেখাগুলিতে একদিকে যেমন স্থান পেয়েছে 'সঙ্গীত ও অভিনয় প্রসঙ্গ', সম্পূর্ণ নকশা (মণিলালের 'অদলবদল'), অন্যদিকে এসেছে বেশ কিছু গবেষণাধর্মী লেখা। বিশেষ উল্লেখযোগ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাচীন ভারতের নাট্যগৃহনির্ম্মাণ' এবং সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর 'আদি বাঙ্গালা নাটকের জন্মরহস্য' নামক লেখা দুটি।

থিয়েটারের সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য সংবাদও পত্রিকাটিতে স্থান পেত। 'মাষ্টার মদন' শীর্ষক লেখায় মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় নামে 'দুগ্ধপোষ্য শিশু'র কথা স্থান পেয়েছে। এই ছেলেটি ছিল শ্রুতিধর। নাটকের গান শুনে তা হুবহু শোনাতে পারত। তার বয়স মাত্র পাঁচ বছর। এক কন্যাদায়গ্রস্ত বিধবাকে সাহায্য করার জন্য মিনার্ভায় তার সঙ্গীতশক্তির পরিচয় শ্রোতাদের

কাছে তুলে ধরা হয়।

কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পরই সম্পাদক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করেন। এই সংখ্যার শেষে 'কার্য্যাধ্যক্ষের নিবেদন' অংশে জানানো হয়—

> আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি—রঙ্গমঞ্চ-এর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রঙ্গমঞ্চ-এর সম্পাদন ভার ও সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া পত্রান্তরে যোগদান করিয়াছেন মণিলাল বাবু এই কয় মাস রঙ্গমঞ্চ সম্পাদনে যে রূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন—রঙ্গমঞ্চের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া যে ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছেন—তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে আমরা সাহস করিয়া একথা বলিতেও বাধ্য হইতেছি যে, মণিলালবাবুর সম্পাদনকালে রঙ্গমঞ্চের যে গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাঁহার অবর্ত্তমানেও রঙ্গমঞ্চের সেই প্রতিষ্ঠিত গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

মণিলালের অবর্তমানে *রঙ্গমঞ্চ*-র 'গৌরব অক্ষুণ্ণ' রাখার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, বাস্তবে তাকে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ এর পরে পত্রিকার কোনো সংখ্যাই আর প্রকাশিত হয়নি। স্বল্পস্থায়ী এই পত্রিকাটি প্রমাণ করে শুধু নাট্যবিষয়কে অবলম্বন করেও, কত সুন্দর রুচিসম্মত একটি পত্রিকা প্রকাশ করা যায়। লেখা-রেখার যে মান ওইকালে মণিলাল স্থাপন করেন, একে অতিক্রম করতে পরবর্তী নাট্যপত্রিকাগুলির বহু সময় লেগেছিল।

রঙ্গমঞ্চ-এর পর ১৩২০-র বৈশাখে নারায়ণচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *নাট্য-পত্রিকা*। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ২৭ রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট থেকে। প্রথম সংখ্যাটি আকারে ছোট। 'আমাদের নিবেদন'-এ বলা হয়েছে—

> ভদ্র পাঠক মহোদয়গণের নিকট আমার নিবেদন—আমি একজন সামান্য মূর্খ ব্যক্তি। আমার লিখিত কোন পুস্তক, জনসমাজে প্রকাশ করা বাতুলের কার্য্য। তত্রাচ মনের আবেগ বশতঃ এই চারখানি নাটকের কয়েক গর্ভাঙ্ক নাট্য-পত্রিকায় প্রকাশিত করিলাম। এই পত্রিকায় নানারূপ ভুল ভ্রান্তি ও দোষক্রটি থাকা সত্ত্বেও ইহা আমি প্রকাশ করিতে সাহস করিয়াছি, ইহার জন্য আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমায় ক্ষমা করিবেন।

নিবেদনের শেষে জানানো হয়েছে—

> এই আমার প্রথম শিক্ষা, ভবিষ্যতের আশা পাইলে আমি আমার সাধ্যানুসারে পত্রিকাখানিকে যতদূর সম্ভব, আপনাদিগের পাঠোপযোগী করিবার জন্য চেষ্টা করিব। এই পত্রিকাখানি প্রতিমাসে প্রকাশিত হইবে এরূপ আশা করিয়াছি। নানাবিধ উপন্যাস ও ঐতিহাসিক ঘটনা এবং পণ্ডিত মহোদয়গণের পুস্তক সকল হইতে ভাবার্থ সংগ্রহ করিয়া নাট্যাকারে লিখিত হইয়া এই পত্রিকা প্রকাশিত হইবেক।

প্রথম সংখ্যায় যে লেখাগুলি বেরোয় সেগুলি হল—

'আশা', 'ড্যানক্যান চরিত', 'হাসনবানু', 'ইন্দুমতী নাটক', 'আশা বিভ্রাট'। 'আশা' নামক কবিতাটি ছাড়া বাকি চারটিই নাটক। প্রতিটির একটি অঙ্ক ও একটি গর্ভাঙ্ক এই সংখ্যায় প্রকাশিত। শেষে নাট্যপত্রিকা সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে জানানো হয়েছে :—

১। মাসিক পত্রিকা প্রতিমাসে প্রকাশিত হইবে।

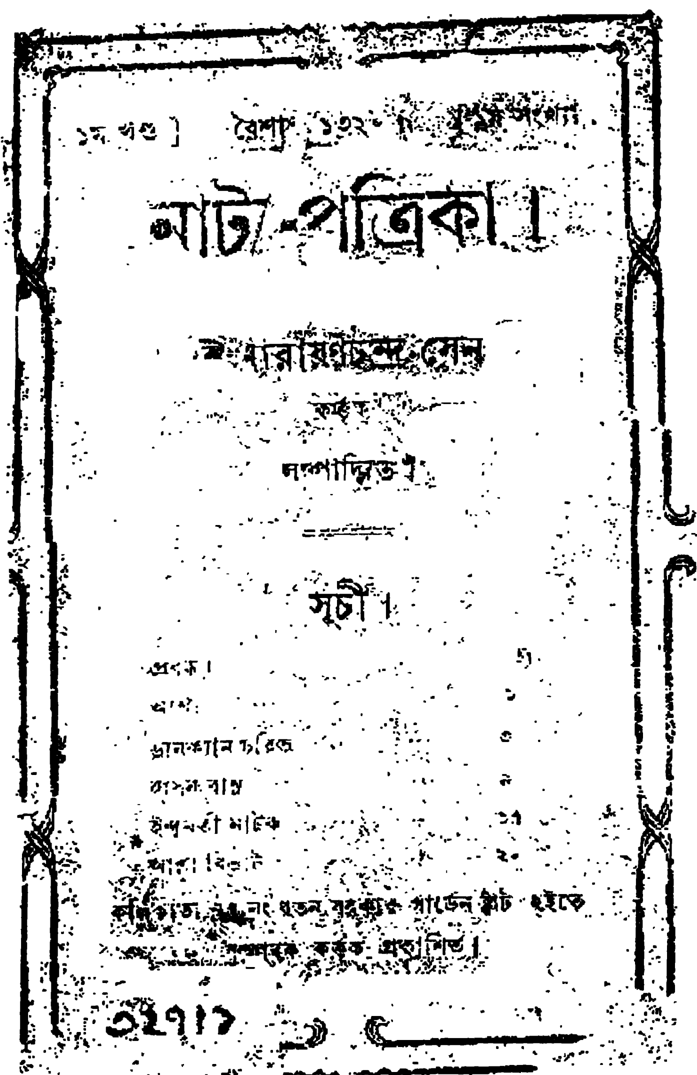
২। পত্রিকার নগৎ মূল্য প্রত্যেক সংখ্যার পাঁচ পয়সা।

৩। অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য কলিকাতা সহরে বার আনা মফঃস্বলে ডাক মাসুল স্বতন্ত্র।

৪। পত্রিকার লভ্যাংশ কাঙ্গালী ভোজনের নিমিত্ত বায়িত হইবে। যদ্যপি কাহারও

অবিশ্বাস হয়, অনুগ্রহ করিয়া ১লা বৈশাখ উপস্থিত থাকিলে, বুঝিতে পারিবেন।

পত্রিকাটির নাম *নাট্যপত্রিকা* হলেও, এটা ঠিক নাটকের পত্রিকা নয়। ব্যক্তিবিশেষের আবেগ থেকে এই পত্রিকার জন্ম। একটির বেশি সংখ্যা বোধহয় প্রকাশিত হয়নি। সমকালের অভিনয়ের সংবাদ, মঞ্চের সংবাদ, অভিনেতাদের বিষয়ে কোনো তথ্যই এই পত্রিকা থেকে জানা যায় না। কোনো নাট্যমঞ্চের সঙ্গেও পত্রিকাটির যোগ ছিলনা।


১ম খণ্ড]

নাট্য-পত্রিকা।

কর্তৃক

সম্পাদিত।

সূচী।

প্রকাশিত।

*নাট্য পত্রিকা*র আখ্যা পত্র

এর বছর পাঁচেক পরে ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয় *নাট্য-প্রতিভা*। পত্রিকাটির আখ্যাপত্রে লেখা থাকত 'বঙ্গীয় নাট্যশাস্ত্রের, নাট্যশালার ও নাট্যকলাবিদ্যার অদ্বিতীয় মাসিক পত্র ও সমালোচনী'। পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—ইনি অমরেন্দ্রনাথের পুত্র, একটি উপন্যাসও লেখেন। সহ সম্পাদক রায়সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত। কার্যালয় ছিল ১৩৯ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট।

নাট্য-প্রতিভা

বঙ্গীয় নাট্যশাস্ত্রের, নাট্যশালার ও নাট্যকলাবিদ্যার অদ্বিতীয়
মাসিক পত্র ও সমালোচনী

প্রথম বর্ষ]　　ফাল্গুন, ১৩২৫।　　[প্রথম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগণেশ-বন্দনা

(১)

সর্ব্ববিঘ্ননিহন্তারং　সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনম্।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতারং　গণেশমনিশং ভজে॥

(২)

প্রপিতামহমারাধ্যং　মাতামহহিমাচলম্।
গণানামধিপং দেবং　গণেশমনিশং ভজে॥

নাট্য-প্রতিভা-র প্রথম সংখ্যার প্রতিলিপি

পত্রিকার সূচনায় হরিচরণ কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ রচিত 'শ্রীশ্রীগণেশ-বন্দনা' স্থান পেয়েছে। পরে সম্পাদকের 'মঙ্গলাচরণ'। যেখানে সম্পাদক জানিয়েছেন—

নটনাথ তব তাত, তুমি তাঁর ঔরস-জাত।
"নাট্য-শাস্ত্র" প্রচারিব এই মন-অভিলাষ।।
পুরুক মনের সাধ, কর দেব আশীর্ব্বাদ।

এর পরেই 'সম্পাদকীয় মন্তব্য'। সেখানে বলা হয়েছে—'অনুগ্রাহক সুধীবর্গের তৃপ্তিসাধনার্থ এবং লোকশিক্ষা ও সমাজের মঙ্গলসাধনার্থ নাট্য-প্রতিভা পত্রিকা জনসাধারণের সম্মুখে অদ্য প্রথম প্রকাশিত হইল।' নবশক্তিতে উন্নত, নবভাবে অনুপ্রাণিত বাঙালির সবই আছে, নেই নাট্য-শাস্ত্রের ও নাট্যশালার উপযুক্ত একটি নাট্যপত্রিকা, এই পত্রিকা সেই সাধ মেটাতে সক্ষম হবে এই আশা নিয়েই পত্রিকাটির আবির্ভাব।

নাট্যশাস্ত্রের বিশ্লেষণ, সাময়িক সাহিত্য আলোচনা, বিদেশীয় রঙ্গালয়সমূহ সংক্রান্ত নানা গল্প, প্রবন্ধ ও চিত্রাদি প্রকাশ করা এবং কলিকাতা ও ভারতবর্ষস্থিত অবৈতনিক ও বৈতনিক নাট্যশালাগুলির পক্ষপাতশূন্য আলোচনা করাই যে পত্রিকার উদ্দেশ্য তাও জানাতে ভোলেননি সম্পাদক।

সম্পাদক আরও জানিয়েছেন, এদেশে সাধারণ বঙ্গালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সমাজের শিক্ষা ও মঙ্গলের জন্য। কিন্তু 'সাধারণ রঙ্গালয়গুলিতে অধুনা যে সকল অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ নাটক, গীতিনাটকাদি অভিনয় হইতেছে, সেই সকল গ্রন্থাবলীর অভিনয় বন্ধ করিবার জন্য আলোচনা ও যত্ন করা...এই কার্য্য সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত কলিকাতার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইবে এবং মধ্যে মধ্যে এই নাট্য-শাস্ত্র-সংবাদ পত্রিকা কার্য্যালয়ে উক্ত কমিটির অধিবেশন হইবে।' নাট্যশালায় অভিনীত অশ্লীল নাটকের অভিনয় বন্ধের পাশাপাশি পত্রিকাটি অন্য একটি গুরুদায়িত্ব বহনের অঙ্গীকারও করে—'এই পত্রিকায়, বঙ্গের সুবিখ্যাত ও মুখোজ্জ্বলকারী মনীষীগণ কর্ত্তৃক লিখিত নানারূপ প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও নাট্য-সমালোচনা প্রকাশিত হইবে। দেশীয়, বিদেশীয় বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিগণের চিত্র প্রকাশিত হইবে। বহু দুর্ল্লভ চিত্রও আমরা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত করিব।' শুধু তাই নয়, পত্রিকাটি যে নিরপেক্ষ থাকবে সে কথাও জানিয়েছেন তিনি—'এই পত্রিকাখানি কোনও নাট্যশালার গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ নহে এবং কোনও নাট্যশালার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে কোন সম্বন্ধেও আবদ্ধ নয়।' পত্রিকাটির প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। এছাড়াও সে সময়ের বহু বরেণ্য ব্যক্তি পত্রিকা প্রকাশে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

প্রথম সংখ্যায় যে লেখাগুলি বেরিয়েছিল সেগুলি হল—

১। প্রার্থনা (কবিতা)	সম্পাদক
২। শ্রীশ্রীগুরু গীতার শ্লোক ও কবিতা	হারাণচন্দ্র রক্ষিত
৩। কবি ও নাট্যকার প্রমথনাথ	সম্পাদক
৪। নিয়তির লিখন (সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত) Truth is stronger than fiction	হারাণচন্দ্র রক্ষিত
৫। নির্ঝরিণী	Tennyson
৬। হাফ আখ্‌ড়াই (ইতিহাস ও উদ্দেশ্য নির্দেশ)	অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু
৭। হৃষীকেশ ও ভারতাশ্রম	প্রিয়নাথ বসু
৮। ভৃত্য (কবিতা)	রবীন্দ্রনাথ রায়
৯। সারা বার্নার্ডের কৃতজ্ঞতা (ক্রমশঃ)	মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়
১০। চিত্র-বিদেশিনী	
১১। অমর-জীবনী (নট, নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্তর ক্রমশঃ প্রকাশ্য জীবনী)	
১২। আমাদের ডায়েরী	

'আমাদের ডায়েরী'তে বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ পাই। যেমন ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়নের 'জয়দেব ও স্বপনে সোহাগ' অভিনীত হওয়ার খবর, অমরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রিয় ভৃত্য গিরিধারীর মৃত্যু সংবাদ। 'অমর লাইব্রেরির' প্রতিষ্ঠার বিবরণের পাশাপাশি জানানো হয়েছে—'নাট্যপ্রতিভার' জানুয়ারী মাস হইতে বর্ষ গণনা হইবার কথা বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, কিন্তু বাঙ্গালা কাগজে ইংরাজী মাসের হিসাব হওয়া ঠিক নয়—এই কথা সকলে বলাতে আমরা বাধ্য হইয়া ও উচিত বিবেচনায় সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ফাল্গুন মাস হইতে বর্ষ গণনা করিলাম...সম্পাদক প্রবর পাঁচকড়িবাবু, রসরাজ অমৃতলাল বাবু, পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকগণের লেখা হস্তগত হইতেছিল না বলিয়া, আমরা প্রথমটা 'যাহা-তাহা' করিয়া বাহির করিতেছিলাম না ; কিন্তু ইহা প্রকাশের জন্য গ্রাহকবর্গের তাগাদার চোটে আমরা ইহা তাড়াতাড়ি প্রকাশিত করিয়া ফেলিলাম ; সেই জন্য ঐ সব খ্যাতনামা লেখকগণের লেখা দিতে পারিলাম না ; আগামী সংখ্যায় উহা দিব।' এছাড়াও এই সংখ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ও অন্যান্য স্থানের অনুষ্ঠানের বিবরণ, ভবানীপুরে থিয়েটার খোলার সংবাদ স্থান পায়।

মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পথ চলা শুরু করলেও, *নাট্যপ্রতিভা* পুরোপুরি নাট্য পত্রিকা নয়। একথা ঠিক, লেখক সূচিতে যাঁদের নাম রয়েছে তাঁরা বেশিরভাগই নাটকের সঙ্গে যুক্ত। পত্রিকায় যে ছবিগুলি স্থান পেয়েছে, সেগুলিও নাটক অভিনয়ের বা নাট্যব্যক্তিত্বের। বলা যায়, পত্রিকাটি মূলত সাহিত্য পত্রিকা, যদিও এর বিশেষ ঝোঁক ছিল নাটকের দিকে। প্রথম সংখ্যাটি ছাড়া পত্রিকাটির আর কোনো সংখ্যা বেরিয়েছিল কিনা সন্দেহ।

নাট্যমন্দির-এর সংস্রব ত্যাগ করার কয়েকমাসের মধ্যে অমরেন্দ্রনাথ আবার একটি নাট্য পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে স্টার থিয়েটার থেকে *থিয়েটার* নামে একটি 'সচিত্র সাপ্তাহিক নাট্য সংবাদপত্র' প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি প্রকাশিত হত প্রতি শুক্রবার। প্রথম পৃষ্ঠায় থাকত শুধুই বিজ্ঞাপন। 'শ্রীরামকৃষ্ণ পদভরসা' করে প্রকাশিত এই পত্রিকায় সম্পাদকের নামেব কোন উল্লেখ নেই। তবে জানা যায় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকাটির প্রকাশ ও পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় অমরেন্দ্রনাথকে ম্যানেজার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

থিয়েটার পত্রিকাটির প্রকাশের বিশেষ একটি কারণ ছিল। অমরেন্দ্রনাথ যখন স্টার থিয়েটারের কার্যভার গ্রহণ করেন, তখন স্টার থিয়েটার থেকে শনি ও রবিবার অভিনয়ের কথা প্রচার করে হাজার হাজার হ্যান্ডবিল বিলি করা হত। অমরেন্দ্রনাথ দেখলেন এই হ্যান্ডবিলের বদলে প্রতি সপ্তাহে যদি একটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে ব্যাপারটা অনেক ভালো হয়। ভাবনাকে কাজে রূপ দিতে বেশি দেরি হয়নি তাঁর। এই পত্রিকা প্রকাশের বিনিময়ে স্টার থিয়েটার থেকে প্রতি সপ্তাহে বেশ কিছু টাকা বিজ্ঞাপন বাবদ তিনি পেতেন। যার ফলে পত্রিকার আর্থিক বুনিয়াদ ছিল দৃঢ়। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় স্টার-এর বিজ্ঞাপন ছেপে, অন্য পৃষ্ঠাগুলিতে নাটক বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনায় ব্যয় করতেন তিনি। প্রতি সপ্তাহে দশ হাজারেরও বেশি (শিরোভাগে লেখা থাকতো 'Guaranteed circulation 15000 copies') *থিয়েটার* ছাপিয়ে বিনামূল্যে তা বিতরণ করা হত। তবে পত্রিকাটি সংগ্রহ করতে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের পরামর্শ দেওয়া হত গ্রাহক হবার। নামমাত্র মূল্যে মাত্র এক টাকায় গ্রাহক করা হত।

প্রকাশের পর পত্রিকাটি নাট্যপ্রেমী জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। শ্রীরামপুর থেকে বসন্তকুমার বসু নামক এক ব্যক্তি একটি চিঠিতে লেখেন—

> আপনার নবপ্রকাশিত 'থিয়েটার' সংবাদপত্র পাঠে প্রীত হইলাম। আমাদের দেশে রঙ্গালয় সম্বন্ধে কোন সংবাদপত্র না থাকায়, রঙ্গালয় সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের রঙ্গালয় সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিবার কোন উপায় ছিল না, এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও রঙ্গালয় সম্বন্ধে স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার উপায় ছিল না। এক্ষণে আপনি উক্ত সংবাদপত্র প্রকাশ করায় উভয়শ্রেণীর লোকের পক্ষে যে বিশেষ সুবিধা হইল তাহা লেখাই বাহুল্য।

স্টার থিয়েটারের বিজ্ঞাপন প্রচার করার পাশাপাশি নাটক, নাট্যাভিনয় ও নাট্যশালার উন্নতি বিধানও ছিল এই পত্রিকার অন্যতম লক্ষ। নট-নটী, নাটক অভিনয়, এবং নাট্যশালা সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ এই পত্রিকায় নিয়মিত পরিবেশিত হত। কোনো কোনো সংখ্যায় উন্নতমানের প্রবন্ধও বেরত। সম্পাদকীয়তে থিয়েটারের বিভিন্ন সমস্যা আলোচিত হত। গল্প কবিতার পাশাপাশি পাঠককে হাস্যরসেরও যোগান দেওয়ার চেষ্টা করা হত।

পত্রিকাটিতে থিয়েটারের আলোচনা ছাড়াও বিভিন্ন জনের চিঠিপত্রও প্রকাশিত হত। ললিতমোহন সিংহ নামক এক ব্যক্তি এই পত্রিকায় প্রেরিত এক পত্রে বর্তমান থিয়েটারকে 'ভাঁড়ের নাচ' বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে দর্শকরা ইচ্ছা করলেই এই 'ভাঁড়ের নাচ' বন্ধ করে দিতে পারেন। মিনার্ভা থিয়েটারে কিছুদিন আগে একটি নাটক দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লেখেন—

> কিছুক্ষণ পরে অভিনয় আরম্ভ হইল। এক একটি দৃশ্যে চার পাঁচ খান করিয়া গান, দেখিলাম তাহাতেও দর্শকবৃন্দ সন্তুষ্ট নন, সেই জন্য এক একখানি গানে দুইবার করিয়া 'ইনকোর' পড়িতে লাগিল এবং শিষ্টাচার বিরুদ্ধ ভাষায় (থিয়েটারে যাহাকে রসিকতা বলে) দর্শকদের পক্ষ হইতে নর্ত্তকীগণেব উদ্দেশ্যে প্রশংসা বর্ষিতে লাগিল তৎপরে একস্থানে পুস্তকের নায়ক কুরুচিপূর্ণ ভাষা, তদপযুক্ত ভাব-ভঙ্গী সহিত ব্যক্ত করিলেন যে তাহা সকলের বড় অশ্রাব্য, অবশ্য পুস্তকে তাহা নাই। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি তাহা শুনিয়া দর্শকবৃন্দ হাসি ও করতালির সহিত তাঁহাকে বাহবা দিতে লাগিল। কেহই এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিলেন না...দেখুন আপনাদের কতদূর অধঃপতন হইয়াছে। একবার ভাবুন দেখি আপনারা সমাজের কি ক্ষতি করিতেছেন।

নাটকের খবর ছাড়াও, অন্যান্য খবরাখবরও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। সাহিত্যের আলোচনাও স্থান পেত। প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় প্রকাশিত হত সমর সংবাদ। আসলে *থিয়েটার* পত্রিকার প্রকাশকালে সারা পৃথিবী হয়ে উঠেছিল উত্তপ্ত। রাষ্ট্রনায়কদের ক্ষমতা লিপ্সার ফলে এই কালে সারা পৃথিবীতে জ্বলে উঠেছিল যুদ্ধের আগুন। নাটকের পত্রিকা হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের এই অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেনি *থিয়েটার*। 'মহাযুদ্ধের মূলতত্ত্ব' নামে একটি লেখা পত্রিকাটিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে।

যে মানুষটি এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেই অমরেন্দ্রনাথের জীবনের মতো এই পত্রিকাটিও (কারণ অমরেন্দ্রনাথ একদিকে লিখছেন 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ'-এর মতো বঙ্গভঙ্গ বিরোধী নাট্যচিত্র, অন্যদিকে তিনিই আবার তৎপর হয়ে উঠছেন রাজভক্তির প্রকাশে) স্ববিরোধী মনোভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। *থিয়েটার*-এ একদিকে বেরোত স্বদেশী দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, অন্যদিকে প্রকাশিত হত 'ন্যায়ের অবতার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধার' সম্রাট পঞ্চম জর্জের প্রশস্তি।

যাই হোক, *থিয়েটার* কখনই প্রথম শ্রেণির পত্রিকা হয়ে উঠতে পারেনি। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের লেখা প্রকাশিত হলেও এই পত্রিকার লেখার মান খুব উন্নত ছিল না। অনেক সময় বোঝাই যেত না ছবিটি কার। মাঝে মাঝে পত্রিকাটিতে ব্যঙ্গচিত্রও ছাপা হত। গিরিশ মেমোরিয়াল ফান্ডের পরিণতিকে ব্যঙ্গ করে যে কার্টুনটি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তা সমকালে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়।

১৭টি সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশের পর পত্রিকাটিতে ভাঁটার টান দেখা দেয়, সপ্তদশ সংখ্যা থেকে স্টারের বিজ্ঞাপন প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। এর পরে *থিয়েটার*-এর আর কোনো সংখ্যা দেখার সুযোগ আমরা পাইনি। এরপর পত্রিকাটিও আর বেশিদিন টিকে ছিল কিনা সন্দেহ।

অমরেন্দ্রনাথের অন্য দুই নাট্যপত্রিকা *রঙ্গালয়* ও *নাট্যমন্দির*-এর প্রকাশ বাঙালি পাঠককে যতখানি আলোড়িত করেছিল, *থিয়েটার* তা করতে পারেনি। লেখায়, রেখায় কিংবা সংবাদ পরিবেশনে অন্য দুটি পত্রিকার সঙ্গে *থিয়েটার* এক আসনে বসার যোগ্য নয়। তবু জীবনের প্রায় শেষ পর্ব পর্যন্ত অমরেন্দ্রনাথ যে নাটক ও নাট্যমঞ্চের উন্নতিকল্পে পত্রিকা প্রকাশ থেকে বিরত হননি—*থিয়েটার* পত্রিকাটি তারই অভ্রান্ত প্রমাণ।

নাচঘর-এর প্রথম সংখ্যা বেরোয় ২৬ বৈশাখ ১৩৩১ বঙ্গাব্দে। সচিত্র এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায় ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। পত্রিকাটির বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটির প্রথম পাতায় থাকত 'রঙ্গরেণু' শীর্ষক লেখা। এই অংশে যে লেখাগুলি প্রকাশিত হয়, সেগুলি হল ক্ষীরোদপ্রসাদের 'গোলকুণ্ডা' অভিনয় আয়োজনের সংবাদ, শিশিরকুমারের 'আলফ্রেডে' জনতা স্রোতের সংবাদ, 'আলমগীর'-এর অভিনয় সাফল্য। *নাচঘর* প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ করেছিল ; গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও মহেন্দ্রলাল বসুর ছবি। প্রথম সংখ্যায় যে লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি হল--'বায়োস্কোপের কথা', 'নৃত্যকলার নতুন প্রস্তাব', 'রঙ্গালয়ের বাইরে', 'চলচ্চিত্রের চলতি কথা', 'নাট্যজগৎ', 'ধোঁয়া নাটক'। আট পৃষ্ঠায় প্রথম সংখ্যা শেষ হয়েছে। পত্রিকায় ঘোষণা করা হয়েছে, 'আসছে হপ্তা থেকে নাচঘরে নিয়মিত অভিনয়-সমালোচনা শুরু হবে।'

নাচঘর-এর নিয়মাবলীতে বলা হয়—

> প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র ইত্যাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধ বা চিঠিপত্র প্রকাশ করা বা না করা সম্পূর্ণ সম্পাদকের ইচ্ছাধীন। প্রবন্ধ অথবা পত্র প্রেরকরা কপি রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেওয়া হইবে না ; চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন।
>
> নাচঘরের মূল্য প্রতি সংখ্যায় নগদ দুই পয়সা। বিজ্ঞাপনের হারের জন্য নাচঘর কর্ম্মসচিবের নিকট আবেদন করিবেন। সমস্ত চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ নাচঘরের অফিসের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

প্রথম সংখ্যা থেকেই পত্রিকাটি বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। তার ফলস্বরূপ ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১-এর ২য় সংখ্যায় পত্রিকাটিকে জানাতে হয় 'কোন দৈনিক পত্রে সাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে যে, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'নাচঘরের' ব্যয়ভার বহন করছেন এবং আমরা নাকি স্টার রঙ্গালয়ের শত্রুপক্ষ। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, 'নাচঘরে'-র সঙ্গে শিশিরবাবুর কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। 'নাচঘরে'-র সত্বাধিকারী হচ্ছেন এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্সের অন্যতম সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার। শিশিরবাবু কেন, কোনো রঙ্গালয়ের সত্বাধিকারীর সঙ্গেই কোনোরূপ আর্থিক সম্বন্ধ রাখা আমাদের চলবে না। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য কোনো রঙ্গালয়ের জন্য দালালি করা নয়—তার দোষ গুণ বিচার করা।

আত্মপক্ষ সমর্থনে আরও বলা হয়েছে—'আমরা যে স্টার রঙ্গালয়ের শত্রু, তার উত্তরে এইটা বল্লেই যথেষ্ট হবে যে 'কর্ণার্জ্জুনের' প্রথম অভিনয়ের পরে আমরা প্রকাশ্যভাবে নাম দিয়ে তার সুখ্যাতিমূলক সমালোচনা করেছিলুম। স্টারের কর্তৃপক্ষ বোধ হয় সে কথা এখনো ভোলেননি। প্রশংসার অবসর পেলে ভবিষ্যতে প্রশংসা করব—সে বিষয়েও আমাদের কোন সংশয় নেই।'

অভিনয় সমালোচনার ক্ষেত্রে পত্রিকাটি কোন পথ অনুসরণ করবে সে সম্পর্কে জানায়—'কলকাতার নট-সমাজের প্রায় অধিকাংশ অভিনেতাই আমাদের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু বা সুপরিচিত। সুতরাং বন্ধুত্বের বা চক্ষুলজ্জার কথা তুললে হয় আমাদের মিথ্যা কথা বলতে হয়, নয় একেবারেই মুখবন্ধ করতে হয়। সেক্ষেত্রে 'নাচঘর' প্রকাশের কোনই সার্থকতা থাকে না। তবু যে আমরা 'নাচঘর' প্রকাশ করছি তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে সত্যকথা বলবার সময়ে আমরা বন্ধুত্বের দোহাই আদোপেই মানব না, তা তিনি আলফ্রেডের শিশিরবাবুই হোন, আর স্টারের অপরেশবাবুই হোন!' এই সংখ্যায় দু-একটি ভালো নাট্যবিষয়ক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'এখনকার থিয়েটার' লেখাটি উল্লেখযোগ্য।

আট পাতার এই সচিত্র পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় সমকালের বিভিন্ন থিয়েটার হলের অভিনয় সম্পর্কিত আলোচনা উঠে আসত 'নাট্য জগৎ' শীর্ষক লেখায়। নাট্যালয় হস্তান্তরের সংবাদও দেওয়া হত। তৃতীয় সংখ্যায় শিশির ভাদুড়ীর মনোমোহন দখল করার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ সংখ্যায় এসেছে 'কর্ণার্জ্জুন', 'মৃণালিনী' ও 'আলমগীর' অভিনয় সংবাদ। *নাচঘর* প্রথম থেকেই শিশির ভাদুড়ীর পত্রিকায় পরিণত হয়েছিল। শিশিরকুমারের সমস্ত সংবাদ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করত পত্রিকাটি। প্রথম সংখ্যার মতো পরবর্তী সংখ্যাগুলোতেও বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্বের ছবি ছাপা হয়েছে।

দশম সংখ্যা থেকে পত্রিকাটির আকার হয় ১২ পৃষ্ঠার। আকার বাড়লেও, পত্রিকার দাম কিন্তু বাড়ানো হয়নি। কিন্তু বেশিদিন এত কম দামে পত্রিকা পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় ১৮ সংখ্যায় ঘোষণা করতে হয়—'আগামী সংখ্যা হইতে ১২ পৃষ্ঠা নাচঘরের তিন পয়সা দাম হইবে।' ২০ অগ্রহায়ণ ১৩৩১-এর ২৮তম সংখ্যায় পত্রিকাটি আবার ঘোষণা করে—'গ্রাহকদের বারংবার অনুরোধে আসছে হপ্তা থেকে 'নাচঘর'-এর দাম আবার দুই পয়সাই ধার্য্য হল। কিন্তু দুই পয়সায় তিন ফর্মা কাগজ দেওয়া অসম্ভব বলে 'নাচঘর'-এর আকারও আবার আগেকার মত দুই ফর্ম্মাই রাখতে বাধ্য হব।' প্রথম দশটি সংখ্যায় পত্রিকাটির চরিত্র পরিষ্কার হয়ে যায়। এটি পুরোপুরি নাট্য বিষয়ক পত্রিকা। বায়োস্কোপ ছাড়া বাইরের অন্যান্য দেশে বাংলা নাটকের অভিনয়ের সংবাদ প্রথম থেকেই প্রকাশ করত পত্রিকাটি। ২৩ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়—'রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উৎসব উপলক্ষ্যে চীনারা কবির 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক সেখানে অভিনয় করেছেন' এমন সংবাদ দেওয়া হয়েছে। 'নাট্যজগৎ'-এর পাশাপাশি 'থিয়েটারি চুটকী' *নাচঘর*-এর অন্যতম আকর্ষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেখানে অন্যান্য থিয়েটারের সংবাদ, নাট্যকারদের নতুন জায়গায় যোগদানের সংবাদ দেওয়া হত। ৬ আষাঢ় সংখ্যায় দানীবাবুর স্টার থিয়েটারে যোগদানের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আমরা আগেই জানিয়েছি সূচনা থেকেই পত্রিকাটি অন্য পত্রিকার সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। ১৩ আষাঢ় সংখ্যায় তার প্রকাশ আবার দেখা যায়—

এম্‌নি-সব কুৎসিত কুৎসা থেকে আমরাও রেহাই পাইনি, প্রতি সপ্তাহেই অভদ্র ভাষায় গালি দিয়ে আমাদের আক্রমণ করা হচ্ছে। কিন্তু 'নাচঘর' যাঁরা প্রথম থেকে পড়ছেন, তাঁরা লক্ষ্য করলে দেখবেন যে, আমরা যথাস্থানে ব্যঙ্গ-কৌতুক করলেও ব্যক্তিগতভাবে অভদ্র গালাগালি আজ পর্য্যন্ত কারুকে দিই নি। গালাগালি দিয়ে যে-সকল মহাত্মা আমাদের পরম আপ্যায়িত করছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। কারণ, তাঁরা আমাদের এত বেশী ভালোবাসেন যে, আমরা তাঁদের কথা ভুলেও না ভাবলেও, আমাদের কথা তাঁরা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।

২ শ্রাবণ ১৩৩১ থেকে পত্রিকাটি চিঠিপত্র ছাপতে শুরু করে। প্রথম চিঠিটি লেখেন জনৈক উপেন্দ্রকুমার মিত্র। *নাচঘর*-এ প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতিবাদ করে পত্রলেখক জানান—

কিন্তু একি শুনি? মিনার্ভার চিতাভস্মের উপর যে প্রকাণ্ড বাড়িটি উঠেছে, সেটি নাকি মিনার্ভা থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারীর হাত ফস্কে কোন্ এক ধনী মহাজনের হাতে গিয়ে উঠবে—যিনি ঐখানে নিজের থিয়েটার চালাবেন। মিনার্ভার সত্ত্বাধিকারী উপেন্দ্রবাবু যে ভাবে নিজের থিয়েটার এবং তার সঙ্গে পুরানো বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আঁকড়ে পড়ে আছেন তাতে তো এ কথা বিশ্বাস হয় না।

পরবর্তীকালেও এই ধরনের প্রতিবাদপত্র প্রকাশ করেছে পত্রিকাটি। এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক অভিনয় সম্পর্কে দিলীপকুমার রায়ের পত্র। নাটকের বিষয় নিয়ে পত্র লিখেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে আরও অনেকে।

রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয়ের সংবাদ বেশ যত্ন নিয়ে পরিবেশিত হত। শুধু তাই নয় বিশ্ববরেণ্য এই মানুষটির মনোমোহনে অভিনয় দেখতে আসার সংবাদও গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হয়েছে : 'গত রবিবার মনোমোহন-নাট্যমন্দিরের পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন। কারণ 'সীতা'র অভিনয়ে সে রাতে পৃথিবীর বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের শুভাগমন হয়েছিল। অভিনয়ের শেষপর্যন্ত না দেখে তিনি আসন ত্যাগ করেননি। অভিনয় যে তাঁর ভালো লেগেছিল, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা প্রকাশ করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা লাভ করা বাঙালী অভিনেতার ভাগ্যে এই প্রথম।' (*নাচঘর* ভাদ্র, ১৩৩১)

আশ্বিন ১৩৩১ সংখ্যায় *নাচঘর* একটি অদ্ভুত বিজ্ঞপ্তি দেয়,—'বাংলা দেশের বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের সহিত তখন যাঁহারা সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন্ তিনজন অভিনেতাকে সাধারণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন তাহা নিরূপিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত ভোট কুপন প্রকাশ করা হইতেছে। পাঠকবর্গ এই কুপনে নিজেদের নির্ব্বাচিত তিনজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার নাম লিখিয়া নাচঘরের কার্য্যালয়ে ফেরৎ পাঠাইলে বাধিত হইব। পূজার সংখ্যা নাচঘরে ইহার ফলাফল বাহির হইবে।'

১৭ আশ্বিন ১৩৩১-এর ২২ সংখ্যায় ফলাফল প্রকাশ করে বলা হয়—'ভোটে যাঁরা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ হয়েছেন আমরা কেবল তাঁদের ভোটের সংখ্যা দি। তৃতীয় ও চতুর্থ খুব কম তফাৎ হওয়ার জন্য চারজনেরই নাম দেওয়া হোলো—

১। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী—২২১১

২। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ—২১৮২

৩। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র—২০৭৪

৪। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী—২০৭০

তারপর যথাক্রমে শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী, মন্মথনাথ পাল, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, রাধিকানন্দ

মুখোপাধ্যায়, কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তারাকুমার ভাদুড়ী, কার্ত্তিকচন্দ্র দে, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রনাথ রায়।'

এই সংখ্যায় সম্পাদক দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছেন—'পূজার সংখ্যায় যাঁদের লেখা পাব ব'লে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলুম, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের তাগাদা সত্ত্বেও যথাসময়ে লেখা দিতে পারলেন না, এজন্যে আমরা লজ্জা অনুভব করছি।' শারদীয় পূজা উপলক্ষে তিন সপ্তাহ *নাচঘর* প্রকাশিত হবে না তাও জানানো হয়েছে।

প্রথম বছরে *নাচঘর* পত্রিকাটি দুই সম্পাদকের দ্বারা অত্যন্ত সফলভাবে চলেছিল। নাট্য জগতের সবদিকে পত্রিকাটির নজর ছিল। অভিনেতাদের সংবাদ, নাটকের সংবাদ, অভিনয়ের সাফল্য ও ব্যর্থতার সংবাদ, অভিনেতাদের থিয়েটার পরিবর্তনেব খবর, বিদেশের অভিনয়, বিদেশের নাটক ও থিয়েটার বিষয়ে প্রবন্ধ সবই প্রকাশ করে *নাচঘর*। এমনকি সমকালে প্রকাশিত অন্য নাট্য পত্রিকার সংবাদও *নাচঘর*-এর পাতায় উঠে এসেছে। যেমন—'শীঘ্রই 'রূপ ও রঙ্গ' নামে আর একখানি থিয়েটারি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হবে। বিজ্ঞাপনে প্রকাশ, 'কাণ্ডজ্ঞানহীন লেখকগণের রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যকলা সম্বন্ধে লেখা পড়িয়া যাঁহারা বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা 'রূপ ও রঙ্গ' পড়লে খুশি হবেন।' আশার কথা! কেননা, পূর্ব্বকথিত থিয়েটারি দৈনিক ও তার বন্ধু সাপ্তাহিকের 'কাণ্ডজ্ঞানহীন লেখকগণে'র অশ্লীল ব্যক্তিগত আক্রমণ বাংলা সাহিত্যকে সত্যই কলঙ্কিত করছে বটে! কিন্তু আমাদের জনৈক বুদ্ধিমান বন্ধু এই আশাজনক বিজ্ঞাপন প'ড়েও খুশি হ'তে পারেননি। তার কারণ তিনি বল্‌লেন যে, 'উক্ত থিয়েটারি দৈনিকের আড্ডা থেকেই যখন এই নব সাপ্তাহিক জন্মলাভ করবে, তখন এর আসল উদ্দেশ্য অত্যন্ত সন্দেহজনক!'—তাই নাকি? এখন আর আমরা কিছু বলব না—'ফলেন পরিচীয়তে।'

সেকালের বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্বরা এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। প্রকাশিত হয়েছিল উল্লেখযোগ্য নাট্য আলোচনা ও প্রবন্ধ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়াও এই পত্রিকায় লিখেছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রপ্রসাদ বাগচী, অমরেন্দ্রনাথ রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মাখনলাল চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র দত্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ।

বহু অপ্রকাশিত নাট্য বিষয়ক রচনা বা নাট্যকারের লেখা কবিতাও প্রকাশ করে পত্রিকাটি। অমৃতলাল মিত্র সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের লেখা, 'তবুও বেঁচে আছি' শীর্ষক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান, *নাচঘর*-এ প্রকাশিত হয়েছিল। নাটক ও অভিনয় ছাড়া অন্য বিষয়ের লেখাও *নাচঘর*-এ বেরোত। যেমন—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাষা ও সঙ্গীত' বা অদ্ভুতচন্দ্র গুপ্তের 'মহা-হিন্দুর হোটেল' শীর্ষক রচনার কথা বলা যেতে পারে।

নাচঘর-সম্পাদক অভিনেতাদের বিষয়ে কত আন্তরিক ছিলেন তার একটা প্রমাণ পাওয়া যায় ২১ কার্তিক ১৩৩১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ঘোষণা থেকে—'এখনকার বাংলা রঙ্গালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যশিক্ষক ও নর্ত্তক শ্রীযুক্ত নৃপেনচন্দ্র বসু দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত আছেন। অবিলম্বে তাঁর রোগমুক্তি কামনা করি।'

দ্বিতীয় বছর থেকে পত্রিকার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সম্পাদক পালটে গেছেন, নতুন সম্পাদক হয়েছেন নলিনীমোহন রায়চৌধুরী। আকারে অনেক ছোটো হয়ে গেছে পত্রিকাটি। পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকেনি। এই বছরের প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬, আবার দ্বিতীয় সংখ্যার ১৮। আখ্যাপত্রে শুধু ছবি, কোনো লেখা আগের মতো প্রথম পৃষ্ঠায় থাকত না। দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় বাঙালি অভিনেত্রীর চিত্র প্রথম ছাপা হয় *নাচঘর*-এ। ছবিটি তারাসুন্দরীর। নিচে লেখা 'জগতের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী'। প্রকাশনা স্থল পালটে গেছে, এই সংখ্যা থেকে প্রকাশনা স্থল হয়েছে '২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা'।

এই কালে পত্রিকাটি 'ডাকঘর'-এর পাশাপাশি 'রংমহল' নামে নতুন বিভাগ শুরু করে। অর্থাৎ 'নাট্য-জগৎ', 'রঙ্গরেণু'র পর 'রংমহল'। এখানে নাটক বিষয়ক সংবাদই আলোচিত হত। এক সময়ের জনপ্রিয় অভিনেতাদের পরিণতি কত করুণ হত সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে ২২ মাঘ ১৩৩২-এর রংমহলে—'জনপ্রিয়তা হারালে পুরাতন নটেরা যে কত মুস্কিলে পড়েন, শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মিত্র প্রভৃতির বেকার জীবনই তার প্রমাণ! অথচ এমন দিন গিয়েছে, এদের অভিনয়ে যেদিন বাঙ্গালী দর্শকেরা একবাক্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত।'

'নাট্যজগৎ' শীর্ষক লেখায় আগের মতোই ধারালো ভাবে অভিনয়ের সমালোচনা, সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। সেকালের অভিনেত্রীদের কণ্ঠে সঙ্গীতের বিষয়ে মত প্রকাশ করে বলা হয়েছে—'অভিনেত্রীরা অধিকাংশই অশিক্ষিতা বা অল্প শিক্ষিতা বলে তাঁরা সমস্ত গান গাইতে শেখেন, অনেক সময় তার অর্থ না বুঝেই শেখেন, সুতরাং গানে ভাব ও ভাষাকে অবহেলা করে কেবল শূন্য সুরটুকু অবলম্বন করে দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টায় শক্তিক্ষয় করেন মাত্র।' দর্শকের রুচির পরিবর্তনের বিষয়টিও 'নাট্যজগৎ'-এর চোখে ধরা পড়েছিল।—

> নাট্যকারদের মনে রাখতে হবে যে এটা আর 'পঞ্চাঙ্ক' নাটকের যুগ নয়। রাত্রির একটার বেশি অভিনয় করলে এখন রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের এখানে জরিমানা দিতে হয়।

দ্বিতীয় বছরে লেখকসূচিতেও দেখা গেছে পরিবর্তন। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের মতো কিছু পুরনো লেখকের পাশাপাশি এসেছেন গিরিজাকুমার বসু, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, সুধাংশুকুমার গুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, দিলীপকুমার রায়, অরুণকুমার রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মন্মথনাথ সরকার, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, প্রোফেসর জে. চৌধুরীর মতো নতুন নাম। লেখার বিষয় বেশিরভাগই ছিল নাটক। স্বদেশি ও বিদেশি দুই ধরনের নাট্যবিষয়ক আলোচনাই এখানে স্থান পেয়েছে। 'বাঙলা নাট্য-সাহিত্যে সীতা', 'ভারতে নাট্যের উৎপত্তি', 'শিশিরকুমার ও অভিনয় শিল্পে Production', 'থিয়েটারের জন্মকথা', 'ভারতের নাট্যকলা ও রচনা-পদ্ধতি'র মতো আলোচনার সঙ্গে 'এলিজাবেথের যুগে ইংলণ্ডের রঙ্গালয়', 'ফ্যান্টোমস' শীর্ষক বিদেশি নাট্য বিষয়ক আলোচনাও পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

সমকালের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ভুল সংশোধনের চেষ্টা করতো *নাচঘর, আনন্দবাজার পত্রিকা*-র একটি ভুল সংশোধন করে ২৭ কার্তিক ১৩৩২ সংখ্যার *নাচঘর* লেখে—'আনন্দবাজার পত্রিকা সংবাদ দিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিসর্জ্জন' এবং 'রাজা ও রাণী' নাটক দু'খানিকে একত্র ক'রে একখানি নূতন নাটক প্রণয়ন করেছেন। সংবাদটি সম্পূর্ণ ভুল না

হলেও আংশিক ভুল নিশ্চয়। কারণ 'বিসর্জ্জন' নাটক ও 'রাজর্ষি' উপন্যাস একত্র হয়ে একখানি নূতন নাটক নাট্যমন্দিরের জন্য রচিত হয়েছে বটে—কিন্তু 'রাজারাণীর' সঙ্গে তার কোনও সম্বন্ধ নেই। আমরা শুনলেম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-সুর-ভাণ্ডারী দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত নাটকখানির সঙ্গীতগুলিতে সুর সংযোজন করে দিয়েছেন।' শুধু ভুল সংশোধন নয়, সমকালের অন্য নাট্যপত্রিকাকে প্রয়োজনে ব্যঙ্গ করতেও ছাড়েনি *নাচঘর*। দ্বিতীয় বর্ষের ১৫ সংখ্যা থেকে একটু নমুনা দেওয়া যাক—

'একখানি সংবাদপত্রে 'বঙ্গ-ইঙ্গ-নট' শীর্ষক একটি ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, সেটাও সর্ব্বজনপ্রিয় অভিনেতা শিশিরবাবুকে লক্ষ্য করে। সে কবিতাটা আবার ততোধিক জঘন্য। 'রঙ্গদর্শন' ভুঁইফোড় কাগজখানি এ যুগের অভিনেতাদের নিয়ে নাস্তানাবুদ ক'রে তুলেছে।' ৩০ সংখ্যায় 'গর্দ্দভের আত্মপ্রকাশ' শীর্ষক চিঠিতে একই পত্রিকাকে অন্যভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে-- 'রূপকথায় শুনিয়াছি, কোন এক ব্যাঙ মনে করিয়াছিল, সে হাতী। এই ফাঁকে ফুলিয়া উঠিয়া, হাতীর মতন বড় হইতে গিয়া শেষটা সে বেচারী ফাটিয়া মারা পড়িয়াছিল। 'রঙ্গদর্শন' নামে একখানা কাগজের সম্পাদকের অবস্থা হইয়াছে অনেকটা সেইরূপ। এই ব্যক্তি সর্বদাই মনে করিতেছে, বাঙ্গালা দেশের নূতন সম্প্রদায়ের অভিনেতারা তাহার মরিচা পড়া কলমের খোঁচায় তটস্থ,--কিংবা বাসায় গিয়া মরিয়া ভূত হইয়া আছে! কিন্তু আমরা বলি, বৎস নিজের সংকীর্ণ বৈঠকখানায় বসিয়া নিজেকে 'মস্ত সাগর' মনে করিয়া স্ফীত হইয়া কোনই লাভ নাই--যে হেতু তাহার ফলেই একদা ভেকের অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল! "সোনা রূপো নয় বাপ্পা, এ বেঙ্গা পিতল!"

নাচঘর-এর তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩-এ। তৃতীয় বছরে বিজ্ঞাপনের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। এই বছরের তৃতীয় সংখ্যা থেকে জানা যাচ্ছে, 'আপাততঃ সহরে চল্‌তি রঙ্গালয় আছে তিনটি এবং ঐ তিন রঙ্গালয়ই এখন দু'একখানি করে সাপ্তাহিক পত্রের অধিকারী হয়েছেন—আপন আপন ঢাক স্বহস্তে বাজিয়ে লোকের কানে তালা ধরিয়ে দেবার জন্যে মন্দ কি?'

এইকালে *নাচঘর* 'বঙ্গ রঙ্গালয়'-কেও ছাড়েনি। এই পত্রিকা সম্পর্কে তাদের মন্তব্য--'বঙ্গ রঙ্গালয়'কে আমরা রঙ্গালয়-বিশেষের বিজ্ঞাপন-পত্র ব'লে আগেই প্রমাণিত করেছি। কিন্তু এমন হাটের মাঝে মুখোস খুলে দেওয়াতে 'বঙ্গ রঙ্গালয়' মোটেই খুসি হতে পারেন নি এবং তাই নিয়ে আবোল-তাবোল যা খুশি তাই প্রলাপ বকছেন. কারণ 'বচনে কো দরিদ্রঃ!' অত বেশি প্রলাপের উত্তর দেবার মত ধৈর্য্য আমাদের নেই। তবে আর এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কেবল আমরাই নই, 'আত্মশক্তি' ও 'বিজলী' প্রভৃতি যে সব কাগজ আমাদের মতো কোন সম্প্রদায়-বিশেষের মুখপত্র নন, তাঁরাও প্রথম দর্শনেই ধরে ফেলেছেন, কোন 'নব-গৃহ'র মধ্যে 'বঙ্গ-রঙ্গালয়' প্রথম-ট্যাঁ করে উঠেছে।'

লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত 'নাট্যমঞ্চে নবযুগ' প্রবন্ধ নিয়েও *নাচঘর* বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। সেখানে—'শিশিরকুমারকে যথার্থ প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা বলে স্বীকার করতে আমরা রাজী নই' বলে তাদের মতে 'আমাদের মতে বর্ত্তমান যুগের অভিনেতা হচ্ছেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী' বলায় *নাচঘর* ব্যঙ্গ করে লেখে 'লেখা'র প্রবন্ধ লেখকটি একস্থানে বলেছেন যে 'কণ্ঠস্বর অভিনয়ের একটা খুব বড় জিনিস নয়।' এ একটা নূতন রকম আবিষ্কার বটে! এর কারণ বোধ হয় এই যে অহীন্দ্রবাবুর কণ্ঠস্বর মোটেই সুমিষ্ট নয়।'

আরও বলা হয়েছে 'মিনার্ভার বৈতালিক' *বঙ্গ রঙ্গালয়*-এর মুখোস খুলে দেওয়াতে বেচারারা আমাদের উপর একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। তা হবারই কথা। রঙ্গালয় সম্পর্কীয় নিরপেক্ষ সংবাদপত্র সেজে বেচারারা আসর জমাবে ভেবেছিল কিন্তু তাদের চূণকালির রংটা সর্ব্বসাধারণের চোখের সামনে ধরিয়ে দেওয়াতে তারা যে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়বে এটা খুবই স্বাভাবিক।' শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিও যে অভিনয়ের দাবি রাখে তাও *নাচঘর* বলে—'আজ শরৎচন্দ্রের প্রত্যেক বইখানিও তেমনি এ যুগের রঙ্গমঞ্চে নাটকাকারে রূপান্তরিত হয়ে অভিনীত হওয়া উচিত...বহুবাজারের আনন্দ পরিষদ 'চন্দ্রনাথ' 'দেবদাস' 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি একে একে অভিনয় করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে এগুলির অভিনয় কত ভাল হ'তে পারে।'

তৃতীয় বছরে এসে *নাচঘর*-এর গুণমান অনেক নেমে যায়। এইকালে ভালো নাটকের আলোচনা প্রায় প্রকাশিতই হয়নি। ক্ষীরোদকুমার শর্ম্মার 'নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী ও আধুনিক নাট্যকলা' অথবা বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্যের 'নাট্যরচনা ও নাট্যকার' ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো লেখা চোখে পড়েনি। তাই যদিও *নাচঘর* আরও বহুবছর চলছিল এবং ঘটেছিল সম্পাদকের পরিবর্তন—কিন্তু প্রথম দু-বছরের ঐতিহ্য পত্রিকাটি সেভাবে ধরে রাখতে পারেনি।

১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১৮ আশ্বিন *রূপ ও রঙ্গ* নামে একটি সচিত্র নাট্যবিষয়ক পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সূচনায় 'আশীর্ব্বচন'-এ দেবেন্দ্রনাথ বসু লেখেন,

> মানুষ মাত্রেই রূপ ও রঙ্গ প্রিয়। তাই আশাকরি, 'রূপ ও রঙ্গ' সাধারণের আদরের সামগ্রী হইবে।...যে অতীন্দ্রিয় রূপের লীলাবিলাস নর-নারী-হৃদয়ে বিচিত্রভাবে মূর্ত্ত হইয়াছে, যাহা তাহাদের কথায়, কাজে, ইঙ্গিতে, ভঙ্গিতে প্রতিক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে ; কাব্য যাহার প্রতিচ্ছবি, কবির যাহা কল্পনা, রূপজীবী অভিনেতা অভিনয়-রঙ্গে যাহাকে মূর্ত্তি দান করেন, সেই রূপ ও রঙ্গই এই পত্রিকার আলোচ্য বিষয়। রস-সাহিত্য ও ললিতকলার যাহা লক্ষ্য, সৎ-সাহিত্যের সৃষ্টি, পুষ্টি, বিকাশ ও বিস্তার কল্পে যাহা প্রযোজ্য বা পরিহার্য্য, আশাকরি, এ পত্রিকার প্রচারে তাহার অণুমাত্র ত্রুটি হইবে না।

রূপ ও রঙ্গ যে শুধু নাটকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না সে কথাও এই অংশে জানানো হয়েছে—'একই বৃক্ষ শাখায় প্রশাখায় যেমন বহুপ্রসারী একমাত্র লক্ষ্য লইয়া এই পত্রিকাও তেমনি বহুমুখী, সুতরাং পূর্ব্বাহ্নে ইহার আলোচ্য বিষয় সকল লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব।' কিন্তু ভদ্র রুচির বহির্ভূত, অন্যায়, অসংযত অপভাষ পত্রিকার পাতায় স্থান পাবে না বলে জানানো হয়।

চব্বিশ পৃষ্ঠায় পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা শেষ হয়েছে। পত্রিকাটির বেশির ভাগ লেখাই ছিল নাট্য বিষয়ক। লেখকরাও ছিলেন নাটকের সঙ্গে যুক্ত। 'পুরাতন ফাইলের একখানি পাতা' শীর্ষক নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধটি লেখেন অমৃতলাল বসু। পত্রিকার অন্য লেখক ও লেখার সূচি এইরকম। 'আজকের নাটক'—শ্রীমধুপ, 'শিক্ষাদানে—অর্দ্ধেন্দু'—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'কবি-ব্যাধি'—জলধর সেন, 'রূপ'—ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'গিরিশচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনা', হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের—'রঙ্গমঞ্চে প্রথম বাঙ্গালা অভিনয়', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ লেখেন 'রূপ ও রঙ্গ' বিষয়ে প্রবন্ধ, সেই সময়ের বিখ্যাত লেখক ও সম্পাদক অমরেন্দ্রনাথ রায় লেখেন 'যাত্রার কথা'। শেষ লেখাটি একটি গল্প। গল্পের নাম 'অভিনেত্রী', লেখক ফণীন্দ্রনাথ পাল।

পত্রিকাটি যে নাট্যপত্রিকা তার প্রমাণ প্রথম সংখ্যার একটি ঘোষণা থেকে মেলে—

'যাঁহাদের উদ্যোগে, ত্যাগশীলতায় ও প্রতিভায় বাঙ্গালার সাধারণ রঙ্গশালা রূপ ও প্রাণ পাইয়াছিল, তাঁহাদিগের চিত্র আমরা 'রূপ ও রঙ্গে'র পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। ইঁহাদের জীবনী ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।' গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্ম্মদাস সুর, অমৃতলাল বসুর ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়। এছাড়া বাংলায় পার্শি থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা জামশেদজী ফ্রামজী ম্যাডান-এর ছবিও ছেপেছিল পত্রিকাটি।

পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৮ কার্ত্তিক ১৩৩১ বঙ্গাব্দে। দ্বিতীয় সংখ্যার প্রথম লেখাটি অমরেন্দ্রনাথ রায়ের 'রঙ্গালয় আলোচনা'। মোট ৮টি লেখা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের দুটি লেখা—'গিরিশচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনা' এবং 'সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গীয় রামতারণ সান্যাল'। দু-একটি গবেষণাধর্মী লেখাও এই সংখ্যায় স্থান পায়, সেগুলি হল হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'অভিনয় আইন বা Dramatic Performance Act' এবং শ্রীপদ মুখোপাধ্যায়ের 'স্বাধীন ও পরাধীন দেশের নাট্যকার'। সংখ্যাটি শুরু হয়েছে গিরিশ ঘোষের রঙিন ছবি দিয়ে। তাছাড়া দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মহেন্দ্রলাল বসু, এবং নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিও এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'নব-বুদ্ধ' নামে একটি রঙ্গনাট্যও প্রকাশিত হয়, লেখকের নাম সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রূপ ও রঙ্গ পত্রিকায় শুধু বাংলা বা ভারতীয় নাটক বা অভিনয়ের সংবাদই প্রকাশিত হত না, বিদেশি নট ও নাটকের সংবাদও পরিবেশিত হত। যেমন ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে শ্রীমধুপের লেখা 'রাশিয়ার নট ও নাটক'।

পত্রিকাটি কোনো বিজ্ঞাপন ছাপত না, তবে নাটক অভিনয়ের কিছু কিছু খবর প্রকাশিত হত। অভিনেত্রীদের সম্পর্কে লেখা প্রকাশ করেছিল পত্রিকাটি। যেমন 'স্বর্গীয় সুশীলাবালা', প্রভৃতি। 'চন্দ্রশেখর উপন্যাসের নাট্যরূপ', 'পল্লীপথ' শীর্ষক লেখাগুলিও উল্লেখযোগ্য। মহিলা লেখকের সংখ্যাও কম ছিল না পত্রিকাটিতে। বিনোদিনীর 'আমার অভিনেত্রী জীবন', খুরসিদ জাঁহা বেগমের 'ভাবের অভিনেত্রী', প্রভাবতীদেবী গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রূপ ও রঙ্গ' প্রভৃতি লেখাগুলি নাটকের সঙ্গে সম্পর্কিত। নাটকের বাইরে সুমতি দেবীর 'কবির প্রেম' ও রাধারাণী দত্তের 'নারীর ভালোবাসা', সফিয়া খাতুনের 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' বিষয়ক অন্য ধরনের লেখাও প্রকাশ করে পত্রিকাটি। প্রবন্ধ লেখার পাশাপাশি মহিলারা কবিতা ও চিঠিপত্র লিখতেন এই পত্রিকার পাতায়।

বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লেখা *রূপ ও রঙ্গ*-এ প্রকাশিত হয়। যেমন অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাঙ্গালার রঙ্গভূমি'। রবীন্দ্রনাথের লেখাটি অবশ্য নূতন নয়, *প্রবাসী* থেকে পুনর্মুদ্রিত।

পরবর্তীকালে পত্রিকাটিতে লেখার সংখ্যা কমতে থাকে। আয়তনও কিছুটা হ্রাস পায়। বছরের শেষের দিকে আবার আয়তন কিছুটা বৃদ্ধি পায়, তবে নাটকের তুলনায় অন্য বিষয়ের লেখার সংখ্যা বাড়তে থাকে। শেষের দিকে পত্রিকাটি 'বহুমুখী' হয়ে পড়ে।

শেষদিকে পত্রিকাটিতে নাট্যপ্রসঙ্গে একেবারেই গুরুত্ব পেত না। যা প্রকাশিত হয়েছিল নাট্যজগৎকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ নিয়ে, শেষপর্যন্ত তা পরিণত হলো পাঁচমিশেলি এক সাময়িকপত্রে।

কলকাতা থেকে *রঙ্গদর্শন* নামে একটি পত্রিকা বেরোয় ১৩৩২-এর শ্রাবণ মাসে।

পাঁচমিশেলি এই পত্রিকার অনেকটা অংশ জুড়ে থাকত 'রঙ্গালয় প্রসঙ্গ'। পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন অমরেন্দ্রনাথ রায়। পত্রিকার প্রথম পর্বের কোনও সংখ্যা দেখার সুযোগ আমরা পাইনি।

দ্বিতীয় পর্বের প্রথম সংখ্যায় একটি হালকা রঙ্গনাট্য শ্রীপদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'হিড়িম্বার প্রেম', এবং 'জাতীয় রঙ্গভূমির অভিনয়' শিরোনামে 'জামাই বারিক' অভিনয়ের আলোচনা ও ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালী' নাটক অভিনয়ের বিজ্ঞাপন ছাড়া রঙ্গালয় প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। আসলে *রঙ্গদর্শন* নাটক ছাড়া অন্য প্রসঙ্গেও যথেষ্ট উৎসাহী ছিল। 'রঙ্গালয় প্রসঙ্গ' অংশে অভিনেতা, অভিনয়ের সংবাদ, থিয়েটারগুলির নতুন নাটকের প্রস্তুতি সংবাদ, অভিনেতার অন্য থিয়েটারে যোগদান, নাট্যবিষয়ক অন্য পত্রিকা, থিয়েটার ও অভিনেতাদের নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ সবই স্থান পেত। এই ধরনের খবরের একটু নমুনা--

''দুর্গেশনন্দিনী' মিত্র থিয়েটারের লোভ বাড়াইয়া দিয়াছে। শুনিতেছি, শীঘ্রই তাঁহারা কৃষ্ণকান্তের উইল লইয়া আসরে নামিবেন। ভ্রমর--সেই কুসুমকুমারী, রোহিণী,--তারাসুন্দরী ; আর চাই কি? 'কৃষ্ণকান্ত'-ও নাকি চমকাইয়া দিবে! বঙ্কিমচন্দ্রেরই দেখিতেছি জয়-জয়কার। লালবাতি জ্বালা রবীন্দ্রের যুগে এটা কিন্তু মোটেই মানাইতেছে না।' (*বঙ্গদর্শন*, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা)

নাটক সম্পর্কে খুব বেশি না হলেও উল্লেখ করার মতো লেখা এখানে দু-চারটি বেরিয়েছে। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী সুকুমারী দত্ত' লেখাটির কথা প্রসঙ্গত মনে পড়ে।

*নটরাজ** নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাট্য সাপ্তাহিক কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ৫ ফাল্গুন, বুধবার। পত্রিকাটির উপরে লেখা থাকত 'সচিত্র' তার নিচে সম্পাদক-- শ্রীব্যোমকেশ রায়চৌধুরী বি. এ। পত্রিকাটির বার্ষিক মূল্য সদরে বারো আনা, মফস্‌সলে দেড় টাকা এবং দৈনিক মূল্য এক পয়সা ধার্য হয়। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠা সংখ্যা আট। প্রথম দুটি লেখা গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে। 'নাট্যজগৎ' শীর্ষক লেখায় থিয়েটারের অভিনয় সমালোচনা পাই। শেষ পাতায় স্টার ও অন্যান্য থিয়েটারের বিজ্ঞাপন। পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২ ফাল্গুন ১৩৩২-এ। এবার পত্রিকাটির প্রচ্ছদে ছাপা হয় বিনোদিনীর ছবি। 'নটরাজের বৈঠক' শীর্ষক লেখা-য় থাকত নানা ধরনের খবরাখবর।

এই ধরনের খবরের সামান্য নমুনা দেওয়া যাক--

> প্রথম বাংলা নাটক--কলকাতায় প্রথম নাটক কি আর কবে অভিনীত হয়েছিল, এ সংবাদ অনেকেই জানেন না। প্রথম বাংলা নাটক অভিনীত হয় ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে। নাটকখানির নাম 'ছদ্মবেশ'। লেবেদেফ নামক একজন রুষীয় ভদ্রলোক প্রণীত ইংরাজী নাটক Disguise-এর বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক গোলকনাথ দাস। মাত্র দুই রাত্রি নাটকখানি অভিনীত হয়েছিল। অনেকে শুনে আশ্চর্য্য হবেন এই নাটকে চরিত্রগুলি স্ত্রীলোক দ্বারাই অভিনীত হয়েছিল।

এই সময় মনোমোহন থিয়েটারের সঙ্গে স্টারের সম্পর্ক ভালো ছিল না। পত্রিকাটির বৈঠকের আলোচনায় তার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।--'কাশীধামে অভিনয় করে ভাদুড়ী সম্প্রদায় গত শুক্রবার শহরে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। এলাহাবাদ বা কাশীধামে বিশেষ সুবিধা

* 'বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী' (১৯১৫-১৯৩০) গ্রন্থে গীতা চট্টোপাধ্যায় পত্রিকাটির প্রকাশকাল ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ এবং সম্পাদক হিসেবে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাম করেছেন।

হয় নাই। বাজারে গুজব এবার ভাদুড়ী সম্প্রদায় পূর্ব্ববঙ্গে যাইবেন। মনোমোহন থিয়েটারের সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হতে এখন বোধ হয় বিলম্ব আছে তাই বিক্রমপুর যাবার ব্যবস্থা মন্দ নয়। মিত্র সম্প্রদায় শ্রীদুর্গা বলে ঝুলে পড়লেন। অপরেশচন্দ্রের কর্ণার্জ্জুন বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চে পৌরাণিক নাটক দিয়ে আরম্ভ করতে হবে। হায় নির্মলেন্দু, মহারাষ্ট্র না করে যদি পৌরাণিক একটা কিছু করতে তবে বোধ হয় তোমাকে এ সম্প্রদায়ে যোগ দিতে হতো না--বরাৎ।' শুধু মনোমোহন থিয়েটার নয়, এই অংশে আরো বলা হয়েছে 'শিশির যেভাবে নিজের ঢাক পিটোচ্ছে সে ভাবে ঢুলিও নিজের ঢাক পিটোয় না।'

দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর লেখা 'মাটির মানিক' লেখাটি ধারাবাহিকভাবে বেরোতে থাকে। এই সংখ্যার শেষে স্টারের বিজ্ঞাপন ও চাণক্যের ভূমিকায় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের ছবি। পত্রিকাটির তৃতীয় সংখ্যা থেকে নটরাজের ছবি ছাপা হতে থাকে। পঞ্চম সংখ্যা থেকে পত্রিকাটিতে নাটকের আলোচনায় আরও একটা বিষয় সংযুক্ত হয়-- নাম 'রঙ্গ জগৎ'। এখানে বিদেশি নাটক ও রঙ্গালয়ের আলোচনা প্রকাশিত হত। পত্রিকাটিতে শুধু মাত্র স্টারের অভিনয় সংবাদই নয়, অন্য থিয়েটারের অভিনয়ের সংবাদও মাঝে মাঝে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হত। যেমন ষষ্ঠ সংখ্যায় স্টারে অহীন্দ্র চৌধুরী ও কৃষ্ণভামিনী অভিনীত বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখরের সংবাদ' পরিবেশিত হয়েছে, আবার মিনার্ভায় 'বাঙ্গালী' অভিনয়ের আলোচনাও বিস্তৃতভাবে করা হয়েছে। একাদশ সংখ্যা থেকে পত্রিকাটির আখ্যাপত্র পালটে যায়। সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২২ বৈশাখ ১৩৩৩। এই মাসে পত্রিকাটির মূল্যবৃদ্ধি করা হয়। ১ম বর্ষের ১৫ সংখ্যা থেকে পত্রিকাটির প্রকাশের দিনও পালটে যায়। বুধবারের পরিবর্তে পত্রিকাটি বৃহস্পতিবার বেরোতে থাকে। পত্রিকাটির ১৭ এবং ১৮ সংখ্যায় বিভিন্ন নাট্যভূমিকায় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ বা দানীবাবুর ছবি। 'নটরাজের বৈঠক' ও 'রঙমহল'-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয় 'দেশী বিলেতী' শীর্ষক লেখা।

সাপ্তাহিক এই নাট্যপত্রিকার বেশিরভাগ সংখ্যা হারিয়ে গেছে। কিছু ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও কয়েকটি গ্রন্থাগারে খুব অল্প কয়েকটি সংখ্যার সন্ধান মেলে। সবদিক থেকেই এটি হয়ে উঠেছিল নাটকের পত্রিকা। অভিনয়ের সংবাদ, অভিনয়ের ছবি, রঙমহলের খবর, অভিনেতার সংবাদ সবই স্থান পেত পত্রিকাটিতে। নাট্যবিষয়ক বেশ কিছু ভালো লেখা প্রকাশ করেছিল *নটরাজ*। তবে এটি যে স্টার থিয়েটার ঘেঁষা পত্রিকা ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে *বঙ্গ-রঙ্গালয়* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ পায়। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি বেরোয় বৈশাখী পূর্ণিমার দিন। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ। নগদ মূল্য ১ পয়সা এবং বার্ষিক দেড় টাকা। পত্রিকাটি প্রতি শুক্রবারে বেরোত। পত্রিকাটির আখ্যাপত্রে গিরিশচন্দ্রের একটি উক্তি ব্যবহৃত--'রঙ্গমঞ্চ হইতে অনেক কুরীতির প্রতি দর্শকের ঘৃণার উদ্রেক করা যায়, অনেক কদাচারী দমিত হয় ; নীতিশিক্ষা, রাজনৈতিক শিক্ষা, রঙ্গমঞ্চ হইতে দেওয়া যায়। রঙ্গমঞ্চের কার্য্য--দেশের কার্য্য।' প্রথম সংখ্যায় 'নিবেদন'-এ সম্পাদক পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানিয়েছেন--

> নটনাথের নাম স্মরণ করিয়া 'বঙ্গরঙ্গালয়' নামে এই সাপ্তাহিক পত্র আমরা প্রকাশ করিলাম। বলিয়া রাখা ভালো অত্যন্ত প্রয়োজন বোধেই এই সাপ্তাহিকের আজ আবির্ভাব। রঙ্গালয় প্রসঙ্গ কথায় পূর্ণ পত্রিকা বাঙ্গালা ভাষায় যে একখানিও নাই, অবশ্য এমন কথা বলি না। একখানি কেন দুই বা ততোধিক কাগজও আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইসব কাগজ, রঙ্গালয়ের বিশেষ মুখপত্র স্বরূপ হইয়া তাহার নিজ স্তুতি ও অন্য থিয়েটারের নিজ নিন্দা কার্য্যে নিযুক্ত থাকে।...যাহারা গিরিশ অর্দ্ধেন্দুকে কখনো

চোখে দেখে নাই, তাহারাই আজকাল রঙ্গালয়ের সমালোচক।...যাঁহারা সত্যই অভিনয়ের ও অভিনয়ে কাব্যের আকৃতির ও প্রকৃতির প্রকৃত গঠন দিয়া বাঙ্গালার নাট্য-জগতে নবযুগ আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথাই 'বঙ্গ রঙ্গালয়' বিশেষ করিয়া বলিবে। অতীতকে ভালো করিয়া না জানিলে বর্ত্তমান উন্নতির দিকে যাইতেছে কি অধঃপতনের পথে যাইতেছে তাহার বিচার ঠিকমতো হয় না--হইতেও পারে না। 'বঙ্গ-রঙ্গালয়' অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সম্বন্ধ সূত্র ধরিয়া আমাদের দেশের রঙ্গালয়ের বিচার বিশ্লেষণ করিবে। কাহারও খাতিরে পড়িয়া বা কাহারও মুখ তাকাইয়া সে সত্য কথা প্রচার করিতে কখনও সংকোচ বোধ করিবে না। যদি 'বঙ্গ-রঙ্গালয়ে'র জীবনে কখনও সে দুর্ব্বলতা আসে, যদি সত্যই সে কোনও সময় সত্য বলিতে ভয় পায়, তবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কবি যে, সেই দিনই যেন তাহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।

প্রথম সংখ্যায় শ্রীপদ মুখোপাধ্যায়ের 'আধুনিক রঙ্গ সমালোচনার আকৃতি ও প্রকৃতি' লেখাটি ছাড়াও 'রঙ্গালয়' নামে একটি লেখা স্থান পায়। এতে বিভিন্ন থিয়েটারের অভিনয় সংবাদ পরিবেশিত। মুখে নিরপেক্ষতার কথা বললেও, পত্রিকাটি প্রথম সংখ্যাতেই ভাদুড়ী সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েনি--

সৌর বৈশাখ চলিয়া গেল, সৌর জ্যৈষ্ঠও যায় যায় কিন্তু ভাদুড়ী কোম্পানীর সাড়া শব্দ পাওয়া যাইতেছে না। আর্টহীন যুগে ছাপার অক্ষরে প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রতিশ্রুতি রাখিতে না পারিলে অধিকারীরা অপ্রস্তুত বোধ করিতেন এবং অযাচিত ভাবে জনসাধারণকে তাহারা একটা কৈফিয়ৎ দিতেন। কিন্তু আর্ট যুগে প্রতিশ্রুতির মূল্য কিছুই নাই, নতুবা বৈশাখ পার হইলেই ভাদুড়ী কোম্পানীর পক্ষ হইতে কথা দিয়া কথা না রক্ষার একটী কারণ ভদ্রতার খাতিরেও শুনিতে পাইত। তবে ভাদুড়ী কোম্পানী খুলিতে যত বিলম্ব হয় ততই অপরের পক্ষে মঙ্গল। শিয়রে সমন থাকিলে লোকের কৃষ্ণভক্তি যে মাথায় উঠিবার সম্ভাবনা।

প্রথম সংখ্যায় অমৃতলাল বসুর কবিতা 'গিরিশ-বন্দনা' ও ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক 'কালিদাসের বিয়ে' স্থান পায়।

পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে। দ্বিতীয় সংখ্যায় সমসাময়িক দুটি পত্রিকাকে বিদ্রূপ করা হয়--

স্টারের মুখপত্র নটরাজের মূল্য বাড়িয়াছে কিন্তু আকার বা প্রকারের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই, আদি ও অকৃত্রিম নটরাজের গায়ে একখানি সাদা, বোধ করি সাপের খোলস, যুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সেইজন্যই মূল্য আরও এক পয়সা বৃদ্ধি হইয়াছে। একালে ভিতর অপেক্ষা বাহিরের দামই অধিক, কাজেই নটরাজ-বাহনেরা বিশেষ কিছু অন্যায় করেন নাই।

শুধু *নটরাজ* নয়, *নাচঘর* পত্রিকাও আক্রান্ত হয় পত্রিকাটির দ্বারা--

নাচঘর নাকি বলিয়াছেন যে 'শ্রীকৃষ্ণ' নাটক নহে--ইহা একখানি নাট্যকাব্য।...আহা বাছারে। নাটক এবং দৃশ্যকাব্য এই দুটি যে ভিন্ন বস্তু তাহা নাচঘর ফুকরাইবার পূর্ব্বে কে জানিত বল?

এই সংখ্যাতে 'বিসর্জন' নাটকে শিশির ভাদুড়ীর অভিনয়কে আক্রমণ করা হয়েছে।

আসলে *বঙ্গ-রঙ্গালয়* ছিল মিনার্ভার মুখপত্র। দ্বিতীয় সংখ্যায় সুচনাতেই তাই এসেছে মিনার্ভায় 'বাঙ্গালী' অভিনয় দেখে বিনয়বাবুর মর্মস্পর্শী চিত্র। সচিত্র এই পত্রিকাটিতে বেশ কিছু ভালো নাটক বিষয়ক লেখা প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে অমরেন্দ্রনাথ রায় 'দীনবন্ধুর নাট্য-সাহিত্য' বিষয়ে আলোচনা করেন। ত্রয়োদশ সংখ্যায় প্রকাশিত 'গিরিশচন্দ্র' রচনাটি নানাদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। ব্যোমকেশ মুস্তাফী সংগৃহীত দুর্গাদাস করের লেখা পূর্ণাঙ্গ নাটক 'স্বর্ণ-শৃঙ্খল'-ও প্রকাশ করে পত্রিকাটি।

সব মিলিয়ে বাংলা নাট্য আন্দোলনকে পত্রিকাটি পরিপুষ্ট করার চেষ্টা করে।

নাটক সম্পর্কিত এইসব পত্রিকাগুলির সীমাবদ্ধতা ছিল, পারস্পরিক বিদ্বেষ এদের গ্রাস করেছিল। তেমন মহৎ কোনো সৃষ্টিও পাঠককে উপহার দিতে পারেনি এগুলি। তবু বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ক্রমবিকাশে এগুলির ভূমিকা অস্বীকার করার নয়। যেসব পত্রিকার কথা আমরা বললাম, তার বাইরেও রয়ে গেল পরবর্তীকালে প্রকাশিত আরও বেশ কয়েকটি নাটকের কাগজ। তাদের কথা ভবিষ্যতে বলা যাবে।

দে বী প্র সা দ ঘো ষ

চলচ্চিত্র পত্রিকা এবং আরও কিছু

চলচ্চিত্র একশো বছর অতিক্রান্ত। এই মাধ্যমটিকে আমরা যে-ভাবে দেখে থাকি, এত সহজে সেটা লাভ করা যায়নি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সেটা এক অন্য ইতিহাস। প্যারিসের কাফে থেকে মুম্বাই—যেখানেই প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন হয়েছে, সংবাদ মাধ্যমগুলো এই আশ্চর্য ঘটনাকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। পরিবেশন করেছিল সংবাদ। এবং পরবর্তীকালে বিজ্ঞাপন। ভারতে, মুম্বাই শহরে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন হয় ১৮৯৬ সালের ৭ জুলাই, ওয়াটসনস্ হোটেলে। এই প্রদর্শনের অংশ হিসেবে যে বিজ্ঞাপনটি *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*-র পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল সে খবর অজানা নয়। ব্রিটিশ রাজত্বে কলকাতার গুরুত্ব অনেক। শহর কলকাতা এই আশ্চর্য প্রদর্শন থেকে দূরে থাকবে সেটাও সম্ভব নয়। তখন পর্যন্ত ব্রিটিশ পদানত ভারতের রাজধানী কলকাতা। দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়নি। প্রায় একই সময় কলকাতায় চলচ্চিত্র প্রদর্শন হয়েছিল, সেই তথ্য থাকলেও ; মুম্বাইতে যে-ভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল সেই জাতীয় বিষয় নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। একথা স্বীকার করা ভালো, ওই সময় কলকাতা থেকে কোনো বাংলা সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়নি। সেই কারণে বিজ্ঞাপন যেটা ছাপা হয়েছিল সেটা অবশ্যই ইংরেজি ভাষায়।

সংবাদ-পরিষেবার এই দিকটি বর্তমানেও নজরে না আসার ফলে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের নাড়ি-ছেঁড়া ঘটনাটি আপাতদৃশ্য হওয়াতে কিছু পরিমাণে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে যায়। তবুও এ-বাবদ যে বিজ্ঞাপনটি নানা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় সেটি হল—'পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। বায়স্কোপ!' এই বিজ্ঞাপনটির একমাত্র উৎস কালীশ মুখোপাধ্যায়-এর 'বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস'। সেখানে কোনো উৎস-নির্দেশ নেই। ফলে নির্দিষ্ট কারণে পথ-চলা বেপথুমান হয়ে পড়ে। তবে বাংলা ভাষায় যে গুটিকয়েক পত্র-পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত তাদের কাছে চলচ্চিত্র খুব সমাদর পায়নি। তার এক বিশেষ কারণ ছিল। প্রথম ও প্রধান হল, দেশের রাজধানী কলকাতা হওয়ার ফলে এবং শাসন-কর্তা ইংরেজ থাকায়, ইংরেজি ভাষাই একমাত্র প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে দেখা দেয়। সম্ভবত প্রথম বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ পায় *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য় ১৮৯৮ সালের ৫ এপ্রিল। ক্ল্যাসিক থিয়েটারে 'আলিবাবা' নাটকের পুনরভিনয় হয় ১৮৯৮ সালের ৪ এপ্রিল। এই নাটকের সঙ্গে রয়াল বায়স্কোপ কোম্পানি ছবি দেখায়। প্রসঙ্গত, রয়াল বায়স্কোপ কোম্পানির জনক ছিলেন হীরালাল সেন। যদিও শঙ্কর ভট্টাচার্য-এর *রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান* থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে মিনার্ভা থিয়েটারে ১৮৯৭ সালের ৩১ জানুয়ারি Animatograph প্রদর্শন হয়। এই বিষয় নিয়ে কোনো সংবাদ-বিজ্ঞাপন লক্ষ করা যায়নি।

রাজনৈতিক কারণে ভারত দু-ভাগ হবার আগে, বর্তমান বাংলাদেশ একটা রাজ্য হিসেবে

ভারতবর্ষের ভূগোলে চিহ্নিত ছিল। আঞ্চলিক দূরত্বের কারণে ঢাকা শহরের প্রতিপত্তি কিছুটা কম ছিল কলকাতা শহরের তুলনায়। অন্যান্য বিকাশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিকাশ চলেছিল প্রায় সমানতালে। ১৮৯৮ সালের ১৭ এপ্রিল ঢাকায় প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন হয়। ওই দিনেই *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত সংবাদটি প্রথম প্রকাশ করে। ওই চলচ্চিত্র-প্রদর্শন নিয়ে সাপ্তাহিক *ঢাকা প্রকাশ* ২৪ এপ্রিল সংখ্যায় চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচনা প্রকাশ করে। তাতে তথ্যের সাহায্য নিয়ে বলা চলে, সংবাদ-পরিবেশনের আকারে চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা কয়েকটা বিচ্ছিন্ন-পর্বের ঘটনামাত্র। মোট কথা, চলচ্চিত্র চর্চা বলতে আমরা কি বুঝেছি বা বোঝার চেষ্টা করি--একটি স্বতন্ত্র মাধ্যমকে নিয়ে পরিকল্পনাপ্রসূত কোনো আলোচনা অন্য আর একটি মাধ্যমে পরিবেশিত হলে সেটাকেই আমরা চর্চা হিসেবে বুঝতে চেয়েছি। এবং সেটি মূলত ছাপা অক্ষরে। ছবি তোলা আর ছবি প্রদর্শনের পর্বটুকু বাদ দিলে যে অংশটি পড়ে থাকে, তা হল ছবির বিষয় নিয়ে গল্প করা, চলচ্চিত্র নিয়ে লেখালেখি করা। বিদেশের প্রসঙ্গগুলো আপাতত সরিয়ে রেখে, কিয়ৎ পরিমাণে বাংলা ভাষায় লেখালেখি হয়েছে--এই নিয়ে আজ আর কোনো দ্বিমত নেই।

এটা নজরে থাকা প্রয়োজন, চলচ্চিত্র সবে মাত্র এদেশে জনসাধারণের সামনে প্রদর্শিত হয়েছিল। তাই সেই বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হওয়া ওই সময়কার পত্র-পত্রিকার দায় ছিল। এই সূত্রে বলা চলে, হীরালাল সেন ভারতীয় চলচ্চিত্রে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রচেষ্টা বিভিন্ন কোণ থেকেই বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সুতরাং তাঁর কর্মকাণ্ডের কিছু পরিমাণ ইঙ্গিত দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে *বঙ্গবাণী* পত্রিকায়। যেগুলো শুধুমাত্র সংবাদের আকারে নিবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে মহারাষ্ট্র-এ দাদাসাহেব ফালকে প্রথম ছবি তৈরি করার পর *মারাঠি কেশরী* পত্রিকা সংবাদের আকারে জনসাধারণকে জ্ঞাত করাবার চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু সংবাদ পরিবেশনের এই ধারার বাইরে চলচ্চিত্রকে একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে বাংলা ভাষায় যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার নাম *ভারতী*। সাহিত্য-রসিক মহলে *ভারতী* পত্রিকার মান উঁচু দিকে থাকলেও, চলচ্চিত্রের বিষয়-আঙ্গিকে সেটার ভূমিকা বড়ো হয়ে দেখা দেয়নি। সামান্য কয়েকবছর হল সেটা লক্ষ করা গেছে। ফলে সময়ের প্রেক্ষিতে তার বিচার জরুরি।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে চলচ্চিত্র সারা বিশ্বে নিজের স্থান প্রতিষ্ঠা করেছে। এদেশে তার স্থানটির দখল নিতে কোনো অসুবিধা হয়নি। চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গেই এই মাধ্যমটির চর্চা শুরু হয়েছিল বিদেশে, এমন-কী এদেশে একথা খুব জোরের সঙ্গে দাবি করা যায় না। এই আশ্চর্য মাধ্যমটিকে নিয়ে প্রথম পর্বে তার ঘোর কাটতেই বেশ কয়েক বছর লেগেছে। দর্শকেরা যখন এর স্বাভাবিক পরিণতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হল, সেই সময়েই চলচ্চিত্রচর্চা শুরু হয়েছিল বলা যেতে পারে। বিদেশের প্রশ্ন আপাতত থাক। আজ আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না, ছবি দেখার সঙ্গে এর দোষ-গুণ, ভালো-মন্দ নিয়ে লেখালেখি বা আলাপ-আলোচনার ভেতর দিয়েই চলচ্চিত্র তার সজীবতা বজায় রেখেছে।

মুম্বাই-এ প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন হবার পর সেটার নির্মাণ পর্যায়ের প্রযুক্তিকে জানা ও ব্যবহার করাটাই ছিল প্রথম ও প্রধান কাজ। অন্যদিকে যারা বিষয়টি নিয়ে আরও গভীরে ডুব দিতে চাইছিলেন, তারাও বসেছিলেন না হাত গুটিয়ে। পত্রিকার পাতায় ছবি সম্পর্কে মতামত, ছবি তৈরির কলা-কৌশল ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে লেখা শুরু করলেন। ফলে

চলচ্চিত্রের বুনিয়াদ আরও পাকাপাকি আসন নিল। এই প্রেক্ষাপটে *ভারতী* পত্রিকায় ভূমিকা দেখা দরকার।

চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া *ভারতী* পত্রিকার পূর্ব-ইতিহাস রয়েছে। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ সালের ২৯ জুলাই (১৫ শ্রাবণ, ১২৮৪)। 'মাসিক সমালোচনা পত্রিকা' শব্দগুলোর উল্লেখ থাকলেও প্রথম সংখ্যা থেকে নানা আলোচনা পত্রিকার পাতায় স্থান পেয়েছে। ব্যতিক্রম চলচ্চিত্র। ঠিকানা ছিল ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। প্রথম সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দীর্ঘ সাত বছর (১২৮৪-১২৯০) পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছিলেন। এই পত্রিকাটির প্রাথমিক পরিকল্পনা করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের পর ঠাকুর পরিবারের স্বর্ণকুমারী দেবী পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন দশ বছর (১২৯১-১৩০১)। ১৩০২ থেকে ১৩০৪ সাল পর্যন্ত হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী। মাত্র এক বছর (১৩০৫) *ভারতী* পত্রিকা সম্পাদনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩০৬ থেকে ১৩১৪ সাল পর্যন্ত সম্পাদনা করেছিলেন সরলা দেবী। এবং ১৩১৫ থেকে ১৩২১ পর্যন্ত পুনরায় সম্পাদকের দায়িত্ব নেন স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি আর দায়িত্ব না-নেওয়ায় ১৩২২ থেকে ১৩৩০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় *ভারতী* পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক হন। সম্পাদক পরিবর্তনের সঙ্গে পত্রিকার ঠিকানা বদল হল। কার্যালয় স্থাপিত হল ২২ সুকিয়া স্ট্রিটে, কান্তিক প্রেসের তিনতলার ঘরে। মণিলাল ও সৌরীন্দ্রমোহন ছিলেন *ভারতী*-র দলে। যুগ্ম-সম্পাদনার পর পত্রিকার দায়িত্ব আসে আবার সরলা দেবীর হাতে, তিনি যোগ্যতার সঙ্গেই ১৩৩১ থেকে ১৩৩৪ সালের কার্তিক মাস পর্যন্ত পত্রিকাটিকে সজীব রাখেন। পঞ্চাশ বছর ধরে মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হবার পর সেটার মৃত্যু ঘটে।

সমাজ ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পত্রিকাটির চরিত্র নানাভাবে বদল হয়েছিল। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর প্রথম-পর্বের সম্পাদনায় (৮ বর্ষ ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১২৯১) একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছিলেন। জানিয়েছিলেন—'জনসাধারণের মানসিক সৌষ্ঠব বিধানই মাসিক পত্রিকার উদ্দেশ্য—অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীবন বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিজ্ঞান-দর্শন-কবিতা আর উপন্যাসাদি এই সকল বিষয় (অধিক কি অল্প হউক) আলোচনা হইয়া আসিয়াছে। আমরাও এখন এই সকল বিষয়ে ভারতীর প্রতিষ্ঠা সম্মান রাখিতে চেষ্টা করিব। তবে আমরা এখন হইতে বিজ্ঞানের মাত্রা কিছু বাড়াইতে ইচ্ছা করি--আমার মতে বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ উপকারিতা আছে এবং আজকাল এদেশে বিজ্ঞান আলোচনার কতক অনুরাগ দেখা যাইতেছে।' পত্রিকার চরিত্র ও চলচ্চিত্র বিষয়টিকে বুঝে নিতে এই উদ্ধৃতি বিশেষ সহায়ক হবে।

আমাদের অনুধাবনের বিষয় *ভারতী* পত্রিকায় চলচ্চিত্র কীভাবে স্থানলাভ করেছিল। যুগ্ম-সম্পাদনাকালে পত্রিকাটি 'সচিত্র' আখ্যায় ভূষিত হয়। শুধুমাত্র লেখা নয়, চিত্রের সমাহার ঘটেছিল পত্রিকাটিতে। এই পরিবর্তনকে অনেক মানুষ মেনে নিতে পারেননি। তাতে পত্রিকার লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়নি বিন্দুমাত্র। সময়ের দাবি, বিশেষ ভাবে পত্রিকার চরিত্র বদলাতে সাহায্য করেছে। উদ্ধৃতি থেকে এটা বোঝা যায়, বিজ্ঞান প্রসঙ্গ পত্রিকার পাতায় বাড়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। যুগ্ম-সম্পাদক এই বিষয়ে অবহিত ছিলেন বলেই আজ মনে হয়। এদিকে দেশে,

বিশেষত কলকাতায় চলচ্চিত্রের দর্শক সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল। দেশে নির্মিত ছবির বাইরে বিদেশ থেকে ছবির আমদানি চলত নিয়মিত। এই সময়টা ছিল চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগ এবং ভারত ছিল ব্রিটিশ পদানত। বিদেশে তৈরি চলচ্চিত্র দর্শকদের থেকে সমীহ আদায় করে নিত তার শিল্পগুণের কারণে। অন্যদিকে দেশি চলচ্চিত্র তার নাবালকত্ব ত্যাগ করতে পারেনি। সঙ্কটের এই মুহূর্তে *ভারতী* পত্রিকায় চলচ্চিত্রচর্চা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। পত্রিকার ইতিহাসে নয় শুধুমাত্র, ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে *ভারতী*-র ভূমিকা কখনও অবহেলাভরে দেখা ঠিক হবে না। দুঃখের বিষয় সেটা আজও অনুচ্চারিত থেকে গেছে। চলচ্চিত্রের সর্বজনীন আবেদনের সঙ্গে পত্রিকার পাতাতে সাধুভাষার পরিবর্তে চলতি ভাষার ব্যবহার শুরু হল। এমন-কী কমিয়ে দেওয়া হল মূল্য। পত্রিকা উঠে এল এক বিস্ফোরণের মুখে। চলচ্চিত্রের তত্ত্বগত দিক এই কারণগুলোই নির্দেশ করে।

মণিলাল ঐতিহ্যের সূত্র অনুসারেই সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। সৌরীন্দ্রমোহন পেশায় আইনজীবী হয়েও সাহিত্যের আসরেই তাঁর প্রথম পরিচয়। এছাড়া ছোটোবেলা থেকে তাঁর ছিল চলচ্চিত্রের প্রতি মোহ। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে বিদেশি ছবির কোম্পানি 'প্যাথি' তাদের অফিস চালু করলে চলচ্চিত্রের নানাবিধ অনুসন্ধানের জন্য তিনি সেখানে যাতায়াত করতে থাকেন। এর পরেও তিনি ছিলেন দেশি ও বিদেশি ছবির নিয়মিত দর্শক। চিত্র প্রযোজক ম্যাডান কোং-র সঙ্গে ছিল তাঁর সুসম্পর্ক। বলাই বাহুল্য, অনুসন্ধানী মন এই আশ্চর্য মাধ্যমটির প্রতি স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়ে পড়বেন। দেশি ছবির ত্রুটি কোথায়, বিদেশি ছবি থেকে কতটা গ্রহণ করা যায়--তিনি ভাবিত ছিলেন এইসব বিষয় নিয়ে। *ভারতী*-র পাতায় তিনি লিখেছিলেন 'শিবসুন্দর' ছদ্মনামে। পত্রিকার পাতায় তিনি মোট পাঁচটি নিবন্ধ লিখেছিলেন--১. বায়োস্কোপের কথা (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০), ২. বায়োস্কোপে অভিনয় (আষাঢ় ১৩৩০), ৩. বাঙলা বায়োস্কোপ (শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৩০), ৪. বায়োস্কোপের নাটক (কার্তিক, পৌষ-মাঘ ১৩৩০), ৫. বায়োস্কোপে হাস্যকৌতুক (অগ্রহায়ণ ১৩৩০)। সৌরীন্দ্রমোহনের লেখার মধ্যে বিশ দশকেই কলকাতায় তৈরি ছবির আলোচনা রয়েছে। সেই সময়ে কলকাতা ও মুম্বাই-এ প্রায় সম সংখ্যক ছবি তৈরি হত। প্রাথমিকভাবে আঞ্চলিকতার ছাপ নজরে এলেও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ভারতীয় ছবির সূত্র নির্দেশই ওই নিবন্ধগুলোর বিষয়। পরবর্তীকালে সৌরীন্দ্রমোহন কবুল করেছিলেন বাংলায় চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটান তিনি।

এরপরই যে পত্রিকাটি সবার নজর কেড়ে নিয়েছিল সেটা *নাচঘর* সাপ্তাহিক। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ২৬ বৈশাখ। সম্পাদক ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায় ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। *ভারতী* পত্রিকা ঠাকুর পরিবারের বন্ধন-মুক্ত হয়ে যেখানে আস্তানা গেড়ে ছিল সেটা ছিল ২২ সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা। আর এখান থেকেই *নাচঘর*-এর প্রকাশ অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে চিহ্নিত করতে পারি। এই সমীকরণ যতটা সহজে বর্তমান সময়ে গ্রহণ করা হোক না কেন, সময়ের প্রেক্ষিত থেকে সেটা ছিল কয়েক কদম এগিয়ে থাকা ঘটনা। যদিও আলোচ্য বিষয় চলচ্চিত্র, নাটক বিষয়ক কোনো আলোচনা এখানে স্থান পাবে না। চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বিষয়গুলো কত পরিমাণে পত্রিকা আত্মস্থ করতে পেরেছিল সেটাই দেখার বিষয়। অবশ্যই বলা প্রয়োজন, *নাচঘর* মূলত বিনোদনমূলক পত্রিকা। বিনোদনের

যাবতীয় শর্ত মেনে, নাটকের সঙ্গে চলচ্চিত্রের মেলবন্ধন অনেক পরিমাণে আমাদের বিনোদন জগতের জলবায়ুতে বেড়ে উঠেছিল, সেই ভূমিকা ছোটো করে দেখা চলে না। *নাচঘর* শুরু থেকেই নাটকের পর চলচ্চিত্রকে বিশেষভাবে স্থান দিয়ে এসেছে। প্রথম বছরেই প্রকাশিত হয় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়-এর 'বায়োস্কোপের নাটক' এবং ধীরাজ ভট্টাচার্য-এর 'থিয়েটার ও বায়োস্কোপ'। এরপর সম্পাদকের হাত-বদল হয়েছে বহুবার. সুকিয়া স্ট্রিটের কান্তিক প্রেস থেকে পত্রিকা চলে গেছে ২০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট-এ। এই উত্থান-পতনের সঙ্গে লেখার মান ও গতির সমানতালে অদল-বদল ঘটেছে। প্রতিবারেই লক্ষ করা গেছে হেমেন্দ্রকুমারের অবস্থানকালে পত্রিকার উন্নতি ঘটেছে সর্বাধিক। তাঁকে তাই মাঝে মাঝেই পত্রিকার দায়িত্ব নিতে দেখা গেছে। প্রবন্ধের তালিকা থেকে বোঝা যায় পত্রিকাটিতে বায়োস্কোপ সম্পর্কিত লেখালেখি ঘটেছিল কত পরিমাণে। নির্মলকুমার ঘোষ লিখিত 'মূক বনাম মুখর চিত্র' এবং জার্মান প্রত্যাগত চিত্র বিশেষজ্ঞ সুরেশচন্দ্র দাস কর্তৃক 'ছায়চিত্রের ট্রাকিং শর্ট'—ইংরেজি ভাষায় লেখা শুধুমাত্র *নাচঘর* পত্রিকার জন্য অনুবাদ করে ছাপা হয়েছিল ৮ বর্ষের ৩৮ সংখ্যায়। এছাড়া ওই বছরে বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'দেশী ছবির মজলিস' এবং নির্মলকুমার ঘোষ 'চিত্রনাট্যের রূপকথা' আদতে যা সংক্ষিপ্ত রূপে চলচ্চিত্র সমালোচনা। চন্দ্রশেখর (মনুজেন্দ্র ভঞ্জ) লিখিত 'রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনীয়তা কি ফুরিয়েছে?' (৮ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা) পত্রিকার চরিত্র বদলাতে সাহায্য করেছিল, দেখা যায়, চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পত্রিকাটি গুরুত্ব দিতে থাকে।

বাংলা ভাষায় তাবৎ আলোচনা রসায়নের সূত্র মেনেই আরও এক পরিমণ্ডল তৈরি করে, যা পরবর্তীকালে 'শুধুমাত্র চলচ্চিত্র' পত্রিকা প্রকাশে আগ্রহী করে দেয় উৎসাহীদের মধ্যে। পত্রিকা প্রকাশ নিছক বিনোদনের সামগ্রী হয়ে ওঠার পরিবর্তে সম্ভ্রম আদায় করে নেয়। সেটার ফল দেখতে পাই *বায়োস্কোপ* নামের পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে।

বিষয়ে প্রবেশের আগে দু-একটি দিকের অনুধাবন প্রয়োজন। কতগুলি আরোপিত ধারণা রয়েছে—চলচ্চিত্র পত্রিকা ব্যতিরেকে আর কোথাও চলচ্চিত্র সম্পর্কিত আলোচনা গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ পায়নি। ভ্রান্ত এই ধারণার নিরসন ঘটা জরুরি। বাঙালিদের কাছে প্রথম পর্যায়ের চলচ্চিত্র তাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। যথেষ্ট আলোচিত নয় এমন পত্রিকা, তারাও চলচ্চিত্রকে মর্যাদা সহকারে পত্রিকার পাতায় স্থান দিয়েছিল। উদাহরণ--*মুক্ত* সাপ্তাহিক এই কাজটি করেছিলেন সুচারুরূপে। সংবাদ-গল্প-কবিতার পাশে চলচ্চিত্র সম্পর্কে এমন গুটিকয়েক মন্তব্য উচ্চারণ করেছিল যা আজ বিশেষ অধ্যয়নের সুযোগ করে দেয়। সুতরাং বর্তমান বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে, চলচ্চিত্র-চর্চায় এইসবের প্রতিফলন কখনই পরিলক্ষিত হয় না। এ নিয়ে দুঃখ-ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। এর কারণ অনুসন্ধান কোনোদিন হয়নি। অনুসন্ধান পর্বে যেটা নজরে এসেছে তা হল চলচ্চিত্র-চর্চার ইতিহাস নিয়ে মূলত দুটি ধারা প্রচলিত আছে। চলচ্চিত্রের জন্ম বিদেশে, ভারতে নয়। ফলে বিদেশের, পাশ্চাত্যের ধারা শ্রেণিবদ্ধভাবে নানা গ্রন্থের মাধ্যমে এদেশে এসেছে। আমরা সেটাকেই অনেকাংশে আত্তীকরণ করার চেষ্টা চালিয়েছি। অথচ অন্য দিকও আছে—সেটা জানা-বোঝার চেষ্টা করিনি। ফল, জলবায়ুর গুণে ইতিহাসের প্রেক্ষণগুলো ক্রমশ শ্যাওলা-ছায়ায় আবৃত হয়ে পড়েছে। এখানেই আর এক সমস্যার উদ্ভব। যে সূত্র-সন্ধান থেকে ইতিহাস গড়ে ওঠে এবং চর্চার ধারা প্রবাহিত

হতে পারে, সেগুলো কিয়দংশ হয় হারিয়ে গেছে, নতুবা অবহেলায় অবসৃত হয়েছে। এই সীমাবদ্ধতা সামনে রেখেও বলা যায় চলচ্চিত্র সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন পত্রিকার মধ্যে কখনও আমরা বিদ্যুতের ঝলকানি পরিলক্ষিত করি।

বাংলায় চলচ্চিত্রের সূচনাপর্ব শুরু হয়েছিল নাটকের ছবি তোলার মধ্য দিয়ে। হীরালাল সেন ছিলেন একাজের অগ্রণী পুরুষ। পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্রের প্রতিপত্তির ফলে, এই মাধ্যমটিকে সরাসরি নাটকে ব্যবহার করা হয়। ১৯২১ সালে দানীবাবু 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নাটকে গোবিন্দলালের চরিত্রে অভিনয় করেন। মনোমোহন থিয়েটারে নাটকের কিছু অংশ চলচ্চিত্রায়িত করে সেটিকে পর্দায় ফেলে নাটকীয়তাকে কয়েক ধাপ এগিয়ে নেবার চেষ্টা চালানো হয়ে থাকে। (এ বিষয়ে মৎপ্রণীত *বঙ্গীয় চলচ্চিত্র ধারা* গ্রন্থের 'বঙ্গরঙ্গমঞ্চে চলচ্চিত্র' অধ্যায়ে বিস্তৃত রয়েছে।) আরও কয়েক বছর বাদে একইভাবে ওই প্রচেষ্টা দেখা গেল। সেটারই সমালোচনা প্রসঙ্গে *মুক্ত* পত্রিকাটিতে লেখা হয় :

> ...মনোমোহন থিয়েটারে বিষবৃক্ষ অভিনয়ের সঙ্গে বিষবৃক্ষের দৃশ্য বিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং উক্ত ফিল্ম অরোরা সিনেমা কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। রঙ্গমঞ্চে এই নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় বেশ দুপয়সা রোজগার করিয়াছিলেন। দেখাদেখি ষ্টার থিয়েটারও চন্দ্রশেখর পুস্তকের কতকাংশ চলচ্চিত্রে দেখানোর জন্য আরোরাকে দিয়েই ফিল্ম তোলান। তবে তাঁরা ততটা সুবিধা করতে পারেন নাই। অবশ্য লাভবান হয়েছিলেন, ক্ষতিগ্রস্থ হন নাই। মনোমোহনে 'মেঘনাদ বধ' এর কতকটা ফিল্ম তোলা হইলে পর এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বন্ধ হইল—বন্ধের প্রধান কারণ ভড়ঙ্-এ লোক ভুলানো যায় না। অতঃপর অরোরা সিনেমা নিজের রত্নাকর ইত্যাদি ছবি তুলিতে আরম্ভ করিলেন। (মে ৩০, ১৯৩১)

আপাতদৃষ্টিতে বিষয়হীন অথচ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি চলচ্চিত্র সংক্রান্ত পত্রিকার পাতাতে লিপিবদ্ধ হয়নি। জলবায়ুর গুণে পাশ্চাত্য ধারা থেকে এদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসের ধারা সামান্য হলেও বাঁক নিয়েছে।

যাই হোক, আমাদের আলোচ্য বিষয় চলচ্চিত্র সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা নিয়ে। এ বিষয়ে সবার প্রথমে যে নামটি আসে, সেটা *বায়োস্কোপ*। সর্ব অর্থে এটিকে বাংলা ভাষার পত্রিকা বলে দাবি করা যায়। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশ পায় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ অক্টোবর। সম্পাদক ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক ও চিত্রশিল্পী চারু রায়। পরিচালকবর্গের মধ্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব প্রমুখের নাম পাওয়া যায়। পত্রিকার প্রথম বারোটি সংখ্যা সম্পাদনা করেন চারু রায়। পরের দুটি সংখ্যা সম্পাদনা করেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং পরবর্তী সংখ্যাগুলো সম্পাদনা করেন পত্রিকা পরিচালক বিমল পাল। ইনি এক অর্থে চলচ্চিত্র প্রদর্শক ব্যবসায়ী ছিলেন। প্রথম সংখ্যায় দেখা যায় 'Printed and Published by Jatindranath Dey at the Metcafe printing works 34 Mechua bazzar street, Calcutta'। সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রথম দিকে সম্ভবত কোনো এক সঙ্কটে উপনীত হয়েছিল। কারণ, ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পত্রিকার এক বছর পূর্ণ হবার কথা, তখনই পত্রিকা প্রকাশে সামান্য ছেদ ঘটে। পরে সেটি 'বিশিষ্ট সংখ্যা' রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময়ে পত্রিকার হাল ধরেছিলেন বিমল পাল। এক বছর পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। যদিও এই পত্রিকার বহু সংখ্যাই নানা অবহেলায় ধ্বংস হয়ে গেছে। সাপ্তাহিকের প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক আনা এবং বার্ষিক চার টাকা।

বায়োস্কোপ

সংখ্যা ১ | সম্পাদক—চারু রায় | ১১ই অক্টোবর

মূল্য /০ | বার্ষিক ৪৲



PICTURES

1929-30.

THE SHOW
John Gilbert
Renee Adoree

THE CAMERAMAN
Buster Keaton

THE ACTRESS
Norma Shearer

ENEMY
Lilian Gish

THE UNKNOWN
Lon Chaney
Joan Crawford
Norman Kerry

YELL IT TO MARINES
Lon chaney
Wm Haines

ALL AT SEA
Karl Dane
Geo K Arthur

MOOKERY
Lon Chaney

CIRCUS ROOKIES
Karl Dane

ROSE MARIE
Joan Crawford

FOUR WALLS
John Gilbert
Joan Crawford

FLYING FLEET
Ramon Navarro



PICTURES.

1929-30.

MAGICIAN
Alice Terry
Paul Wegner

MYSTERIOUS LADY
Greta Garbo
Conrad Nagel

DIAMOND
Eleanor Broadman
Conrad Nagel

HANDCUFFS
Eleanor Broadman
Conrad Nagel

TELLING THE WORLD
Wm Haines & Anita Page

THE CROWD
James Murray

TWELVE MILES OUT
John Gilbert
Joan Crawford

VARSITY GIRL
Marion Davies

THE WIND
Lillian Gish

LADY OF CHANCE
Norma Shearer

FIRE BRIGADE
May McAvoy

CHINA BOUND
Geo K Arthur
Karl Dane

বায়োস্কোপ-এর প্রথম সংখ্যা

পত্রিকাটি সম্পর্কে যেটুকু অভিযোগ আসে তা হল, প্রতি সংখ্যায় অন্তত একটি ইংরেজি লেখা প্রকাশিত হত। এর ফলে পত্রিকার মূল চরিত্রে কোনো আঘাত হানতে পারেনি, এটুকু আমাদের স্থির বিশ্বাস। পত্রিকার কারিগরি খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে দেখা প্রয়োজন পত্রিকা প্রকাশের পেছনে কোন উদ্দেশ্য কাজ করেছে, চলচ্চিত্রের সম্যক গতির সঙ্গে চর্চার কোন দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। পত্রিকা সংক্রান্ত আলোচনায় নিছক কাঠামোর হদিস পাওয়াটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এক্ষেত্রে চারু রায়-এর লেখা প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়র গোটাটাই উদ্ধৃত করতে চাই। প্রায় বিস্মৃত লেখাটির মূল্য মোটেই কম নয়।

'বায়োস্কোপ' সম্বন্ধে কাগজ বের করে তাকে লাভজনক করে তোলার উদ্দেশ্য যে নাই তা নয়, তবে সেটা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কারণ সে উদ্দেশ্য পূরণ সময় সাপেক্ষ। আমাদের ঘরে টাকা আসার আগে এই ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনা করে Cinema Industryটাকে প্রকৃতভাবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে এই কাগজ বের করা হচ্ছে, অতীতের ভাঙা-গড়ার ইতিহাসে ভবিষ্যতের ইমারত তৈরি হয়। আমরা সাধারণতঃ সেই চেষ্টাই করব যাতে সম্ভবমত এই Industry-র সঠিক ইতিবৃত্ত সকলের কাছে পৌঁছয়।

ব্যবসার দিক থেকে Film Industry ঠিক কতখানি সাফল্য লাভ করেছে তা বলা কঠিন। কিন্তু এই Industry নিয়ে আজকের দিনে বাংলা দেশে মস্ত বড় সাড়া পড়ে গেছে। Govt. Cinema Committee-র Report বের হবার পর একসঙ্গে অনেকগুলো company তৈরি হয়েছে এবং সকল company-র এক উদ্দেশ্য Film তৈরি করা। Film তৈরি করার পর ব্যবসার দিক থেকে যে কাজটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয়--অর্থাগম--সে সম্বন্ধে কোন চেষ্টা এসব company করে না।

সব Industry-র দুটো দিক আছে প্রথমে নিজের ঘর থেকে টাকা খরচ করা পরে লভ্যাংশ সমেত নিজের টাকা ঘরে আনা। নিজের কর্ম অনুযায়ী লক্ষ্মী তাই কখনও সচলা কখনও বা অচলা হন।

Film Industry বলতে শুধু Film তৈরি (Production) বোঝায় না। Show house নির্মাণ, distribution ইত্যাদি এরই অঙ্গ। এর প্রত্যেকটিকে এক একটি আলাদা ব্যবসায়ে পরিণত করা যায়। Film তৈরি করা কয়েকদিন বন্ধ রেখে Show house নির্মাণের দিকটা বেশী করে ভাববার দিন এসেছে। কলকাতা শহরের উপর অত্যন্ত ক্ষীণ চেষ্টা অবশ্য চলছে এই show house নির্মাণ নিয়ে কিন্তু সেসব নিতান্তই ছেলেখেলা বলে মনে হয়।

যতগুলো company হয়েছে তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই one-film company, তাদের সেই একটা Film থেকে খরচের টাকা ঘুরে না এলে অন্য Film করার মত সঙ্গতি নেই। প্রাণধারণ করে থাকবার ব্যবস্থা থাকলে শরীরকে খাটিয়ে নেওয়া চলে আর তা না থাকলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এটাকে ঠিক ব্যবসা বলা চলে না--আর ঠিক এই কারণের জন্যেই বোধহয় capitalist-দের ভীতি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এই জাতীয় Company-দের ইতিবৃত্ত capitalist-রা কণ্ঠস্থ করে রাখেন--তাই কেউ যখন নূতন company খোলার উদ্দেশ্যে টাকার জন্য এদের দ্বারস্থ হন তখন তাদের নজীর কাটিয়ে নজর পাওয়া বিশেষ কঠিন হয়ে ওঠে।

Cinema Industry একটা বৃহৎ ব্যাপার। প্রকৃত ব্যবসায়ের দিক থেকে তার উন্নতি করতে হলে তার জন্যে টাকাও দরকার প্রচুর। ছোট ছোট company করে তা থেকে নিজেদের প্রয়োজন মত সংসার-যাত্রা নির্বাহ করার মত টাকা পাওয়ার নাম successful business নয়। এ রকম ব্যবসায়ের ক্ষতি এই যে এটা সত্যি বুঝি কম মূলধনের ব্যবসা। তাই বেশী মূলধনের প্রস্তাবে এইসব capitalist-রা আতঙ্কে পশ্চাৎপদ হন। সেটা সত্যি বড় ব্যাপার তাকে জোর করে খর্ব করে, স্বার্থপরের মত নিজের সাফল্য লাভের চেষ্টায় ক্ষতি এই যে আসল জিনিষটাকে চিরকালের জন্য আমরা পঙ্গু করে রেখে বিগ্রহের দায় বইব। বিদেশী পূজারী এসে পূজার নৈবেদ্য এবং দক্ষিণা নিয়ে যাবে আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে ফুল চন্দনের সঙ্গে মিশিয়ে এই আশীর্ব্বাদ করে যেন চিরকাল আমরা তাদের ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন অক্ষুণ্ণ রাখি।

বায়োস্কোপ-এর প্রতীতী এভাবেই জন্ম নেয় কারিগরি সম্পর্কের সঙ্গে মূলধনের অবস্থান

বৈরী নয়। সমান্তরাল গতি পথে কোনো ছেদ ঘটলে শিল্প মুখ থুবড়ে পড়বে। মূলসূত্রটি বুঝতে পত্রিকার কোথাও খামতি ছিল না। এছাড়া দেশি পুঁজিকে সঠিকভাবে চালিত করতে না পারলে বিদেশি পুঁজি গ্রাস করে নিতে পারে, জাতীয়তাবোধের এমন নিদর্শন কতটুকু আমরা দেখতে পেয়েছি!

প্রভূত সম্ভাবনা নিয়েও পত্রিকাটি বেশি স্থায়ী হয়নি। তবে মুনাফা অর্জন একমাত্র অভীষ্ট ছিল এমন দাবিও করা যায় না। এক বছর আয়ু যথেষ্টই বলে মনে হয়। প্রথম সংখ্যার লেখকসূচিতে ছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ। বাঙালির এই দিকগুলো বহু ক্ষেত্রে অধরা থেকে গেছে।

সম্ভবত পঞ্চাশটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে থাকবে। 'সম্ভবত' লেখার কারণ কয়েকটি সংখ্যা বাদ দিলে বেশির ভাগটাই কীটের উদরে স্থান পেয়েছে। গুটিকয়েক সংখ্যা নিয়ে পত্রিকার ইতিহাস রচিত হবে—দুর্ভাগ্যের এই বোঝা অবশ্যই আমাদের মেনে নিতে হবে। একথা নিশ্চিত বলা চলে, পত্রিকাটিকে ঘিরে একটি পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল যার মধ্যে ছিলেন কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ অন্যদিকে ছিলেন সাহিত্যে প্রতিশ্রুতিবান মানুষ। এই মেলবন্ধন থেকে আজকের ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিকাশ, বিশেষত বাংলা চলচ্চিত্রের প্রসারে পত্রিকাটির ভূমিকা মহীরূহ প্রমাণ যেটা বোঝা যায়।

স্ফুলিঙ্গের প্রসার ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এখানে *দীপালী* পত্রিকার কথা এসে পড়ে। রঙ্গমঞ্চের প্রভাব থেকে এর উৎপত্তি হলেও চলচ্চিত্রের অমোঘ টানে আর একটা মাধ্যমকে অচিরেই গ্রহণ করেছিল। *বিনোদন* পত্রিকায় চলচ্চিত্র আবশ্যিক উপাদান হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে এসেছে। ১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে *দীপালী* আত্মপ্রকাশ করে। ডবল ক্রাউন সাইজের চার পাতা, মূল্য এক আনা। সম্পাদক মুরারিমোহন চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকার পেছনে মূল মানুষ ছিলেন বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। ৭৭ হরি ঘোষ স্ট্রিটের সুবোধচন্দ্র দত্ত-র মানসী প্রেস থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। মুদ্রক ও প্রকাশকের নাম দেখা গেল ভিখাভাই কালিদাস বিলাসী প্যাটেল। পত্রিকাটির মূল অফিস ছিল ১১ অবিনাশ মিত্র লেন। সাত/আট সপ্তাহ প্রকাশের পর পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। আবার তোড়জোড় করে নবপর্যায়ে *দীপালী* প্রকাশিত হতে থাকে। এবার সম্পাদক-মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসেবে নাম পাওয়া গেল বিলাসী প্যাটেলের। পত্রিকার প্রাণশক্তি ছিলেন সেই বসন্তকুমার। মানসী প্রেসেই ছাপা হতে থাকে। ১৩৩৭ সালের ৪ বৈশাখ বৃহস্পতিবার নবপর্যায়ে দ্বিতীয় বর্ষের *দীপালী* প্রকাশিত হয়। আট পাতার কাগজের দাম হল দু-পয়সা। এবার রঙ্গজগতের খবর নয় শুধু, চলচ্চিত্র সংক্রান্ত সংবাদ সমালোচনা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে পত্রিকার পাতায়। দীর্ঘ আয়ু ছিল পত্রিকাটির। ছিল বিষয়ের বৈচিত্র্য। কিন্তু এক ও একমাত্র চলচ্চিত্র পত্রিকা হিসাবে একে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যেটুকু বলা যায়, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেও পত্রিকার বিচ্যুতি ঘটেনি। একইভাবে ঘটেছিল বিনোদন উপকরণের সঙ্গে সাহিত্যের যোগসূত্র। প্রায় একই সময়ে সুধীরেন্দ্র সান্যাল প্রমুখ যুক্ত হয়ে ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হতে থাকে। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন মনুজেন্দ্র ভঞ্জ। বাংলা ইংরেজি দুই ভাষাতেই পত্রিকাটি। চল্লিশ দশকের শেষ ভাগ পর্যন্ত পত্রিকাটি চলেছিল।

ইংরেজি ভাষার পত্রিকা নিয়ে আলোচনার স্থান এখানে নয়। তবুও যে বিষয়টি পাঠকদের জানিয়ে রাখা প্রয়োজন, ১৯২৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর কলকাতা থেকে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক সিনেমা পত্রিকা প্রকাশ পায় *Film Land*, এটি ছিল Introductory issue, পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩০ সালের ১১ জানুয়ারি। নিউ পার্ল প্রেস থেকে মুদ্রিত, এস. গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ১৫৭বি ধর্মতলা স্ট্রিট ছিল ফিল্মল্যান্ড পাবলিশিং সিন্ডিকেট-এর অফিস। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ। এই পত্রিকাটিকে নিয়ে বারান্তরে আলোচনার সুযোগ রইল।

পত্রিকা প্রকাশের শুভ মুহূর্তগুলোতে চলচ্চিত্রের আঙ্গিকগত পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল। নির্বাক থেকে সবাক হবার দিকে চলচ্চিত্রের প্রসার পত্রিকাগুলোকে প্রভাবিত করতে থাকে। একথাও সত্য, নির্বাক ছবি সম্পর্কে কারও কারও মোহ থাকলেও সবাকের প্রতি আগ্রহ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের।

চলতি সময়ে আরও একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যার সঙ্গে সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নাম জড়িয়ে আছে, *চিত্রলেখা*। অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন কাগজে সুমুদ্রিত পত্রিকাটির আঠারোটি সংখ্যা প্রকাশিত হতে পেরেছিল। দু আনা মূল্যের সাপ্তাহিক ছাপা হয়েছিল প্রবাসী প্রেস থেকে, প্রকাশিত হয়েছিল ১৪ ক্লাইভ স্ট্রিট, কলকাতা থেকে। প্রথম প্রকাশের সাল ১৯৩০ সালের ১৫ নভেম্বর। প্রথম সংখ্যা লিখেছিল : 'এদেশে এখনও সেদিন আসেনি যেদিন বিদেশের আবহাওয়া ও কারুকলার প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে এতদ্দেশীয় ছায়াচিত্র এখানকার জীবনধারা ও জলমাটির উপযোগী পথে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে যাত্রা শুরু কর্ত্তে পারে।' এ নিয়ে অবশ্যই কোনো দ্বিমত পোষণ করা চলে না, এদেশের গোড়ার পর্বে চলচ্চিত্র নিজেদের মুক্ত করার পথ তখনও তৈরি হয়নি। পত্রিকাটি সম্পর্কে কোনো-কোনো মহলে অভিযোগ শোনা যায় 'চিত্রা' সিনেমা-হলের মালিক বীরেন্দ্রনাথ সরকার, পরে চলচ্চিত্র প্রযোজক বি. এন. সরকার সমস্ত আর্থিক দায় নিয়েছিলেন। 'হাউস জার্নাল' হবার প্রভূত সম্ভাবনা রয়ে গেছে। এ নিয়ে পত্রিকার পাতাতেই প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় প্রথম প্রকাশের কয়েক সপ্তাহ পরেই। পত্রিকাটি আর্থিক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকেনি। অনুমান করা চলে, সরকার পরিবার চলচ্চিত্র প্রযোজনার দিকে সফলভাবে এগিয়ে যেতে থাকে, তখনই পত্রিকার গুরুত্ব কমে আসে।

কলকাতা-কেন্দ্রিক বাংলা ভাষায় পত্রপত্রিকার প্রকাশ নবযুগের সূচনা করলেও শহর থেকে দূরে ঢাকা এই কর্মকাণ্ডে পিছিয়ে ছিল না। যদিও চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ মূলত কলকাতায় হলেও, ঢাকার ভূমিকা ছিল সামান্যই। হয়ত বা এই কারণে তাদের উৎসাহ বা আগ্রহের মাত্রা ছিল সামান্যই। সুধাংশু সাহা ও রমেন্দ্রনাথ দে সম্পাদিত *চিত্রকথা* মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ সালের আষাঢ় মাসে। ক্রাউন সাইজের পত্রিকাটির প্রকাশ স্থান ছিল ১২ মালাকার টোলা, ঢাকা। মাত্র দুটি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটির অপমৃত্যু ঘটে।

১৩৩৮ সালের কার্তিক মাসে প্রকাশিত হয় *চিত্রপঞ্জী* মাসিক। ১৬৯ রসা রোড, ভবানীপুর, কলকাতা থেকে অবনীনাথ বসু ও বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর যুগ্ম-সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রায় সাত বছর চলেছিল। এদের ঘোষণায় লেখা হয়েছিল 'নিছক চলচ্চিত্র সংক্রান্ত

বাংলার একমাত্র সচিত্র মাসিক পত্রিকা'। পত্রিকাটি যাত্রা শুরু করেছিল সচল উদ্দেশ্য নিয়ে। চার বছর পত্রিকা প্রকাশের পর 'আমাদের কথা' শিরোনামে লেখা হয়েছিল :

চিত্রপঞ্জী

বহু অর্থব্যয়ে প্রস্তুত হইতেছে। মুক্তি প্রতীক্ষায় থাকুন

সোনার সংসার

পরিচালক দেবকী বসু

সুর-শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে

কলকাতা থেকে প্রকাশিত সিনেমা পত্রিকা *চিত্রপঞ্জী*

...অনেকক্ষেত্রে আমরা পাঠকদের পূর্ণ খুশী করতে পারিনি। তা না পারার একমাত্র কারণ আমাদের অক্ষমতাই নয়, আমাদের কাগজের গণ্ডী ছোট হওয়াও তার অন্যতম কারণ। পত্রিকা সম্পাদনা এবং পরিচালনা সম্বন্ধে যাঁরই সামান্য একটু ধারণা আছে, তিনিই বুঝতে পারবেন 'স্পেশালাইজ্‌ড' পত্রিকা চালানো কী দুরূহ ব্যাপার।... ব্যবসা করার উদ্দেশ্য নিয়ে 'চিত্র-পঞ্জী'-র জন্ম হয়নি। ছায়া-ছবিকে আমরা ভালবাসি। দেশী ছায়া-ছবির উন্নতি সম্বন্ধে

ছবির কারখানার মালিকদের কাছে সাধারণের মতামত বহন করার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং কাগজ করার সখে পড়ে 'চিত্র-পঞ্জী'র জন্ম হয়েছে। 'চিত্র-পঞ্জী' একমাত্র সাধারণকেই খুশী করার চেষ্টা করেছে, কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষকে খুশী করবার চেষ্টা সে করেনি কোনদিনই।...বিজ্ঞাপনের মোহ তাকে ভোলাতে পারেনি—বন্ধুর করুণ মুখ তার প্রাণে দাগ কাটেনি। ফলে সে বিজ্ঞাপন হয়তো কিছু হারিয়েছে, কিন্তু পেয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশী বড় জিনিষ—পাঠকের বিশ্বাস এবং সহানুভূতি।... আমাদের অর্থব্যয় এবং শ্রম ওতেই সফল হয়েছে। (আশ্বিন ১৩৪২)

পত্রিকাটির আরও একটি দিকের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে যেসব চলচ্চিত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয় সেগুলোর অনেকেই চলচ্চিত্রের খুঁটিনাটি নিয়ে, মূলত কারিগরি দিক নিয়ে নিশ্চুপ থাকে। অথচ এই পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল :

চিত্র-পঞ্জী হচ্ছে নিছক চলচ্চিত্র সংক্রান্ত পত্রিকা। আমাদের একাধিক পাঠক অনুযোগ জানিয়েছেন : আমরা চলচ্চিত্র সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে চাই বলেই না এই দুর্মূল্যের বাজারেও প্রতিমাসে চার আনা খরচ করি! কিন্তু শিক্ষামূলক প্রবন্ধ আমরা চিত্র-পঞ্জী মারফৎ ন'মাসে ছ'মাসে পাই। শিক্ষামূলক প্রবন্ধ যদি নিয়মিত না পাই, তো কম পয়সায় পাঁচমিশেলি কাগজ কিনলেই তো পারি—'স্পেশালাইজ্‌ড' পত্রিকা পড়ি কেন?' ...অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম : পাঠকের জ্ঞান-পিপাসা মেটাবার একটি উপায় আছে। উপায়টি হচ্ছে ইংরেজিতে টেকনিকাল প্রবন্ধ প্রকাশ করা। বাংলা কাগজে ইংরেজি প্রবন্ধ প্রকাশ করার বিরুদ্ধে অনেকে হয়তো অনেক কথা বলবেন তা আমরা জানি। ও-ছাড়া অন্য উপায় নেই আমাদের হাতে। (ঐ)

এই লেখা ছাপার পরেই পঞ্চম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৩৪২) প্রখ্যাত শব্দযন্ত্রী মধুসূদন শীল (এম. শীল) একটি প্রবন্ধ লেখেন A Novel Method of Sound Recording : The Blattner phone Stille System, আজও চলচ্চিত্র শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৩৯ সালে ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি ফরিদপুরে (বাংলাদেশ) চলচ্চিত্র কনফারেন্সের পরই *রূপ-মঞ্চ* পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদক ছিলেন কালীশ মুখোপাধ্যায়। প্রায় ত্রিশ বছর পত্রিকাটি বেঁচে ছিল। চলচ্চিত্র সম্পর্কে নানা উৎকর্ষের লেখা পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বঙ্গীয় দর্শক সমিতি তৈরি হয়েছিল বলে শোনা যায়। চলচ্চিত্রের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও মূলত বিনোদন পত্রিকা হয়েই বেঁচে ছিল। এমতাবস্থায় পত্রিকার একটি তালিকা দেওয়া গেল : *খেয়ালী* (সম্পা. সুকোমল বসু), *অচলপত্র* (দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল), *উল্টোরথ*, *সিনেমা জগৎ* (প্রসাদ সিংহ ও গিরীন্দ্র সিংহ), *চিত্রবাণী* (গৌর চট্টোপাধ্যায়), *মনের মতন কাগজ* (শচীন ভৌমিক ও প্রণবকুমার বিশ্বাস), *ছায়া* (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়), *রূপবাণী* (ফণীন্দ্র পাল), *রূপাঞ্জলি* (সুধাংশু বক্সী), *বাতায়ন* (অবিনাশ ঘোষাল), *প্রসাদ* (প্রণব বসু), *রূপম* (শ্যামল চক্রবর্তী) ইত্যাদি আরও অনেক পত্রিকা। উল্লিখিত পত্রিকাগুলো চলচ্চিত্রের গুণকীর্তন করা সহ বিনোদনের অন্যান্য দিকগুলো নিয়েও তাদের পৃষ্ঠাগুলো ভরিয়ে তুলতে দ্বিধা বোধ করত না। এমনকী খেলাধূলা (অকসন ব্রিজ সহ) তাতে স্থান পেত। এছাড়া গল্প-উপন্যাস ধারাবাহিক যা প্রকাশিত হত, মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সেগুলো কোনোভাবে চলচ্চিত্র-পরিচালকদের নজরে আসে। পরে এই ধারা কিছু

পরিমাণে ক্ষীণ হয়ে আসে, চলচ্চিত্র উপযোগী সাহিত্য নয়--শুধুমাত্র সাহিত্য বিবেচ্য হয়ে প্রকাশিত হত, হয়েও থাকে বর্তমান সময়ে। কারণ *উল্টোরথ* বা *সিনেমা জগৎ* বা *সাতরঙ* পত্রিকাগুলিতে বহু উল্লেখযোগ্য গল্প-উপন্যাস ছাপা হয়েছে, কোনটাই চলচ্চিত্রকে সামনে রেখে নয়। পরিতাপের বিষয় দু-একটি অভিজাত গ্রন্থাগার উল্লিখিত পত্রিকাগুলিকে গ্রহণযোগ্য বা সংরক্ষণযোগ্য বলে বিবেচনা করেনি। ফলে সংগ্রহের ধারাবাহিকতা এখানে বেপথুমান হয়ে পড়েছে। এই আক্ষেপ আমাদের মৃত্যুদিন পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যেতে হবে।

আশার কথা, সুদীর্ঘকাল প্রকাশিত *দেশ* সাপ্তাহিক পত্রিকা চলচ্চিত্র (এবং নাটক) সম্পর্কে 'রঙ্গজগৎ' একটি পৃষ্ঠা অথবা বেশি বরাদ্দ রাখতে কোনো দ্বিধা বোধ করেনি। প্রসঙ্গত *দেশ* পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালের ২০ নভেম্বর। অথচ *দেশ* কখনও এমত দাবি করেনি বিশেষ ভাবে চলচ্চিত্রের গুরুত্বের প্রতি। *অমৃত* সাপ্তাহিক পত্রিকায় (১৯৬১) 'প্রেক্ষাগৃহ' কলমে চলচ্চিত্রের সমালোচনা ও সংবাদ প্রকাশিত হত। টানা-পোড়েনে এই দিকগুলি সম্যক উপলব্ধি করতে না পারলে পত্রিকার ইতিহাসের সঙ্গে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস সম্মুখ গতিলাভে বঞ্চিত হবে। বলার বিষয়, উপেক্ষা নামক বস্তুটি ইতিহাসের কি নির্মম শাস্তি--তারাই অনুভব করবেন যাঁরা এই বিষয় নিয়ে আরও গভীরে অনুসন্ধান চালাতে চান।

উল্লিখিত পত্রিকাগুলির একটি বাণিজ্যিক চরিত্র ছিল। অবশ্যই ব্যতিক্রম রয়েছে-- *বায়োস্কোপ, চিত্র-পঞ্জী*। এরই মাঝে আরও কিছু পত্র-পত্রিকার প্রসঙ্গ টেনে আনা প্রয়োজন। ফরাসি চলচ্চিত্রকার রেনোঁয়া সাহেব কলকাতা সফরের পর এদেশের মূলত বাংলার চলচ্চিত্র-প্রাণ যুবকদের মধ্যে উষ্ণ স্রোত বইতে শুরু করে। তার ফলশ্রুতি ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি। পরবর্তী সময়ে তাঁদেরই উৎসাহে, বিশেষত দিলীপকুমার গুপ্ত-র (ডি. কে) আগ্রহে সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় *চলচ্চিত্র : প্রথম পর্যায়* আশ্বিন ১৩৫৭। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন চিদানন্দ দাশগুপ্ত, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ। আজ অস্বীকার করা সম্ভব নয়--এই সংকলনের ভেতর থেকেই ফিল্ম সোসাইটি পত্রিকার উৎপত্তি। সময় বাড়ার সঙ্গে ষাট-সত্তর-আশির দশকে বিভিন্ন সোসাইটি থেকে তাদের মুখপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। ফিল্ম সোসাইটি মুখপত্রের আলোচনা এখানে করা হল না। সেটার স্থান স্বতন্ত্র। যে দৈব-মেধা নিয়ে *চলচ্চিত্র : প্রথম পর্যায়* প্রকাশিত হয়েছিল এবং সমান সঙ্গতি রেখে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি মমত্ব প্রকাশ পেয়েছে সেটাবই ধারা অনুসরণে সোসাইটি পত্রিকাগুলোতে প্রচেষ্টার অনেক খামতি দেখা গেছে। মাত্র দুই-তিনজন দেশীয় পরিচালককে বাদ দিলে অনেক যোগ্য পরিচালক অথবা তাদের ছবি আলোচনায় স্থান লাভ করেনি। এটা পরিতাপের বিষয়। যেটুকু আমাদের নজরে এসেছে, যাঁরা সোসাইটি পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীতে ছিলেন তাদের অধিকাংশই চলচ্চিত্র বিলাসী। তাঁদের কোনো দায় ছিল না পত্রিকার ভাষা সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার। ফলে দুই-এর যোগসূত্র ঘটেনি। হয়ত বা সোসাইটির ধর্ম অনুসারে জনপ্রিয়তার নিরিখ তাঁদের কাম্য ছিল না।

চলচ্চিত্র সাময়িকী প্রকল্পের সঙ্গে দৈনিক পত্রিকাগুলি বিনোদন নিয়ে আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। এই বিষয়ে দৈনিক পত্রিকায় চরিত্র বদলাতে বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল *নাচঘর* সাপ্তাহিক। প্রতি সপ্তাহে বিনোদন সংবাদ পরিবেশিত হতে থাকে, তাতে চলচ্চিত্র সংবাদে স্থান পায়

দৈনিক-এ। একথা ঠিক, চলচ্চিত্র বিষয়ক কোনো দৈনিকের সন্ধান ভারতে পাওয়া যায়নি। একমাত্র দৈনিক লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে *The Daily Film Renter*। এছাড়া আরও সুখের কথা কলকাতা থেকে তিরিশের দশকে (১৯৩৪ খ্রি.) প্রকাশিত হয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে হিন্দি মাসিক পত্রিকা *সিনেমা সংসার*। প্রায় এক বছর সচিত্র পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

সুদীর্ঘ সময় জুড়ে বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র পত্রিকা প্রকাশ প্রায় এক নিরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। সমাজের অন্যান্য উপাদানের মতো চলচ্চিত্রও একটি। ফলে পত্র-পত্রিকায় গুরুত্ব পেয়ে সামনের দিকে আসার চেষ্টা চালিয়েছে, বলা যায়, এই মাধ্যমটিকে ভর করে। সব শিল্প-সৃষ্টির মূল কাঠামোকে আত্মস্থ করে চলচ্চিত্র যখন জন্ম নেয়, কারিগরি দিকটিকে স্মরণে রেখেই বলা, সেখানে থাকে যৌথ-শিল্পের সম্ভাবনা। যেমনটা ঘটেছে ১৯৭৫ সালে প্রথম প্রকাশিত বিনোদন বিষয়ক *আনন্দলোক* পাক্ষিক পত্রিকা। এই পত্রিকার শারদ সংখ্যাগুলিতে সাহিত্য যথা নিয়মে প্রকাশ পায়। যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, চলচ্চিত্র জন্মের সঙ্গে মানুষের ভাবনাগত দিকের প্রভূত পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। একটা সময় ছিল বাতাসে শব্দতরঙ্গ ভেসে আসত। মানুষ পেতে শুরু করে স্থির চিত্র—সেদিক থেকে নির্বাক যুগ কিছু পরিমাণ হলেও আশাপূরণ করেছে। পরে সবাক যুগের চলচ্চিত্র আরও সহস্রগুণ এগিয়ে নিয়ে গেছে। সুতরাং জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে সাহায্য করেছে পত্রিকা-পরিচালকদের। প্রত্যাশা জাগিয়েছে আরও গভীরে প্রবেশ করার। সেদিন থেকে চলচ্চিত্রকে হাতিয়ার সাজিয়ে এগিয়ে যাওয়া অবশ্যই সদর্থক পরিচয়। কিন্তু কেবলমাত্র চলচ্চিত্র—এই বিষয়কে সামনে রেখে টিকে থাকা অথবা তাকে মূলধনে পর্যবসিত করা কতটা সার্থক, তা আমরা *বায়োস্কোপ* পত্রিকার ভাগ্যলিপিতেই দেখেছি। স্বপ্ন সাকার করার পরিকল্পনা সম্পাদকীয়তে স্পষ্টরূপেই দেখতে পাওয়া গেছে, অন্যদিকে *চিত্রলেখা* সেই উত্তরণের পথটুকুর সন্ধান নিতে পারেনি। এই পার্থক্যটাই শিল্পীর জাত চিনিয়ে দেয়। এই দিক থেকে চলচ্চিত্র সর্বদা রসের ভাণ্ডারী হয়ে থেকেছে, কখনও হয়ে উঠেছে রঙের ভাণ্ডারী—মোটেই সহজ নয়। বিদেশেও এমন উদাহরণ খুব বেশি নেই, এই ঝলকই আমাদের আগামীদিনের পাথেয়।

ই স রা ই ল খা ন

বাংলাদেশের সাময়িকপত্র (১৯৪৭-২০০০)

'বাংলাদেশের সাহিত্য' বলতে গবেষকেরা যেমন পাকিস্তান-আমলে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত সাহিত্য-শিল্পকে বুঝিয়ে থাকেন, তেমনি সাময়িকপত্রের আলোচনায়ও তা অনুসরণ করা সঙ্গত। কারণ পাকিস্তানি-ঔপনিবেশিক শাসকদের বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ধ্বংসের ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করতে গিয়ে বাঙালি লেখক-সাহিত্যিকেরা ওই কালে এক তাৎপর্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক-জাগরণের সৃষ্টি করেন। এই জাগরণের অবলম্বন হয়েছিল উনিশ শতকীয় নবজাগরণের বাহনের মতোই পাকিস্তান আমলে প্রচলিত বাংলা ভাষার পত্রপত্রিকা। এই পত্রিকাগুলো পূর্ববাংলায় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনা করে যে জাগরণ ঘটান, তার প্রত্যক্ষ ফল ১৯৭১-এ অর্জিত স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ'।

উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান আমলে প্রায় পাঁচশো বাংলা পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ২০১টি মাসিক, ১২৮টি সাপ্তাহিক, ৫৭টি পাক্ষিক ও ২৭টি দৈনিক, ২৭টি ত্রৈমাসিক, ১৪টি দ্বিমাসিক, ১০টি ষাণ্মাসিক, ৭টি অর্ধ-সাপ্তাহিক, ৭টি সংকলন, ৬টি বার্ষিকী ; চতুর্মাসিক ২টি, মহিলা বিষয়ক ১৭টি, কিশোর পত্রিকা ৩৩টি, বিজ্ঞান-বিষয়ক ১৮টি এবং ১১টি ধর্মবিষয়ক।

রাজধানী থেকে কিছু প্রকাশিত হয়, অধিকাংশই প্রকাশিত হয় মফস্‌সল থেকে। জিলা, মহকুমা ও থানা পর্যায় থেকেও প্রকাশিত হয়েছে। রাজধানী ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম শ্রেণির পত্রিকা *মাহে নও, দিলরুবা, সওগাত, মোহাম্মদী, সমকাল* এখন দুষ্প্রাপ্য। মফস্‌সলের সাময়িকীগুলোর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। অধিকাংশ পত্রিকারই দু'এক বা দু-চার, পাঁচ সংখ্যা সংগৃহীত হয়েছে। বহু পত্রিকার কেবল নাম শোনা যায়। কিছুই জানা যায় না, এমন অনেক পত্রিকা আছে। উন্নতমানের কোনো সাহিত্যপত্রিকা এখানে নিয়মিত প্রকাশিত হতে পারেনি। পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কারিগরী প্রতিবন্ধকতা ছিল প্রকট। বড়ো অভাব ছিল ভালো লেখার। বাংলাদেশের লেখক সম্প্রদায় তখন কেবল গড়ে উঠছেন। অথচ হঠাৎ করে অসংখ্য পত্রিকা প্রকাশ পেতে আরম্ভ করল।

এ-অবস্থায় নব্য-শিক্ষিত, হাতে-খড়ি দেওয়া লেখকদের রচনাতেই ভরে থাকত তাবৎ পত্রিকা। কয়েকটি পত্রিকার মালিক-সম্পাদকই কেবল উন্নতমানের লেখক নির্বাচন করে তাঁদের কাছ থেকে ভালো লেখা সংগ্রহ করতে পেরেছেন। ফলে পূর্ববঙ্গে অল্পসংখ্যক পত্রিকাই দাঁড়াতে পেরেছে। আবার সাম্প্রদায়িক কারণে হিন্দু লেখক ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভারত গমনের ফলে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তা পূরণ করতে গিয়ে স্বল্পশিক্ষিত মুসলমান বাঙালি এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড মান তাঁরা বজায় রাখতে পারেনি। তা অর্জন করতে সময় ক্ষেপণ করতে হয়।

তবে পূর্ববঙ্গের সাময়িক সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয় বিভাগ-পূর্ববর্তী কালের ঐতিহ্য অনুসরণ করেই। *ঢাকা প্রকাশ* ঢাকা থেকে শতবর্ষ আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। বিভাগ-পরবর্তীকালেও তার ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। *অমৃতবাজার, আজাদ* প্রভৃতি পত্রিকার ঢাকাস্থ অফিস ও ব্যবস্থাপনা বলবৎ ছিল। *আইনুল ইসলাম, তরুণপত্র, দরদী, অভিযান, সবুজপল্লী, শিখা, জাগরণ, সঞ্চয়, চাবুক, জিন্দেগী* প্রভৃতি পাক্ষিক, মাসিক, সংবাদ-সাময়িকী ও সাহিত্যপত্র ঢাকা থেকে বিশ, ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে প্রকাশিত হয়েছে। বিভাগ-পরবর্তীকালে সেগুলোর কোনো-কোনোটার প্রকাশ অব্যাহত ছিল। অতএব পূর্ববঙ্গ বা ঢাকা থেকে পত্রিকা প্রকাশের দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল, কিন্তু শৈল্পিকমান ছিল নিম্ন। প্রকাশনা সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা ছিল। বড়ো প্রেস বা মুদ্রণশিল্প বলতে তেমন কিছুই ছিল না। প্রকাশনায় বৈচিত্র্য আনার ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিল না।

বলা আবশ্যক যে, একালে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার মধ্যে এক-দশমাংশ মাত্র বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। বাকিগুলি ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য হাসিলের নিমিত্ত সরকারি প্রযোজনায় প্রকাশিত। সরকারি ইচ্ছা তথা অখণ্ড পাকিস্তান, ইসলামী জাতীয়তাবাদ ও পাক-বাংলার কালচারের পক্ষে জনমত গঠন করতে চেয়েছে। তবু 'বাঙালি' বলে সরকারি উদ্দেশ্য সফল করতে গিয়েও পূর্ববঙ্গের স্বার্থকে তাঁরা উপেক্ষা করতে পারেননি। এবং বুঝেছেন সকলেই এক পাকিস্তানের নাগরিক হলেও বাঙালি-পাকিস্তানিদের সম্মান ও গুরুত্ব পশ্চিম প্রদেশের পাকিস্তানিদের থেকে অনেক কম। এবং সেই অপমান ও আক্ষেপ তাঁদের অজ্ঞাতেই ওই কালের বাংলা পত্রপত্রিকার পাতাতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। মতাদর্শগত শ্রেণিবিভাজনের সময় এসকল পত্রিকাকে তবু পাকিস্তানি আদর্শের প্রচারক বা পাকিস্তানপন্থী পত্রিকার ভাগেই ফেলতে হবে। পাকিস্তানপন্থী প্রধান পত্রিকা ছিল *মোহাম্মদী* (১৯০৩-৭০), *আল্-ইস্লাহ্* (১৯৩২-৭১), *মাহে নও* (১৯৪৯-৭১), *দিলরুবা* (১৯৪৯-৬৪), *নওবাহার* (১৯৪৯-৫৩), *তাহজিব* (১৯৫০), *দ্যুতি* (১৯৪৯-৫৩), *লেখকসংঘ পত্রিকা* (১৯৬১), *পরিক্রম* (১৯৬২-৭০), *সংলাপ* (১৯৬১-৭০) ও *উত্তরঅন্বেষা* (১৯৬৭-৭১) প্রভৃতি।

পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী, ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী ধারার কয়েকটি অপ্রধান পত্রিকার নাম করতে গেলে বলতে হবে *নওরোজ* (১৯৪২-৭১), *জাগরী* (১৯৫৬), *অতএব* (১৯৬০-৬২), *প্রবাহ* (১৯৬১), *দিগন্ত* (১৯৬৬), *অভিযান* (১৯৫৪-৬৪) প্রভৃতির কথা।

পাকিস্তানপন্থী সাময়িকপত্রের বিপরীত ধারায় অবস্থান নিয়ে একগুচ্ছ পত্রিকা ১৯৪৭ সনের পরপরই 'ইয়্যা আজাদী ঝুটা হ্যায়' ঘোষণা করে বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি ও স্বতন্ত্র অর্থনীতি তথা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনা করতে জিহাদে নামে। বামপন্থী বা বামঘেঁষা সংস্কৃতিকর্মীদের ছোটো কাগজগুলোই পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে ছিন্ন করে স্বাধীনতা অর্জনের পথে প্রথম পা বাড়িয়েছিল। তাঁদের সেই কর্মধারা যখন স্বাধীনতার মননক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিল, তখন সেকালের বড়ো কাগজগুলো অর্থাৎ নিয়মিত প্রকাশের আশ্বাস দেওয়া মাসিক-ত্রৈমাসিকগুলো সেই চেতনা-প্রবাহকে গতিদান করে স্বাধীনতার সূর্যস্নাত প্রভাতকে ত্বরান্বিত করেছিল। এই পত্রিকাগুলোর মধ্যে *কৃষ্টি* (১৯৪৭), *সীমান্ত* (১৯৪৭-৫২), *সংকেত* (১৯৪৮-৯), *অগত্যা* (১৯৪৯-৫২), *মুকৃতি* (১৯৫০), *পরিচিতি* (১৯৫১-৫৩), *যাত্রিক* (১৯৫৩), *স্পন্দন* (১৯৫৩), *উত্তরণ* (১৯৫৮-৬১), *পলিমাটি* (১৯৬৪-৯৪) ও *নাগরিক* (১৯৬৪-৭০) উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকাগুলোর প্রকাশ ছিল

অনিয়মিত, ক্ষীণ কিন্তু স্ফুলিঙ্গের ন্যায় উজ্জ্বল ও প্রতিভার দীপ্তিতে ভাস্বর।

উল্লেখ্য, চল্লিশের দশকে পাকিস্তান-আন্দোলনে মুসলিম-লিগের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকলেও এই আন্দোলনের ধারাকে গতিশীল করেছিলেন প্রগতিবাদী সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মী, নেতৃবৃন্দ। তাঁরা জনগণের সামনে নতুন স্বদেশে জীবনের বহুমাত্রিক স্ফূর্তি ও বিকাশের কথা বলেছিলেন বলেই জনগণ পাকিস্তানকে প্রত্যাশিত রাষ্ট্র বলে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এই প্রত্যাশা জাগ্রতকারী সংগঠক ও কর্মীদের মধ্য থেকেই পাকিস্তান-পরবর্তীকালের সংবাদ ও সাহিত্যবিষয়ক সাময়িকপত্রসমূহ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। এতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ববাংলার পত্র-পত্রিকাসেবীগণ উন্নততর সমাজব্যবস্থা এবং স্বদেশহিতের সহায়ক প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি প্রবর্তনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। তমদ্দুন মজলিশের মুখপত্র *সাপ্তাহিক সৈনিক* (১৯৪৮-৫৭), বঙ্কিমচন্দ্র সাহা সম্পাদিত ও প্রকাশিত সাপ্তাহিক (পরে অর্ধ-সাপ্তাহিক) *চাবুক* (১৯৩২-৪৯), নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত *কৃষ্টি* আর চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত *সীমান্ত*– সকল পত্রিকার বক্তব্যই ছিল প্রগতিশীল, বক্তব্য প্রকাশে জড়তা আড়ষ্টতা ও সংস্কারমুক্ত নির্ভীক। উন্নত সমাজব্যবস্থার সপক্ষ নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে উচ্চারিত। কিন্তু ক্রমে মুসলিম লিগের দক্ষিণপন্থীদের ক্ষমতা দৃঢ়ীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কমিউনিস্ট কার্যাবলি কঠোরভাবে দমন করা হয়। নন্-কমিউনিস্ট অথচ বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতি ও চিন্তাচর্চার আগ্রহের উচ্ছেদসাধনপূর্বক তদস্থলে পাকিস্তানি জাতীয় ভাষা তথা উর্দু ও ইসলামী-সংস্কৃতি প্রভৃতির বাস্তবায়ন করার যাবতীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপের ফলে ইসলামী, পাকিস্তানবাদী ধারা সচল ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৬০-৬২ সন পর্যন্ত হয়ত স্বদেশ-অনুভবেই বাঙালিরা তাই 'পাকিস্তান-জিন্দাবাদ', 'পাকসার-জমিনসাদ বাদ' সঙ্গীত ও শ্লোগানে তুষ্টি-তৃপ্তি উপলব্ধি করতেন। কিন্তু আইউব খানের সামরিক শাসনামলে এবং পরবর্তীকালে বাঙালির চিন্তাধারাকে অবক্ষয় কবলিত করে দেওয়ার সরকারি ষড়যন্ত্রের ফলে প্রগতিশীল কার্যাবলী স্তিমিত হয়ে আসে। এজন্য ১৯৪৭-৫৪ সময়কালে প্রগতিশীল ও মার্কসীয় আদর্শ প্রভাবিত সাহিত্যচর্চার নমুনা ও পত্রপত্রিকা প্রকাশের ধারা আনন্দদায়ক হলেও, পরবর্তীকালে সে ধারা ক্ষীণ হতাশাব্যঞ্জক হয়ে পড়েছিল। পূর্ববাঙলায় '৯২-ক' ধারা জারির পর এইসব সাহিত্যিক প্রচেষ্টা 'আন্ডারগ্রাউন্ডে' চলে যায়। সামরিক শাসন উঠে গেলেও ১৯৬৫-৬৬ সালের পূর্বে আর তা বেগবান হয়নি। পাকিস্তানি পররাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিবর্তন আনয়নের ফলে কমিউনিস্ট কার্যাবলি সক্রিয় হয়েছিল যখন,--তখনই 'ছয়দফা' আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তা এদেশে বিকাশলাভ করে এবং স্বাধীনতাসংগ্রামে রূপলাভ করে। এই সময়ে মার্কসীয় মতাদর্শগত ধারার পত্রিকাগুলো সহযোগী ভূমিকা পালন করে মানবতাবাদী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার পত্রিকাগুলোর। মানবতাবাদী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার পত্রিকাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : *ইমরোজ* (১৯৪৯-৫৪), *সওগাত* (নবপর্যায়ে ১৯৫২-৭০), *সমকাল* (১৯৫৭-৭৭), *পূবালী* (১৯৬০-৬৭), *পূর্বমেঘ* (১৯৬০-৭১) ও *কণ্ঠস্বর* (১৯৬৫-৮৬)। এই ধারার অপ্রধান পত্রিকার মধ্যে যেগুলোর নাম করতে হয়, সেগুলো হল : *মেঘনা* (১৯৫৭), *সাহিত্য* (১৯৬০-৬২), *যাত্রী* (১৯৬০-৬২), *সুন্দরম* (১৯৬৩-৬৪), *স্বাক্ষর* (১৯৬৩-৬৬), *স্বদেশ* (১৯৬০-৭০) প্রভৃতি।

২. পাকিস্তান আমলের প্রধান সাময়িকপত্রগুলোর পরিচিতি

ক. মার্কসীয় মতবাদ প্রভাবিত পত্রিকা

১. কৃষ্টি (১৯৪৭)

পাকিস্তানী আজাদী উত্তরকালে ১৯৪৮ সন পর্যন্ত একবছরে ঢাকা থেকে কোনো সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়নি বলে কোনো কোনো গবেষক মত প্রকাশ করেছিলেন (মোহাম্মদ আবদুল কাইউম)। কিন্তু এই তথ্য সঠিক নয়। সাপ্তাহিক *চাবুক* ১৯৩৩ থেকে ৪৯-৫০ পর্যন্ত ঢাকা থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া *কৃষ্টি* ও *সীমান্ত* বাংলা মাস-সনের হিসাবে যথাক্রমে অক্টোবর ও নভেম্বর ১৯৪৭-এ প্রকাশিত হয়। এই হিসাবে *কৃষ্টি* পাকিস্তানকালের প্রথম সাময়িকপত্র। *চাবুক* ছিল অর্ধ-সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

কৃষ্টি উন্নতমানের পত্রিকা—যার আদর্শ ছিল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, বাংলাভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির উজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠা। এ-পত্রেই ছাপা হয় ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের সেই বহুল উদ্ধৃত, পাকিস্তান ভাঙার ভবিষ্যৎবাণী সম্বলিত প্রবন্ধ 'পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা'। ১৯৪৭ সনেই তিনি (ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্বে) উর্দু-বাংলার বিতর্কের ফলাফল বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন 'ইহাতে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সর্বনাশ ঘটিবে' অর্থাৎ 'উর্দু বাহিয়া আসিবে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মরণ,—রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু। এই রাষ্ট্রীয় ভাষার সূত্র ধরিয়া শাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সর্ববিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান হইবে উত্তর ভারতীয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানী উর্দুওয়ালাদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র, যেমন ভারত ছিল ইংরেজি রাষ্ট্রভাষার সূত্রে ইংরেজদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র।'

যে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্রে পূর্ববাংলার স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রাম দানা বেঁধে ওঠে, সেই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে, বাঙালির কী করণীয়, তা লেখক বিস্তারিত যুক্তি দিয়ে সেদিন উপস্থাপন করেছিলেন। বাঙালির ভাষা-চিন্তা সেদিন সঠিক ছিল, *কৃষ্টি* তার নমুনা হয়ে রয়েছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীলতার কারণে, এবং সম্পাদকগণ হিন্দু ও কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন হওয়াতে এর দ্বিতীয় সংখ্যা আর বের হয়নি।

কৃষ্টি প্রকাশিত হয় গোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ থেকে। পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন সুধাংশু রায়, প্রভাত সরকার, সাধন চ্যাটার্জি, ফুলদা রায়, জীবন গোস্বামী প্রমুখ।

২. সীমান্ত (১৯৪৭-৫৩)

একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনায় মর্মাহত হয়ে প্রথম যিনি কবিতা লিখেছিলেন, চট্টগ্রামের সন্তান সেই কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *সীমান্ত* ১৯৪৭ সালেই। এই পত্রিকার মাধ্যমে গড়ে ওঠা 'সাংস্কৃতিক বৈঠক' ; বৈঠক থেকে সৃষ্ট 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ' এবং এগুলোর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম প্রগতিশীল, গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক-সম্মেলন (১৯৫১) প্রভৃতি পূর্ববাংলার স্বাধীনতাকামীদের বৈপ্লবিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পূরক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারারও মূল সুর বেঁধে দিয়েছিল। ১৯৭১ এগিয়ে আসে সে ধারাতেই।

সীমান্ত পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ১৩৫৪ সনের কার্তিক মাসে প্রকাশিত হয়। কার্যালয় ছিল যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম। শহরের ইম্পেরিয়াল প্রেস থেকে মুদ্রিত হত। প্রথম দুবছর *সীমান্ত*-র সহযোগী সম্পাদক ছিলেন সুচরিত চৌধুরী। ১৯৫৩ পর্যন্ত গোটা পঁচিশেক সংখ্যা বেরিয়েছিল। ভাষা-আন্দোলনকালে বাংলার সপক্ষে, সাম্প্রদায়িক-দাঙ্গার বিরুদ্ধে, বিশ্বশান্তি আন্দোলনের জন্যে পারমাণবিক বোমা নিষিদ্ধকরণের দাবিতে সেকালে যে সকল বক্তব্যসমৃদ্ধ রচনা দিয়ে সীমান্তর প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তেমন একটি পত্রিকা ওই কালে আর বের হয়নি। সকল পত্রিকার মধ্যে *সীমান্ত*-র স্বাতন্ত্র্য সহজেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। প্রগতিশীল বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণার বিকাশ ঘটিয়ে মুক্তি-সংগ্রামের পটভূমি প্রস্তুতে *সীমান্ত*-র রয়েছে অবিস্মরণীয় অবদান।

৩. সংকেত (১৯৪৮)

সিরাজুর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত *সংকেত*-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তখনকার বামপন্থী লেখক আলাউদ্দিন আল আজাদ ও চৌধুরী মমতাজ হোসেন। 'পূর্বপাকিস্তানের একমাত্র প্রগতিশীল বাংলা মাসিক' আখ্যা দিয়ে প্রকাশিত *সংকেত*-ও দু'এক সংখ্যাব বেশি প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায় না। *সংকেত*-এর লেখার দৃষ্টি পাকিস্তান-বিরোধী ছিল, যদিও কায়েদে আজমের প্রতি ছিল তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা।

৪. অগত্যা (১৯৪২-৫২)

চট্টগ্রাম ও ঢাকা থেকে *সীমান্ত, কৃষ্টি, সংকেত* ইত্যাদি প্রকাশিত হলেও *কৃষ্টি* ও *সংকেত*, এক-দুই সংখ্যার বেশি প্রকাশিত হয়নি। আর *সীমান্ত* 'মাসিক' হলেও অনিয়মিতভাবে বের হচ্ছিল। অতএব ঢাকার প্রগতিপন্থী লেখক-সাহিতিকদের বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম তখনও সৃষ্টি হয়নি। *মোহাম্মদী, মাহে নও, দিলরুবা* প্রভৃতিতে প্রতিবাদীদের স্থান ছিল না। এমতাবস্থায় তরুণ প্রাণের অকৃত্রিম হৃদয়াকুতি এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য একটি উপযুক্ত পত্রের প্রয়োজনবোধ থেকেই আষাঢ় ১৩৫৬-তে ১০৭ ইসলামপুর, ঢাকা থেকে *অগত্যা* প্রকাশিত হল—যার কর্ণধার ছিলেন একদল প্রতিভাবান তরুণ, পরবর্তীকালে এঁদের অধিকাংশই বাংলাদেশের 'বুদ্ধিজীবী' 'শিল্পী' ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। ফজলে লোহানী, ফতেহ লোহানী, খোন্দকার আবদুল হামিদ; তসিকুল, আলম খাঁ, সাবের রেজা করিম, কামরুল হাসান, আবদুল আহাদ, কাজী আলাউদ্দিন, আবু সঈদ নাসির, মাহবুব জামাল জাহেদী, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, আতাউর রহমান, আনিস চৌধুরী প্রমুখ *অগত্যা*-র আড্ডায় একত্রিত হয়েছিলেন। এই পত্রিকাকে ঘিরেই এঁদের উচ্ছ্বাস, আনন্দ, চিন্তা-ভাবনা এবং কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয় পঞ্চাশ দশকের সূচনালগ্নে।

বলা বাহুল্য, *অগত্যা* ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিল তৎকালীন সমাজে ও সাহিত্যে। এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ তাঁরা ছিলেন মেধাবী আর রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আইডেনটিটির ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থান ছিল মুসলিম লিগের, পাকিস্তানপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল, প্রতারক ইসলামী ধারার বিপক্ষে। এক কথায় এস্টাব্লিশমেন্টের বিরোধিতা করা ছিল তাঁদের উৎসাহী কার্যাবলির মূল প্রেরণা। এস্টাব্লিশমেন্টের ভণ্ডামি, প্রতারণা এবং অপকীর্তির মুখোশ

উন্মোচন করতে গিয়ে তাঁরা যে পদ্ধতি, পন্থা ও ভাষাকে আশ্রয় করেছিলেন, তাতে ছিল তীক্ষ্ণ হুল, শ্লীলতাবর্জিত ব্যঙ্গ-কৌতুক ও হাস্যরস। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই *অগত্যা* ব্যাপকভাবে পঠিত ও বহুপরিচিত হতে পেরেছিল। সঙ্গে সঙ্গে কুখ্যাতিও অর্জন করেছিল 'ভদ্রলোকের পত্রিকা নয়' বলে। বলা হত, ভদ্রলোকের অপাঠ্য, অশ্লীল, কিন্তু বিষয়বস্তুর কারণেই তা প্রতিষ্ঠিত-অপ্রতিষ্ঠিত, খ্যাত-অখ্যাত, সরকারি, সরকার-বিরোধী, সকল প্রবীণ-তরুণদের পাঠ্য হয়েছিল। এর সমালোচনার বিষয় ছিল মুসলিম লিগ সরকারের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক প্রশাসনিক অপপ্রয়াস। আর প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ কবি-সাহিত্যিক এবং তাঁদের অনুসারী হবু-খ্যাত ডানপন্থী তরুণ কবি-সাহিত্যিক। ফলে অশ্লীল বলে পড়ব না--এমন ভাব দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলত না। এককালে যেমন চলত না *কল্লোল* (১৯২৩) *অগ্রগতি* (১৯৩৫), *অচলপত্র* না-পড়ে অবজ্ঞা করা। অবশ্য একথা বলতে হবে যে, জনপ্রিয় হবার ও পরিচিতি অর্জনের কৌশল ও মেধা আর সাহস উদ্যোক্তাদের দলপতি ফজলে লোহানীর বেশ ভালোই ছিল।

অগত্যা-র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় আত্মপরিচয় দেওয়া হয় 'বিচিত্র মাসিকপত্র' বলে। বর্ষ আরম্ভ হয় আষাঢ় ১৩৫৬ থেকে। মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা। বলা হত : 'অগত্যার প্রচার সুরুচিসম্পন্ন পাঠক এবং সু-সংস্কৃত ছাত্রসমাজ-এ'। আরও বলা হত : "*অগত্যা* একমাত্র প্রগতিশীল সাহিত্যপত্রিকা। জীবন, সাহিত্য, চলতিঘটনা, বিশ্বপরিস্থিতি, সিনেমা, বেতার, দর্শন, বিজ্ঞান, কারুকলা এবং আমাদের কৃষ্টি ও অগ্রগতির একমাত্র পরিচায়ক মননশীল রুচিসম্পন্ন সাহিত্য রচনাই অগত্যার উদ্দেশ্য। রাজনীতির সঙ্গে অগত্যার কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো দল বা গোষ্ঠীর প্রচারপত্র অগত্যা নয়। অগত্যা আপনার আমার সকলের মুখপত্র।

"পৃষ্ঠা সংখ্যা চৌষট্টি। প্রতিপৃষ্ঠার মূল্য আধ পয়সা। চৌষট্টি পৃষ্ঠা অন্তত চৌষট্টিবার পড়তে ইচ্ছে করবে আপনার। অগত্যা ঢাকা থেকে প্রকাশিত। দ্বিবর্ণে ও প্রয়োজনবোধে বহুবর্ণে মুদ্রিত হবে।"

অগত্যা-য় কায়েদে আজম বা কবি মুহম্মদ ইকবালের কোনো স্তুতি না-করেই রবীন্দ্রনাথের উক্তি পুরোভাগে উদ্ধৃত করে এবং ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ ছেপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সোবিয়েট সাহিত্যিক আন্তন চেকভ সম্পর্কে আলোচনা ও মার্কসীয় ধারার লেখক খাজা আহম্মদ আব্বাস-এর রচনার অনুবাদ এতে গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয়। প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত ইলিয়া ইলেনবুর্গ, অ্যালান মঁরে, আনাতোল ফ্রান্স, বালজাক, বার্নার্ড শ, হেমিংওয়ে, এ গ্রিনিন, গোর্কি প্রমুখ প্রগতিপন্থী লেখকের অনুবাদ *অগত্যা*-য় ছাপা হয়। এদেশে পত্রপত্রিকায় এই শ্রেণির সাহিত্যের প্রকাশ অনেকটা নতুন ছিল।

৫. মুক্তি (১৯৫০)

বাংলাদেশের সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায়-বিস্মৃত ও অনালোচিত একটি পত্রিকা--*মুক্তি*। *মুক্তি*-র সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন কবি-সাংবাদিক আবদুল গণি হাজারী। যুগ্মসম্পাদক ছিলেন মাহবুব জামাল জাহেদী। সদস্য ছিলেন : অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, সরদার জয়েনউদ্দিন। প্রচ্ছদশিল্পী কামরুল হাসান।

পত্রিকার কর্মকর্তাবৃন্দ ছিলেন সেকালের উজ্জ্বল তরুণ সাহিত্যকর্মীগণ। লেখকসূচিও দখল করেছিলেন সেরা মেধাবী শব্দ-সৈনিকেরা। বাঙালির জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনার ভিত্তি বিনির্মাণ ও বিকাশে তাদের অবদান রয়েছে।

৬. পরিচিতি (১৯৫১-৫৩)

মফিজউল হক পঞ্চাশের দশকের প্রগতিশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিনির্মাণের জন্য চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশ করেছিলেন ত্রৈমাসিক *পরিচিতি*—যা দলিল হয়ে রয়েছে সেকালের সাংস্কৃতিক বিতর্ক ও সম্মেলন প্রভৃতির। এসবে বিকশিত হয় পূর্ববাংলার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বাঙালির মনন-স্বরূপ, আর বাঙালি জাতীয়তাবাদ। প্রকৃতপক্ষে *কালিকলম, অগ্রগতি* প্রভৃতি পত্রিকার আদর্শে, সুন্দর ঝক্‌ঝকে ছাপায় এবং রুচিশীল প্রচ্ছদে প্রবর্তক প্রেস থেকে শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী ছেপে দিতেন। ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউট ছিল তাঁদের কেন্দ্র। সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সমরেন্দ্র দত্ত, সিরাজুল ইসলাম (আজিজ মিসির), রুস্তম খান, এরশাদ হোসেন। প্রথম সংখ্যায় লেখা দিয়েছিলেন আবুল ফজল, শওকত ওসমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, শামসুর রাহমান, অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী, মুনীর চৌধুরী, মিহির সেন, সলিল চৌধুরী, চিরঞ্জীব দাশ শর্মা। ফলে পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে যায়। 'বুদ্ধির মুক্তি' শীর্ষক আবুল ফজলের প্রবন্ধই ছিল পত্রিকার মূল আদর্শ। *পরিচিতি*-র মুক্তিসাধনার সঙ্গে গ্রথিত হয়ে আছে আমাদের ১৯৭১ সনের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু মফিজউল হক এবং *পরিচিতি* দুইটিই অবহেলিত, বিস্মৃত নাম আজ।

৭. যাত্রিক (১৯৫৩)

বাঙালি জাতীয়তাবাদে আস্থাশীল, বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনের সক্রিয়কর্মী, পঞ্চাশ দশকের ছাত্র রাজনীতির একজন পুরোগামী সৈনিক, চিন্তক ডা. শহীদ আবদুল আলীম চৌধুরী এবং আহমদ কবির যৌথ সম্পাদনায় বের করেছিলেন *যাত্রিক*। বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনের অব্যবহিত পরে সমাজ পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল বলে অচিরেই তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। *যাত্রিক*-এর লেখক সকলেই খ্যাতিমান। কাজী মোতাহার হোসেন ব্যতীত সকলেই ছিলেন তরুণ, সেকালের সম্ভাবনাময় লেখক—আলীম চৌধুরী, চৌধুরী নূরুদ্দীন, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, আনিস চৌধুরী, শামসুর রাহমান, আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুল গণি হাজারী, হাসান হাফিজুর রহমান, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, এবনে গোলাম সামাদ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, জহির রায়হান, ফজলে লোহানী, আবদুর রশীদ, সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ সফিউল্লাহ প্রমুখ। তাঁদের রচনা ছিল জাগরণধর্মী। বাঙালি সমাজকে অধিকার সচেতন করে তোলার মাধ্যমে মুক্তিসংগ্রামের পটভূমি প্রস্তুতে এই পত্রিকা বিশেষ অবদান রাখে।

৮. স্পন্দন (১৯৫৩)

মার্কসীয় মতাদর্শ প্রভাবিত পত্রিকার তালিকায় *স্পন্দন*-এর অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে বলতে হয়, ঘোষিত কমিউনিস্ট ১৯৫৪ সনের পূর্বে বাংলায় টিকতে পারত না। সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকায়

রাজনীতি করার অধিকারও সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত ছিল। এমন অবস্থায় *স্পন্দন* 'পূর্বপাকিস্তানের একমাত্র প্রগতিশীল পত্রিকা'রূপে আত্মপ্রকাশ করে মহিউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায়। এই পত্রিকায় তখনকার প্রগতিশীল লেখকেরা লিখতেন।

৯. উত্তরণ (১৯৫৮-৬০)

সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত *সমকাল* (১৯৫৭)-এর প্রভাবপুষ্ট উন্নতমানের একটি পত্রিকা ছিল *উত্তরণ*। ১৯৫৮ সনে আইউব খানের সামরিক শাসন জারির সন্ধিক্ষণে পূর্ববাংলার প্রথম শ্রেণির একটি সাহিত্য পত্রিকা *উত্তরণ* প্রকাশ করেছিলেন এনামুল হক। ত্রিমাসিক পত্রিকা, তিন বৎসর চলে। তৎকালে পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবী-লেখক সম্প্রদায়ের মানস-মুক্তির লক্ষ্যে সে ছিল এক অপূর্ব প্রয়াস। 'কালের দাবি' মেটানো বলে যে কথা সাহিত্যের সমাজতান্ত্রিক সমালোচনার ধারায় ভূমিকা বিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়,—সে বিবেচনায় 'উত্তরণ' প্রকৃতপক্ষে সার্থক পত্রিকা ছিল। বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতিতে এর উচ্চমূল্য অস্বীকার করা যাবে না।

১০. পলিমাটি (১৯৬৪-৭০)

পলিমাটি-র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের 'বসন্ত ঋতুতে' একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা-শহীদদের স্মৃতিসংখ্যারূপে, 'কালের যাত্রার ধ্বনি' শোনবার ব্যাকুল আগ্রহে। কালের হিসেব কষলে দেখা যায়, ছয়-দফা আন্দোলনের সমকালে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনে উন্মুখ তরুণসমাজের মুখপত্ররূপে *পলিমাটি* আত্মপ্রকাশ করেছিল। তখন এদেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়া ও চীনের লাল ও হলুদ মলাটের বই প্রচুর আমদানি হচ্ছে, আর মার্কসীয় মতাদর্শের প্রভাব বাংলার তরুণ সমাজের ওপর পড়ছে লক্ষণীয়রূপে। এদেশের তরুণ সমাজ স্বপ্ন দেখছেন শোষণহীন, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার। এঁদেরই কজনা : আবুল কাসেম ফজলুল হক, রফিক আজাদ, রফিকুল আলম খান, গোলাম সারোয়ার, মাহবুবউল্লাহ, বুলবুল খান মাহবুব, হুমায়ুন আজাদ, হুমায়ুন কবির, মনসুর মুসা; আলাউদ্দিন খান, আহমদ ছফা প্রমুখ *পলিমাটি*-তে স্বদেশহিতের সাধনা করেছিলেন।

১১. নাগরিক (১৯৬৪-৭০)

ডাক্তার আহমদ রফিক ছদ্মনামে *নাগরিক* সম্পাদনা করতেন। 'নাগরিকের আসা যাওয়া' শীর্ষক একটি স্মৃতিচারণামূলক রচনায় লিখেছিলেন, '...উঠতি ঢাকার বর্ধমান নাগরিক চরিত্রের কথা মনে রেখে পত্রিকার নাম দাঁড়াল 'নাগরিক'। এক কথায় গড়ে উঠতে থাকা নাগরিক সংস্কৃতির দর্পণ ও মুখপাত্র।' বাঙালির সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষা সেকালে নাগরিকের সাত বছরের স্বল্পায়ুজীবনে কতখানি ধরা পড়েছে, তা অনুসন্ধান করলে দেখা যায়—ঢাকার বিশিষ্ট লেখকেরা মধ্যবিত্ত শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করেছিলেন *নাগরিক*-এ। বাঙালিদের স্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তায় প্রণোদিত হতে সহায়তা করেছিল *নাগরিক*। আর একারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে যেসকল পত্রিকা স্বীকৃতিলাভ করবে, *নাগরিক* নিশ্চয়ই সে সঙ্গে থাকবে।

৩. মানবতাবাদী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার সাহিত্যপত্রিকা

বিশ ও ত্রিশের দশকে *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা* (১৯১৮), *সওগাত* (১৯১৮), *ধূমকেতু* (১৯২২), *সাম্যবাদী* (১৯২৩), *শিখা* (১৯২৭), *নওরোজ* (১৯২৭), [illegible] (১৯২৮), *সঞ্চয়* (১৯২৮), *মোয়াজ্জিন* (১৯২৮), *জয়তী* (১৯৩০), *বুলবুল* (১৯৩৩) প্রভৃতি মুসলিম সম্পাদিত সাহিত্যপত্রিকা প্রগতিশীল মানবতাবাদী ধারার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও তিরিশ ও চল্লিশের দশকে স্বাতন্ত্র্যবাদী, পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী, ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী ধারাই প্রবল হয়ে ওঠে এবং এমনকি *সওগাত* ও অন্যান্য প্রগতিশীল পত্রপত্রিকার লেখকেরা পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত তো বটেই, ষাটের দশকেও পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী মনোভাবের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছিলেন। তবু মানবতাবাদী ধারাটি কখনই শুকিয়ে যায়নি।

প্রগতিবাদের প্রতি অনুরাগী কতিপয় সাহিত্যপত্রিকা ওই কালে যে বের হয়েছে, তাতে অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী, উদারপন্থী চিন্তাধারার পরিচয় দুর্লক্ষ্য নয়। ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী, পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী *মাহেনও-মোহাম্মদী*-র সঙ্গে এক গোত্রে বিবেচনা করা চলে না, আবার মার্কসবাদীও নয়, পক্ষান্তরে পাকিস্তানকে অস্বীকার না-করে জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক আকুতি নিয়ে যে কতিপয় পত্রিকা সাতচল্লিশের পরে পূর্ববাংলা থেকে প্রকাশিত হয়েছে—সেগুলোর সংখ্যা খুব বেশি নয়। প্রকাশের সময়ও ষাটের দশক। ১৯৪৯ সনে *ইমরোজ* এবং নবপর্যায়ে *সওগাত* ছাড়া ১৯৫৭ সনে *সমকাল* প্রকাশের আগে পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার পত্রিকার সংখ্যা এতই কম ছিল যে, *সমকাল, পূর্বমেঘ* ও *পূবালী* প্রভৃতি না বেরুলে এই ধারার পত্রিকার তেমন গুরুত্ব স্বীকার না-করলেও চলত। অথচ সেকালে এই কটি পত্রিকাই মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে।

১. ইমরোজ (১৯৪৯-৫৪)

পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রগুলোর মধ্যে *ইমরোজ* গুরুত্বপূর্ণ হলেও এখন এর নাম অনেকেই জানেনা। এটি পাঁচবছর নিয়মিত প্রকাশ পায়। খ্যাতনামা লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ ছিল। *ইমরোজ* পরিচালনা করতেন প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী অনিলচন্দ্র ঘোষ। সেকালের বন্ধ্যা সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে যখন অসাম্প্রদায়িক, বাংলা ভাষার সপক্ষে সুপারিশকারী নিয়মিত কোনো শক্তিশালী পত্রিকা ছিল না তখন *সীমান্ত, অগত্যা, মুকুতি, যাত্রিক, স্পন্দন* প্রভৃতির সঙ্গে মিলেছিল সুব্যবস্থাপনায় *ইমরোজ*। ফলে সহায়ক হয়েছিল বাহান্নর ভাষা সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীদের। এদের বিপক্ষে ছিল একঝাঁক পাকিস্তানপন্থী নিয়মিত ও অনিয়মিত, সরকারি ও বেসরকারি পত্রপত্রিকা। *সওগাত* নবপর্যায় ১৯৫২-তে প্রকাশিত হলেও ১৯৫৮ সন পর্যন্ত অনিয়মিত বা বন্ধ ছিল। আর সামরিক শাসনের সময়ে বৃদ্ধ সম্পাদক, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ততটা বিপ্লবী হতে পারেননি। তাছাড়া *সওগাত* কলকাতার পর্ব শেষ করে ১৯৪৯ সনে ঢাকা এসে যখন বের হয়নি, বন্ধ—তখন এখানে নিয়মিত মাসিকরূপে *ইমরোজ* প্রকাশিত হত বাঙালির অকপট জীবনধারার রূপকার হিসেবে।

তাই নানা ঐতিহাসিক-সামাজিক কারণের সমন্বয়ে *ইমরোজ* খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী একটি মাসিক সাহিত্যপত্র ছিল।

মোহাম্মদী, মাহেনও, আল্-ইসলাহ, নওবাহার, দ্যুতি ও *তাহজিব* প্রভৃতির সাধনা ছিল যেখানে ইসলামী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার, সেখানে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক আধুনিক রাষ্ট্র ও মাতৃভাষার নির্বাধ নিঃশঙ্কচর্চার উপযোগী সাহিত্যপরিবেশ সৃষ্টিতে *ইমরোজ* সুদৃঢ় অবস্থান নিয়েছিল।

ইমরোজ কথার মানে 'আজকে', টু-ডে। মুসলমান সমাজে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য অনিলচন্দ্র ঘোষ মুসলমান সম্পাদক নিয়োগ করে মুসলমানদের পত্রিকা মনে হয়, এমন একটি পত্রিকা বের করতে চেয়েছিলেন। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কবি মঈনুদ্দীন, মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্, শেখ আবদুল হাকিম প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ, হিন্দুসাহিত্যিক ও হিন্দুরচিত সাহিত্য এতে ছাপা হয়েছে। পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রতি অনুগত ইসলামী বিষয়ও প্রচুর ছাপা হয়েছে। *ইমরোজ* বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি তথা জাতীয় উন্নতি-অগ্রগতির জন্য সচেষ্ট ছিল। স্বাধীনতার পরও দুই সম্প্রদায়ের মনের বিদ্বেষবিষ দূর হয়নি, সাহিত্যেও তা পূর্বের ন্যায় ক্রিয়া করেই চলছিল। এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের কাছে প্রায় শত্রুরূপে চিহ্নিত হচ্ছিল। তখন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নিকট থেকে এঁরা সংগ্রহ করেছিলেন 'সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা' শীর্ষক প্রবন্ধ। ১৯৫০ সনের দাঙ্গার কালে তাঁরা স্পষ্টই মতামত জানিয়েছিলেন এই দাঙ্গার জন্য তাঁরা 'দুঃখিত ও লজ্জিত'।

ইমরোজ-এর লেখক ও বিষয়বস্তুতে প্রতীয়মান হয় হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থে বা কল্যাণে এর পাতায় জ্ঞানের চর্চায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনা এর প্রতিটি রচনার মূল প্রেরণা। বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশকে তাঁরা আলোচনার মুখ্য বিষয় করেছিলেন।

২. সওগাত (১৯১৮-৮০)

১৯১৮ সনে মুসলিম বাংলার প্রগতিশীল ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যপত্রিকা *সওগাত* আত্মপ্রকাশ করেছিল যখন, তখনকার মুসলিম সমাজকে এককথায় অবপতিত বলা চলে। সেই সমাজকে আলোর মুখ, মুক্তির দিশা দেখাবার সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই *সওগাত* বের হয়েছিল এবং সফল হয়েছিল। সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অগ্রগতিতে *সওগাত*-এর সাধনা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু *মোহাম্মদী*-র ন্যায় সওগাতের স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের ভূমিকাও প্রথম অধ্যায়ের তুলনায় হীন! মুসলিম সমাজে যখন 'আধুনিক' ভাবনা-চিন্তার নিতান্ত অভাব, তখন এই পত্রিকাই ছিল সর্বাধুনিক সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজভাবনার প্রধান অবলম্বন। *সওগাত*-এর ভূমিকা তাই এককথায় 'বিপ্লবী' ছিল এবং *শিখা*-র সমগোত্রীয় পত্রিকা *সওগাত*-এর সম্পাদকও মুসলিম সাহিত্যসমাজের নেতৃবৃন্দের ন্যায় *সওগাত* বের করে শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন। ঢাকা থেকে ১৯৫২ সনে প্রকাশিত *সওগাত*-এর সম্পাদকীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় :

> সওগাত তার জীবনের সুদীর্ঘ সময় কলিকাতায় কাটাইয়া আজ আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হইতে নবপর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করিল।...সংক্ষেপে এইটুকু বলিয়া রাখি যে, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি ও চিন্তা-চর্চার ক্ষেত্রে 'সওগাত' চিরদিনই গোঁড়ামী ও

> সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থাকিয়া উদার মত ও পথের অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে এবং আল্লাহর ইচ্ছা হইলে এখনও তাহাই করিতে থাকিবে।

সওগাত-এর সুদৃঢ় ঘোষণা সত্ত্বেও ১৯৫৮ সন পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হতে পারেনি। ১৯৫৮-র পর *সওগাত* যখন নিয়মিত বের হয়--তখন আদর্শ প্রচারে এবং পত্রিকার মান ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। পাকিস্তান আমলের *সওগাত* একটি গতানুগতিক পত্রিকা। মাঝে মধ্যে ভালো লেখা ছাপা হলেও ইসলাম, মুসলমান, মুসলিম-বিশ্ব, পাকিস্তানের স্বার্থ, ভারতের শত্রুতা ইত্যাদি যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি আবুল ফজল, আবদুল হক প্রমুখের মুক্তবুদ্ধির আলোচনাও *সওগাত*-এ ছাপা হয়েছে। কিছু ভালো স্মৃতিকথা যেমন আবুল ফজলের 'রেখাচিত্র', 'লেখকের রোজনামচা', গাজী শামসুর রহমানের 'আইনের চোখে' এবং আবুল হাসানাতের 'ফসলের ঘ্রাণ', হুমায়ুন কাদিরের 'দূরের আকাশ', জাহাঙ্গীর শাহ নওয়াজের 'মনমাঝি' এবং নুরুল ইসলাম খানেব 'এক আকাশ লক্ষ তারা', রশীদ আল ফারুকীর 'কেন্দ্রবিন্দুতে প্রত্যাবর্তন' প্রভৃতি উপন্যাস, আর অনেক অনূদিত রচনা *সওগাত* প্রকাশ করেছে। এসবের দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক এবং আধুনিক সাহিত্যের সম্পদ সেগুলো। এই বিবেচনায় *সওগাত*-এর অবদানকে খাটো করে দেখা যায় না। কারণ মাসে মাসে নিয়মিত প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা এদেশে বেশি নয়। লেখকদের বিচিত্র রচনাপ্রকাশের বিরাট-ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় *সওগাত*।

৩. সমকাল (১৯৫৭–৭৭)

সমাচার দর্পণ থেকে আজকের *সুন্দরম* কিংবা *লোকায়ত* পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্য- পত্রিকাসমূহের মধ্যে *সমকাল* নিঃসন্দেহে প্রধান একটি পত্রিকা। মুসলিম সম্পাদিত সাময়িকপত্রের অথবা পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রের মধ্যে *সমকাল* প্রধান পাঁচটির একটি। *সওগাত, শিখা, মোহাম্মদী*-র পরেই *সমকাল*-এর অবস্থান। জাতীয় পুনর্গঠনে এই পত্রিকা *বঙ্গদর্শন*-এর মতোই 'পাকিস্তান-দর্শন' করেছিল এবং বাংলাদেশের মুখোম্মোচন করে দিয়েছিল। *সমকাল* বস্তুত 'মুসলিম সাহিত্যসমাজ', *শিখা* এবং *সওগাত*-এর উত্তরসূরি, একই ঐতিহ্যধারায় পুষ্ট। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে...*সওগাত*-এর সরণি বেয়ে *সমকাল*-এর নেতৃত্ব শুরু হল। *সমকাল* সম্পর্কে হাসান হাফিজুর রহমান লিখেছেন :

> সমকাল সবদিক দিয়েই একটি আধুনিক পত্রিকা। সওগাত এবং শিখা যে আধুনিকতার জন্য সংগ্রাম করেছে তারই পরিপূর্ণ ফসল একে বলা যায়।..সমকাল শুধু অসাম্প্রদায়িক নয়, ধর্মনিরপেক্ষও। সমকাল বিষয়বস্তুর পরিবেশনে স্বেচ্ছাধর্মী এবং অগ্রসর জীবনচেতনা ও সংগ্রামের মুখপত্র হয়ে উঠতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। এ-ক্ষেত্রে জাতিগত বিমূর্ত মূল্যবোধের অগ্রসরতার সঙ্গেই যোগস্থাপন সে করেছে।

জাতীয়তার প্রশ্নে *সমকাল* উচ্চকিত ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেই দেখা গেল স্বাতন্ত্র্যই মুক্তি নয়। দুর্বল বাঙালি ন্যাশনালিটি প্রবল পাঞ্জাবি ন্যাশনালিটির বন্ধনে বাধা পড়েছে। স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জায়গায় নতুনভাবে দেখা দিল আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। *সমকাল* এ-প্রশ্নে বিপদ বরণ করেও সাহসিক এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এ-প্রশ্নের সমাধানে স্বাধীন বাঙালি জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব। এ-উদ্ভবে *সমকাল*-ও তার কৃতিত্ব-চিহ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে।

সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদক, হাসান হাফিজুর রহমান ছিলেন সহযোগী। সম্পাদকের চারিত্র্যের উপর পত্রিকার ভূমিকা এবং বৈশিষ্ট্যের মাত্রা নির্ধারিত হয়। উনিশ শতকে এমন কতিপয় মহান সম্পাদক আবির্ভূত হয়েছিলেন বলেই বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি দ্রুত বিকশিত হয়ে উন্নততর স্তরে পৌঁছতে পেরেছিল। উনিশ শতকের *সংবাদ প্রভাকর*, *তত্ত্ববোধিনী*, *বঙ্গদর্শন* এবং বিশ শতকের *সবুজপত্র*, *সওগাত*, *শিখা*, *কল্লোল*, *বুলবুল*, *চতুরঙ্গ*, *পরিচয়*, *কবিতা*, *মোহাম্মদী*, *সমকাল* প্রভৃতি পত্রিকার বৈশিষ্ট্য প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পাদকের ব্যক্তিত্বের কারণেই সৃষ্টি হয়েছিল।

সমকালের প্রধান লেখক আবুল ফজল, আবদুল হক, শামসুর রাহমান প্রমুখ। সুনির্বাচিত লেখাসমূহের একটিই উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি সমাজকে জাগিয়ে দেওয়া--পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ ও বৈষম্য-বিশ্বাসহীনতার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা এবং বাঙালির জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে উচ্চারণ করা সত্যভাষণ। আবুল ফজল আইউব খানের সামরিক শাসনামলের সেই ভয়ঙ্কর দুর্দিনে লেখক-শিল্পীর স্বাধীনতা এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক অবরুদ্ধ অবস্থার বিরুদ্ধে লিখেছিলেন কালের দাবি মিটিয়ে দুর্দান্ত সব অনল-বর্ষী স্পষ্টতই বিপ্লবাত্মক সফল প্রবন্ধ। 'সাহিত্যিক সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধে আবুল ফজল লিখেছিলেন :

> এ যুগের সাহিত্যিক শিল্পীরা কালের ও রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে একরকম বলি বললেই চলে। শহীদ তাঁরা নন, তাঁরা আজ হাড়ি কাঠের বলি। স্বাধীনতার পর দেশের যা অবস্থা হয়েছে, সেই অবস্থার যূপকাষ্ঠে সাহিত্যিক শিল্পীরাই হচ্ছেন নির্ভেজাল বলি। স্বাধীনতার পর থেকেই ভাষার ওপর চলেছে এক উৎপাত...আমাদের যা কিছু উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বা রচনা সবই আমরা যখন বাঙালি ছিলাম তখনকার...গত এগার বছরে আমাদের প্রবীণরা যেমন কিছু সৃষ্টি করতে পারেননি, তেমনি পারেননি তরুণরাও। এমনকি জয়নুল আবেদিনেরও যা কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি, তাও সব স্বাধীনতার আগেই আঁকা। সাহিত্য যতখানি জীবনের সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছবি ততখানি নয়।..

আবুল ফজল বলেন, "আমরা কি লিখলে, কেমন করে লিখলে শাসকদের বিষনজরে পড়বনা, তাও আমাদের এক দুশ্চিন্তা। ফলে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, বিনা আবেগ ও বিনা প্রেরণায় আমরা সাহিত্যিকরাও বহু শ্লোগান আউড়িয়েছি এই এগার বছর ধরে। তা সত্ত্বেও সাহিত্যের অগ্রগতির চেয়ে পশ্চাৎগতিই হয়েছে বেশি।' পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের সংকট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি যথার্থই বলেন, বাঙালির সামনে কোনো রাষ্ট্রাদর্শ নেই বলেই সাহিত্যাদর্শ কিংবা সাহিত্যসৃষ্টির পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। লক্ষণীয়, 'পাকিস্তান-আন্দোলন' ও তার সাফল্য প্রতিভাবান শিল্পী-সাহিত্যিকদের মন-মানসে কোনো নতুন জোয়ার আনতে পারেনি, অন্তরের অন্তঃস্থলকে গভীরভাবে নাড়া দেয়নি কারও, খুলে যায়নি তাদের চোখের সামনে সাহিত্য-শিল্পের কোন নতুন দিগন্ত-রেখা। স্বাধীনতার অরুণোদয়ে কারও মন-মানস হয়নি মুখর--নতুন আবেগে কারও উদাত্ত কণ্ঠ হয়ে ওঠেনি উচ্ছ্বসিত।

আবুল ফজলের ন্যায় আবদুল হকও বিভিন্ন রচনায় পাকিস্তানের কাঠামো থেকে বাঙালিকে বেরিয়ে আসার জন্য শাণিত বক্তব্য তুলে ধরেন। একটি রচনায় তিনি স্পষ্টতই বলেন :

> পাকিস্তান ঐতিহাসিক কারণ পরম্পরায় এক রাষ্ট্র হলেও, চোখ বুজে বাস্তবকে অস্বীকার না-করলে একথা মানতেই হবে যে, রাষ্ট্রের দুই অংশ আসলে সহস্রাধিক মাইল দ্বারা বিভক্ত দুটি

স্বতন্ত্র দেশ এবং এই দুদেশের অধিবাসীরাও স্বতন্ত্র মানবগোষ্ঠী। এদের প্রাকৃতিক পরিবেশ স্বতন্ত্র, সমস্যা স্বতন্ত্র, প্রগতির ধারা স্বতন্ত্র, এদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অনাবিধ সুযোগ-সুবিধারও বিপুল বৈষম্য বর্তমান। এইসব কারণে তাদের স্বার্থ একরকম হতে পারেনা। এই মৌলিক কথাটা উপলব্ধি না-করলে পূর্বপাকিস্তানীদের দুঃখ কোনোকালে ঘুচবে না।

সমকাল-এর সকল সংখ্যার সকল রচনার আলোকে একথা বলা চলে যে, পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলের অবরুদ্ধ সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সাহিত্যিক অবস্থা থেকে মুক্তি বা উত্তরণের সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই সিকানদার আবু জাফর স্বদেশপ্রেমিক, কালজয়ী সাহিত্যিক প্রতিভা নিয়ে *সমকাল*-এর ন্যায় একটি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের তাগিদবোধ করেছিলেন। এই তাগিদ তাঁর রাজনৈতিক সচেতনসত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংমিশ্রিত ছিল বলেই *সমকাল* বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি মস্তবড় হাতিয়াররূপে বাঙালির জীবনে প্রাণরস সজীব রাখতে সচেষ্ট ও সফল হয়েছিল। ষাটের দশকে *সমকাল*-এর সহযোগী পত্রিকা ছিল--*পূবালী, পূর্বমেঘ, কণ্ঠস্বর, স্বদেশ* প্রভৃতি।

৪. মুক্তিযুদ্ধকালীন পত্রপত্রিকার ভূমিকা

বাঙালির চেতনা বিকাশে যেমন পাকিস্তান আমলের প্রগতিশীল পত্রিকার ভূমিকা রয়েছে, তেমনি ১৯৭১ সালে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের প্রচারপত্রগুলোরও অবদান রয়েছে যুদ্ধকে পরিচালনা করে বিজয়ের পথে বাঙালিকে অগ্রসর করে দিতে। একালে প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে *সাপ্তাহিক বিপ্লবী বাংলাদেশ, জয়বাংলা, বাংলাদেশ, বঙ্গবাণী, রণাঙ্গন, সোনার বাংলা, বাংলার মুখ, জন্মভূমি, বাংলার বাণী* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্বাধীন বাংলাদেশকে যদি এক অভূতপূর্ব মহান শিল্পকর্ম বলে গণ্য করি, তবে তা ছিল বহুজনের যৌথরচনা। এই সৃজনকর্মে যুদ্ধের নয়মাসে প্রকাশিত সাময়িকপত্রসমূহ যোজনা করে সেই অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা, যার অভাবে যুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনা করাই সম্ভব ছিল না।

৫. বাংলাদেশের সাময়িকপত্র (১৯৭২-২০০০)

যে সৃজনশীলতার মুক্ত উদার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক আনুকূল্যের জন্য আন্দোলন ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছিল, স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশে সেই সৃজনশীলতাকেই শত্রুরূপে গণ্য করা হয়। ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের আগে এবং যুদ্ধকালে যেসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, বাহাত্তরে এবং তৎপরবর্তীকালে ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশিত হতে পারেনি। স্বাধীনতার মূল্যহীনতাকে সমালোচনার দায়ে অনেক পত্রিকাই স্বাধীনদেশে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৪-৭৫ সময়কালে সৃজনপ্রয়াসী সাময়িকপত্র প্রকাশের ধারা স্তিমিত হয়ে আসে। প্রাতিষ্ঠানিক গুটিকয়েক দৈনিক, সাপ্তাহিক ও সৃষ্টিছাড়া রম্যপত্রিকা ব্যতিরেকে ষাটের দশকের মত তখন সৃষ্টিশীল পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হত না। ১৯৭৬ সন থেকে রাজনৈতিক পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সৃজনশীল পত্রিকা প্রকাশের পথ প্রশস্ত হয়। এই বন্ধ্যাদশা থেকে মুক্তির প্রেরণা সৃষ্টিকারী কতিপয় পত্রিকা সেকালে সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার ধারাকে সচল রাখার গুরুদায়িত্ব পালন করে। বাংলা একাডেমী (ঢাকা) থেকে প্রকাশিত শামসুল হক প্রণীত 'বাংলা সাময়িকপত্র' শীর্ষক গ্রন্থে তার কিছু বিবরণ রয়েছে।

এছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশের পত্রপত্রিকার ভূমিকা বিশ্লেষণের কোনো কাজ চোখে পড়ে না। অথচ বাংলাদেশের সাময়িকপত্রসমূহ বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের প্রধানতম আকরসূত্র।

যেসকল পত্রপত্রিকা ১৯৭২ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তার এক বিরাট অংশ অনিয়মিত সাময়িকী ও একুশের সংকলন। তখনকার ফেব্রুয়ারি মাসে লিটল ম্যাগাজিন বা একুশের সংকলন প্রকাশ করার উত্তেজনা-আগ্রহ তরুণসমাজে যেভাবে সঞ্চারিত হয়, তাতে জাতি আশাবাদী হয়ে উঠেছিল। ১৯৮২ সনে সামরিক শাসন জারির পরে সংস্কৃতিচর্চায় আবার বাধার সৃষ্টি হল।

বাংলাদেশ আমলে পাকিস্তানকালের কয়েকটি পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত ছিল অনেকটা গতানুগতিক নিয়মে। যেমন *সমকাল, কণ্ঠস্বর, সাম্প্রতিক* এবং *রূপম*। একালে মহসিন শস্ত্রপানি প্রমুখের *উন্মেষ*, বদরুদ্দীন উমরের *সংস্কৃতি*, মফিজউল ইসলামের *জনান্তিক, আজকাল, ত্রিভুজ, ড্যাফোডিল, থিয়েটার* (রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত), *অতলান্তিক* বের হয়েছে। বাংলাদেশের লেখকদের চিন্তাচর্চার দলিল সেগুলো। একালে মানসম্মত পত্রিকা ছিল ভূঁইয়া ইকবাল ও মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত *বক্তব্য* এবং আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত *চারিত্র*। এ সময়ের *সংলাপ, স্বরগ্রাম, বিনিময়, উষালোকে, সন্ধিক্ষণ* সাহিত্যসমাজের সচলতার প্রতীকমাত্র।

সত্তরের দশকে চট্টগ্রাম এবং বিভিন্ন শহর থেকে বেশ কিছু লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়, যা সাময়িকপত্রের ধারাকে টিকিয়ে রাখে। এগুলোর মধ্যে *স্পার্ক জেনারেশন, সম্পাদক, এপিটাফ, ধানসিঁড়ি, পদাতিক, যুগান্তর, সে. শোক, মধ্যরাত, মনসিজ* উল্লেখযোগ্য। তবে লিটল ম্যাগাজিনের শ্রেষ্ঠ প্রযোজক চট্টগ্রাম। রাজধানীর বাইরের সুবিধা-বঞ্চিত সৃষ্টিশীল তরুণদের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম ছিল ওই ছোটো কাগজগুলো।

বাংলাদেশ আমলের প্রথম দশকে (১৯৭২-৮২) দৈনিক পত্রিকা বেশি ছিল না। *দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, আজাদ, সংগ্রাম, দৈনিক বাংলা, বাংলার বাণী, দেশ* প্রভৃতিই ছিল দেশের সেরা দৈনিক পত্রিকা। মফস্সলের দৈনিক পত্রিকার প্রচার ও প্রভাব ছিল না বললেই চলে। কারণ ঢাকা থেকে প্রকাশিত *আজাদ, সংগ্রাম, দেশ*, এমনকি *দৈনিক বাংলারও* পাঠক ছিল সীমিত। আর এক অর্থে *সংবাদ*-এরও প্রভাব ছিল গণ্ডিবদ্ধ। ইংরেজি দৈনিক *অবজারভার*, আর দৈনিক *ইত্তেফাকই* ছিল আমজনতার ও অফিস-আদালতের পত্রিকা। একালে কয়েকটি সাপ্তাহিক পত্রিকা পাঠকদের বৈচিত্র্যের আস্বাদ মেটাত। দৈনিক বাংলার সহযোগী *বিচিত্রা* সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং পাঠকনন্দিত পত্রিকা ছিল। এর অনুকরণে কিংবা প্রভাবে বাজার দখল করার জন্যে ইত্তেফাক-গ্রুপের থেকে ১৯৭৭ সনে প্রকাশ করা হয় *রোববার। সন্ধানী* ছিল অপর ভাল সাপ্তাহিকী। সাপ্তাহিক *একতা, হককথা* ইত্যাদি রাজনৈতিক পত্ররূপে বেশ চলত।

১৯৮২ সনে এরশাদ সরকারের আমলে স্বাধীন মতামত প্রকাশের অঙ্গীকার নিয়ে বের হয় *লোকায়ত*। সম্ভাবনাময় পত্র ছিল *সাহিত্যপত্র, সুন্দরম, দীপঙ্কর, মনন, এখন, একাল* বা *এদেশ একাল* প্রভৃতি। ওই কালের কয়েকটি সাহিত্যিকপত্র *সমালোচনা, গণসংহতি, রবীন্দ্রচর্চা, প্রেক্ষিত, প্রতিপক্ষ, একবিংশ, অধুনা* প্রভৃতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন *অনুষদ* ও গবেষণাকেন্দ্রের মুখপত্রসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা একাডেমীর পত্রিকাগুলো মাসিকপত্রিকার ধারায় ফেলা চলে না বলে একথা বলা চলে বাংলাদেশ আমলে সাময়িকপত্রিকার ঐতিহ্যিক-ধারা থেমে গিয়েছে।

৬. উপসংহার

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৪৭ সনে সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান। এর পূর্বেই বাংলার প্রধান প্রধান কবি-সাহিত্যিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার সাধনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এমন উৎকর্ষ ঘটে যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম চারদশকে জাপান, চীন, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের ভাষা ও সাহিত্যের থেকে বাংলা উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল।

এদেশে ইংরেজ শাসন ও সে-সুবাদে ইউরোপীয় দর্শন ও সাহিত্য সংস্কৃতির প্রভাবেই এই ফললাভ ঘটেছিল। কিন্তু এরকম বিশ্বের আরও অনেক দেশেই ইউরোপীয় প্রভাব সৃষ্টির ঘটনা ঘটলেও বাংলাদেশে ছিল ভিন্ন পরিস্থিতি। বাঙালি লেখকদের সাধনার ঐকান্তিকতায় এবং মেধার কৌলীন্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদা এমন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে 'নোবেল প্রাইজ'ও জুটেছিল। এই সময় কলকাতাই ছিল সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র। পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির নতুন রাজধানী 'ঢাকা'কে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্য আবার একটি গাছের নতুন কাণ্ডের মত বিকশিত হতে আরম্ভ করে।

বস্তুত সূচনাপর্বে ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্যের স্ট্যান্ডার্ড পূর্ব-সৃষ্ট সাহিত্যের সমমানের না-হলেও নিম্নতম পর্যায় থেকেই 'বাংলাদেশের সাহিত্যে'র যাত্রা আরম্ভ হয়।

বাংলাদেশ যে সৃষ্টি হয়েছে, সেই সৃষ্টির প্রেরণা জুগিয়েছে এতদঅঞ্চলের সাহিত্য-পত্রিকাগুলো। এসবের মধ্যে আবার ষাটের দশকের আগে প্রকাশিত *মোহাম্মদী, মাহেনও, দিলরুবা, নওবাহার* প্রভৃতিতে পাকিস্তানি আদর্শে বিশ্বাসী ধ্যান-ধারণাই প্রকাশিত। ষাটের দশকে একসঙ্গে একঝাঁক পত্রিকা প্রকাশিত হয় যেগুলো মানবতাবাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাধারার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। *সমকাল*-এর ধারার পরিণতি লক্ষ করলে এটা যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি বিপরীত ধারার পত্রিকাগুলোর পরিণতি দেখলেও তা প্রকটিত হয়। *মাহেনও, মোহাম্মদী, আল-ইসলাহ*-র ধারায় ১৯৬৫ সনের পরে আর কোনো ধার ছিল না। উপরন্তু পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী পত্রিকাগুলোর মধ্যে ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে যেগুলো প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর বক্তব্যের মধ্যেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়।

পাকিস্তান-আমলে সাহিত্যপত্রিকার যে-ধারাটি সচল রেওয়াজের মত গড়ে উঠেছিল, বাংলাদেশ আমলে তা একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতিতে সাতচল্লিশ-একাত্তর পর্বের সাহিত্যপত্রিকাগুলো যত অনিয়মিত, বিক্ষিপ্ত, স্বল্পায়ুই হোক না কেন, যে অনন্যসাধারণ ভূমিকা রেখেছিল, বাংলাদেশ আমলে তা রক্ষা করতে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

এখন সাতচল্লিশ থেকে সত্তর যতদূর, সত্তর থেকে ততখানি দূরত্বে এসে একাত্তরের ক্ষয়িষ্ণু ধারাটিই পুনরুজ্জীবিত হয়েছে—দেখতে পাওয়া যায়। পত্র-পত্রিকা যা বের হয়, তাতে *মোহাম্মদী, মাহেনও, দিলরুবাই* যেন নতুন নামে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হচ্ছে বলে মনে হয়। *সমকাল*-এর ধারা এখন অবরুদ্ধ। ঔপনিবেশিক আমলে এদেশ থেকে একই সঙ্গে একগুচ্ছ মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল।

পাকিস্তানের প্রায় সমানবয়সী স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে একটি-দুটি মাসিক সাহিত্যপত্রিকাও নিয়মিত প্রকাশিত হয়নি। এমনকি সাহিত্যচর্চা এখন অপাংক্তেয় পেশারূপে গণ্য হয়েছে। বৈশ্যবৃত্তির সাফল্য নেই যে সাহিত্যকর্মে—তা এখন অবজ্ঞার শিকার। সাহিত্যপত্রিকার প্রতি সমাজের আগ্রহ বর্তমানে স্তিমিতপ্রায়। এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য দরকার *সমকাল-পূর্বমেঘ*-এর মত সাহিত্যপত্রিকার। এ-ঘটনা যত দেরিতে না-ঘটবে, ততই মঙ্গল।

উ ৎ প ল কু মা র ব সু

লিটল ম্যাগাজিন প্রসঙ্গে কিছু কথা

লিটল ম্যাগাজিন বলতেই আমাদের সামনে একধরনের পত্রিকার ছবি ভেসে ওঠে। সাইজে ডবল-ডিমাই, কয়েক ফর্মার বিস্তার, প্রচুর ছাপার ভুল। অলঙ্করণহীন, মলিন মলাট এই জাতীয় স্বল্পায়ু পত্রিকার ইতিহাস বাঙালির জীবনে অন্তত--সংবাদপত্রের ইতিহাস, বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ইতিহাস বা আরও একটু এগিয়ে বলা যায়, আমাদের সমাজ-সংসারের ইতিবৃত্তের চেয়ে কিছু কম রহস্যময় বা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

গত একশ বছরে কত লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে তার কোনো সঠিক হিসেব নেই। একটা সমস্যা হল, ঠিক কী কী ধরনের বিষয় থাকলে একটি পত্রিকাকে আমরা লিটল ম্যাগাজিন বলতে পারি। প্রথমেই সাহিত্যকে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। এমনও বলা চলে কিছু কমবয়সী ছেলেমেয়ে একত্র হলে--কবিতা, ছোটগল্প ও প্রবন্ধের মাধ্যমে তাদের আত্মপ্রকাশের আগ্রহ ঘটলে--একটি লিটল ম্যাগাজিনের জন্ম হয়। এমন মন্তব্য শোনা গেছে যে লিটল ম্যাগাজিন হল 'কতিপয় বঙ্গযুবার পদ্যাভিলাষী ক্ষুদ্রপত্র।' এইসব পত্রিকার আর্থিক সঙ্গতি, বলাবাহুল্য ক্ষীণ--যেমন স্বল্পস্থায়ী এদের উপস্থিতি। টাকার অভাবে, বিজ্ঞাপনের অনটনে, বিক্রির অনিশ্চয়তায়--এই ধরনের লিটল ম্যাগাজিন বন্ধ হয়ে যায়। লেখক লেখিকারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, বড় কাগজে বা সম্প্রতিকালে বিভিন্ন মাধ্যমে যোগ দেন, বা অন্য জীবিকায় জড়িয়ে পড়েন। ঘর-সংসারও তাঁদের সময় ও স্বাধীনতা অনেকটা খর্ব করে।

সঙ্কোচ কাটিয়ে বলতে পারি, বর্তমান প্রবন্ধকারের আকর্ষণ এইজাতীয় পত্রিকার প্রতিই বেশি। এখানেই নতুন প্রতিভার উন্মেষ লক্ষ করা যায়। এর উর্বরতা এক দ্বান্দ্বিক বিরোধের ফল। ছোট কাগজের নিজ নিজ গোষ্ঠিবদ্ধতা বনাম লেখকদের স্বাধীন চিন্তা ও প্রকরণের বিকাশ, প্রাতিষ্ঠানিক পূর্বসূরীদের লেখা ও ভাবনার বিরুদ্ধে নতুন লেখকদের অভিজ্ঞতা ও সংবেদনশীলতার লড়াই এবং সর্বোপরি নতুন পথ ও দৃষ্টিভঙ্গির আভাস এইসব অখ্যাত, অবাণিজ্যিক ও আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকাতেই প্রথম লক্ষ করা যায়।

কিন্তু কেউ কি লিটল বলতে শুধুমাত্র এই ধরনের পত্রিকাকেই বুঝবেন? মনে হয়, না। নামকরণ থেকে পত্রিকার চরিত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখলুম সাম্প্রতিক *পদক্ষেপ* পত্রিকায় ১৬৪টি 'বিষয়' উল্লিখিত হয়েছে। তা-ও এই সংখ্যাটির প্রকাশ ১৯৯৮ সালে। অনুমান করি তারপরেও আরও নানা পত্রিকা বেরিয়েছে। এবং এই তালিকাটিও সম্পূর্ণ নয়। নামকরণ থেকে পত্রিকার চরিত্র কি বোঝা যায়? বহুক্ষেত্রে যায় না। যেমন এক অক্ষর নামকরণের তালিকা দেখে সে আশা দুরাশা বলেই ত্যাগ করলুম--*অ, ক্ষ, খ, জো, পা, রা* এবং *ধী*।

অদ্ভুত বিচিত্র নামকরণের তালিকাটিও কম বিস্ময়কর নয়--*মানুষের বাক্সো, ল্যাকেটু, হৃদয়ে বাষ্প চাপ, অয়ে অজগর, টপক্লাস সোসাইটি, যাচ্ছেতাই, হযবরল, টাইরেসিয়াস, দুমদাম,*

পাগলা কাগজ, নটে গাছটি মুড়োলো।

কাব্যগ্রন্থ, কবিতা বা চিত্রকল্প থেকে লিটল ম্যাগাজিনের নামকরণে সবচেয়ে বড়ো অবদান জীবনানন্দ দাশের। *জলসিড়ি, ধানসিড়ি, বনলতা সেন, রূপসী বাংলা, সিন্ধুসারস, ঝরা পালক, অরুণিমা, আকাশলীনা, জর্নল, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন কোরাস, বেলা অবেলা কালবেলা, মহাপৃথিবী, শঙ্খচিল, শঙ্খমালা, সুচেতনা, সুরঞ্জনা, হায় চিল*.

রেজিস্ট্রেশনের সময় স্বতন্ত্র নাম চাই। তাই একই নামে কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হলেও প্রতিটি নামের আগে অব্যয়, উপসগ বা শব্দবন্ধ যোগ করে এই সমস্যার সমাধান হয়।

এখনও কিন্তু আমরা লিটল ম্যাগাজিনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারিনি। হয়ত জার্মান দার্শনিক নিটশের উক্তিতে খানিকটা আশ্বস্ত হব। 'কেবলমাত্র তারই সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব যার কোনো ইতিহাস নেই।' অনুশাসনটি বেশ চমকপ্রদ। বহু মননকর্মের সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন খুঁজে বের করতে গিয়ে আমরা যে বারবার পর্যুদস্ত হই--তার মূলে হয়ত আছে ঐ ভুল পথে চলা। সাহিত্য কাকে বলে বা শিল্প কাকে বলে--এমন প্রশ্নের কোনো সর্বকালীন, নিশ্ছিদ্র উত্তর আমরা তৈরি করে উঠতে পারব না। হয়ত আমরা ইতিহাসে আশ্রয় নেব, জ্ঞানীগুণী-ভাবুকদের মতামতই পুনঃপ্রচার করব। কিন্তু সেগুলি সংজ্ঞা নয়--যেমন আলো, তাপ বা মাধ্যাকর্ষণের নিখুঁত সংজ্ঞা আমরা ভৌতবিজ্ঞানে পেয়ে থাকি।

বেশি তর্কবিতর্কে না গিয়ে এই প্রসঙ্গে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে লিটল ম্যাগাজিনের কোনো সংজ্ঞা নেই। শুধু ইতিহাস আছে। বিবর্তন আছে। পাঠক হিসেবে আমাদের নৈতিক বোধ আছে। যেমন, কোনো লিটল ম্যাগাজিন যদি অনেক বিজ্ঞাপন পেয়ে গায়ে-গতরে ফুলে ওঠে, তবে আমরা বলে থাকি কাগজটা 'বাণিজ্যিক' হয়ে গেছে। অর্থাৎ, আর্থিক স্বাচ্ছল্য যেন যথার্থ সৃজনশীল রচনা বা স্বাধীন মতামত প্রকাশের পরিপন্থী। এই সব ঠিক বোঝা, ভুল-বোঝাও কম বিতর্কের সৃষ্টি করেনি--অন্তত আমাদের সাহিত্যে।

এক একটি লিটল ম্যাগাজিন এক এক রকমের সাময়িক ভাবনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। *বঙ্গদর্শন*-এর লক্ষ্য ছিল ভাষা। এর প্রথম প্রকাশ ১২৭৯ সালে, সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র। বছর চারেক চলে। ১২৮৪ সাল থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় পুনঃপ্রকাশিত হয়। কিন্তু আবার বন্ধ হয়ে যায়। ১২৯০ সালে বঙ্কিমের অনুমোদনে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় *বঙ্গদর্শন* আবার আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু কিছুদিন পরই বঙ্কিম এটি, মতবিরোধের ফলে বন্ধ করে দেন। চন্দ্রনাথ বসুর 'পশুপতি সম্বাদ' আখ্যায়িকাটি বঙ্কিমচন্দ্রের অসন্তোষের কারণ হয়।

বঙ্গদর্শন প্রকাশের মাধ্যমে, আমার ধারণা, বঙ্কিমচন্দ্র দুটি বিষয়ের প্রতি পাঠক পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমত 'ইংরাজি-প্রিয় কৃতবিদ্যদের' পরিহাস করা। কেননা তাঁদের বিবেচনায় 'বাঙ্গালা ভাষার লেখকমাত্রেই হয়ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশল শূন্য, নয়ত ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদক।' *বঙ্গদর্শন*-এর প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় এইভাবেই শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, স্বদেশ সম্বন্ধে বঙ্কিমের মত, ওই সম্পাদকীয়তেই লিখিত 'উচ্চবর্ণে ও নীচবর্ণে যেরূপ গুরুতর ভেদ জন্মিয়াছে, এমত কোনো দেশে জন্মে নাই।...সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অভিপ্রায়সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালা

ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তাহাদিগের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাঁহাদিগের সংস্রবে আসে না...বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনাদরেই বাঙ্গালার অনাদর বাড়িতেছে।' *বঙ্গদর্শন*-এর প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়, বঙ্কিম এই আশায় শেষ করছেন—'আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব।' *বঙ্গদর্শন*-এর প্রথম সংখ্যার বিষয়বস্তু ছিল এইরকম : প্রবন্ধ ('ভারতকলঙ্ক' ও 'আমরা বড়লোক') কবিতা ('কামিনীকুসুম'), উপন্যাস ('বিষবৃক্ষ'), সঙ্গীত, 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল' ও 'উদ্দীপনা'।

হয়ত প্রাথমিক শিক্ষা ও স্কুলের লেখাপড়া শেষ হওয়ার পর বৃহত্তর জগতের সংস্পর্শে আসার ফলে এবং যৌবনোদ্গমের ধর্মে স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের চরিত্রে মননের ক্ষমতা এবং নান্দনিক সংবেদনশীলতা প্রকাশের তীব্র চেষ্টা দেখা যায়। তখনই গান-বাজনা-নৃত্য-ছবি আঁকা—সাহিত্যচর্চা ও সাংগঠনিক কাজের শুরু। এবং তখন এই প্রতিটি পরিসরের অন্তর্নিহিত সমস্যা, দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান সন্ধানের সঙ্গে নব্য যুবকযুবতীর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ঘটে থাকে।

সাহিত্যের জগতে আত্মপ্রকাশের স্ফুরণ ঘটে থাকে ভাষাকে ঘিরে। তাই নতুন লেখকদের সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু সৃজনশীলতার ভাষা ও তার সামাজিক প্রেক্ষিত। এই সমস্যা বঙ্কিমচন্দ্রের *বঙ্গদর্শন*-এর ভূমিকায় যেমন প্রতিভাত হয়েছে—সত্তর আশিবছর পরে প্রকাশিত *কৃত্তিবাস* পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় অম্লান দত্তকে বলতে শুনি—সব ভালোবাসারই দুঃখ আছে। ভাষাকে ভালোবাসার দুঃখ কিছু কম নয়। এই রচনার শেষে ওই উক্তিটির পুনরুল্লেখ হবে।

কেস স্টাডি হিসেবে আমরা দুটি পত্রিকাকে আমাদের বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের বিষয় বলে উপস্থিত করতে পারি। দুটিকেই লিটল ম্যাগাজিন বলতে হয়ত কারও দ্বিধা হবে না। প্রথমটি *কালি-কলম* এবং দ্বিতীয়টি *কৃত্তিবাস।* লিটল ম্যাগাজিন শব্দবন্ধটি প্রচারিত হওয়ার আগে *কালি-কলমের* মতো কাগজকে বলা হত সাময়িকপত্র। আমরা *কালি-কলম*-এর মতো কাগজের পূর্বসূরি পত্রিকাগুলির জন্মসাল লক্ষ করি :

বঙ্গদর্শন (১৮৭২)
ভারতী (১৮৭৭)
সাহিত্য (১৮৯০)
সাধনা (১৮৯১)
প্রবাসী (১৯০১)
ভারতবর্ষ (১৯১৩)
সবুজপত্র (১৯১৪)
কল্লোল (১৯২৩)
কালি-কলম (১৯২৩)
কৃত্তিবাস (১৯৫৩)

কালি-কলম-এর সম্পাদক মুরলীধর বসু আগেও একটি পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। তার নাম *সংহতি* এবং এটিকে বলা হত 'শ্রমজীবী সমাজের মুখপত্র'। ঘটনাটি এইজন্য উল্লেখযোগ্য যে অভিজাত বাঙালিদের সাহিত্যসেবার জগৎ থেকে সরে এসে সাধারণ মানুষ তাদের সুখ-দুঃখের কথা বিধৃত করার জন্য অন্যধরনের পত্রিকার প্রয়োজন বোধ করেছিল।

এগুলিকে লিটল ম্যাগাজিন বলব কিনা এ নিয়ে দ্বিধা হতে পারে। কিন্তু লিটল ম্যাগাজিনের কিছু কিছু চরিত্র বৈশিষ্ট্য *কল্লোল* বা *কালি-কলমে* দেখা গেছে। এঁরা সাহিত্যেও 'নবযুগ আনার' চেষ্টা করেছেন। এঁদের অর্থকষ্ট ছিল এবং প্রাতিষ্ঠানিক সাপোর্ট বা সাহায্য ছিল না। কর্মসচিব শিশিরকুমার নিয়োগীর সচ্ছলতা ও উদার সাহায্য সত্ত্বেও কয়েকবছর পর *কালি-কলম* বন্ধ হয়ে যায়। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিত্রবহা' নামক একটি উপন্যাসকে কেন্দ্র করে অশ্লীলতার বিতর্ক উঠেছিল এবং পুলিশ *কালি-কলম* অফিসে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে হানা দেয়। সজনীকান্ত দাস মন্তব্য করেছিলেন 'কালি-কলমের কালি শুকাইল'। কিন্তু ততদিনে কালি-কলমের অন্য দুই সম্পাদক সাহিত্যজগতে পরিচিত হয়ে উঠেছেন—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। *কালি-কলম*-এর লেখকসূচিও পত্রিকাটিকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে গেছে—জীবনানন্দ দাশগুপ্ত (তখন), নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, প্রমথনাথ বিশী, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ। 'চয়নিকা' নামে একটি বিভাগে তৎকালীন খ্যাতিমান লেখকদের সংকলিত লেখা ছাপা হত রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ ব্যক্তিত্বের। আখ্যাপত্রে *কালি-কলম*-কে 'সচিত্র মাসিকপত্র' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল—কারণ এখানে নিয়মিত পাতা জোড়া ছবিও ছাপা হত। পত্রিকাটির নিশ্চয়ই কিছু অবদান ছিল। নইলে আমরা এতদিন পর তাকে স্মরণ করছি কেন?

দীর্ঘায়ু হওয়া যেন লিটল ম্যাগাজিনের ধর্ম নয়। কবিতা পত্রিকার ক্ষেত্রে তো এটি যেন অবশ্য স্বীকার্য। *কবিতা*-র কুড়ি বছরে পদার্পণ উপলক্ষে সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছিলেন—'কোনো কবিতা-পত্রিকার পক্ষে আমরা বড়ো দীর্ঘকাল টিঁকে আছি...হয়ত অসংগত রকম দীর্ঘকাল।' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও এই বলে *কৃত্তিবাস* একদা বন্ধ করে দিয়েছিলেন—'পত্রিকা সম্পাদনা যৌবনের কাজ, যৌবন পেরিয়ে এসে তা না করাই উচিত।' কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর আরেকটি বিধান হয়ত *কৃত্তিবাস*-কে পুনরুজ্জীবিত করে এসেছে—'হোক পত্রিকা, হোক মানুষ তার সত্যিকারের আয়ুষ্কাল ততক্ষণই যতক্ষণ সে নিজেকে প্রয়োজনীয় এবং সার্থক বলে অনুভব করে। অন্যেরা যা বলে বলুক, নিজেকে সার্থক বলে অনুভব করাই আসল কথা, তারই নাম জীবন।'

কৃত্তিবাস পত্রিকার জীবনীকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়—বিশুদ্ধ কবিতার ত্রৈমাসিক এবং তরুণতর কবিদের মুখপত্র হিসেবেই এর আত্মপ্রকাশ। ১৯৫৩ সালের বর্ষাকালে প্রকাশিত হয় প্রথম সংখ্যা *কৃত্তিবাস।* সম্পাদক সুনীলের বয়স তখন উনিশ। অন্য দুজন সম্পাদকও প্রায় সমবয়সী—আনন্দ বাগচী ও দীপক মজুমদার।

দ্বিতীয় পর্বে *কৃত্তিবাস* কবিতার পত্রিকাই থাকে। তৃতীয় পর্বে *কৃত্তিবাস* একটি পুরোপুরি সাহিত্য-মাসিক হিসেবে বেরোতে থাকে।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে *কৃত্তিবাস*-এর প্রথম পর্যায়ে সিগনেট প্রেসের তথা দিলীপ গুপ্তর আর্থিক অবদান এবং রুচির প্রভাব ছিল অভাবিত। এমন মূল্যবান কাগজ, অতুলনীয় মুদ্রণ ও নতুন কবিদের সমাবেশ এর আগে বাংলা সাহিত্যে ঘটেনি। পত্রিকাটির নামকরণও দিলীপবাবুর। প্রথম সংখ্যা ছাপা হয়েছিল পাঁচশো কপি। প্রতিসংখ্যার দাম আট আনা, প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছাপা হয়েছিল সিগনেট প্রেসের বিজ্ঞাপন "১৩৫৯-এর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ—নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের নির্বাচন—বনলতা সেন কবি জীবনানন্দর

শ্রেষ্ঠ সংকলন।" তারপর সম্পাদকীয় এবং দুই প্রবন্ধ ('সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা'—সমর সেন) ও ('স্বরান্বিতা'—জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র)। কবিতার শুরু শঙ্খ ঘোষের 'দিনগুলি রাতগুলি' দিয়ে. চতুর্থ-পঞ্চম যুগ্ম সংখ্যায় প্রথম লেখা অম্লান দত্তর 'ভাষার সাধনা'। আগে এর উল্লেখ আছে। এবার একটু বিশদ করে লিখি 'সব ভালোবাসারই দুঃখ আছে ; ভাষাকে ভালোবাসার দুঃখ কম নয়। ভাষাকে যে ভালোবাসে না এ দুঃখ সে বুঝবে না।' প্রবন্ধটির শেষ এই পংক্তিতে—'সব সাধনারই গৌরব আছে, ভাষার সাধনায় গৌরব কারো চেয়ে কম নয়।'

হয়ত এজন্যই বহু লিটল ম্যাগাজিন দশকের পর দশক প্রকাশিত হয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতে হতে থাকবে।

বাহান্ন বছর আগে প্রকাশিত *কৃত্তিবাস* পত্রিকার সম্পাদকীয়টি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। লিখেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তখনও কোনো লিটল ম্যাগাজিন স্বতন্ত্র ঘোষণাপত্র বা 'ম্যানিফেস্টো' নিয়ে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে আবির্ভূত হয়নি। পরবর্তীকালে হয়েছে। হয়ত সম্পাদকীয়ই ছিল, প্রথা অনুসারে, এক ধরনের কৈফিয়ৎ বা ঘোষণা। *কৃত্তিবাস*-এর অন্যতম সম্পাদক সুনীল প্রথম সংখ্যাতেই লিখেছেন 'প্রশ্ন উঠতে পারে, তারা (অর্থাৎ তরুণরা) তো বিভিন্ন কাগজে লিখছেনই এবং যদি তাঁদের স্বকীয়তা থাকে তবে নিজেদের দীপ্তিতে তাঁরা তো মনোযোগ আকর্ষণ করবেনই, সুতরাং পৃথক কাগজের কী প্রয়োজন তার উত্তর, অনেককে এক জায়গায় দেখলে নতুন কবিতার চেহারাটা সম্পূর্ণাঙ্গ হয়ে চোখে পড়ে।'

এর পর আরো তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘোষণা 'আসল কথা হল তরুণদের একটি গোষ্ঠী বা দল গড়ে ওঠা।'

বঙ্গদর্শন যদি 'ভাষাভেদ' নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে থাকে, *কালিকলম* (তথা সংহতি) যদি 'শ্রমজীবী' মানুষের সম্পর্কে সংবেদনশীল হয়ে থাকে—*কৃত্তিবাস* সরাসরি গোষ্ঠীবদ্ধতার প্রতি আকর্ষণ বোধ করল।

সব ছোটো পত্রিকারই লক্ষ্য সাহিত্যের সাধনা। কিন্তু আমরা দেখছি এদের—বিচরণক্ষেত্র আলাদা, পথ ভিন্ন ও পদ্ধতি স্বতন্ত্র।

সা জ জা দু র র হ মা ন

বাংলাদেশের লিটল ম্যাগাজিন (১৯৭১-২০০০)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্ব ও তৎপরবর্তী সময়ের লিটল ম্যাগাজিনের প্রসঙ্গ এলেই *কণ্ঠস্বর* ও *কালবেলা* নাম দুটি এক সাথে উচ্চারিত হয়। এর কারণ হচ্ছে প্রথমত, দুটো ম্যাগাজিনই প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয় এবং ম্যাগাজিন দুটো সে-সময়ের তরুণ লেখকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়ত, শিল্প সৃজনের মহৎ উদ্দেশ্যে তারুণ্যের বাঁধভাঙা আবেগে তারা অভিন্ন পথে যাত্রা করতে গিয়েও শেষে পথ 'দুটি দিকে বেঁকে' যায়। প্রথম বাঁকটি *কণ্ঠস্বর* এবং দ্বিতীয় বাঁকটি *কালবেলা*। প্রথম পথ মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়েও অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল এবং সেটি ষাট দশকের তরুণদেরই নয়, সত্তর দশকের তরুণদেরও জড়ো করতে পেরেছিল। তবু একসময় তা মেঠো পথের মতো যেতে যেতে কোনো এক ক্ষেতের আলের কোণে গিয়ে থেমে যায়, যেন পথিক এগুলেই পায়ের ছাপে পথ পড়ত। দ্বিতীয় পথটি মরুভূমিতে পৌঁছানো নদীর মতো খুব দ্রুত শুকিয়ে শেষ হয়ে যায়। তবু চিহ্ন রেখে যায়। এ যেন তার নিয়তি, তা-ই যেন অনিবার্য ছিল।

দশক ধরে সাহিত্য বিচারকে অনেকে যথার্থ বিবেচনা করেন না। কিন্তু তারপরেও সত্য হচ্ছে, সেই উন্মাতাল বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, উত্তাল বিশ্ব রাজনীতির আবর্তে বেড়ে ওঠা সৃষ্টিকাঙ্ক্ষী ষাটের দশকের সত্তরের দশকের তরুণদের, শক্তিমান লেখকদের একত্র করতে পেরেছিল এই দুটি পত্রিকা। তৎকালীন বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন মিলে এই সময়ের লেখকদের মনোজগৎ এবং লেখার জগৎ নিয়ন্ত্রণ করেছিল।

কণ্ঠস্বর-এর প্রথম সংখ্যা বের হয়েছিল ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। এর ঘোষণাপত্রটি ছিল এরকম :

> যারা সাহিত্যের সনিষ্ঠ প্রেমিক, যারা
> শিল্পে উন্মোচিত, সৎ, অকপট, রক্তাক্ত,
> শব্দতাড়িত, যন্ত্রণাকাতর ; যারা
> উন্মাদ, অপচয়ী, বিকারগ্রস্ত,
> অসন্তুষ্ট, বিবরবাসী ;
> যারা তরুণ, প্রতিভাবান, অপ্রতিষ্ঠিত,
> শ্রদ্ধাশীল, অনুপ্রাণিত ;
> যারা পঙ্গু, অহংকারী, যৌনতাপৃষ্ট
> কণ্ঠস্বর
> তাদেরই পত্রিকা।

প্রবীণ মোড়ল, নবীন অধ্যাপক,
পেশাদার লেখক, মূর্খ সাংবাদিক, 'পবিত্র'
সাহিত্যিক, এবং
গৃহপালিত সমালোচক এই পত্রিকায় অনাহূত।

কণ্ঠস্বর আর *কালবেলা* প্রায় একই সময়ে বের হলেও 'তরুণ লেখকদের খুব-একটা দলে না-পাওয়ায় *কালবেলা* পড়ে যায় বিপাকে। নামে তরুণদের পত্রিকা হলেও বড়োদের লেখা ছাপা শুরু হয় ওদের (জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, হায়াৎ মামুদ প্রমুখদের--লেখক)। আস্তে আস্তে সিকান্দার আবু জাফর, সৈয়দ আলী আহসানের মতো প্রবীণ লেখকেরা হয়ে ওঠে ওদের পত্রিকার লেখক। একসময় নবীনদের পত্রিকার চরিত্রই হারিয়ে ফেলে *কালবেলা*।' কয়েকটি সংখ্যা বের হওয়ার পরেই এটি বন্ধ হয়ে যায়।

'*কণ্ঠস্বর* বেরোয় ১৯৬৫ সালে, চলে ১৯৭৬ পর্যন্ত।' ...'কণ্ঠস্বর বেঁচে ছিল মোট এগারো বছর।'...'স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়কার দু-বছর বাদ দিলে এর জীবনকাল ন-বছরের মতো।'...'স্বাধীনতার আগে *কণ্ঠস্বরকে* ... মাসিক পত্রিকা হিসাবে ঘোষণা দিলেও নানা সমস্যার কারণে গড়ে এ দুমাসে একটির বেশি বের...' হয়নি। স্বাধীনতার পর 'বলিষ্ঠ চেহারার দৃষ্টিলোভন অবয়ব নিয়ে, পাঠকদের চোখে আস্থা আর বিস্ময় জাগিয়ে ত্রৈমাসিক হিসাবে...নতুন পর্যায়ে বের হল নতুন *কণ্ঠস্বর*।' এগুলো *কণ্ঠস্বর* সম্পাদকের কথা।

আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে স্বাধীনতার আগে *কণ্ঠস্বর* বের হত সাড়ে বারো-শ কপি করে এবং স্বাধীনতার পর একটানে তা দুহাজার কপি করে বের হতে থাকে। 'দুহাজারের মধ্যে বিক্রির জন্য দোকানে যেত কমপক্ষে আঠারো-শ কপি ; আশ্চর্য ব্যাপার এই আঠারো-শ-ই বিক্রি হয়ে যেত।' 'এই আঠারো-শ-র সবই যে বাংলাদেশে বিক্রি হত তা নয় ; দু-শ বিক্রি হত কলকাতায়। ...কলেজ স্ট্রিটের পাঠকেরা পত্রিকাটাকে হুটোপুটি করে কিনে নিত...। দিন-সাতেকের মধ্যেই শেষ হয়ে যেত দু-শ কপি।'

এ সময়ের লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক-প্রকাশকের কাছে সংখ্যাটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করবে। *কণ্ঠস্বর*-এর কাল আজ প্রায় ৩০ বছর পার হয়ে গেছে। অফসেট প্রেসের এ যুগে, ডেস্কটপ প্রকাশনার এ যুগেও কোনো লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক এক হাজার কপির ঊর্ধ্বে ছাপতে সাহস করবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া *কণ্ঠস্বর* প্রথম সংখ্যা থেকেই ডিক্লারেশন নিয়ে বের হয়েছে। লিটল ম্যাগাজিন ডিক্লারেশন নিয়ে প্রথম সংখ্যা বের করছে এরকম নজির এসময়ে নেই বললেই চলে।

লিটল ম্যাগাজিন শব্দগুচ্ছ মনে হলেই প্রতিষ্ঠান এবং প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন সমাজের ধারণায় উচ্ছন্নে যাওয়া (!) কিছু যুবকের মুখ আসে, যাদের কথা-বার্তায় এমন আত্মপ্রত্যয় থাকে যে একটা দুর্দান্ত কিছু তারা ঘটিয়ে চলেছে। লিটল ম্যাগাজিনের সংজ্ঞা কী তা বলা মুশকিল। (কোনো এক লেখকের লেখায় পড়েছিলাম যে তৎকালীন ছোটো ছোটো সাময়িক পত্রিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এরকম মন্তব্য করেছিলেন : 'এগুলোতে ফুল-ফসলের চেয়ে কাঁটাই বেশি।' *কণ্ঠস্বর* সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে 'তেজী, জেদী আর ব্যতিক্রমী' শব্দ তিনটি ব্যবহার

করেছেন এবং এর লেখকেরা হবেন 'জেদি, তেজি, টাটকা, তাজা তরুণ--একরোখা, রাগি, অসন্তুষ্ট তরুণ।' এরকম লিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যা এবং এরকম লেখকের সংখ্যা স্বাধীনতা-উত্তর কালে ক্রমেই কমে গেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর অনেক সাময়িক পত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিন বের হয়। মোহাম্মদ কামরুল ইসলামের সম্পাদনায় *কালস্রোত* (মাসিক)-এর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে। পত্রিকাটি সম্পর্কে *দৈনিক বাংলা* পত্রিকায় ২০ মে, ১৯৭৩ সালে একটি আলোচনা ছাপা হয়। বলা হয় : 'কণ্ঠস্বর ঘেঁষা হলেও কালস্রোতে কণ্ঠস্বরের আমেজ অনুপস্থিত।...' সম্ভবত ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যাটিই *কালস্রোত*-এর শেষ সংখ্যা। এটি বের হয় ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে।

ওবায়দুল ইসলাম ও মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ সম্পাদিত *মুখপত্র* (মাসিক) ছিল কালক্রম গোষ্ঠীর মুখপত্র। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা বের হয় জানুয়ারি ১৯৭২-এ। ৩টি সংখ্যা বের হওয়ার পর এটি *কালক্রম* নামে বের হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হলেও তা আর বের হয়নি। মাসিক সাহিত্য সাময়িকী *প্লাবন*-এর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা বের হয় ১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। বছর খানেক পর তা বন্ধ হয়ে যায়।

রফিক নওশাদের সম্পাদনায় *কালপুরুষ*-এর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা বের হয় ১৯৭২ সালে। পত্রিকাটির উপর এক আলোচনায় ৫ আগস্ট *দৈনিক বাংলা* পত্রিকায় লেখা হয় : 'কালপুরুষ নামে এই কবিতাপত্রের সাথে যাদেরই পরিচয় আছে তারা জানেন কি রচনা কি পরিবেশনায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।...'

লক্ষণীয় যে, এই সময়ে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনগুলোর নামের মধ্যে একধরনের ধ্বনিগত ঐক্য রয়েছে : *কণ্ঠস্বর-কালবেলা-কালস্রোত-কালক্রম-কালপুরুষ* ইত্যাদি।

ষাটের দশকের শেষার্ধে চট্টগ্রাম থেকে একটি ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে *পদাতিক* নামের পত্রিকাটি বের হয়েছিল। এটা নব্বই দশক পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে বের হয়েছে। মফস্‌সল শহরের একটা লিটল ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে এটা বেশ বড়ো একটা অর্জন বলে মনে করা যায়। 'দীর্ঘ সময় ধরে চট্টগ্রামে তরুণ লেখক ও পাঠক তৈরির কাজটিও করেছে *পদাতিক*। অতীতে ও বর্তমানে চট্টগ্রামের অনেক লেখক, কবি, সাহিত্যিক তাঁদের সাবলীল ও মুক্ত সাহিত্য চর্চার সুযোগ লাভ করেছেন *পদাতিক* এর সূত্রে।'

প্রতিভাস বের হয়েছিলও চট্টগ্রাম থেকে ১৯৭২-এর এপ্রিল মাসে। বেশিদিন চলতে পারেনি। তিতাস চৌধুরীর সম্পাদনায় কুমিল্লা শঙ্খচিল সাহিত্য গোষ্ঠী কর্তৃক প্রকাশিত হয় দ্বি-মাসিক *অলক্ত* (১৯৭২)। পরে এটি ত্রৈমাসিকে রূপান্তরিত হয়। পাঁচ বছরের মতো এটা টিকে ছিল। *রূপম* ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় জুলাই ১৯৭২ সালে। সম্পাদক ছিলেন আনওয়ার আহমেদ। অনিয়মিত হলেও আশির দশক, নব্বইয়ের দশক পার করে নতুন শতাব্দী পর্যন্ত এই পত্রিকা বের হয়েছিল। (সম্পাদকের মৃত্যুর পর পত্রিকাটি সম্ভবত আর বের হয়নি। তিনি *কিছুধ্বনি* নামক একটি কবিতা পত্রিকাও বের করেছিলেন ষাট দশকের শেষার্ধে এবং এটিও তিনি আমৃত্যু প্রকাশ করে গেছেন।

জনান্তিক মাসিক হিসাবে ১৯৭২ সালে প্রথম প্রকাশিত হলেও দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই এটি ত্রৈমাসিকে রূপান্তরিত হয় এবং কয়েক বছর পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে বের হয়। পত্রিকা

সম্পর্কে *দৈনিক বাংলা* পত্রিকায় ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭৩-এ লেখা হয় : 'ত্রৈমাসিকও যদি নিয়মিত প্রকাশিত হতো এই পত্রিকা তাহলে অচিরেই কণ্ঠস্বর জাতীয় একটা আসন পাকাপাকিভাবে পেয়ে যেত।...'

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে সাময়িকী প্রকাশের যে জোয়ার আসে, তা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই থিতিয়ে আসে। ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে বলতে গেলে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো লিটল ম্যাগাজিন বের হয়েছে বলে জানা যায় না।

ফজল মাহমুদের সম্পাদনায় *চিরকুট* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৪ সালে কুমিল্লা থেকে। বেশ কয়েক সংখ্যা এটি বের হয়েছিল এবং মফস্সল থেকে বের হওয়া পত্রিকা হলেও এটি সেসময়ে বেশ আলোচিত হয়েছিল। *উপকণ্ঠ* (মাসিক, কবিতা পত্র), হারুন রশিদের সম্পাদনায় ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা বের হয় ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে। '...সচেতন বিদ্রোহী পতাকা...' তুলে ধরার অঙ্গীকার নিয়ে মোরশেদ শফিউল হাসান ও হুমায়ুন আজিজের সম্পাদনায় ১৯৭৫ সালের শুরুতে *যুবরাজ* (সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমাসিক)-এর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা বের হয়। কয়েকটি সংখ্যা, সম্ভবত অনিয়মিতভাবে ৫টি সংখ্যা, বের হওয়ার পর এটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

মিলন মাহমুদ এবং ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় খুলনা থেকে *কবিপত্র* (অনিয়মিত কবিতার সংকলন) কয়েকটি অনিয়মিত সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৫-এর এপ্রিল-মে মাসে। *মৌমাছি* (মাসিক সাহিত্য পত্রিকা) সিলেট থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালের জুন মাসে। *কবিতালাপ* (মাসিক) খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালে। একই সময়ে ঢাকা থেকে *অনন্যা,* ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

কাশবন (ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা) ১৯৭৫ সালে ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ছাপা হয়। সম্ভবত ৩ বছর ধরে অনিয়মিতভাবে এটি বের হয়েছিল। নাট্য বিষয়ক বেশ 'তেজী' বক্তব্য নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে রবিউল আলমের সম্পাদনায় *তির্যক* (অনিয়মিত নাট্য পত্রিকা)-এর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা বের হয় ১৯৭৬ সালের মে মাসে। কয়েক বছর ধরে এটি অনিয়মিতভাবে বের হয়। *সংবর্ত* (ত্রৈমাসিক) প্রায় একই সময়ে বের হয়। 'এই পত্রিকাটি মানের দিক থেকে বেশ উন্নত এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত যে কোন উন্নতমানের সাহিত্য পত্রিকার সাথে তুলনীয়।...' (*দৈনিক বাংলা,* ৩১ অক্টোবর, ১৯৭৬)

শুধু প্রবন্ধ ও আলোচনা ছাপানোর ঘোষণা দিয়ে ভূঁইয়া ইকবাল ও মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত *বক্তব্য* পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালের জুন মাসে চট্টগ্রাম থেকে। বেশ কয়েক বছর ধরে এই পত্রিকা অনিয়মিতভাবে বের হয়েছিল। *ঋতু* (পাক্ষিক কবিতা প্রচারপত্র), অনিয়মিতভাবে কয়েক বছর প্রকাশিত হয়েছিল। এর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ছাপা হয় ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। সম্পাদক ছিলেন মাহবুব উল আলম।

সত্তরের দশকের শেষ অর্ধাংশে ঢাকা থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল *যুবরাজ* (মোরশেদ শফিউল হাসান ও হুমায়ুন আজিজ সম্পাদিত), *বিশ্ব সাহিত্য* (মাশুক চৌধুরী সম্পাদিত), *অবকাশ* (অসীম সাহা সম্পাদিত), *বিকাশ* (ফারুক মাহমুদ সম্পাদিত), *সভ্যতা* (হাফিজুর রহমান সম্পাদিত), *চিরায়ত* (আতাহার খান ও

মাহমুদ শফিক সম্পাদিত), *বন্ধ করো না পাখা* (জাফরুল আহসান সম্পাদিত), *নক্ষত্রবীথি* (জাফর ওয়াজেদ সম্পাদিত), *আলবাট্রস* (মুহম্মদ জুবায়ের সম্পাদিত), *পূর্বপত্র* (আফসান চৌধুরী সম্পাদিত), *কৃষ্ণের লাল পাখি* (শাহরিয়ার ইমাম সম্পাদিত) এবং আরও কিছু পত্রিকা।

আশির দশকের শুরুর দিকে মীজানুর রহমান *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা* প্রকাশ করেন। এটাকে ঠিক লিটল ম্যাগাজিন বলা যাবে কি না তা নিয়ে একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়তে হয়। প্রায় দুই যুগ ধরে প্রায় নিয়মিতভাবে বের হওয়া এই পত্রিকা সম্পর্কে *কণ্ঠস্বর* সম্পাদকের মত এরকম : 'উচ্চাঙ্গের এই পত্রিকাটির প্রকাশনামান যেমন উঁচুমাপের তেমনি এর কলেবরও বিপুল। একটি উন্নতমানের স্ট্যান্ডার্ড ম্যাগাজিন বলতে যা বোঝায় এই পত্রিকাটি তাই।...আশির দশকের পর যখন আমাদের এখানকার সাহিত্যিক সৃজনশীলতায় ভাটার টান চলছে সে-সময় কী করে তিনি যে এমন একটি পত্রিকা এতদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছেন তা আজও আমার কাছে বিস্ময়।...'

প্রায় একই সময়ে আবুল কাশেম ফজলুল হক *লোকায়ত* পত্রিকা বের করেন। এটি সম্পর্কে কণ্ঠস্বর সম্পাদকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : 'লেখালেখির পাশাপাশি তাঁর (আবুল কাশেম ফজলুল হক) সম্পাদিত মাসিক 'লোকায়ত' পত্রিকার ভেতর দিয়ে জীবনের এই উচ্চতর বৈভবের তিনি সন্ধান করেছেন। যে একাগ্রতার সঙ্গে দীর্ঘ বিশ বছর ধরে তিনি এই পত্রিকাটি বের করেছেন, এর জন্য যে-বাস্তব পরিশ্রম করেছেন তা তাঁর মতো একজন পুরোপুরি অবৈষয়িক ও ভাবজগতের মানুষের পক্ষে কতখানি দুঃসাধ্য তা আমি বুঝতে পারি। খুব বড় ধরনের অঙ্গীকার ছাড়া এটা সম্ভব নয়।...'

আশির দশকে চট্টগ্রাম থেকে চলচ্চিত্র বিষয়ক ২টি ম্যাগাজিন বের হয়েছিল ; *লুক-থ্রু* ও *নিউ ওয়েভ*। এগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এসময়ে কিছু নাট্য বিষয়ক পত্রিকাও বের হয়েছিল : *মঞ্চ, গণায়ন, প্রসেনিয়াম*। অধিকাংশের মতো এগুলোও বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। একই সময়ে চট্টগ্রাম থেকে দুটি শিল্পকলা বিষয়ক পত্রিকা *নান্দনিক* ও *চারুকৃৎ* বের হয়েছিল আশির দশকে। তীব্র বক্তব্য নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে স্বপন দত্তের সম্পাদনায় সত্তর দশকের শেষের দিকে প্রকাশিত হয়েছিল *স্পার্ক জেনারেশন*। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এটা বের হত। চট্টগ্রাম থেকে *এপিটাফ* সত্তরের শেষাংশে বের হয়ে আশি দশকের শুরুর কয়েক বছর চলেছিল।

বগুড়া থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি প্রায় একই সময়ে বের হয়েছিল *দ্রষ্টব্য* এবং *নিসর্গ*। এ সময়ে ওপার বাংলার লেখক সুবিমল মিশ্র এপার বাংলার গল্পকার লিখিয়েদের একটা অংশের উপর বড় প্রভাব ফেলেছিল। দ্রষ্টব্য গোষ্ঠী ছিল দারুণভাবে এ-প্রভাবে প্রভাবিত। তারা মফস্‌সল শহর বগুড়া থেকে বেশ বড়ো মাপের পত্রিকা বের করত। যেটা ঢাকার জন্য ছিল ঈর্ষণীয় ব্যাপার। তবে *দ্রষ্টব্য* আর বের হয় না। *নিসর্গ* এখন পর্যন্ত বের করে চলেছেন সম্পাদক সরকার আশরাফ এবং এ সময়ে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনের মধ্যে এটি অন্যতম। আশির দশকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনের মধ্যে তপন বড়ুয়া সম্পাদিত *গাণ্ডিব* ছিল উল্লেখযোগ্য একটি নাম। দীর্ঘদিন বিরতির পর ইদানীং আবার বের হচ্ছে।

আশির দশকেই খোন্দকার আশরাফ হোসেন সম্পাদিত *একবিংশ* (কবিতা ও নন্দনভাবনার কাগজ) প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। কবিতা পত্রিকা হিসাবে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে *একবিংশ*-এর প্রভাব ব্যাপক। প্রায় কাছাকাছি সময়ে সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল *সূচিপত্র* নামক পত্রিকা বের করেছিলেন। এটি অনিয়মিতভাবে ৬টি সংখ্যা বের হওয়ার পর নব্বই দশকের শুরুর দিকে বন্ধ হয়ে যায়।

আশির দশকের বেশ কিছু পত্রিকা নব্বই-এর দশকে পদার্পণ করে। ঢাকা থেকে এসময়ে আরও কিছু পত্রিকা বের হয়। এগুলোর মধ্যে আছে *সূচক, মঙ্গলসন্ধ্যা, ব্যাস, জীবনানন্দ, বিষয় মানুষ, সহজিয়া, ধূলিচিত্র, কথা* সহ আরও কিছু পত্রিকা। নব্বই-এর দশকে 'সাহিত্যের বাতাবরণে নতুন অভিমত ও বক্তব্য নিয়ে হাজির' হয় চট্টগ্রাম থেকে *লিরিক* পত্রিকা গোষ্ঠী। পত্রিকাটি বেশিদিন স্থায়ী না হলেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা তারা বের করেছিল। সিলেট থেকে বের হয়েছিল *পাঠকৃতি*। বরিশাল থেকে *জীবনানন্দ* (কবিতা বিষয়ক ম্যাগাজিন), দিনাজপুর থেকে *অম্বিকা, হঠাৎ রোদ্দুর, সে,* ঠাকুরগাঁও থেকে *চালচিত্র* সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেসব পত্রিকা বের হত তার একটি তালিকা পাওয়া যায় মিজান রহমান সম্পাদিত কর্ষণ সাহিত্য কেন্দ্র, পিরোজপুর থেকে প্রকাশিত *বাংলাদেশের লিটল ম্যাগাজিন পরিচিতি* নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকায়। এর প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এ। এই সংকলনে যতগুলো লিটল ম্যাগাজিনের নাম আছে তার সংখ্যাটা শুনলে আশ্চর্য হতে হয়। এতে মোট ৪২৭টি লিটল ম্যাগাজিনের নাম উল্লেখ আছে। পিরোজপুর থেকে এ ধরনের একটি উদ্যোগ সফল করা বেশ কঠিন কর্ম বলেই মনে হয়। তবে এই নামগুলোর মধ্যে এমন কিছু নাম আছে যেগুলো দীর্ঘদিন ধরে আর প্রকাশিত হচ্ছে না। (যেমন সাইম রানা সম্পাদিত *উচক্রা*)। আবার এমন কিছু নামও আছে যাকে ঠিক লিটল ম্যাগাজিন নামে আখ্যা দেওয়া যায় না (যেমন বদরুদ্দীন উমর সম্পাদিত *সংস্কৃতি*)। সুতরাং এসময়ে মোটামুটি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যা এই তথ্য থেকে নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

অনিকেত শামীম সম্পাদিত *লোক* পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় এ সময়ের লিটল ম্যাগাজিন বিষয়ে সিদ্ধার্থশঙ্কর ধর-এর একটি আলোচনা ছাপা হয়েছে। 'লিটল ম্যাগের অন্তর্গত ভুবন : বিশটি লিটলম্যাগের আলোচনা' নামক প্রবন্ধে তিনি ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে এমন বিশটি গুরুত্বপূর্ণ লিটল ম্যাগাজিনের আলোচনা করেছেন। এই লিটল ম্যাগাজিন গুলো হচ্ছে : বগুড়া থেকে প্রকাশিত *নিসর্গ,* নাটোর থেকে প্রকাশিত *বালুচর,* গোপালগঞ্জ থেকে প্রকাশিত *দূর্বা,* ঝিনাইদহ থেকে প্রকাশিত *কহন, দাঁড়,* রাজশাহী থেকে প্রকাশিত *চিহ্ন,* সিলেট থেকে প্রকাশিত *অর্কিড* ও *সূণৃত,* বান্দরবান থেকে প্রকাশিত *সমুজ্জ্বল সুবাতাস,* ঢাকা থেকে প্রকাশিত *প্রতিশিল্প, সময়কাল, শালুক, অমিত্রাক্ষর* ও *উল্লেখ,* ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত *ভূমিজ,* কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত *কোমলগান্ধার,* ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত *শালিকজংশন,* নেত্রকোণা থেকে প্রকাশিত *হাওড়,* বরিশাল থেকে প্রকাশিত *ধ্রুবতারা* এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত *ওঙ্কার*।

লেখকের মতে, 'তুলনামূলকভাবে গতবছর (২০০৩) সাহিত্যের ছোটকাগজ প্রকাশিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি।...' তবে 'লিটলম্যাগের যে উদ্দেশ্য আর আদর্শের একটি স্বাভাবিক

তুল্য ধারণা থাকা প্রয়োজন, তা থেকে অধিকাংশের-ই আশাহত দূরত্ব লক্ষ্য করা যায়।...' স্বাতন্ত্র্য হারানো মফস্‌সলের পত্রিকাগুলো সম্পর্কে তার মত : এগুলো 'নগরকেন্দ্রের মফস্বল-সংস্করণ হতে দেখা গিয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত লেখকের লেখা ছাপিয়ে সম্পাদক কিংবা আয়োজকেরা নিজেদের নামগুলোতে সারিবদ্ধ করাতেও দেখা যায়।...'

পুণ্ড্রনগর লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি বগুড়া থেকে সাজ্জাদ বিপ্লব সম্পাদিত *স্বল্পদৈর্ঘ্য* পত্রিকায় সম্পাদক নিজে 'শূন্য দশকের পত্রিকা : একটি খসড়া তালিকা' তৈরি করেছেন। এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে ৩৪টি লিটল ম্যাগাজিন ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে কটি নতুন এবং কটি পুরাতন তা জানা যায় না। ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়েছে ৬৫টি। ২০০২-এ প্রকাশিত হয়েছে ৫৫টি। ২০০৩-এ প্রকাশিত হয়েছে ৪২টি। ঢাকার শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটের বইয়ের দোকানগুলো এ সময়ের লিটল ম্যাগাজিনগুলো প্রাপ্তির একটা নির্ভরযোগ্য স্থান। অঙ্গসৌষ্ঠবে পুষ্ট, মুদ্রণে আভিজাত্যবিশিষ্ট বেশ কিছু লিটল ম্যাগাজিন এ সময়ে বের হচ্ছে। যেমন : *স্রোতচিহ্ন*, *নান্দীপাঠ*, *কোরাস*, *উত্তরমেঘ* ইত্যাদি।

এ সময়ের লিটল ম্যাগাজিনের প্রতি কটাক্ষ করে এ সময়েরই একটা গুরুত্বপূর্ণ লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকীয় বক্তব্য এরকম : 'লক্ষ করা গেছে, অনেকে নিজে সম্পাদক হওয়ায় নিজের লেখার উপর সমালোচনার নামে স্তুতিগদ্য, হাততালি ছাপেন দ্বিধাহীনভাবে। ভাবখানা, এটিও সম্পাদকীয় দায়িত্বের মহান নৈতিকতা। কেউ কেউ আবার এমন সব ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক চিঠি ছাপেন সেগুলোর অধিকাংশই সম্পাদক কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া আর কারও কাছেই গুরুত্বপূর্ণ মনে হওয়ার কথা নয়।...'

এ সময়ের লিটল ম্যাগাজিনের অধিকাংশের ক্ষেত্রে এ বক্তব্য প্রায় সত্য হতে দেখা যায়। বস্তুত এই সময়ের ছোটো কাগজগুলোর স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল। 'একই বিষয়ের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সংস্করণ' ; 'আকারে, মলাটে ও ঠিকানায়'ই যা আলাদা।

তথ্যসূত্র

১. শামসুল হক, *বাংলা সাময়িক-পত্র* : ১৯৭২-১৯৮১, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪ ঢাকা।
২. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, *ভালোবাসার সাম্পান*, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২ ঢাকা।
৩. মিজান রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের লিটল ম্যাগাজিন পরিচিতি*, প্রথম প্রকাশ, একুশে বইমেলা ফেব্রুয়ারি ২০০৪, কর্ষণ সাহিত্য কেন্দ্র, পিরোজপুর
৪. কমলেশ দাশগুপ্ত ও শ্যামলী মজুমদার সম্পাদিত, *অন্তরীপ*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৭, চট্টগ্রাম।
৫. সাজ্জাদ বিপ্লব, *স্বল্পদৈর্ঘ্য*, বর্ষ ৯, সংখ্যা ১৪, পুণ্ড্রনগর লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি, বগুড়া।
৬. অনিকেত শামীম সম্পাদিত, *লোক*, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪।
৭. রবিউল করিম সম্পাদিত, *নব্বই দশকের গল্প*, ব্যাস প্রকাশন, ঢাকা ২০০০।

বা রি দ ব র ণ ঘো ষ

বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র চর্চা প্রসঙ্গে

> বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, আমাদের সমাজে ইংরেজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় প্রভাবের বিস্তার, দেশের তৎকালীন সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা এবং ধীরে ধীরে তাহার পরিবর্ত্তন, এক কথায় উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সকল দিক সম্বন্ধেই সে-যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে বহু অমূল্য উপকরণ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আবার উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁহাদের আবির্ভাবে বঙ্গের ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাদের জীবনচরিত রচনা করিতে গেলেও সমসাময়িক সংবাদপত্রের সাক্ষ্য অপরিহার্য্য।

—*সংবাদপত্রে সেকালের কথা* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 'ভূমিকা'র সূচনাতেই এ কথাগুলি ভেবেছিলেন উনিশ শতকের সংবাদপত্রসমূহের বৈজ্ঞানিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এ-সব কথা ভেবেছিলেন বাংলা ১৩৩৯ সালে এ গ্রন্থ প্রকাশের কিছুকাল আগেই।

কিন্তু তাঁর ভাবনার বহু আগেই এ-বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা করেছিলেন *সৌরভ*-পত্রিকা-খ্যাত কেদারনাথ মজুমদার (১৮৭০-১৯২৬)। কেদারনাথের বিস্তারিত পরিচয়-প্রদান এখানে ততখানি প্রাসঙ্গিক হবে না সম্ভবত। সেজন্যে তা থেকে বিরত থাকছি। তাঁর 'রামায়ণের সমাজ' এক সময়ে তাঁকে সুবিখ্যাত করে রেখেছিল (রচনা শুরু ১৩২৮)। তার অনেক আগেই তিনি ইংরেজি ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেন। সেই বইটিতে (গদ্যসাহিত্য-সারস্বত কুঞ্জ) কেদারনাথ তাঁর *বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য* প্রকাশের বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কিন্তু বইটি প্রকাশিত হতে আরও প্রায় দশ বছর লেগে যায় নানা কারণে। এই *বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য* বইটিই তৎকালাবধি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাময়িক পত্রাদির প্রথম পরিচায়ক গ্রন্থ। এই প্রবন্ধের সূচনা, অতএব, এই গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে। *সৌরভ* পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১৯ বঙ্গাব্দে। অনেক আগে থেকে ভাবনাচিন্তা করলেও, এই পত্রিকার চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই (কার্ত্তিক ১৩২২) আমরা তাঁর কাছ থেকে এতদ্বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পেলাম—'ময়মনসিংহে সংবাদপত্র'। এমনি এ বছরের ফাল্গুন সংখ্যাতে পেয়েছি তাঁর 'সেকালের বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা ও বঙ্গসমাজ' প্রবন্ধটি। এভাবেই তাঁর পরিকল্পিত ইতিহাসটি রূপায়িত হতে থাকে। অবশেষে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় *বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য*-এর প্রথম খণ্ড।

দুই

আমরা বইটির আখ্যাপত্র (প্রথম সংস্করণ) আগে তুলে দিই।

> *বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য* / প্রথম খণ্ড / শ্রীকেদারনাথ মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক— শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার। / Research House, Mymensingh. / ১৩২৪ আষাঢ়—১৯১৭ জুলাই। / সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত। / — / মূল্য তিন টাকা মাত্র।

বইটির 'মুখবন্ধে'র অংশবিশেষ উদ্ধার করে গ্রন্থটির পরিধি বিষয়ে লেখকের অভিমতটি তুলে ধরি :

> সাময়িক সাহিত্য অর্থে আমি—দৈনিক, বারত্রয়িক (?), সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক প্রভৃতি পত্রিকা—যাহাতেই বেশীর ভাগ সাহিত্যের আলোচনা করা হইয়াছিল—তাহা—বুঝিয়াছি এবং যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার বিবরণ এই গ্রন্থে প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত এই সকল সাময়িক সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যান্য সংবাদপত্রাদির সম্বন্ধেও যে দুই একটী কথা বলা যায়, তাহাও বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

দেখা যাক, লেখক তাঁর প্রয়াসে কতখানি সমর্থ হয়েছিলেন।

বইটির দুটি প্রধান অংশ। প্রথম অংশটি [প্রথম সংস্করণ অনুসারে] ১-১৯৪ পৃষ্ঠায় বিন্যস্ত। এর সূচনাপর্বে লেখক বাংলা সাময়িকপত্রের প্রচারকাল জানাতে গিয়ে তাঁর ক্যানভাসটিকে বহু বিস্তৃত করেছেন বিশ্বের সাময়িকপত্রের বিবিধ আলোচনা উপহার দিয়ে। এভাবেই তিনি ভারতের মিশনারি যুগে এসে পৌঁছেছেন।

প্রথমাংশে সূচনাংশ ছাড়া মোট অধ্যায় সংখ্যা ছ'টি। সাময়িকপত্রের আলোচনা করতে গিয়েও লেখক প্রথম অধ্যায়ে মিশনারি যুগের বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রদান করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি কোম্পানির আমলে দেশীয় শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যাতে সাময়িকপত্রের প্রচার ও প্রসারের পিছনে শিক্ষাপ্রসারের ইতিহাসটিও কতখানি সম্পৃক্ত তা অনুধাবন করা যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও বঙ্গসমাজ'—যেখানে *বেঙ্গল গেজেট, দিগদর্শন, সমাচার দর্পণ, গস্পেল ম্যাগাজিন, সংবাদ কৌমুদী* ও *ব্রাহ্মণ সেবধি, সংবাদ প্রভাকর* প্রভৃতি পত্রিকার পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে পত্র-প্রকাশে মিশনারিদের এবং সরকারের সঙ্গে দেশীয় উদ্যোগের সংঘাতের ছবিটিও চিত্রিত হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব এদেশীয়দের মধ্যে উত্তরোত্তর বিস্তৃত হওয়ার উদাহরণ দিয়ে তিনি প্যারীচাঁদের *মাসিক পত্রিকা* ও *বামাবোধিনীর* প্রসঙ্গ এনেছেন। এর পরেই শুরু হয়েছে *বঙ্গদর্শন*-এর প্রকাশ সূত্রে 'নবীন যুগ'। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

> ইহার পর এক মধুর বসন্ত-প্রভাতে নবীন যুগের আগমনের সাড়া বঙ্গবাসী পুলকবিহ্বল চিত্তে শুনিতে পাইলেন—"আগামী ১২৭৯ সালের বৈশাখ হইতে 'বঙ্গদর্শন' নামে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশিত হইবে। সে পত্রের সম্পাদক হইবেন—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। লেখক থাকিবেন—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায়, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রামদাস সেন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি।"
>
> ১২৭৮ সালের চৈত্র মাসে ভবানীপুর মুদ্রাযন্ত্রের ব্রজমাধব বসু এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন। বাঙ্গালী "বঙ্গদর্শনের" সাদর সম্ভাষণের জন্য উৎফুল্ল চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে মুদ্রণ সংক্রান্ত নানান সংবাদ ও নানা ইংরেজি পত্র-পত্রিকার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া দেওয়া হয়েছে মুদ্রা আইনের প্রচলন এবং তৎসংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদের নানা সংবাদও। সাহিত্যে প্রচারে প্রাচীন রাজবিধি-সংক্রান্ত আলোচনায় নিবিষ্ট আছে পঞ্চম অধ্যায়। প্রথমাংশের শেষ তথা ষষ্ঠ অধ্যায়ে সাময়িকপত্রের প্রসারের সঙ্গে দেশের ডাক ব্যবস্থার সংযোগ নিয়ে যেমন আলোচনা আছে, তেমনি আছে মফস্সলে

সাময়িকপত্রের অবদানের কথাও।

দ্বিতীয় অংশটি আমাদের মুখ্য আলোচনার বিষয়ীভূত। প্রথমাংশটি ছিল এরই ভূমিকা। দ্বিতীয়াংশে প্রায় ৪০টি পত্রিকার পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে *বেঙ্গল গেজেট* (১৮১৮) থেকে *সমাজদর্পণ* (১৮৭১) কালপর্বের। পত্রিকার পরিচয়ের সঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে নানান প্রাসঙ্গিক জীবনী—যা অন্যত্র সুলভ ছিল না। যেমন, *বিদ্যোন্নতিসাধিনী* পত্রিকার সম্পাদক, শেরপুরের জমিদার—হরচন্দ্র চৌধুরীর জীবনী। জীবনী ছাড়া বিজ্ঞাপন, মূল্য, প্রকাশের ইতিহাস, গ্রাহক, প্রাসঙ্গিক সংকলন, চরিত্র-নিরূপণ, বর্ষ-সংখ্যাদির বিবরণ, লোগো, শিরোভূষণ শ্লোকাদি, ভূমিকা ইত্যাদি উদ্ধার ও সবিস্তার আলোচনা করে গ্রন্থের মহার্ঘতা প্রতিপাদন করেছেন। এ-সব পত্রিকা তো এখন দুর্লভপ্রায়—কেদারনাথের সৌজন্যে তাঁর নামোল্লেখ না করেই আমরা সগর্বে তথ্যাদি অপহরণ করে 'আহরণ' বলছি! অর্থাৎ একটি পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিকথা পেয়ে গেছি আমরা! পল্লবগ্রাহী গবেষক এর মর্যাদা বুঝতে পারবেন না। কেদারনাথ পত্রিকাগুলির সব সংখ্যাই দেখে তবে মন্তব্য করতেন। উদাহরণস্বরূপ *নবপ্রবন্ধ* পত্রিকার শেষ সংখ্যার বিবরণও তিনি নিশ্চিতভাবে উদ্ধার করে দিয়েছেন। রচনাপ্রণালী বিশ্লেষণেও তিনি সাহসী এবং বিশ্বাসযোগ্য। যেমন, *অবোধবন্ধু* পত্রিকা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য—'বঙ্কিমযুগের পরে রবীন্দ্রনাথ যে গদ্য রচনার প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, এই রচনা প্রণালী তাহারও আদর্শ' (পৃ. ৪১৫)।

এর ফলে কেদারনাথের বই কেবলমাত্র তথ্যপঞ্জি হয়ে ওঠেনি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ৮৩টি মুদ্রিত বইয়ের আলোচনা, ভাষারীতির পরিচয়—এসব তো উপরি পাওনা এবং জমা রাখার মত আমানত। যুগ ও জীবন তাঁর কলমে নিঃশেষে ধরা পড়ে গেছে। কত সাহস করে তিনি বলেছেন—'গোঁড়া হিন্দুরা যাহাই বলুন না কেন, রাজা রামমোহন রায় যে এই অভিনব ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া মিশনারীদিগের কবল হইতে বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিলেন, একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।' অপক্ষপাত তথ্যানুসন্ধান, বিচার ও বিশ্লেষণে বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাস আলোচনার এই প্রথম বাংলা ইতিবৃত্তখানি আজও আমাদের কাছে সমান প্রয়োজনীয়। দেশভাগ এবং প্রচারের অভাব—এর জন্যেই এই বইটি প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

কেদারনাথের পরেই উচ্চারণ করতে হয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির (১২৬০-ব.-১৩১৯-ব.) নাম। তিনি প্রচারের অন্তরালে রয়ে গেছেন, কারণ সাময়িকপত্রচর্চায় তাঁর ভূমিকা বিশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও, তিনি এ বিষয়ে কোনো গ্রন্থ প্রকাশ করে যাননি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাময়িকপত্রচর্চা' তাঁর পূর্বে তেমন করে আরব্ধ হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও তাঁর অনেক আগেই মহেন্দ্রনাথ [এবং কেদারনাথ] পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে গেছেন।

১৩০৩ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩০৯ বঙ্গাব্দের কালপরিধিতে তিনি *জন্মভূমি* পত্রিকায় এতৎ-সম্পর্কিত ১৬টি প্রবন্ধ রচনা করেন [প্রসঙ্গত একসময়ে তিনি *জন্মভূমি*র সম্পাদকীয় দায়িত্বও পালন করেছিলেন]। অন্যত্রও তিনি আরও প্রবন্ধ লেখেন [এর তালিকা পরে দ্রষ্টব্য]। শুধুমাত্র *জন্মভূমি* পত্রিকাতেই সূচনা থেকে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৮৪টি বাংলা সাময়িক-সংবাদপত্রের সবিস্তার আলোচনা করেন। এগুলির তালিকা এইপ্রকার :

সাময়িক সাহিত্য : *নব্যভারত* ১০/১২, চৈত্র ১২৯৯

বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাস : *জন্মভূমি* ১৩০৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন, কার্তিক এবং পৌষ সংখ্যা ; ১৩০৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ, শ্রাবণ, ভাদ্র-আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ এবং ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা ; ১৩০৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ, আশ্বিন এবং কার্তিক সংখ্যা।

এছাড়া *জন্মভূমিতেই* [সংবাদপত্রের ইতিহাস] *সোমপ্রকাশ* ১০/১ শ্রাবণ ১৩০৮

বাঙ্গালা প্রথম প্রাত্যহিক পত্র *পরিদর্শক* (১৮৬০-৬২) ১১/৬ পৌষ ১৩০৮

নব্যভারত পত্রিকার ১৮/৩ আষাঢ় ১৩০৭ সংখ্যায় লেখেন *বেঙ্গল গেজেট*-এর আলোচনা। এর ১৮/১২ চৈত্র ১৩০৭ সংখ্যায় লেখেন *বেঙ্গল গেজেট* ও *সমাচারদর্পণ*। *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার* ৫/৪ মাঘ-চৈত্র ১৩০৫ সংখ্যায় দীর্ঘ ২৪৫-২৬৯ পৃষ্ঠার পরিসরে তিনি যে 'বঙ্গীয় সমাচার পত্রিকা (*কালানুসারী ইতিবৃত্ত*) নামে যে প্রবন্ধ লেখেন তাতে *বেঙ্গল গেজেট, সমাচার দর্পণ, সংবাদ কৌমুদী* প্রভৃতি পত্রের বিস্তৃত আলোচনা করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ *সংবাদ কৌমুদীর* কোনও সংখ্যা দেখেননি বলেছেন--তবে কি মহেন্দ্রনাথ তার আগে এর সংখ্যাগুলি দেখেছিলেন? তিনি *সমাচার দর্পণ*-এর প্রথম কয়েক বছরের ফাইল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর যে সভায় এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন, তাতে প্রদর্শন করেন। ঠিক হয়েছিল এই পত্রিকা থেকেও একটি সংকলন মহেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হবে। কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে তা প্রকাশিত হয়নি। ফলে, আমাদের আরও প্রায় ৫০ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্কলনের জন্যে। তবে এর সংগ্রহ মহেন্দ্রনাথই করে গিয়েছিলেন।

অনুসন্ধান পত্রিকার ১৩ বর্ষের ৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৬ সংখ্যায় মহেন্দ্রনাথ রচনা করেন 'বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেট' প্রবন্ধটি। দেখতে গেলে তিনি কেদারনাথ মজুমদারের অনেক আগেই এই কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু কেদারনাথের আলোচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশের সৌভাগ্য লাভ করে—সেকারণে তাকেই আমরা আলোচনার প্রথমে রেখেছি। নইলে পথিকৃতের যাবতীয় সম্মান মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধিরই প্রাপ্য।

তিন

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার অবধি নেই। তাঁর *সংবাদপত্রে সেকালের কথার* খণ্ড দুটি ছাড়া উনিশ শতকের বঙ্গীয় গবেষণাকর্ম অপূর্ণ থেকে যায়। এটি অবশ্য প্রথমে তিনটি খণ্ডে আত্মপ্রকাশ করে যথাক্রমে ১৩৩৯, ১৩৪০ ও ১৩৪২ বঙ্গাব্দে। তৃতীয় খণ্ডটি ছিল আসলে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সংযোজন অংশ যা পরে একত্রিত হয়ে দুটি খণ্ডেই প্রচারিত হতে থাকে।

প্রথম খণ্ডটির আশ্বিন ১৩৩৯ সালে প্রকাশের পরে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় পাঁচ বছরের মধ্যে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে এবং পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণটি প্রকাশ পায় ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে। এতে ১৮১৮-১৮৩০ কালপর্বে প্রকাশিত পত্রিকার কথা বলা হলেও *সমাচার দর্পণ* থেকেই সংবাদ সংকলিত হয়েছে। বলা বাহুল্য *সমাচার দর্পণ* দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা, তার সংকলন অদ্যাবধি প্রচারিত হওয়ায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গীয় শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ক বিচিত্র সংবাদ আমরা জানার অবকাশ পেয়ে বঙ্গীয় আধুনিক যুগের সূচনা সম্যক্‌ভাবে অবহিত হতে পারছি। ব্রজেন্দ্রনাথের একাজের পরিমাপ প্রায় অসম্ভব। একটি মূল্যায়ন আমরা উদ্ধার করতে পারি। আচার্য যদুনাথ সরকার :

আর তাহার 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' কাঁচি দিয়া ছাপার পাতা কাটিয়া আঠা দিয়া জোড়া সংকলন বহি নহে, ইহা একটি জীবন্ত সাহিত্যগ্রন্থ, এক বিচক্ষণ শিল্পীর সৃষ্টি-- একথা সাধারণে বুঝে না।'—(*শনিবারের চিঠি*, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ১২৪-২৫)

গ্রন্থটির বিন্যাস লক্ষণীয়। প্রথমে *সমাচার দর্পণের* বিভিন্ন সংখ্যা থেকে শিক্ষা বিষয়ক তথ্যাদি ও পরে পরে সাহিত্য এবং সমাজ ও ধর্ম বিষয়ক তথ্যাদি সুনিপুণ বিচারে গৃহীত হয়েছে। পরে বিবিধ স্তম্ভে নানা বিচিত্র সংবাদের সমাহার ঘটিয়েছেন। *সমাচার দর্পণ* প্রকাশের (১৮১৮) ঠিক আগের বছরেই হিন্দু কলেজ (১৮১৭) স্থাপিত হয়ে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক যুগে সংস্থাপিত করেছে। তারপর থেকে দেশি-বিদেশি উদ্যোগে নানান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জন্ম নিতে শুরু করেছিল। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল ধর্মভেদ-জাতপাতের রাজনীতি। বিশেষ করে রামমোহন রায়ের সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ বনাম হিন্দুসমাজ একটা বড়ো ভূমিকা নিতে শুরু করেছিল। হীরা বুলবুলের সন্তানের পড়া নিয়ে সামাজিক-ধর্মগত আন্দোলন তার একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র। *সমাচার দর্পণের* পৃষ্ঠাগুলি এমনতর সংবাদে পরিকীর্ণ ছিল। ইংরেজি শিক্ষা বনাম প্রথাগত শিক্ষার (প্রধানত সংস্কৃত শিক্ষা) দ্বন্দ্বও খুবই প্রকট ছিল এই পর্বে।

ছাপাখানার দৌলতে সংবাদ-সাময়িকপত্রের পাশাপাশি নানান বিদ্যার বইপত্র ছাপাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি এবং তার অনুবাদাদি ছাপা হচ্ছে। অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থাদি ও প্রাচীন সাহিত্য। তার পাশাপাশি চিকিৎসাগ্রন্থ বা পাঠ্যপুস্তক। ব্রজেন্দ্রনাথ এ সবগুলি 'সাহিত্য' স্তম্ভে বিন্যস্ত করেছেন সাহিত্যকে খুবই সীমিত অর্থে ধরে। নইলে এ বইপত্রগুলি কোনোভাবেই সাহিত্য-পদবাচ্য হতে পারে না। কিন্তু এর চেয়েও নব নব আন্দোলনে এ সময়ের সমাজ যেভাবে আলোচিত হতে শুরু করেছিল—তার ইতিবৃত্তই অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের তৎকালীন নৈতিক অবস্থা, আর্থিক অবস্থাদির পাশে ধনী মানুষজনদের সামাজিক অবস্থান যেমন জানতে পেরেছি, তেমনি জানতে পেরেছি সাধারণ মানুষজনদেরও অবস্থানের কথা। কী বনিয়াদের উপর আমাদের এই আধুনিক সমাজ গড়ে উঠেছে তার ইতিবৃত্ত জানতে হলে ব্রজেন্দ্রনাথের এই বই ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। তাঁর সুলিখিত দীর্ঘ ভূমিকাটি এ-বিষয়ে আমাদের হাত ধরে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় খণ্ডটি ১৩৪০ সালে প্রথম প্রকাশিত হবার পর ১৩৪৮-এ এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর পর প্রথম খণ্ডটির মতই 'পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ' প্রকাশিত হয় ১৩৫৬ বঙ্গাব্দেই (মাঘ মাসে)। ৬০ বছরের পরিসরে এটি ৫ বার মুদ্রিত হয়। এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে *সমাচার দর্পণের* পরবর্তী বছরগুলির, ১৮৩০-৪০ কালপর্বের, সংবাদসমূহ একই বিন্যাসে। এই বাইশ বছরে বাঙালি ও বাংলার ওঠা-পড়ার এমন ইতিবৃত্ত অন্যত্র দুর্লভ। গবেষকদের গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ নিজে কি পেয়েছেন জানি না, কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের পরিশ্রম লাঘব করে দিয়ে গেছেন গবেষকবৃন্দ 'কৃতজ্ঞতা প্রকাশ' করবেন কিনা সে অপেক্ষা না রেখেই। তাঁর সত্যনিষ্ঠা তাঁকে প্রবাদপুরুষে পরিণত করেছে। গোঁজামিল জিনিসটি তাঁর অভিধানে ছিল না। সম্ভবত উচ্ছ্বাস জিনিসটিও। সতর্ক প্রহরীর মত তিনি সজাগ এবং সতর্ক। কিছুই তাঁর নজর এড়িয়ে যায় না। তারপর তিনি সেই দেখাকে চিত্রে পরিণত করে আলেখ্যের মালা নির্মাণ করেন। আমরা তার আঘ্রাণ পেয়ে পরিতৃপ্ত।

ব্রজেন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন বঙ্গদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি কত দ্রুত পত্রিকাদির পৃষ্ঠা জীর্ণ করে তুলবে। আরও বুঝতে পেরেছিলেন আমাদের সংরক্ষণ বিমুখতার চরিত্রটি। জীর্ণকে দ্রুত জরাজীর্ণ করার সামর্থ্য আমাদের প্রচুর। তাই এখন থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে তিনি সেগুলিকে রক্ষা করার একক দায়িত্ব নিয়ে স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে গেছেন। সৌভাগ্যক্রমে তখন সম্ভবত সাময়িক-সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা এতখানি হরিদ্রাভ এবং পর্পটবৎ হয়ে পড়েনি। আরও উল্লেখযোগ্য এতে মুদ্রিত প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলী। তার গৌরবও আমরা সানন্দে পরিপাক করে চলেছি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খণ্ডশেষে 'সম্পাদকীয়' রচনাগুলি। আমাদের যাবতীয় জিজ্ঞাসার উত্তর ব্রজেন্দ্রনাথ এখানে দিয়ে গেছেন তথ্যাদি সরবরাহ করে।

ব্রজেন্দ্রনাথ এও বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর সময়কাল (১৮৯১-১৯৫২) অবধি প্রচারিত যাবতীয় পত্রিকার এমনতর সংকলন করা তাঁর একার পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু সেইসব পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ তাদের একটা তালিকা না করে গেলেও হয়তো কালের গর্ভে তাদের কিছু অংশ চিরতরে বিলীন হয়ে যাবে। সেজন্যে তিনি একই কালে আরও একটি গ্রন্থপ্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। 'শ্রীযুক্ত অমল হোম প্রিয়বরেষু'-কে উৎসর্গীকৃত সেই গ্রন্থটির নাম *দেশীয় সাময়িকপত্রের ইতিহাস*। এর একটিমাত্রই খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল, যদিও প্রকাশিত খণ্ডটি 'প্রথম খণ্ড' নামেই চিহ্নিত হয়ে আছে। এ থেকে বোঝা যায় আরও খণ্ড প্রকাশের বাসনা তাঁর ছিল। তবে এই প্রথম খণ্ডটি *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* গ্রন্থেরই পরিপূরক, কারণ এটিতে সংকলিত পত্রিকাসমূহের কালপর্ব ছিল ১৮১৮-১৮৩৯। ২৫/২ মোহনবাগান রো কলিকাতাস্থ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস থেকে এটি প্রকাশিত হয় ১৩৪২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলীর ৮৬ সংখ্যক গ্রন্থ হিসেবে। ঘটনাচক্রে এটির প্রচার রহিত হয়ে গেছে এবং ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের তালিকাভুক্ত হয়ে পড়ছে। সেজন্যে এর 'নিবেদন'-এর অংশবিশেষ উদ্ধার করে দিই :

নিবেদন

> এদেশে বাংলা সাময়িক পত্রের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮১৮ সালে। এই ১৮১৮ হইতে ১৮৬৭ সাল পর্য্যন্ত বাংলায় মুদ্রিত সাময়িকপত্রের একখানি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস লিখিবার ইচ্ছা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার মনে জাগে। বিষয়টি নূতন না হইলেও এ-সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থের অভাব আমি অনেক সময়ে অনুভব করিয়াছি। সেই অভাব কথঞ্চিৎ দূর করিবার অভিপ্রায়ে কয়েক বৎসরের অনুসন্ধানের ফলে আমি যে-সকল উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহারই সাহায্যে আপাততঃ সঙ্কলিত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। আমার সংগৃহীত উপকরণকে কেহ যেন চূড়ান্ত বলিয়া মনে না করেন, কারণ এমন অনেক পত্র-পত্রিকা আছে যাহা আমি নিজে দেখি নাই—উল্লেখমাত্র পাইয়াছি। শহর ও মফস্বলের প্রাচীন পরিবারে রক্ষিত কাগজপত্রগুলি অনুসন্ধান করিলে হয়ত এ-বিষয়ে এখনও কিছু উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে।
>
> এই পুস্তকে অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য সাময়িকপত্রের কোন কোন পৃষ্ঠার প্রতিলিপি দেওয়া হইয়াছে।

পাঠক বুঝতে পারছেন ব্রজেন্দ্রনাথের সততার পরিমাণ! তাঁর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই সততার সংযোগ হয়ে তাঁকে নির্ভরযোগ্যতার প্রতিমূর্তি করে তুলেছে। এর প্রথম পরিচ্ছেদে

১৮১৮-২২ কালপর্বের *দিগদর্শন* (মাসিক), *সমাচার দর্পণ* (সাপ্তাহিক) *বাঙ্গাল গেজেটি* (সাপ্তাহিক) *গসপেল ম্যাগাজিন* (মাসিক), *ব্রাহ্মণ সেবধি, সম্বাদ কৌমুদী* (সাপ্তাহিক...) *পশ্বাবলী* এবং *সমাচার চন্দ্রিকা* (সাপ্তাহিক)... ছাড়া উর্দু সংবাদপত্র *জাম-ই-জাহান-নুমা* (সাপ্তাহিক) এবং ফার্সী সংবাদপত্র *মীরাৎ-উল-আখবার* (সাপ্তাহিক) গৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (১৮২৩-৩৫) গৃহীত হয়েছে *সম্বাদ তিমিরনাশক* প্রভৃতি ২১টি বাংলা পত্রিকা ছাড়া একটি হিন্দি, ৫টি ফার্সি ও একটি উর্দু সংবাদপত্রের বিবরণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে *সম্বাদ সুধাসিন্ধু* প্রভৃতি ৯টি পত্রিকার সোল্লেখ আলোচনা। একালের জীবিত ও মৃত পত্রিকাগুলিকেও তিনি তালিকাভুক্ত করে শেষে *সত্যবাদী* পত্রিকার আলোচনা করেছেন। পরিশিষ্টে মুদ্রিত হয়েছে MR W.B. BALEY'S MINUTE (dated 10th October 1822) এবং *Calcutta Christian Observer Vol. 1 No 5 Oct 1832* থেকে General Characteristics of the Native Newspapers নিবন্ধটিও।

ব্রজেন্দ্রনাথকে নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক লেখালেখি হয়েছে, সাহিত্য সাধক চরিতামালাতেও একটি জীবনী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু এই বইটির যে সমালোচনাটি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় করেছিলেন, সেটির উল্লেখ কোথাও দেখতে পাইনি। এর কারণ যেখানে এই সমালোচনাটি মুদ্রিত হয়, সেই সংখ্যাটি দেখার সুযোগ খুব কম লোকেরই রয়েছে, সেটি এমনই দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। সুনীতিকুমার এটির একটি সুচিন্তিত আলোচনা করেছিলেন 'দেশ' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের ৪১ সংখ্যায় (২৯ আগস্ট ১৯৩৬, পৃ. ৩২১)। সুনীতিকুমারের এই রচনাটি অদ্যাবধি অন্যত্র সংকলিতও হয়নি। আমি সেই দুর্লভ রচনাটির কিছু অংশ এখানে উদ্ধার করে দিলাম।

সাময়িক পত্রের ইতিহাস রচনা

অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ. ডি-লিট

> বাঙ্গালা সাহিতের ইতিহাস লইয়া যাঁহারা সার্থক আলোচনা করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আসন অতি উর্ধ্বে। ইনি বিগত শতকের বাঙ্গালা সাহিত্যের লুপ্ত কাহিনী উদ্ধাবকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং ইঁহার চেষ্টায় আমাদের আধুনিক সাহিত্যের পত্তনের মূলকথা বাঙ্গালার পাঠক-সমাজের সমক্ষে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ব্রজেন্দ্রবাবু পুরাতন বাঙ্গালা পত্র পত্রিকা অবলম্বন করিয়া ইতিপূর্বে তিনখণ্ডে "সংবাদপত্রে সেকালের কথা' নাম দিয়া এক অতি উপাদেয় পুস্তক প্রকাশ করেন, ইহাতে আধুনিক বাঙ্গালী জীবনের যুগান্তর কালের সত্যকার চিত্র, আমাদের পিতামহ ও প্রপিতামহগণের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা ও কর্মের বিচিত্র কাহিনী সমসাময়িক লেখা ও রচনা এবং সংবাদ ও মন্তব্য হইতে সংগৃহীত করিয়া আমাদের সামনে ধরিয়া দিয়াছেন।... ব্রজেন্দ্রবাবু "দেশীয় সাময়িকপত্রের ইতিহাস" লইয়া কিছুকাল ধরিয়া 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'তে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই অমূল্য প্রবন্ধাবলী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই এগুলির উপযোগিতা সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন, এবং এই প্রবন্ধগুলি সম্পূর্ণ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে ব্রজেন্দ্রবাবু পরিষৎ পত্রিকার প্রবন্ধাবলীর আধারে প্রস্তুত এই চমৎকার বইখানি বাঙ্গালী পাঠকসমাজে "ভেট" দিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রবাবুর বই পড়িতে পড়িতে অসাধারণ শ্রম ও সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া বিস্মিত ও প্রীত হইতে হয়। তিনি কোনও কিছু উক্তি করিবার পূর্ব্বে আলোচ্য পত্র বা পত্রিকা নিজে খুঁজে বাহির করিয়া দেখিয়াছেন—কোথাও পরের মুখে ঝাল খান নাই—"পরস্মৈপদী" গবেষণা চালাইবার আকাঙ্ক্ষা ব্রজেন্দ্রবাবুর বইয়ের কুত্রাপি দেখা যায় না। অনুগামী আলোচনাকারীদের সুবিধার জন্য তিনি সর্বত্র প্রচুর প্রমাণ পঞ্জী দিয়াছেন, মূল পত্রপত্রিকাদির প্রাপ্তিস্থান ও কতটা অংশ বা কত সংখ্যা প্রাপ্তব্য, তাহারও পূর্ণ নির্দেশ দিয়াছেন। এইরূপ সারল্য ও সততার সহিত গবেষণা বাঙ্গালা দেশের তথাকথিত সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বিষয়ক গবেষকদের মধ্যে বিরল—একরকম অজ্ঞাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্রজেন্দ্রবাবু ঐতিহাসিক বা সময়ানুসারী ক্রম হিসাবে প্রথম হইতে বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা হিন্দী উর্দু ও ফারসী প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত অবং সংবাদপত্র ও অন্য সাময়িক পত্রের যথাপ্রাপ্ত পূর্ব পরিচয় দিয়াছেন। ইউরোপীয় সংস্কৃতির সহিত প্রথম পরিচয়ের যুগে ভারতীয়—বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালী ও অন্য ভাষাভাষী—জনগণের চিত্তের ঔৎসুক্য ও নূতন জ্ঞান আত্মসাৎ করিবার জন্য আগ্রহ দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। খ্রীষ্টীয় ১৮১৮ হইতে ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত এই ২১ বৎসরের ইতিহাস এই পুস্তকে (ইহার প্রথম খণ্ডে) ব্রজেন্দ্রবাবু উপস্থিত করিয়াছেন। এই ২১ বৎসরের মধ্যে ৩৬খানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও পত্রিকা, ৭খানি ফারসী, ২খানি উর্দু ও ১খানি হিন্দী কাগজ বাহির হয়। শতাধিক বৎসর পূর্বে, যখন ডাকের ব্যবস্থা ছিল না বলিলেই হয়, এবং যখন দেশে ছাপাখানার রেওয়াজ নূতন আসিয়াছে, তখন কলিকাতা অঞ্চলের অল্প কয়েক লক্ষ লোকের মধ্যে নানা বিষয়ে এতগুলি পত্র পত্রিকার প্রকাশ জাতীয় চিত্তের জাগৃতির পরিচায়ক বটে। এই যুগের সাহিত্যিক চেষ্টার কত কথাই না আমাদের অজ্ঞাত ছিল ও আছে। আমরা সকলে এই চেষ্টার—এই সকল পত্রপত্রিকার—অস্তিত্বের কথাই ভুলিয়া গিয়াছি। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবুর অনুসন্ধানের প্রসাদে আমরা এই পূর্বকথা—জাতির এই কৃতিত্ব আবার স্মরণপথে আনিতে সমর্থ হইতেছি। এজন্য তিনি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ধন্যবাদার্হ।

ব্রজেন্দ্রবাবু যথার্থ ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতা ও আড়ম্বরহীনতার সহিত তাঁহার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা রীতি গবেষণা লিপিবদ্ধ করিবার পক্ষে আদর্শস্বরূপ।...

দেশীয় সাময়িকপত্রের ইতিহাস যে 'অপ্রচারিত' হয়ে যায় তার কারণ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে *বাংলা সাময়িকপত্র* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রকাশ। এখানে ১৮১৮-১৮৬৭ কালপর্বের সাময়িকপত্রিকাগুলি স্থান পেয়েছে। এতেই *দেশীয় সাময়িকপত্রের ইতিহাস* প্রথম খণ্ডের (১৮১৮-১৮৩৯) সমগ্রত অন্তর্ভুক্তি ঘটে যায়। বর্তমানে প্রচারিত 'বাংলা সাময়িকপত্র' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত মাঘ ১৩৫৪ তারিখে রচিত ব্রজেন্দ্রনাথের 'নিবেদন' অংশ থেকে সেই তথ্যটি সংগ্রহ করা যাবে না। *বাংলা সাময়িকপত্রের* ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের সংস্করণে মুদ্রিত নিবেদন অংশে তা পাওয়া যাবে—

১৩৪২ সালের মাঘ মাসে 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস' ১ম খণ্ড' এই নামে ১৮১৮ হইতে ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাস আমি প্রকাশ করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান পুস্তকে সেই পুস্তকান্তর্গত সমুদায় অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এর দ্বিতীয় খণ্ডটি (১৮৬৮-১৯০০) প্রকাশিত হয় ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে। প্রথম খণ্ডটি ছিল পত্র-পত্রিকার কালানুক্রমিক প্রকাশসহ তাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার ভাণ্ডার। দ্বিতীয় খণ্ডটিতে শুধু সাল-তারিখ সমেত পত্রিকাদির তালিকায় পরিশিষ্টের ২৪টি পত্রিকা

ছাড়া ৮১৮টি পত্রিকার নাম স্থান পেয়েছে। এই অনুসন্ধান গভীর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফল। তবুও ব্রজেন্দ্রনাথ জানতেন, এই তালিকা সম্পূর্ণ নয় এবং সেটাই স্বাভাবিক। সেকথা তিনি উল্লেখও করে গেছেন—'আমাদের বিবরণে অসম্পূর্ণতা থাকা মোটেই বিচিত্র নহে।'

ব্রজেন্দ্রনাথের সমকালেই বাংলা সাময়িকপত্র নিয়ে গভীরভাবে অনুশীলন করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (১৯০৫-১৯৯০)। এ-বিষয়ে তিনি একটিমাত্র ছোটো বই লিখে গেলেও তাঁর রচিত সংবাদ-সাময়িকপত্র সম্পর্কিত লেখাগুলি নিয়ে একটি গ্রন্থপ্রকাশ করা যেতে পারে। বাংলা ১৩৪৯, ইংরেজি ১৯৪২ সালে এই শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ থেকে ৪২ পৃষ্ঠার ছোটো বই *শ্রীহট্টবাসী সম্পাদিত এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র* প্রকাশিত হয়। বস্তুত ১৩৪০ বঙ্গাব্দ থেকেই তিনি এই বিশেষ চর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর চর্চার ফল আমি কালানুক্রমিকভাবে উল্লেখ করছি :

১ সম্বাদভাস্করে সেকালের কথা, *প্রবুদ্ধভারত*, ১/২ আষাঢ় ১৩৪০

২ সংবাদপত্রে সে যুগের কথা, *প্রবর্ত্তক* ২২/১/৫ ভাদ্র ১৩৪৪

৩ ঐ " *পণ্যচক্র*, শারদীয় ১৩৪৫

৪ ঐ " *সাময়িক*, শারদীয় ১৩৪৫

৫ ঐ " *মাতৃভূমি*, মাঘ ১৩৪৫

৬ ঐ " *প্রবর্ত্তক* চৈত্র ১৩৪৫

৭ ঐ " *মাতৃভূমি* জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬

৮ ঐ " *বঙ্গলক্ষ্মী*, আষাঢ় ১৩৪৬

৯ ইউরোপীয় সম্পাদিত বাঙলা সংবাদ ও সাময়িকপত্র 'দিগদর্শন', *সংহতি*, আশ্বিন ১৩৪৬

১০ সোমপ্রকাশে সে যুগের কয়েকখানি বাঙলা গ্রন্থ পরিচয়, *সংহতি*, পৌষ ১৩৪৭

১১ সোমপ্রকাশে ব্রাহ্মপ্রসঙ্গ, *তত্ত্বকৌমুদী*, ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩

১২ সংবাদপত্রে সে যুগের কথা (১৮১৮-১৮৬৭), উদ্বোধন, আষাঢ় ১৩৫৮

১৩ বাংলা সংবাদপত্রে বাংলা গ্রন্থপরিচয়, *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ১৩৬২, সংখ্যা ১, ২, ৩।

১৪ শিলঙের প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র, *পূর্বভারতী* (শিলং), আশ্বিন ১৩৭৬

তালিকাটি থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যতীন্দ্রমোহন 'সংবাদপত্রে সে যুগের কথা' নামে একটি প্রবন্ধমালা লিখে সেই যুগটিকে ধরার চেষ্টা করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ-বিনয় ঘোষদের মতোই। এছাড়া সে সময়ে প্রকাশিত গ্রন্থরাজির যে সমালোচনাগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পত্রস্থ হয়েছিল, তাদের সম্পর্কে লিখে যতীন্দ্রমোহন সেকালের গ্রন্থরচনার বৈশিষ্ট্যগুলিও পাঠকের গোচরীভূত করতে পেরেছিলেন।

চার

এই যে মহেন্দ্রনাথ-কেদারনাথ-ব্রজেন্দ্রনাথেরা বাংলা সাময়িকপত্র-প্রকাশ ও চর্চার ইতিহাসের স্বর্ণদ্বারটি উন্মোচন করে দিলেন সেই দ্বার দিয়ে বিপুল সংখ্যক পথিক পদচারণা করতে লাগলেন—একথা ভাবা উচিত হবে না। এজন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল

যতীন্দ্রমোহনের পর বিনয় ঘোষের (১৯১৭-১৯৮০) আগমন পর্যন্ত। তাঁর পাঁচ খণ্ডে পরিকল্পিত *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র* বাংলার নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের এক দুর্মর প্রয়াস, এক অভাবিত উদ্যোগ এবং সমাজেতিহাসের এক স্বনির্ভর দলিল। এই পাঁচটি খণ্ডই যেন একটি জাতীয় মহাফেজখানা।

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র-এর প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে। এটি ছিল *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকার সংকলন—এর পরিসর ছিল ৫৪৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী। এর ভূমিকা লিখেছিলেন ইতিহাসবিদ্ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ। দ্বিতীয় খণ্ডটি *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* সংকলন—প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৯৬। তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশ ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে। *বেঙ্গল স্পেক্টেটর, সম্বাদ ভাস্কর, বিদ্যাদর্শন* ও *সর্বশুভকরী* পত্রিকার রচনা-সংকলন সম্বলিত ৬২৪ পৃষ্ঠার বিপুলায়তন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বীক্ষণ থেকে। এই বীক্ষণ-বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রথম খণ্ড দুটির প্রকাশক ছিলেন। চতুর্থ খণ্ডটি আকারে সর্ববৃহৎ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০২৬। প্রকাশক পাঠভবন। বীক্ষণ-পাঠভবন ঠিকানা একই ১৪/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে *সোমপ্রকাশ* পত্রিকার সামাজিক রচনাবলি। ২৫২ পৃষ্ঠা সম্বলিত এর পঞ্চম খণ্ডটি কোনো পত্রিকার সংকলন নয়, স্বয়ং গ্রন্থকার *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা* এতে বিন্যস্ত করে বাংলার সমাজেতিহাসে সাময়িকপত্রের গুরুত্বের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন।

পাঠক সহজেই বুঝতে পেরেছেন অন্তত গ্রন্থের নামকরণ থেকে যে এই মহাখণ্ডপঞ্চকের বিষয়বস্তু বর্ণিত সাময়িকপত্র-সমূহে মুদ্রিত সমাজবিষয়ক রচনাবলি। ১৮৪০-১৯০৫ কালপর্বের —অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমার্ধের শেষ দশক থেকে শুরু করে বিংশ শতকের বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের কাল পর্যন্ত প্রায় ৫০ বছর ধরে বাঙালি-সমাজ যে বিচিত্র ও বিবিধ আন্দোলন-সংঘাতে—রক্ষণশীলতা-উদারপন্থী মতবাদে—আন্দোলিত হয়ে চলেছিল তার প্রামাণ্য দলিলগুলিই এখানে সংকলিত হয়েছে। এই সমাজ সম্পূর্ণ ব্রিটিশ-শাসনাধীন ছিল। স্বভাবতই তাঁদের বিচিত্র ভূমিকা একালের সমাজ ভাঙা এবং গঠনে যথেষ্ট কার্যকর ছিল। জমিদারি প্রথা, পল্লীগ্রামের অবস্থা, বিবাহ, শ্রমিকবর্গ, সনাতন হিন্দুধর্ম-ব্রাহ্মসমাজ-প্রচলিত অন্যান্য ধর্মসমূহ এবং খ্রিস্টীয় প্রচারাদিতে আলোড়িত সমাজ, পুজো-আচ্চা, নারীদের অবস্থান, রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, উত্থান-পতন, বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন, শিক্ষা, সাহিত্যচর্চা, অভিনয়, লোকসংস্কৃতি, নানান বিদ্রোহ, নানান প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের নিয়ে তৎকালীন যে সমাজ গড়ে উঠেছিল—তার সত্যচিত্রটি পেতে গেলে এই খণ্ডগুলির সাহায্য নিতেই হবে। ক্রমজীর্ণ ও ক্ষীয়মাণ দুর্লভ পত্রিকাটি যখন হারিয়ে যাবে ক্রমশ, তখন এই খণ্ডগুলিই মিটিয়ে যাবে আমাদের যাবতীয় কৌতূহল।

পাঁচ

ব্রজেন্দ্রনাথ-বিনয়বাবুরা যেখানে থেমে গেছেন, সেখান থেকেই নতুন করে শুরু করেছেন গীতা চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই নিষ্ঠিত কর্মী বহু আয়াসে *বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি প্রস্তুত করে দিলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে সেটি প্রকাশ করে। এই খণ্ডে ১৯০০-১৯১৪ কালপর্বে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাগুলির

পরিচয় গৃহীত হয়েছে। বহু নিকট-দূরের গ্রন্থাগারে তাঁকে এজন্যে যেতে হয়েছে। ১৯১৪ সালটি উল্লেখযোগ্য, কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এই কালকে স্পর্শ করেছিল। এ সময়ে সমাজেরও লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছিল। কিছুকাল আগে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে দেশে নতুন করে স্বদেশপ্রীতি জেগে উঠেছিল। রামকৃষ্ণ মিশন কিছুকাল আগে মাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পাশ্চাত্যশিক্ষা ক্রম প্রসার্যমান। সাহিত্যেও একটা নতুন জাগরণ দেখা গেছে। বিজ্ঞান, কলা, শিল্প সর্বক্ষেত্রে একটা নতুন উদ্যোগ লক্ষিত হয়েছে। এর পুরো ছবিটি পেতে হলে আমাদের একালের সাময়িকপত্রের উপর নির্ভর করতেই হয়।

বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জীর এই খণ্ডে ৩৮৭টি সাময়িকপত্রের পরিচয়, স্বভাবতই সংক্ষিপ্ত, প্রদত্ত হয়েছে। বেশ কিছু ছবি রয়েছে, যেগুলি দেখার সুযোগ কদাচিৎ ঘটে। কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এখানে রয়েছে যার অভাব আগের সংকলনগুলিতে রয়ে গেছে। আগের সংকলনগুলিতে অবশ্য পত্রিকার পরিচিতি ছিল না, ছিল সেখান থেকে আহৃত সমাজ বিষয়ক বিবিধ রচনার সংকলন। এখানে পত্রিকা পরিচিতিই প্রধান হয়ে পড়েছে ব্রজেন্দ্রনাথের বাংলা সাময়িকপত্র-এর চরিত্রানুসরণ করেই। কিন্তু গীতা চট্টোপাধ্যায় তাঁর নির্ঘন্ট এমন বিষয়ানুসারে বিন্যস্ত করেছেন যে, পাঠকের উদ্দিষ্ট পত্রিকা বেছে নিতে অসুবিধা হয় না। তাছাড়া এই পত্রিকা কোন গ্রন্থাগারে প্রাপ্য তার নির্দেশ থাকায় পাঠকের পক্ষে তা খুবই সহায়ক হয়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রেই সংক্ষিপ্ত পরিচিতির মধ্য থেকেই পত্রিকার চরিত্র অনুধাবিত হয়ে যায়। এর দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে একই প্রকাশনা সংস্থা থেকে ১৯৯৪ সালে। এখানে ১৯১৫-১৯৩০ কালপর্বের ৬৯২টি পত্রিকা গৃহীত হয়েছে। প্রসঙ্গ-কথাটি এখানে সুবিস্তৃত হওয়ায় বাঙালির তৎকালীন সমাজের বহুধা বিস্তৃত পরিচয়টি উদঘাটিত হয়ে গেছে। যে দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন তা তাঁকে আরও পালন করতে হবে আরও খণ্ড প্রকাশ করে। তবে পাঠক-গ্রাহকের আনুকূল্যে তাঁকে কতখানি উৎসাহিত করবে জানি না। অশোককুমার রায়--শুধুমাত্র সূচি হলেও 'বাংলা সাময়িক পত্রপত্রিকার ক্রমবিকাশ পঞ্জি' প্রকাশ করেছেন ১৯৯০ সালে। এই তালিকায় স্থান পেয়েছে ১৮১৮-১৯৬৮ কালপর্বের অনেক পত্রিকা। তবে তা থেকে বাড়তি কোনো পরিচয় পাবার সুযোগ অনুপস্থিত।

তবে বিশেষ বিশেষ পত্রিকার সূচি নির্মাণের একটা উদ্যোগ দেখা গেছে এখনকার গবেষকদের মধ্যে। এভাবেই *সুবর্ণবণিক সমাচার পত্রিকা* (১৩২৩-৬৪, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত), *কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি, প্রবাসী, ঢাকাপ্রকাশ, ইতিহাস, জ্ঞানান্বেষণ* (ইংরেজি-বাংলা), *ভারতী, মানসী* ও *মর্মবাণী, সাহিত্য, রবীন্দ্রভাবনা, বঙ্গবাণী, সৌরভ, দেশ, বঙ্গদর্শন, সাধনা, সঞ্জীবনী, বিচিত্রা, শনিবারের চিঠি* প্রভৃতি পত্রিকার সূচি নির্মিত হয়েছে। কেউ কেউ সাময়িকপত্রাদি থেকে বিশেষ কোনো প্রসঙ্গ ব্যক্তি বা স্থানের গুরুত্ব দিয়ে গ্রন্থ নির্মাণ করেছেন। এভাবে সাময়িকপত্রে কলকাতা, বর্ধমান প্রভৃতি স্থান, রবীন্দ্রনাথ (*প্রবাসী, কল্লোল, কবিতা, শান্তিনিকেতন, সাহিত্য* প্রভৃতিতে) স্বাধীনতা লাভ স্থান পেয়েছেন। কিন্তু তা থেকে সমাজের ওঠা-পড়ার ছবিটি ধরা দুষ্কর। কিন্তু প্রবণতাটি সৎ। আবার *সমকালীন, চতুরঙ্গ, জিজ্ঞাসা* প্রভৃতি পত্রিকার নির্বাচিত সংকলনও বরণীয়।

পশ্চিমবঙ্গের মত বাংলাদেশেও এ ধরনের গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়ে সাময়িকপত্রের ইতিবৃত্ত

চর্চার প্রয়াসকে পূর্ণতর রূপ দিতে পেরেছে। ড. আনিসুজ্জামান-এর *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র* (ঢাকা ১৯৬৯), মুস্তাফা নূরউল ইসলাম-এর *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত* (১ম খণ্ড ঢাকা ১৯৭৭, ২য় খণ্ড ঢাকা ২০০৫) মোহাম্মদ আবদুল কাইউম রচিত *ঢাকার সাময়িকপত্র, সাময়িকপত্রে সাহিত্যিক প্রসঙ্গ* (ঢাকা, ১৯৯০), শামসুল হক-এর *বাংলা সাময়িকপত্র* (ঢাকা, ১৯৮৪) কিংবা ইসরাইল খানের প্রয়াস সাময়িকপত্র চর্চার ধারাকে অব্যাহত রেখে পূর্বসূরিদের উদ্যোগকে সমৃদ্ধ করেছে।

এই প্রসঙ্গে মুনতাসীর মামুনের কথা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ১৯৮৫-২০০০ এই কালপর্বে নটি খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র* (১৮৪৭-১৯০৫) সংবাদ-সাময়িকপত্র গবেষণার ধারায় এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই মহাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পূর্ব বাংলা থেকে এই পর্বে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির কালানুক্রমিক পরিচয়ে এগুলির বৈশিষ্ট্য, চরিত্র বিশ্লেষিত। পরবর্তী খণ্ডগুলিতে আছে *ঢাকা প্রকাশ* ও *পূর্ববঙ্গ* থেকে প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকার সংবাদ-রচনা সংকলন এবং তার মূল্যায়ন। এ মূল্যায়ন তিনি করেছেন সম্প্রদায়গত দিক থেকে নয়, শ্রেণিগত দৃষ্টিকোণ থেকে। উনিশ শতকে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক স্বর্ণখনি মুনতাসীর এই খণ্ডগুলিতে আমাদের উপহার দিয়েছেন। তাঁর কাজ এখনও শেষ হয়নি। আরও দুটি খণ্ড প্রস্তুত হয়ে প্রকাশের অপেক্ষায় দিন গুনছে।

ছয়

এই প্রসঙ্গে একাধিক গবেষণাগ্রন্থের উল্লেখ সম্ভবত প্রাসঙ্গিক হবে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর গবেষণা সন্দর্ভ *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ* (১৮১৮-১৮৭৮) প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে। সম্প্রতি এর একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ (২০০৩) প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রথম ৬০ বছর তাঁর গবেষণার কাল পরিধি। যেহেতু এটি গবেষণাগ্রন্থ, সেজন্য তাঁকে প্রধানত নির্ভর করতে হয়েছে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের গবেষণার উপর। সব পূর্ব-গবেষণা তিনি দেখেছেন বলে তার ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী থেকে মনে হয়নি। তবে তিনি নিজে মূল পত্র-পত্রিকার অনেক সংখ্যাই দেখেছেন। ফলে তাঁর পরিবেশিত তথ্য ও মন্তব্যাদি আমাদের কাছে নতুন বলে মনে হয়েছে। তিনি প্রধানত *সমাচার দর্পণ, ব্রাহ্মণ সেবধি* ও *সম্বাদ কৌমুদী, সমাচার চন্দ্রিকা, বঙ্গদূত, সংবাদ প্রভাকর, জ্ঞানান্বেষণ* (এর একটি চমৎকার সংকলন ও বিশ্লেষণাত্মক ভূমিকা লিখেছেন, সুরেশচন্দ্র মৈত্র . কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের *সঞ্জীবনী, ভারত শ্রমজীবী* পত্রিকার সংকলনও ভূয়সী প্রশংসার দাবি রাখে), *সম্বাদ-ভাস্কর,* ও *সম্বাদ রসরাজ, বেঙ্গল স্পেক্টেটর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* (এর প্রথম বর্ষের সংখ্যাগুলির একটি সূচিপত্রও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে), *এডুকেশন গেজেট* ও *সাপ্তাহিক বার্তাবহ, সোমপ্রকাশ, অমৃতবাজার* এবং *সুলভ সমাচার* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাঁর বিশ্লেষণে তিনি পত্রিকা সমূহের প্রচার, ইংরেজি পত্রিকার সঙ্গে তৌলবিচার প্রভৃতি চরিত্র লক্ষণের পাশাপাশি এইসব পত্রিকায় প্রকাশিত সতীদাহ, বিধবা ও বহুবিবাহ, কৌলীন্য প্রথাসহ নানান সামাজিক কুসংস্কারের কথাও তুলে ধরেছেন। সংবাদপত্রের সামাজিক ভূমিকার পাশাপাশি শিক্ষার দায়বদ্ধতা ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতা আর উদারপন্থার সংঘর্ষ এবং জাতীয় চেতনার ক্রমপ্রসারও তিনি তন্নিষ্ঠ দৃষ্টিতে লক্ষ করেছেন।

লক্ষ করেছেন কেমন করে বাংলাগদ্যের নির্মিতিতে এইসব সংবাদ-সাময়িকপত্র একটা ধনাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

সাত

উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকার চর্চা অধুনাতম একটি নবোদ্যোগ পেয়েছে স্বপন বসু সংকলিত ও সম্পাদিত দুটি পৃথুল খণ্ডে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি তাঁর গ্রন্থ *সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ*-এর প্রকাশক। প্রথম খণ্ডে স্থান পেয়েছে উনিশ শতকের যাবতীয় বাংলা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ভূস্বামীদের ভূমিকা, কৃষক বিদ্রোহ সমেত কৃষকদের অবস্থা ও অবস্থান, গণঅসন্তোষ বিষয়ক যাবতীয় সংবাদ। দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয় উনিশ শতকে বাংলার নারীসমাজ। অনেক চেষ্টা করেও এমন পত্র-পত্রিকার নাম বের করতে পারিনি যা স্বপন বসুর অবগতির বাইরে রয়ে গেছে। অনেকে তাঁকে ব্রজেন্দ্রনাথ-বিনয়বাবুর উত্তরসূরি বলেছেন। তবে তাঁর পরিকল্পনা একটু অভিনব। এখানে বিষয়ভিত্তিক সংকলন করা হয়েছে ; দ্বিতীয়ত তিনি কোনো একটি বিশেষ পত্রিকার সংকলন করেননি—উনিশ শতকে প্রকাশিত সমস্ত বাংলা সাময়িক-সংবাদপত্রের সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ ও মস্তিষ্কগত পরিচয়। এই পরিশ্রম বিমুখতা এবং পরধনলোভমত্ত গবেষণার যুগে এই নিষ্ঠা এবং স্বেদবাহী সংকলন দুর্লভ। আরও কয়েকটি এমনতর খণ্ড প্রকাশিত হবে জেনে আমরা আশান্বিত। আপন পরিশ্রমে অপরের পরিশ্রম-লাঘব করার জন্যে এই যে কমিটমেন্ট—তা উনিশ শতকের এবম্বিধ চর্চার আদর্শ হয়ে থাকবে।

তপন বাগচী

বিজ্ঞাপনের জগৎ

বিজ্ঞাপন শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশেষ জ্ঞাপন। সে অর্থে সংবাদকেও বিজ্ঞাপন বলা যায়। কিন্তু যোগাযোগ বিদ্যার ভাষায় গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ কিংবা যে কোনও উপাদানই বিজ্ঞাপন নয়। অর্থের বিনিময়ে পণ্য, সেবা কিংবা ধারণার প্রচারণাকে বিজ্ঞাপন বলা হয়। জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার অধ্যাপক, বিশিষ্ট যোগাযোগবিদ যোশেফ ডমিনিক-এর ভাষায় বিজ্ঞাপন হচ্ছে 'any form of nonpersonal presentation and promotion of ideas, goods and services usually paid for by an identified sponsor'. সংবাদ অর্থের বিনিময়ে ছাপা হয় না, তাই এটি বিজ্ঞাপন নয়। কিন্তু বাণিজ্যিক পণ্যের গুণাগুণ জানিয়ে বক্তব্য প্রচার, নতুন পণ্য বাজারজাতকরণের ঘোষণা, কিংবা নতুন কোনো ধারণা বা তথ্য জনসাধারণের কাছে প্রচারের জন্য উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান অর্থের বিনিময়ে গণমাধ্যমে প্রচার করে। একসঙ্গে অনেক লোকের কাছে পৌঁছানো যায় বলে বিজ্ঞাপনদাতারা বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, পোস্টার, বিলবোর্ড প্রভৃতি মাধ্যমকে বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার করে।

বিজ্ঞাপন প্রচার শুরু কবে থেকে হয়, তা এখনও গবেষণার বিষয়। ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সময়েও বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা ছিল, ইতিহাসবিদগণ সে ব্যাপারে কিছু তথ্যপ্রমাণ পেয়েছেন। পম্পেই ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি বিলবোর্ড খুঁজে পাওয়া যায়, যাতে পণ্যের প্রচারমূলক বক্তব্য ছিল বলে জানা যায়। মধ্যযুগে জাহাজের নাবিকরা বন্দরে নোঙর করলে তাতে পণ্যের গুণ উল্লেখ করে মানুষকে কেনার জন্য উদ্বুদ্ধ করত। এটিও এক ধরনের বিজ্ঞাপন। অবশ্য গুটেনবার্গের ছাপাখানা আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞাপন তার নিজস্ব চেহারা পায়। তবে প্রথম বিজ্ঞাপন হিসেবে ধরা হয় ১৪৮০ সালে ব্রিটেনে পাওয়া একটি হ্যান্ডবিলকে। এতে একটি ধর্মীয় গ্রন্থ ক্রয়ের আহ্বান প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদপত্রে প্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১৬০০ সালে ব্রিটেনে। এর প্রায় ১০০ বছর পরে আমেরিকার সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। ১৭০৪ সালে *দ্য বোস্টন নিউজলেটার* নামের একটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার শুরু হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশের সংবাদপত্রে প্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১৭৮০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হিকির *দ্য বেঙ্গল গেজেট, অরিজিনাল ক্যালকাটা জেনারেল এডভার্টাইজার* পত্রিকায়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখ করেছেন তারাপদ পাল--

এখন কলকাতাবাসী জনৈক ভদ্রলোক দু'টি সুদেহী আফ্রিকান—যাদেরকে কথ্য ভাষায় 'কাফরী' বলা হয়—মেয়েছেলে চান। তাদের বয়স ১৪ থেকে ২০/২৫-এর মধ্যে হবে। গড়ন বেশ হৃষ্টপুষ্ট হওয়া দরকার। সকল রকমভাবে যাতে দেহভোগের কাজে লাগে সেরকম হতে হবে।

দেহভোগের উদ্দেশ্যে নারী ক্রয় কিংবা ভাড়া চেয়ে এ ধরনের প্রকাশ্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নারীর প্রতি চরম অপমান দেখানো হয়েছে। এই বিজ্ঞাপনে পুরুষশাসিত সমাজের হীন দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ ঘটেছে। হয়তো এটি তৎকালীন সমাজের স্বাভাবিক চিত্র নয়। কিন্তু একটি খণ্ডচিত্র হিসেবেও এটি তাৎপর্যপূর্ণ।

সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়

প্রাত্যহিক পত্র।

প্রথম পাতায় বিজ্ঞাপন আর বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপনদাতা পণ্যের প্রচার করে বিক্রি বাড়ায়। আর সংবাদপত্র সেই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে নিজের আয় বাড়ায়। তাই সকল দেশের সংবাদপত্রেই বিজ্ঞাপন একটি প্রয়োজনীয়

উপাদান। আর পাঠকও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘরে বসেই নতুন পণ্যের খবর পায়, নতুন তথ্য ও ধারণা পায়। পাঠকের কাছেও বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়।

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র *সমাচার দর্পণ* থেকেই বিজ্ঞাপনের আবির্ভাব। যত দিন গেছে, ততই বেড়েছে বিজ্ঞাপনের সংখ্যা আর বৈচিত্র্য--অনেক সময় বিজ্ঞাপনের ভারে সংবাদই গেছে সঙ্কুচিত হয়ে। কত বিচিত্র ধরনের বিজ্ঞাপন যে সেকালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত তার ঠিক ঠিকানা নেই। আর এই সব বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে পরিবর্তমান

এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ। ১০ই অগ্রহায়ণ ১২৮২

Wanted a 2nd Master for the H. E. School at Pooteah on a salary of Rs. 50 a month. Applications with copies of testimonials are to be sent to Raja Paresh Narain Ray, Secretary to the School within the 5th December next. Candidates who have passed the B. A. Degree Examination and have some experience in teaching would have the preference.

Pooteah, Zillah Rajashye — Sharoda Bhoosun Sanyel Hd Master H. C. E. School at Poooteah

নূতন পুস্তক।

ভারতভিক্ষা।

ত্রৈমাসিক সমালোচক।

সর্ব্ব শাস্ত্র বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

F. H. Skrine Esquire C. S.

Literary enterprise is making considerable strides in Bengal. We have now several monthly Magazines which will be soon capped by a Quarterly Review in Bengali.

Euclid's Elements of Geometry Book I and Measurement of ... surfaces

জ্যামিতি ও পরিমিতি

১৮৭৬ সালের মাইনর এবং বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য।

উদ্ভিদ্ বিচার (৩য় সংস্করণ)

বঙ্গমহিলা।

বই আর কর্মখালির বিজ্ঞাপন

বাঙালিসমাজের চেহারা। সরকারি ঘোষণা, নিলামের বিজ্ঞাপন তো কমবেশি সব পত্রিকার কপালেই জুটত। এছাড়াও যেসব জিনিস বিশেষভাবে চোখে পড়েছে তার মধ্যে যেমন

কর্মখালির, গৃহশিক্ষকের, বিবাহের, বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যের, স্কুল-কলেজের, বই, পত্র-পত্রিকার, সভা-সমিতির বিজ্ঞাপন আছে, তেমনই আছে কন্যাদায়ে ভিক্ষা চেয়ে মায়ের সাহায্য প্রার্থনাও।

সময় যত এগিয়েছে, ক্ষেত্র ততই প্রসারিত হয়েছে—নাটকের, সিনেমার, গ্রামাফোন কোম্পানির সচিত্র বিজ্ঞাপন জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। পণ্যের কাটতি বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞাপনে দেওয়া হয়েছে নানারকম লোভনীয় উপহারের প্রতিশ্রুতি। একালের পাঠকের কাছে সেকালের সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের কিছু নমুনা পেশ করা যাক। শুরু করি বই-এর বিজ্ঞাপন দিয়ে। *সমাচার দর্পণ, সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়* থেকে শুরু করে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের *এডুকেশন গেজেট*-ও বই-এর বিজ্ঞাপন পরম আগ্রহে প্রকাশ করত। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌ ভারতবর্ষে আসার পর সেকালের বিখ্যাত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত ভিক্ষা'-র যে বিজ্ঞাপন বেবিয়েছিল সেটি এইরকম

'নূতন পুস্তক
ভারতভিক্ষা।
(প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের শুভাগমন উপলক্ষে)
কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য।'

এরপরে বইটির দাম, প্রাপ্তিস্থান সবকিছু জানানো হয়েছে।

বাংলা বই-এর বিজ্ঞাপন অনেক সময় আবার ইংরেজি-তে লেখা হত। *এডুকেশন গেজেট* থেকে একটু নমুনা দেওয়া যাক--

BEERA BALA!!!
A
Most enchanting and heroic drama comprising a war with the famous Nictor Seleucus and Chandracotas. By Babu Umesh Chandra Gupta. Apply to the Editor of Sammilani, Teota.

পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞাপন যে কত বেরিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সেকালের কাগজ খুললেই নানা ধরনের পত্রিকার বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। ২৫ এপ্রিল ১৮৮০-র *সাধারণী* থেকে মেয়েদের বিখ্যাত কাগজ *বামাবোধিনী*-র একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধার করছি--

বামাবোধিনী পত্রিকা

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগেব হিতার্থ প্রথম প্রকাশিত এই পত্রিকাখানি প্রায় ১৬ বৎসর কাল চলিয়া মধ্যে বিশেষ দুর্ঘটনা প্রযুক্ত এক বৎসর বন্ধ ছিল। কার্ত্তিক মাস হইতে ইহা পুনঃপ্রকাশিত হইয়া ছয় মাস কাল নির্বিঘ্নে ও নিয়মিতরূপে চলিয়া আসিয়াছে।.. এক্ষণে বামাবোধিনী যাহাতে অধিকতর উন্নতি লাভ কবিয়া বামাগণের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সহায় হইতে পারে তাহা একান্ত প্রার্থনীয় এবং সেইজন্য দেশস্থ বিদ্যানুরাগী ও বামাকুলের উন্নতি প্রার্থী সকল মহোদয় ও মহোদয়ার নিকট আগ্রহ সহকারে প্রার্থনা তাঁহারা এই পত্রিকার প্রতি যথোচিত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া ইহার উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করিবেন।

বিয়ের বিজ্ঞাপন উনিশ শতকের সত্তরের বছরগুলি থেকেই বেরোতে আরম্ভ করে। এইকালে বিধবা বিবাহের বিজ্ঞাপনও আমাদের চোখে পড়ে। ২৯ অগস্ট, ১৮৮১-র *সোমপ্রকাশ* থেকে এই রকমের একটি বিজ্ঞাপন তুলে ধরছি—

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী একটি ব্রাহ্মণকন্যা, বিবাহপ্রার্থিনী বালবিধবা কিন্তু এক্ষণে বয়ঃক্রম ২০ কিম্বা ২১ বৎসর হইবে ; ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈদ্য এই তিন জাতির মধ্যে অবস্থানুসারে বিবাহ দেওয়া যাইবে। যাঁহারা এই প্রস্তাবিত বিষয়ে ইচ্ছুক হইবেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকৃত অবস্থা এবং নামধাম লিখিয়া ২০-এ আশ্বিন মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। তৎপরে পত্রাদি পাঠানো বিফল।

ঠিকানা
শ্রী রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৫০ নং সিকদারের বাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালিসমাজে পণপ্রথা বীভৎস ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কন্যাদায়ে অনেক পরিবার সর্বস্বান্ত হয়। কন্যাদায়ে ভিক্ষা চেয়ে একটি করুণ বিজ্ঞাপন ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চের *এডুকেশন গেজেট*-এ আমাদের চোখে পড়েছে—

'কন্যাদায়ে ভিক্ষা

আমি স্বামী পুত্রহীনা। একটি কন্যামাত্র অবলম্বন। দুঃখ করিয়া কষ্টে খাই এবং মেয়েটিকে খাওয়াই। কন্যাটি বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, আর রাখা চলে না। আত্মীয়স্বজন গরিব, কাহারও সাহায্য করিবার ক্ষমতা নাই। একশত টাকার কমে মেয়েটি পার হইবে না। মেয়েটি সুন্দরী বলিয়াই এত কমে হইবে। এই টাকা সমস্তই ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। অনন্যোপায় হইয়া সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপন দিতেছি। হিন্দু-মুসলমান মাত্রের নিকট করযোড়ে ভিক্ষাপ্রার্থনা। দয়া করিয়া দুই এক পয়সাও যিনি যাহা দেন হুগলী জজ কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ ধর মহাশয়ের নিকটে দিলে আমি পাইতে পারি

শ্রী শিবদাসী দাসী,
চুঁচুড়া

মেয়েরা যখন লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করলেন, তখন ব্যাপারটাকে বাঙালিসমাজ খুব প্রসন্ন চোখে দেখেনি। বেথুন স্কুল খোলার পর সামাজিক কীরকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল তা আমরা সবাই জানি। মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর কাতর আহ্বান জানিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞাপন ১৮৫৬-র ২৪ ডিসেম্বরের *সংবাদ প্রভাকর*-এ আমাদের চোখে পড়েছে। চোখে পড়েছে বিভিন্ন অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষাকেন্দ্রের বিজ্ঞাপনও। তারপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা বুঝতে আরম্ভ করলেন। দেখা দিল স্ত্রী শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগল এই ধরনের বিজ্ঞাপন। বিখ্যাত পত্রিকা *ঢাকাপ্রকাশ* থেকে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক—

কর্ম্মখালি

চট্টগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একজন শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন. বেতন মাসিক ১৫ টাকা। আগামী ১৫ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে আবেদনপত্র হস্তগত হওয়া আবশ্যক। শিক্ষা ও সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে বিশেষ নিদর্শন দেখাইতে হইবে।

শ্রী শিবচন্দ্র নাগ
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

ভারতবর্ষীয় " সনাতন ধর্ম্ম রক্ষণী সভা " স[illegible]ক্রান্ত সা-হিত[illegible] য[illegible]ন্ত্রের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক [illegible] [illegible]শেষ অপটুতা, আলস্য ও নানাপ্রকার দোষ নিবন্ধন [illegible]ক য[illegible]ন্ত্রের যাবতীয় কার্য্যের বিস্তর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত [illegible]য়, এবং ক্রমান্বয়ে সংস্কৃত শাস্ত্রানুবাদক দুই জন প[illegible] [illegible]র শারীরিক উৎকট পীড়া প্রযুক্ত সনাতন ধর্ম্মোপদে[illegible] [illegible]ত্রিকা কয়েক মাস যাবৎ প্রকাশ করা হয় নাই, তাহা[illegible] [illegible]াহকমহোদয়গণ অবশ্যই বিরক্তচিত্ত হইয়া থাকিবেন। এই বিষয়টী আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাতীত হওয়ায় ভরসা করি, তাঁহারা এই দোষ মার্জ্জনাপূর্ব্বক " উপদেশিনীর " প্রতি পূর্ব্ববৎ অনুরাগ প্রকাশে পত্রিকা গ্রহণ ক[illegible] বাধিত করিবেন।

সম্প্রতি নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া, যাহাতে ভবি-ষ্যতে অবাধে সুনিয়মে পত্রিকা মুদ্রাঙ্কিত হইয়া গ্রাহক সন্নি-ধানে রীতিমত কালে প্রেরিত হইতে পারে তদুপোযোগী উপায় সমস্ত অবলম্বিত হইয়াছে। ভগবৎ কৃপায় বোধ হয় আর কোন বিঘ্ন সংঘটিত হইবে না। কিমধিক লিতি তাং ৫ ই অগ্রহায়ণ ১২৭৯।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
ত্রৈবৈতনিক সম্পাদক

ধর্মসভা-র বিজ্ঞাপন

কত যে সভা-সমিতি উনিশ শতকে স্থাপিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এইসব সভাসমিতির মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এর প্রথম সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে ব্রাহ্মসমাজ তাঁর দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। বই-এর আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম সমাজকে জানিয়ে দেন যে এই সাহায্যের আর কোনো প্রয়োজন নেই। এই প্রসঙ্গে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র ১৭৮৪ শকের কার্তিক সংখ্যায় যে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় সেটি এইরকম—

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় সমাজ হইতে যে বার্ষিক বৃত্তি পাইতেছিলেন, সম্প্রতি তিনি তাহা গ্রহণ অনাবশ্যক বিবেচনায় উপকার স্বীকারপূর্ব্বক এক্ষণ অবধি আর না লইবার প্রার্থনায় এক পত্র লিখিয়াছেন, অধ্যক্ষ মহাশয়রা যে তাঁহাব নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ ছিলেন, ঐ পত্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ করিলেন।

উনিশ শতকে বিশেষ করে হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলনেব কালে কত যে ধর্মীয় সভা স্থাপিত হয়েছিল তার ঠিক নেই। এমনই একটি প্রতিষ্ঠান 'সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা'। এই সভার মুখপত্র থেকে সভাটির একটি বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি এইসঙ্গে দেওয়া হল।

বিজ্ঞাপন পাওয়ার ক্ষেত্রে কলকাতার কাগজগুলি যে অনেকখানি এগিয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। তবে মফস্‌সলের কাগজগুলি যে খুব একটা পিছিয়েছিল তা কিন্তু নয়। পূর্ব বাংলাব প্রথম সংবাদপত্র *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* (১৮৪৭)-তে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন দেখেই রামনারায়ণ তর্করত্ন 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব'-র মতো নাটক লিখতে উৎসাহিত হন। দীর্ঘজীবী *ঢাকাপ্রকাশ*-এ কত ধরনের বিজ্ঞাপনই না বেরোত। এই পত্রিকা থেকে সেকালের সরকারি বিজ্ঞাপনের একটু নমুনা হাজির করি--

গভর্ণমেন্টের বিজ্ঞাপন। ফোর্ট উইলিয়াম, ৯ জুলাই, ১৮৬৩ ইংরেজী : যেহেতু শহর ঢাকার বহুতর বাসিন্দাগণ উক্ত সহরের গলি ও সড়ক নবদমা ও পুষ্করিণী প্রস্তুত, জীর্ণ সংস্কার ও পরিষ্কার ও আলোময় ও কদর্যবস্তু বারণ ও অন্য প্রকার শহরের উন্নতি সাধন মানসে ১৮৫০ সনের ২৬ আইন জারী হওয়াব বাসনায় বাংলা প্রদেশে শ্রীল শ্রীযুক্ত লেফটেনেন্ট গভর্ণর সাহেব বাহাদুরেব আবেদন করিয়াছেন, অতএব উক্ত শহরের সর্ব্বসাধারণদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাহারা কি তন্মধ্যে যে কোন ব্যক্তি উক্ত আইন জারীতে বিপক্ষে কি সপক্ষে হবেন, তাঁহারা উক্ত স্থানের শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে অদ্যকার তারিখ হইতে একমাস মধ্যে স্বীয়২ আপত্তি উপস্থিত করেন ইতি। একটিং ম্যাজিষ্ট্রেট।

১৮৬৬ সালে ময়মনসিংহ থেকে *বিজ্ঞাপনী* নামে পত্রিকা প্রকাশিত হত কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায়। কিন্তু নামের সঙ্গে বিজ্ঞাপন শব্দটি থাকলেও এটি বিশেষ জ্ঞাপন অর্থে সংবাদপত্র। এতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতো কিনা তা আমাদের জানা নেই। তবে ১৮৭৫ সালে ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত *ভারতমিহির* পত্রিকার মূল কপিতে দেখি বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। বই ও পত্র-পত্রিকা ছাড়া *ভারতমিহির পত্রিকায়* উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞাপন হলো--

১ বৃত্তি খালি (স্কুলের ছাত্রবৃত্তির ঘোষণা)

২ কর্ম্মখালি (শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি)

৩ ময়মনসিংহ অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার পাঠ্য

৪ কৃষিপ্রদর্শনী মেলা

৫ জ্বরবিনাশক পরীক্ষিত মহৌষধ বিক্রি

৬ পরীক্ষিত সন্ন্যাসী দত্ত মহৌষধ

৭ নিলামী বিজ্ঞাপন (সাবর্ডিনেট জজ আদালত জেলা ময়মনসিংহ)

৮ আমমোক্তার বরখাস্ত

৯ বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং কর্পরেসন লিমিটেডের 'অনুষ্ঠানপত্র'

১০ বিশুদ্ধ আসাম চা

১১ Tender Notice প্রভৃতি

ভারতমিহির পত্রিকার ১২টি পৃষ্ঠার শেষ তিন পাতা জুড়েই বিজ্ঞাপন ছাপা হত।

দিনাজপুরের ব্রজেশ্বর সিংহ সম্পাদিত দীর্ঘস্থায়ী মাসিক *দিনাজপুর পত্রিকা*-য় (১৮৮৫) সাহিত্য ও সংবাদের পাশাপাশি বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন ছাপা হত। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন সম্পর্কে গবেষক মেহরাব আলী জানিয়েছেন—

ভারতমিহির। ২রা বৈশাখ, ১২৮৭।

...মূল্য নাই। * * গ্রন্থের ভাষাটী মনোহর ... রচনৌশল বিশিষ্ট, লেখক লিপি ... বহুবিবাহ নিবারণ জন্য আইন হওয়া উচিত কি না এইবিষয়ে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠকদিগকে পড়িতে অনুরোধ করি। বঙ্গদর্শন, ১২৮০ কার্তিক।

পরীক্ষিত সন্ন্যাসী দত্ত মহৌষধি।

[illegible]

শ্রীমহেশচন্দ্র সরকার।
পোঃ—বালীয়াটি,—জিলা ঢাকা।

[illegible]

... নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অংশীদিগকে আবেদন কালে প্রত্যেক অংশের নিমিত্ত এক টাকা, অংশ প্রাপ্ত হইলে এক টাকা, তৎপর তিন তিন মাস বিজ্ঞাপনের পর এক এক বারে এক এক টাকা করিয়া দিতে হইবে অর্থাৎ গৃহীত অংশের সমস্ত টাকা আড়াই বৎসরে প্রদান করিতে হইবে। [illegible]

স্থায়ী আমানতি টাকার সুদ।

[illegible]

শ্রীভুবনমোহন ...
বঙ্গদর্শনের সম্পাদক
... কলিকাতা।

বিবিধ তন্ত্রের প্রমাণ ও অনুবাদসহ তন্ত্রসার প্রকাশ করিতেছি। অনুমান ২৫ খণ্ডে এবং ইন্দ্রজাল, মন্ত্রোক্ত ... ৮ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। গ্রাহকদিগের পক্ষে প্রতিখণ্ডের মূল্য ... [illegible] ... সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়
জ্যোতিষ প্রকাশ যন্ত্রালয়
... কলিকাতা ...

ভারত মিহিরের এজেন্ট।

[illegible]

ভারতমিহির সংক্রান্ত নিয়ম।

[illegible]

মূল্যের নিয়ম।

[illegible]

শ্রীকালী নারায়ণ সান্যাল
অধ্যক্ষ।

এই পত্রিকা প্রতি ... ময়মনসিংহ ভারতমিহির যন্ত্রে ... কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপন প্রকাশে মফস্সলের কাগজগুলিও পিছিয়ে ছিল না

পত্রিকার শেষাংশে ছিল বিজ্ঞাপন বিভাগ। রকমারি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত উক্ত বিভাগে। তা ছাড়া ধারাবাহিকভাবে এমন একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতো সংবাদপত্রের ইতিহাসের গবেষণার জন্য যার

মূল্য অনন্য। অর্থাৎ যখনই বাংলাদেশের যে স্থান, বিশেষ করে কলকাতা, ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় শহর থেকে যেসব নতুন নতুন পত্র-পত্রিকার বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত আলোচনাসহ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হতো। ফলে আজীবন পত্রিকাটির পাতায় প্রকাশিত সমসাময়িক নতুন নতুন পত্র-পত্রিকাগুলোর নাম গণনা করে দেখা যায় তার সংখ্যা ৮০টির কম নয়। বাংলাদেশের সাংবাদিকতা ও পত্র-পত্রিকার বিস্মৃত ইতিহাসের গবেষণার জন্য এটি যে কত বড় মূলাবান তথ্যসম্পদ তা' বলাই বাহুল্য।

মেহরাব আলীর মন্তব্য থেকেই জানা যায়, পত্রিকাটি বিজ্ঞাপন প্রকাশের ক্ষেত্রে তেমন বাছ-বিচার করতো না। ব্যবসায়-বাণিজ্য, দোকানপাট, নিলাম ইস্তেহার, জমিদারি ক্রয়-বিক্রয়, যাদুমন্ত্র, ভোজবাজি প্রভৃতি সকল বিষয়ের বিজ্ঞাপন এতে প্রকাশিত হত। পত্রিকার শেষাংশে এক তৃতীয়াংশ জুড়ে থাকতো বিজ্ঞাপন।

উনিশ পেরিয়ে আমরা যখন বিশ শতকে পড়লাম তখন সংবাদপত্রের সংখ্যা যেমন গেল বেড়ে, তেমনই বিজ্ঞাপনও আসতে লাগত প্রচুর পরিমাণে। এই শতকে সিনেমা-থিয়েটারের কাগজ যেমন বেরোতে লাগল, তেমনি প্রকাশিত হতে শুরু করল অভিনব সব বিজ্ঞাপন। ১১.১.১৯০১-এর *মিহির* ও *সুধাকর* থেকে এমনই একটি বিজ্ঞাপন--

ক্লাসিকেই কেবল আনন্দ লহরী।
আসিয়া দেখুন--হাসিমুখে ফিরিয়া যান।
ক্লাসিক থিয়েটার
৬৮নং বিডন ষ্ট্রীট
শনিবার ২৮শে পৌষ, ১৩০৭ সাল
রাত্রি ৯টা
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক
নাটকাকারে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমর
বারুণী পুষ্করিণীর সুন্দর দৃশ্য, জলমগ্ন রোহিণীর আশ্চর্য্য উদ্ধার
তৎপরে
সেই বায়স্কোপ। সেই
বুয়ার যুদ্ধের লোমহর্ষণ চিত্রাবলী- সার্কাসের খেলা, ভাঁড়ের তামাসা, হাসির তুফান, কামানের ধুমরাশি--সব কথা বলা হইল না।-আসিয়া দেখুন
পরদিন রবিবার সন্ধ্যা ৬।।. টায়
কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজাধিরাজ
মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের উপস্থিতিতে বিরাট আয়োজন
১) সেই সরস নূতন নক্সা চাবুক
২) সেই পরীদৃশ্যময় বিচিত্র অপেরা সোনার স্বপন
৩) তার উপর আবার বায়স্কোপ
বিলম্বে আসিলে স্থান পাইবেন না।

ডি. দ
বিজনেস ম্যানেজার

শ্রী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত
ম্যানেজার।

ধূমকেতু



সারথি—কাজী নজরুল ইসলাম

শুক্রবার, ২৬শে আশ্বিন ১৩২৯ সাল, ১৩ই অক্টোবর, ১৯২২

যুধিষ্ঠির দাঁ ও মোহিতমোহন দাঁ

২১১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা



পূজার

সুন্দর দেশী পোষাক

মন্মথনাথ দাঁ

ও

সুধীরমোহন দাঁ

২১০নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

Printed & Published by Md. Afzalul Haque
7, Pratap Chatterji Lane, Calcutta.

ধূমকেতু ভরে থাকত বিজ্ঞাপনে

তারপর দিন যত এগোল, বিজ্ঞাপনদাতাদের দাপটও বাড়তে লাগল তত। নজরুলের বিখ্যাত পত্রিকা *ধূমকেতু*-র মুখ পর্যন্ত ঢেকে যেতে লাগল বিজ্ঞাপনে। তারই সামান্য একটু নমুনা দিয়ে শেষ করি বর্তমান প্রসঙ্গ।

তথ্যসূত্র :

ঢাকাপ্রকাশ ১৮৬৩
ভারতমিহির ১৮৮০
এড়ুকেশন গেজেট ১৮৭৫
মিহির ও সুধাকর ১৯০১
ধূমকেতু ১৯২২
মেহরাব আলী *দিনাজপুরের সাংবাদিকতার একশ বছর* (ঢাকা, ১৯৯৪)

লেখক পরিচিতি

অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় — গবেষক। অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। উল্লেখযোগ্য বই-- *প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প : মননে ও সৃজনে।*

অলোক রায় — বিশিষ্ট লেখক-গবেষক। প্রাক্তন অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। উল্লেখযোগ্য বই--*রাজেন্দ্রলাল মিত্র, উনিশ শতক।*

আবুল আহসান চৌধুরী — বিশিষ্ট লেখক-গবেষক। অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ। উল্লেখযোগ্য বই--*কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা।*

আশিস খাস্তগীর — বিশিষ্ট গবেষক। অধ্যাপক, কালীনগর কলেজ। উল্লেখযোগ্য বই-- *বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষা, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা* (সম্পাদনা)।

ইসরাইল খান — বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্রের বিশিষ্ট গবেষক। উল্লেখযোগ্য বই--*পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান : জীবন ও চিন্তাধারা।*

উৎপলকুমার বসু — বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক। উল্লেখযোগ্য বই--*শ্রেষ্ঠ কবিতা, গদ্য সংগ্রহ* (১)।

কৃষ্ণ ধর — বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক। প্রাক্তন সম্পাদক, *যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী*। উল্লেখযোগ্য বই--*ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাংলা, কলকাতা--তিন শতক।*

চণ্ডী লাহিড়ী — বিশিষ্ট ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী। উল্লেখযোগ্য বই--*গগনেন্দ্রনাথ--কার্টুন ও স্কেচ।*

তপন বাগচী — বাংলাদেশের সাংবাদিক-গবেষক। উল্লেখযোগ্য বই--*নির্বাচন সাংবাদিকতা।*

দেবীপ্রসাদ ঘোষ — চলচ্চিত্র গবেষক। উল্লেখযোগ্য বই--*চলচ্চিন্তা, বাংলাভাষায় চলচ্চিত্রচর্চা* (১৯২৩-৩৩) (সম্পাদনা)।

প্রভাতকুমার দাস — বিশিষ্ট লেখক। সম্পাদক, *বহুরূপী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*। উল্লেখযোগ্য বই--*জীবনানন্দ দাশ, কবিতা পত্রিকা : সূচিগত ইতিহাস।*

বারিদবরণ ঘোষ	বিশিষ্ট লেখক-গবেষক। প্রাক্তন অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। উল্লেখযোগ্য বই—*সাহিত্য সাধক শিবনাথ শাস্ত্রী, চিত্রশিল্পী হেমেন মজুমদার*।
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	বিশিষ্ট গবেষক-লেখক। প্রাক্তন অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। উল্লেখযোগ্য বই--*বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস--প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব, কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*।
মুস্তফা নূরউল ইসলাম	বিখ্যাত লেখক-গবেষক। প্রাক্তন অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাক্তন মহা-পরিচালক, বাংলা আকাদেমি, ঢাকা। উল্লেখযোগ্য বই—*সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত* (২ খণ্ড), *আমাদের মাতৃভাষা চেতনা ও ভাষা-আন্দোলন*।
রমেনকুমার সর	গবেষক। অধ্যাপক, শ্রীগোপাল ব্যানার্জি কলেজ।
শেখর ভৌমিক	গবেষক। অধ্যাপক, মহিষাদল রাজ কলেজ। উল্লেখযোগ্য বই—*সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চা* (সম্পাদনা)।
শ্যামল চক্রবর্তী	বিশিষ্ট গবেষক। অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। উল্লেখযোগ্য বই—*বিশ্বসেরা বিজ্ঞানী, জিন জীবন ক্লোনিং--পথের শেষ কোথায়?*
সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	বিশিষ্ট লেখক-গবেষক। উল্লেখযোগ্য বই—*গ্রামবাংলার গড়ন ও ইতিহাস, দেশভাগ--দেশত্যাগ*।
সাজ্জাদুর রহমান	বাংলাদেশের লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত গবেষক।
সুদীপ বসু	গবেষক। অধ্যাপক, বিশ্বভারতী। উল্লেখযোগ্য বই--*বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা*।
সুবিমল মিশ্র	গবেষক। উল্লেখযোগ্য বই- *জলধর সেনের কিশোব রচনা সংগ্রহ* (সম্পাদনা), *শিবনাথ শাস্ত্রীর কিশোর রচনা সম্ভার* (সম্পাদনা)।
সুমন ভট্টাচার্য	গবেষক। অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর গার্লস কলেজ।
সুরজিৎ বসু	গবেষক। অধ্যাপক, চারুচন্দ্র কলেজ। উল্লেখযোগ্য বই—*বাংলায় সাহিত্য আন্দোলন, বঙ্গদর্শন-পরিচয়*।
হাবিব রহমান	বিশিষ্ট লেখক-গবেষক। অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ। উল্লেখযোগ্য বই—*মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর চিন্তাধারা, মোতাহের হোসেন চৌধুরীর জীবন ভাবনা*।